শারদীয়া
কিশোর ভারতী
শারদীয়া ১৩৮২
সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই সংখ্যায় প্রায় শত লেখক-শিল্পীর মহাসমারোহ

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ আশাপূর্ণা দেবী ॥ সূর্য রায় ॥ ধীরেন্দ্রলাল ধর ॥ নারায়ণ দেবনাথ ॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥ স্বপনবুড়ো ॥ বিমলচন্দ্র ঘোষ ॥ মন্মথ রায় ॥ খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ॥ অদ্রীশ বর্ধন ॥ বীরু চট্টোপাধ্যায় ॥ সঙ্কর্ষণ রায় ॥ নটরাজন ॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসু ॥ কুমারেশ ঘোষ ॥ প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ নচিকেতা ভরদ্বাজ ॥ দুর্গাদাস সরকার ॥ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক ॥ মনোরঞ্জন ঘোষ ॥ অজেয় রায় ॥ অরুণ আইন ॥ অশোককুমার সেনগুপ্ত ॥ হীরালাল চক্রবর্তী ॥ ময়ূখ চৌধুরী ॥ শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পরেশ ভট্টাচার্য ॥ সুতপা চক্রবর্তী ॥ নীরদ হাজরা ॥ শৈবাল চক্রবর্তী ॥ বিশ্বপ্রিয় ॥ দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ সুশীলকুমার গুপ্ত ॥ সুধীরকুমার করণ ॥ সুফি ॥ সুধীন ভট্টাচার্য ॥ বারীন বসু ॥ অবনীভূষণ ঘোষ ॥ অবিনাশ সাহা ॥ সুজিতকুমার সেনগুপ্ত ॥ শৈলেনকুমার দত্ত ॥ প্রভাকর মাঝি ॥ করুণাময় বসু ॥ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ॥ রবি ভট্টাচার্য ॥ নিশিকান্ত মজুমদার ॥ অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ আদিত্য রায়চৌধুরী ॥ সুনীতি মুখোপাধ্যায় ॥ বিমল সেন ॥ শ্যামলেন্দু চৌধুরী ॥ সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ অপূর্বকুমার কুণ্ডু ॥ শৈলেন দত্ত ॥ গোবিন্দ গোস্বামী ॥ বিশ্বনাথ দাস ॥ চণ্ডী সেনগুপ্ত ॥ শিখরেশ দাস ॥ তাপসকুমার ঘোষ ॥ শঙ্করলাল সাহা ॥ শৈলেশ সেনগুপ্ত (শিল্পী) ॥ শাশ্বত সেন ॥ নয়নরঞ্জন বিশ্বাস ॥ অনিল ভট্টাচার্য ॥ কিশোর জাদুকর ॥ কিশোর বিজ্ঞানী ॥ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোথাও যা নেই, থাকছে এখানেই !

ঐতিহাসিক 'অষ্টবজ্রসম্মেলন' ! আহ্লাদে আটখানা হবার মতো আটখানা সম্পূর্ণ উপন্যাস

দুর্যোগের ঘূর্ণিঝড়ে ।। দিগ্বিজয়ীর দিগন্ত ।। টার্গেট—টেগার্ট ।।
ঝিকিমিকি জল, নদী টলমল···।। অচিন যুগের ভোরে ।।
লিফটবয় ।। রক্ত-প্রবাল ।। ধূমকেতু আর সূর্য

অপরাজেয় কিশোর 'ভারতীয় একাদশ' ! এগারোটি উপন্যাসোপম বড় গল্প ঃ

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড ।। নেকড়ে-মানব ।। ক্রুষ্কিয়াম্ নটোবোরিয়াম্।। পদ্মবনে হাতী ।। ইন্দ্ররাজের অজ্ঞাতবাস ।। ছদ্মবেশী ।। নাগরদোলা ।।
ব্রণ্টি ।। গিরিশ নট্ট ।। মাৎস্যন্যায় ।। চাঁদনী

'বাউণ্ডারী' ! চারটি সম্পূর্ণ ছবিতে গল্প (দুটি রঙিন) ঃ

সন্ধ্যার মহুয়ামিলন ।। নণ্টে আর ফণ্টে ।। রাজা হবুচন্দ্রের জুতো চুরি

মনে গাঁথবার 'চার' ! চারটি কৌতূহলোদ্দীপক বিশেষ রচনা ঃ

মনে পড়ে ।। প্রথম দেখা ।। সাপ ও শরৎচন্দ্র ।। কেন চিড়িয়াখানা

একাধারে পাঠ করবার ও পার্ট করবার !

শরৎ-মুকুল ।। মামার বাড়ী

ময়দানব না বিশ্বকর্মা ? বিচিত্র যন্ত্রের সচিত্র নির্মাণ-প্রণালী

নিজে করো ঃ এলিমিনেটর

বুদ্ধির 'দ্বৈরথ' ! গোলক-ধাঁধায় ফেলে দেবার মতো দুটি আশ্চর্য খেলা !

জিতল কে ? ।। চোর কে ?

'পাঁচমিশালী ব্যঞ্জন' আরো একজাহাজ গল্প-কবিতা-আসরের সমারোহ ঃ

গল্প ঃ সোনার হাতী। মণিহারা। রুমমেট। বিশ্বকর্ম। শেষ পাতা। দশাননের পঞ্চানন। বাহন নিয়ে বিপদ। কুম্ভীরাশ্রু। চিড়িয়াখানায় সাপের খানা। ডিকি। আবর্ত। দাদুর চাদর ।। আসর ঃ মহাজীবনের মণিকণা। এক নাম, অন্য মুখ। জাদুবিদ্যা। টুকরো হাসি। গল্প হলেও সত্যি। যা নয় তাই। জানো কি? এবং আরো অনেক কিছু ।।

ছোট ছোট বাসন কোসন
চামচ হাঁড়ি-কুড়ি
'ডাটার' গুঁড়ো মশলা দিয়ে
রান্না ভালই করি।
ডাটা
গুঁড়া মশলা
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৮২

শারদশুভেচ্ছা

● পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক জেলা-বোর্ডসমূহের জন্য মাসিক কিশোর-পত্রিকারূপে অনুমোদিত [৫.৪.৭৫ তারিখের ১৫৪ (১৬) টি. বি. সি, / ২এ-১টি/৭৪ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য]

● পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত [১৭.৩.৭২ তারিখের টি. বি. নং ৩ দ্রষ্টব্য]

● আসাম শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত [২.৭.৭১ তারিখের ই জি/এম আই এস সি/২৩/৭০/৩২/(এ) নং মেমো দ্রষ্টব্য।]

● পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক স্কুল লাইব্রেরীসমূহের ব্যবহারের জন্য ও প্রাইজ-পুস্তক হিসাবে সুপারিশকৃত [২৫.৯.৬৯ তারিখের ২২/৬৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।]

'পত্র ভারতী'র প্রকাশনায়

শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৩৮২

সূচীপত্র

মজার গল্প

গভীর রসের কবিতা

হাস্যরসের কবিতা

কবিতাগুচ্ছ ঃ ২

কৌতূহলোদ্দীপক স্মৃতিকথা

মনে গাঁথবার 'চার'

ভ্রমণ-কাহিনী

মহাজীবনের নাটক

অশান্ত কৈশোরের নাটক

সরস নিবন্ধ

বিজ্ঞানীর দপ্তর—পরিচালক ঃ কিশোর বিজ্ঞানী

জাদুবিদ্যা—পরিচালক ঃ কিশোর জাদুকর

মূল্য ঃ বারো টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

কিশোর ভারতী কার্যালয় ॥ ৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ ॥ ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৯
এবং বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত **বইয়ের দোকান ও পত্রপত্রিকার স্টল**

'পত্র ভারতী'র পক্ষে দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস, ১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

অষ্টম বর্ষের সূচনা-লগ্নে

স্নেহের বন্ধুগণ, আবার এল কিশোর ভারতীর শুভ জন্মলগ্ন। আজ সে অষ্টম বর্ষে পা দিল। আজ থেকে ঠিক আট বছর আগে এমনি এক শুভ দিনে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

তোমরা নিশ্চয়ই জান, ক্ষেত্রবিশেষে এক-একটা কথা আমাদের চিন্তা-রাজ্যে এক-এক ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। মনে করো, অতি আপন কোন প্রিয়জনের কোন শুভ সংবাদ তোমাদের কানে এল। এ সন্দেশে মনে তোমাদের কোন্ ভাবের উদয় হবে, তা বোধহয় ব্যাখ্যা করার দরকার করে না। নিঃসন্দেহে তোমাদের চিত্তলোক মধুর রসানুভূতিতে সিক্ত হয়ে উঠবে।

অথচ এই একই খবর যদি তোমরা শোন এমন কারো সম্বন্ধে যাকে হয়তো প্রায় চেনই না বা চিনলেও যার সঙ্গে অন্তরের প্রত্যক্ষ নিবিড় যোগ অতি সামান্যই, তাহলে তোমাদের মনোরাজ্যে তা কার্যতঃ কোন সাড়াই জাগাবে না, অথবা একান্তই যদি জাগায় তা উল্লেখ করার মতো নয়।

তেমনি বন্ধু, কিশোর ভারতী আজ আট বছরে পা দিল, সামান্য এই কথা কয়টি তোমরা যারা কিশোর ভারতীর সবচেয়ে আপন সবচেয়ে নিকট জন তাদের অন্তর্লোকে কী অসামান্য আনন্দের গুঞ্জরন তুলবে, তা আর কেউ না বুঝুক, আমরা মনেপ্রাণে বুঝি।

কিশোর ভারতী যদি একখানা উদ্দেশ্যহীন আদর্শহীন পত্রিকা হতো, তার আত্মপ্রকাশ ও পরিচালনার পেছনে যদি সুনির্দিষ্ট কতকগুলি নীতি কাজ না করতো, তাহলে সে কখনই তোমাদের অবিসংবাদী মুখপত্রে পরিণত হতে পারতো না।

তোমরা তো জান বন্ধু, গত সাত বছরের পথ-পরিক্রমায় তোমাদের প্রাণ-ভরা শুভেচ্ছা ও ভালবাসা কিশোর ভারতীকে কিভাবে সঞ্জীবিত করেছে। অনাবিল এই শুভেচ্ছা ও ভালবাসার শুভ্র দীপ্তি অনির্বাণ আলোকবর্তিকার মতো তার ভবিষ্যতের যাত্রাপথকেও উদ্ভাসিত করবে, আজ তার এই শুভ জন্মলগ্নে এর চেয়ে বড় কামনা আমাদের আর নেই।

তোমরা শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবে যে, তোমাদের দাবি ও পরামর্শমতো কিশোর ভারতীকে আমরা আরো সুন্দর আরো সমৃদ্ধ এবং তার প্রকাশকে সুনিয়মিত করার ব্যবস্থা করছি।

কিশোর ভারতীর পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে আজ আমরা জানাই অন্তরের একান্ত শুভেচ্ছা ও ভালবাসা আর স্নেহাশিস। মনেপ্রাণে প্রার্থনা করি, তোমাদের ভবিষ্যৎ দীর্ঘ জীবন চিন্তা ও কর্মের সাফল্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

এবারের শারদীয়া কিশোর ভারতী কেমন লাগলো, জানাতে ভুলো না কিন্তু। ইতি

তোমাদের

সম্পাদক বন্ধু

ঘনার বচন

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নতুন কবিরাজী মতে
জানাই কটি সত্য,
কোন্ রোগে কি দাওয়াই দেবে
এবং কি বা পথ্য।

পড়তে বসে উশখুশিয়ে
ওঠে যদি মনটা,
ডাংগুলি কি ঘুড়ির ধ্যানে
গোনে ছুটির ঘণ্টা,

চুপিসারে সট্‌কে পড়ার
খোঁজে শুধু মৌকা,
ভরা পালেও চড়ায় ঠেকে
হয় যেন এক নৌকা,

তখন হবে মরুভূমির
জাহাজ হেন উষ্ট্র।
এই বুদ্ধিই দিয়ে গেছেন
প্রাচীন জরথুশ্‌ত্র

উষ্ট্র কেন? মানে কি?
বুঝলে না ত? বলে দি!

উষ্ট্র যেমন জলের খোরাক
জমিয়ে রাখে হপ্তার,
তেমনি ছুটির যত খেলা
জমাও মাথায় সব তার॥

পড়ার সঙ্গে একটু করে
খেলাও দিলে মাখিয়ে,
ছুটির পড়া, পড়ার ছুটি,
ছুই উঠবে জাঁকিয়ে।

এমনি আরো অনেক দাওয়াই
দিতে পারি বাতলে,
মেলে যদি মনের মত
ভুজিটা পাত পাতলে॥

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পূর্ণ উপন্যাস

দুর্যোগের ঘূর্ণিঝড়ে : দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২ প ৭৫

॥ এক ॥

নিরুদ্বিগ্ন শান্ত পরিবেশ রায় পরিবারে। দৈনন্দিন জীবনে আনন্দ-বেদনার উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ নেই বটে, তবে ছোটখাট মিষ্টি হিল্লোলের অভাব নেই। আর ভাবার জীবনে নেই একঘেয়েমির চর্বিতচর্বণ।

বাবু ও মামণির সঙ্গে এখানেওখানে বেড়াতে যাওয়া তাঁদের সঙ্গে নানা আলোচনা, রাজা কেলো বালু টম প্রভৃতিকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি, লেখাপড়া ও খেলাধুলো জগতের সতীর্থ-বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ইত্যাকার আপাত-তুচ্ছ নানা ঘটনা পরিবারের আবহাওয়াকে যেমন স্নিগ্ধ মধুর করে রাখে, তেমনি ভাবার জীবনের মূল স্রোতকেও তা অলক্ষ্যে পরিপুষ্ট করে তোলে। কিন্তু এইটুকুই সব নয়।

গুরুতর জখম হয়ে ভাবা যখন নার্সিং হোমে ছিল, তখন কল্পনা দেবী সমীহযোগ্য হেন দেবতা নেই যার পায়ে মাথা কোটেন নি, জাগ্রত হেন তীর্থ নেই যেখানে মানত করেন নি।

তারপর ভাবা সুস্থ হতে এবং ধীরে ধীরে পারিবারিক স্বস্তি ও শান্তি ফিরে আসতেই, শুরু হলো কল্পনা দেবীর তাগিদ। তিনি অনর্থক সময় নষ্ট করতে নারাজ। অযথা দেরিতে কোথায় কোন্ দেবতা মনঃক্ষুণ্ণ হবেন বা হবেন না, এটা যখন স্থিরনিশ্চয় করে কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় তখন কেন এই ঝুঁকির মধ্যে যাওয়া! তাঁর এই যুক্তি কতখানি অকাট্য মোক্ষম বিশেষ করে ডাঃ রায়ের কাছে, কল্পনা দেবী তা জানেন। আর তাই যত দিন যায়, তাঁর অস্থিরতা ততই বাড়তে থাকে, আর সেই সঙ্গে চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে তাঁর তাগিদ আর হুমকির বহর।

দীর্ঘকালের পরিশীলনের ফলে এই সব ধর্মকর্মসম্পর্কিত ব্যাপারে ডাঃ রায়ের মতামত অধুনা খুবই পরিস্রুত। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম সীমারেখার ওপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে পদচারণা করেন তিনি। দেবতা অস্তি, এ বিশ্বাসের পক্ষে যেমন একমাত্র শাস্ত্রীয় বচন-নির্দেশ ও ধর্মীয় মহাপুরুষদের উক্তি ছাড়া যুক্তিসিদ্ধ খুব জোরালো আর কোন তথ্য-প্রমাণ তাঁর হাতে নেই, তেমনি দেবতা নাস্তি, এ বক্তব্যের সমীচীনতা বিচারের প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্তও তিনি মনের দিক থেকে সভয়ে পরিহার করে চলেন। কল্পনা দেবীর মতো তিনিও এসব ব্যাপারে ওরকম ঝক্কি-ঝামেলায় যাওয়ার মধ্যে কোন বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ দেখতে পান না।

তবে একটা বিষয়ে ডাঃ রায়ের বিশ্বাসে কোন কৃত্রিমতা বা ভেজাল নেই। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্যের পেছনে যে একটা মহাশক্তি কাজ করে চলেছে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কিন্তু সেই মহাশক্তির স্বরূপ এবং তেত্রিশ কোটি দেবতার রূপ ধারণ করে তা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা, তৎসম্পর্কে তাঁর মনে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই।

এ নিয়ে ভাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর ও কল্পনা দেবীর তর্ক বাধে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, তাঁরই উদ্যোগে হয়তো শুরু হয়েছে তর্ক, আর তিনি সূত্রপাত ঘটিয়ে দিয়েই কোন্ এক ফাকে সরে দাঁড়িয়েছেন, আর তর্ক চলছে ভাবা ও কল্পনা দেবীর মধ্যে। তাঁর কাজ তখন নীরবে শুনে যাওয়া।

এক দিকে বিশ্বাস ও সংস্কার, অন্য দিকে তথ্য-প্রমাণ ও জোরালো যুক্তি—তর্কের এই ধরনটা শ্রোতা হিসেবে উপভোগ করতে ডাঃ রায়ের মোটেই মন্দ লাগে না। তর্কের মধ্যে কোন পক্ষ একটু ঝিমিয়ে পড়লে বা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলে, তিনি দু-একটা লাগসই মন্তব্য করে সময় সময় আলোচনাটাকে উসকে দেবারও ব্যবস্থা করেন। অবশ্য তর্ক যদি কখনো অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তাহলে তার রাশ টানার বা দরকার মতো তা বন্ধ করে দেবার কৌশলও তাঁর বেশ রপ্ত। সেই যে কথা আছে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ', ব্যাপারটা দাঁড়ায় তখন কতকটা তেমনি।

ডাঃ রায়ের এই সূক্ষ্ম পদ্ধতিটি কেবল যে একান্ত পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই সবসময় সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়, সান্ধ্য আসরে—যেখানে ব্যারিস্টার কমল সোম ও অধ্যাপক সুরেশ গাঙ্গুলী ছাড়াও সময় সময় আরও কিছু ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক, ডাক্তার, সাহিত্যিক, ইঞ্জিনীয়ার প্রমুখ সমাজের সারবান ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন—সেখানেও চলে তাঁর এই কূট কৌশল। ফলে জমাটী সান্ধ্য মজলিস আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, আর ডাঃ রায় নীরব শ্রোতা হিসেবে তারিয়ে তারিয়ে তার রস উপভোগ করেন ও মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন।

সেদিনও তর্ক বাধলো কল্পনা দেবী ও ভাবার মধ্যে। না, ঠিক বাধলো না, ডাঃ রায়ই বাধিয়ে দিলেন।

নানারকম সাংসারিক আলোচনা চলেছে। ভাবাও উপস্থিত, কল্পনা দেবীর পাশে বসে সংবাদপত্র পাঠে মগ্ন।

ডাঃ রায়কে উদ্দেশ করে কল্পনা দেবী এক সময় প্রশ্ন করলেন,—তা, তারকেশ্বর যাচ্ছ কবে? ওখানকার পুজোটা তাড়াতাড়ি সারা দরকার। এমনিতেই অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত ডাঃ রায় চুপ করে রইলেন. তারপর মুচকি হেসে ভাবাকে দেখিয়ে বললেন,—তুমি তো বলছো সময় নষ্ট. কিন্তু খোকন বোধ করি তা মনে করে না। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

ওকে আবার কি জিজ্ঞেস করবো?—কিঞ্চিৎ ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললেন কল্পনা দেবীঃ হুঃ, কথায় আছে, দুদিনের বৈরেগী হয়ে ভাতেরে বলে অন্ন! দু পাতা ছাইপাশ পড়ে একেবারে পণ্ডিত হয়ে বসেছে। ওর কথা রাখ।

মুখ গোমড়া ক'রে ডাঃ রায় বললেন,—তা না হয় রাখলুম, কিন্ত খোকনকেও তো যেতে হবে। ওর তো কাজের অন্ত নেই। ঘরের ভাত খেয়ে বনের মোষ তাড়নাদি নানাবিধ সৎ কর্মে ও এখন বিশেষ ব্যস্ত। ওর কবে সময় হবে, তাও তো জানা দরকার। কী খোকন, শুনছিস তোর মামণির কথা?

ভাবার দিক থেকে কোন সাড়া এল না। মনে হয়,

খবরের কাগজের মধ্যে এমনি ডুবে আছে যে, এ পর্যন্ত কোন আলোচনাই তার কানে যায় নি।

ডাঃ রায় আবার ডাকতে তাঁর হুঁশ হলো, কাগজ থেকে মুখ সরিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—কি বলছো?

—আমি বলছি নে। তোর মামণি বলছে, মানত শোধ করার জন্যে তারকেশ্বর যাওয়া দরকার আর তা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই ভাল। তোর কবে সময় হবে?

অ্যাঁ, কী বলছো,—ভাবা সোজা হয়ে বসেঃ আবার তারকেশ্বর? কেন কালীঘাট, দক্ষিণেশ্বর গিয়ে কি আশ মেটেনি? তোমরা তো জান, ওসব মানত-টানত আমি মানিনে। ওসব স্রেফ সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় শুধু।

কী!—কল্পনা দেবী যেন কাঁকিয়ে উঠলেন ঃ আবার—আবার তুই ঐসব অন্যায় অধর্ম মুখে আনছিস! দেবতার পুজো করা সময়-শক্তি-অর্থের অপব্যয়! তুই কি হলি, খোকন?

ভাবা চুপ করে থাকে। মুখে মৃদু হাসি।

ডাঃ রায় বুঝতে পারেন, সাহায্য না করলে খোকনের পক্ষে আর এগুনো মুশকিল। মোলায়েম কণ্ঠে তিনি বললেন কল্পনা দেবীকে,—আহা, অত চটছো কেন? ও রকম করলে তো কোন আলোচনাই চলে না।

রাখ তোমার আলোচনা!—কল্পনা দেবী ধমকে ওঠেন। তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন,—খোকনের কি হলো বলতে পার? দিনে দিনে ও হচ্ছে কি! স্বপ্নেও কি কোনদিন ভাবতে পেরেছি, ও ঠাকুর-দেবতা মানবে না, ধর্ম মানবে না, খাঁটী যা, তা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষে উদ্ভট হয়ে থাকবে!

ডাঃ রায় হেসে ফেলেন,—তা মন্দ বলো নি, উদ্ভট হয়ে থাকবে!

ভাবা কিন্তু চুপ। নির্বিকার চোখে তাকিয়ে আছে বাগানের দিকে। আর ডাঃ রায় খোকনের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তে আশা করছেন কল্পনার মন্তব্যের প্রতিবাদ। কিন্তু না, কি যেন ভাবছে সে।

বাধ্য হয়ে ডাঃ রায়কে আবার আসরে নামতে হলো, বললেন,—না না, ওটা তুমি কিন্তু ঠিক বলো নি, কল্পনা। খোকন অধার্মিক হয়ে গেছে, এটা কি বলা যায়? অথচ তুমি যা বললে, তার অর্থ ঐরকমই দাঁড়ায়। কিরে খোকন, তুই কি বলিস?

নির্লিপ্ত কণ্ঠে ভাবা বলে,—কি আর বলবো? ঠাকুর, দেবতা, শাস্ত্র, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে কোন কথা বলতে গেলে, তা যদি মামণির সংস্কার-বিশ্বাসের অনুকূল না হয়, তাহলেই বাধে গোলমাল, মামণি রেগে যায়। সেখানে যুক্তি তথ্যপ্রমাণের কোন দামই নেই। কাজেই চুপ করে না থেকে কি করবো? অথচ আশ্চর্য, অন্য সব ক্ষেত্রে মামণি কিন্তু খুবই যুক্তিবাদী।

ডাঃ রায় তাকান কল্পনা দেবীর দিকে। তাঁর মুখ থমথম করছে, রাগে না দুঃখে বোঝা কঠিন। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে তিনি কথা বললেন, কণ্ঠে ব্যথার সুর স্পষ্ট। বললেন,—বেশ, বল্ তুই কি বলবি। আমি রাগ করবো না।

ঠিক বলছো?—খোশমেজাজে ভাবা ফিরে বসেঃ বেশ। তাহলে তোমায় একটা প্রশ্ন করবো, মামণি। তুমি যথেষ্ট পড়াশুনো করেছ, এখনো চালিয়ে যাচ্ছ। তোমায় জিজ্ঞেস করি, 'ধর্ম' কথাটার অর্থ আমায় একটু বুঝিয়ে বলবে?

সবিস্ময়ে কল্পনা দেবী বললেন,—হঠাৎ 'ধর্ম' কথাটার অর্থ নিয়ে তোর মাথাব্যথা কেন?

—এইজন্য যে, তাহলে বোঝা যাবে, বর্তমানে প্রচলিত এই সব ধর্মমতকে কেউ যদি তথ্য প্রমাণ যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে আর যাই বলা যাক, অধার্মিক, অন্যায়কারী, নীতিজ্ঞানহীন প্রভৃতি কোনভাবেই বলা চলে না। বর্তমান সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর অতীতের কঙ্কাল এইসব সেকেলে ধর্মমতের বদলে সে হয়তো যুগোপযোগী অত্যাবশ্যক কোন জীবন-দর্শনে বিশ্বাস করে। কেউ চাইলে সে দর্শনকে মহত্তম মানবধর্মও বলতে পারে। সেকেলে এইসব—

কল্পনা দেবী বাধা দেন,—থাম্ বাপু। লেক্‌চার থামিয়ে 'ধর্ম' কথার অর্থের সঙ্গে এইসব লম্বা-চওড়া বুলির সম্পর্কটা একটু বুঝিয়ে বল্। অবশ্য বাগাড়ম্বর ছাড়া বোঝা বা বোঝানোর মতো কোন বস্তু যদি থাকে।

হাসতে হাসতে ভাবা বলে,—বেশ, তাই বলছি। আমি যতদূর জানি এবং তোমরাও হয়তো স্বীকার করবে যে, 'ধর্ম' কথাটার অভিধানগত বা উৎপত্তিগত বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'ধারণ করা' বা 'পোষণ করা', অর্থাৎ যা সকলকে ধারণ করে বা পোষণ করে। অর্থটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, সঠিক তো বটেই। এটা মাথায় রাখলে বোঝা যায়, অতীতে ধর্মের উৎপত্তি কেন ও কিভাবে হয়েছিল।

কিরকম?—কল্পনা দেবীর কণ্ঠে পরিহাসের সুরঃ শুনি তোমার মহাজ্ঞানের তত্ত্বকথা।

ভাবা বললে,—ঠাট্টা নয়, মামণি। এ শুধু আমার কথা নয়, সংস্কারমুক্ত নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করলে দেখবে, এ সবই যুক্তির কথা, তথ্য প্রমাণের কথা। মানুষের সমাজকে ধারণ ও পোষণ করার জন্যেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজবদ্ধ মানুষ যাতে তৎকালীন ধ্যানধারণা অনুযায়ী পরস্পরের ন্যায্য স্বার্থ বজায় রেখে শৃঙ্খলার সঙ্গে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে, সেজন্য মানুষই ধাপে ধাপে তৈরি করেছিল নানা নিয়মকানুন, প্রচলন করেছিল নানা ন্যায়নীতি। আর যেহেতু তখনকার বেশির ভাগ মানুষ দেবতা-ভগবানের বা ঐ জাতীয় কোন ঐশ্বরিক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো, বিশ্বাস করতো স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য প্রভৃতিতে, তাই দেবতা-ভগবানের পুজোর্চনা, আচার-অনুষ্ঠানও যুক্ত হয়েছিল ঐসব নিয়মকানুনের মধ্যে। যুক্ত হয়েছিল পরকাল, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি সম্পর্কিত তত্ত্ব। এ সবের তখন দরকারও ছিল। সমাজের অনেক মানুষ ভয়ে ভক্তিতেও মেনে চলতো এইসব নিয়মকানুন। এমনিভাবে তৎকালে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন, দেব-দ্বিজে ভক্তি-বিশ্বাস, পুজোর্চনা, আচার-অনুষ্ঠান আর পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির ধ্যানধারণা নিয়ে মানুষের সমাজে যে বস্তুটির তখন উদ্ভব হলো, তারই নাম দেওয়া হয় 'ধর্ম'। তাহলে দেখ,

সমাজ ও সমাজের মানুষকে ধারণ ও পোষণ করার জন্যেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছিল।

ভাবার মুখের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন কল্পনা দেবী, তাকিয়ে আছেন ডাঃ রায়ও। ভাবা একটু থামতে কল্পনা দেবী বললেন,—তর্কের খাতিরে তা না হয় বোঝা গেল, তারপর?

তারপরটাই জবর।—মুচকি হেসে ভাবা বলেঃ যুগে যুগে মানুষ পাল্টে গেছে, তার মন ও মগজের আরও উৎকর্ষ ঘটেছে। আরো ভাল করে বেঁচে থাকার তাগিদে যতই সে সভ্যতার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছে, ততই তার চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণায় এসেছে রূপান্তর। তার ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটেছে। অপ্রয়োজনীয় বোধে আগের যুগের নিয়মকানুন কিছু বর্জন করা হয়েছে, কিছু সংশোধিত ও পরিমার্জিত হয়েছে, নতুন কিছু যুক্তও হয়েছে। সেইসঙ্গে দেবতা-ঈশ্বরাদির ধ্যানধারণায় ও ধর্মমতেও যে পরিবর্তন ঘটেছে তা বোধহয় না বললেও চলে।

কল্পনা দেবীর বুঝি আর সহ্য হয় না। তিনি ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন,—খোকন, এসব দুষ্পাচ্য ছাইপাশ আগেও যে কিছু শুনি নি তা নয়। এক-আধটু যেটুকু শুনেছি, তাতে এই বক্তব্যকে এতই অযৌক্তিক অন্তঃসারশূন্য ঠেকেছে যে, যারা এ সবের প্রচারক তাদের সম্বন্ধে মনে অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণারই উদ্রেক হয়েছে। আজ তোর মুখেও সেই সব ন্যাক্কারজনক কথা শুনছি। তুই তো কথায় কথায় যুক্তি-প্রমাণের দোহাই পাড়িস, বল্ তো দেবতা-ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা ও ধর্ম যুগে যুগে পালটে গেছে—এটা কোন্ যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে? নতুন যা কিছু শুনবি, তা আজগুবী বিদঘুটে হলেও কি বিশ্বাস করবি আর তোতা পাখির মতো আওড়াবি? আশ্চর্য!

মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে ভাবা বলে,—দোহাই মামণি, তুমি অত উত্তেজিত হয়ো না। তোমাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমি জানি, যুক্তি ও তথ্যপ্রমাণের আলোকে বর্তমানে চালু ধর্মমত যত অসারই প্রতিপন্ন হোক, যুগ-যুগান্তের হাজার হাজার বছরের বিশ্বাস ও সংস্কারের জোর এত বেশী যে, তোমাদের পক্ষে বিশেষতঃ এই বয়সে তা ত্যাগ করে নতুন কিছু গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও কিছু মনে করার নেই। অনেক বিজ্ঞানের লোককে দেখা যায়, অন্য সব ব্যাপারে যুক্তি মেনে চললেও এ ব্যাপারে একেবারেই অনড়। ভুলে যাচ্ছ কেন মামণি, আজকের এই আলোচনা তোমাদের ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন আনার জন্য নয়, আমার নতুন জীবন-দর্শন গ্রহণের পক্ষে যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ হাজির করাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য?

কল্পনা দেবী ঝিম মেরে বসে থাকেন কিছুক্ষণ। শেষে অবসন্ন কণ্ঠে বললেন,—বেশ বল্, শুনি তোর তথ্য প্রমাণ।

ভাবা বলে,—সংক্ষেপেই বলবো, মামণি। দরকার হলে পরে আর একদিন শান্ত চিত্তে আলোচনা করা যাবে বিস্তারিতভাবে। দেবতা-ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা ও ধর্ম যে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে, এটা প্রমাণের জন্যে অন্য সব ধর্মমত ও শাস্ত্রাদির আলোচনায় যাবার দরকার নেই, আমাদের বর্তমান হিন্দুধর্মের কথাই ধরা যাক। তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার বৈদিক ধর্ম ও আজকের হিন্দু ধর্ম কি এক? এটা আমার কথা নয়, বেদ-পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্র-ইতিহাসের কথা। ভেবে দেখ, কতটুকু মিল আছে এই দুই ধর্মমতের মধ্যে। দুস্তর ব্যবধান নয় কি? সে সময়কার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যানধারণা ও ধর্মাচরণের সঙ্গে আজকের হিন্দুধর্মের কোথায় কতটুকু মিল? সেদিনকার সমাজব্যবস্থা, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস ও নিয়মকানুনের সঙ্গেই বা আজকের মিল কোথায়? বর্তমান কাল পর্যন্ত আসারই বা কি দরকার? বেদে আমরা যে দেবতাদের সাক্ষাৎ পাই, পরবর্তী কালে হাজার দেড় হাজার বছরের মধ্যে, এমন কি কয়েক শো বছরের মধ্যেই, তাদের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে? অনেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেউ উপরে উঠেছে, কেউ বা নীচে নেমেছে, আর সেই সঙ্গে নতুন নতুন দেবতারও আবির্ভাব ঘটেছে। এ থেকে কি প্রমাণিত হয়? প্রমাণিত হয় না কি যে, দেবতা ও ধর্ম মানুষের তৈরী, দেবতা-ঈশ্বর-পরমেশ্বরাদির অস্তিত্ব মানুষেরই মনে—মানুষের বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্যেই তারা বেঁচে আছেন? যুগে যুগে মানব সভ্যতা যেমন যেমন এগিয়েছে, মানুষের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি যেমন যেমন সংস্কৃত ও মার্জিত হয়েছে, তেমনি দেবতা-ঈশ্বরের বাইরের ও ভেতরের চেহারা ও চরিত্রও পালটে গেছে, আদিম বন্য দেবতারা আরও মার্জিত ও সভ্যভব্য হয়েছেন, ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর বা পরমেশ্বর সম্পর্কিত বক্তব্য ও ধ্যানধারণা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়েছে, তারা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। এসব কি করে অস্বীকার করা যায়, মামণি? তাহলে তো নিজেদের অতীত সংস্কৃতি-সভ্যতা, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র, সাহিত্য ও ইতিহাসকেই অস্বীকার করতে হয়।

ভাবা থামে।

ডঃ রায় মৃদু মৃদু হাসছেন। বুঝতে পারছেন কল্পনা দেবীর অবস্থা।

ভাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন কল্পনা দেবী—বিমূঢ় দৃষ্টিতে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। শেষে নির্জীব কণ্ঠে কল্পনা দেবী বললেন,—তোর ওসব কথা, ঐসব বিশ্লেষণ মানতে প্রবৃত্তি হয় না, কোনমতেই সম্ভব না। এটা কখনই বিশ্বাস-যোগ্য নয় যে, যুগ যুগ ধরে মুনি, ঋষি ও মহাপুরুষদের যে ঈশ্বরোপলব্ধি ঘটেছে, তা সব মিথ্যে ভাঁওতা।

ধীরে ধীরে ভাবা বলে,—এসব তথ্যপ্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ যদি মানতে না চাও মামণি, মেনো না। মুনি-ঋষি-মহাপুরুষদের ঈশ্বরোপলব্ধি ভাঁওতা না বাস্তব, তাও এখানে বিবেচ্য নয়। বিবেচ্য বিষয় হলো আমার মানা-না-মানার প্রশ্ন। অন্ধ বিশ্বাস ও সংস্কারের বদলে আমি যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিসিদ্ধ নতুন জীবন-দর্শন গ্রহণ করি, তাহলে তোমাদের তো আপত্তির কারণ

থাকা উচিত নয়।

ডাঃ রায় নড়েচড়ে বসলেন। এবার হস্তক্ষেপ দরকার. যুক্তির কাছে বিশ্বাসের পরাজয় ঘটতে চলেছে। কাজেই আলোচনায় ইতি টানার জন্যে তিনি বললেন,—খোকন, তোমার বক্তব্য যেমন স্বীকার-অস্বীকার করার প্রশ্ন উঠছে না, তেমনি—

ডাঃ রায়ের কথায় বাধা পড়লো।

হঠাৎ কেলোর খিচিরমিচির চিৎকারে সবার দৃষ্টি যায় এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের দিকে।

কেলো বারান্দার বাইরে রেলিং ধরে নীচের দিকে শূন্যে ঝুলছে, ক্রুদ্ধ বিচলিত তার চোখের দৃষ্টি, দুই তারা অবিরাম ঘুরছে—কখনো রাজার দিকে, কখনো বা বালুর দিকে। আর বালু রেলিংয়ের এপাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তার দুই হাতের কব্‌জি চেপে ধরে তাকে ওপরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, কেলোর তাতে ঘোরতর আপত্তি, তাই সমানে চিৎকার করছে।

নাটকের অন্যান্য কুশীলবগণও যে যার স্বাভাবিক পোজে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত।

বালুর পাশে বসে রাজা দুই চোয়াল ফাঁক করে নীরবে কেলোকে শাসিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট গর্জনও করছে, কখনও বা কেলোর রেলিং-চেপে-ধরা দুই হাতের আঙুলে থাবার নখর দিয়ে পরম আদরে আঁচড় কাটছে অতি মোলায়েম ভাবে। চোখে তার অর্ধ-নিমীলিত নিস্পৃহ দৃষ্টি। আর তার নখরের সুখ-স্পর্শ কেলো যখনই অনুভব করছে, তখনই চেঁচিয়ে উঠছে তারস্বরে।

এমন যে মিনি ও পুসি, যারা সোফায় নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিল, তারাও কোন্ ফাঁকে সেখানে গিয়ে হাজির। বালুর দুদিকে দুজন রেলিংয়ের ওপর বসে আকুল নয়নে দেখছে কেলোর মনোরম অভিনয় আর মাঝে মাঝে ফ্যাঁচর-ফ্যাঁচ করছে। নির্ঘাৎ হাসছে।

উপস্থিত ব্যক্তি তিনজনের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, চিরন্তন সেই একই নাটকের অভিনয় হচ্ছে—কেলো ও রাজার মধ্যে মধুর ভাব-বিনিময়ের সাম্প্রতিকতম একাঙ্ক নাটিকার এটা শেষ দৃশ্য। পার্থক্য শুধু, কেলো এবার মোক্ষম ঝকমারিতে পড়েছে।

দেখা গেল, টমও অনুপস্থিত নেই। তবে সে নীচেয় একতলায়—কেলোর ঠিক নীচেয় থাবা গেড়ে ঊর্ধ্বনেত্রে সমাসীন। ভাবখানা, কেলো পড়লেই সে লুফে নেবে।

ভাবা তাড়াতাড়ি উঠে গেল। যেতে যেতে বালুকে বললে, কেলোর কব্‌জি যেন ও না ছাড়ে, তাহলে নীচেয় পড়ে গিয়ে সে আচমকা চোট খেতে পারে।

গুরুজীকে আসতে দেখেই কেলো শিবনেত্র হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার কব্‌জিও ঢিল হয়ে এল। বালু এবার সহজেই তাকে টেনে তুললো ওপরে।

তদন্তকালে বালু ও রাজার বিবৃতি থেকে যা জানা গেল, তার সারমর্ম হলো—গুরুজী জানে, রাজাকে উত্ত্যক্ত করতে না পারলে কেলোর উদরস্থ আহার্যবস্তুর সুষ্ঠু পরিপাক-ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষতঃ রাজার সুপুষ্ট দীর্ঘ লাঙুলটির প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণ। তজ্জন্যই গুরুজী নির্দেশ দিয়েছিল, কেলো কখনও রাজার পাশে বসবে না। এবং এই নিষেধাজ্ঞা যাতে ঠিকমতো প্রতিপালিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে বালুকেও সে নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু রাজার প্রতি কেলোর আকর্ষণ এমনই দুর্বার যে, কেলো এটা প্রায় সময়েই মনে রাখে না। রাজা এই সময় বাধা দিয়ে জানালো, কেলোর এই আকর্ষণ তার প্রতি মোটেই ভালবাসার নিদর্শন নয়। যাই হোক, গুরুজীর নির্দেশ মতো আজো বালু ওদের দুজনের উপবেশনের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। এক কোণে কেলো, আর এক কোণে রাজা, আর সে নিজে মাঝের কোণে সতর্ক প্রহরায় ছিল। আর কেলো তাকে সারাক্ষণ ভেংচি কাটছিল। বালু অবশ্য ভেংচি গ্রাহ্য করে না।

তারপর একসময় উকুনের জ্বালায় তিতবিরক্ত হয়ে সে উকুনবংশ-উৎখাতে মনোনিবেশ করে। সেই সুযোগে কেলো সন্তর্পণে এগিয়ে যায় রাজার দিকে। রাজা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু সাবধানতার মার নেই, এই আপ্ত বাক্যটি স্মরণে রেখে সে নিজের একটি কানকে সতর্ক প্রহরায় রেখেছিল। গুরুজী জানে, রাজার ওই শব্দগ্রহণ-যন্ত্র দুটি কিরকম প্রখর। কেলোর শনৈঃ শনৈঃ আগমন-বার্তা সে গোড়াতেই টের পায় এবং তৈরী হয়ে থাকে। কেলো একেবারে কাছে গিয়ে হাজির হতেই সে একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে পাকড়াও করতে যায়। ততক্ষণে বালুও ছুটে গেছে। কেলো আর পালানোর পথ না পেয়ে রেলিং ধরে ঝুলে পড়ে। তার পরের দৃশ্য তো গুরুজী স্বচক্ষেই অবলোকন করেছে।

ভাবার সামনে কেলো বসে আছে—বাহ্যজ্ঞানরহিত, বড় এক আবলুস কাঠের গুঁড়ি যেন। শুধু চোখ দুটো পিট-পিট করছে।

ভাবার হুকুম হলো, যতক্ষণ এই আলোচনা চলবে. ততক্ষণ কেলোর গলা ও মাথা বালুর দক্ষিণ বগলের নীচে অবস্থান করবে। কোনরকম নড়াচড়া চলবে না। এর কিছুমাত্র হেরফের হলে আরও কঠিন সাজা দেওয়া হবে।

কী সাংঘাতিক শাস্তি! ঐ ভুস্‌কোটার বগলের নীচে! সেখানে বসে বসে উপর্যুপরি গোটা চারেক ডিগবাজি খায় কেলো। কিন্তু পঞ্চমবারের অনুষ্ঠানটি শুরু করতে যেতেই তার নজর যায় গুরুজীর চোখের দিকে।

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কেলো পায়ে পায়ে রওনা হলো হুকুম তামিল করতে।

বালু ডান বগল ফাঁক করে ধ্যানীর মতো বসে আছে। তার তদবস্থ যোগী মূর্তি দেখে কেলোর পিত্তিনাড়ী জ্বলে যায়। প্রচন্ড এক ভেংচি কাটলো সে।

দূরের কোণে রাজা গুটি সুটি মেরে শুয়ে আছে, কিন্তু জিব বের করা। আধ-বোজা একটা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

ধেই ধেই করে নাচতে গিয়েই কেলো সামলে নিলে।

যেতে যেতে সে নিজের গলা ও মাথাটা কয়েকবার টেনে

দেখে, ধড় থেকে ওটাকে মূলসুদ্ধ উপড়ে নেওয়া যায় কিনা। তাহলেই বাজী মাৎ! ভুস্‌কোটার বগলের নীচে ওটা ঢুকিয়ে দিয়েই সে পগার পার!

কিন্তু নাঃ!

হাড়িকাঠে গলা দিতে যাবার ঠিক আগে মিনি ও পুসির দিকে কেলোর নজর যায়। কান্ড দেখে রাগে তার জান যাবার যোগাড়। পাজীর পা-ঝাড়া দুটো মেজেতে নাচ জুড়ে দিয়েছে আর গুম্ফ নাচিয়ে মিটির মিটির হাসছে।

বালুর বগলের তলা থেকে কেলো মুখ ভেংচে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। হুঁ গুম্ফ সে উপড়ে নেবে!

এইসব কান্ড দেখে ডাঃ রায় ও কল্পনা দেবী হাসছেন।

হাসতে হাসতে ভাবা বললে,—বলো বাবু, কি বলছিলে। ঐ বিচ্ছু কটার কথা আর বোলো না! ওদের হুজ্জৎ-হাঙ্গামা লেগেই আছে। সবচেয়ে ধড়িবাজ বড় বিচ্ছু হলো ঐ কেলোটা। ফষ্টিনষ্টি ছাড়া একমুহূর্ত চুপ থাকতে পারে না, সব কটাকে জ্বালিয়ে মারে। যাক্ গে—এবার বলো।

স্মিত মুখে ডাঃ রায় বললেন,—বলার আর কিছু নেই, বিশেষ করে এই মুহূর্তে। আলোচনায় এবার ইতি টানা যাক। তবে শেষ করার আগে বলি, জানিস তো শাস্ত্রে আছে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।

কথাটা শুনতেই কল্পনা দেবী যেন আনন্দে ফেটে পড়লেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—ঠিক, ঠিক বলেছ। ইস্, কেন যে কথাটা এতক্ষণ মনে হয় নি! ঠিক ঠিক, ভারী সত্যি কথা—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর!

বলতে বলতে তিনি দীপ্ত মুখে ফিরলেন ভাবার দিকে,—বুঝলি খোকন, এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। ভেবে দ্যাখ্, বিশ্বাসহীন জীবন কী সাংঘাতিক! কোথাও মূল নেই তার। তাই বলি, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর—এইটাই হওয়া উচিত আমাদের চলার পথের আদর্শ, জীবনের মূল অক্ষদন্ড। জীবনে তাহলে আসে স্বস্তি, আসে প্রশান্তি।

যে রকম জোরের সঙ্গে তিনি বক্তব্য শেষ করলেন, তাতে বোঝা যায়, এতক্ষণে খোকনের যাবতীয় যুক্তির মুখের মতো জবাব দিতে পেরে এবং সেসব নস্যাৎ করতে পেরে তাঁর বুকের ভার যেন অনেকখানি লাঘব হয়ে গেছে।

আর ভাবা হাসছে। হাসতে হাসতে সে বললে,—তা বটে, জ্ঞানের তৃষ্ণা থাকবে না, জীবন-জিজ্ঞাসা থাকবে না, মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়েও মনে কোন প্রশ্ন থাকবে না, বিশ্বাস ও সংস্কারই হবে একমাত্র মূলধন, জীবনের ধ্রুবতারা। অতএব সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞানগম্যির ওপরেই যখন বিশ্বাস ও সংস্কারের স্থান, তখন মানবসভ্যতার এই অগ্রগতি, বিজ্ঞানের এই অভাবনীয় জয়যাত্রা, এ সব কিছুই বরবাদ করা উচিত। এবং মানুষের আবির্ভাবের সেই ঊষাকালে, সেই আদিম বন্য বর্বর জীবনে ফিরে যাওয়াই শ্রেয়। অর্থাৎ মানুষ ও পশুর জীবনে যেন কোন পার্থক্য না থাকে, সব হবে একাকার। মন্দ নয় ব্যাপারটা।

মুহূর্তে কল্পনা দেবীর চোখের দীপ্তি নিভে গেল। ভাবার এই জবাব বুঝি অপ্রত্যাশিত ছিল তাঁর কাছে! নিঃসীম বেদনায় তিনি স্তব্ধ হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। শেষে একসময় কথা বললেন, ক্ষোভে দুঃখে গলা কাঁপছে, বললেন, —এ জবাব তোর কাছ থেকে আশা করি নি, খোকন। কে বলেছে, জ্ঞানের তৃষ্ণা থাকবে না, মানুষের পশুজীবন কাম্য হওয়া উচিত? ধর্মে ও ঈশ্বরে যাদের মতি স্থির, তারা কি তাই চায় নাকি? যা শাশ্বত অবিনশ্বর, যা অনন্ত জীবনের তৃষ্ণায় মানবচিত্তকে আকুল করে তোলে, তাতে বিশ্বাস হারিয়ে এ তুই কী হলি বল্ তো? প্রশ্ন আমার সেখানেই। কখনো কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি, তুই একদিন ধর্ম মানবি নে, শাস্ত্র মানবি নে, দেবতা মানবি নে? গোড়া থেকেই তোকে নিয়ে যে আমার সর্বক্ষণের ভয়, পেয়ে না হারাই! তাই তোর ঐ সব কথা যখন শুনি, ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যায়।

বলতে বলতে আবেগে কল্পনা দেবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে,—বিশ্বাসহীন জীবনের কি পরিণতি, ভেবে পাইনে। আদর্শভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট হবার ভয় তার সব সময়। তাই তো আমার আতঙ্ক। তোকে নিয়ে কী যে করবো আমি! আমার সমস্ত আশাই আজ নির্মূল হয়ে গেল। কত সাধ ছিল, তোর বাবু তো সারা জীবন নিজের কাজ নিয়ে মেতে রইলেন, তোকে নিয়ে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করবো, দেবতা দর্শন করবো। কিন্তু সে সাধ আর পূর্ণ হবার নয়।

ভাবা সচকিত হতভম্ব। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। মামণির এমন করুণ আশাহত কণ্ঠ সে আগে কোন দিন শোনে নি। মামণির নিরুপায় মুখের দিকে তাকিয়ে সারা অন্তর তার ব্যথায় টন টন করে উঠলো। সে আর সহ্য করতে পারে না। মামণিকে জড়িয়ে ধরে অস্থির কণ্ঠে বললে,—এ সব তুমি কি বলছো, মামণি? কেন এত উতলা হচ্ছো? কার বিশ্বাসহীন জীবন? আমার? আমি হবো লক্ষ্যভ্রষ্ট নীতিভ্রষ্ট আদর্শভ্রষ্ট? গোটা ব্যাপারটা জানলে বুঝতে, তোমার এ ধারণা কী মারাত্মক ভুল। জীবন-জিজ্ঞাসার তাগিদে যে জীবন-দর্শন আমি আজ আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছি যার কথা বলি মাঝে মাঝে, সে সম্বন্ধে একটু আভাস দিই মামণি। তাহলে বুঝতে পারবে, তোমার আশঙ্কাই শুধু অমূলক নয়, তুমি যা ভাবছো বাস্তব অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। আমার এই জীবন-দর্শনের অন্যতম মূল কথা কি জান? মূল কথা হলো—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

এ জীবন-দর্শন মানুষকে ভালবাসতে বলে, চায় নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত বিশ্বমানবের মুক্তি। না, শুধু চায় না, কিভাবে শোষণ বঞ্চনা অনাচার অবিচার ও লাঞ্ছনার অবসান ঘটিয়ে এই মুক্তি সম্ভব করতে হবে, তারও পথ-নির্দেশ করে। সেখানে

বিশ্বাস ও সংস্কারের বদলে সে সর্বোপরি স্থান দিয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণকে। জীবন-জিজ্ঞাসাকে সে আরো প্রখর করে তোলে। সে বলে,—যেটুকু জেনেছ সেটুকুই পূর্ণ সত্য নাও হতে পারে, আরো জান, প্রশ্ন করো, আরো জানবার চেষ্টা করো এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্যে যাবতীয় তথ্য-প্রমাণকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণ করো। বুঝলে মামণি, এই হলো আজ আমার জীবনের আদর্শ। এ আদর্শ বলে, মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ; বলে, মহোজ্জ্বল মানুষের ভবিষ্যৎ, সীমাহীন সম্ভাবনা তার সামনে। দেশে দেশে যারা অধিকাংশ, সেই শোষিত বঞ্চিত মানুষেরা একদিন শৃঙ্খল ভেঙে নিজেদের মুক্ত করবে, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে, এই বিশ্বাসকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে এই জীবন-দর্শন। এ দর্শন আমাদের শিক্ষা দেয় পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষ হতে, সমাজের অনাচার অবিচার শোষণ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। আর তুমি কিনা মামণি ভয় পাচ্ছ আমার জীবন বিশ্বাসহীন, আদর্শভ্রষ্ট ও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হবে বলে! আশ্চর্য!

দম নেবার জন্যে ভাবা থামে। কল্পনা দেবীর চোখে মহাবিস্ময়। বললেন,—বলিস্ কি? সত্যি?

হ্যাঁ মামণি,—ভাবা বলেঃ বর্ণে বর্ণে সত্যি। সমস্ত ধর্মের ওপরে যে বিজ্ঞানভিত্তিক মানবধর্ম, এই জীবন-দর্শক তাই। সে যাক—কিন্তু মামণি, তুমি কি বলছো? তোমার সাধ কেন পূর্ণ হবে না? তুমি কালই চলো, তোমায় নিয়ে আমি সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করবো, সমস্ত দেবতা দর্শন করাবো। এতে বাধা কোথায়?

যাবি?—আনন্দে কল্পনা দেবীর চোখমুখ ঝলমল করে ওঠেঃ যাবি তুই? তবে যে তারকেশ্বর যেতে চাইলি না?

ভাবার চোখেমুখে হাসির ঝিলিক খেলে যায়। বাবার দিকে এক নজর তাকিয়ে আবার সে জড়িয়ে ধরে মামণিকে। বলে,—ক্ষমা দাও মামণি, ক্ষমা দাও। বাব্বা! একটা কথার কথা বলে ফেলে কী নাস্তানাবুদ!

উদ্দীপ্ত চোখে কল্পনা দেবী বললেন,—কিন্তু তুই যাবি কি, তুই তো নাস্তিক!

এই দেখ, আবার তুমি ঐসব কথা তুলছো!—হাসতে হাসতে ভাবা বলেঃ শোন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী বলে শাস্ত্রানুযায়ী আমায় নাস্তিক বলা যায়। কিন্তু 'নাস্তিক' কথাটাকে ঐ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার না করে বৃহত্তর অর্থেও ব্যবহার করতে পারো। শ্রেষ্ঠ মানবধর্মে যে বিশ্বাসী, বিশ্বাসী গণদেবতার অসীম ক্ষমতায়, তাকে কী বলবে, নাস্তিক আখ্যা দেবে কিনা, তা অবশ্য তোমাদেরই বিচার্য। কিন্তু ওসবে কি আসে যায়, মামণি? বললাম তো, কালই তুমি চলো, তোমায় নিয়ে বেরোচ্ছি। তীর্থে তীর্থে তুমি যখন পুণ্য সঞ্চয় করবে, মন্দিরে মন্দিরে দেবতা দর্শন করবে, আমি তখন দেখবো বর্তমান ভারতের গণদেবতাকে, দেখবো রূপময় অতীত ভারতবর্ষকে, তার অনুপম সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শন-গুলিকে, আর এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে বুঝতে চাইব ভারতাত্মার মূল চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যকে।

ডাঃ রায় এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নি। বিস্ময়ে পুলকে নির্বাক হয়ে গেছলেন বলা যায়। কিন্তু ভাবার শেষ কথাগুলো শুনতে শুনতে তিনি নিজেকে আর বুঝি ধরে রাখতে পারলেন না। অপরিসীম আনন্দের আবেগে উঠে গিয়ে ভাবার মাথায় হাত রেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন,—অদ্ভুত! অদ্ভুত! অদ্ভুত চমৎকার! এমন অপূর্ব সুন্দর কথা আগে আর কোন দিন শুনিনি। খোকন, বাবা, আশীর্বাদ করি, এই মন ও দৃষ্টিভঙ্গি তোর অক্ষয় হোক। অনেক—অনেক বড় হবি তুই। অপূর্ব! অপূর্ব! সত্যি, তোকে নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই।

ডাঃ রায় বলার আর ভাষা খুঁজে পান না। ভাবা নত-মস্তকে বসে থাকে। আর কল্পনা দেবীর চোখে তখন নেমেছে আনন্দাশ্রুর বন্যা।

॥ দুই ॥

ভাবার জীবনের সংকীর্ণ ধারা ক্রমেই প্রশস্ততর হচ্ছে। পারিবারিক জীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে তা ছড়িয়ে পড়ছে বিচিত্র নানা কর্মস্রোতের মধ্যে। জীবন আজ তার অনেকখানি কর্মমুখর।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় ভাবা যায় নিয়মিত। পশু-পাখিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ও অন্তরঙ্গতায় তার মোটেই ভাটা পড়ে নি। ওদের সঙ্গ সে ভালবাসে, ভালবাসে ওদের সহজ সরল জীবনের আনন্দ-বেদনার কথা শুনতে, আর নানা কৌশলে সে চেষ্টা করে ওদের দুঃখকষ্টের লাঘব ঘটাতে।

চিড়িয়াখানায় কোন নতুন প্রজাতির পশুপাখির আমদানি হলে ভাবা উঠে-পড়ে লাগে তাদের সঙ্গে ভাব জমাতে এবং তাদের হাবভাব ও ভাষা রপ্ত করতে। যত-ক্ষণ না সে তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছে, ততক্ষণ স্বস্তি নেই। অবশ্যি এসব কাজ তাকে করতে হয় খুবই সংগোপনে লুকিয়েচুরিয়ে, কোন লোক যাতে বুঝতে না পারে।

তথাচ সময় সময় এ নিয়ে কিছু কিছু ঝুট-ঝামেলাও যে পোয়াতে না হয়, তা নয়। কোন নয়া আগন্তুক প্রাণীর সঙ্গে সে হয়তো চুটিয়ে গল্প করছে, এমন সময় দেখা গেল পাহারাওলা বা দর্শকের দল আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ভাবাকে চুপ করতে হয়। কিন্তু প্রাণীটা তো আর ওসব বোঝে না, সে বকরবকর করে চলে। হয়তো সে তখন বলছে তার মুক্ত স্বাধীন আনন্দমুখর অতীত দিনগুলোর কথা; বলছে বিস্তীর্ণ বাধাবন্ধনহীন তার সাবেক বাসভূমির কথা অথবা হয়তো বর্ণনা করছে তার বর্তমান বন্দী জীবনের দুঃখ-বেদনার করুণ কাহিনী।

বাধ্য হয়ে ভাবাকেই শেষে পায়ে পায়ে সরে যেতে হয়। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে প্রাণীটিও তখন চুপ করে আর ফ্যাল-

ফ্যাল করে চেয়ে থাকে নতুন দোপেয়ে দোস্তের গমনপথের দিকে।

সময় সময় কোন কোন নয়া আগন্তুক পশু দোপেয়ে দোস্তের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারে মনে আঘাতও পায়। তার চাউনিতে ফুটে ওঠে বিস্ময়, ব্যথা বা অভিমান। তারপর পাহারাওলা বা দর্শকরা চলে গেলে ভাবা পড়ে ফ্যাসাদে' আগন্তুক পশুটির মানভঞ্জনের জন্যে কসরৎ তখন তাকে কম করতে হয় না।

ভাবা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে, অন্য দোপেয়ে জন্তুগুলোর সঙ্গে তার কি তফাৎ। অন্য দোপেয়েরা পশুপাখির সঙ্গে কথা বলে না, যেহেতু বলতে পারে না। কিন্তু সে পারে। পশুপাখির ভাষা বোঝার আর তাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলার এই ক্ষমতা দুনিয়ার আর কোন দোপেয়েরই নেই। তাই তারা যদি কোনভাবে টের পায় যে, তার এই ক্ষমতা আছে, তাহলে তাকে খুবই বিপদে পড়তে হবে।

কোন কোন পশুর মগজ এত দুর্বল এবং এমন আদিম স্তরভুক্ত যে, ব্যাপারটা তারা কিছুতেই ঠাওর করতে পারে না। ভাবা নানাভাবে চেষ্টা করে, কিন্তু বৃথা। বিন্দুবিসর্গও ওরা আন্দাজ করতে পারে না। কেউ কেউ আবার হঠাৎ এক তাজ্জব কান্ড করে বসে। আচমকা উত্তেজিত হয়ে এমন লাফালাফি চেঁচামেচি শুরু করে দেয় যে, বিপন্ন ভাবাকেই শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাঁচতে হয়।

এই পালিয়ে বাঁচার ব্যাপারটা আরো এক-আধবার করতে হয়েছে ভাবাকে। কিন্তু তার কারণ অন্য।

এটা বোধহয় না বললেও চলে যে, চিড়িয়াখানার প্রায় সব বাসিন্দাই, তা সে পুরনো হোক আর নতুন হোক, ভাবাকে স্বভাবতঃই ভীষণ পছন্দ করে, মনেপ্রাণে ভালবাসে এবং কিছুতেই তাকে ছাড়তে চায় না। অনেক গলদ্ঘর্ম চেষ্টার পর ভাবা তাদের শেষপর্যন্ত বোঝাতে পেরেছে যে, সব সময় তাদের সঙ্গে থাকা তার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তাহলে দোপেয়ে পাহারাওলারা তাকে মেরে তাড়িয়ে দেবে, আর আসতে দেবে না। শুনে সবাই নিরস্ত হয়েছে। কিন্তু দু-একটি আছে তারা কোন কথাই শুনতে চায় না। যত বোঝাও, সেই এক গোঁ—না, তুমি যেতে পারবে না।

এমনি এক নাছোড়বান্দার পাল্লায় পড়ে সেবার তাকে কী নাস্তানাবুদই না হতে হয়েছিল, ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছলো অতি অল্পের জন্যে।

পশুটা ছিল এক নীল গাই। দুপেয়ে দোস্তকে ছেড়ে থাকতে সে রাজী নয় কিছুতেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, ভাবা কত বোঝায়, কিন্তু কে শোনে ওসব কথা! নীল গাইয়ের সেই এক গোঁ : দোস্তকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না।

এমনি যখন নাজেহাল অবস্থা, ভাবা তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে, একজন পাহারাওলা তার ওপর নজর রাখছে: এটা খুবই স্বাভাবিক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা লোক রয়েছে নীল গাইটার কাছে, কেন রয়েছে কি করছে সে ওখানে—এসব প্রশ্ন পাহারাওলাটির মনে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয়।

ভাবা মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। তারপর পাহারাওলাটি একটু অন্য দিকে যেতেই সে দ্রুত পায়ে হাঁটা মারলো অন্য দিকে। দু-এক সেকেন্ড পরেই তার কানে এল নীল গাইয়ের প্রাণপণ চিৎকার। সে হাঁক পাড়ছে : দোস্ত, তুমি যেও না। তুমি গেলে আমি অক্কা পাব। দোস্ত, দোস্ত—

সর্বনাশ! নীল গাইটা শুধু হাঁকই পাড়ছে না, ছুটোছুটিও শুরু করেছে। ভাবাও প্রায় ছুটতে শুরু করে।

জন্তুটার হাঁকডাক দাপাদাপিতে পাহারাওলারা নির্ঘাৎ খুব অবাক হয়েছে, ঘাবড়েও গেছে, এতক্ষণ যে লোকটা এখানে ছিল তার খোঁজও তারা নিশ্চয়ই করছে আর সেই সঙ্গে বোধহয় খবর পাঠিয়েছে ওপরওলার কাছে,—মারাত্মক এইসব কথাগুলো ভাবার মনের মধ্যে যত খোঁচা মারতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে তার হাঁটার বেগ।

মাঝে মাঝে তার দৌড়তে ইচ্ছে করছে। সে যে ভারতের অন্যতর সেরা দৌড়বীর, মিনিট দুয়েকের মধ্যে চিড়িয়াখানার পগার পার হয়ে তা সে আবার দেখিয়ে দিতে পারে! কিন্তু বর্তমান ঘোরালো পরিস্থিতিতে তা তো আর করা চলে না! তাহলে সবার নজরে পড়ে যেতে হবে যে!

চিড়িয়াখানার ফটক আর হয়তো তিন-চার সেকেন্ডের পথ, এমন সময় সেরেচে! সামনের দিক থেকে একটা লোক কেন দ্রুতপায়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে অ্যাঁ? ভাবা চমকে যায়, লোকটা আর কেউ নয়, সেই পাহারাওলাটা যে তার ওপর নজর রাখছিল। মনে মনে সে বিপদ গোনে।

পাহারাওলাটা এসে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। সেলাম ঠুকে বলে,—বাবুজী, সাহেব আপনাকে বোলাইছেন।

ভাবা ইতিমধ্যে মতলব স্থির করে ফেলেছে। অবাক হবার ভান করে বললে,—কেন বলো তো? কে সাহেব? কোথায় তিনি?

—ঐ অফিসে, বাবু। কেন, তা বলতে পারবো না।

ভাবা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে,—আজ আমার সময় কম, বড্ড ব্যস্ত। আর একদিন দেখা করা যাবে।

বলতে বলতে ক্ষণেক থেমে যেন চিন্তিত কণ্ঠে সে বললে,- আচ্ছা চলো। কোন্ সাহেব কেন ডাকছেন, শুনে আসি।

অফিস-ঘরে বড় এক টেবিলের ওধারে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন। পাহারাওলাটি তাঁকে সেলাম জানিয়ে বললে,—এই বাবু।

ভদ্রলোক অবাক চোখে ভাবার আপাদমস্তক কয়েকবার দেখে নিলেন। তার কমনীয় সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা আর অবাঙালীসুলভ দীর্ঘ সুঠাম অদ্ভুত স্বাস্থ্য দেখে তিনি বোধহয় মর্মাহত। ক্ষণ পরে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন,—আহা, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন বসুন! আপনি বাঙালী তো?

আজ্ঞে।—ভাবা বসতে বসতে বললে : আমায় আপনি ডেকেছেন?

—হ্যাঁ, আপনার সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।

ভাবা বললে,—বেশ। তবে দয়া করে একটু সংক্ষেপে বলুন। আমার আজ বড্ড তাড়া রয়েছে। আপনার ঐ পাহারাওলাকেও সেটা বলেছিলাম। তবু আপনি যখন ডেকেছেন, তাই এলাম।

আচ্ছা, তাই হবে।—গম্ভীর কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন ঃ আপনাকে সরাসরি প্রশ্ন করি, নীল গাইটার কাছে আপনি অতক্ষণ কি করছিলেন?

কেন বলুন তো?—ভাবার কণ্ঠে বিস্ময়।

—কারণ আপনি ওখান থেকে চলে আসার পরই সে এমন ডাকাডাকি দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে, যা সে এর আগে কখনো করেনি।

বলেন কি?—ভাবার কণ্ঠে তেমনি বিস্ময়ের ভান ঃ আমি চলে আসতেই সে ঐসব কাণ্ড করছে? আমার চলে আসার সঙ্গে তার ঐ ব্যবহারের সম্পর্ক কি? আমার দায়িত্ব কোথায়?

সেখানেই তো প্রশ্ন—অফিসার ভদ্রলোকটি বললেন ঃ আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি কি ওকে কিছু খেতেটেতে দিয়েছেন?

অসম্ভব।—আহত কণ্ঠে ভাবা জবাব দেয় ঃ চিড়িয়াখানার নিয়মকানুন আমি কিছুটা জানি। তাছাড়া আমি নিজে ওটাকে অন্যায় মনে করি।

ভাবার দৃঢ় স্পষ্ট কণ্ঠের জবাবে অফিসারটি যেন বেশ একটু মুষড়ে পড়েছেন মনে হলো।

ভাবা সেটা লক্ষ্য করে আবার বললে,—আমার একটা অনুরোধ, দয়া করে আবার একটু খোঁজ নিন তো প্রাণীটা এখনো ওরকম করছে কিনা। এমনও তো হতে পারে যে, আমার চলে আসার মুখে মুখে এমন কিছু ঘটেছিল যা ওর সাময়িক ঐ উত্তেজনার কারণ। ঘটনা দুটো কাকতালীয় নিশ্চয়ই।

ভাবার এটা বলার প্রধান কারণ—ফটকের দিকে আসতে আসতে শেষ দিকে বন্ধু-বৎসল নীল গাইটার আর কোন সাড়া সে পায়নি। হতে পারে অক্কা পাবার ভয়টা আর তার নেই।

খবরের জন্যে লোক পাঠানোর আর দরকার হলো না। আর একজন পাহারাওলা সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকে জানালে,—নীল গাইটা শান্ত হয়েছে। আর কোন ঝামেলা নেই।

আচ্ছা, এবার তাহলে আসি। ধন্যবাদ।—ভদ্রলোককে নমস্কার করে ভাবা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো। অপ্রস্তুত নির্বাক ভদ্রলোক ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন তার গমন-পথের দিকে।

আর ভাবা! সেই যে গা ঢাকা দেয়, বেশ কয়েক দিন আর ওপথ মাড়ায় না। বাব্বা! এত অল্পে রেহাই পাবে সে ভাবতে পারেনি।

তার পর থেকে এই ভাব জমানোর ব্যাপারে সে বেশ সতর্ক হয়ে গেছে—বিশেষতঃ উৎকট বন্ধুবৎসল ঐ নীল গাই ও আর দু-একটা প্রাণী সম্পর্কে। পারতপক্ষে সে ওমুখো হয় না।

কিছুকাল আগে যে বস্তিটির উচ্ছেদের জন্যে বস্তি-মালিক গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল এবং যা রক্ষা পেয়েছিল প্রধানতঃ ভাবারই নেতৃত্বে ও প্রত্যক্ষ প্রতিরোধের ফলে, সেখানে তাকে যেতে হয় প্রায় নিয়মিত।

এজন্যে সে কিন্তু মোটেই তৈরী ছিল না। আর যাই হোক, রিক্ত নিঃস্ব কঙ্কালসার বস্তির নোংরা আবর্জনা ও জঘন্য পরিবেশের মধ্যে নিয়মিত গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে হলে যে মানসিক প্রস্তুতি দরকার, তার তা থাকার কথা নয়। সে মানুষ হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, তার শিক্ষাদীক্ষা, আচারব্যবহার ও রুচিবোধ বস্তির জীবন থেকে একেবারেই আলাদা।

এই অবস্থায় হাজার হাজার খেটে-খাওয়া গরিব বস্তি-বাসী যখন তাদের মাতব্বরদের নেতৃত্বে তার ওপর এসে চড়াও হলো শ্রদ্ধা ও ভালবাসার আবেদন নিয়ে, বললো দাদাবাবুকে যেতে হবে তাদের ওখানে, প্রতিদিন যেতে বলছে না, মাঝে মাঝে গেলেই চলবে, তারা মানুষের মতো বাঁচার জন্যে, আর নিরাপত্তার জন্যেও বটে, দাদাবাবুর আশ্রয় ও নেতৃত্ব চায়, তখন ভাবার বিপন্ন মানসিক অবস্থা অনুমান করা বোধহয় খুব কঠিন নয়। একদিকে নোংরা বস্তির পঙ্কিল পরিবেশ সম্পর্কে তীব্র বিতৃষ্ণা, অন্য দিকে দুঃস্থ অভাগা সহায়সম্বলহীন মানুষগুলির স্বতোৎসারিত অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভালবাসার দাবি—এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব তাকে মনের দিক থেকে যৎপরোনাস্তি কাহিল করে ফেললে।

শেষ পর্যন্ত যখন সে বুঝলে, মানসিক এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের নিরসন ঘটানো তার পক্ষে কোনভাবেই সম্ভব নয়, তখন সে গিয়ে একদিন হাজির হলো গাঙ্গুলী কাকু অর্থাৎ অধ্যাপক সুরেশ গাঙ্গুলীর কাছে।

তাঁকে সমস্ত ঘটনার সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে ভাবা শেষে বললে,—বুঝতেই পারছেন কাকু আমার অসহায় অবস্থা, দোটানায় পড়ে কিরকম নাস্তানাবুদ হচ্ছি। এখন বলুন আমার কি করণীয়।

ভাবার কথা শুনতে শুনতে অধ্যাপক গাঙ্গুলীর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বললেন,—খোকন, আমার কাছে পরামর্শের জন্যে এসে তুমি কোন অন্যায় বা ভুল করেছ বলছিনে, কিন্তু অন্তরের তাগিদে তুমি জীবন-পথের হাতিয়ার হিসেবে যে বৈজ্ঞানিক আদর্শ ও বাস্তব বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছ, তার কাছে জিজ্ঞেস করলে এত দিনে এর সদুত্তর পেয়ে যেতে, তোমার মানসিক দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটতো, এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তব্য-পথেরও সন্ধান পেতে।

কি রকম? একটু বুঝিয়ে বলুন।—ভাবা জিজ্ঞেস করে।

কেন?—অধ্যাপক গাঙ্গুলী বললেন ঃ এ নিয়ে তো আগেও একাধিকবার আলোচনা হয়েছে, তাছাড়া পড়েছও নিশ্চয়। যে আদর্শকে তুমি জীবন-দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছ বলে মনে করো, যা ভাববাদী দর্শনের ঠিক বিপরীত,

তার দুটো দিক—একটা তত্ত্বগত, অন্যটা সেই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ। তত্ত্বের এই ব্যবহারিক প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতা অর্জন এবং তার মধ্য দিয়ে সমাজব্যবস্থার রূপান্তরের প্রয়াস —এই হলো এ দর্শনের মূল শিক্ষা, এছাড়া সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। বুঝতে পারছো, কি বলতে চাইছি?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ভাবা বললে,—বুঝেছি কাকু বুঝেছি। আমার কি করণীয়, এবার বুঝতে পারছি।

—হ্যাঁ। বুঝলে খোকন, বস্তিবাসীদের এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার দাবি তোমার কাছে দুর্ভোগ হিসাবে আসেনি, এসেছে অপূর্ব সুযোগ হিসাবে। মনে রেখ, আমার বৈজ্ঞানিক জীবন-দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আর ফাঁক নেই, তত্ত্বগত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, এই বোকামি ও অহমিকা তোমাকে যেন কখনও পেয়ে না বসে। বর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ধ্যানধারণা, আমাদের জীবনযাত্রা ও পরিবেশ এবং হাজার হাজার বছরের সংস্কার ও বিশ্বাস আমাদের ওপর, ভেতরে ও বাইরে, সবসময় ক্রিয়াশীল। এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন না থাকলে তা আমাদের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। অবিরত তত্ত্বগত জ্ঞানবৃদ্ধি ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের কলাকৌশল আয়ত্ত করার চেষ্টা এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়েই আমরা ঐ বিভ্রম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি, এগোতে পারি লক্ষ্যের দিকে।

এর পর অধ্যাপক গাঙ্গুলীর পরামর্শে ভাবা বস্তি ও তার বাসিন্দাদের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করে। বস্তির মানুষদের সে সংঘবদ্ধ করছে, নিজেদের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর তাদের নির্ভরশীল করে তোলার চেষ্টা করছে, লেখাপড়া শেখানোর জন্যে নাইট-স্কুল স্থাপন করেছে এবং বস্তির নানাবিধ উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাবুর ও সোম কাকুর অর্থাৎ ব্যারিস্টার কমল সোমের চেষ্টার ফলে এইসব বস্তি-উন্নয়নমূলক কাজে কিছু কিছু সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা পেতেও তার খুব বেশী বেগ পেতে হয়নি।

বস্তিবাসীদের স্বাবলম্বী করার ব্যাপারে দুটো পন্থা তাকে গ্রহণ করতে হয়। একটি হলো বস্তির বাছাই-করা তরুণ ও যুবকদের নিয়ে একটা ভলান্টিয়ার বাহিনী গঠন করা। তাদের কাজ হলো বস্তির শান্তি রক্ষা করা, অন্যায় প্রতিরোধ করা আর উন্নয়নমূলক কাজকর্ম যাতে ব্যাহত না হয় তার ব্যবস্থা করা এবং ঐসব কাজে নিজেরা মনেপ্রাণে যোগদান করা। এই বাহিনীকে জঙ্গী বাহিনীতে পরিণত করতে হলে যে ট্রেনিং দরকার, তা দেবার দায়িত্ব ভাবা নিজে নেয়। আর দ্বিতীয় পন্থা হলো বস্তির মাতব্বরদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা। কমিটির কাজ হলো, বহুমুখী এই সব কাজকর্মে ও উদ্যোগ-আয়োজনে যাতে ভাটা না পড়ে কিংবা কোন ভুল বা অপব্যয় না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ন সজাগ দৃষ্টি রাখা, আর বস্তিবাসীদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্বে মাঝে মাঝে যেসব ঝগড়াঝাটি ও অশান্তির উদ্ভব হয় তা যাতে কখনই থানা পুলিশ-আদালত পর্যন্ত না গড়ায়, নিজেদের ঝগড়াঝাটি যাতে নিজেরাই সালিসি মারফৎ আপসে মিটিয়ে নিতে পারে, তার যথাযথ ব্যবস্থা করা।

এই যে ব্যবস্থা দুটো ভাবাকে নিতে হলো, তা কিন্তু প্রথম দিকে তার মাথায় আসে নি। এল ঘটনাচক্রে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। সে ইতিহাসের মধ্যে অসাধারণ না থাকলেও বৈচিত্র্য আছে।

সর্বত্র যেমন, এ বস্তিতেও তেমনি গুণ্ডা-মস্তানদের ছোট একটা ভীষণ মারকুটে দল সক্রিয় ছিল ভাবা আসার অনেক আগে থেকেই। পরগাছা-বৃত্তি তাদের পেশা। বস্তিবাসীদের ঘাড়ের ওপর পা রেখে খুশিমতো হুকুম চালানো, যখন তখন জবরদস্তি টাকাপয়সা আদায় করা এসব ছিল তাদের নিয়মিত কাজের অঙ্গ। এজন্যে দরকার হলে মারধোর, ছোরা বোমা চালাতেও তারা পিছপা হতো না।

ছোট্ট দল, সংখ্যায় বড় জোর দশ-বারো জন হবে কিন্তু এমনি তাদের দাপট যে, কয়েক হাজার মানুষের এই বস্তিকে মুখ বুজে সহ্য করতে হতো তাদের সবরকমের হামলা, জুলুম আর ক্ষয়ক্ষতি। এমন ঘটনা মোটেই বিরল নয় যে, এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে কাউকে কাউকে দৈহিক নির্যাতনই শুধু নয়, সাংসারিক নানা দুর্ভোগও পোয়াতে হয়েছে। এসবের নীট ফল হয়েছে, ছাপোষা শান্তিপ্রিয় গরিব মানুষগুলো আর ওদের ঘাঁটানোর কথা ভাবে না, মুখে কুলুপ এঁটে গুনাগারি দিয়ে যায়।

ভাবা আসার আগে পর্যন্ত এমনি নির্ঝঞ্ঝাটেই চলছিল দলটির সন্ত্রাসের কারবার। শুধু তাই নয়, বস্তির কিছু কিছু তরুণ ও যুবকও গিয়ে ধীরে ধীরে ওদের দল বৃদ্ধি করছিল। কারণ মাথার ঘাম পায় ফেলে রুজি-রোজগারের ধান্দায় ঘোরার চেয়ে এ জীবনের আকর্ষণ অনেক বেশী লোভনীয়।

ভাবা আসতে ওরা সচকিত হয়ে উঠেছিল। আর বস্তির উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শুরু হতেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। আর কিছু না হোক, কয়েক দিনের মধ্যেই এটা তারা স্পষ্ট বুঝলো যে, এসব বেয়াড়া কাজ-কারবার যদি এগুতে দেওয়া হয় আর নতুন আলো এসে যদি বস্তি-জীবনে পড়ার সুযোগ পায়, তাহলে তাদের রাজত্ব খতম হতে দেরি হবে না।

অতএব অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন যেখানে মুখ্য, সেখানে যা করণীয় সেই পথ ওরা গ্রহণ করলো। পন্থা দুটো— একটি হলো উন্নয়নমূলক যাবতীয় কাজ থেকে বস্তির লোকদের যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে রাখা আর দ্বিতীয়টি হলো দরকারমতো ভেতর থেকে সবকিছু বানচাল করে দেওয়া।

এর পরই বস্তিতে নেমে এল ভয়ংকর তাণ্ডবের রাজত্ব। আর এসবই চললো অতি সংগোপনে।

তারা চায় না, ভাবা এসব জানুক। এটা যে শ্রদ্ধা-ভালবাসার ব্যাপার নয়, তা বোধহয় বলার দরকার করে না। প্রশ্নটা ভয়ের। ভাবাকে তারা প্রচণ্ড ভয় করে! বস্তি-রক্ষার সময় গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে ভাবার হিম্মৎ তারা দেখেছে। দেখেছে, ভাবার হাতে পড়ে তাদের পঞ্চাশ-ষাটজন জাত-

ভাইয়ের কী নাকাল অবস্থা হয়েছিল। তা থেকে এমনকি পুলিসও বাদ যায়নি। তাই নিতান্ত নিরুপায় না হলে ভাবার মুখোমুখি হওয়া তাদের চিন্তার বাইরে।

ভাবা এসব কিছুই জানে না—না দলটির অস্তিত্ব, না তাদের এইসব মতলব আর তান্ডব। কাজকর্মের অবস্থা দেখে সে বিচলিত বোধ করে—শুরুতেই প্রায় অচল অবস্থা। যে প্রচন্ড উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে বস্তিবাসী তাকে এ কাজে টেনে নামালো, তা হঠাৎ কোথায় গেল? জিজ্ঞাসাবাদ করেও সে কোন হদিস পায় না। কি করেই বা পাবে' কার ঘাড়ে কটা মাথা যে, গুন্ডাদের মারাত্মক শাসানির পরোয়া না করে তাদের মতলব ফাঁস করে দেবে আর খোয়াবে জানমান সবকিছু! এমন যে মাতব্বররা, তাদেরও সাহস নেই প্রকাশ্যে মুখ খোলার। ভাবার প্রশ্নে তারা অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে থাকে, কখনো বা তো-তো করে আর মাথা চুলকোয়।

ভাবা একগুঁয়ে চিরকাল। প্রথম দিকে স্বভাবতঃই একটু অভিমান হয়েছিল, কিন্তু তা সাময়িক। তার পরেই সে রুখে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই এ সবের পেছনে কোন গুরুতর রহস্য আছে, সে রহস্য তাকে ভেদ করতে হবে।

এ কয় দিনে অদ্ভুত একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে—কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। সমস্ত প্রশ্নেরই জবাব এড়িয়ে যায়। কিন্তু কেন? ভয়ে? কিসের ভয়? নাকি অন্য কিছু?

ভাবার গোপন তদন্ত শুরু হলো।

লোক পাঠিয়ে গোপনে মাতব্বরদের সে ডেকে পাঠায় তার বাড়িতে—প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে।

খুব বেশী দেরি করতে হয় না। ধীরে ধীরে একসময় গুপ্ত রহস্য ফাঁস হয়ে এল। প্রচন্ড রাগে ভাবা গুম হয়ে থাকে। প্রথমে সে ঠিক করেছিল, নিজের হাতে গুন্ডা-গুলোকে সে বুঝিয়ে দেবে চরম শাস্তি কাকে বলে।

কিন্তু ধীরে ধীরে রাগ তার ঠান্ডা হয় এক সময়। মনে পড়ে গাঙ্গুলীকাকুর উপদেশ ঃ আবেগের দ্বারা চালিত হয়ো না খোকন। যুক্তিকে স্থান দেবে সবার ওপরে। যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে বাস্তব অবস্থাকে ঠিকমতো বিশ্লেষণ করতে পারলে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা কঠিন হবে না।

ভাবা আত্মসমাহিত—গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। এই বস্তি-উন্নয়নের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য কি? সে উদ্দেশ্য হলো—বস্তির মানুষদের সর্বতোমুখী মানসিক উন্নয়ন ঘটানো, নিঃসীম অন্ধকার থেকে তাদের তুলে আনা, তাদের সচেতন করে তোলা। এই যদি হয় মূল উদ্দেশ্য, তাহলে সেই শিক্ষা ও জ্ঞান তাদের একান্ত দরকার, যা তাদের সবরকমের মানসিক দৈন্য, ভয়ভীতি ও ভীরুতা থেকে মুক্তি দেবে, তাদের পরমুখাপেক্ষিতা দূর করবে, আত্ম-নির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী হতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তির ওপর পুরোপুরি আস্থাশীল করে তুলবে।

এমনি করে একের পর এক চিন্তার সূত্র ধরে ভাবা এগোয়। শেষ পর্যন্ত সে সিদ্ধান্তে এল—না, এই সন্ত্রাস ও গুন্ডাবাজির মোকাবিলা করার ভার ব্যক্তিগতভাবে একলা তার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া কখনই ঠিক হবে না, বস্তির বাসিন্দাদের দিয়েই এ কাজটা করাতে হবে। তাতে একটু দেরি হবে। তা হোক, ক্ষতি নেই। তাতে লাভ হবে সব দিক দিয়েই। এজন্যে এখুনি দরকার একটা জঙ্গী ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোলা। তাদের সে নিজে ট্রেনিং দেবে। গুন্ডাবাজি ও সমস্ত রকম দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে তারাই হবে বস্তির প্রতিরোধ-শক্তির মূল বর্শাফলক। এই সঙ্গে করতে হবে আরো দুটো কাজ ঃ প্রথমতঃ মাতব্বরদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ বস্তির বাসিন্দাদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে গভীর প্রয়োজনবোধ এবং ঐসব কাজের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে পারস্পরিক সুদৃঢ় ঐক্যবোধ এবং নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তি সম্পর্কে চেতনা ও অনড় আস্থা। তাছাড়া তাদের নিয়ে নিয়মিত আলোচনা-বৈঠকেরও ব্যবস্থা করতে হবে।

গোপনে কাজ আরম্ভ হয়।

ভাবার কথায় বস্তির প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মাতব্বরেরা উদ্দী-পিত হয়ে ওঠে। আবার বুঝি তারা আশার আলো দেখতে পায়।

শেষ পর্যন্ত তাদের নিয়ে সর্বোচ্চ বস্তি-কমিটি গঠিত হলো।

কমিটির চেষ্টায় বস্তির সৎ ও সুস্থমনা তরুণ ও যুবকেরা একে একে এসে জড়ো হতে থাকে ভাবার পাশে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের সংখ্যা দাঁড়ালো সাতাশীজন! তাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত বেশি বুদ্ধিমান, সক্রিয় ও সচেতন, তাদের নেতৃত্বে গড়া হলো ভলান্টিয়ার বাহিনী। ভাবা তাদের নিয়মিত তালিম দেয়।

সেই সঙ্গে সে দিনের পর দিন যায় বস্তিতে। গুন্ডা-দের সঙ্গে তার আলোচনা করার ইচ্ছে। তার ধারণা, ওদের দু-একজন ছাড়া অন্যদের ন্যায়-অন্যায় বোধ এখনো হয়তো লুপ্ত হয়নি। আলোচনার মাধ্যমে আবার তাদের হয়তো সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি! তারাও তো বস্তির লোক!

কিন্তু ভাবার সে চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ করতে পারায় গুন্ডাদলের মধ্যে তখন প্রচন্ড উৎসাহ। তারা নিঃসন্দেহ যে, ওসব আপদ চিরতরে চুকে গেছে। কাজেই ভাবার সঙ্গে দেখা করার কোন প্রয়োজনই তারা বোধ করে না। উপরন্তু ভাবা চলে যেতেই নতুন উদ্যমে শুরু হয় তাদের গুন্ডাবাজি' বস্তিবাসীদের তারা হাতেকলমে বুঝিয়ে দিতে চায়, তাদের ঐ দাদাবাবুটির কথাবার্তা কত শূন্যগর্ভ।

কাজেই ভলান্টিয়ার বাহিনীকে এবার কাজে নামতে হলো। গুন্ডাদলের সঙ্গে শুরু হলো তাদের ছোটখাট সংঘর্ষ। হামলা-জুলুমবাজির তারা প্রতিবাদ করে, তারপর করে প্রতিরোধের চেষ্টা।

গুন্ডারা প্রথমে হকচকিয়ে যায়। বস্তির জীবনে এই প্রথম এ ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। ব্যাপারটা তাদের কাছে হেঁয়ালি ঠেকে। কিন্তু এ সব নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো মানসিক গড়ন সমাজবিরোধী এইসব মূর্খ দুর্বৃত্তদের

থাকে না। এসব ব্যাপারে তাদের একমাত্র মনোভাব হলো, নিজেদের এই এতকালের আরামের রাজত্ব তারা এইটুকুতে ছেড়ে যাবে, এটা কি একটা কথা নাকি যে মাথা ঘামাতে হবে। তাই তারা দিনে দিনে মরিয়া হয়ে উঠতে থাকে, তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে তাদের হামলা জুলুমবাজি আর লুঠতরাজ। অন্য পক্ষেও স্বভাবতঃই প্রতিরোধের তীব্রতা বাড়তে থাকে সমান তালে।

নির্বোধ গুন্ডার দল বুঝতে পারে না, কিভাবে তারা ক্রমেই ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে। ভাবা তাদের কাউকেই চিনতো না। এইসব সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সেই কাজটা সুসম্পন্ন হয়। শুধু ভাবাই তাদের চিনলো না, চিনলো রাজা কেলো বালুও।

এবার দ্বিতীয় পর্ব তথা শেষ পর্ব শুরু করার জন্যে ভলান্টিয়ার বাহিনীর মধ্য থেকে দাবি উঠতে থাকে। দাবি জানায় মাতব্বরদের কমিটিও। ভাবা খুশী হয়। সে-ও বুঝছে, এতদিন ছিল প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের পালা, এখন শুরু করতে হবে প্রতি-আক্রমণ।

গোপনে দিনক্ষণ স্থির হলো।

রাজা, কেলো ও বালুকে নিয়ে ভাবা গিয়ে আত্মগোপন করলো বস্তির মধ্যে। ভলান্টিয়ার বাহিনীকে দুভাগে ভাগ করা হলো। বড় অংশ গিয়ে চড়াও হলো গুন্ডাদের ওপর। বাকী অংশ পেছনে লুকিয়ে রইলো।

দু দলে প্রচন্ড লড়াই চলে। গুন্ডার দল বোমা ছুঁড়ছে শিলাবৃষ্টির মতো। বোমার শব্দে আর দু পক্ষের হুঙ্কার-গর্জনে গোটা বস্তি এলাকা সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত।

ভাবার ট্রেনিংয়ের ফলে ভলান্টিয়ার বাহিনীর আক্রমণের কৌশল যেমন আলাদা, ধারও তেমনি অনেক বেশী তীক্ষ্ন। কাজেই যা কোন দিন ঘটে নি, এখন তাই ঘটলো। গুন্ডার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটতে শুরু করলো। কিন্তু কোথায় হটবে! ভাবার ইঙ্গিতে ভলান্টিয়ার বাহিনীর মজুদ অংশ পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর। রাজা, কেলো আর বালুও ততক্ষণে রণাঙ্গনে উপস্থিত।

এর পরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। গুন্ডাদের কয়েকজন আগেই বেশ জখম হয়েছে, বাকীদের ওপর শুরু হয় প্রচন্ড মার—যাকে বলে হাটুরে মার, গোটা বস্তি যেন এতকালের মনের ঝাল মেটাতে চায় ওদের ওপর দিয়ে। মারের চোটে কয়েকটা তো অজ্ঞানই হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ওরা প্রাণে বাঁচলো ভাবার হস্তক্ষেপে। সব কটাই ধরা পড়েছে—একমাত্র পালের গোদা ছাড়া। সে পালিয়েছে। বস্তি ছেড়ে সেই যে সে পালালো, আর ফেরে নি।

প্রকাশ্য বিচারসভা। বাসিন্দারা হাজারে হাজারে জমায়েত হয়েছে। বস্তি-কমিটির সামনে গুন্ডাদের হাজির করা হয়। জানের মায়ায় গুন্ডারা কাঁদছে হাউমাউ করে। সবার হাতে পায়ে ধরে তারা কাঁদে, নিজেরা নাক-কান মলে বারবার হলপ করে, আর কখনো তারা কোন অন্যায় বা দুষ্কর্ম করবে না, এখন থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে।

বস্তির মানুষদের অন্তহীন অভিযোগ গুন্ডারা একটাও অস্বীকার করতে পারে না। নিজেরাই মাটিতে নাক ঘষে আর স্বীকার করে। কথায় বলে, প্রাণের দায় বড় দায় —নাকের ওদের ছালচামড়া উঠে যাবার যোগাড়!

শেষ পর্যন্ত কমিটি রায় দিলে। চরম দন্ড না হোক, যে সাজা গুন্ডাদের দেওয়া হলো তাও খুব কম কঠোর নয়! গুন্ডারা তাইতেই বর্তে যায়।

এতকাল পরে বস্তিবাসীরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বস্তির জীবনে এল শান্তি, এল নিশ্চিন্তে দিনযাপনের আশ্বাস।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আবার শুরু হয় পূর্ণোদ্যমে।

এর পর থেকে প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে বস্তিতে আলোচনা-সভা বসে। ভাবার উপস্থিতি সেখানে স্বভাবতঃই অপরিহার্য। এজন্য আগে থেকে দিনক্ষণ ধার্য করা থাকে। বাসিন্দারা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে এই সময়টির জন্যে।

বৈঠকে বস্তির কাজকর্ম নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা হয়। আর ভাবা আলোচনা করে গরিবদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয় এবং দেশের ও বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিষয়। বস্তিবাসীদের সে শোনায় ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের কাহিনী, শোনায় মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস, তার সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস, আর শোনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শোষিত রিক্ত বঞ্চিতদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত। যত দিন যায়, বস্তির বাসিন্দাদের মনে প্রশ্নের সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। ভাবা সাধ্যমতো সে সবের জবাব দেয়।

এমনি করে অন্ধ বস্তির চোখের ওপর থেকে ধীরে ধীরে কালো পর্দা সরে যেতে থাকে, যুগ-যুগান্তের তিমিরাবরণ ছিন্ন-দীর্ণ করে চিত্তাকাশে জাগে প্রাণময় আলোর বন্যা, এতকালের নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কের কোষে কোষে শুরু হয় চেতনাজাগরণের নব উল্লাস। সীমাহীন বিস্ময়ে পুলকে বস্তিবাসী নতুন সচেতন দৃষ্টি মেলে তাকায় তাদের চারদিকে, বৃহত্তর দুনিয়ার দিকে আর তাকায় তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম দাদাবাবু তথা গুরুজীর দিকে, অন্তর-উজাড়-করা শ্রদ্ধা ও প্রীতির অর্ঘ্যে তাকে অভিষিক্ত করে।

নবজীবনের পথে পা বাড়ানোর আগে পর্যন্ত ভাবা কলেজজীবনে ছাত্রদের আন্দোলন-বিক্ষোভাদির ব্যাপারে ছিল একান্তই নিস্পৃহ নির্বিকার। কারণ জাতীয় জীবনের পটভূমিকায় শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রসমাজের গুরুত্ব তার কাছে মোটেই স্পষ্ট ছিল না। তাই ছাত্রদের সবরকমের আন্দোলন-বিক্ষোভকে নিছক হুজুগ ও দলবাজি মনে করে নিজেকে সে সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখতো।

কিন্তু ভাবা না চাইলেও, বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠন কিন্তু কিছুকাল আগে পর্যন্তও তার পেছনে লেগে থাকতো আঠার মতো। তাদের প্রত্যেকেরই আপ্রাণ চেষ্টা ওকে দলে টানার। যেহেতু ভবেন রায় তাদের দলে যোগ দিলে ছাত্রসমাজের মধ্যে সংগঠনের মর্যাদা ও শক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি

পাবে, তাই তাদের মধ্যে চলতো এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। তারা জানে, ভবেন রায় রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকলেও, ছাত্রসমাজের ওপর তার বেশ প্রভাব। যদিও দলীয়-নির্দলীয় রাজনীতি থেকে তা মুক্ত। ছাত্ররা তাকে সমীহ করে, ভালবাসে। তাদের চোখে সে এক বিস্ময়।

হ্যাঁ, সত্যিই বিস্ময় এবং তার যথেষ্ট সংগত কারণও আছে।

ছাত্র হিসেবে ভাবার মতো চৌকস ছাত্র—যেমন পড়াশুনোয়, তেমনি খেলাধুলো ও দৈহিক সৌন্দর্যে—সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কটি মিলবে সন্দেহ।

পড়াশুনোয় তার নিজের পাঠ্য বিষয়ে সে সেরা ছাত্র। বর্তমানে পোস্টগ্রাজুয়েট বিজ্ঞান বিভাগে অর্থাৎ এম. এসসি ক্লাসে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বা পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা তার অধ্যয়নের বিষয়। না, শুধু অধ্যয়নের বিষয় বললে বোধহয় কম বলা হবে, ইতিমধ্যে তার কোন কোন প্রসঙ্গ নিয়ে সে গবেষণাও শুরু করেছে।

তেমনি সে খেলাধুলোরেও। সর্বভারতীয় দৌড়, বক্সিং, ছোরা ও লাঠিখেলা, লং ও হাই জাম্প, ডিসক্যাস নিক্ষেপ রাইফেল শুটিং ও জুজুৎসু প্রতিযোগিতায় তার স্থান আজ প্রথম সারিতে। ক্রিকেট, হকি ও টেনিসেও সে যথেষ্ট নাম করেছে।

ফলে ছাত্রসমাজের কাছে সে শুধু বিস্ময়ই নয়, গর্বের বস্তুও বটে। খেলাধুলোয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালী ছাত্রসমাজের যে মুখোজ্জ্বল করছে, তার জন্যে তাদের এই গর্ববোধ মোটেই অযৌক্তিক নয়।

একটি রহস্যের তারা কিনারা করতে পারে না। এটাও তাদের বিস্ময়ের অন্যতম কারণ। তারা বুঝে পায় না, কি করে একজনের পক্ষে একাধারে সেরা ছাত্র ও সেরা খেলোয়াড় হওয়া যায়। সত্যিই এটা রহস্য, তবে এ রহস্যের কিনারা করতে হলে ভাবার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার।

এমনিতেই অসাধারণ তার দৈহিক শক্তি ও মগজের তীক্ষ্ণতা, তার ওপর সে যখন কোন কিছু শিখতে বা জানতে চায় বা কোন দায়িত্ব হাতে নেয়, তখন তার মধ্যে যে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও আবেগের প্রকাশ ঘটে, তা বিস্ময়কর। রহস্য সেখানেই। যতক্ষণ না সে বিষয়টা অধিগত করতে পারছে বা দায়িত্ব সমাধা করতে পারছে, ততক্ষণ তার স্বস্তি থাকে না, নিবৃত্তিরও প্রশ্ন ওঠে না। আর তাই ছেদ পড়ে না একাগ্র তপস্যাতেও।

ভাবা কিন্তু এসব কিছুই জানে না, জানে না সাধারণ ছাত্রদের ওপর তার আদৌ কোন প্রভাব আছে কিনা। জানার দরকারও মনে করে না। এমনই তার প্রকৃতি যে, প্রভাব থাকা-না থাকা নিয়ে সে আদৌ মাথায় ঘামায় না। কারণ অহমিকার লেশমাত্র নেই তার মধ্যে। সে স্বভাবগম্ভীর, মিথ্যাচার ও কুরুচি বরদাস্ত করতে পারে না, কিন্তু একেবারেই দিলখোলা। বিশিষ্ট-অবিশিষ্ট সব ছাত্রের সঙ্গেই তার সমান ব্যবহার। তার প্রাণখোলা হাসি সবাইকে সহজে আপন করে নেয়।

অতএব ভাবা না জানলেও, ছাত্র-সংগঠনের নেতারা এসব খুব ভাল করেই জানে। আর তাই তাদের এত আগ্রহ তাকে দলভুক্ত করার।

পরবর্তী কালে কিন্তু ভাবা আর নির্বিকার থাকতে পারে নি ছাত্র-আন্দোলন সম্পর্কে। তার মধ্যে নবচেতনার উন্মেষধনের ফলে দৃষ্টিভঙ্গিতে ধীরে ধীরে যে আমূল রূপান্তর ঘটে, সেই চোখ নিয়ে সে তাকালো শিক্ষাব্যবস্থা ও ছাত্রসমাজের দিকে।

শিক্ষাজগতের সংকট এবং সমস্যাসংকুল মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত ছাত্রসমাজের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সে যেন অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পায়। তার ধারণা হয়, রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বর্তমানে যে অবস্থা চলেছে, অবিলম্বে তার পরিবর্তন দরকার। তা নইলে ছাত্রজীবন তথা ব্যাপক জনজীবনে যে অন্ধকার নেমে আসছে এবং বর্তমানের অন্ধ কানাগলির মধ্যে পড়ে তা যেভাবে পাক খাচ্ছে, তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। মনে মনে তাই সে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তার গুরুতর আশঙ্কা হয়, এভাবে চললে বিপথচালিত শ্রমজীবী জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজ রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ও বেইমানির পাঁকে পড়ে নিজেরাই নিজেদের হনন করবে, চরম হতাশায় নিজেদের রুধির নিজেরা পান করবে ছিন্নমস্তার মতো।

এ অবস্থায় তার কি করণীয়? কোনো রাজনৈতিক দলে ও ছাত্রসংগঠনে যোগ দেবে? কিন্তু কোন্ দলে বা সংগঠনে? ওদের সবার কর্মসূচী সে পড়েছে, বক্তৃতা শুনেছে, কার্যকলাপও দেখছে। তথাকথিত বাম দক্ষিণ মধ্য—নামের ও সাইনবোর্ডের তফাৎ ছাড়া আর কোথায় পার্থক্য?

ভাবা চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু তাই বলে আগের মতো আর চুপচাপ নির্বিকার থাকতে পারে না। ন্যায্য দাবিদাওয়া ও অভিযোগের প্রশ্নে ছাত্র-আন্দোলনে সে অংশ নিতে শুরু করে।

ছাত্র-আন্দোলনের লক্ষ্য, তার চরিত্র ও আদর্শ, লক্ষ্য সাধনের পন্থা ইত্যাদি মূল প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে তার দীর্ঘ আলোচনা হয়। দেখা যায়, বহু ক্ষেত্রে মতপার্থক্য গুরুতর ও মূলগত। তেমনি সঠিক দাবিদাওয়া নির্ধারণ ও তা আদায়ের পন্থা নিয়েও ঘটে এই মৌলিক পার্থক্য।

এইসব আলোচনায় নিজের বক্তব্যে সে কিন্তু অবিচল—কোন অস্পষ্টতা বা জড়তা রাখে না। রাখার প্রশ্নও ওঠে না। কারণ তার কোন পেছু টান নেই। নেই খ্যাতির মোহ, ছাত্রনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা-লাভের কোন বাসনা। তাই কোন দল তাকে সমর্থন করলো কিনা, সে ভাবনা থেকে সে মুক্ত। আর ভয়ডর? ওটা সে কোনকালেই জানে না। তেমনি জানে না মূল নীতির প্রশ্নে আপস করতে।

কাজেই স্পষ্ট ভাষায় সে অপর পক্ষকে বলতে পারে যে, ছাত্র-আন্দোলনের মূল লক্ষ্য থেকে সরে এসে অবাস্তব দাবি তুলে ছাত্র ক্ষ্যাপানোর সে বিরোধী। তাতে ক্ষতি হয় ছাত্র-

দেরই বেশী, তাদেরই ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত জঙ্গী ছাত্র-আন্দোলন এবং জাতীয় স্বার্থই বানচাল হয়। এমনকি যেসব সংগঠন সাময়িক লাভের মোহে এই পন্থা গ্রহণ করে, শেষ পর্যন্ত ডুবতে হয় তাদেরও। এটা ভুল রাজনীতিরই পরিণতি।

বিরাট ছাত্র-জমায়েতে ভাবা যেদিন প্রথম বক্তৃতা করার সুযোগ পেয়েছিল, সেদিনটা ভোলা দুষ্কর। মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার মানুষের সামনে বক্তৃতা করা তার সেই প্রথম। তাই প্রথম দিকে সংকোচ ও আশঙ্কায় বুক একটু কাঁপছিল বৈকি। কিন্তু উঠে দাঁড়ানোর পর কি যে হলো! ভেতর থেকে স্বতঃই যেন বেরিয়ে আসতে থাকলো তার অন্তরের কথাগুলো—যা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মূল সত্য হিসাবে!

এমন বক্তৃতা এ কালের ছাত্রসমাজের কাছে অভিনব। স্তব্ধ নীরবতায় তারা সেদিন উৎকর্ণ হয়ে শুনেছিল ভাবার প্রতিটি কথা। সে কথার মধ্যে কোন জড়তা নেই, অস্পষ্টতা নেই, নেই কোন ফাঁকি বা গোঁজামিল। নির্ভীক স্পষ্ট বক্তব্য—যেখানে ঘটেছে যুক্তি, তথ্য আর আবেগ ও আন্তরিকতার অদ্ভুত সমন্বয়।

বক্তৃতা-শেষে হাজার হাজার ছাত্রের সেই বিশাল জমায়েত থেকে মুহুর্মুহু যে হর্ষধ্বনি ও জয়ধ্বনি উঠলো, জমায়েতের ভেতর থেকেই একের পর এক ছাত্র উঠে যেভাবে ভাবাকে অভিনন্দন জানালো, তা থেকে বোঝা গেল কি গভীর ভাবে সে বক্তৃতা দাগ কেটেছে ছাত্রদের মনে। বস্তুতঃ ভাবার বক্তৃতার পর আর কোন ছাত্রনেতার বক্তৃতা জমলো না! ভাবার বক্তব্যের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও নেতারা বুঝলো, এ সমাবেশে তার বিরোধিতা করা কখনই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

এই সমাবেশ থেকেই ব্যাপক ছাত্রসমাজের মধ্যে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো ভবেন রায়ের নাম। এতদিন সেরা ছাত্র হিসাবে আর সেরা খেলোয়াড় হিসাবে ভবেন রায় ছিল তাদের আদর্শ, আজ নির্ভীক স্পষ্টবাদী ছাত্রনেতা হিসাবে সে তাদের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো।

আর বাম দক্ষিণ মধ্য নির্বিশেষে বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠনের নেতারা প্রমাদ গুনলো, উদ্বিগ্ন শঙ্কিত হয়ে উঠলো।

এর পর থেকে ভাবাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ছাত্রদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠতে থাকে। তাদের একটা অংশ এর আগে কোন দলীয় রাজনীতিতে যোগ দেয় নি, কারণ কোন আকর্ষণ বোধ করে নি। আর কিছু কিছু আছে, যারা এককালে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু দলবাজির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে সরে এসেছে। এতদিন তারা নিষ্ক্রিয় ছিল, দূরে থাকতো সমস্ত রকম আন্দোলন থেকে। বিভিন্ন কলেজ থেকে এরা এসেছে। এককালে নিষ্ঠাবান ছাত্রকর্মী বা ইউনিয়নের নেতা হিসাবে সেখানে তাদের সুনাম ছিল।

গোষ্ঠীর আলোচনা-বৈঠক বসে প্রায়ই। সেখানে ছাত্র-আন্দোলন, জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিক্ষানীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিতর্ক চলে, সাংগঠনিক প্রশ্নও আলোচিত হয়। আর এমনি করে আলোচনার মাধ্যমে নীতি ও কর্মপদ্ধতি বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে থাকে। আর ক্রমেই গোষ্ঠীর শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে চলে।

এক বৈঠকে গোষ্ঠীর সাংগঠনিক বা দলীয় নাম রাখার প্রসঙ্গ উঠলো। ভাবা তাতে ঘোরতর আপত্তি জানায় এবং বুঝিয়ে বলে, কৌশলগত প্রশ্নে কেন এখন ও জাতীয় নাম রাখা ঠিক হবে না।

কিন্তু ভাবা না চাইলেও, কলেজে কলেজে গোষ্ঠীটি 'ভবেন রায়ের দল' হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠতে থাকে।

বলা বাহুল্য, ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দেবার সময় থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রতিটি ব্যাপারেই ভাবা গাঙ্গুলী কাকু অর্থাৎ অধ্যাপক সুরেশ গাঙ্গুলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলেছে। সক্রিয় রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ভাবার কাছে, বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে গিয়ে, গাঙ্গুলী কাকুর উপদেশ, নির্দেশ ও পরামর্শ অপরিহার্য।

গোষ্ঠীর উদ্যোগে বিভিন্ন কলেজে আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়। ভাবা-ই সেখানে প্রধান বক্তা।

ছাত্রেরা এতদিন দূর থেকে ভবেন রায়ের নাম শুনেছে। বর্তমানে অতি কাছ থেকে দেখছে তাকে। তার ব্যক্তিত্বশালী অপূর্ব চেহারা, তার স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, কৌতুকপ্রিয়তা ও প্রাণখোলা হাসি তাদের মনে গভীর দাগ কেটে যায়।

আর ততই ছাত্র-সংগঠনের নেতারা মরিয়া হয়ে ওঠে। কয়েকবার তারা ভবেন রায়ের সঙ্গে প্রকাশ্য আলোচনায় বসেছিল। কিন্তু কোন বারই তার ক্ষুরধার যুক্তির সামনে দাঁড়াতে পারেনি। কাজেই তাদের সিদ্ধান্ত, আর আলোচনা নয়, একদিকে চালাতে হবে ভবেন রায়ের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার আর অন্যদিকে কোন কলেজে যাতে তার আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান না হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

সেদিন বড় এক কলেজে আলোচনা-বৈঠক বসেছে। ছাত্র-ছাত্রীতে প্রকাণ্ড হলঘরটি ভর্তি। ভাবা বক্তৃতা করছে, তার সুরেলা কণ্ঠে গমগম করছে সারা হল।

এমন সময় দশ-বারো জন যুবকের একটা দল হকি-স্টিক হাতে ভেতরে ঢুকে সোজা এগিয়ে গেল ভাবার কাছে। রূঢ় কণ্ঠে বললে,—আলোচনা বন্ধ করতে হবে।

ভাবা প্রথমে অবাক। তার পরেই তার চোখের কোণে খেলে যায় হাসির ঝিলিক। জিজ্ঞেস করে,—কেন?

দলটির নেতা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠকায়। সে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললে,—জবাব দিতে আমরা বাধ্য নই। ক্ষতিকর এইসব আলোচনা চলবে না।

ক্ষতিকর!—ভাবা এবার হেসে ফেলে ঃ বেশ তো, আপনারা আসুন, আলোচনায় যোগ দিন, বলুন কোথায় ক্ষতিকর। আপনারা যদি তা দেখাতে পারেন এবং যুক্তিতে আপনাদের কাছে যদি হেরে যাই, তাহলে কথা দিচ্ছি আপনাদের সংগঠনে আমরা সদলে যোগ দেব।

দলপতি আরো গরম হয়ে ওঠে। মারমুখো গলায় সে আবার শাসিয়ে উঠলো,—শেষবারের মতো বলছি, মিটিং এখুনি বন্ধ করতে হবে।

ভাবা-গোষ্ঠীর ছাত্ররা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে।

স্বভাবতঃই তারা উত্তেজিত।

তাদের শান্ত থাকতে ইংগিত করে ভাবা এবার ফিরলো সমবেত ছাত্রছাত্রীদের দিকে। শান্ত অচঞ্চল কণ্ঠে বললে,—আপনারা কি বলেন? আমার কথা কি আপনারা সমর্থন করেন? মিটিং চলবে, না এই বন্ধুদের হুকুম মতো বন্ধ হবে?

হলঘর নির্বাক। ভয়ে বিস্ময়ে সবাই চুপ হয়ে গেছে। দু-একজন ছাত্রছাত্রী আবার পায়ে পায়ে এগোচ্ছে দরজার দিকে।

আবার শোনা গেল ভাবার বলিষ্ঠ কণ্ঠ—আপনারা কি ভয় পেলেন? এত অল্পে কেন ভয় পাবেন? ভয়ের কাছে মাথা নত করা মানে নিজের অধিকার ও বিবেককে অন্যায়ের কাছে বলি দেওয়া। আপনারা রুখে দাঁড়ান, দেখবেন ভয় পালাতে পথ পাবে না।

বৈঠক-ভাঙানী দলটা এতক্ষণ ইতঃস্তত করছিল। এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেদিনও পর্যন্ত ভবেন রায়কে নিয়ে তারা গর্ব করেছে। কিন্তু ভাবার শেষ কথা কানে যেতেই তাদের দলপতি গর্জন করে উঠলো,—বটে! পালাতে পথ পাবে না! মার খেয়ে মরো তাহলে!

বলতে বলতে সে হকি স্টীক তুললো ভাবার মাথা লক্ষ্য করে। লম্বায় সে হবে ভাবার থুতনি পর্যন্ত। ভাবা তৈরীই ছিল। বাঁ হাত দিয়ে সে হকি স্টিকটা ধরে ফেলে হ্যাঁচকা টান মারতেই, ওটা তার হাতে এসে গেল।

ততক্ষণে হলের অদূরবর্তী এক কোণ থেকে একজন ছাত্রী উঠে দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ম কণ্ঠে সে বললে,—থামুন সমীরদা, থামুন। আপনাদের এই হামলাবাজির আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি।

উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে। কোমরে কাপড় জড়াতে জড়াতে নির্ভীক পদক্ষেপে সে দ্রুত এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ভাবাকে আড়াল করে দলপতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বললে,—আপনাদের এই গুরুতর অন্যায় কাজের আমি তীব্র নিন্দা করছি। এই যদি আপনাদের নীতি, তাহলে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে কোন্ মুখে আপনারা সরকারের বিরুদ্ধে গলাবাজি করেন?

ভাবার দৈহিক শক্তির প্রচণ্ডতায় দলপতিটি কেমন যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। তারপর ছাত্রীটির এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে সে একেবারেই ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেল। তার গলা থেকে শুধু বেরিয়ে এল,—অনিতা, তুমি?

হাঁ, আমি!—ঝাঁঝালো কণ্ঠে মেয়েটি আবার বললে ঃ ছি ছি, এই মন নিয়ে আপনারা ছাত্র-আন্দোলন করেন? লজ্জা করে না? ছাত্র হয়ে বিনা দোষে ছাত্রের ওপর লাঠি-বাজি করতে আপনাদের বিবেকে বাধে না? ছি ছি ছি! ঘেন্না করছে যে, আপনাদের ভাল ভাল কথা শুনে ঐ ইউনিয়নের সভ্য হয়েছিলাম!

মুগ্ধ বিস্ময়ে ভাবা তাকিয়ে আছে অনিতার বীরাঙ্গনা সুঠাম মূর্তির দিকে। সুগৌর সুন্দর মুখ উত্তেজনায় দীপ্ত রক্তবর্ণ। শুধু কণ্ঠ থেকে নয়, তার বড় বড় দুই চোখ থেকেও যেন ঠিকরে বের হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কয়েক গোছা চূর্ণকুন্তল সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে। অপূর্ব! এই তো সাত্যকার বাঙালী মেয়ে। সমাজে সংসারে এইরকম মেয়েই তো আজ দরকার। ভাবার চোখে আনতা যেন এক দেবী-মূর্তি। সে চোখ ফেরাতে পারে না।

ইতিমধ্যে দলপাত ধাতস্থ হয়েছে কতকটা। অনিতার শেষ কথায় খেঁাকিয়ে উঠলো, কিন্তু কণ্ঠে সে জোর নেই,—খবরদার আনতা, মুখ সামলে কথা বলো!

কী, কী, শাসাচ্ছেন আমাকে?—ক্রুদ্ধ কণ্ঠে অনিতা ধমকে উঠলো ঃ আপনারা—

পরক্ষণে তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল হলের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের তীব্র চিৎকারে। একযোগে তারা উঠে দাঁড়িয়ে ধিক্কার জানাচ্ছে,—বেরিয়ে যান আপনারা, এক্ষুণি বেরিয়ে যান!

তাদের দিকে ফিরে স্মিত কণ্ঠে ভাবা বললে,—না বন্ধু, ওরা থাকুন। ওদের আমি আবার অনুরোধ করছি, ওরা বসুন, আলোচনায় যোগ দিন।

বলতে বলতে সে মৃদু হেসে হকি স্টিকটা বাড়িয়ে ধরলে দলপতির দিকে।

যন্ত্রের মতো হকি স্টিকটা কোন রকমে হাত বাড়িয়ে নিয়ে হেঁট মাথায় দলপতি হল থেকে বেরিয়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটা তার মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তা অবর্ণনীয়। চৌকস ছাত্র বা ছাত্রনেতা হিসেবেই শুধু নয়, মানুষ হিসেবেও ভবেন রায় সম্পর্কে তাকে নতুন করে মূল্যায়ন করতে হবে।

দলপতিকে অনুসরণ করে তার অনুগামীরাও ধীর পায়ে হল ছেড়ে চলে গেল যুদ্ধে বিধ্বস্ত সৈনিকের মতো।

সমবেত ছাত্রেরা তাদের পেছনে টিটকারি দিতে যেতেই ভাবা বাধা দেয়,—না বন্ধু, দয়া করে ওটা করবেন না। এখনকার এই পরিস্থিতিতে ওটা ঠিক রুচিসম্মত হবে না। এ-ও তো এক ধরনের লড়াই, তাই লড়াইয়ের নিয়ম আমাদের মেনে চলা উচিত। আমাদের ঐ বন্ধুদের ভাবতে দিন।

অনিতা অভিভূত।

আবার তাহলে আলোচনা শুরু হোক।—ক্ষীণ জড়িত কণ্ঠে কথাটা কোন রকমে উচ্চারণ করে নত চোখে সে পা বাড়ায় নিজের সীটের দিকে।

না না, আপনি যাবেন না, এখানেই থাকুন।—বলতে বলতে ভাবা নির্দ্বিধায় সহজ ভাবেই আলগোছে অনিতার ডান হাতটা ধরলো। মনে তার কোন বিকার নেই।

আর থরথর করে কেঁপে উঠলো অনিতা। নিমেষে তার সারা মুখে কে যেন সিন্দুর ছড়িয়ে দেয়। কান ঝাঁঝাঁ করতে থাকে।

অনিতার হাত তেমনি ধরে ভাবা বলে চলে,—আজকের এই মিটিং আপনিই রক্ষা করেছেন। সেই সঙ্গে ওদেরও বাঁচিয়েছেন। অদ্ভুত! অদ্ভুত! কোমলে কঠোরে বাংলার নারীর মহিমময়ী বীরাঙ্গনা রূপ এতদিন কল্পনায় ছিল, আজ প্রত্যক্ষ করলাম। আমার প্রস্তাব, নতুন করে আবার এই

মিটিং শুরু হোক, আর আপনি তার সভাপতিত্ব করুন। নিন, বসুন দয়া করে।

এমনিতেই অনিতার তখন দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অবশ দেহে আচ্ছন্নের মতো সে চেয়ারে বসে পড়লো।

ভবেন রায়কে দেখার সাধ তার বহু দিনের। সেই সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে তো কথাই নেই। কাগজে কাগজে ভবেন রায়ের ছবি সে দেখেছে। আর নাম শুনেছে অজস্র বার। অধুনা ছাত্রনেতা হিসেবে ভবেন রায়ের খ্যাতি তো সর্বত্র। অনিতা অবশ্য রাজনীতির ব্যাপার-স্যাপার ঠিকমতো বোঝে না। সমীর ও অন্যান্যের অনুরোধে সে ইউনিয়নের সভ্য হয়েছিল। তাছাড়া কলেজে সমীর ও তার দলকে সাধারণ ছাত্রেরা সমীহ করে চলে। সে জানে, তার পেছনে ভক্তির চেয়ে ভয়টাই বেশী। সে-ও তাই ঝামেলা এড়াতে ইউনিয়নের চাঁদা দিয়েছিল।

অনিতা নিজে দক্ষ সাঁতারু। টেনিসেও তার কিছুটা নাম আছে। পড়াশোনাতেও মন্দ নয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার পেয়েছিল। তাই সেরা ছাত্র আর সেরা অ্যাথ্‌লীট ও খেলোয়াড় হিসেবে ভবেন রায়কে দেখার তার এত ইচ্ছে।

মিটিং শুরু হবার আগেই সে কোণের ঐ জায়গাটা দখল করে বসে ছিল। তারপর ভবেন রায় ঘরে ঢুকতেই সে চমকে যায়। শুধু গৌরকান্তি দীর্ঘকায় সুদর্শনই নয়, কী প্রতিভাদীপ্ত উজ্জ্বল স্বাস্থ্য! অনিতা তারপর নির্নিমেষ চোখে দেখেছে তার প্রতিটি হাবভাব ও অঙ্গভঙ্গি, উৎকর্ণ হয়ে শুনেছে তার দিলখোলা হাসির হররা, সরস মিষ্টি কৌতুক আর সুরেলা কণ্ঠের বক্তৃতা, আর সর্বশেষে দেখলো সমীরদের সঙ্গে তার পৌরুষব্যঞ্জক খেলোয়াড়ী ব্যবহার। কোথায় কল্পনা আর কোথায় বাস্তব! বাস্তবের কাছে কল্পনা এত ম্লান!

আজকের এই ঘটনার জন্যে অনিতা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ভবেন রায়ের মিটিং না হয়ে অন্য কারো হলে সে কি করতো? কিছুই করতো না। কারণ সে মিটিংয়েই সে যেত না। এসব তার একদম ভাল লাগে না।

ধীরে ধীরে অনিতার আচ্ছন্ন ভাব কেটে আসে। একটু একটু করে সে ধাতস্থ হয়।

ভাবার বক্তৃতা শেষ হয় একসময়। দু-চারটে প্রশ্নের সে জবাব দেয়। অন্য দু-একজনও উঠে দাঁড়িয়ে কিছু কিছু বললে।

তারপর অনিতার মুখের ওপর ডাগর দুই চোখ রেখে মিষ্টি হেসে ভাবা বললে,—এবার সভাপতি হিসেবে আপনি কিছু বলুন।

অনিতা ততক্ষণে আবার আরক্তিম হয়ে উঠেছে। আজ তার কী যে হচ্ছে, নিজেই বুঝতে পারছে না। এমন অবস্থায় আর কখনো পড়েনি। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। নিজেকে যথাসাধ্য সংযত করে সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর কাঁপা-কাঁপা গলায় বললে,—বন্ধুগণ, আমার আর কিছুই বলার নেই। শ্রীযুত ভবেন রায় মশাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি মিটিং শেষ করছি।

ছাত্রবন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভাবা রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সে অন্যমনস্ক। আজকের ঘটনাটা ভাবছে। যৎসামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকলে কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্র-সংগঠন এত নীচুতে নামতে পারে, এ তার ধারণার বাইরে ছিল। এ থেকেই বোঝা যায়, কিরকম দেউলিয়া অবস্থা ওদের।

ভাবা ঘড়ি দেখে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজে। ট্রামে-বাসে যা ভিড়, ওঠা দুষ্কর। নানা কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে সে এগিয়ে চলে স্টপেজের দিকে।......

সত্যি, অদ্ভুত সাহস ওই অনিতা মেয়েটির! সবাই যখন চুপ, ওদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারো নেই, ও-ই তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল। ওর তখনকার চেহারা দেখবার মতো।......

দেহের স্বাস্থ্য তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার মতো মনের জোর কজনের আছে! দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটির সেই মনের জোর ও মানসিক সৌন্দর্য আছে বলেই ওকে আরো সুন্দর করে তুলেছিল। ও আজ উপস্থিত না থাকলে কী কেলেংকারী কাণ্ডই না ঘটতো!

ভাবার দৃষ্টি হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দেখে, ভিড় থেকে একটু দূরে একটা বাড়ির পাঁচিলের ধার ঘেঁষে অনিতা দাঁড়িয়ে আছে। একটার পর একটা বাস-ট্রাম বাদুড়-ঝোলা হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আর অনিতা বারবার ঘড়ি দেখছে। সে যে বিপন্ন, তা তার চোখেমুখে স্পষ্ট।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে ভাবা বললে,—এই যে, আপনি এখানে?

চমকে অনিতা ঘাড় ফেরায়। মৃদু হেসে সহজ কণ্ঠে বলে,—ট্রাম-বাসের যা অবস্থা, কি করবো ভেবে পাচ্ছি নে।

তা বটে।—ভাবা বলে ঃ এখন অফিস ছুটির সময়। ট্রামে-বাসে ওঠা এখন অসম্ভব।

তাই তো দেখছি।—অনিতার কথায় অস্বস্তি প্রকট।

—এভাবে যাতায়াত করা বুঝি আপনার অভ্যাস নেই?

অনিতা মাথা নাড়ে।

—তা বুঝতে পারছি। শান্ত সুবোধ বালক-বালিকাদের মতো তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরাই অভ্যাস।

অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে কৃত্রিম রাগত কণ্ঠে অনিতা বললে,—কেন, ওটা কি অন্যায়? মা-বাবা গুরুজনদের দুশ্চিন্তা হয় না?

ভাবা হেসে ওঠে, বলে,—আরে সর্বনাশ! আমি কি তাই বলছি? আমি নিজেই তো ভুক্তভোগী। এই দেখুন না, আমি তো বুড়ো ছেলে, একেবারে অবলা রোগাপটকাও নই, তবু একটু দেরি হলেই মামণি-বাবু ঘর-বার করতে থাকে। অতএব যত কাজই থাকুক, পরিত্রাহি ডাক ছেড়ে হাহাকার করতে করতে ঘরমুখো ছুটতে থাকি। সে যে কি জ্বালা!

মুখে রুমাল চেপে অনিতা হাসছে। হাসির দমকে তার চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে।

অসহায় কণ্ঠে ভাবা বলে,—হুঁ, আপনি তো হাসছেন। আমায় তখন যদি দেখতেন, ভবেন রায়কে খুঁজেও পেতেন না। মামণির পাশে বসে আমি তখন নিঃশব্দে পুচ্ছ নাড়ছি।

রুমাল চেপে হাসি থামানো অসম্ভব। অনিতা খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে এক ফাঁকে বললে,—দোহাই আপনার, থামুন, আর পারছি নে।

একটু পরে ভাবা জিজ্ঞেস করে,—তা, আজ যে একটু দেরি হতে পারে, মা-বাবাকে বলে আসেননি?

—এসেছি তো। বাপীর এ সময় গাড়ির দরকার হয়. তাই মাকে বলে এসেছি, আমি যা হোক করে ফেরার ব্যবস্থা করবো।

—তা, এখন ট্যাক্সি করেও তো ফিরতে পারেন?

অনিতা চুপ করে থাকে।

ক্ষণেক চিন্তা করে ভাবা বলে,—ওহো বুঝেছি, সাহস হয় না।

ভাবার দিকে এক পলক তাকিয়ে কিঞ্চিৎ সলজ্জ কণ্ঠে অনিতা বললে,—বর্তমানে যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে ওটা কি অস্বাভাবিক? অবশ্যি আমার ক্ষেত্রে সাহসের প্রশ্ন ওঠে না। নিতান্ত অবলা দুর্বলা আমি নই। তবে বিশ্রী কোন পরিস্থিতিতে যাতে পড়তে না হয়, সেদিকে সতর্ক থাকাই বোধ করি সংগত।

ভাবার চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করলে,—নিশ্চয়ই। আপনারা থাকেন কোথায়?

—পণ্ডিতিয়া রোডে।

একটু ইতস্ততঃ করে ভাবা বললে,—কিছু যদি মনে না করেন, তাহলে একটা প্রস্তাব দিই। আমারও বাড়ি ফিরতে হবে। ট্যাক্সি করেই ফিরবো। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে আমি বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি। অবশ্যি এ প্রস্তাবে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলেও আমি কিছু মনে করবো না।

আপত্তি! এমন মানুষের সংগে ট্যাক্সিতে যেতে আপত্তি! অনিতা যেন হাতে স্বর্গ পায়।......

ট্যাক্সি চলেছে।

ভাবা একসময় জিজ্ঞেস করে,—আচ্ছা মিস......

আমরা 'সেন'।—মৃদু কণ্ঠে অনিতা বললে।

—ধন্যবাদ। আচ্ছা মিস সেন, আপনি বুঝি কলেজ ইউনিয়নের একজন সক্রিয় কর্মী?

কে? আমি?—অনিতার কণ্ঠে বিস্ময় ঃ মোটেই না! আপনার হঠাৎ ওটা মনে হলো কেন, বলুন তো? ও ব্যাপারে আমাকে নিষ্ক্রিয় বললেও কম বলা হবে। ও সম্বন্ধে আমি কোন খবরই রাখি নে। রাখার দরকারও মনে করি নে। কোন রাজনৈতিক সভা-সমিতিতেও যাই নে।

এবার ভাবার অবাক হবার পালা। বললে,—তাই নাকি? তবে আজ যে গেলেন?

অনিতা নীরবে গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। ভাবা আবার প্রশ্ন করে,—তা না হয় হলো, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে আপনার এই নির্লিপ্ততা কেন?

—কি করবো বলুন। ওসব ঠিক আমার মাথায় ঢোকে না। এক-এক দল এক-একরকম কথা বলে, কারো সংগে কারো মিল নেই। তাছাড়া মিল নেই ওদের কথায় ও কাজে! আজকের ঘটনাই তো তার এক জলজ্যান্ত প্রমাণ। ওসব কচকচি তাই ভাল লাগে না।

বুঝতে পারছি।—ধীর শান্ত কণ্ঠে ভাবা বলে ঃ কিন্তু মিস সেন, বড্ড কঠিন সময়ের ভেতর দিয়ে আমরা চলেছি। বর্তমান কালের শিক্ষিত মানুষ হয়ে এর কারণ আমরা জানবো না, প্রতিকারের পন্থা ভাববো না, নিজের দেশে ও বাইরের দুনিয়ায় অবিরত যে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেছে যার সংগে আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের ভাল-মন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে সবের অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলি সম্পর্কে সচেতন হবো না, এটা কি ঠিক?

দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে অনিতা বললে,—আজ আপনার বক্তৃতা শোনার পর মনে হয়েছে, হয়তো ঠিক নয়। আচ্ছা, একটা কথা মনে পড়লো, মিটিংয়ে আমার মুণ্ডপাত করবার সময় আপনি বলেছিলেন, আমি নাকি সমীরদের বাঁচিয়েছি। কি ব্যাপার বলুন তো?

—কী কাণ্ড! ঐ সামান্য কথাটাও মনে রেখেছেন? ওটা মোটেই তেমন কিছু নয়।

তবু বলুন।—অনিতা অনুরোধ জানায় ঃ আমি জানতে চাই, যেহেতু আমার নাম জড়িত। তবে আমার কাছে প্রকাশ করা চলে না এমন গোপন যদি কিছু থাকে, তাহলে অবশ্য আমি অনুরোধ করবো না।

অনিতার কথায় যেন প্রচ্ছন্ন অভিমান ফুটে ওঠে।

শশব্যস্তে ভাবা বললে,—আরে রাম রাম, ওর মধ্যে আবার গোপনের কি আছে? আপনার নাম জড়িয়ে আপনাকে আমি অসম্মান করবো, এটা ভাবতে পারেন আপনি? যাক গে—শুনুন তাহলে। আজ আপনি না থাকলে হকিস্টিক-ধারী ঐ হামলাবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আর কেউ ছিল না। ওরা মিটিং ভাঙতে এসেছিল, এসেছিল আমার ওপর আক্রমণ চালাতে। শাসানি-তড়পানির ফলে মিটিং হয়তো ভণ্ডুল হয়ে যেতো, ভয়ে সবাই সরে পড়তো। তেমনি আমার পক্ষেও এত বড় অন্যায় নীরবে হজম করা সম্ভব হতো না, ওদের উচিত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হতো। কিছু মনে করবেন না, আপনি আমার কতটুকুই বা জানেন! হকিস্টিকধারী ঐ দশ-বারোটি জীবের একটাকেও আমি আস্ত ছেড়ে দিতাম না। তাই বলেছিলাম, আপনি ওদের বাঁচিয়েছেন। বুঝলেন?

যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধার ভারে অনিতা বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। মহৎ হৃদয় এই মহাশক্তিমান মানুষটির কাছে নিজেকে তার বড় অপরাধী মনে হয়। কিন্তু সংকোচে ক্ষমাও চাইতে পারে না।

ভাবাও চুপ করে আছে। তারপর এক সময় হালকা গলায় বললে,—কি হলো আপনার? একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন যে? অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রসংগে আমি যে

প্রশ্নটা তুলেছিলাম, তার জবাব কিন্তু পাইনি।

ক্ষীণ কণ্ঠে অনিতা বলে,—কি বলবো, বলুন? আজ আপনার কথায় মনে হয়েছে, ওটা জানা দরকার। কিন্তু মুশকিল হলো, কোথা থেকে শুরু করবো জানি নে।

ওঃ, তাই বলুন!—ভাবা বললে ঃ তাহলে জানার ইচ্ছা আপনার হয়েছে? কিছু যদি মনে না করেন, ও দায়িত্ব আমি হয়তো কিছুটা নিতে পারি। আমরা কয়েকজন ছাত্রবন্ধু মিলে একটা আলোচনা-চক্র করেছি। মাঝে মাঝে তার বৈঠক হয়। আপনিও আসুন না সেখানে। আপনাদের কলেজের থার্ড ইয়ারের কেমিস্ট্রি অনার্সের ছাত্র সুমিত ঘোষ, সেকেন্ড ইয়ারের ইকনমিক্স অনার্সের ছাত্র অনিমেষ চক্রবর্তী এবং আরো কয়েকজন আমাদের ঐ আলোচনা-চক্রের নিয়মিত সভ্য। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে, তারা আপনাকে নিয়ে আসবে। কি বলেন, আসবেন?

কি এক আনন্দে অনিতার মন ভরে ওঠে। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে বললে,—যাবো।

॥ তিন ॥

অশান্তি নেই, জটিলতা নেই, ভাবা তথা রায় পরিবারের জীবনাকাশে কোথাও নেই এতটুকু মেঘ। বিভিন্ন কর্মপ্রবাহে ছড়িয়ে পড়ছে ভাবার জীবন।

দুঃখী মানুষ ও পশুদের জন্য নির্ভেজাল ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বস্তিজীবনের সঙ্গে একাত্মতা, নিয়মিত চিড়িয়াখানায় যাতায়াত, ছাত্র-আন্দোলনে যোগদান, সে আন্দোলনকে সুস্থ খাতে প্রবাহিত করার লড়াই ও অন্যতম জনপ্রিয় ছাত্রনেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন, ছাত্র হিসাবে অতুলনীয় কৃতিত্ব ও সাফল্য, এমনি আরো কত কর্মোদ্যোগ ভাবার জীবনাদর্শকে অভিজ্ঞতায় ও ধ্যানধারণায় দিনে দিনে শ্রীমণ্ডিত ও সমৃদ্ধ করে তুলছে। ভাবাকে নিয়ে সুখী পরিতৃপ্ত রায় পরিবার। ভাবার জন্যে তাঁদের গর্বের অন্ত নেই।

কিন্তু রায় পরিবারের ভাগ্যে বুঝি নিরবচ্ছিন্ন শান্তি লেখা নেই। তেমনি ভাবার জন্মলগ্নেই বিধাতা বুঝি তার কপালে অন্তহীন দুর্ভাগ্য ও লাঞ্ছনার রাজটিকা এঁকে দিয়েছিলেন। তা নইলে ভাবার জীবন-নদী যখন দিনে দিনে আরও প্রশস্ত ও পরিপুষ্ট হচ্ছে, দিকে দিকে নিত্যনতুন শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে দুই তীরের মানুষের জীবনকে তা যখন সবুজ শ্যামল করে তুলছে আর এগিয়ে চলেছে বিপুল সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে, তখন কেন এই অপ্রত্যাশিত আঘাত? একেই বোধহয় বলে বিনামেঘে বজ্রপাত, আর তা সোজাসুজি ভেঙে পড়লো ভাবারই মাথায়। এবং সেই সঙ্গে আকস্মিক আঘাতের প্রচণ্ডতা নিঃসীম বেদনায় অবশ অসাড় করে দিয়ে গেল রায় পরিবারের সমস্ত বোধশক্তিকে।

দীর্ঘকাল পরে আদালতে বিরাট মামলা উঠেছে। সরকার পক্ষ ফরিয়াদী।

বিবাদী হলো মোংলা ওরফে নরহরি, জগদম্বা দেবী ও তাদের দলবল, আর শিল্প ও ব্যবসা জগতের কীর্তিকর্মা ঝানু চাঁই হিসেবে পরিচিত কয়েকজন রাঘববোয়াল। বিত্তবৈভব, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিতে সমাজে ও সরকারী মহলে এদের মর্যাদা ও প্রভাব ছিল অসাধারণ।

এদের বিরুদ্ধে বহুবিধ গুরুতর অভিযোগ। তন্মধ্যে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, দাঙ্গাহাঙ্গামা, জালিয়াতি, আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক চোরাচালান, কালোবাজারি, চোরাকারবার ও এইসব ভয়ংকর সমাজবিরোধী দুষ্কর্মের পরিপোষণ ও ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অন্যতম। তৎসঙ্গে মোংলার বিরুদ্ধে যুক্ত হয়েছে আর একটা গুরুতর অভিযোগ। তা হলো আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইনানুগ শাস্তি, যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ফাঁকি দেবার মতলবে জেল ভাঙা ও তার জন্যে ষড়যন্ত্র।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন প্রখ্যাত সীনিয়ার কৌসুলি ব্যারিস্টার কমলকৃষ্ণ সোম। তাকে সাহায্য করছেন জুনিয়ার কয়েকজন ব্যারিস্টার ও অ্যাডভোকেট।

সরকার পক্ষের সাক্ষীর সংখ্যা বিরাট। তাদের মধ্যে ভাবা অন্যতম।

মামলায় সাক্ষি দিতে হবে, এই দুঃসংবাদটি পাওয়ার পর থেকে ভাবা খুবই অশান্তির মধ্যে আছে।

কী সাংঘাতিক! আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে! ওরে ব্বাবা! ভাবা চিন্তা করে থই পায় না। মাঝে মাঝে হাঁটুতে হাটুতে বুঝি ঠোকাঠুকি লাগে।

উঠে বসে দাঁড়িয়ে, কোনটায় তার স্বস্তি নেই। শুয়েও দেখেছে। দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটিও করে দেখেছে—অবশ্যি রাজা কেলো বালু টম ইত্যাদিকে নিয়েই, নয়তো লোকে বলবে কি! কিন্তু সুবিধে হয় নি।

বুড়ো ছেলের কাণ্ড দেখে কল্পনা দেবী হাসেন। শেষে একদিন বললেন,—তোর কি হলো বল্ তো, খোকন? তোর কাণ্ডবাণ্ড দেখে সবাই যে হাসছে!

ভাবা খ্যাঁক করে উঠলো,—থামো! হুঁ, হাসছে! হাসছে তো আমি বর্তে গেলাম! হুঁ, কত ধানে কত চাল, বাছাধনরা বুঝতো, যদি আমার অবস্থায় পড়তো! তুমি ওসব বুঝবে না।

বুঝবো না মানে?—তেমনি হাসতে হাসতে কল্পনা দেবী বললেনঃ আমিও তো সাক্ষি দেব।

অ্যাঁ!—ভাবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো! বিস্ফারিত চোখে বললেঃ তুমি সাক্ষি দেবে! সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবে? কেঁপেঝেঁপে নাকের জলে চোখের জলে একশা করবে না? হয়েছে আর কি!

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কল্পনা দেবী বললেন,—কি আবার হবে? শুধু কি আমি,? তোর বাবু সাক্ষি দেবেন. সাক্ষি দেবে হরিহরবাবু, বাড়ির পুরনো ঝি, ঠাকুর, দারোয়ান সবাই—মোংলা ও জগদম্বার অপকর্ম সম্পর্কে যারা যা জানে, বলবে।

ভাবার চোখ আরো বিস্ফারিত হয়ে যায়ঃ বলো কি?

ঠিকই বলছি।—কল্পনা দেবী বললেন ঃ আর তুই কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হয়ে, ডাকসাইটে খেলোয়াড় হয়ে এবং বাঘা ছাত্রনেতা হয়ে চিঁচিঁ করছিস! বাইরের লোক

শুনলে তোর মান-ইজ্জৎ একেবারে ফর্সা।

কী আপদ! কী আপদ! ভাবার চোখ ততক্ষণে ছোট হয়ে এসেছে। চোখ পিটপিট করতে করতে হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠলো,—হরে—, এই হরে—, ও হরে—! নাঃ, মর্কটটা গেল কোথায় অ্যাঁ!

উচ্চিংড়ের মতো লাফাতে লাফাতে হরি এসে হাজির,—আমারে ডাকতিচেন, দাদাবাবু?

ভাবা মুখ ভেংচে ওঠে,—ডাকতিছি না তো কি তোর ছেরাদ্দের মন্তর পড়তিছি?

বিরলকেশ টাকটা একঝলক চুলকে নিয়ে হরি বিগলিত কণ্ঠে বললে,—ও আমার কবে হইয়ে গেছেন, দাদাবাবু! এই বয়েসে আবার হলি নোকে কবে কি?

ভাবা বিপন্ন কণ্ঠে বললে,—শুনলে মামণি শুনলে, লম্বোকর্ণটা বলে কি? ওর পুনরায় শ্রাদ্ধ হলে নাকি নোকে টিটকারি দেবে! নাঃ, বঙ্গভাষার বারোটাই বাজলো! এই শোন্, বড় বড় দুই গেলাস জল নে আয়। তাড়াতাড়ি আন্। খাবার জল। খবরদার, তোর বাথরুমের জল আনবি নে।

কল্পনা দেবী হাসিতে ফেটে পড়েন। আর ভাবা বসে তেমনি চোখ পিটপিট করতে থাকে।

একটু পরেই নাচতে নাচতে হরি ঘরে ঢুকলো। তার কাঁধে জলের মস্ত এক কাচের জার, আর হাতে পেল্লাই এক কাচের গেলাস।

ভাবার চোখ পিটপিটানি বন্ধ। সে হেঁকে উঠলো,—এই, এটা কি অ্যাঁ?

হরি বিরলকেশ মস্তকটা আবার একঝলক চুলকে নিলে,—কেনে, জল! তুমি তো জল খাতি চাতিছিলে।

ভাবা খেঁকিয়ে উঠলো,—জল খাতি চাতিছিলাম বলে তুই দুনিয়ার তাবৎ জল এনে হাজির করবি? কবে কোন্ ফাঁকে যে তোকে আমি পরলোকে পাঠাবো, তা আমি নিজেও টের পাবো না!

হরি এবার প্রকাশ্যেই হইহই করে ঘর্মাক্ত টাক চুলকোতে আরম্ভ করলো।

হাসতে হাসতে কল্পনা দেবীর চোখে তখন জল এসে গেছে।

আঃ! ঢকঢক করে দুই গেলাস জল শেষ করে ভাবা যেন অনেকটা ধাতস্থ হলো। তারপর মামণির দিকে ফিরে বললো,—হাসি রাখো তো বাপু! বিপদের সময় হাসি দেখলে গা জ্বালা করে। তোমার ঐ হেঁয়ালিটার একটু ব্যাখ্যা দাও তো শুনি। ছাত্রনেতা হওয়ার সঙ্গে আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর সম্পর্কটা কি?

কল্পনা দেবী একটু সামলে নিয়ে চোখমুখ মুছতে মুছতে বললেন,—যথেষ্ট সম্পর্ক। প্রকাশ্য মিটিংয়ে তুই বক্তৃতা দিস, বিপক্ষ দলের সঙ্গে সমানে বাকযুদ্ধ করিস, সেই তুই কিনা আদালতে সাক্ষি দিতে হবে শুনে চিৎ হয়ে পড়েছিস।

মুখ গোমড়া করে ভাবা কয়েক মুহূর্ত কি ভাবলে, তারপর চিন্তান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে,—আচ্ছা মামণি, তুমি কখনো নেতাগিরি করেছ? প্রকাশ্যে বক্তৃতা দিয়েছ?

—অ্যাঁ আমি? বলিস কি? রামো রামো!

হুঁ, বুঝলাম। তা আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষি দিয়েছ কখনো?—বিরস বদনে ভাবা আবার প্রশ্ন করে।

—তুই কি পাগল হলি? আমি যাব সাক্ষি দিতে? কোন্ দুঃখে! এ মামলা হচ্ছে সম্পূর্ণ এক আলাদা ব্যাপার।

চোখ পিটপিট করতে করতে ভাবা বলল,—হুঁ, বুঝলাম। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কি—তুমি নেতাগিরি করো নি, বক্তৃতা করো নি, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষিও দাও নি। তাহলে ও দুটোর মধ্যে সম্পর্কটা তুমি বুঝলে কি করে?

কল্পনা দেবী থ। শেষে ককিয়ে উঠলেন,—কী কাণ্ড! কী কাণ্ড! তুই হলি একটা—তুই হলি একটা—

আস্ত গবেট!—ভাবা পাদপূরণ করে।

মাতৃস্নেহে উদ্বেল কল্পনা দেবী ভাবার মাথাটা কোলের কাছে নিয়ে বলেন,—তুই আমার হীরের টুকরো ছেলে। কোটিতে একটা মেলে না। তোকে যে গবা বলবে, সে মহাগবা।

মামলায় ভাবার সাক্ষি দেবার দিন এসে গেল।

প্রথম দিকের দুর্ভাবনাটা ভাবা কাটিয়ে উঠেছে। সরকার পক্ষে সোমকাকু আছেন, এটা মস্ত ভরসার কথা। তারপর এ কয়দিন বিস্তারিত আলোচনা করে সে বুঝেছে, ব্যাপারটা যত ঘোরালো মনে হয়েছিল, তেমন কিছু নয়।

তবু কথায় বলে, না আঁচালে বিশ্বাস নেই।

কল্পনা দেবী ও ডাঃ রায়ের ইচ্ছে, তাঁদের দুজনের কেউ খোকনের সঙ্গে যান।

সোম সাহেব বাধা দিলেন। ডাঃ রায়কে লক্ষ্য করে বললেন,—তোমাদের আক্কেল দেখে বলিহারি যাই। কোথায় তোমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করবে, বলতে পার? গাড়িতে, না বার লাইব্রেরীতে? মামলায় তোমরাও সাক্ষী। অতএব এজলাসে ঢুকতে পারবে না। তাছাড়া তোমাদের কাণ্ড দেখে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। জোয়ান ছেলে, দুনিয়া চুড়ছে। আর তোমরা কিনা বডিগার্ড হিসেবে ওর সঙ্গে আদালতে যাবে!

আদালত-কক্ষে তাঁদের ঢোকা চলবে না, কল্পনা দেবী বা ডাঃ রায়ের এটা জানা ছিল না। তাঁরা নিরস্ত হলেন।...

বিরাট মামলা। আদালত-কক্ষ লোকে লোকারণ্য। উকিল, ব্যারিস্টার, প্রেস-রিপোর্টার ও অন্যান্য লোকে গিজগিজ করছে।

ডাক পড়তে ভাবা দুরুদুরু বুকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে উঠলো।

তার অসামান্য স্বাস্থ্যশ্রী ও মুখশ্রীর বুদ্ধিদীপ্ত কমনীয়তা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সরকার পক্ষের কৌঁসুলি সোম সাহেবের প্রশ্নের জবাবে ভাবা সংক্ষেপে বলে গেল তার জীবনের ইতিহাস—জঙ্গলের জীবন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত।

মুগ্ধ চোখে সবাই তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। এই

তাহলে সেই সেরা ছাত্র, সেরা খেলোয়াড় ও নামকরা ছাত্র-নেতা ভবেন রায়! কিন্তু কী বিচিত্র তার জীবনের ইতিহাস!

সোম সাহেবের প্রশ্নের জবাবে ভাবা একের পর এক বলে গেল, কিভাবে নরহরি ও জগদম্বা একাধিকবার তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে, তার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, তাকে ঘরছাড়া করেছে......

সরকার পক্ষের জেরা শেষ হয় একসময়।

এবার বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলি উঠলেন। দু-একটা নির্দোষ প্রশ্নের পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—আচ্ছা, রায় বাড়িতে এসে আপনার জ্ঞানচক্ষু যখন উন্মীলিত হলো, তখন জগদম্বা দেবী ও নরহরিকে আপনার কেমন লাগতো?

বিবাদী পক্ষের কৌসুলির ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ভাবা গায়ে না মেখে বললে,—ভাল না।

—কেন?

—ওরা আমায় দেখলেই কটমট করে তাকাতো। আমি পালিয়ে যেতাম। পারতপক্ষে ওদের মুখোমুখি হতাম না।

—হুঁ, আর এটা নিশ্চয়ই ডাঃ রায় ও মিসেস রায়কে রং চড়িয়ে বলতেন, তাই না?

ভাবা থতমত খেয়ে যায়। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে,—কক্ষণো না। আমি কিছুই বলতাম না। নালিশ করার স্বভাব আমার কোনকালেই নেই।

আচ্ছা,—কৌঁসুলি প্রশ্ন করেনঃ আপনি যখন বুঝতে শিখলেন, তখন ডাঃ রায় ও মিসেস রায়ের সঙ্গে নরহরি ও জগদম্বা দেবীর সম্পর্ক কেমন ছিল?

সরল মনে ভাবা জবাব দেয়,—খারাপ মনে হয়নি।

এর পর আরো কয়েকটা উলটোপালটা প্রশ্ন করার পর বিপক্ষ কৌঁসুলি প্রশ্ন করলেন,—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, নিঃসন্তান রায় দম্পতির যাবতীয় সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ন্যায়তঃ ধর্মতঃ ও আইনতঃ তাঁদের ভাগ্নে নরহরিরই প্রাপ্য। নয় কি? কিন্তু আপনি আসার কিছুকাল পর থেকেই নরহরি ও জগদম্বার প্রতি রায় দম্পতির মনোভাব ও আচরণ সম্পূর্ণ পালটে যায়. তাঁরা নরহরি ও জগদম্বার প্রতি যারপরনাই রুষ্ট ও বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। ঐ সময় তাঁরা নরহরিকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্যে আপনাকে পোষ্য-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। কেমন কিনা? আমার প্রশ্ন, রায় দম্পতির মনোভাবের ঐ আমূল পরি-বর্তনের ব্যাপারে আপনার ভূমিকাই কি মুখ্য ছিল না? আপনিই কি সর্বতোভাবে দায়ী ছিলেন না? যদি বলি. আপনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম কায়দায় নানারকম ফন্দিফিকির করে ধীরে ধীরে রায় দম্পতির মন নরহরি ও জগদম্বার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিয়েছিলেন, তাহলে আপনি কি বলবেন? এ কাজটা আপনি করেছিলেন একটামাত্র উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য —তা হলো, রায় দম্পতির যাবতীয় সম্পত্তি কুক্ষিগত করা। তাই নয় কি? জবাব দিন।

কিন্তু কে জবাব দেবে? ভাবা স্তম্ভিত বিহ্বল। যেমন রাগে ও অপমানে. তেমনি দুঃসহ ব্যথায় সে মূক হয়ে গেছে। এত বড় জঘন্য মিথ্যা ও ব্যক্তিগত কুৎসার সে কি জবাব দেবে? এর তো আগাগোড়া সবটাই মিথ্যে! ব্যক্তিগত এই একটা ব্যাপারে সে চিরকাল অসহায়, আত্মরক্ষা করতে শিখলো না।

সমস্ত রক্ত বুঝি ভাবার মাথায় গিয়ে উঠেছে...ছি ছি ছি, এরা এত নোংরা কুৎসিত! সমস্ত মিথ্যে জেনেও তার গায়ে পাঁক মাখছে!...উঃ মাথাটা কেমন করছে!...বাবু বা মামণি সঙ্গে থাকলে খুব ভাল হতো...

ইতিমধ্যে সোম সাহেব লাফিয়ে উঠেছেন। বিচার-পতিকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—বিরোধী পক্ষের কৌঁসুলির এইসব অবান্তর ও অসত্য প্রশ্ন ও মন্তব্যের আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি।

বিচারপতি মাথা নাড়লেন। বিরোধী পক্ষের কৌঁসুলিকে জিজ্ঞেস করলেন,—মূল মামলার সঙ্গে এই জাতীয় প্রশ্নের সম্পর্ক ও সঙ্গতি কোথায়?

বিরোধী কৌঁসুলি বললেন,—সম্পর্ক খুবই নিকট এবং অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। আমি দেখাতে চাই, অপরিসীম নৈরাশ্যবোধ থেকেই নরহরি পরবর্তীকালে অসৎপথে পা বাড়িয়েছিল। পিতৃহীন তরুণ নরহরি বিধবা মায়ের সঙ্গে মাতুলালয়ে মামা-মামীর অপত্য স্নেহে মানুষ হচ্ছিল। কোথাও বিন্দুমাত্র অশান্তি ছিল না। এই যুবক রায় পরি-বারে আসার পরেই আরম্ভ হলো অশান্তি। যুবকটি যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতকুলশীল তা বোধহয় বলার দরকার করে না এবং ওর ক্রিয়াকলাপ থেকে গুরুতর সন্দেহ হয়, হীন-বংশজাতও। ও অত্যন্ত চতুর, কুচক্রী এবং হিংস্র। ওর ঐ সুদর্শন চেহারার নীচে যে হিংস্রতা ও ধূর্ততা লুকিয়ে আছে তা কল্পনাতীত। এটা বংশগত ও বন্য জীবনের সম্মিলিত ফল বলে আমি মনে করি। আমি প্রমাণ করবো যে, রায় দম্পতির সম্পত্তি ভোগদখলের হীন লালসা দ্বারা ও পূর্বাপর চালিত হয়েছে এবং ওর জঘন্য কারসাজির ফলে রায় পরিবারের সুস্থ স্বাভাবিক আবহাওয়া কিছু-কালের মধ্যেই আমূল পরিবর্তিত হয়. নরহরি ও জগদম্বা রায় দম্পতির স্নেহ-ভালবাসা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। এর ফলে ওদের মনে কী পরিমাণ অসহায়তা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়. তা সহজেই অনুমেয়। নরহরি যে পরবর্তীকালে বিপথগামী হয়েছিল. তা বহুলাংশে এই নৈরাশ্যসঞ্জাত এবং আমি তো প্রমাণও করবো। এই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নরহরির বা তার মায়ের অপরাধের গুরুত্ব বিচার করা উচিত এবং সেইটাই প্রকৃত ন্যায়বিচার বলে আমি মনে করি।

ভাবা বুঝি পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। নিথর নিস্পন্দ সে। আঘাতটা এত প্রচন্ড, এত নির্মম ও মর্ম-ভেদী যে, সে বুঝি মূক বধির হয়ে গেছে। বোধশক্তিও লুপ্ত। শুধু ভেতরে ভেতরে চলেছে তীব্র আবেগের অসহ্য জ্বালা, সমস্ত অন্তর তা মন্থন করছে।

কিন্ত বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। মস্তিস্কের কোষে কোষে অবিরত আঘাত হানছে কয়েকটা কথাঃ তুমি অজ্ঞাত-

কুলশীল....হীনবংশজাত...চতুর....কুচক্রী....ধূর্ত...হিংস্র...বন্য ...সম্পত্তি ভোগদখলের হীন লালসা তোমার...

নিরস্ত্র অসহায় ভাবা। মাথার মধ্যে তার তীব্র যন্ত্রণা।

বিরোধী কৌঁসুলির বক্তব্য শেষ হতেই সোম সাহেব উঠে দাঁড়ান। বললেন,—ওঁর ঐ দীর্ঘ বক্তৃতা যে কি পরিমাণ অবাস্তব, মিথ্যা, অন্তঃসারশূন্য ও উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত, তা সরকার পক্ষের অন্যান্য সাক্ষীদের, বিশেষতঃ ডাঃ রায় ও কল্পনা দেবীর সাক্ষ্য থেকে পুরোপুরি প্রমাণিত হবে।

এর পর সোম সাহেব তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে ভাবা কত বড় উন্নতমনা মহৎচরিত্রের যুবক, একের পর এক অজস্র দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু এ সবের কোন কিছুই ভাবার কানে ঢুকছে বলে মনে হয় না। কাঠগড়ার রেলিং দুহাতে চেপে ধরে বিস্ফারিত চোখে সে তাকিয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

সোম সাহেব এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি। হঠাৎ ভাবার দিকে নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর মনে হলো, ভাবা খুব কষ্ট পাচ্ছে। তাঁর অনুরোধে সেদিনের মতো সাক্ষ্যগ্রহণ স্থগিত রাখা হলো।

সোমসাহেব গিয়ে ভাবার কাঁধে হাত রেখে বললেন,—খোকন, আজকের মতো আদালতের কাজ শেষ। তুমি বার লাইব্রেরীতে গিয়ে বসো, আমি এক্ষুণি আসছি।

অপরের কথা সাময়িকভাবে বোঝার মতো ক্ষমতা ভাবার তখনো বোধহয় সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। কাঠগড়া থেকে সে নেমে এল, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা ধরে নীচে নেমে রাস্তায় গিয়ে পড়লো......

রাস্তা ধরে ভাবা চলেছে...কোথায় চলেছে, জানে না। মন বিকল। মস্তিষ্কের কোষে কোষে চলেছে ঐ কথাগুলোর অনুরণন ঃ ও অজ্ঞাতকুলশীল...ও হীনবংশজাত...ও চতুর... কুচক্রী...ধূর্ত...ও হিংস্র...বন্য...ওর সম্পত্তি ভোগদখলের হীন লালসা......

উঃ কী কষ্ট! এক দানব যেন মাথার ভেতর হাতুড়ির ঘা মারছে! দ্রুতপায়ে ভাবা এগিয়ে চলে...

যেতে যেতে পথচারীরা অবাক চোখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে ঃ কে ঐ যুবক—সুদর্শন স্বাস্থ্যবান দীর্ঘদেহী—মাঝ রাস্তা দিয়ে চলেছে? চেহারা বেশভূষা থেকে বোঝা যায়, সম্ভ্রান্তবংশীয় শিক্ষিত। বাস, ট্যাক্সি, লরি, প্রাইভেট কার হর্নের পর হর্ন দিচ্ছে, ট্রাম ঘণ্টা বাজাচ্ছে—কিন্তু ছেলেটির কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, হেঁটে চলেছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

কোন কোন পথচারীর মুখ থেকে স্বগতোক্তি বেরিয়ে আসেঃ আহা রে, যে কোন মুহূর্তে গাড়ির নীচে শেষ হয়ে যাবে!

এদিকে সোম সাহেব বার লাইব্রেরীতে এসে ভাবাকে দেখতে না পেয়ে ধরে নিলেন, ও বাড়ি চলে গেছে। নিশ্চিন্ত মনে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি গেট পার হতে চলেছে. হঠাৎ তিনি দেখেন, ভাবার গাড়ির ড্রাইভার মোহনলাল দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি এখানে? খোকন কোথায়?

দাদাবাবুর জন্যেই তো দাঁড়িয়ে আছি।—বিস্ময় মোহনলালের কণ্ঠেও।

—বলো কি? কোর্ট-রুম থেকে সে তো অনেকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে! কী কান্ড! ও কোথায় গেল?

সোম সাহেব গাড়ি থেকে নেমে আবার ঢুকলেন ভেতরে।

না, ভেতরে ও কোথাও নেই।

শোকে আকুল রায় পরিবার। গোটা বাড়িটা কাঁদছে।

ভাবা ফেরে নি। তার খোঁজও পাওয়া যায় নি। পুলিসের ওয়ারলেস ভ্যান ঘুরছে, থানায় থানায় খবর গেছে।

পাগলিনীর মতো কল্পনা দেবী কাঁদছেন। বসনভূষণ অসংবৃতা, শরমের বালাই নেই। খোকনের অসংখ্য স্মৃতি তাঁকে পাগল করে তুলছে, আর ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠছেন! তিনি ঃ ওরে খোকন, সোনমণি আমার, ফিরে আয়...ফিরে আয়...তোকে ছেড়ে আমি তো বাঁচবো না রে...কখনো বা হাউহাউ করে কেঁদে উঠছেনঃ ও সাক্ষি দিতে যেতে চায় নি, ছটফট করেছে...ওরে খোকন, তাই কি তুই অভিমান করে চলে গেলি...ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়...আর তোকে পাঠাবো না...তোকে আমি বুকে চেপে রাখবো...কখনো বা তিনি হাহাকার করে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ছেন ঃ ওরে খোকন, তুই যে আমার হীরের টুকরো ছেলে...মামণির কান্না তুই সইতে পারিস নে...ওরে একবার এসে দেখে যা, তোর মামণি কিভাবে কাঁদছে...ওরে ফিরে আয়...ফিরে আয়...তোকে ছেড়ে আমি যে শেষ হয়ে যাবো......

ডাঃ রায় নীরবে অঝোরে কাঁদছেন। কল্পনা দেবীর কথাগুলো শেলের মতো এসে বিঁধছে আর হু-হু করে কেঁদে উঠছেন। প্রাণপণে তিনি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করছেন, পরক্ষণে খোকনের মিষ্টি স্মৃতি তাঁকে অস্থির করে তুলছে, তিনি কাঁদছেন আকুল হয়ে।

শোকাচ্ছন্ন সোম সাহেব মাঝে মাঝে চোখ মুছছেন। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে তাঁর।

হরিহরবাবু থেকে ঠাকুর, ঝি, চাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার, যে যার অন্ধকার কোণে বসে কাঁদছে। অমন দাদাবাবু আর হয় না।

রাজা, বালু, কেলো, টম, মিনি ও পাখি চুপ করে বসে আছে। কি ব্যাপার, তারা বুঝতে পারছে না, তবে গুরুতর কিছু তা বুঝছে। তারা গুরুজীর অপেক্ষা করছে, সে এলে শুনবে।

রায় পরিবারে কেউ কাউকে সান্ত্বনা দেবার নেই।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেল।

ভাবার খবর নেই।

এর মধ্যে কল্পনা দেবী একবার মূর্ছা গেছেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার হয়। শোকের অতলে ডুবে গেছে গোটা বাড়িটা। নিঝুম নিষ্প্রাণ অন্ধকার। মাঝে মাঝে বুকফাটা ক্ষীণ আর্তিতে কেঁপে উঠছে থরথর করে।

সোম সাহেব মাঝে মাঝে ফোন করছেন পুলিস হেড কোয়ার্টারে। না, কোন খবর নেই।

ডাঃ রায় যেন পাষাণ হয়ে গেছেন। দুই চোখের পলকহীন প্রার্থনা শুধু পাখা মেলে উড়ছে মহাকাশের পথে পথে।

ঢং—ঢং—ঢং—মধ্যরাত্রি পার হলো।

সাড়ে বারোটা—একটা—দেড়টা—দুটো—। প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা॥ প্রতীক্ষার মর্মদাহে হৃৎস্পন্দন বুঝি থেমে আসতে চায়। ডাঃ রায় মাঝে মাঝে গিয়ে কল্পনা দেবীর নাড়ী পরীক্ষা করছেন।

টিকটিক—টিকটিক—নিঝুম রাত এগিয়ে চলেঃ আড়াইটে—তিনটে—

হঠাৎ জোরালো হেডলাইট আর হর্নের শব্দে অন্ধকার নৈঃশব্দ্য খান খান হয়ে গেল। ফটক পার হয়ে পুলিস ভ্যান ঢুকছে।

বিহ্বল আনন্দে সমস্ত বাড়িটা চিৎকার করে উঠলোঃ পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!

আলুথালু বেশে কল্পনা দেবী ছুটে এসে খোকনকে জড়িয়ে ধরে আবার কেঁদে উঠলেন নতুন করে।

কিন্তু ভাবা নির্বাক। কল্পনা দেবীর কান্না তার মনে কোন সাড়া তুললো বলে মনে হয় না। চোখ বড় বড় করে অর্থহীন বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে।

ডায়মণ্ডহারবার রোডে সরিষা ছাড়িয়ে ওকে রাত পৌনে দুটো নাগাদ পাওয়া গেছে। দ্রুত পায়ে ও তখন দক্ষিণ মুখো হেঁটে চলেছে। ও যে অক্ষত আছে, এইটেই সবচেয়ে ভাগ্যের কথা। গভীর অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো রাস্তার মাঝখান ধরে হাঁটছিল—বাহ্যজ্ঞানরহিত। রাত্রিবেলায় ও সব রাস্তায় ঐভাবে হাঁটার সম্ভাব্য পরিণাম ভেবে সবাই শিউরে উঠলেন।

ওকে যখন ধরা হয়, বাধা দেয় নি। ভ্যানে তোলার সময়ও কোন কথা বলে নি। এমনকি ভ্যানে করে ওকে কোথায় নেওয়া হচ্ছে, তাও একটিবার জিজ্ঞেস করে নি। সারাক্ষণ অপ্রকৃতিস্থের মতো মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকিয়েছে!

বাড়িতে এসেও সেই একই অবস্থা—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ওর অন্ধকারে নিবদ্ধ।

সোম সাহেবের কাছ থেকে ডাঃ রায় আনুপূর্বিক শুনেছেন আদালতের ঘটনাবলী। খোকনের ফুলের মতো কোমল নিষ্পাপ মনের ওপর তার আঘাতের প্রচণ্ডতা ও প্রতিক্রিয়া ডাঃ রায়ের বুঝতে অসুবিধা হয় না। সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো এই সব জঘন্য ব্যক্তিগত আঘাত ও আক্রমণকে কিভাবে প্রতিরোধ ও প্রত্যাঘাত করতে হয়, ওকে তা কোনভাবেই শেখানো গেল না। তাই বিনা প্রতিরোধে তা সমস্ত প্রচণ্ডতা নিয়ে তারা আবেগপ্রবণ সত্তাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। সোমের এসব জানার কথা নয়। কিন্তু তাঁরা সব জানা সত্ত্বেও কেন খোকনকে একলা আদালতে পাঠালেন, সেই অনুশোচনার প্রতিকারহীন জ্বালায় ডঃ রায়ের অন্তর পুড়তে থাকে।

উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত করার জন্যে তিনি ভাবাকে ওষুধ দিলেন। ধীরে ধীরে ভাবা ঘুমিয়ে পড়লো। আর তার শয্যাপার্শ্বে জেগে বসে রইলেন কল্পনা দেবী, ডাঃ রায় ও সোম সাহেব। নিরুপায় শোকে নীরবে কেঁদে চলেছেন কল্পনা দেবী।

ভাবার চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসা করছেন ডাঃ রায় নিজে।

আঘাতের প্রাথমিক ধাক্কা ভাবা সামলে উঠেছে বটে, কিন্তু কি এক বিষণ্ণতা ও অবসাদ তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নিস্পৃহ নির্বাক সে সবসময়, একান্ত প্রয়োজনে দু-একটা ছাড়া কথা বলে না। কত বোঝানো হয়েছে, কত উপদেশ ও সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সে নির্বিকার, নীরবে শুধু শুনে যায়, এমনকি বক্তার মুখের দিকেও একবার তাকায় না।

ইতিমধ্যে ভাবার অনুগামী ছাত্রদের কাছ থেকে খোঁজ এসেছে, খোঁজ করেছে বস্তির মানুষেরাও। হরিহরবাবু সবাইকে মিথ্যে করে জানিয়ে দিয়েছেন, খোকাবাবুর শরীর খারাপ, তাই কলকাতার বাইরে গেছেন বায়ুপরিবর্তনের জন্যে।

এই খবরে সবচেয়ে বেশী অবাক হয় অনিতা। তার মনে খটকা লাগে। ইত্যবসরে আলোচনা-চক্রে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে অনিতার কাছে ভাবা আর 'ভবেনবাবু' নেই, তেমনি ভাবার কাছেও অনিতা নেই 'মিস সেন'। সম্বোধন দুটি যথাক্রমে 'ভবেনদা' ও 'অনিতা'য় উন্নীত হয়েছে আর 'আপনি' 'তুমি'তে পরিণত হয়েছে।

অনিতার অবাক হবার সংগত কারণ রয়েছে। সেদিন ভবেনদা তাকে বলেছিল, কি একটা মামলায় পরদিন তাকে সাক্ষি দিতে হবে। ওটা সেরে সে যাবে আলোচনা-চক্রে। সে সময় তার তো কিছুমাত্র অসুস্থতার লক্ষণ ছিল না। অথচ পরদিন থেকেই সে অনুপস্থিত। তাহলে কি সাক্ষি দিতে গিয়ে কোন বিপদ ঘটলো, না কি অন্য কোন রহস্য আছে? কিন্তু সন্দেহভঞ্জনেরও তো কোন উপায়ও নেই। ওই খবরের পর কোন লজ্জায় সে যাবে রায়বাড়িতে? অতএব অভিমানে ও দুর্ভাবনায় অনিতা ছটফট করে বেড়ায় আর সবার অলক্ষ্যে চোখের জল মোছে।

ভাবার অবস্থার বিশেষ কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন নেই। ইতিমধ্যে টেলিগ্রাম পেয়ে দিল্লী থেকে ডঃ নাগ এসেছেন, আসাম থেকে এসেছেন কল্পনা দেবীর সেজো ভাই মৃগেন্দ্রনারায়ণ। তাঁদের চেষ্টাতেও কোন ফল হয় নি।

কল্পনা দেবী আকল হয়ে, অধ্যাপক গাঙুলী কবে কলকাতায় ফিরবেন, সেই আশায় দিন গুনছেন। ইতিহাস কংগ্রেসে যোগ দিতে তিনি বাইরে গেছেন। ভাবার খবর কিছুই জানেন না। কল্পনা দেবীর মাতৃহৃদয় যেন বলছেঃ আর কেউ নয়, আর কেউ নয়, খোকনকে যদি কেউ নিরাময় করতে পারেন তো তিনি অধ্যাপক গাঙুলী। সেবার সরমার মৃত্যুর ফলে খোকনের মধ্যে যে গুরুতর ভাবান্তর দেখা দিয়েছিল, তিনি কি সুন্দরভাবেই না তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ রায় অবশ্য অতখানি আশাবাদী নন। খোকনের অসুখটা যখন পুরোপুরি মনোরোগ, তখন মনের

কোন্ তন্ত্রীতে কিভাবে কতটুকু আঘাত করলে স্পষ্ট নির্দিষ্ট সাড়া জাগবে, তা যদি সুরেশ বুঝতে পারে, তবেই সফলতা সম্ভব।

কল্পনা দেবী প্রায় রোজই অধ্যাপক গাঙুলীর খোঁজ করেন। আজো সেই প্রশ্ন। ডাঃ রায় বলেন,—হ্যাঁ, খবর নিয়েছি। আজই সে ফিরছে।

পরদিন ভোরবেলায় ছুটতে ছুটতে অধ্যাপক গাঙুলী এসে হাজির। তাঁকে দেখেই, এতদিন পরে এই প্রথম কি এক অনির্বচনীয় প্রত্যাশায় কল্পনা দেবীর মন ভরে উঠলো।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে অধ্যাপক গাঙুলী জিজ্ঞেস করলেন,—কি হয়েছে খোকনের? ট্রেন লেট, তাই বাড়ি ফিরতে রাত প্রায় কাবার। এসে শুনলাম খোকনের গুরুতর অসুস্থতার কথা। কি হয়েছে?

ডাঃ রায় ও কল্পনা দেবী ধীরে ধীরে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা, মায় সাক্ষি দিতে যেতে ভাবার তীব্র অনিচ্ছা সবই বলে গেলেন।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু শোনার পর অধ্যাপক গাঙুলী চুপ করে বসে থাকেন বহুক্ষণ। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছেন! শেষে একসময় বললেন,—খোকনের সঙ্গে আমি একান্তে কথা বলবো। কিন্তু ও যেন বুঝতে না পারে যে, এ ব্যবস্থাটা পূর্বনির্দিষ্ট। তাই আপনারাও চলুন বৌঠান, তারপর একসময় অবস্থা বুঝে সহজভাবে সরে আসবেন।

ভাবা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। দুই হাত মাথার নীচে, দৃষ্টি ছাদে নিবদ্ধ। ডাঃ রায় ও কল্পনা দেবী সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, অধ্যাপক গাঙুলীকে দেখেই ভাবার চোখে যেন একটু খুশির চঞ্চলতা জেগে উঠলো। অথচ আর সবার বেলায় কোন পরিবর্তনই ঘটে না, দৃষ্টিতে সেই একান্ত নিস্পৃহ নির্জীবতা।

ভাবা মাথার নীচে থেকে হাত দুটো টেনে নিলে।

অধ্যাপক গাঙুলী মৃদু হেসে ভাবার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন,—তোমার কি হয়েছে, খোকন?

ম্লান চোখে ভাবা একবার তাঁর দিকে তাকায়। কোন কথা বলে না।

এটা লক্ষ্য করে কল্পনা দেবীই শুধু নন, ডাঃ রায়ের মনেও আশা জাগে, সুরেশ হয়তো সফল হতেও পারে।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে অধ্যাপক গাঙুলী আবার বললেন,—কই খোকন, জবাব দিলে না তো? এত দিন পরে ফিরলাম। জানো বোধহয়, আমি হিস্ট্রি কংগ্রেসে গিয়েছিলাম? জানো না?

ভাবা ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে জানায়—সে জানে।

আর আনন্দের বান ডাকে ডাঃ রায় ও কল্পনা দেবীর মনে।

তুমি শুনলে খুশী হবে, খোকন,—অধ্যাপক গাঙুলী বলেনঃ সেখানে আমি যে পেপারটা পড়েছিলাম, তার মৌলিকত্বের সবাই প্রায় কম-বেশী প্রশংসা করেছিলেন। তার বিষয়বস্তুটা তোমায় বলেছিলাম, মনে আছে?

ভাবা ঘাড় নেড়ে জানালে—মনে আছে।

—হ্যাঁ, আলোচ্য বিষয় ছিল ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের ওপর ইতিহাসের প্রভাবের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয়টা বিচার করার চেষ্টা করেছি। কোথাও যাতে কোন গোঁজামিল না থাকে, তার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে কিভাবে গবেষণা করেছি, তুমিও জান। কি, জানো না?

মাথা নাড়তে নাড়তে ভাবা ধীরে ধীরে উঠে বসলো।

আর পরম স্বস্তির সঙ্গে কল্পনা দেবী ও ডাঃ রায় একে একে উঠে গেলেন।

সেদিকে নজর না দিয়ে অধ্যাপক গাঙ্গুলী বলতে থাকেন তার গবেষণার বিষয়। বলতে বলতে তিনি অতীত থেকে বর্তমানে চলে আসেন। এবং জনজীবন থেকে ব্যক্তি-জীবনের। তারপর বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শনের প্রশ্নে।

ভাবার চোখেমুখে আগ্রহের আভাস স্পষ্ট। অধ্যাপক গাঙ্গুলীর কথা শুনতে শুনতে সে যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করছে।

অধ্যাপক গাঙ্গুলী তখন বলছেন,—তুমি তো জান খোকন, বৈজ্ঞানিক দর্শন মানুষের জীবনের কম্পার্টমেন্টাল ভাগ স্বীকার করে না।

উৎসুক কণ্ঠে ভাবা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে,—কি রকম?

এতদিন পরে ভাবা এই প্রথম এ ধরনের প্রশ্ন করলো।

অধ্যাপক গাঙ্গুলী বললেন,—ব্যাপারটা হলো, ট্রেনের কামরাগুলোর কথা চিন্তা করে দেখ। প্রত্যেকটি কামরা পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন। তার এক-এক কামরায় এক-একরকম বস্তু থাকতে পারে, এবং তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রও হতে পারে। মানুষের জীবনে কিন্তু এরকম বিভাগ চলে না, বৈজ্ঞানিক দর্শন অনুযায়ী তা অবাস্তব ও কৃত্রিম। কি, বুঝতে পারছো?

মৃদু কণ্ঠে ভাবা বলে,—আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।

বেশ, শোন।—অধ্যাপক গাঙ্গুলী বলেন ঃ অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ বাইরের সামাজিক জীবনে খুবই প্রগতিশীল, কিন্তু ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনে যৎপরোনাস্তি প্রতিক্রিয়াশীল। আবার এ-ও দেখা যায়, কেউ হয়তো বাইরের সামাজিক জীবনে বৈজ্ঞানিক জীবন-দর্শনের কথা বলে, যুক্তি-তথ্য ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের জয়ধ্বনি দেয় এবং সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মন্ত্র আওড়ায়, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রায়ই তা অনুসরণ করে না। প্রশ্ন হলো, একজন ব্যক্তির জীবনে সত্যিই কি একটা সম্ভব? পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র একাধিক মৌলিক সত্ত্বা কি থাকতে পারে মানুষের মধ্যে? বিজ্ঞান তা স্বীকার করে না। এ যেন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় এবং নিঃসন্দেহে তথাকথিত ঐসব সত্ত্বার মধ্যে একটি আসল, অন্যগুলি কৃত্রিম বা নকল।

ভাবার চোখের দৃষ্টিতে যেন সজীবতা ফিরে আসছে, জাগছে ঔৎসুক্য ও কৌতূহল।

অধ্যাপক গাঙ্গুলীর তা দৃষ্টি এড়ায় না। তিনি বলে চলেন,—তবে সব মানুষের জীবনেই যে এসব অভিনয় তা নয়। কিছু মানুষের জীবনে হয়তো তাই। তাদের ওটা বাইরের পোশাক, অন্তরের নয়। মুখোশও বলতে পার।

কিন্তু কারো কারো জীবনে হয়তো তা নয়। তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মধ্যে এই যে পার্থক্য দেখা যায়, তা মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়। পার্থক্যের কারণ অন্য। বৈজ্ঞানিক জীবন দর্শনে তাদের যে বিশ্বাস, তাতে তাদের হয়তো আন্তরিকতার অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানের ঐকান্তিক সচেতন প্রয়াসের। তার ফলে সংকটে পড়লে তাদের মধ্যে আসে বিভ্রম, ঘটে গুরুতর ভুল। বুঝতে পারছো?

ভাবা গভীর চিন্তামগ্ন, ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে...

এমনি করে দিনের পর দিন আলোচনা চলতে থাকে। ধীরে ধীরে ভাবার মনের ওপর থেকে কুয়াশা সরে যেতে থাকে, কাটতে থাকে আচ্ছন্নতা এবং ধীরে ধীরে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে থাকে।

আর রায় পরিবারে আবার ফিরে আসে আগেকার সেই স্বস্তি ও আনন্দ।

ভাবা শেষে একদিন স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠে বললে,—জানেন কাকু, বিবাদী পক্ষের উকিলের ওই সব জঘন্য বিষাক্ত কথা আমার চিন্তাভাবনা ও মস্তিষ্কের ক্রিয়াকে একদম অসাড় করে ফেলেছিল।

ভাবার কথা শুনে কল্পনা দেবী কেঁদে ফেলেন। ভাবা অবাক। মামণির গলা জড়িয়ে ধরে বলে,—তোমার আবার কান্নার কি হলো? জানেন কাকু, আমার মামণির ভেতরে না অশ্রুর সমুদ্র লুকিয়ে আছে! আমাকে নিয়ে তার শুধু কান্না।

কল্পনা দেবীর কান্নার বেগ আরো বেড়ে যায়। বিব্রত অবস্থায় পালিয়ে যান তিনি।

আর শান্ত হাসিতে অধ্যাপক গাঙ্গুলীর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি বললেন,—বিবাদী পক্ষের উকিলের যে কথা তুমি তুললে খোকন, সে সম্বন্ধে তোমাকে আরো ভাবতে হবে। একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, নিজের বৈজ্ঞানিক জীবনাদর্শ ও বাস্তবসম্মত বিচার-বিশ্লেষণ সম্পর্কে তোমার জ্ঞান অপ্রতুল ও অসম্পূর্ণ ছিল বলেই ঐ অবস্থা হয়েছিল। তুমি যদি পুরোপুরি সচেতন হতে, তোমার ভাবপ্রবণতা ও আবেগ যদি যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হতো, তাহলে বুঝতে, বিরোধী পক্ষের উকিলের ঐসব কথা কত মিথ্যা ও অন্তঃসারশূন্য, তাহলে একজন উকিলের তুচ্ছ কয়েকটা কথায় তোমার ঐ সাংঘাতিক অবস্থা ঘটতো না। এ বিষয়ে, আমার মনে হয়, তোমার আরো পড়াশুনো ও চিন্তাভাবনা দরকার, সেই সঙ্গে দরকার নিজের মনকে ঠিকমতো বিচার-বিশ্লেষণ করা, যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো এই রকম বিভ্রান্তি তোমাকে পেয়ে না বসে।

অধ্যাপক গাঙ্গুলীর কথায় সমর্থন জানিয়ে ভাবা বললে,—আপনার সমালোচনা ও বিশ্লেষণ আমি পুরোপুরি মানি। কিন্তু একটা কথা। আমি যে অজ্ঞাতকুলশীল, উকিলের এই কথা তো অস্বীকার করা যায় না এবং এরই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে উকিল যখন বলে আমার নীচ বংশে জন্ম, তখন তা-ই বা অস্বীকার করি কি করে!

স্বীকার-অস্বীকারের প্রশ্ন নয় খোকন,—অধ্যাপক গাঙ্গুলী বললেন: প্রশ্ন হলো তোমার ওপর ঐসব মন্তব্যের কিরকম প্রতিক্রিয়া ঘটে সেইটা। একটু আগে তো বললাম, তোমার ঐ আবেগ ও ভাবপ্রবণ স্পর্শকাতরতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে তিনি আবার বলেন,—কিছু মনে কোর না খোকন, তোমায় একটা প্রশ্ন করি! সত্যিই কি তুমি নিজের শৈশব-জীবনের রহস্য জানতে মনে-প্রাণে উদ্‌গ্রীব? একটা উকিলের সামান্য ফালতু কথায় তোমার যে অবস্থা হয়েছিল আর তার ফলে অন্যদেরও যে অবস্থায় পড়তে হয়েছিল, ভেবে দেখো তো তার জন্য তুমিই দায়ী কিনা? নিজের অজ্ঞাত অতীতকে জানার জন্যে তোমার মধ্যে যদি আন্তরিক তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকতো, তাহলে সে রহস্য-উদ্‌ঘাটনের জন্য উঠে-পড়ে লাগতে এবং এত দিনে হয়তো তা জেনেও যেতে, আর তাতে জানা যেত তোমার বংশ-পরিচয়ও।

হেঁট মাথায় ভাবা বসে থাকে কিছুক্ষণ। শেষে দৃঢ়-কণ্ঠে বললে,—আপনি ঠিকই বলেছেন। এজন্য আমার আগ্রহের অভাব ও ঔদাসীন্যই দায়ী। এবার আমি ওটার ফয়সালা না করে থামছি না।

॥ চার ॥

ভাবা আবার সুস্থ স্বাভাবিক—আগের মতোই প্রাণোচ্ছল, হাসিখুশী। পার্থক্য শুধু একটা ব্যাপারে। এবার সে সংকল্পে অটল—নিজের আদি পরিচয়, প্রাক্-ভল্লুকজীবনের রহস্য সে উন্মোচন করবেই, তারপর অন্য কাজ। আর ঢিলেমি নয়, গাঙ্গুলী কাকু ঠিকই বলেছেন—সে কে, ভালুকের হাতে পড়ার আগে সে কি ছিল এবং কিভাবেই বা ভল্লুকদের হাতে পড়লো, এটা জানার তীব্র আকাঙ্ক্ষা যদি তার থাকতো, তবে এতদিন কোন্ কালে এ রহস্যের কিনারা হতো।

গাঙ্গুলী কাকুর কথা মনে হলেই সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভাবার মাথা নত হয়ে আসে। সত্যি, মামণি ও বাবুর পরেই গাঙ্গুলী কাকু তার জীবনাকাশে তৃতীয় অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যার প্রজ্ঞার শান্ত দীপ্তি তার চলার পথকে আলোকিত করেছে এবং তার সামনে তুলে ধরেছে প্রকৃত জীবন-জিজ্ঞাসা। তাই তো আজ সে সুনির্দিষ্ট আদর্শ নিয়ে স্থির লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারছে। শুধু কি তাই, জীবনের গভীর বাঁকে বাঁকে বারে বারে সংকটের অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে চেয়েছে আর গাঙ্গুলী কাকুই তাকে উদ্ধার করেছেন তা থেকে। সাম্প্রতিক দুর্যোগের যে ঘূর্ণি হঠাৎ এসে তাকে বিপর্যস্ত করার উপক্রম করেছিল, শেষ পর্যন্ত গাঙ্গুলী কাকুই তো তাকে বাঁচালেন তা থেকে।

গাঙ্গুলী কাকু বলেছেন, তার শৈশবের আদি পরিচয় জানার নানা উপায় আছে। সেসবের মধ্যে সবচেয়ে সহজ উপায়টা আগে অবলম্বন করা উচিত। ওটা হলো পুরনো

খবরের কাগজে খোঁজ করে দেখা, সেখানে এমন কোন সংবাদ কখনো বেরিয়েছিল কিনা যা তার অন্ধকার রহস্যময় শৈশবের ওপর আলোকপাত করতে পারে। এ জাতীয় সংবাদ বেরুনোর সম্ভাবনা প্রায় ষোল আনা। একান্তই যদি খবরের কাগজে কোন সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহলেও ঘাবড়াবার কারণ নেই, তখন অন্যান্য কঠিন পন্থা গ্রহণ করা যাবে।

এই খবরের কাগজ ঘাঁটার কাজটা সে আগেও করেছে, কিন্তু ঐ সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা ও একাগ্রতার অভাব থাকায় কাজটা মোটেই বেশী দূর এগোয়নি। ঠিকই, এ ব্যাপারে তার মনের দিক থেকে কোন তাড়া ছিল না।

অতএব ভাবার কাজ শুরু হলো। প্রতিদিন সকালে খেয়েদেয়ে সে বেরিয়ে পড়ে সংবাদপত্র অফিসের দিকে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে তার কাজ—খুঁটিয় খুঁটিয়ে সে পরীক্ষা করে অতীতের খবরের কাগজগুলো।

মামণির পরামর্শ মতো এই তল্লাশির কালটা সে অনেকখানি কমিয়ে এনেছে। বর্তমান থেকে পেছনের ষোলটা বছর বাদ দিয়ে সে কাজ শুরু করেছে এবং এগোচ্ছে পেছনের দিকে।

মামণি যে হিসাবটা দিয়েছিলেন, তা খুবই যুক্তিসঙ্গত। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী সে যখন ভালুকের হাতে পড়ে, তখন বয়স তার তিন-চার বছরের বেশি হবার সম্ভাবনা খুবই কম। তার বেশি হলে কিছু-না-কিছু, অত্যন্ত অস্পষ্ট হলেও, নিশ্চয়ই তার মনে থাকতো—বিশেষ করে যে রকম তীক্ষ্ম তার স্মৃতিশক্তি। কিন্তু ভল্লুক-জীবনের আগেকার কোন কিছুই তার মনে নেই, শত চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারে না। শিকারীদের হাতে সে যখন ধরা পড়ে, তখন তার বয়স ছিল আট-ন বছর। আট বছর ধরে হিসাব করলে দেখা যায়, চার বছর বয়সেও যদি সে ভালুকের হাতে পড়ে থাকে, তাহলে তাদের সঙ্গে সে ছিল অন্ততঃ চার বছর। চোদ্দ বছর হলো সে শিকারীদের হাতে ধরা পড়েছিল। ভালুকদের সঙ্গে চার বছর আর চোদ্দ বছর, এই আঠারো বছর অনায়াসে বাদ দেওয়া যেতে পারে তল্লাশির কাজ থেকে।

বাবু ও গাঙ্গুলী কাকু ও মামণির এই হিসাবটা পুরোপুরি সমর্থন করেছেন।

কিন্তু সন্দেহের যাতে কোন অবকাশ না থাকে, তার জন্যে সে আঠারোর বদলে ষোল বছর বাদ দিয়ে তার পর থেকে তদন্ত শুরু করেছে।

কাজটা যেমন নীরস, তেমনি শ্রমসাধ্যও বটে, খুব তাড়াতাড়ি এগোনো দুষ্কর। কাজ করতে করতে ক্লান্ত ভাবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বস্তির মানুষদের জীবনযুদ্ধ! মনে পড়ে ছাত্র-আন্দোলনের সহকর্মী বন্ধুদের কথা। বেশি করে মনে পড়ে অনিতাকে। তারই একান্ত নির্দেশমতো অনিতার পড়াশুনো এগোচ্ছিল। কিন্তু তার এই অজ্ঞাতবাসের ফলে ওর পড়াশুনোর কি হচ্ছে কে জানে! বস্তির খবর সে গোপনে রাখে, কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু অনিতার ও ছাত্রবন্ধুদের খবর নেবার কোন ব্যবস্থা সে আজো করতে পারে নি।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবা আবার তল্লাশির কাজে মন দেয়। না, তার জীবনের এই রাহু-মুক্তির আগে অন্য কোন কাজ নয়—এ দায়িত্ব শেষ করার পর তবে অন্য কিছু। গাঙ্গুলী কাকুরও সেই পরামর্শ।

এমনি করে দিনের পর দিন চলে ভাবার নিরলস পরিশ্রম। কিন্তু কোন খবরই চোখে পড়ে না। সময় সময় সে যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে, নাঃ—খবরের কাগজ থেকে বোধহয় কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না!

তারপরেই হঠাৎ সে একদিন চমকে উঠলোঃ বিবর্ণ কাগজের পৃষ্ঠায় সংবাদদাতা-প্রেরিত এক লম্বা খবর! রুদ্ধশ্বাসে সে পড়তে থাকে সংবাদটা ঃ

'শিলিগুড়ি-দার্জিলিং সড়কে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত ট্যাক্সি-ড্রাইভারের সংজ্ঞালাভ'

'গত ২৯শে এপ্রিল শিলিগুড়ি-দার্জিলিং সড়কে সুক্‌নার পর বন্য হাতির আক্রমণে যে ট্যাক্সিটি গুরুতর দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিল, উহার চালক সর্দার গুলাব সিংয়ের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অবস্থা এখনও শঙ্কামুক্ত নয়। জবানবন্দিতে সে বলিয়াছে, সুক্‌না ছাড়াইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর হঠাৎ একদল বুনো হাতি জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং পরক্ষণে প্রকাণ্ড এক দাঁতালো হাতি শুঁড় উঁচাইয়া ট্যাক্সিটিকে আক্রমণ করে। উহার দেখাদেখি আরও দুই-তিনটি হাতি ছুটিয়া আসে এবং তাহাদের মিলিত আক্রমণে গাড়িটি গড়াইয়া পাশের খাদে পড়িয়া যায়। এই সময় সে অর্থাৎ গুলাব সিং গাড়ি হইতে ছিটকাইয়া পড়ে এবং সংজ্ঞা হারায়।

'আরও প্রশ্নের জবাবে সে জানায়, এক বাঙালী সাহেব দার্জিলিং যাইবার জন্য শিলিগুড়ি হইতে তাহার ট্যাক্সিটি ভাড়া করেন। সাহেবের বয়স হইবে ৩০/৩২ বৎসর। খুবই লম্বা-চওড়া চেহারা, গায়ের রং সাহেবদের মতই ফর্সা আর পরনে ছিল দামী সাহেবী পোশাক। সাহেবের সঙ্গে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী আর সাড়ে তিন বছর-চার বছরের এক বাচ্চা। মা-বাবার মত লেড়কাটিও ছিল খুব জোয়ান আর ভারী খুবসুরৎ। কুড়ি-বাইশ বছরের এক নেপালী চাকর তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। সাহেবের কথা হইতে গুলাব সিং তাহার নাম শুনিয়াছিল জঙ্গ বাহাদুর। গাড়ির সামনে ড্রাইভারের পাশের সীটে জঙ্গ বাহাদুর বসিয়া ছিল। দুর্ঘটনার সময় বাচ্চা ছেলেটি তাহার কোলে ছিল। সাহেবের কোন পরিচয় জানা নাই। তবে তাঁহাদের পোশাক-আশাক, চালচলন, কথাবার্তা ইত্যাদি হইতে গুলাব সিংয়ের মনে হইয়াছিল, তাঁহারা খুব দিলদার আমিরী লোক ছিলেন। সাহেব ও মেম সাহেব অনেক সময় বাংলা ছাড়া ইংরেজীতেও কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ট্যাক্সি ভাড়া করিবার সময় কোন দরদস্তুর করেন নাই, বরং বলিয়াছিলেন, সময়মত পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে বকশিস মিলিবে। তাঁহাদের সহিত লটবহর ছিল, তবে খুব বেশী নয়।

'প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গুলাব সিংয়ের আগেই নেপালী চাকর জঙ্গ বাহাদুরের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহার আঘাতও কম গুরুতর নয়। হাসপাতালে ভর্তি হইবার ছয়-সাত ঘণ্টা পরেই তাহার জ্ঞান ফিরিয়াছে সত্য, কিন্তু অদ্যাবধি সে একটি কথাও বলে নাই। প্রশ্ন করিলে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে। তাহাকে কথা বলাই-বার যাবতীয় চেষ্টাই এ পর্যন্ত নিষ্ফল হইয়াছে। ডাক্তার-দের আশঙ্কা, মাথায় সম্ভবতঃ গুরুতর আঘাত লাগায় নেপালী যবকটির শুধু বাক্‌শক্তিই লোপ পায় নাই, স্মৃতিভ্রংশও ঘটিয়াছে। কারণ স্মৃতিশক্তি ঠিক থাকিলে শুধু বাক্‌শক্তি লোপ পাইলেও সে লিখিয়া বা অন্যভাবে মনের ভাব জানাইতে পারিত। কিন্তু উহার কোনটাই সে করিতেছে না।

গুলাব সিংয়ের জবানবন্দি হইতে ঘটনার ও সওয়ারীদের, বিশেষ করিয়া শিশুটির, বিবরণ জানিবার পর পুলিশের পক্ষ হইতে ঘটনাস্থল ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বহু দূর পর্যন্ত পাহাড়-জঙ্গলে তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজ করা হইয়াছে, কিন্তু শিশুটির কোন খোঁজ পাওয়া যায় না, এমনকি রক্তমাংস-অস্থিপঞ্জরাদিরও কোন চিহ্ন মেলে নাই। তথাপি পুলিশ-মহল প্রায় নিঃসন্দেহ যে, শিশুটি দুর্ঘটনাজনিত অগ্নি-কাণ্ড হইতে রক্ষা পাইলেও সম্ভবতঃ বাঁচিয়া নাই। গভীর জঙ্গলের প্রতিকূল পরিবেশে মাংসাশী হিংস্র শ্বাপদের কবলে প্রাণ হারাইয়াছে।

'পরিশেষে দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, এই দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের মধ্যে একমাত্র সর্দার গুলাব সিং ছাড়া অন্য কাহারও পরিচয় অদ্যাবধি জানা যায় নাই। পুলিশ অবশ্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না।'

রুদ্ধশ্বাসে দীর্ঘ রিপোর্টটি শেষ করে ভাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। সে-ই কি তাহলে ঐ হারিয়ে-যাওয়া শিশু? মনে মনে সে হিসাব করে দেখে, আজ থেকে প্রায় ১৭ বছর ২ মাস ৯ দিন আগে ঘটেছিল ঐ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। দূর সেই দিনটিতে কি ঘটেছিল, সে কল্পনা করার চেষ্টা করে। সামনের সীটে জঙ্গবাহাদুরের কোলে ছিল শিশুটি। গাড়িটি খাদে গিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে জঙ্গ বাহাদুরের সঙ্গে সে-ও ছিটকে গিয়ে পড়ে। পরক্ষণে অসহায় মানবশিশুর আর্ত কান্নায় বুঝি গহন বনভূমি সচকিত হয়ে উঠেছিল। কাছে-পিঠে ছিল হয়তো এক ভল্লুকী। শিশুর কান্না শুনে সে ছুটে এসেছিল এবং মাতৃস্নেহে বুকে তুলে নিয়েছিল মানব-সন্তানটিকে। তারপর......

মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে ভাবা হঠাৎ যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। দ্রুত সে ওলটাতে থাকে খবরের কাগজের পেছনের পাতাগুলো।

৩১শে তারিখের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এসে ভাবার চোখ যেন আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে। নিজস্ব সংবাদদাতা-প্রেরিত আবার এক খবর :

'শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রোডে ভয়াবহ মোটর-দুর্ঘটনা

'দুইজন নিহত, আহত দুইজন'

'গত ২৯শে এপ্রিল শিলিগুড়ি-দার্জিলিং রোডে এক ভয়াবহ মোটর-দুর্ঘটনায় দুইজন নিহত হইয়াছে এবং আহত হইয়াছে দুইজন। দুর্ঘটনার স্থান সুকনা হইতে প্রায় মাইল খানেক দূরে এক বাঁকের মুখে। গাড়িটি তিন-চার শো ফুট গভীর পাশের খাদে গড়াইয়া পড়ে এবং উহার পেট্রল-ট্যাঙ্কে আগুন ধরিয়া যায়। রাস্তাটির দুই পার্শ্বে উপরে-নীচে বহু দূরবিস্তৃত গভীর জঙ্গল—এক দিকে পাহাড়, অপর দিকে খাদ।

'গাড়ির ভিতর হইতে দুইটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে—উহাদের একজন নারী, অপরজন পুরুষ। কিন্তু দেহ দুইটি অগ্নিদগ্ধ হইয়া এমনই বিকৃত হইয়াছে যে তাহাদের সনাক্ত করা অসম্ভব। সঙ্গের মালপত্র কিছুই অবশিষ্ট নাই, সামান্য কয়েকটি দুমড়ানো-মুচড়ানো দগ্ধ ধাতব দ্রব্য ছাড়া সমস্তই অগ্নিগ্রাসে গিয়াছে।

'প্রত্যক্ষদর্শী যাহারা, তাহারা দূরের এক পাহাড়ী গাঁয়ের মানুষ। দুর্ঘটনার সময় তাহারা উপস্থিত ছিল না। বনের ভিতর আগুন ও ধোঁয়া দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আসে। গাড়িটি তখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারা আগুন নিভাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করে এবং দূরবর্তী পুলিস ফাঁড়িতে খবর পাঠায়। পুলিস যখন পৌঁছায়, তখন আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই—গাড়িটির ধাতব চাদর পর্যন্ত গলিয়া-পুড়িয়া প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে।

'খাদের ঢালুতে গুরুতর আহত যে দুইজনের সংজ্ঞা-হীন দেহ পাওয়া গিয়েছে, তাহাদের একজন মধ্যবয়সী পাঞ্জাবী শিখ, অপরজন এক নেপালী যুবক। শিখের নিকট হইতে প্রাপ্ত কাগজপত্র হইতে জানা যায়, গাড়িখানি ছিল ট্যাক্‌সি এবং সে ছিল ঐ ট্যাক্‌সির ড্রাইভার। নেপালী যুবকের পরিচয় জানা যায় নাই। আহত দুইজনকে হাস-পাতালে ও মৃতদেহ দুইটি পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠানো হইয়াছে। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের জঙ্গলে ও রাস্তায় হাতির পায়ের টাটকা ছাপ ও নাদ পরীক্ষা করিয়া পুলিস ধারণা করিতেছে, বন্য হাতিদের আক্রমণেই সম্ভবতঃ এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।'

খবরটা শেষ করে আবার ভাবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে! সংবাদদাতার এই প্রাথমিক রিপোর্টে শিশুটির কোন উল্লেখ নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ দুর্ঘটনার পরে কেউ আর শিশুটিকে দেখেনি, তার অস্তিত্ব সবার কাছে ছিল অজ্ঞাত......

সামনে কাগজ খোলা, ভাবা স্থাণুর মতো বসে আছে। মনের মধ্যে তোলপাড় চলছে। এ কি তারই জীবনের ঘটনা? তার জীবনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আদিপর্বের কাহিনী? না কি অন্য কোন ঘটনা, তার জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন? ভাবা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। কি করেই বা আসবে? তবু তার অন্তরের গভীরে কোথায় যেন একটা বিষণ্ণ করুণ সুর বাজছে। কে যেন সেথায় ফিসফিস করে বলছে—না, না, না, এটা অন্য কারো নয়!

তোমারই শৈশবে ঘটেছিল এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, তার ফলে তুমি জন্মদাতা পিতামাতাকে হারিয়েছিলে, লোকালয় থেকে নির্বাসিত বহু-বহু দূরে নির্জন বন্য প্রকৃতির ভয়াল পরিবেশে শুরু হয়েছিল তোমার নিষ্করুণ পশুজীবন।...কিন্তু কে ছিলেন ঐ নিহত বাঙালী দুজন?

ভাবা আবার কাগজ ওলটাতে শুরু করে—এবার আর পেছনের তারিখ নয়, দুর্ঘটনার পরবর্তী সামনের তারিখ। কিন্তু নাঃ, ও সম্বন্ধে কোথাও আর কোন খবর নেই!

রিপোর্ট দুটো নিয়ে ভাবা বাড়ি ফিরলো।

প্রেস-রিপোর্ট দুটো পড়ে ডাঃ রায় ও কল্পনা দেবী অভিভূত। ভাবার মতো তাঁদেরও অন্তরে বাজতে থাকে সেই একই ব্যথার সুর আর অস্পষ্ট গুঞ্জন ঃ এই হলো তোমাদের খোকনের জীবনের সেই আদিপর্বের নিষ্করুণ ইতিহাস! এমনি করেই সে সেদিন হারিয়ে গিয়েছিল আদিম অরণ্যের গহন তমিস্রায়!

আলোচনা-বৈঠক বসলো রায় বাড়িতে। ডাঃ রায়, কল্পনা দেবী ও ভাবা ছাড়াও অধ্যাপক গাঙ্গুলী ও সোম সাহেব উপস্থিত। অধ্যাপক গাঙ্গুলী ও সোম সাহেবও একমত যে, এটা খোকনেরই শৈশব-জীবনের কাহিনী।

কিন্তু এ তো ধারণা ও বিশ্বাসের কথা! তথ্য-প্রমাণ কোথায়?

সোম সাহেব বললেন,—ওর জন্যে ভাবনা কি! রসো, কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা করছি। প্রথমে বের করতে হবে দুর্ঘটনায় নিহত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার পরিচয়। তারপর দেখছি।

যে কথা, সেই কাজ! কয়েকদিন পরেই আবার বৈঠক বসলো। সোম সাহেব নিহত ব্যক্তি দুজনের খবর এনেছেন প্রায় সতেরো বছর আগেকার নাতিদীর্ঘ পুলিস-রিপোর্ট আর সেই সঙ্গে তাঁর নিজস্ব তদন্তের ফলাফল।

পুলিস-রিপোর্টে বলা হয়েছে—নিহত ভদ্রলোকের নাম অমিতাভ মিত্র, স্ত্রীর নাম সুনন্দা। অমিতাভবাবু ছিলেন বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য পুরুষ, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ইণ্ডিয়ান অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস্ সার্ভিসের সুউচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুনন্দা দেবীও ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা—ইতিহাসের ডক্টরেট। ডঃ মিত্র ছুটিতে স্ত্রী-পুত্রসহ দার্জিলিং বেড়াতে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণকান্ত মিত্র। পূর্ববাংলার ফরিদপুর জেলায় এঁরা ছিলেন সংস্কৃতিবান সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশ। কলকাতায় সাদার্ন এভিনিউতে এঁদের নিজস্ব বসতবাটী বর্তমান। বঙ্গবিভাগের পর তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। পরলোকগত ডঃ অমিতাভ মিত্রের পিতামাতা জীবিত।

এবার সোম সাহেবের নিজস্ব তদন্তের রিপোর্ট। তিনি বললেন,—সাদার্ন এভিনিউয়ের বাড়িতে গিয়ে খবর শুনে আমার তো মাথায় হাত! কৃষ্ণকান্তবাবু প্রায় পনেরো-ষোল বছর আগে কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে সস্ত্রীক কাশীবাস করছেন। এখন কোথায় পাই তাঁর কাশীর ঠিকানা? অতএব খোঁজ—খোঁজ! পুলিসী চর লাগিয়ে দিলাম। শেষ পর্যন্ত ওটা পাওয়া গেল শ্রীহরিনারায়ণ সেন নামধেয় কৃষ্ণকান্তবাবুর জনৈক আত্মীয়ের কাছে। ঐ সঙ্গে পাওয়া গেল আরো একটা দুঃসংবাদ। বছর খানেক আগে কৃষ্ণকান্তবাবুর স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। বৃদ্ধ এখন নিঃসঙ্গ, ঠাকুর-চাকরের ওপর নির্ভরশীল। মাঝে মাঝে হরিনারায়ণবাবুরা কেউ কেউ গিয়ে তার খোঁজখবর নেন।

সমবেদনায় কল্পনা দেবীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে,—আঃ! কী কষ্টের জীবন! পূর্বজন্মে উনি কী পাপ যে করেছিলেন!

সোমসাহেব হইচই করে উঠলেন,—দেখলে অসীম দেখলে, কোথাকার জল বৌদি কোথায় নিয়ে ঢাললেন! ওঁর নিজস্ব নদীটাকে উনি যে কোন কায়দায় শ্মশানের ধারে নিয়ে ফেলবেনই! কী কাণ্ড! আমি কোথায় ছুটোছুটি করে নিজের ঘর্ম নিজে আহার করছি, আর উনি কিনা এখন এক অপরিচিত বৃদ্ধের জন্যে হা-হুতাশ করতে বসলেন! এরকম করলে শরীর টেকে কখনো? শোন অসীম ডাক্তার, শ্রীমান্ খোকনের মঙ্গলকামনায় অবিলম্বে আমাদের কাশীতে পুণ্য সঞ্চয় করতে যেতে হবে। বৌদিকে এখানে রেখে যেও, নয়তো ঐ বিদেশ-বিভুঁইয়ে কোথা থেকে কোন্ বিপদ বিনির্গত হবে কে জানে! উনি হয়তো বৃদ্ধের গলা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ কান্না জুড়বেন। ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারছো তো নিরেট ডাক্তার?

কপট ক্রোধে কল্পনা দেবী বললেন,—বটে! আমাকে বাদ দিয়ে কাশী? তাহলে ব্যাসকাশীতে স্থান হবে।

এর দিন দশেক পরে কল্পনা দেবী ও ভাবাকে নিয়ে ডাঃ রায় কাশীতে পেঁছিলেন। বলা বাহুল্য, সোম সাহেব সঙ্গে আছেন।

দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে বাঙালীটোলার অদূরে এক পুরনো বাড়িতে কৃষ্ণকান্তবাবু থাকেন।

কাশী পেঁছনোর পরদিনই সোম সাহেব একলা গিয়ে কৃষ্ণকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। সঙ্গে অ্যাটাচি-কেসে ভাবার যাবতীয় ফোটো—বাল্যকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত। বৃদ্ধের বয়স ছিয়াত্তর-সাতাত্তর। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায়। বয়সের ভারে দেহ কিঞ্চিৎ ন্যুব্জ হলেও, অতীত বলবত্তা ও সামর্থ্যের সাক্ষ্য এখনও যথেষ্ট। কৃষ্ণকান্তবাবু যেন সুখদুঃখের অতীত পাষাণে পরিণত হয়েছেন।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়াদির পর সোম সাহেব অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ধীরে ধীরে তাঁর আগমনের কারণ জানালেন। সেই সঙ্গে সবিস্তারে জানালেন ভাবার জীবনের কাহিনী।

এ কাহিনী শুনতে শুনতে ভেতরে ভেতরে বৃদ্ধের কি হচ্ছে বোঝা মুশকিল। ভাবলেশহীন নির্বিকার মুখে তিনি নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন সোম সাহেবের দিকে। কাহিনীটি তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে কিনা, তা-ও বোঝার উপায় নেই।

বিনীত কণ্ঠে সোমসাহেব একসময় জিজ্ঞেস করেন,—ধৃষ্টতা মাফ করবেন, একটা সংবাদ জানতে চাই। দুর্ঘটনার

কালে আপনার পৌত্রের বয়স কত ছিল?

—আড়াই বছর।

আড়াই বছর!—সোমসাহেব একটু বিস্মিত হনঃ কিন্তু ট্যাক্সির ড্রাইভার বলেছিল, ছেলেটির বয়স ছিল সাড়ে তিন বছর-চার বছর!

স্বাভাবিক।—নিরুত্তাপ কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেনঃ আমাদের বংশের সবাই খুব বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। কিন্তু আমার দাদুভাই থাকলে বোধহয় সবাইকে ছাড়িয়ে যেত। তাই আড়াই বছরের ছেলেকে চার বছরের মনে হওয়া এমন কোন তাজ্জব ব্যাপার নয়। কিন্তু ওসব থাক। আপনি কি বলতে চাইছেন যে, ঐ ছেলেটিই আমার দাদুভাই?

আজ্ঞে না,—মৃদু হেসে সোমসাহেব বললেনঃ আমি কিছুই বলতে চাইছি না। শ্রীমান্ ভবেন আপনার দাদুভাই হয় ভালই, না হলেও বা কি ক্ষতিবৃদ্ধি! আশা করি, আমার কথা থেকে বুঝতে পেরেছেন যে, আপনার সামান্য সম্পদের ওপর তার লোভ থাকার কথা নয়। ডাঃ এ. কে. রায়ের নাম শুনেছেন কিনা জানি নে, শুধু যদি টাকার পরিমাণও বিচার করেন, তাহলে সে অংকটা শুনলে আপনার হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

শেষ দিকে সোমসাহেবের কণ্ঠে বিরক্তি ও উষ্মা প্রকট হয়ে ওঠে।

বৃদ্ধের মুখভাবে এবার পরিবর্তন ঘটলো। কিঞ্চিৎ প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন,—না, সে ভয় আর নেই। আপনাদের সকলের শুভেচ্ছায় ঐসব লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে বোধহয় উঠতে পেরেছি। জীবন যে কতখানি নির্মম হতে পারে, তা আমার চেয়ে বেশি কজন বুঝেছে সন্দেহ আছে। এককালে যার সব ছিল, পরমকারুণিক বিধাতা তাকে সেসব কিছু থেকেই মুক্তি দিয়েছেন। আজ তাই বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না, বিধাতা নামক নির্দয় দানবটির মনে অনুশোচনা এসেছে, এই চরম অভাগাকে বিদায় নেবার পূর্বক্ষণে কিছুটা ফিরিয়ে দিতে চায়।

সোমসাহেব মাথা নীচু করে বসে থাকেন। শোকতাপে দগ্ধ একটি অসহায় জীবনের যে আর্তি ফুটে উঠেছে মর্মান্তিক কথাগুলোর ভেতর দিয়ে, তা এত করুণ যে বেশ কিছুক্ষণ তিনি কথা বলতে পারেন না।

তারপর একসময় ব্যথিত কণ্ঠে বললেন,—আপনার মনোভাব আমি বুঝতে পারছি। কি প্রমাণ পেলে আপনি বিশ্বাস করবেন?

—দুটো প্রমাণ। এক, দাদুভাই ছিল ঠিক আমার অমির মতো দেখতে, তাই ঐ ছেলেটির বর্তমান জোয়ান বয়সের ফোটো দেখতে চাই; দুই, দাদুভাইয়ের এমন একটি জন্মচিহ্ন ছিল যা খুবই দুর্লভ এবং তা তার শরীরের এমন জায়গায় ছিল যে, সহজে চোখে পড়ে না।

সোমসাহেব অ্যাট্যাচি-কেস খুলে ভাবার আধুনিক ফোটোখানা বের করতে করতে বললেন,—আপনার দাদু-ভাইয়ের ডান কানের পেছনে কি বড় একটা জড়ুল ছিল? শ্রীমান্ ভবেনের আছে। আর এই নিন ফোটো—

অ্যাঁ আছে?—বলতে বলতে পরক্ষণে ভাবার ফোটো-খানার দিকে নজর পড়তেই বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলেনঃ অ্যাঁ—অ্যাঁ—এ যে আমার অমি—এ যে আমার অমি— এ যে আমার দাদুভাই—

হাউহাউ করে বৃদ্ধ কেঁদে উঠলেন।

উজ্জ্বল মুখে সোমসাহেব অবিরাম তখন চোখের জল মুছছেন।

প্রত্যুপকার

এক ব্যক্তি, অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইংলন্ডের অন্তঃপাতী রেডিঙ্ নগরের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি বালক, পথের ধারে, কর্দমে পতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইল, সে অতিশয় যাতনাভোগ করিতেছে। অশ্বকে দন্ডায়মান করিয়া, সে ব্যক্তি কারণ জিজ্ঞাসিলে, বালক বলিল, মহাশয়, পড়িয়া গিয়া, আমার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; নড়িতে পারি বা চলিয়া যাই, আমার এমন ক্ষমতা নাই; এজন্য কাদায় পড়িয়া আছি, উঠিতে পারিতেছি না।

অশ্বারোহী ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল। বালকের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ দয়ার উদয় হইল। তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; বালককে কর্দম হইতে উঠাইয়া, অশ্বের উপর আরোহণ করাইলেন; এবং উহার হস্ত ও অশ্বের মুখরজ্জু ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি রেডিঙ্ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচিতা এক বৃদ্ধা নারী ঐ নগরে বাস করিতেন। তিনি তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বলিলেন, দেখ, যাবৎ এই বালকটী সুস্থ হইতে না পারে, তোমার আলয়ে থাকিবে, ইহার চিকিৎসা শুশ্রূষার নিমিত্ত যে ব্যয় হইবে সে সমস্ত আমি দিব; আর তুমি ইহার জন্য যে পরিশ্রম করিবে, তাহারও সমুচিৎ পুরস্কার করিব। বৃদ্ধা সম্মত হইলেন। তখন তিনি এক চিকিৎসক আনাইয়া, তাঁহার উপর বালকের চিকিৎসার ভার দিলেন; এবং বৃদ্ধার হস্তে কিছু দিয়া, প্রস্থান করিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই, বালক, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল; তাহার শরীর সবল, এবং হস্ত পদ কর্মক্ষম হইয়া উঠিল। তখন সে আপন আলয়ে প্রতিগমন করিল; এবং সূত্রধরের ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে, ওই অশ্বারোহী ব্যক্তি, একদা রেডিঙ্ নগরের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন। এক সেতুর উপরিভাগে উপস্থিত হইলে, অশ্ব কোনও কারণে ভয় পাইয়া, অতিশয় চঞ্চল ও উচ্ছৃংখল হইয়া উঠিল, এবং অশ্বারোহী সহিত, নদীতে লম্ফ প্রদান করিল। সে ব্যক্তি সন্তরণ জানিতেন না; সুতরাং তাঁহার জলে মগ্ন হইয়া প্রাণনাশের উপক্রম হইয়া উঠিল। অনেকেই সেতুর উপর দন্ডায়মান হইয়া সাতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিলেন না।

সেই সেতুর অনতিদূরে, এক সূত্রধর কর্ম করিতেছিলেন। সে, সেতুর উপর জনতা দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া কর্মপরিত্যাগ পূর্বক, তথায় উপস্থিত হইল, জলপতিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র, জলে ঝম্পপ্রদান করিল; এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল। এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া সেতুর উপরিস্থিত ব্যক্তিগণ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন; এবং সূত্রধরের ক্ষমতা ও অকুতোভয়তার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রাণরক্ষা হওয়াতে, সে ব্যক্তি প্রাণদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, ভাই, তুমি আজ আমার

যে উপকার করিলে, তজ্জন্য আমি চিরকালের নিমিত্ত তোমার কেনা হইয়া রহিলাম। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন, সূত্রধর, কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। কিছুকাল পূর্বে, আমি ভগ্নহস্ত ও ভগ্নপদ হইয়া, কর্দমে পতিত ছিলাম; আপনি, সেসময়ে দয়া করিয়া, আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আপনার কৃত উপকার, আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার পিতা। আমি অতি অধম; আমি যে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর পাইলাম, তাহাতেই চরিতার্থ হইয়াছি, ও আশার অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছি; আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, প্রভূত ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া, সূত্রধর কর্মস্থানে প্রস্থান করিল; এবং তিনি, তদীয় সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পিতৃভক্তি

আয়র্লন্ডের অন্তঃপাতী লন্ডন্ডরি নগরে, বেকনর নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে জাহাজে নাবিকের কর্ম করিত। তাহার পুত্রও, দ্বাদশ বৎসর বয়সে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পিতাপুত্রে এক জাহাজেই কর্ম করিত। বেকনর্, আপন পুত্রকে বিলক্ষণ সন্তরণ শিখাইয়াছিল। মৎস্য যেমন অবলীলাক্রমে জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, বেকনরের পুত্রও সন্তরণ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল। সে প্রতিদিন কর্মে অবসর পাইলেই, জাহাজ হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া সমুদ্রে পড়িত; এবং জাহাজের চতুর্দিকে সন্তরণ করিয়া বেড়াইত; ক্লান্তিবোধ হইলে, লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।

এক দিবস, বায়ুবেগ বশতঃ, সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে, কোনও আরোহীর একটি অতি অল্পবয়স্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল। বেকনর্ দেখিবামাত্র, লম্ফ দিয়া সমুদ্রে পতিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কন্যার বস্ত্রে ধরিয়া, তাহাকে জল হইতে ঊর্ধ্বে তুলিল। অনন্তর সে কন্যাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া সন্তরণ করিয়া, জাহাজের প্রায় নিকটে আসিয়াছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা ভয়ানক হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দেখিবামাত্র, বেকনর্ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। জাহাজের উপরিস্থ সমস্ত লোক অতিশয় ব্যাকুল হইল; এবং বন্দুক লইয়া, হাঙ্গরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, জলে অবতীর্ণ হইতে পারিল না; সকলেই, হায়! কি হইল বলিয়া, কোলাহল করিতে লাগিল।

জাহাজ হইতে যত গুলি মারিয়াছিল, তাহার একটিও হাঙ্গরের গায় লাগিল না। হাঙ্গর, ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মুখব্যাদানপূর্বক, বেকনর্কে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; তাহার পুত্র অতিশয় পিতৃভক্ত ছিল। সে, পিতার প্রাণনাশের উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া, সমুদ্রে ঝম্পপ্রদান করিল, এবং দ্রুতবেগে হাঙ্গরের দিকে গমন করিয়া, উহার উদরে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন হাঙ্গর, কুপিত হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে সন্তরণকৌশলে, হাঙ্গরের আক্রমণ এড়াইয়া, উহার কলেবরে উপর্যুপরি তরবারির আঘাত করিতে লাগিল।

এই অবকাশে জাহাজের উপরিস্থ লোকেরা কতিপয় রজ্জু ঝুলাইয়া দিল। পিতাপুত্রে এক এক রজ্জু অবলম্বন করিলে, তাহারা টানিয়া উহাদিগকে জল হইতে কিঞ্চিত ঊর্ধ্বে উঠাইল। এই সময়ে, উহাদের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া, সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু, সেই দুর্দান্ত জন্তু, মুখব্যাদান ও ঊর্ধ্বে লম্ফপ্রদান পূর্বক, বেকনরের পুত্রের কটিদেশ পর্যন্ত গ্রাস করিল; এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা, গ্রস্ত অংশ কাটিয়া লইয়া, জলে পতিত হইল; বালকের কলেবরের ঊর্ধ্বতন অর্ধ অংশমাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল।

এই হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া, কিয়ৎক্ষণ দন্ডায়মান রহিল; অনন্তর সকলেই, শোকে বিচলিত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। বেকনর্, জাহাজে উত্তোলিত হইয়া, পুত্রের তাদৃশী দশা দেখিয়া, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল। পার্শ্ববর্তী লোকেরা বলপূর্বক ধরিয়া না রাখিলে, সে নিঃসন্দেহ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিত। তাহার পুত্র, যতক্ষণ জীবিত ছিল, অবিচলিত ভাবে পিতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু পিতার প্রাণরক্ষা হইয়াছে, এই আহ্লাদে প্রফুল্ল বদনে, সে প্রাণত্যাগ করিল, তাহার আকৃতি দেখিয়া সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই এরূপ বোধ ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

ভ্রাতৃস্নেহ

য়ুরোপের অন্তঃপাতী সুইট্জার্লন্ড দেশ পর্বতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পর্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে আচ্ছন্ন থাকে; এজন্য ঐ দেশে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। জ্যেষ্ঠের বয়স্ক নয় বৎসর, কনিষ্ঠের বয়স ছয় বৎসর, এরূপ দুই সহোদর নীহারের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া, খেলা করিতে করিতে, এক সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিল; এবং ক্রমে ক্রমে অনেক দূর যাইয়া পথহারা হইল।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে তাহারা অতি শঙ্কিত ও গৃহপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া, পথের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু পথের নির্ণয় করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

জ্যেষ্ঠটির বয়স যত অল্প, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। সে বিবেচনা করিল, যত চেষ্টা করি না কেন, আজ রাত্রিতে, এ জঙ্গল হইতে কোনও মতে বাহির হইতে পারিব না; সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা; এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে; কিন্তু নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই মরিয়া যাইব। অতএব যেখানে নীহার নাই, এমন স্থানের অন্বেষণ করি।

এই স্থির করিয়া, সেই বালক নীহারশূন্য স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে চন্দ্রের উদয় হওয়াতে, তদীয় আলোকে, পর্বতের পাদদেশে, এক ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হইল। বালক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, সেখানে কিছুমাত্র নীহার নাই। তখন সে কতকগুলি শুষ্ক পর্ণ জড় করিয়া, তদ্দ্বারা একপ্রকার শয্যা প্রস্তুত করিল; পরে, কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্ত ধরিয়া বলিল, ভাই, আর কাঁদিও না; তোমার কোনও ভয় নাই; আইস, এখানে শয়ন কর।

ইহা বলিয়া, কনিষ্ঠকে সেই পর্ণশয্যায় শয়ন করাইয়া আপনিও তাহার পার্শ্বে শয়ন করিল। কনিষ্ঠ, বারংবার বলিতে লাগিল, দাদা, বড় শীত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ভাইটিকে অতিশয় ভালবাসিত; এবং তাহার কোনও কষ্ট দেখিলে, নিজে অতিশয় কষ্ট বোধ করিত; এক্ষণে কি উপায়ে তাহার শীতনিবারণ হয়, অনন্যমনে সেই চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে, অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, সে আপন গাত্র হইতে সমুদয় বস্ত্র খুলিয়া, তাহার গাত্রে দিল, এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীত নিবারণ না হয়, এই ভাবিয়া, স্বয়ং তাহার গাত্রের উপর শয়ন করিল।

এইরূপে, নিজের ও জ্যেষ্ঠের বস্ত্রে আবৃত হওয়াতে ও জ্যেষ্ঠের গাত্রের উত্তাপ পাওয়াতে, কনিষ্ঠের অনেক শীত নিবারণ হইল; তখন সে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করিল। তদ্দর্শনে, জ্যেষ্ঠের হৃদয় আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল; নিজে অনাবৃত গাত্রে থাকাতে, তাহার যে ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছিল, ঐ কষ্টকে কষ্ট বলিয়া গণ্য করিল না। যদি তাহারা এইভাবে অধিকক্ষণ থাকিত, তাহা হইলে, অগ্রে জ্যেষ্ঠের এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠের নিঃসন্দেহে প্রাণবিয়োগ হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিতে পারিল না।

সন্ধ্যার পর, অনেকক্ষণ পর্যন্ত, তাহারা গৃহে প্রতিগত না হওয়াতে, তাহাদের পিতা ও মাতা অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহাদের পিতা অন্বেষণে নির্গত হইলেন এবং ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে সেই গহ্বরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহারা শয়ন করিয়া আছে। তিনি, তাহাদের বিষয়ে একপ্রকার হতাশ হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইলেন। তাঁহার নয়নে আনন্দের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি তাহাদিগকে পর্ণশয্যা হইতে উঠাইলেন; এবং প্রথমতঃ, যথোচিত তিরস্কার করিলেন; পরে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কষ্টনিবারণের কীদৃশ চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা সবিশেষ অবগত হইয়া, যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন; এবং জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, তাহার প্রতি সাতিশয় স্নেহপ্রদর্শনপূর্বক, তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া, গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

লোভসংবরণ

এক দীন বালক কোনও বড় মানুষের বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার উপর গৃহমার্জন প্রভৃতি অতি সামান্য নিকৃষ্ট কর্মের ভার ছিল। সে, একদিন গৃহস্বামীর বাসগৃহ পরিষ্কৃত করিতেছে; এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্যসকল দৃষ্টিগোচর করিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। তৎকালে সেই গৃহে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিল না; এজন্য সে নির্ভয়ে, এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে।

গৃহস্বামীর একটি সোনার ঘড়ি ছিল। ঘড়িটি অতি মনোহর, উত্তম স্বর্ণে নির্মিত, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখন্ডে মন্ডিত। বালক, ঘড়িটি হস্তে লইয়া, উহার অসাধারণ সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল; এবং বলিতে লাগিল, যদি আমার এরূপ একটি ঘড়ি থাকিত, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হইত! ক্রমে ক্রমে, তাহার মনে প্রবল লোভ জন্মিলে, সে ঘড়িটি চুরি করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল, যদি আমি লোভসংবরণ করিতে না পারিয়া এই ঘড়ি লই, তাহা হইলে চোর হইলাম। এখন কেহ গৃহের মধ্যে নাই; এবং আমি চুরি করিলাম বলিয়া, জানিতে পারিতেছে না; কিন্তু যদি দৈবাৎ চোর বলিয়া ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার আর দুর্দশার সীমা থাকিবে না। সর্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদন্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। আর, যদিই আমি চুরি করিয়া, মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট অনেকবার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না বটে; কিন্তু তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে, তাহার মুখ ম্লান ও সর্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে, ঘড়িটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিতে লাগিল, লোভ করা বড় মন্দ; লোকে লোভসংবরণ করিতে না পারিলেই, চোর হয়। আমি আর কখনও কোনও বস্তুতে লোভ করিব না; এবং লোভের বশীভূত হইয়া, চোর হইব না। চোর হইয়া ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল; তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়। চুরি করিতে উদ্যত হইয়া, আমার মনে এত ক্লেশ হইল; চুরি করিলে না জানি, আমি কতই ক্লেশ পাইব। ইহা বলিয়া সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহমার্জনে প্রবৃত্ত হইল।

গৃহস্বামিনী, ঐ সময়ে পার্শ্ববর্তী গৃহে থাকিয়া বালকের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ এক পরিচারিনী দ্বারা আপন সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তুমি কিজন্য আমার ঘড়িটি লইলে না? বালক শুনিবামাত্র, হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না; কেবল জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলী হইয়া, বিষন্ন বদনে, কাতর নয়নে, গৃহস্বামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে, ও নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি নির্গত হইতে লাগিল।

তাহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, গৃহস্বামিনী সস্নেহ বচনে বলিলেন, বৎস, তোমার কোনও ভয় নাই; তুমি কিজন্য এত কাতর হইতেছ? এখানে থাকিয়া, আমি তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি; কিন্তু শুনিয়া তোমার উপর কি পর্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, বলিতে পারি না। তুমি দীনের সন্তান বটে; কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্মভীরু বালক দেখি নাই। জগদীশ্বর তোমার যে লোভসংবরণ করিবার এরূপ শক্তি দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও। অতঃপর সর্বদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভের বশীভূত না হও।

এই প্রকারে তাহাকে অভয়প্রদান করিয়া তিনি বলিলেন, শুন বৎস, তুমি যে এরূপে লোভসংবরণ করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় পুরস্কার দেওয়া উচিত। এই বলিয়া, কতিপয় মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া বলিলেন, অতঃপর তোমায় আর গৃহমার্জন প্রভৃতি নীচ কর্ম করিতে হইবে না। তুমি বিদ্যাভাস করিলে, আরও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইতে পারিবে; এজন্য কল্য অবধি আমি তোমায় বিদ্যালয়ে পাঠাইব, এবং অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়ের ব্যয় নির্বাহ করিব। অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিয়া তাহাকে উঠাইলেন, এবং তাহার নয়নের অশ্রু মার্জন করিয়া দিলেন।

গৃহস্বামিনীর ঈদৃশ স্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, ঐ দীন বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে পরদিন অবধি, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, যারপরনাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, শিক্ষা করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই, সে বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জন করিল; এবং লোকসমাজে বিদ্বান্ ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল।

নন্টে
আর
ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ

আর কয়েকদিন পরেই তো পুজোর বন্ধ। কিন্তু কেল্টুদা কোথায় রে?
আমার থেকে টাকা ধার নিয়ে কি যেন কিনতে গেলো।

করেছিস কি! জেনেশুনে কেল্টোটাকে আবার টাকা দিয়েছিস? আর কখনো সে টাকা তোর কাছে ফিরে আসবে!

নিশ্চয়ই আসবে। শুধু আসবে না বর্দ্ধিত হয়ে আসবে স্ফীত হয়ে আসবে।

বর্দ্ধিত হবে! কিন্তু ক্ষুদ্র হয়েও তো কোনদিন আসেনি গো কেল্টুদা!
আসবে, আসবে। তখন আসে নি, কিন্তু এখন আসবে।

যা কখনো ঘটেনি এখন কোন যাদুমন্ত্রে তা ঘটবে গো কেল্টুদা?
যাদুমন্ত্রে হবে কেন, রে গবেট—হবে একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে।

মরেছে! আবার কার বিপর্যয় ঘটাবে?
টাকের!

য়্যা!
য়্যা নয় হ্যাঁ! দেখবি টাকের জগতে আমি একেবারে বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবো।

টাক বলতে আর কিছু থাকবে না। যাদের একমাথা টাক, তাদের মাথায় দুব্বোঘাসের মতো চুল গজাবে। আর চুলো মাথায় লাগালে তাদের আর একটা চুলও উঠবে না।

ওরে বাবা! শুনেই তাজ্জব লাগছে! কিন্তু সেটা কি করে হবে?
হেঃ, হেঃ! কি করে হবে? হবে আমার তৈরি একটা ভেষজ তেল লাগিয়ে।

কিন্তু সেই তেল তুমি তৈরি করবে কি দিয়ে?
আরে সেই যুগান্তকারী ফরমুলাই তো আমার করায়ত্ত!

কিন্তু সেই ফরমুলা তোমার করায়ত্ত হলো কেমন করে?
ওঃ সেও এক আশ্চর্য ঘটনা! তাহলে বলি শোন। কাল বিকালে নদীর দিকে বেড়াতে যাচ্ছি দেখি গাছতলায় এক সাধু। এগোতেই পেছন থেকে ডাক পড়লো–

দাঁড়াও বৎস!
আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ বৎস, তোমাকেই ডাকছি। আমার কাছে এসো। মনে হচ্ছে আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি!
আমাকে! কেন?

বোসো বৎস! তোমার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।

এবার বলুন আপনার কি কথা আছে।
বলছি। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তুমি খুব প্রতিভাধর। ভবিষ্যতে তুমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। আর প্রচুর অর্থশালী হবে।

আমার গুরু মহারাজ ধ্যান যোগে তোমার মতন একজন সুলক্ষণ যুক্ত প্রতিভাধরের বর্ণনা দিয়ে আদেশ করেছিলেন জিনিষটা দিতে। এখন মনে হচ্ছে তোমারই বর্ণনা দিয়েছিলেন।

কে আপনার গুরু সাধুজী? তিনি এখন কোথায় আছেন?
আমার গুরু শ্রীশ্রীমৎ স্বামী ফেরেববাজানন্দজী মহারাজ! তিনি এখন হিমালয়ের দুর্গম গুহায় ধ্যান মগ্ন।

তিনি কি জিনিষ দিতে বলেছিলেন সাধুজী?
সেই জন্যেই তো তোমাকে ডাকলাম বৎস! আমার শ্রীশ্রীমৎ গুরু টাক নিরাময়ের একটি অব্যর্থ ভেষজ বস্তু দীর্ঘদিনের সাধনায় আয়ত্ত করেছেন। তাঁর সেই সাধনালব্ধ জিনিষটি সবার উপকারে লাগাতে পারে এরকম উপযুক্ত লোকের হাতে দেবার জন্যে আমাকে পাঠিয়েছেন।

এ বস্তুটি ব্যবহার করলে চকচকে টাকেও চুল গজাবে?

বর্ষাকালে মাঠে যেমন ঘাস গজায় তেমনি টাক মাথা ঘন চুলে ভরে যাবে। গুরুজীর নিজের শরীরের ওপর পরীক্ষা করে করে তাঁর সর্বাঙ্গ এখন ঘন চুলে ভর্তি।
তাহলে দিন আমাকে সেই জিনিষটি।

তোমাকে দেবার জন্যেই তো এতো ঘুরেছি বৎস! কি কি দ্রব্যে এটি প্রস্তুত হয় তা একটা কাগজে লিপিবদ্ধ করা আছে। কিন্তু একটা নির্দেশ আছে। এটি হস্তান্তরের সময় কিঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রয়োজন।
তা হলে আগামী কাল এসে নিয়ে যাবো।

তাই ফন্টের কাছ থেকে ধার নিয়ে দক্ষিণা দিয়ে এই যুগান্তকারী ফরমুলা নিয়ে এসেছি।
দারুণ জিনিস! আজকের টেকো মাথা কাল চুলে ভর্তি।

শোন নন্টে! তুইও কিছু ক্যাপিট্যাল ছাড়বি। উপাদান কিনতে হবে। তারপর জিনিষটা তৈরি হলে শিশিতে ভরে তোরা ক্যানভাস করবি। অবশ্য তার জন্যে ভালো কমিশন পাবি।

ঠিক আছে কেল্টুদা! টাক থেকে এবারে টাকা ইনকাম হবে।
এক টাকে চুল গজালে সব টেকো আমার এই ভেষজ তৈল কিনবে। আবার যাদের চুল উঠে টাক পড়ার ভয় আছে তারাও কিনবে।

বুঝলি, এই টাকের ওষুধেই আমি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবো। লোককে আর দু'চার গাছা চুল টেনে টাক ঢাকবার নিষ্ফল প্রয়াস করতে হবে না। সবাই ফুরফুরে চুল নিয়ে ঘুরবে। আর আবিষ্কারক হিসেবে আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ফর্মুলাটা একবার দেখাবে না কেল্টুদা?
উঁহু, গুপ্ত তথ্য কাউকে জানাতে নেই।

পরদিন
ইস্! বিচ্ছিরি একটা দুর্গন্ধ আসছে কোত্থেকে বলতো?
বাগানের দিক থেকে মনে হচ্ছে।

ঐ ভাঙাচোরা জিনিষ রাখার ঘরটা থেকে গন্ধ বেরোচ্ছে
ওখান থেকে কে এমন গন্ধ ছড়াচ্ছে বলতো?

এসে গেছিস। আমারও প্রায় তৈরি হয়ে এলো। কেউ যাতে না জানতে পারে তাই এখানে এসেছি।
তুমি! কিন্তু কি বিদঘুটে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে কেল্টুদা!

গুলি মার দুর্গন্ধে! মখন জিনিষ ওরকম একটু আধটু হয়েই থাকে। তোরা এবার এগুলো কয়েকটা শিশিতে ভরে ফ্যাল, তারপর তোরা দুজনে এগুলো নিয়ে বেরোবি। আর আমি এদিকে তৈরি করতে থাকবো।
আঁচ্ছা।

একটা লাগসই নাম ঠিক করো কেল্টুদা!
ঠিক বলেছিস। এর নাম দিলুম টাকের দুশমন

পরদিন
চুল পার্কের ভেতরে গিয়ে বসি। পোস্টারটা নিয়েছিস তো?
হ্যাঁ, এই যে নিয়েছি। গিয়ে দেয়ালে সেঁটে নিতে হবে।

টাকের দৌরাত্ম্যে যাদের মাথা ফাঁকা বা যাঁরা চুল উঠে টেকোর দলে নাম লেখাতে চলেছেন। তাঁরা আমাদের এই—
টাকের দুশমন
টাকের দুশমন প্রয়োগ করুন। দেখবেন দুদিনেই টাক ফাঁক হয়ে চুল গজিয়ে উঠবে দামও বেশী নয় মাত্র দুটাকা।

ঠিক কাজ দেবে তো হে ছোকরা?
অব্যর্থ। মাথা ছাড়া কোথাও লাগাবেন না। যেখানেই লাগবে চুল গজাবে।

মাথার চুল ওঠা বন্ধ হবে তো হে
নিশ্চয়! এতো শক্ত হবে যে একটি চুলও টেনে তুলতে পারবেন না।
আর যা চুল উঠেছে তার দ্বিগুন হবে।

দারুণ সেল হয়েছে মাইরি! আরো থাকলে আরো হতো। কাল আবার এখানেই আসবো।
কেল্টুদাকে বলবো প্রডাকসন বাড়াতে। পুজোর আগে ভালোই কমিশন পাওয়া যাবে।

টাকের দুশমন'এর প্রথম দিনের আমদানী তো দারুণ রে! লাগিয়ে যারা উপকৃত হবে দেখবি এর আবিষ্কর্তাকে তারা নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবে এত্তোবড় একটা সমস্যা দূর করার জন্যে।
আমাদের আসলটা আর কমিশনটা দাও কেল্টুদা!

তোরা বড় চট্ করে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলিস। আরো কিছুদিন ক্যানভাসিং কর তাতে তোদেরই কমিশন বাড়বে। তারপর একসঙ্গে নিবি। আমি এখন ল্যাবরেটারিতে যাচ্ছি কালকেরটা রেডি করতে।
দেখলি, সব পকেটে পুরে ফেললে।

পরদিন
আসুন, এক শিশি টাকের দুশমন কিনে টাকের সমস্যা দূর করুন।
এক শিশিতেই কার্য সিদ্ধি। আসুন নিয়ে যান।

দ্যাখ্ ফন্টে! দুজন টেকো এদিকে আসছে। নিশ্চয় কাস্টমার!
একদম ওল-মাথা কাস্টমার রে!

আসুন। এক শিশিতেই আপনার মাথার চেহারা পাল্টে যাবে।
চিনতে কষ্ট হচ্ছে। হবারই কথা। মাথার চেহারা পাল্টেছে যে। এটা দেখো তো।

এবারে নিশ্চয় চেনা চেনা লাগছে
হ্যাঁ! কাল আপনি এক শিশি টাকের দুশমন কিনেছিলেন।
ঠিক। তারপর ওটা ব্যবহারের আগে এটা পরে।

দেখুন না মশাই! কাল আমিও একশিশি কিনে রাত্রে মাথায় লাগিয়ে হাতটা গোঁফে পুঁছেছিলুম। সকালে দেখি গোঁফ সমেত মাথার চারপাশে যে কটি চুল ছিল ঝরে গেছে। এই বয়সেই চিটিংবাজী।
আমরা তৈরি করি নি। কেল্টুদা করেছে।
কোথায় কেল্টুদা, চল।

কোথায় তোদের প্রতিভাধর কেল্টুদা! একটু অভিনন্দন জানিয়ে যাই।
ঐ তো কেল্টুদার ল্যাবোরেটারি

কেল্টুদা তোমাকে দুজন লোক ডাকছেন।
নিশ্চয় অভিনন্দন। জানাতে। চল্।

তোমার নাম কেল্টু? 'টাকের দুশমন' তোমার তৈরি
হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা আমার আবিষ্কৃত জিনিষে উপকৃত না হয়েই ছুটে অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। এতে আমি খুবই—

আনন্দিত— আমি-আঁ-আঁ!
এ এ কিরকমের অভিনন্দন।

চোট্টা চিটিংবাজ! দ্যাখ্ এবার তোর টাকের দুশমন তোর মাথাতেই প্রয়োগ করবো। নিয়ে আসুন সব শিশি।
নন্টে, ফন্টে! হেল্প!

এ তো ক্ষণে বোধ হয় সব টাকের দুশমন কেল্টের মাথায় হয়ে গেছে। কি বলিস ফন্টে?
তা হয়েছে। সেই সাধু ব্যাটা একটা চিটিংবাজ! কেল্টেকে ঠকিয়েছে। আর মাঝখান থেকে আমাদের জমানো ক্যাশও সাফ হয়ে গেলো।

মন্মথ রায়ের নাটক

শরৎ-মুকুল

প্রথম দৃশ্য

[ভাগলপুরে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মামার বাড়ী। ছোট-মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।]

সন—১৮৯৪ খৃস্টাব্দ।

সুরেন ॥ যাক্ আবার তোমাকে ফিরে পেলাম ভাগ্নে। বাড়ীর ভীড়ের মধ্যে কথা বলে সুখ নেই দেখে তোমাকে এই আড়ালে টেনে এনেছি। তা দেখছি বেশ বেড়ে গেছ।

শরৎ ॥ এটা কোন সাল রে, সুরেন?

সুরেন ॥ কেন, এটা তো ১৮৯৪।

শরৎ ॥ ভাগলপুর ছেড়ে দেবানন্দপুরে গিয়েছিলুম কোন্ সালে?

সুরেন ॥ সে তো গিয়েছিলে পাঁচ বছর আগে।

শরৎ ॥ এই পাঁচ বছরে সেখানকার সরস্বতী নদীর জল হাওয়ায় বেড়ে উঠবো না তো কি! তাছাড়া বাংলা-দেশের মাটিটাও বড় সরস। সবচেয়ে বড় কথা, দেবানন্দ-পুর আমার জন্মভূমি। ছিলাম যেন একেবারে মায়ের কোলে!

সুরেন ॥ রাখ তোমার মায়ের কোল, জামাইবাবু মানে তোমার বাবা বলছিলেন, দারুণ ম্যালেরিয়া। বলছিলেন, টিকতে পারলেন না।

শরৎ ॥ আরে ম্যালেরিয়া কোথায় না আছে! আর ঐ ম্যালেরিয়া নিয়েই বাংলাদেশ কী দিনদিন কম বড় হচ্ছে? কতসব মহাপুরুষ, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক—সবই তো বাংলাদেশে। আসল কথা হচ্ছে কী সুরেন, আমরা বড় গরীব হয়ে পড়েছিলুম, বাবার কোন ভাল কাজকর্মো হোল না। দেশ না ছেড়ে উপায়ই ছিল না। ম্যালেরিয়া আমার কী করতে পারত? ওখানেও তো পুরোদমে খেলাধুলো করেছি, বনে জঙ্গলে ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। সঙ্গী সাথী নিয়ে রাতের বেলায় জেলেদের নৌকো চুরি করে মাছ-টাছ ধরেছি—লোকজনের বাগান থেকে বাড়তি ফলমূল চুরি করে নিজেরা খেয়েছি, পরকে বিলিয়েছি। না, এ কথা বলতেই হবে পাঁচ বছর খুব হৈ-চৈ করেই কাটিয়ে দিয়েছি। তোদের এখানে যতটা শাসন ওখানে ততটা ছিল না। সেটাই ছিল সুবিধে, বুঝলি।

সুরেন ॥ এখান থেকে যখন দেবানন্দপুরে তুমি গেলে তখন তোমার বয়স ছিল কত?

শরৎ ॥ তেরো।

সুরেন ॥ আমি দেখছি ভাগ্নে, বয়সটা যত বাড়ে শাসনের ভয়টা তত কমে। তার মানে যারা শাসন করে, তারা আর তেমন পেরে ওঠে না। [দুজনের হাস্য] কী রকম দৌরাত্ম্য-টৌরাত্ম্য করতে একটু বল, শুনি।

শরৎ ॥ গেল বছরের কথাই বলছি শোন—ওখানে অনেক সাকরেদ জুটে গিয়েছিল আমার। হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ঘষতে ঘষতে গেল বছর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলাম। খুব একটা গোপন কথা বলি তোকে, মাস্টার মশাইরা আমার পরীক্ষার খাতাগুলি খুব ভয়ে ভয়েই দেখতো। কিন্তু আবার ভালওবাসতেন খুব।

সুরেন ॥ তোমায় কে না ভালবাসে ভাগ্নে। এখানে তোমার মত আরেকটি ছেলে আছে—রাজেন্দ্রনাথ, রাজু।

শরৎ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ রাজু। মনে পড়েছে মজুমদার বাড়ীর

ছেলে। আমাকে নিয়ে যাস তো একদিন তার কাছে। তার সঙ্গে আলাপটা আবার ঝালিয়ে নিতে হবে। তা দেবানন্দপুরেও আমার মনের মতো একটা বন্ধু জুটে-ছিল। তার নাম সদানন্দ। আমরা রঘু ডাকাত-ডাকাত খেলতাম। আমাদের দেবানন্দপুর থেকে সরস্বতী নদীর দিকে যাবার রাস্তাটির ধারে মুন্সীবাবুদের হেদুয়া পুকুরের গড়ের জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে একটা বড় গর্ত ছিল। সেই গর্তটাকে আরো বড় করে আমরা সেখানেই তৈরী করে নিয়েছিলুম রঘু ডাকাতের গুপ্ত ঘাঁটি। যেদিন এই খেলা হোত, সেদিন আমি তোদের ন্যাড়া শরৎ নই, সেদিন লতাপাতার মুকুট পরে আমি বনে যেতাম স্বয়ং রঘু ডাকাত! গেল বারের ঘটনাটা তোকে বলছি, শোন—

[ফ্ল্যাশ ব্যাক]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দেবানন্দপুর গ্রামের উপকণ্ঠে শরৎচন্দ্রের পূর্বোক্ত গুপ্ত ঘাঁটি। শরৎচন্দ্রের সাকরেদগণ—সদানন্দ, বিশু, কালু, ভোলা, রামু। সকলেই মালকোচা মেরে ধুতি পরেছে। হাতে লাঠি।] নৃত্যগীত

॥ ছেলেদের গান ॥

ডাকাত, ডাকাত—
আমরা সবাই ডাকাত বনেছি
নন্দপুরে ফলের বাগান লুঠতে এসেছি
ভয় পাইনে থোড়াই কেয়ার
তালপাতার ঐ সেপাই
ভাঙ্গবো হাড়, করবো গুঁড়ো
তাই, তাই, তাই।

[নৃত্যগীতঅন্তে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ। সকলের জয়ধ্বনি-'রঘু ডাকাত কী জয়'—]

শরৎ ॥ এই তোরা সব শোন, আজ আর রঘু ডাকাত-টাকাত খেলা নয়। আজ আমি আর রঘু ডাকাত নই, সোজাসুজি শরৎচন্দ্র। তোরাও আজ রঘু ডাকাতের সেনাপতি কী সৈন্য নোস, তোরা আমার সব ভাই, বন্ধু।

বিসু ॥ কেন সর্দার, আজ তো নন্দপুরের পুব পাড়ায় কুবের শার বাড়ীতে ডাকাতি করতে যাবার কথা।

কালু ॥ আমরা তো সব তৈরী হয়েই রয়েছি। লাঠি-সোঁটা সব মজুত।

ভোলা ॥ শুধু তোমার হুকুম পাইনি বলে বসে আছি।

সদানন্দ ॥ কথা ছিল কালি-ঝুলি মেখে, লাল কাপড় পরে, কানে জবাফুল গুঁজে হাতে তীর ধনুক আর বল্লম, তলোয়ার নিয়ে কুবের শার বাড়ীতে ডাকাতি করে ফিরে আসব এই ঘাঁটিতে।

শরৎ ॥ হ্যাঁ কথা ছিল। কিন্তু তার আর দরকার নেই। কুবের শা তার নাতিকে দিয়ে আমাকে বলে পাঠিয়েছে, তার বাড়ী থেকে আর ভিখিরীদের তাড়ানো হবে না। ভিখিরীরা গেলেই ভিক্ষে দেওয়া হবে। এটা আমাদের জয় হয়েছে কি না বল?

সদানন্দ ॥ কয়েকদিন দেখতে হবে, কথা রাখছে কিনা।

শরৎ ॥ আরে সেটা তো আমরা নজর রাখব।

ভোলা ॥ হ্যাঁ বাবা, আমাদের সঙ্গে চালাকি চলবে না।

শরৎ ॥ তাহলেই দেখ্, আমাদের সবাই ভয় পায়।

বিসু ॥ ভয় না পেয়ে যাবে কোথায়, অতবড় আম, জাম কাঁঠাল, লিচুর বাগান ওই রোগা-পটকা মালীগুলোর পাহারায় রেখেছে। শেষরাতে আমাদের কালি ঝুলি মাখা চেহারাগুলি ঘুমের ঘোরে দেখলে ভূত মনে করে অজ্ঞান হয়ে পড়ত।

ভোলা ॥ আধ ঘন্টার মধ্যে অত বড় বাগান সাফ করে দিয়ে আমাদের এই দুর্গে ফিরে আসতাম। দুর্গে মাল নিয়ে ফিরে এসে ফল ফলারি খেয়ে নাচ গান হল্লায় রাতটা কাটিয়ে দিতাম।

শরৎ ॥ এই বেকুফ্, সরস্বতীতে চান না করে কালিঝুলি না তুলেই নাচ গান হল্লা।

সকলে ॥ না, না চানটানই আগে সারতে হয়।

বিসু ॥ হ্যাঁ যাতে সবাই আমাদের দেখে ভাবে আমরা স্কুলের ছেলেরা এখানে পিকনিক করছি।

কালু ॥ তা আজ যখন ডাকাতি আর হোল না, তখন এর ওর বাগান হতে দু-চারটে করে ফল ফলারি যে যা এনেছি তাই দিয়েই এখন একটা ফিস্টি হোক।

যেদো ॥ এই তো, ধামার মধ্যে ঢাকা রয়েছে।

[ধামার ঢাকাটি খুলিল এবং চমকিয়া উঠিল]

যেদো ॥ একী সর্দার, সব লোপাট!

সকলে ॥ (সবিস্ময়ে) সেকী, একধামা ফল ফলারি উধাও!

কালু ॥ চোরের ওপর বাটপাড়ি।

যেদো ॥ বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

ভোলা ॥ আমি যখন এখানে আসি, এসে দেখি রামু এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বিসু ॥ এ তবে ওরই কাজ।

সদানন্দ ॥ এত বড় সাহস, আজ রামুর একদিন কি আমা-দের একদিন।

যেদো ॥ যাবে কোথায়, আশেপাশেই কোথায় বসে ফল-গুলো একা একা মেরে দিচ্ছে।

কালু ॥ ধর ব্যাটাকে ধর।

বিসু ॥ মার ব্যাটাকে মার।

[সকলে লাঠি-সোঁটা হাতে তুলে নেয়]

শরৎ ॥ এ্যাই সব থাম।

সদানন্দ ॥ থামব, থামব কেন সর্দার। আমরা যে যখন যা পাই, এক সঙ্গে সব খাই। আজ আর ওর রক্ষে নেই।

[সকলে যাইতে উদ্যত]

শরৎ ॥ খবরদার, রামুর গায়ে হাত পড়লে, তোমাদের কারো রক্ষে নেই।

[শরৎচন্দ্র চট করিয়া তাঁহার কোমর হইতে ছোরাটি বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিলেন]

অনেকেই ॥ (ভয় পাইয়া) ওরে বাবা।

শরৎ ॥ ওই দেখ্, রামু আসছে।

কয়েকজন ॥ একী সঙ্গে আমাদের প্যারী পন্ডিতের ছেলে, কাশীনাথ।

সদানন্দ ॥ তাহলে প্যারী পন্ডিত সব জানতে পেরেছে। হেড মাস্টারের কানেও যাবে তাহলে কথাটা। তবে বুঝেই দেখ, রামুর পেটে পেটে কত বড় শয়তান।

[রামু এবং তৎসহ প্যারী পন্ডিতের ছেলে কাশীনাথের

প্রবেশ। রামুর হাতে শূন্য ধামাটা। সকলে বিস্ময়ে হতবাক। ধীরে ধীরে রামু ও কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।]

কাশীনাথ ॥ ওরে ন্যাড়া, আর আমি তোকে কখনও ন্যাড়া বলে ডাকব না। আজ দুদিন আমাদের পেটে ভাত পড়েনি, জল খেয়ে আমরা সবাই বিছানায় শুয়েছিলাম। খিদের জ্বালায় ঘুম আসছিল না কারো। ছোট ছোট ভাই বোনগুলি কাঁদছিল, কিছু করতে না পেরে মা আকুলি-বিকুলি করছিল। বাবা দু-হাতে মুখ ঢেকে গুম হয়ে বসেছিল। এমন সময় এই রামু ঘরের কড়া নেড়ে দোর খুলিয়ে এক ধামা ফল ফলারি আমাদের সামনে রেখে বলল, শরৎ সর্দার পাঠিয়েছে তোমাদের জন্য, খাও।

সকলে ॥ এ্যাঁ।

কাশীনাথ ॥ হ্যাঁ। বাবা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, এই ন্যাড়া, এই শরতাকে দুষ্টুমির জন্যে আমি কত বেত পিটিয়েছি। শরতা দেখছি মানুষ নয়, দেবতা। বাবার কথাই ঠিক, তোকে আমি ন্যাড়া বলব না রে, তুই সত্যিই দেবতা।

শরৎ ॥ ও সব বড় বড় কথা ছেড়ে দে দেখি। তোরা এখানে একটু গানটান গা, দাবাটাবা খেল। আমি কাশীনাথকে নিয়ে একটু আমাদের রঘু ডাকাতের কোষাগারে যাচ্ছি। দেখি, কাশীনাথকে আর কিছু দিতে পারি কিনা।

সদানন্দ ॥ হ্যাঁ, চাল ডাল, কাপড়-চোপড় কিছু থাকতে পারে।

কাশীনাথ ॥ কিন্তু........

[ইতঃস্তত করিতে থাকে]

শরৎ ॥ ভাবছিস বুঝি এসব চোরাই মাল, লুঠের মাল। কিন্তু তা নয় ভাই। এসবই আমরা যে যখন পারি আমাদেরই বাড়ি থেকে সাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এখানে আমাদের কোষাগারে জমা করি। দরকার মতো খরচ করি।

কাশীনাথ ॥ তোদের এত সব কান্ড কারখানা, অথচ আমি কিছু জানি না।

শরৎ ॥ পড়াশুনোয় আমাদের মন নেই দেখে আর তার ওপর মাঝে মাঝে দৌরাত্ম্য করি বলে পন্ডিত মশাই আমাদের উপর খুব চটা। আমাদের এই সব ডাকাতি-টাকাতির কথা তাঁর কানে গেলে তিনি হেডমাস্টার মশাইকে বলে দিয়ে স্কুল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিতেন না? তুই তো তাঁরই ছেলে, যদি কখনও তাঁকে বলে দিস, এই ভয়ে তোর কাছে আমরা এসব চেপে গেছি এতদিন। আয় ভাই, এবার আয়। ওরে, তোরাও আর এখানে খুব বেশী দেরী করিস না। ভোর হয়ে আসছে, যে যার বাড়ী চলে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়।

সকলে ॥ আবার তবে আমরা এখানে কবে মিলছি, সর্দার।

শরৎ ॥ আগামী অমাবস্যায়।

[কাশীনাথকে লইয়া শরতের প্রস্থান। অন্যান্যদের পূর্বোক্ত নৃত্যগীত]

তৃতীয় দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্যের অনুসরণ। সুরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র কথোপকথনরত।]

সুরেন ॥ তাহলে তুমি ছিলে দেবানন্দপুরের রঘু ডাকাত।

শরৎ ॥ বুঝলি সুরেন, বাবা রঘু ডাকাতের কাহিনীটা লিখেছিলেন, তা তাঁর যেমন স্বভাব, কোন একটা বিষয়ে বেশ কিছু দিন লিখে হঠাৎ ছেড়ে দেন—তবু যেটুকু লিখেছিলেন, সেটা খুব কম নয়। সেটা আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তাম, আর কেবলি আমার মনে ইচ্ছে হোত বড়লোকদের বাড়ীতে রঘু ডাকাতের মতো ডাকাতি করে সেই লুঠের মাল গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিই। তা সে তো আর একালে হবার নয়, তাই প্রতি অমাবস্যায় রঘু ডাকাত ডাকাত খেলা নিয়েই মেতে থাকতাম।

সুরেন ॥ মানে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে।

শরৎ ॥ যা বলেছ।

[উভয়ের হাস্য]

সুরেন ॥ এখানে এখন কী করবে মনে করেছ? শুনেছি, তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে তোমাকে ভর্তি করা হচ্ছে।

শরৎ ॥ হ্যাঁ, পড়ব। কিন্তু শুধু পড়াশুনা নিয়ে থাকতে পারব না আমি।

সুরেন ॥ কিন্তু তোমার ঐ রঘু ডাকাত-টাকাত এই ভাগলপুর শহরে চলবে না। অবসর সময়টা তোমার কাটবে কীভাবে?

শরৎ ॥ কিন্তু ভাগলপুরে তো যাত্রা হয় দেখে গেছি। আমি এখানে যাত্রা করব। বিশ্বাস হচ্ছে না? আমার দেবানন্দপুর বালক যাত্রা সঙ্ঘ কী নাম করেছে তাতো জান না। কত বড় বড় বাড়ীতে আমার এই বালক যাত্রা করতে আমাদের ধরে নিয়ে যেত। সেকী আদর। সেকী খানাপিনা।

সুরেন ॥ ভাগনে গুল দিচ্ছ না তো?

শরৎ ॥ আরে না না। গুল মারব তোর কাছে! কি করে ব্যাপারটা ঘটল জান? বোধকরি বাবাই ছেলেদের জন্য একটা যাত্রার-পালা লিখেছিলেন। আমি পড়ে দেখলাম, চমৎকার। বইটার নাম হচ্ছে 'মধুসূদন দাদা'। বাবার সেই বইটাই একটু রং-ঢং করে সাজিয়ে নিয়ে যাত্রা করলাম। সে যা একখানা যাত্রা হোত না। শোন তোকে বলছি—

চতুর্থ দৃশ্য

[দেবানন্দপুরে বালক যাত্রা সঙ্ঘ। ছেলেরা কনসার্ট বাজাইতেছে।] বনভূমি গীত-কন্ঠে শিশু নেপালের প্রবেশ।

॥ নেপালের গান ॥

আমাকে একাকী রাখিয়া তুমি কী
লুকায়ে থাক।
এ ঘন বনে আঁধার আনে
ভয় লাখ লাখ।
তব হাত ধরি ভয় পরিহরি
হই বিজন পার।

বিপদ তারণ শ্রীমধুসূদন
দেখা দাও আরবার।
[গীত-কন্ঠে মধুসূদন দাদার প্রবেশ]
॥মধুসূদন দাদার গান ॥
ডাকিস কেন ওরে এমন করে
মরমী সুরে
পারি না থাকিতে রহিতে দূরে
আপন ঘরে
অভয় আমি পার হবে তুমি
এ বনভূমি।

নেপাল ॥ মধুসূদন দাদা, আজ মা তোমার জন্যে কি দিয়েছে জান, খুব সুন্দর একটা বাতাসা।

মধুসূদন ॥ কৈ, কৈ? আমাকে দাও। তোমার মায়ের হাতের মিঠাই একটু খেলে খিদে তেষ্ঠা সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। তুমি খেয়েছ তো।

নেপাল ॥ হ্যাঁ, মধুসূদন দাদা, মা আমার জন্যও একটা দিয়েছে, আমি পাঠশালায় গিয়ে খাব। কিন্তু মধুসূদন দাদা, মা তোমাকে বলতে বলেছে আমাদের ভারী বিপদ।

মধুসূদন ॥ কেন ভাই, কি বিপদ?

নেপাল ॥ পাঠশালার পন্ডিত মশাই, যার রাম-চিমটি খেয়ে আমরা মরে যাই আর কী, সেই পন্ডিত মশায়ের বাপ মরে গেছে। আজকে হবে শ্রাদ্ধ। তাঁর হুকুম ঐ শ্রাদ্ধের জিনিসপত্রের যোগান দিতে হবে সব পড়ুয়াকে। কাউকে দিতে হবে চাল, কাউকে দিতে হবে ডাল। কেউ দেবে ময়দা, কেউ দেবে ঘি। কারও কাছে চেয়েছেন রসগোল্লা, কারও কাছে চেয়েছেন মন্ডা।

মধুসূদন ॥ তাই নাকি? তোমাকে কী দিতে বলেছেন।

নেপাল ॥ মায়ের তো মাথা ঘুরে গেছে। আমার কাছে চেয়েছেন দই। আমাদের ভাতই জোটে না, বলতো মধুসূদন দাদা, আমরা দই পাব কোথা?

মধুসূদন ॥ মা কি বলেছেন, নেপাল।

নেপাল ॥ মা বলল, বলিস তোর মধুসূদন দাদাকে। সে যদি ইচ্ছে করে সেই যুগিয়ে দেবে ঐ দই। পারবে নাকি মধুসূদন দাদা? যদি পার তবেই যাব পাঠশালায় নইলে বেত খেতে যাবে কে? খালি হাতে গেলে আমাকে মেরেই ফেলবে, পন্ডিত।

মধুসূদন ॥ না, না তুমি কিচ্ছু ভেব না ভাই নেপাল। আমি তোমাকে দই এক্ষুণি দিচ্ছি।

[ছুটিয়া বনের ভিতর গিয়া আবার তখুনি আসিয়া নেপালের হাতে ছোট একটা দইয়ের ভাঁড় দিল]

এই নাও তোমার দই।

নেপাল ॥ এইটুকু দই! আর লোক খাবে কত। অত লোকের পাতে এইটুকু দই। না না মধুসূদন দাদা, পন্ডিত মশাই দেখলেই আমাকে মেরে ফেলবে, মধুসূদন দাদা।

মধুসূদন ॥ তা আর কী করব বল ভাই। আমার এই ছোট্ট ভাঁড়টাই ছিল সম্বল। তুমি কিচ্ছু ভেব না। নিয়ে যাও। আমি এমন এক মন্তর দিয়ে দিলাম যত লোকই হোক, এই ভাঁড়ের দই খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

নেপাল ॥ তবে, আর আমার ভয় কী? আমি নিয়ে যাচ্ছি। ফেরবার সময় আবার তোমাকে পাব তো? তুমি বনটা পার করে না দিলে আমি বাড়ী যেতে পারি না। চোর ডাকাত, বাঘ-ভাল্লুক সবই তো এই বনে থাকে। তুমি আমার সঙ্গে থাক বলে, কেউ আমার কিছু করতে পারে না। আচ্ছা আমি তাহলে চলি।

মধুসূদন ॥ এস ভাই।

[উভয়ের প্রস্থান। গীতকন্ঠে বিবেকের প্রবেশ।]

॥ বিবেকের গান ॥
ওরে মন, জেনো এযে গহন বন
এ সংসারে কেউ নয়রে আপনজন
স্বজন যে জন, তার সন্ধান কর হে মন।
খোঁজার মত খুঁজবে যখন, তিনি দেবেন দরশন।
ক্ষ্যাপা তাই তার নিয়েছে স্মরণ
(তাই) ভরসা করে বলি তোদের
ভজ শ্রীহরি, মধুসূদন।

[আর্তকন্ঠে নেপালের ছুটিয়া প্রবেশ]

নেপাল ॥ মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা কোথায় তুমি, শিগগীর এস। পন্ডিত মশাই আমাকে মেরে ফেলতে ছুটে আসছে। মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা, কোথায় তুমি আমাকে বাঁচাও।

[মধুসূদন ছুটিয়া আসিল।]

মধুসূদন ॥ কী ভাই নেপাল, ব্যাপার কি? তুমি ভয়ে কাঁপছ যে।

[নেপাল মধুসূদনকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—]

নেপাল ॥ পন্ডিত মশাই আমাকে মারতে ছুটে আসছেন।

মধুসূদন ॥ কেন, কেন? তুমি তো এক ভাঁড় দই দিয়েছ।

নেপাল ॥ হ্যাঁ দিয়েছি। সেটা তাঁর হাতে দিতে, তিনি বললেন এতবড় ব্যাপারে এতটুকু একভাঁড় দই। বলেই বেত বের করে তেড়ে আমায় মারতে এলেন। আমি ছুটে পালিয়ে এসেছি দাদা।

মধুসূদন ॥ না, না তোমার কোন ভয় নেই ভাই। আমি বলছি তুমি দেখ পন্ডিত মশাই তোমার ওপর মোটেই চটবেন না, বরং ভারী খুশী হবেন। আমি বলছি, তুমি দেখ।

[নেপথ্যে পন্ডিত মশায়ের উচ্চ চীৎকার ন্যাপলা, ন্যাপলা, তুই কোথায়—]

নেপাল ॥ মধুসূদন দাদা, ঐ যে পন্ডিত মশাই আসছেন। তুমি আমাকে বাঁচাও, তুমি আমাকে বাঁচাও মধুসূদন দাদা।

মধুসূদন ॥ আমি বলছি তোমার কোন ভয় নেই। আমি তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমায় দেখতে পাবে, কিন্তু পন্ডিত মশাই আমায় দেখতে পাবে না।

নেপাল ॥ বল কী।

মধুসূদন ॥ হ্যাঁ। দেখ—

[পন্ডিত মশায়ের প্রবেশ]

পন্ডিত ॥ এই যে পেয়ে গেছি। ওরে বাবা ন্যাপলা, তোকে ঐ দইয়ের ভাঁড় কে দিয়েছিল রে? তোর মা? আমাকে নিয়ে চল তার কাছে।

নেপাল ॥ না, মা তো দেয়নি। দিয়েছে মধুসূদন দাদা।

পন্ডিত ॥ মধুসূদন দাদা? সে আবার কে? কোন যাদুকর?

নেপাল ॥ না, না। তাতো জানিনে। তিনি আমার দাদা।

পন্ডিত ॥ তোর দাদা। না, না নিশ্চয়ই কোন যাদুকর। তুই আমার হাতে ঐ দইয়ের ভাঁড়টা তুলে দিতেই, আমি রাগের চোটে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম, তোকে মারতে বেত তুলতেই দেখি, দইটা সব মাটিতে পড়ে গেছে, কিন্তু ভাঁড়টা সঙ্গে সঙ্গে আবার ভর্তি হয়ে গেল। অবাক কান্ড! দই মানে যত পড়ে তত ভরে। ওখানকার লোকজন একে একে সবাই খাচ্ছে, কিন্তু ভাঁড়টা খালি হচ্ছে না। না, না কিছুতেই খালি হচ্ছে না। এমন কান্ড জন্মে দেখিনি! বল, বল, কোথায় তোর সেই মধুসূদন দাদা। আমি চাইতে এসেছি তার কাছে এক ভাঁড় টাকা। খালি হবে, সঙ্গে সঙ্গে আবার ভরে উঠবে। টাকার এমনি একটা ভাঁড় আমার চাই-ই, চাই। বল, কোথায় সে,—নিয়ে চল আমাকে তার কাছে।

নেপাল ॥ তিনি এখানেই রয়েছেন পন্ডিত মশাই।

পন্ডিত ॥ (ভেংচাইয়া) এখানেই রয়েছেন পন্ডিত মশাই। কোথায় রয়েছেন? থাকলে আমি দেখতাম না। আমার সঙ্গে মস্করা হচ্ছে।

নেপাল ॥ সত্যিই বলছি পন্ডিত মশাই, এই আমার পাশেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হাসছেন।

পন্ডিত ॥ দ্যাখ ন্যাপলা, আবার মস্করা করছিস, রাম-চিমটির ভয় নেই।

নেপাল ॥ বারে আমি দেখছি, আপনি না দেখলে আমি কি করব?

পন্ডিত ॥ বটে রে পাজী নচ্ছার, দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি—

[নেপালকে মারিতে সবেগে হাত তুলিলেন, কিন্তু আশ্চর্য, সেই হাত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হাত আর কিছুতেই নড়িল না।]

পন্ডিত ॥ এ কী আমার হাত নড়ছে না যে, সরছে না যে। এ কী হোল হাত যে আমি গুটোতেও পারছি না। এ কী কান্ড!

নেপাল ॥ তাই তো, আমাকে মারতে গিয়েছিলেন বলে, মধুসূদন দাদা আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনার ঐ দশা করেছেন। মধুসূদন দাদা, মধুসূদন দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার পন্ডিত মশাইকে ভাল করে দাও। (মধুসূদন দাদার কথা যেন শুনছে) কী বলছ? পন্ডিত মশাই আর রাম-চিমটি কাটবেন নাকি?

পন্ডিত ॥ না। না। আমি আর রাম-চিমটি কাটব না। তোকে তো নয়ই, আর কাউকেও না।

নেপাল ॥ কী বলছ মধুসূদন দাদা? পন্ডিত মশাই আর বেত মারবেন কী?

পন্ডিত ॥ না। না। আমি আর কাউকে বেত মারব না। বেত আমি নদীর জলে ফেলে দেব।

নেপাল ॥ কী? আবার কী বলছ মধুসূদন দাদা? পন্ডিত মশাই আমাদের সবাইকে নিজের ছেলের মতো ভাল-বেসে লেখাপড়া শেখাবেন কি?

পন্ডিত ॥ নিশ্চয়। নিশ্চয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি শুধু তোদের ভালবাসা নয়, রোজ তোদের দু-একটা মিষ্টিও খাওয়াব।

[হঠাৎ দেখিলেন তাঁহার স্তম্ভিত হস্ত স্ববশে আসি-য়াছে]

আঃ। এই যে হাত নড়েছে, হাত নড়েছে। ওরে বাবা! তোর এই মধুসূদন দাদা নিশ্চয়ই স্বয়ং মধুসূদন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ আর আমার বুঝতে বাকী নেই। না জানি কোন পুণ্যফলে তুই তোর ঐ দাদাকে পেয়েছিস। তুমি আমার প্রণাম নাও মধুসূদন।

[গড় হইয়া প্রণামান্তে]

বাপ ন্যাপলা, তুই আমার বুকে আয়। তোকে আমি বুকে ধরে পবিত্র হই, আর মধুসূদনের দয়া ভিক্ষা করি।

[নেপালকে কোলে তুলিয়া লইয়া]

চল বাবা, তোর মাকেও নমস্কার করে আসি। যার এমন ছেলে, তিনিও পরম এক দেবতা।

নেপাল ॥ মধুসূদন দাদা, আমি যাব? কী বলছ, তুমি খুব খুশী হয়েছ? মায়ের কাছে ওনাকে নিয়ে যেতে বলছ?.........

পন্ডিত মশাই, মধুসূদন দাদা আপনার ওপর খুশী হয়েছেন, আপনার খুব ভাল হবে, বলছেন। চলুন, আমাদের বাড়ীতে চলুন।

পন্ডিত ॥ চল, বাবা চল। মধুসূদন, মধুসূদন আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। অর্থ চাইতে এসে পরমার্থের পরশ পেয়েছি। অর্থ আর চাই না, চাই পরমার্থ। দয়া কোরো, দয়া কোরো শ্রীমধুসূদন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।

[নেপালকে কোলে লইয়া প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্যের অনুসরণ। সুরেন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র।]

সুরেন ॥ নিশ্চয়ই এই পন্ডিতটা সাজতে তুমি।

শরৎ ॥ না। পন্ডিত সাজত সদানন্দ। তবে ওদের শিখিয়ে ছিলাম আমি। আমিই ছিলুম ওদের মোশান মাস্টার। আমার বন্ধু কাশীনাথ করত মধুসূদন দাদা। আর ন্যাপলা যে সাজত তার সত্যিকার নামও ছিল ন্যাপলা। গানগুলার সুর দিয়েছিলুম আমি। ওরা গেয়েওছিল বেশ ভাল আর লোকেরও খুব ভাল লেগেছিল।

সুরেন ॥ ভাল লাগবারই কথা। এই বয়সেই গানে তুমি ওস্তাদ জানি। কিন্তু তুমি যে সকলের জানা সেই মধু-সূদন দাদার গল্পটা এমন রংচং করে সাজিয়েছ তাতে সত্যই অবাক হচ্ছি।

শরৎ ॥ না না সুরেন—বাবার লেখার ওপর আমি হাত চালাই নি। রংচং করেছিলুম শুধু সাজ-পোশাকে আর সিন-সিনারিতে। বাবা সত্যিই লেখেন ভাল, দোষ ঐ যা বলছি, কোন লেখাই শেষ করেন না। এ নাটকেরও কিছুটা বাকী রেখেছিলেন আমি সেটা শেষ করেছি।

সুরেন ॥ তবে আর কী, লিখতে তো তবে শুরু করেছ। তুমি যা গল্প বলতে পার, তা আর আমাদের মধ্যে কেউ পারে না। অনেক গল্প তুমি আমাদের বানিয়েও শোনাতে। ভূতের গল্প, চোরের গল্প, ডাকাতের গল্প— কতক সত্যি, কতক মিথ্যে। কিন্তু এমন করে সাজিয়ে বলতে যে আমরা থ হয়ে শুনতাম। তাছাড়া লুকিয়ে

লুকিয়ে এই বয়সেই কত না ছাপা গল্প উপন্যাস তুমি পড়ে, তা আবার আমাদের শোনাতে। তুমি যদি নিজে গল্প লেখ, আমি জোর করে বলতে পারি, তা বই হয়ে বেরুবেই।

শরৎ ॥ তবে শোন সুরেন, আমি দেবানন্দপুরে তিন-তিনটে বড় গল্প লেখায় হাত দিয়েছি—কোরেল গ্রাম, কাক বাসা, আর কাশীনাথ। তিন-তিনটে খাতায় আমি লিখে নিয়ে এসেছি। লেখা যেন আমার এখন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পান, তামাকও নেশা, কিন্তু লেখার নেশার কাছে কিছু নয়। যখন লিখি, তখন আমার চারপাশের মানুষদের মনে রেখেই আমি লিখি। কিন্তু লিখতে লিখতে আমি যেন অন্য জগতে চলে যাই। সুরেন, শুধু যে আমি লিখব তা নয়। এখন হতে তোদেরও লিখতে হবে। ভাগলপুরে আমরা একটা সাহিত্যের বাগান তৈরী করব। আমি কী ভাবি জানিস সুরেন, বড় দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে আমি মানুষ হচ্ছি, কিন্তু আমি একা নই, যে দিকে তাকাই দেখি মানুষের দুঃখ আর দুঃখ। সবারই গোড়ার কথা হচ্ছে, কিছু হৃদয়হীন লোকের অনাচার আর অবিচার। কিছু স্বার্থপর লোকের শোষণ আর নিপীড়ন। এদের বিরুদ্ধে আমার কলম চালাব, এই হোল আমার পণ। তুই আমার সঙ্গে আছিস তো।

সুরেন ॥ নিশ্চয়ই আছি।

[শরৎ আবেগে সুরেনকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিলেন। পরে ধীরে আলিঙ্গন-মুক্ত হইলেন।]

শরৎ ॥ আমার কাশীনাথ গল্পটা যেভাবে শুরু করেছি। তোকেই আজ তা প্রথম শোনাচ্ছি।

সুরেন ॥ শোনাও ভাগে।

শরৎ ॥ কিছুটা নিশ্চয়ই শোনাব। শোন। তোকে দিয়েই আমি বউনি করছি—

[পকেট হইতে একটা পান্ডুলিপি বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন ঃ]

"রাত্রি চারটার সময় স্নানান্তে পূজাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া টিকিটি বেশ উঁচু করিয়া বাঁধিয়া কাশীনাথ যখন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের টোল ঘরের বারান্দায় বসিয়া দর্শনের সূত্র ও ভাষ্য গুন্ গুন্ স্বরে কণ্ঠস্থ করিত তখন তাহার বাহ্য-জগতের কথা মনে থাকিত না। প্রশস্ত ললাট দীর্ঘাকৃতি কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দর্শনশাস্ত্র গহনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে দিশেহারা করিয়া ফেলিত। তাহাকে তদবস্থ কত লোক কত বলিত। কেহ বলিত যে তাহার পিতার ন্যায় পন্ডিত হইবে। কেহ বলিত পিতার ন্যায় পড়িয়া পড়িয়া হয়ত বা পাগল হইয়া যাইবে।"

(অন্যের পদশব্দ শুনিয়া 'ঐ কে যেন আসছে। চল্ এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোনখানে বসি'। বলিয়া উভয়ের পলায়ন।)

মহাজীবনের মণিকণা

শৈলেনকুমার দত্ত

ছদ্মবেশ ধারণে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর জুড়ি ছিল না—কখনও তেলেভাজা বিক্রেতা, কখনও ফলওলা, কখনও ডিমওলা। লাহোরে থাকাকালে একবার পুলিস তাঁকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু রাসবিহারীকে তাঁরা ধরতে পারেন নি। তিনি নিখুঁতভাবে ঝাড়ুদার সেজে একহাতে ঝাঁটা আর একহাতে নোংরা বালতি নিয়ে বেরিয়ে যান। পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী যা সাজতেন তিনি, তাই হত অনবদ্য। উত্তর ভারতে তিনি পরিচিত ছিলেন 'সতিন্দর চন্দার' নামে, আর পাঞ্জাবে পরিচিত ছিলেন 'দরবারা সিং' নামে। এই অনবদ্য ছদ্মবেশেই তিনি রাজা পি. এন. টেগোর নাম নিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে জাপানে পলায়ন করেন ১৯১৫ সালের ১২ই মে। সেকালের বিখ্যাত পুলিস অফিসার টেগার্ট সাহেবও রাসবিহারীর ছদ্মবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি-প্রদান নিষিদ্ধ ছিল। একদিন সকালে বেড়িয়ে ফিরছিলেন দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি দেখলেন, ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের হেড মাস্টার জগদানন্দ রায় একটি ছেলের কান ধরে সজোরে মলে দিচ্ছেন। নিজের কুটিরে ফিরে এসে দ্বিজেন্দ্রনাথ জগদানন্দকে একটি চিরকুটে লিখে পাঠালেন—

শোনো হে জগদানন্দ দাদা,
গাধারে পিটিলে হয় না অশ্ব
অশ্ব পিটিলে হয় যে গাধা!

দিগ্বিজয়ীর দিনান্ত
ধীরেন্দ্রলাল ধরের সম্পূর্ণ উপন্যাস

অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক।

বাদশাহী অবস্থার তখন চরম দুর্গতি।

বাদশাহ শক্তিহীন। উজির, দেওয়ান, সুবাদার, আমীর-ওমরাহ থেকে শুরু করে সমস্ত রাজকর্মচারী ও ক্ষমতাবান পদস্থ ব্যক্তিরা সততা ও কর্মনিষ্ঠা হারিয়ে ফেলেছে। পদস্থরা লুঠ-তরাজ জুলুম চালিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করছে, নিম্নস্থরা ঘুষ নিয়ে চুরি করে পয়সা কামাচ্ছে। কিছু বাজে লোক শুধু মোসাহেবি ও দালালি করে নিজের অবস্থা গুছিয়ে নিচ্ছে। আজ যে বন্ধু, অর্থের জন্য কাল তার সঙ্গে শত্রুতা করতে বাধছে না। সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা বাদশাহের চারিপাশ থেকে শুধু নয়, দিল্লীর জনপদ থেকে যেন হারিয়ে গেছে। ধূর্তামি নষ্টামি ষড়যন্ত্র ও গুপ্তশত্রুতা মানুষের গুণ ও বুদ্ধিমত্তা বলে স্বীকৃতি পাচ্ছে। অর্থের মাপকাঠি দিয়ে মানুষের বিচার হচ্ছে, যার যত সম্পদ সে ততো সম্মানী।

বাদশা মহম্মদ শাহ্ নামেই বাদশা। সিংহাসনে বসে দরবার করেন, হুকুম জারি করেন, কতজনকে সুবাদার করেন, মনসবদার করেন। আর সুবা নিয়ে জায়গীর নিয়ে হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা খাজনা আদায় করে রাজকোষে কিন্তু কেউ আর টাকা পাঠায় না, নিজের ঘরে জমা করে।

বাদশার তাই টাকা নেই। দিল্লীর কেল্লায় আট হাজার বাদশাহী সৈন্য আছে, তারা মাইনে পায় না। মাসে বারো থেকে পনেরো টাকা মাইনে, তা-ও বারো-তের মাসের বাকী পড়েছে। সৈন্যরা কেল্লার ফটকের সামনে এসে হৈ-হল্লা করে নায়েব-নাজিম এসে তাদের হাতে দু-পাঁচ টাকা করে দিয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বিদায় করেন। তারা তখন সুবিধা-মত লুঠ-তরাজ ও জুলুম চালায়। বাদশাহী ফৌজকে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। এই অরাজকতাই তখন দিল্লীবাসীদের মেনে নিতে হয়েছে।

অত্যাচারের জন্য বাদশাহের দরবারে নালিশ করেও কেউ আজ পর্যন্ত কোন প্রতিকার পায়নি।

দু-তিন পুরুষের বাসিন্দা যারা, দিল্লী ছেড়ে সহসা তারা অজানা জায়গায় চলে যেতেও পারে না। শহর ছেড়ে গেলেই যে প্রাণ রক্ষে পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পথে বেরুলেই সিপাহীর ভয়, ঠগীর ভয়। তারা পরনের জামাকাপড় অবধি কেড়ে নেয়, প্রাণটাও যায় বেঘোরে।

এ এক অদ্ভুত রাজ্য। রাজা থেকেও নেই, আইন আছে কিন্তু আইন মানার লোক নেই, আইন মানাবার মত রাজ-শক্তিও নেই।

তবু মানুষ সুদিনের আশায় দিন গুণে যাচ্ছে—সাধারণ মানুষের ভগবানই ভরসা।

দিনে দিনে কিন্তু সংকট বাড়ছে। মারাঠা, রাজপুত, রুহেলা, আফগানী, তুরানী, ঠগী সবাই মিলে টাকা লুঠতে ব্যস্ত। সাধারণ মানুষের কথা কেউ আর ভাবছে না।

এই অরাজক আমলের দুটি দশকের দশটি বছর জুড়ে আমাদের এই কাহিনী—১৭৩৭ থেকে ১৭৪৭ সাল অবধি এক সৈনিকের জীবনকথা। সে মহাবীর মুনশী।

ভীম সিং ছিলেন জয়পুরের রাজপুত। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আকর্ষণ ছিল রাজদরবারের দিকে। রাজ-সরকারে সে বসে চাকরি করবে। সেইজন্য তখনকার দিনের যে শিক্ষা—সাধারণ লিখতে-পড়তে জানা আর টাকা-আনা-পয়সার হিসাব—তার সঙ্গে লাঠিখেলা, অসিখেলা, ঘোড়ায় চড়া ও বন্দুক চালানো সবই সে শিখেছিল, তবে ভাল করে মক্‌শো করেছিল হাতের লেখাটা। দিনে দিনে তার হাতের লেখা হয়েছিল মুক্তোর মতো। একদিন জয়পুরের মহা-রাজাকে সে তার হাতের লেখাটা দেখালো, বললো—রাজ-সরকারে আমি একটা কাজ চাই।

জয়পুরের মহারাজা ভীম সিংকে দরবারের মুনশীর কাজ দিলেন। ভীম সিংয়ের কাজ ছিল প্রতিদিন দরবারের সব কথা লিপিবদ্ধ করা।

মহারাজা সেবার দিল্লী এসেছিলেন বাদশার দরবারে। ভীম সিংও এসেছিল মহারাজার সঙ্গে। তার হাতের লেখার ঢং তখন আরো সুদৃশ্য হয়েছে। বাদশা একদিন সেই হাতের লেখা দেখে বললেন,—সুন্দর লেখার ছাঁদ তোমার। আমার দরবারে মুনশী হয়ে থাকো।

এ আশা ভীম সিংয়ের দীর্ঘদিনের। মহারাজাকে বলে সে বাদশাহী দরবারে মুনশী হলো। সারা ভারতের কত ঘটনাই তখন থেকে তার কলমে লিপিবদ্ধ হতে থাকলো। কত রাজা মহারাজা আমীর ওমরাহকে সে দেখতে লাগলো প্রতিদিন।

অল্পকালের মধ্যেই লোকে তার আসল নাম ভুলে গেল, পরিচিত হলো সে দরবারী মুনশী বলে।

কিছুদিন আগে মারাঠীরা দিল্লীতে প্রচন্ড উৎপাত করে। সেই সময় মুনশীজীর বাড়ীও তারা লুঠ করে। কিন্তু লুঠ করে সোনাদানা কিছু না পেয়ে মারাঠী সর্দার বলে,—ব্যাটা দরবারী মুনশী, ব্যাটার ঘরে দু-দশখানা মোহর নেই তা কি হয়? মাটির নীচে কোথাও লুকানো আছে। দু-চার ঘা পিঠে পড়লেই মুখ ফুটবে।

মারাঠীরা মুনশীজীকে বেদম প্রহার করে। ভীম সিংয়ের ডান হাতে বিশেষ চোট লাগে। সে হাত আর ভাল হয়নি, লিখতে গেলে হাত কাঁপে। যে লেখার জন্য তার এত কদর, সেই লেখাই বিগড়ে গেল। চাকরি আর রইল না। বাদশা ভীম মুনশীর পেন্‌শনের ব্যবস্থা করে দিলেন মাসিক ত্রিশ টাকা।

কিন্তু সে টাকা পুরো মুনশী হাতে পায় না। বাদ-শাহের মীর বকসীর সই হয়ে নগদ টাকা হাতে নিতে মধ্য-পথে তিনজন কর্মচারীকে দস্তুরি দিয়ে খুশী করতে হয়। তাতে মাসে শেষ অবধি পঁচিশটি টাকা হাতে আসে।

সেই টাকাও আবার সবসময় ঠিকমত জোটে না। বাদশার কোষাগার শূন্য। ফৌজরাই মাইনে পায়নি একবছর, তারা কাজ করছে, আর মুনশীজীর তো পেনশন, কাজের সে বাইরে। তাই মাসিক বরাদ্দ টাকা মুনশীজী কখন তিন-মাসে, কখন বা চারমাসে একবার পান।

শেষে মুনশীজী একদিন দেখা করলো বাদশার সঙ্গে, বললো—জাঁহাপনা, আমি তো উপোস করার অবস্থায় আছি, আমার ছেলেকে যা হয় একটা কাজ দিন।

বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন— তোমার ছেলে তোমার কাজটা করতে পারবে? হাতের লেখা কেমন?

ভীম সিং বললো—হুজুর, ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল না,

তবে তলোয়ার চালাতে, বন্দুক ছুঁড়তে ভাল জানে। ঘোড়ার পিঠে বসেই বন্দুক চালাতে পারে।

তাহলে তাকে ফৌজে ভর্তি করে দাও।—বাদশা বললেন ঃ সওয়ারী ফৌজে মাসে ত্রিশ টাকা করে পাবে।

ভীম সিং হাত জোড় করে বললো—হুজুর, একটাই মাত্র ছেলে। ফৌজে ভর্তি করতে ভয় করে। কখন জান চলে যাবে, বুড়ো বয়সে আমাদের দেখবার কেউ থাকবে না। আপনি ওকে পাহারাদারির কোন কাজে মোতায়েন করে দিন হুজুর।

বাদশা ক্ষণেক কি যেন ভাবলেন তারপর বললেন—বেশ, আমি তাকে তোষাখানার পাহারাদার করে দেব। তুমি তাকে একবার এনো দিকি আমার দরবারে।

—বাইরের ফটকে তাকে রেখে এসেছি হুজুর, আপনার হুকুম পেলে এখনি নিয়ে আসতে পারি।

—নিয়ে এসো।

ভীম সিং তখনই ছুটে গিয়ে ফটকের সামনে থেকে ছেলেকে ডেকে নিয়ে এলো।

মহাবীর সিং কুর্নিশ করে বাদশার সামনে দাঁড়ালো।

বাদশা দেখলেন বছর সতের-আঠারোর জোয়ান ছেলে, গৌরবর্ণ, পেশীবহুল দেহ। বললেন—এ তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। রাতে তোষাখানার পাহারাদারি করতে পারবে, ভয় করবে না?

মহাবীর জবাব দিল—কিল্লার মধ্যে ভয় কি, হুজুর! এখানে হুজুরের ফরমান পেলে আমি কিছুই পরোয়া করি না।

—সারারাত জাগতে হবে, দিনের পর দিন রাত জাগতে পারবে?

—নোকরকে আপনি যা হুকুম করবেন, তাই করবো। দিনে ঘুমুবো রাতে জাগবো।

—ভাঙ্ খাওয়ার অভ্যাস আছে?

—না, হুজুর।

—মাঝে মাঝে রাতে আমি খবরদারি করতে বেরোই। যদি কোনদিন দেখি তুমি ঘুমুচ্ছ, তাহলেই নোকরি খতম হবে।

—কোনদিনই ঘুমুবো না, হুজুর।

ভীম সিং মুনশীর ছেলে মহাবীর সিং মুনশীর বাদশাহী দরবারে চাকরি হয়ে গেল—রাতে তোষাখানা পাহারা দেওয়া।

চাকরি তো হলো, কিন্তু বেতন কই? দিন চলে না।

রাজপ্রাসাদের কর্মকর্তা মীর বকসীকে টাকার কথা বললে, পাঁচ টাকার বেশী পাওয়া যায় না।

দিনে দিনে সেই পাঁচটি টাকাও আবার দুটাকা নয়তো তিনটাকায় নেমে আসে।

ওদিকে মুনশী সাহেবের ভাতাও তো মাসের পর মাস পাওয়া যায় না।

রাজকোষে টাকা নেই।

সৈনিকেরা মাঝে মাঝে বেতন না পাওয়ার জন্য গোলযোগ বাধিয়ে কিছু কিছু টাকা আদায় করে নেয়, তাছাড়া নাগরিকদের কোন কোন পল্লীতে লুঠতরাজ করেও তারা পুষিয়ে নেয়।

কিন্তু মহাবীর সিং কি করবে? সে তো সৈনিক নয়।

মহাবীরের দিন চলে না। মুদী বলে দিয়েছে, নগদ দাম না দিলে আর মাল দেবে না। সামান্য লকড়িওয়ালাও এখন শক্ত কথা বলতে ছাড়ে না। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—ঠেলায় কাঠ আনছিলাম মুনশীজী, পথে ফৌজী সিপাইরা গাড়ী লুঠ করে নিলে, তুমি দুপুরে না ঘুমিয়ে আমার সঙ্গে চলো, ঠেলায় করে গাছ কেটে আনবো, তুমি বন্দুক নিয়ে সঙ্গে আসবে। সিপাহী সঙ্গে দেখলে আর লুঠ হবে না। আমি একমণ কাঠ তোমায় এমনি দেবো।

মহাবীরের সম্মানে ঘা পড়ে। বাদশাহের তোষাখানার পাহারাদার সে, একজন সামান্য লকড়িওয়ালা তাকে কাঠ পাহারাদারের কাজ করতে বলে! সে ধারে কাঠ নেয়, টাকা বাকী রাখে বলেই তো কাঠওয়ালা একথা বলার সাহস পেয়েছে। নাঃ, এ অবস্থার একটা প্রতিকার তাকে করতেই হবে। বাড়ী এসে মহাবীর বললো—রান্নার কাঠ আজ আর পাওয়া যাবে না।

মা বললো—কাঠ পেলেই বা কি হবে, আটা তো নেই, ডালও নেই, রাঁধবো কি? আমি তাই সকালেই বাসনওয়ালার কাছে একখানা থালা বেচে এসেছি। তা দিয়ে ছাতু এনেছি, লংকা এনেছি, এবেলা ওবেলা চলে যাবে, কালও সকালে খাওয়া হবে! কাল যেভাবেই হোক মীর বকসীকে বলে দু-তিন টাকা নিয়ে আসার চেষ্টা করিস।

মহাবীর বললো—টাকা ওরা দেবে না। বাদশার টাকা নেই।

মা বললো—নোকর-চাকরকে দিয়ে কাজ করাবে আর মাইনে দেবে না? বাদশার টাকা নেই, মোহর আছে, হীরে-জহরৎ আছে। হীরে-জহরৎ বেচে লোকের মাইনে দিক, নাহলে বাদশাহী তখ্‌ত ছেড়ে বনে চলে যাক। এমন বাদশাহে দরকার কি?

মহাবীর বললো—হীরে-জহরৎ বাদশা বেচতে পারবে না, বেচবো আমরা। আমরা তো তোষাখানায় পাহারা দিই, আমরাই হীরে-জহরৎ লুঠ করবো। না খেয়ে তো আর দিন চলবে না। দু-তিন টাকা ভিক্ষে নিতে আর ইচ্ছা করে না।

ভীম সিং দাওয়ার উপর চারপায়ায় বসেছিল, বললো—হুঁশিয়ার হয়ে কথা বল রে! এ কথা বাদশাহের কানে গেলে নোকরি যাবে।

মহাবীর বললো—নোকরি কোথায়? এ তো বেগার কাজ।

—হিন্দুস্থানের বাদশাহের নোকরি, এর তলবের কি কোন মার আছে? এ টাকা একদিন পাওয়া যাবেই।

—সে তো দেখছি, তুমি এক বছরে ভাতার একটি টাকাও পাওনি। না খেয়ে মারা গেলে টাকায় আর কি হবে? আর টাকা তখন দেবেই বা কে?

—সবই নসিব। তকদিরে যা আছে, তা তো ভুগতে হবেই।

—আমি আজ রাতেই নসিব বদল করবো।

—কি করবি? তুই একা কি করতে পারিস?

—কাল সকালে দেখবে কি করেছি।

—চুরি করবি নাকি? না, ডাকাতি?

—যা করবো, কাল সকালে দেখবে। উপোস করে আমি বাদশাহী নোকরি করবো না।

—কোন গোলমাল হাঙ্গামে যাস না রে বেটা। হুজো-

তের মধ্যে পড়লে জান-মান দুই-ই, যাবে পেটও ভরবে না।

মহাবীর সে কথার জবাব দিল না। ঘরের মধ্যে চলে গেল।

দেওয়ান-ই-খাসের পাশে যে পথটি সোজা কেল্লার পাঁচিলের পাশে চলে গেছে, সেইখানেই পাঁচিলের ধার দিয়ে কয়েকখানি ঘর। সেই ঘরের নীচেই তোষাখানা। একটা ছোট দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে নীচে নেমে যেতে হয়। সেই দরজায় একটা মস্ত তালা ঝোলানো আছে। একমাত্র মীর বকসীর কাছে আছে তার চাবি। প্রয়োজন মত তালা যখন খোলা হয়, তখন চারজন কৃপাণধারী খোজা দাঁড়িয়ে যায় দরজার দুপাশে, মীর বকসী একা ঢুকে যান, একা বেরিয়ে আসেন। বাইরে থেকে ভিতরটা অন্ধকার দেখায়, কিন্তু মীর বকসী কখনো কোন সময় একটা লন্ঠন নিয়েও নামেন না।

যাক সে কথা, তোষাখানায় হীরে-জহরৎ বা মোহরের সঞ্চয় কত আছে, তা মীর বকসী ছাড়া আর কেউ জানে না। মীর বকসী আজ অবধি কাউকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নামেন নি।

রাতে এই তালাবন্ধ দরজাটাই মহাবীরকে পাহারা দিতে হয়। কখনো সে বসে থাকে, কখনো বা ঘুম পেলে পায়চারি করে। দুপুরে রাতে প্রাসাদ যখন নিঝুম হয়ে অন্ধকারে ডুবে যায়, তখন মহাবীরের আগে গা ছম্‌ছম্‌ করতো, দিনে দিনে এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আগেকার সেই নিঃসঙ্গ ভয়টা এখন আর নেই।

আজ সন্ধ্যার পর পাহারা দিতে এসে মহাবীর সিং তালাবন্ধ দরজাটার পাশে চুপচাপ বসে রইল। ঘন্টা খানেক বসে বসেই কেটে গেল। কেল্লার ফটকে রাত প্রথম প্রহর-শেষের ঘন্টা বাজলো। মুক্ত কৃপাণ কাঁধে নিয়ে সর্দার খোজা তদারক করে গেল—পাহারাদার মুনশীজী!

মহাবীর উঠে দাঁড়ালো, জবাব দিল—সেলাম!

—খোদা হাফেজ!

সর্দার খোজা এগিয়ে গেল।

মহাবীর কয়েকবার পায়চারি করলো। এদিকে এখন আর কেউ আসবে না। আবার সেই রাত বারোটায় সর্দার খোজার খবরদারি।

মহাবীর বসলো। কুলুপ দেওয়া দরজার উপরের পাথরখানা হাল্কা। সেই পাথরখানার জোড়ের মুখে একখানি ছোরা দিয়ে সে ঘষতে শুরু করলো। এই পাথরখানা তুলে ফেলে সে তোষাখানায় ঢুকবে। আজ রাতেই ঢুকবে, যা পাবে নেবে। যদি নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তাহলে সারাজীবন আর খাওয়া পরার কথা ভাবতে হবে না। আর যদি ধরা পড়ে, এই দুনিয়া থেকেই তার ছুটি হয়ে যাবে। খাওয়া পরার ভাবনাও আর থাকবে না।

রাত দুপুরের ঘন্টা বাজলো, মহাবীর দাঁড়িয়ে উঠে পায়চারি শুরু করলো। খিলানের আড়াল থেকে দেখা গেল সর্দার খোজার তলোয়ারখানা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। সর্দার সামনে এলো, ডাক দিল—মুনশীজী!

—সেলাম।

—খোদা হাফেজ!

সর্দারের ছায়া খিলানের আড়ালে হারিয়ে গেল। মহাবীর আবার ছোরা ঘষতে বসলো।

রাত তৃতীয় প্রহরের ঘন্টা যখন বাজলো, তখন ইস্পাতের ছোরার তীক্ষ্ম ফলা পাথরখানাকে চারপাশে ঢিলা করে ফেলেছে। সর্দারজীর তদারকির পর পাথরের ফাঁকে ছোরা ঢুকিয়ে দিয়ে মহাবীর চাড় দিতে শুরু করলো। পাথরখানি উঠে পড়লো। মহাবীরের গায়ে ক্ষমতা ছিল, দুহাতে সে পাথরখানি তুলে ফেললো। ছোট একখানি টালি, একটি মানুষ গলে যাবার পক্ষে পর্যাপ্ত। মহাবীর ফোকর দিয়ে নীচে নেমে গেল।

মহাবীরের জেবে ছোট ছোট কাঠির মুখে কাপড়-জড়ানো তেলে-ভেজানো মশাল ছিল। চকমকি ঠুকে সে একটি মশাল জ্বাললো। সেই আলোয় দেখলো সামনে দুজন মানুষ চলার মত পথ। সেই পথে কয়েক হাত গিয়েই এক খিলান। খিলান পার হয়েই বড় দালান, দালানের গায়ে সারি সারি কাঠের সিন্দুক, ডালায় বড় বড় কুলুপ আঁটা। এই তালা এখন ভাঙতে হবে—এ তো অনেক সময় লাগবে। তাহলে?

নজরে পড়লো একধারে কয়েকটা মাটির কলসী রয়েছে।

মহাবীর সেইদিকে গেল।

কলসীগুলি মোহরে ভরা।

মহাবীর আর চিন্তা করলো না। মুঠো মুঠো মোহর তুলে জামার দুটি জেব ভর্তি করলো। তারপর ফিরে এলো আবার সেই ফোকরের মুখে।

লোহার আঁকশিতে সে দড়ি বেঁধে এনেছিল। মাথার উপর ছুঁড়ে দিল আঁকশি। বার পাঁচেক ছোঁড়ার পর আঁকশি আটকালো। মহাবীর সেই দড়ি ধরে উপরে উঠতে শুরু করলো।

ব্যস্ততার মধ্যে মহাবীর কিন্তু ভুল করলো—আঁকশিটা শক্ত হয়ে আটকেছে কিনা দেখেনি। ফোকরের মুখোমুখি তখন প্রায় সে উঠে এসেছে, এমন সময় হাত বাড়িয়ে ফোকরের কিনারা ধরতে গিয়ে হাতটা পিছলে গেল, দড়িটা দুলে উঠলো, পরক্ষণে কট করে খুলে গেল আঁকশিটা। ধুপ করে মহাবীর পড়ে গেল ফোকরের মধ্যে।

তখনই সামলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে দেখলো ডান পা আর ফেলতে পারছে না। ফেলতে যেতেই পায়ের 'গোছ' ঝিম ঝিম করে উঠলো।

তাড়াতাড়ি পা মালিশ করে নিয়ে মহাবীর আঁকশি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু মালিশ করার ফলে এবার পায়ের মধ্যে শুরু হলো যন্ত্রণা। কে যেন পায়ের মধ্যে সূচ বিঁধিয়ে দিচ্ছে মনে হয়। মাঝে মাঝে চিড়িক দিয়ে উঠছে কোমর অবধি।

এক পায়ে দাঁড়িয়েই মহাবীর আঁকশি ছুঁড়লো। এবার প্রথম বারেই আঁকশি আটকালো। মহাবীর আর ভুল করলো না। দড়ি টেনে দেখলো। তারপর কোনমতে উপরে উঠে এলো।

পাথরখানাও সে যথাযথ উপরে লাগিয়ে ফোকর বন্ধ করে দিল। পাথরের ফাঁকের ধুলোবালিও রুমাল দিয়ে হটিয়ে দিল। কিন্তু তখন আর তার নড়ার শক্তি নেই। পায়ের যন্ত্রণা মাথায় উঠে গেছে। বিষম চিড়িক চিড়িক করছে মাথার মধ্যে। পা একটু নাড়লেই অসহনীয় যন্ত্রণা।

মহাবীর সেইখানেই শুয়ে পড়লো।

ভোর হয়ে আসছে। কিন্তু মহাবীর শুয়ে আছে নিশ্চল।

ভোরের আলোয় পূর্বাকাশ ফর্সা হবার মুখেই সর্দার খোজা নিয়মিত দেউড়িতে আসে সানাইওয়ালার খবরদারি করতে। সানাইওয়ালা দেউড়ির মঞ্চেই ঘুমোয়, সর্দার তাদের ডেকে দিয়ে আসে। ঊষার আলোয় সারা আকাশ যখন সাদা হয়ে যায়, পূর্ব দিকে লাল আভার আভাস জাগার মুখেই দেউড়ির সানাই বেজে ওঠে।

তারপর সর্দার খোজা রাতের পাহারাদারদের খবরদারি করে ছুটি দিয়ে দেয়। সেদিনও যথারীতি কোষাগারের কাছে এসে সর্দার হাঁক দিল—পাহারাদার মুনশীজী!

কিন্তু মুনশীজী দাঁড়ালো না, সাড়াও দিলে না।

—মুনশীজী!

সাড়া নেই।

সর্দার খোজা কাছে এলো; দেখলো, মুনশীজী পড়ে আছে, জ্ঞান নেই।

বাদশা মহম্মদ শাহ্ দেওয়ান-ই-আম-এ আর বসেন না। বিশেষ ব্যাপার না থাকলে বসে কি হবে! দরবারের কোন জৌলুস নেই, সামন্ত রাজারা আসে না, সুবাদাররা আসে না, কখনো বা প্রধান উজিরকেও ডেকে পাঠাতে হয়। শুধু কয়েকজন কর্মচারী নিয়ে আম্-দরবার হয় না।

বাদশা সকালে দেওয়ান-ই-খাস-এ বসেন। ছোট ছোট ঘরোয়া ব্যাপার খাস দরবারেই সম্পন্ন হয়।

সেদিন দরবারে বসতেই বাদশার নজরে পড়লো, দালানের নীচেই চারজন খোজা একটি ঝোলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরক্ষণেই সর্দার খোজা আ-ভূমি কুর্নিশ করে সামনে এসে দাঁড়ালো। বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি?

—হুজুর, চুরি।

—চুরি?

—তোষাখানার পাহারাদার মহাবীর মুনশী তোষাখানা থেকে মোহর চুরি করেছে, তার পিরানের জেব মোহরে ভর্তি। পালাবার সময় পায়ে চোট লেগে সে পড়ে ছিল তোষাখানার দরওয়াজার পাশে। তাকে ঝোলায় নিয়ে এসেছি।

—মহাবীর মুনশী? ভীম মুনশীর ছেলে?

—জী, খোদাবন্দ!

বাদশা ইশারা করলেন। ঝোলাবাহকরা ঝোলা নিয়ে এগিয়ে গেল। দেওয়ান-ই-খাসের চত্বরে উঠে, কিছুটা সামনে গিয়ে ঝোলা নামালো।

বাদশা ডাকলেন—মহাবীর!

ইতিমধ্যে পায়ে ফেটি বেঁধে, চোখেমুখে জল দিয়ে মহাবীর কিছুটা সুস্থ হয়েছে। তাড়াতাড়ি সে ঝোলার উপরেই উঠে বসলো, বসে বসেই মাথা নামিয়ে কুর্নিশ করলো।

বাদশা বললেন—মহাবীর, তুমি তোষাখানায় চুরি করেছ?

মহাবীর জানে, তার আর মুক্তি নেই, শিরচ্ছেদ সুনিশ্চিত। রাজপুত সে, বেপরোয়া—সত্যি কথা বলাই ভাল। বললো—হ্যাঁ হুজুর!

—তোষাখানার তালা ভেঙে ভিতরে ঢুকেছিলে?

—না হুজুর, দরওয়াজার উপরের পাথর কেটে ভিতরে ঢুকেছিলাম।

—কি নিয়েছিলে?

—শুধু মোহর, হুজুর।

—পালাবার সময় তোমাকে সর্দার খোজা ধরেছে?

না হুজুর, আমার নিজের বুদ্ধির দোষে আমি পা ভেঙে ধরা পড়েছি।—মহাবীর ঘটনাটি বললো।

বাদশা বললেন—তুমি যেখানে চোর ধরবে, সেখানে তুমিই চুরি করলে? আর কোথাও চুরি করার জায়গা পেলে না?

—হুজুর, আর কোথাও চুরি করলে আমার পাপ হতো। এখানে আমি চাকরি করছি, এক বছর হলো মাইনে পাচ্ছি না। কাল আমার বাড়ীতে রসুই হয়নি, মুদী ধার দিচ্ছে না, কাঠওয়ালা লকড়ি দিচ্ছে না, আমার মা আমাদের খানা-খাবার থালা বিক্রি করে ছাতু কিনে এনেছে। আজ আর ঘরে খাবার নেই। অথচ এখানে আমি লাখ লাখ মোহরের কোষাগার পাহারা দিচ্ছি। আমার পাওনা তো এখান থেকেই। চুরি করলে এখান থেকেই পাওনা চুরি করতে হবে। তাই এখানেই চুরি করেছি, হুজুর।

—চুরির সাজা তুমি জান?

—জানি, হুজুর। আমি মরলে আমার আর এই ঝামেলা থাকবে না, হুজুর। নোকরি করে পয়সা পাব না, বুড়ো বাপ-মাকে উপোসী রাখবো—এ অশান্তি আর থাকবে না। আমি বেঁচে যাবো।

বাদশা খানিক কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তোমার চুরি করা মোহরগুলি কোথায়?

—আমার কুর্তার জেবে রয়েছে, হুজুর।

—বারো মাসের মাইনে তোমার কত?

—তিনশো টাকা।

—দশখানা মোহর তুমি তাহলে নিয়ে নাও, বাকি মোহর জমা করে দাও মীর বকসীর কাছে। পা সেরে গেলে তুমি আবার যথারীতি তোষাখানায় পাহারা দেবে।

—হুজুর খোদাবন্দ।

—কী?

—আমার প্রাণদন্ড?

—না, তোমার মত সত্যবাদী মানুষ আজ আমার দরকার। আমার কর্মচারীদের মধ্যে তোমার মত মানুষ বেশী নেই। তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে একজন নির্ভীক কর্মচারী আমি হারাবো।

—হুজুর খোদাবন্দ।

বাদশা ইশারা করলেন। ঝোলাওয়ালা ঝোলা কাঁধে তুলে নিল।*

মহাবীরের পা ভাঙেনি। পতনের ফলে পায়ের গোছের হাড় মচ্‌কে গিয়েছিল, এবং তা মচ্‌কে ছিল ভালভাবেই।

ভীম সিংয়ের সঙ্গে বাদশাহের হেকিমের খাতির ছিল। ভীম সিং ছেলেকে পালকি করে নিয়ে গেল হেকিম সাহেবের কাছে। হেকিম সাহেব দেখে শুনে মালিশ দিলেন আর বলে দিলেন হাড়ভাঙা পাতা দিয়ে বেঁধে রাখতে। সেই হাড়-ভাঙা পাতা জোগাড় করতেই ভীম সিংয়ের পুরো একটা

*ঘটনাটি ঐতিহাসিক, স্যার যদুনাথ সরকার লিখিত 'ফল অফ দি মুঘল এম্‌পায়ার' বইয়ের প্রথম খন্ডে পৃষ্ঠা ৬, পঠিতব্য।

দিন লেগে গেল। তা যাক, হেকিম সাহেবের মলমটা কিন্তু খুব কাজের, সামান্য আলতোভাবে বুলিয়ে দিলেই সব যন্ত্রণা যেন ঠান্ডা হয়ে যায়। দিন পনেরো বিছানায় পড়ে থাকার পর, তবে মহাবীর মাটিতে পা ফেলে দাঁড়াতে পারলো।

রীতিমত চলাফেরা করতে মহাবীরের লাগলো আরও দিন পনেরো।

তারপর একদিন মীর বকসীর কাছে গিয়ে মহাবীর সেলাম দিল, বললো—হুজুর, আমি সুস্থ হয়েছি।

সেই রাত থেকে মহাবীর আবার পুরানো কাজে বহাল হয়ে গেল।

রাতে খোজা সর্দার তদারকি করতে এসে বললো—বাদশাহী মহলে চুরি করে আজ অবধি কেউ মাথা বাঁচিয়ে ফিরতে পারেনি। তোর নসিবের আমি তারিফ করি। তোর কথা শুনে বাদশা খুশী হয়েছেন। তোর কথা বলার বাহাদুরি আছে।

মহাবীর বললো—খেতে না পেলে কি করবো বলতো, সাহেব?

—যাক, আবার যেন চুরি করিস না।

—আর জরুরৎ হবে না। এক বছরের মাইনে পেয়ে গেছি, এখন ছমাস আর অভাব থাকবে না। ছমাস এখন ফুর্তিতে কাজ করবো।

ছমাস?—খোজা সর্দার হাসলো ঃ ছসপ্তাহ কাজ করতে হবে না। ইরাণের সুলতান ফৌজ নিয়ে আসছে, আর কদিনের মধ্যে তারা দিল্লীতে চড়াও হবে। তাদেরকে রুখবার মত মানুষ এখন কেউ নেই।

—বাদশা লড়বেন।

—বাদশা কি লড়বেন? তিনি লড়াই করতে পারলে আজ দিল্লীর এমন অবস্থা হয়? উজির, আমীর, ওমরাহরা কেউ তাঁকে ভয় করে না। সব সময় তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করছে। আর সেই সুযোগে রাজপুত, মারাঠা আর জাঠেরা লুঠতরাজ চালাচ্ছে। নাদির শাহের সামনে রুখে দাঁড়াবার মত মানুষ কই? সে রকম লড়িয়ে সেনাপতি কই?

—তাহলে লড়াই হবে না?

—মনে হয় তেমন কিছু হবে না, নাদির শাহ্ সোজা এসে দখল করবে দিল্লী।

—তাহলে কি আবার নতুন বাদশাহী শুরু হবে?

—সে খোদা জানেন। যাক্, এসব কথা নিয়ে তুমি আবার যেন কারও সঙ্গে আলোচনা করো না। এখানে কোন মানুষকে বিশ্বাস নেই। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। নিজে সাবধানে থেকো। তেমন লুঠতরাজ দেখলে পালানোর পথ রেখো।

—আপনার বহুত মেহেরবাণী, আপনার উপদেশ আমার মনে থাকবে। কিন্তু সাবধান হতে গেলে যা করা দরকার, তার অবকাশ পেল না মহাবীর সিং।

কেল্লার মধ্যে মহাবীর কারও সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করতো না। ভীম সিং তাকে সাবধান করে দিয়েছিল—ওখানে কাউকে বিশ্বাস করিস না। বাদশাহী কর্মচারীদের মধ্যে সাঁচ্চা মানুষ খুব কম আছে।

তাছাড়া রাতের কাজ, তখন আর কথা বলার মানুষ কোথায়!

সকালে বাড়ী ফিরে সারা দুপুরটা তো ঘুমিয়েই কাটে। বিকালের দিকে একবার বেরোয়, হরবংশ সিংয়ের বাড়ী যায় তামাক খেতে। বাড়ীতে বুড়ো বাপের সামনে সে তামাক খেতে পারে না। তখনই হরবংশ আর তার ভাই নারায়ণপ্রসাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা হয়।

ওরা দুভাইও কেল্লার পাহারাদার। তবে ওদের কাজ সকালে, উজির দপ্তরখানার ফটকে।

দুদিন পরেই হরবংশ বললো—এবার দিল্লী থেকে পালাতে হবে। ইরাণের সুলতান আসছে। একবার জিতলেই সে তো আগে হিন্দুদের গর্দান নেবে, তারপর অন্য কথা।

মহাবীর বললো—সে কি খুব ভাল লড়িয়ে? শুনেছি তো তার সৈন্য খুব কম।

—তাতে কি? নাদির শা জবরদস্ত লড়িয়ে। পাঞ্জাবের সুবাদার তাকে ঠেকাতে পারেনি, তাকে রুখবে আমাদের এই বাদশা! সারাদিন তো গাঁজা খায় বলে শুনি আর বিকালে আফিম। নেশাখোরের কি কোন হিম্মত থাকে!

—ইরাণের শা তাহলে দিল্লী দখল করে ফেলবে বলছ?

—আমার তো তাই মনে হয়। তারপর উজির কামরুদ্দিন সাহেব তো মদেই ডুবে আছে। মদ ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না। লড়াইটা করবে কে? আমাদের সৈন্য আছে, হাতিয়ার আছে, কামান আছে, হাতি আছে, কিন্তু তাদেরকে চালাবার মানুষ নেই। কাজেই আগে থেকে সরে পড়াই ভাল। অনেক দিন মাইনে পত্তর পাইনি, হাতে পয়সা নেই, পথে বেরুলেই তো টাকার দরকার। তাই ভাবছি, কাল বাসনকোসন খাটিয়াউটিয়া সব বেচে দিয়ে দুভাই পরশু সকালেই সরে পড়বো।

—বাদশাহী নোকরির কি হবে?

—যে নোকরিতে এক বছর তলব মেলেনি, সে নোকরি করে লাভ কি? শুধু কিল্লার সিপাই বলে লোকে খাতির করে, তাই এতদিন টিকে আছি। তুমিও বাপ-মাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে চল। পরে আর সরার ফুরসৎ পাবে না।

—দেখি, বাবাকে বলি।

—আজই বল, আর দেরী করো না।

নারায়ণপ্রসাদ কোথায় গিয়েছিল, ফিরে এলো, বললো—খবর আছে। বাদশা আজ দুপুরে ফকির সাহেবদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনজন পীরই বলেছেন, লড়াই হবে।

—হারজিতের কথা কিছু বলেননি?

—শা মুবারক বলেছেন, হারজিত খোদার মর্জি। শা বন্দা বলেছেন, এ খুনের নেশা, নেশা মিটে গেলেই শা ফিরে যাবে। আর শা রামজ্ বলেছেন, বাদশাহের বাদশাহী ঠিক থাকবে।

—বাদশাহী ঠিক থাকবে, খুনের নেশা মিটে যাবে, তাহলে তো লড়াই হবে এবং বাদশাই জিতবেন, তাহলে মুবারক শা হারজিত খোদার মর্জি বললেন কেন? মুবারক শা'র কথা শুনলে তো মনে হয়, বাদশা হেরে যাবেন। হেরে গেলে বাদশাহী ঠিক থাকবে কি করে?

—তা জানি না। যা শুনলাম তাই বলছি। পীর সাহেবদের কথা শুনে বাদশা লড়াইয়ের যোগাড় করছেন। লড়াই হবে।

—এমনিতেই তো সপ্তাহে দু-চার টাকা পাই, লড়াই হলে সেটাও আর পাব না তার চেয়ে আগে-ভাগেই সরে যাওয়া ভাল। মহাবীর তুমিও চল, দিল্লীতে এবার জান-মান বাঁচানো মুস্কিল হবে।

মহাবীর বললো—বাবাকে বলি, দেখি তিনি কি বলেন।

আরেক কলকে তামাকু শেষ করে মহাবীর পান চিবুতে চিবুতে বাড়ী ফিরলো। ভীম সিং দাওয়ায় বসে তামাকু খাচ্ছিলো। মহাবীর তাকে সব কথা বললো।

ভীম সিং চুপ করে সব শুনলো, তারপর বললো—গোল-যোগ বাধলে খুবই মুস্কিল হবে, কিন্তু যাবি কোথায়? পথে বেরুলেই তো ঠেঙ্গাড়ের ভয়। টাকা-পয়সা কিছু থাক না থাক আগে তো খুন করবে, তারপর অন্য কথা। পথে ঠগী-ঠেঙ্গাড়ের হাতে খুন হওয়ার চেয়ে এখানে থাকাই ভাল। নগরে আরো মানুষ তো থাকবে, তাদের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে। মহাদেবের নাম নিয়ে বসে থাকি। তিনি যা অদৃষ্টে লিখেছেন, তাই হবে। কারও কথা শুনে চললে হবে না। বিপদ এলে নিজে বুঝে চলতে হয়।

মহাবীর চিরকালই বাপ-মায়ের অনুগত, কোন সময়ই বাপের মুখের উপর কথা বলে না। তাই চুপ করে রইল।

ভীম সিং বললো—হাতে তো পয়সা আছে, মাসখানেকের মত খোরাক কিনে ঘরে রাখ, যাতে দু-দশ দিন ঘরে বসে থাকতে হলেও উপোস না করতে হয়।

কাজেই মহাবীর যেমন ছিল, থেকে গেল।

এদিকে নাদির শা তখন দিল্লীর কাছে এসে পড়েছেন।

নাদির শাহের এই ভারত-অভিযান আকস্মিক নয়।

পারস্যের বাদশা কিছুতেই রাজ্য সামলাতে পারছিলেন না। আমীর-ওমরাহেরা তাঁর কথা শুনতেন না। তার উপর রুশ ও তুর্কীদের আক্রমণে প্রজাদের কষ্টের অবধি ছিল না। তুর্কী সেনাপতি নাদির কুলি এই সময় ইরাণের শাকে সরিয়ে দিয়ে সিংহাসন দখল করে বসে হলেন নাদির শা। নাদিরের বাবা ছিলেন চামড়া সেলাই-করা দরজী।

শা হয়েই নাদির রুশ ও তুরস্ককে হটিয়ে দিলেন, তার-পর নজর দিলেন আফগানিস্থানের দিকে। আফগান আমীররা ভারতে পালিয়ে আসতে লাগলো। নাদির দূত পাঠালেন দিল্লীর বাদশাহের কাছে। তারপর এগিয়ে এলেন পেশোয়ার পার হয়ে লাহোরে। লাহোরের সুবাদার নাদিরকে সসম্মানে কুর্নিশ জানালো।

নাদির এরপর বাদশাহের কাছে আবার দূত পাঠালেন, জানালেন—তোমার ওমরাহরা তোমার ক্ষতি করছে। তাদেরকে শায়েস্তা করতে আমি যাচ্ছি।

বাদশা লড়াই করার সৈন্য সমবেত করলেন। কিন্তু ওম-রাহেরা তখন নিজেদের মধ্যে ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। প্রত্যেকে চাইছে অন্যকে জব্দ করতে। তারা গোপনে নাদির শাহের কাছে দূত পাঠাতে লাগলো—আপনি আসুন!

নাদির এগিয়ে এলেন। বাদশার ফৌজও গিয়ে পৌঁছালো তিরৌরীর মাঠে। লড়াই হলো। বাদশার সেনাপতি মারা পড়লে, মহম্মদ শা ভয় পেয়ে পিছু হটে এলেন। নাদির শা বললেন—দু কোটি টাকা পেলে আমি ফিরে যাবো।

বাদশা টাকা দিতে রাজী হলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অযোধ্যার সুবাদার বুরহনুল-মুলক নাদিরের সঙ্গে দেখা করে বললো— দিল্লীর বাদশার কাছ থেকে আপনি কি সামান্য দু কোটি টাকা চাইছেন! আমি অযোধ্যার সুবা-দার, ওই টাকা তো আমিই চেষ্টা করলে আমার সুবা থেকে দিতে পারি! আপনি একবার দিল্লীতে গিয়ে অবস্থাটা দেখুন, তারপরে টাকা চাইবেন।

নাদির শা দিল্লী অবধি যাওয়াই ঠিক করলেন। নাদিরের ঘোড়সওয়ার ছিল ১২৫০০০, আর বাদশাহের সৈন্য ছিল ২০০০০০, তাছাড়া কামান ছিল ৫০০০, তবু বাদশা নাদিরের গতিকে রুখতে পারলেন না। বাদশার সুবাদার ও সেনাপতিরা ছিল বিশ্বাসঘাতক।

ছ দিন পরে নাদির শালিমার বাগানে এসে তাঁবু ফেল-লেন। বাদশাকে জানালেন—তুমি আমার স্বজাতি, তাছাড়া তুমি তৈমুরলঙ্গের বংশের লোক তোমাকে আমি সিংহাসন থেকে নামাবো না। যুদ্ধের খরচ নিয়ে চলে যাবো।

ভীরু মহম্মদ শা পরদিন দিল্লীতে নাদিরকে সম্বর্ধনা জানালেন। নাদির শা বাদশাহের ময়ূর সিংহাসনে বসলেন। তিনি হলেন বাদশার বাদশা।

পরদিন সকালে হঠাৎ খবর রটে গেল যে, নাদির শা মারা গেছেন। দিল্লীর সৈন্যরা তখনই মারমার করে লাফিয়ে পড়লো বিদেশী সৈন্যদের উপর। যেখানে যত ইরাণী পেল, মেরে শেষ করলো।

পরদিন সকালে নাদির বেরুলেন ব্যাপারটা ঠিকমত জানতে। পথে তখন অনেক মৃতদেহ পড়ে ছিল। নাদির গণনা করিয়ে দেখলেন, তার সংখ্যা ৯০০। ইতিমধ্যে এক অজ্ঞাত সৈনিক নাদিরের উপর গুলি চালালো। নাদিরের লাগলো না, পাশের দেহরক্ষী মারা গেল। নাদির এরপর যেন ক্ষেপে গেলেন, বললেন—দিল্লীর বাসিন্দারা সব বদ-মাশ, এদেরকে উচিত শিক্ষা দাও, খুনের বদ্‌লা খুন চাই!

তারপর থেকে শুরু হলো হত্যাকান্ড। সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নাদিরের সৈন্যরা যাকে সামনে পেল তাকেই হত্যা করলো। ত্রিশ হাজার নিরপরাধ সাধারণ নাগরিক খুন হলো। বাদশা মহম্মদ শা তখন অনেক মিনতি জানিয়ে নাদিরকে প্রসন্ন করে সেই ভয়ঙ্কর নরহত্যা বন্ধ করলেন। আর সেই সঙ্গে নাদিরের হাতে তোষা-খানার চাবিও দিয়ে দিলেন।

ইতিমধ্যে নগরে শবদেহ পচে দুর্গন্ধ শুরু হয়েছে। সৈন্যরা সব মড়া একত্র করে যে বাড়ী থেকে যত কাঠ পেল টেনে এনে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যাবতীয় মড়া সব পুড়িয়ে দিলে।

নাদির এবার সুবাদারদের উপর জুলুম শুরু করলেন। অযোধ্যার সুবাদারের কাছ থেকে আদায় হলো ৫০০০০০০০ টাকা, ওমরাহ খান দৌরানের কাছ থেকে ৫০০০০০০০, নিজামুল-মুলকের কাছ থেকে ১৫০০০০০০, কামরুদ্দিন খাঁয়ের কাছ থেকে ১৫০০০০০০ টাকা। এ ছাড়া পাঁচ-সাত, দশ লাখ টাকা তো অনেকের কাছ থেকেই আদায় হলো। নাদির ময়ূর সিংহাসন সঙ্গে নিলেন, আর তার সঙ্গে তোষাখানায় হীরে-জহরৎ যা ছিল তাও নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন— মহম্মদ শা অযোগ্য লোক, তবু তাকে সিংহাসনে রেখে গেলাম তৈমুরের বংশধর বলে, আর বাদশাহের কর্মচারীদের মধ্যে তিনটি ওমরাহ মাত্র বিশ্বাসী,

নাসির খান, খান দৌরান, ও মহম্মদ খান। বাকি সবাই নিমকহারাম। নিজামুল-মুলকের মত ধূর্ত ও স্বার্থপর ওমরাহের গর্দান নেওয়াই উচিত। আমি দয়া করে ওর মাথা নিইনি!

নাদির শা শুধু সোনাদানা হীরা-জহরৎ নিয়েই খুশী হননি, তিনি এ দেশ থেকে নিয়ে যান ১০০০ হাতি, ৭০০০ ঘোড়া, ১০০০০ উট, ১০০ জন খোজা, ১৩০ জন মুনশী, ৩০০ জন মিস্ত্রী এবং ২০০ জন ছুতোর।

যাবার আগে নাদির শা দিল্লীর বাদশাহী বংশের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতার সম্পর্কও করে গেলেন। ঔরংজীবের ছোট ছেলে কমবক্সের নাতনী, সম্পর্কে মহম্মদ শাহের পিসির সঙ্গে নাদিরের ছোট ছেলে নসরুল্লা-মির্জার বিয়ে দিয়ে গেলেন। দিল্লী যখন হত্যাকান্ডের বীভৎসতায় সন্ত্রস্ত হতচেতন, শ্মশানভূমিতে পরিণত, তখন বাদশাহী মহলে আমীর, ওমরাহদের মধ্যে বিবাহ-উৎসবের জলুস হলো।

নাদির শা দিল্লীতে প্রবেশ করেছিলেন ২১শে মার্চ, আর বিদায় নিলেন ১৬ মে, (১৭৩৮ অব্দ)। এই একমাস ছাব্বিশ দিনে দিল্লীর উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেল।*

মহাবীর সিং প্রথম কয়েকটা দিন কেল্লা থেকে বেরুতে পারেনি, তাকে ফটকের পাহারাদার বেরুতে দেয়নি।

নাদিরের ছেলের বিয়ের দিন কেল্লার ফটক সকলের জন্য উন্মুক্ত হলো। যে কেউ কেল্লার ভিতরে আসতে পারে বিয়ের সমারোহ দেখতে। অবশ্য ব্যাপক হত্যাকান্ডের পরে দিল্লীর কোন নাগরিকের আর বাদশাহী বিয়ে দেখার মত উৎসাহ তখন ছিল না। মর্মান্তিক একটা শোকাবহ আবহাওয়া তখন সারা নগরে পরিব্যাপ্ত।

বাদশাহী তোষাখানায় তখন আর বাদশাহী পাহারাদারের প্রয়োজন নেই। বাদশাহের যা কিছু ছিল, সবই নাদিরের অধিকারে চলে গেছে; নাদিরের বিশেষ ফৌজ কাজিলবাসীরা তার পাহারাদারি করছে, মহাবীর সিং থাক আর যাক সেদিকে কারও নজর নেই। আমীর, ওমরাহরা আর ইরাণী সিপাইরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। বাদশাহী কর্মচারীদের দিকে কেউ খেয়ালই করছে না।

মহাবীর কোন এক সময় গুটিগুটি সকলের অলক্ষ্যে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেল। মা-বাবার জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় মন তার ভারাক্রান্ত। দ্রুত পায়ে সে এগোলো।

ফটক দিয়ে বরাবর রাস্তা গেছে চাঁদনী চকের দিকে। চক পার হয়ে ডাইনের গলিটার মধ্যে শেখ সাহেবের অম্বুরী তামাকের দোকান। বুড়ো শেখসাহেব দোকানে বসে ছিল, মহাবীর উদ্বিগ্ন কন্ঠে জিজ্ঞেস করলো—সেলাম শেখ সাহেব, এদিককার খবর কি?

শেখ সাহেব চোখ তুললো। কোন কথা বললো না।

—কি খবর শেখ সাহেব?

খবর!—এবার বুড়ো কথা বললো: সব শেষ। এ পাড়ায় তো বাড়ী বাড়ী মড়ার গাদি লেগেছিল। পচা দুর্গন্ধ, শেষে ঠেলা গাড়ী করে সব নিয়ে গিয়ে যমুনার তীরে পুড়িয়ে ফেলা হলো। বাড়ী বাড়ী ইরাণী ফৌজ লুঠ করেছে। পাড়াকে পাড়া শূন্য হয়ে গেছে।

—তোমার এই দোকান লুঠ হয়নি?

—আমি ছেলেটাকে নিয়ে পায়খানার নীচের ঘরে লুকিয়ে ছিলাম। তাই জান বেঁচে গেছে। ছেলেটা জুমা মসজিদে চলে গেছে। আমি একা এখানে আছি।

মহাবীর কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শেষে জিজ্ঞেস করে—আমার বাবা-মায়ের খবর কি?

জানি না। সেই খুনোখুনির পর থেকে তাদের আর দেখিনি। দোকানে তামাক কিনতেও আসেনি। কারও মুখে যে খবর পাব, তেমন কেউ নেই। পুরো দু-দিন তো লুকিয়েই ছিলাম, পরের দিনও পথে বেরোইনি। তুমি নিজে গিয়ে একবার দেখে এসো।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মহাবীর গলির মধ্যে অগ্রসর হলো।

কয়েক পা গিয়েই বুঝলো, অবস্থা কী সাংঘাতিক! কোন বাড়ীতে বাসিন্দা নেই, দরজা ভাঙ্গা, কোন কোন বাড়ীর দরজার সামনে দু-একটা ভাঙ্গাচুরো মগ, বালতি, বালিশ নজরে পড়ছে। সব বাড়ী লুঠ হয়েছে।

মহাবীর তখন প্রায় ছুটছে।

সাত-আটখানা বাড়ী পার হয়েই সে এক ভাঙ্গা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। ভিতরে দাওয়ার উপর চারপায়ার পাশে গড়গড়াটা ভেঙে পড়ে আছে, কলকেটা তিন টুকরো। ঘরের মধ্যে মাটির হাঁড়ি-কুড়ি একটাও আস্ত নেই। পিতলের লোটা, থালা, বাটি কিছুই নেই। ঘর দুখানা হতশ্রী লুন্ঠিত। শুধু ফাঁকা ঘরে এমন কান্নাভেজা বিষণ্নতা থাকে না।

মহাবীরের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। দাওয়ায় এসে চারপায়াটার উপর সে ঝুপ করে বসে পড়লো। তার মনে হলো, মাথাটা যেন ঘুরছে...........

সারাটা রাত মহাবীরের বাবা-মাহারা নিঃসঙ্গ ঘরে জেগে জেগেই কেটে গেল। কখনো অন্ধকার দাওয়ায় পায়চারি করছে, কখনো বা ঝুপ করে এসে বসেছে খাটিয়াটার উপর। মাথার মধ্যে কোথায় যেন আগুন জ্বলছে। বুড়ো বাপ-মাকে এভাবে হারাতে হবে, সে কোনদিন ভাবেওনি। কখনো কখনো মন তার পুড়তে থাকে, যখন ভাবে—হরবংশের কথামত ওদের সঙ্গে তখন চলে গেলেই ভাল হতো।

সকালে সে চারপায়ার উপর শুয়ে পড়লো আকাশের পানে তাকিয়ে।

সন্ধ্যা অবধি কেটে গেল সেই একই অবস্থায়। স্নানের কথা মনেও হলো না, খিদেও পেল না। কাল থেকে পরনে সেই সরকারী পোশাকই রয়েছে।

সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ তার কি মনে হলো, চারপায়া থেকে সে উঠে পড়লো, নাগরা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে।

গলি পার হয়ে চাঁদনী চক পাশ কাটিয়ে মহাবীর চললো যমুনার তীরে।

একটা নিমগাছের নীচে একটা ঝুপড়িতে শা মুবারক থাকেন। আশী বছরের বৃদ্ধ। ফটিকের জপমালা ঘুরিয়ে চলেছেন দিনরাত। বাদশা ডুলি পাঠিয়ে দেন, আমীর-

---

*স্যার রিচার্ড বার্ন সম্পাদিত 'দি ক্যাম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া'র চতুর্থ খন্ড 'মুঘল পিরিয়ড' দ্রষ্টব্য।

ওমরাহরা ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ায়, সেলাম দিলে মুবারক শা আশীর্বাদ করেন, তারপর আবার মালা জপতে শুরু করেন। অনাবশ্যক কথা বলতে তিনি অভ্যস্ত নন। কেউ কোন বিশেষ প্রশ্ন করলে সংক্ষেপে তার জবাব দেওয়াই মুবারক খাঁয়ের অভ্যাস। নাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা তাঁর কাছে বসে থাকলেও কোন কথা নেই। তিনি চোখ বুজে বসে বসে মালা ঘুরিয়েই যাবেন।

মহাবীর চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইল, তারপর বললো—হুজুর সাব, আমি একটা কথা জানতে চাই। কৃপা করে বলুন, আমার বাবা-মা বেঁচে আছেন কি না। থাকলে কোথায় আছেন?

ফকির সাহেব চোখ মেললেন, তাকালেন মহাবীরের মুখের পানে, অন্ধকারে সে মুখে তিনি কি দেখলেন, তিনিই জানেন, তারপর বললেন—নেহি হ্যায়।

মহাবীর জবাবটা শুনে নিজেকে সামলাতে কয়েক মিনিট সময় নিলে। তারপর আবার বললে—হজরৎ!

ফকির চোখ মেললেন।

—আমি এই মৃত্যুর প্রতিশোধ চাই।

ফকির আবার মুখের পানে তাকালেন। তারপর বল-লেন—হিম্মতের কাজ।

—আমি পারবো?

—খোদা মেহেরবান, তিনি মেহেরবানি করলে মানুষ সব পারে।

—আমি তাহলে এখন কি করবো?

—কেল্লাতেই থাকবে। সংগে কাটাকুটির দাওয়াই রাখবে। কাউকে বিশ্বাস করবে না, খোদার উপর ভরসা রাখবে। কাজের সুবিধা করতে হলে ধর্মটাকে বদলে নাও। খোদা হাফেজ!

'খোদা হাফেজ' মুবারক শার শেষ কথা। এর পর যত কথাই বলা হোক, ফকির আর জবাব দেবেন না। মহাবীর সেলাম জানিয়ে উঠে পড়লো।

রাত দুপুর পার হয়ে গেছে। দেওয়ান-ই-আমের পিছনে মখমল বিছানো গদির উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে অন্তরঙ্গ মুনশী আর আফগান ওমরাহদের নিয়ে নাদির শা বসে আছেন। সোনার গড়গড়ার সোনালী নল মুখে রয়েছে, সরেস অম্বুরী তামাক খাচ্ছেন, আর মুনশীর হিসাব শুনছেন।

লাখ লাখ টাকার হিসাব।

বাদশাহের দুকোটি টাকা। তারপর দেওয়ান, উজির, সুবা-দার, ওমরাহদের ঘর থেকে পঞ্চাশ লাখ, ত্রিশ লাখ, বিশ লাখ, পনেরো লাখ, দশ লাখ, পাঁচ লাখ।

পাঁচ লাখ টাকার নীচে আর কথা নেই।

তার সংগে আছে হীরা-জহরৎ। বাদশাহী ময়ূর সিংহাসন ও কোহিনুর।

নাদির শাহের কাছে এ স্বপ্ন, এ আশাতীত। এ তো কল্পনার বাইরে। তইমুর লংগ ও সুলতান মামুদও এত সম্পদ একসংগে পায়নি।

তারপর আলমগীরের নাতনীর মেয়েকে সে নিয়ে যাচ্ছে পুত্রবধূ করে।

নাদিরের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বলে উঠ-লেন—এ সবই খোদা-তালার মেহেরবানি, তইমুরের আশী-র্বাদ!

নাদির তইমুরকে আদর্শ বীরপুরুষ বলে মনে করেন। তইমুরের একখানি আত্মচরিত সবসময় তাঁর হাতের কাছে থাকে। তাকিয়ার নীচে থেকে লাল চামড়ায় বাঁধানো তইমুর-চরিত বের করে নাদির সেটা পড়ার উপক্রম করলেন। মুনশীকে বললেন—ছুটি!

মুনশী বিদায় নিল, আফগান ওমরাহরাও কুর্নিশ করে বিদায় নিল।

নাদির মৃদুকন্ঠে ডাকলেন—আবদালি!

হুঁকাবরদার পিছনে বসে তামাক সাজছিল, সামনে এলো।

—পা দুটো একটু মালিশ করে দাও!

আবদালি নাদিরের পা টিপতে বসলো। নাদির তই-মুর-চরিতের পাতা ওলটাতে লাগলেন। রাত্রি এগিয়ে চললো।

আশাতীত বিত্তলাভে উত্তেজনা আছে। নাদিরের মন উত্তেজিত হয়ে আছে। তার উপর অত্যুৎকৃষ্ট বাদশাহী সিরাজী পানীয় মাথার মধ্যে যে উত্তেজনা জাগিয়ে দিয়ে-ছিল, তাতে ঘুম আসা সম্ভব নয়। নাদির বার বার পঠিত তইমুর লংগের জীবনকথার উপর নতুন করে চোখ বোলা-চ্ছেন। তইমুর তার আদর্শ। তইমুরের মত নাদিরও হবে দিগ্বিজয়ী। বাধা ছিল অর্থের, এবার সে অর্থ হাতে এসেছে। উপযুক্ত বিশাল সেনাবাহিনী রাখতে আর অসুবিধা হবে না। মধ্য এশিয়ায় এবার একছত্র অধীশ্বর হবে নাদির শা। নাদির ঘুমুবেন কি, তার মাথার মধ্যে শিরায় শিরায় রক্ত চন-চন করতে থাকে।

আবদালি পা টিপতে থাকে। সারাদিনের পর রাতেও ঘুমের অবকাশ নেই, দেহে ক্লান্তি জমে, কিন্তু দাস তার অবসাদের কথা বলবে কার কাছে—কে শুনবে!

বেদীর উপর ময়ুর-সিংহাসন ঝলমল করছে। মাথার উপর ঝাড়লন্ঠনের আলোয় রঙের খেলা চলেছে। চুনির লাল আভা, পান্নার সবুজ, নীলার রক্তাভ নীল, পোখরাজের হলুদ, হীরের দীপ্তি সূর্যের মত। মনে হচ্ছে যেন একটা দ্যুতিময় ময়ুর পাখনা মেলে বসে আছে। নাদির যত দেখেন তত মুগ্ধ হন।

এক সময় নাদির ডাকেন—আবদালি!

—খোদাবন্দ!

—ময়ুর-সিংহাসনটা কেমন ঝলমল করছে!

—চমৎকার!

—ওটার দাম কত জানিস? বিশ কোটি টাকা। বাদ-শাহ শাজাহান তৈরি করিয়েছিলেন। তারপর এই সিংহা-সনে বসেছে আলমগীর। তারপর এখন যারা বসছে, তারা কেউ যোগ্য নয়, সিংহাসন একটা যোগ্য বাদশা চাইছে।

নাদির থামলেন। আবদালি বললো—হুজুর, এই সিংহাসনে বসার যোগ্য মানুষ এখন আপনি।

—বহুত ঠিক বাতলেছ আবদালি। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। সেইজন্যই তোমাকে আমি সবসময় কাছে কাছে রাখি। তুমি মনসবদারি করতে পারবে?

—হুজুরের হুকুম পেলে আমি সব পারি।

—আজ আমার মেজাজ বড় খুশী আছে। আজ সবাইকে

বখশিস দিতে ইচ্ছে করছে। তোমাকে একটা মনসবদারি আজ আমি বখশিস দিলাম। তুমি হলে দু-হাজারী মনসবদার।

—হুজুরের বহুত মেহেরবানি। কিন্তু হুজুর, আমি মনসবদার হলে আপনার তামাকু সাজবে কে? কে আপনার হাত-পা টিপবে? এই কাজ আমার খুব ভাল লাগে।

—লড়াইয়ের সময় তুমি হবে মনসবদার, অন্য সময় তুমি যেমন আছ আমার কাছে কাছে থাকবে।

—হুজুরের বহুৎ মেহেরবানি!

পূবের আকাশ তখন ফরসা হতে শুরু হয়েছে। একটা কাক এসে বারন্দার সীমানায় পাথরের ঝালরের উপর বসে ডাকতে শুরু করলো।

সারাদিন সারা রাত ঘুম নেই। আবদালি অবসন্ন হয়ে বসে আছে দেওয়ান-ই-আমের চত্বরের নীচে। একটু যে ঘুমিয়ে নেবে সে ভরসা নেই। নাদির শা এইমাত্র একটু ঘুমিয়েছে। ঘুম ভাঙলেই তামাকুর জন্য ডাক দেবেন, তখনই তামাক সেজে দিতে না পারলে অদৃষ্টে অনেক দুর্ভোগ ঘটে। আবদালি সেই দুর্ভোগ ভুগতে রাজী নয়। সে তাই চত্বরের পাশেই চুপ করে বসে আছে। কিন্তু বসে থাকলেও অবসাদের ক্লান্তিতে আবদালির চোখ বুঁজে আসছে।

প্রধান উজির নিজামুল-মুলক আসফ ঝা'র প্রত্যূষে ভ্রমণের অভ্যাস। ভোরে উঠে দেওয়ান-ই-আমের সামনের বাগানে তিনি পদচারণা করতে যাচ্ছিলেন, চোখ বুজে আবদালিকে বসে ঝিমুতে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। সূর্যোদয়ের প্রথম রশ্মির আভাসটুকু মানুষটির মুখের উপর পড়েছে। সেই আলোয় আসফ ঝা ভাল করে তাকালেন আবদালির মুখের পানে।

আবদালি ঘুমুতে চায় না, জোর করে ঘুম দূর করতে মাঝে মাঝে সে তাই চমকে চমকে উঠছে। এবারও সে চমকে চোখ মেললো, সামনে নিজামুল-মুলককে দেখে কুর্নিশ জানালো।

আসফ ঝা মুচকি হাসলেন, বললেন—তুমি তো শাহানশা নাদিরের হুকাবরদার।

—জী, হুজুর।

—তুমি তো আগে থেকেই আছ?

—জী, হুজুর। আমি কান্দাহারের লোক।

—দিল্লী বিজয়ের পর শাহানশা তোমাকে কিছু বখশিস দেননি?

—দু-হাজারী মনসবদার করে দিয়েছেন।

—মাত্র দু-হাজারী মনসবদারি দিয়েছেন! শাহানশা জানেন না যে, তুমি একদিন শাহানশার মসনদে বসবে।

—আপনি কি বলছেন হুজুর!

—আমি তোমার কপালের লিখন দেখতে পাচ্ছি, পাঁচ বছর পরে তুমি হবে সুলতান, পাঁচ বছর বাদে তুমিই বসবে ময়ূর সিংহাসনে। তোমার নসীব সেই কথাই বলছে।

আবদালি ভয় পেয়ে গেল, বললো—এসব কথা বলবেন না হুজুর, তাহলে আমার কাঁধের উপর মাথা থাকবে না।

আসফ ঝা হাসলেন, বললেন—তোমার মাথা এতো সহজে যাবার নয়। তোমার ওই মাথাই তোমাকে বসাবে সিংহাসনে। মাথা যায় তো পরে যাবে, তার আগে নয়। নিজামুল-মুলক আসফ ঝা বাজে কথা বলে না।*

আবদালি আবার কুর্নিশ করলো। আসফ ঝা এগিয়ে গেলেন বাগানের দিকে।

আবদালির চোখ থেকে ঘুম ছুটে যায়। হুকাবরদার থেকে দু-হাজারী মনসবদার, সেখান থেকে সুলতান—এ তো আজব কথা! তা সে যত আজব ও অসম্ভব কথাই হোক, কথাটা আবদালির মনকে চেপে ধরলো। আবদালি সুলতান!

অপরাহ্ণ বেলায় আহারাদির পর নাদির দেওয়ান-ই-খাসে বসে তামাকু সেবন করছেন, আর সেইসঙ্গে চলেছে নানা গল্প। সেখানে বাদশা মহম্মদ শা ও বড় বড় ওমরাহরা অনেকেই আছেন। নাদির শা দিল্লী থেকে বিদায় নেবার উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করছেন।

কোন এক সময় নাদির কি যেন ভাবলেন, তারপর আসফ ঝাকে জিজ্ঞাসা করলেন—নিজামুল-মুলক, আজ সকালে আপনি আমার হুকাবরদারকে কি যেন বলছিলেন? আমার ঘুম ভাঙতেই দেখি, আপনি তার সঙ্গে কথা বলছেন।

আসফ ঝা শঙ্কিত হলেন। তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—হুকাবরদার সিঁড়ির উপর বসে ঝিমুচ্ছিল, তাই বললাম, খানিকটা সে ঘুমিয়ে নিতে পারে। তা সে ভরসা পেল না।

—কাল তাকে দু-হাজারী মনসবদার করেছি। সে এখন ভাবছে, আমায় খুশী রাখলে আরও বড় বড় বখশিস মিলবে, আরও বড় হওয়া যাবে।

—বড় সে হবেই শাহানশা। তার বরাত তাকে অনেক উপরে তুলবে।

—বরাত নিয়ে আপনি তো খুব চর্চা করেন, শুনেছি। আপনি যাকে যা বলেন, তার তাই ঘটে।

আসফ ঝা চুপ করে রইলেন।

নাদির শা বললেন—আমি দিল্লী দখল করবো, এ কথা আপনি কি বাদশাহকে কখনো বলেছিলেন?

—বলেছিলাম, তিনি সর্বস্বান্ত হবেন।

—আমার ভবিষ্যৎ কিছু বলতে পারেন?

—কিছুটা বলা যায়, তবে সে কথা আপনার মনের মত হবে না।

—তা হোক, আপনি বলুন।

—আপনি বেয়াদবি বলে মনে করবেন।

—কিছু মনে করবো না, আপনি বলুন।

—আপনিও লড়াই করতে করতে একদিন নিঃস্ব হবেন খোদাবন্দ, শেষ অবধি আপনার সেনাবাহিনী আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। সে বিদ্রোহ সামলানো আপনার পক্ষে সহজ হবে না।

—তারা কি আমাকে বন্দী করবে, না খুন করবে?

—আপনি সতর্ক থাকলে রক্ষা পাবেন।

—কত দিনের মধ্যে এই বিদ্রোহ ঘটবে?

---

*ঘটনাটি ঐতিহাসিক। স্যার যদুনাথ সরকারের 'ফল অব্ দি মুঘল এমপায়ার' প্রথম খন্ড পঠিতব্য, পৃষ্ঠা ১২৪।

—পাঁচ-ছ বছর।

নাদির হাসলেন, বললেন—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, উজির সাহেব। বহু জনের বহু মৃত্যু আমি দেখেছি, আমার মৃত্যুটা ঘটবে সব শেষে। সেইটাই হবে আমার শেষ দেখা। সেজন্য আমার দুর্ভাবনা নেই। আপনি নির্ভয়ে আমার মৃত্যু সম্পর্কে বলতে পারেন।

নাদির শাকে এই কদিনে আসফ খাঁ ভাল করেই চিনেছিলেন। তাই হেসে বললেন—মানুষের সব ভবিষ্যৎ বাণীই সফল হতে পারে, শুধু মৃত্যু সম্পর্কে কোন সময় বা ক্ষণ বলা যায় না।

—কিভাবে মৃত্যু হবে, তা বলা যায়?

—তা যায়। আপনার মৃত্যু হবে শান্তভাবে, কোন যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে নয়।

কথাটা শুনে নাদির খুশী হলেন। বললেন—ওই হুকাবরদার কি হবে?

—ও একজন জায়গীরদার হবে।

—আমীর হবে?

—অসম্ভব নয়।

—সুলতান?

—তাও হতে পারে।

—আমার মত দিগ্বিজয়ী?

—সে সম্ভাবনাও আছে।

—ওই উজবুকটা যদি সত্যি একদিন দিগ্বিজয়ী হয়, তাহলে তখন তো আমার কথা ভুলে যাবে! ভুলে যাবে যে সে নাদির শাহের একজন হুকাবরদার ছিল!

বলতে বলতে নাদির সহসা আবদালিকে ডাকলেন—এই উজবুক, ইধার আও!

আবদালি কাছে এলো।

—শির নামাও।

আবদালির মাথা নত করলো।

নাদির বাঁ হাতে আবদালির ডান কানটা ধরলেন, তারপর কোমরবন্ধ থেকে ছুরি টেনে নিয়ে কচ্ করে কানটা কেটে নিলেন। বললেন—ব্যাটা যখন দিগ্বিজয়ী হবি, তখন এই কাটা কান দেখলেই তোর মনে পড়বে যে, তুই নাদির শাহের হুকাবরদার ছিলি।

কান থেকে ঝর্ ঝর্ করে রক্ত ঝরছে। আবদালি কাঁধের দামাস্কাসি রুমাল দিয়ে কান চেপে ধরলো ডান হাতে, বাঁ হাতে কুর্নিশ করে বললো—আমি আপনার কেনা চাকর, আপনি আমাকে খুনও করতে পারেন হুজুর, আমি তা শাহানশার মেহেরবানী বলে মনে করবো।

নাদির কাটা রক্তাক্ত কানটা আবদালির মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে বললেন—যা, তোর হুকাবরদারি ছুটি, আজ থেকে তুই হবি ছ-হাজারী মনসবদার।

—আপনি তো কাল আমায় দু-হাজারী মনসবদার করেছেন, হুজুর।

—আজ করলাম ছ-হাজারী। যা—

আবদালি আবার কুর্নিশ করে বেরিয়ে এলো।*

তোরণের মুখেই আবদালির সঙ্গে মহাবীরের দেখা। মহাবীর দেখেই চিনলো। দূর থেকে নাদিরের আশে-পাশে এই মানুষটিকে সে এই কদিনে অনেকবার দেখেছে। তার মুখের উপর রুমালের পাশ দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে দেখে, মহাবীর অবাক হলো, বললো—এতো রক্ত কেন সা'ব? আপনার কি হলো?

কান কেটে গেছে।—বলে আবদালি পাশ কাটাচ্ছিল। মহাবীর বললো—খুব বেশী কেটে গেছে! চলুন, আমি আপনাকে হেকিম সাহেবের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। একটা মলম লাগিয়ে দিলেই এখুনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

আবদালি খেয়ালে বেরিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় যাবে ঠিক নেই। মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। আর মনে মনে অভিশম্পাত দিচ্ছে নাদিরকে। হেকিমের কথা শুনেই তার মন বর্তমানে ফিরে এলো, সত্যই তো কানের রক্তপাত বন্ধ করতে হবে। আবদালি ফিরে দাঁড়ালো। বললো—হেকিম সাহেব কত দূরে থাকেন?

—চাঁদনী চকে।

—মলমের দাম চাইবেন তো? আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।

—আপনি জখম হয়েছেন, আপনার সুস্থ হওয়ার দরকার, পয়সার জন্য ভাববেন না। হেকিম সাহেব যদি পয়সা চান, সে আমি দেবো। আপনি চলুন।

আবদালিকে সঙ্গে নিয়ে মহাবীর কেল্লা থেকে বেরিয়ে পড়লো।

কেল্লার দরওয়াজা দিয়ে সোজা রাস্তা চলে গেছে চাঁদনী চক অবধি। এই পথে আগে বাদশা শাজাহান জৌলুস করে বেরুতেন।

চৌমাথার উপরেই চকবাজার।

চকবাজারে হেকিমী দাওয়াইখানার কয়েকটি দোকান, তারই দোতলায় হেকিম মুজিবর খানের আস্তানা। তিনিই এখানকার প্রবীণ হেকিম, কয়েক পুরুষ ধরে বাদশাহী পরিবারে ও আমির-ওমরাহদের চিকিৎসা করে আসছেন। সেই কারণে মর্যাদাও যথেষ্ট। মহাবীর তাঁকে ভালমতই চিনতো। সোজা সে দোতলায় গিয়ে উঠলো।

ঘরে ঢুকেই তার মনে হলো, ঘরের সে জৌলুস নেই। দরজায় রেশমী পর্দা নেই। মেঝেতে দামী গালিচা নেই। ঘরখানা কেমন যেন শ্রীহীন। মেঝেতে মাদুর বিছানো, তারই একপাশে একখানি ছোট আসন পেতে বৃদ্ধ হেকিম সাহেব গড়গড়া টানছেন।

—সেলাম হেকিম সাহেব!

—এসো, বসো।

—আপনার ঘরের একী অবস্থা হেকিম সাহেব?

—সব লুঠ হয়ে গেছে, আমার ছেলেটা খুন হয়েছে। আমি চাকরটাকে নিয়ে বাদশাহী মহলে ছিলাম, তাই বেঁচে গেছি। তোমার খবর ভাল? মুনশীজী ঠিক আছেন?

—আমি তো তোষাখানায় ছিলাম। বেরনোর হুকুম ছিল না। তারপর বেরিয়ে এসে দেখি, বাবা-মা কারও পাত্তা নেই।

—সবই তকদীর, দিল্লীওয়ালাদের নসীব খারাপ! দু-চার বছর অন্তত এক-একটা হুজ্জৎ লেগেই আছে। সবই

---

*স্যার যদুনাথ সরকার রচিত 'ফল অব্ দি মুঘল এম্পায়ার' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৫ পঠিতব্য।

খোদাতালার মরজি!

হেকিম সাহেব গড়গড়া খেতে ভুলে গেলেন, উদাস চোখে তাকালেন জানালা দিয়ে সামনের আকাশের পানে।

—সঙ্গে একজন রোগী ছিল হেকিম সাহেব।

—রোগী? ভিতরে নিয়ে এসো।

মহাবীর আবদালিকে ভিতরে ডাকলো।

হেকিম বললেন—কি হয়েছে দেখি?

আবদালি হাতের রুমাল সরালো।

—এ কী! এতো একটা কান কেটে নিয়েছে।

আবদালি চুপ করে রইল।

—কে এমন করলে? কি করেছিলে?

মহাবীর আগেই আবদালির কাছ থেকে শুনেছে ঘটনাটা। সে আবদালির পরিচয় দিল, বললো—শাহানশা নাদির শাহের এ এক খেয়াল!

—খোদা এমন নিষ্ঠুর মানুষ সৃষ্টি করেছেন ভাবলে মনে কষ্ট হয়। যাক তুমি বসো, আমি দাওয়াই দিচ্ছি। এখুনি রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। ওসমান—ওসমান—

চাকর এলো, ঘরের একপাশে কয়েকটি তাকের উপর পাথর ও মাটির অনেকগুলি পাত্র ছিল, হেকিম তারই একটা নামিয়ে আনতে বললেন। সঙ্গে এলো সাদা কাপড়ের টুকরো। হেকিম সাহেব কাটা কানের রক্ত মুছে মলম লাগিয়ে দিলেন। তারপর একখানি কলার পাতা চাপা দিয়ে পটি বেঁধে দিলেন। বললেন—আমার ছেলেকে তোমরা খুন করেছ, আমার বাড়ী তোমরা লুঠ করেছ, তোমাদের চিকিৎসা করতে আমার ইচ্ছা হয় না। শুধু খোদাতালা তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ভেবেই আমি তোমার চিকিৎসা করলাম। তার উপর মুনশীজীর ছেলে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তাই।

কি দিতে হবে?—আবদালি জিজ্ঞাসা করলো।

—তোমাদের টাকা তো লুঠের টাকা, রক্তমাখা টাকা, ও টাকা আমি নিতে পারি না।

যদি আমি দিই, নেবেন তো?—মহাবীর বললো।

—দেশের দুশমনের জন্য তুমি টাকা দেবে কেন? যদি তোমার টাকা বেশী থাকে, গরীব-দুঃখীদের দাও গে। দুশমন সেবার মজুরি আমি চাইনা। যাও।

হেকিম সাহেবের মুখের পানে তাকিয়ে মহাবীর আর কথা বললো না, আবদালির সঙ্গে পথে নেমে এলো।

মহাবীর বললো—এখন কেমন বুঝছেন, সাহেব? কোন কষ্ট হচ্ছে?

আবদালি বললো—সব ঠান্ডা হয়ে গেছে! খুব ভাল ওষুধ।

—ইনি বাদশাহী হেকিম।

—তোমাকে খোদাতালা আশীর্বাদ করুন। তুমি যা করলে, চিরদিন আমার মনে থাকবে। যদি কখনো তোমার কোন দরকার হয় তো আমার কথা মনে রেখো—আহমদ আবদালি, ছ-হাজারী মনসবদার।

—আপনি মনসবদার!

—হ্যাঁ, আগে হুঁকাবরদার ছিলাম, কান কেটে নিয়ে আজ থেকে শাহানশা আমাকে ছ-হাজারী মনসবদার করেছেন।

—জখম করলেন, আবার মনসবদারিও দিলেন, আশ্চর্য তো!

—শাহানশাহী খেয়াল! ওসব আমরা বুঝবো না।

আজ নাদিরের দিল্লী-ত্যাগ। সকাল থেকেই বিশাল সেনাবাহিনী অতি ব্যস্ত। সকালে আহারাদি শেষ করে প্রত্যেকে নিজ নিজ লুঠের মাল গুছিয়ে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বেঁধে তৈরী হচ্ছে। এক-একটি শিবির খালি করে দিলেই খিদমতগার এসে তাঁবুর খুঁটি তুলতে শুরু করবে।

নাদির শা সকালে দেওয়ান-ই-আমে কিছুক্ষণের জন্য দরবারে বসেছিলেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এবার কয়েকজন বিশিষ্ট ওমরাহের সঙ্গে বাদশাহের ভোজ খেতে গেছেন। এই ভোজের পরেই যাত্রা শুরু। এক লাখ মানুষের চলে যাওয়া তো সহজ ব্যাপার নয়, অল্প-সময়ের কথাও নয়।

আবদালি এখনও নাদিরের কাছে কাছেই থাকে। মাথার পাগড়ী বদলেছে, গায়ের আলখাল্লা বদলেছে; কিন্তু কোন্ দলের সে মনসবদার হয়েছে, তা এখনও জানে না। যাবার সময় হয়তো নাদির শা বলবেন, নয়তো তা-ও বলবেন না। যেমন আছে তেমনি চলবে। তবে এখন আর তাকে গড়-গড়া বইতে হয় না, এই যা কথা।

আবদালি গেল সিপাই-সর্দারদের সরাইখানায় খেতে। এখানে আর যারা আসে, তারা অনেকেই তাকে ভাল নজরে দেখে না—হুঁকাবরদার থেকে একেবারে ছ-হাজারী মনসব-দার, একটা সাধারণ চাকর থেকে একেবারে সেনাপতি এবং ছ-হাজারী নায়ক, এটা অনেকের কাছেই প্রীতিকর নয়। আড়ালে তারা ব্যঙ্গ করে বলে 'কানকাটা মনসবদার'। আবদালি এ কথা জানে, তবে সে গ্রাহ্য করে না। তাকে আরও উপরে উঠতে হবে। নিজামুল-মুলকের ভবিষ্যদ্বাণী যদি সার্থক হয়, তাহলে আজ যারা বিদ্রূপ করছে, একদিন তারাই তাকে কুর্নিশ করবে। আবদালি সেই কারণে মুখ বুজে আহার করে চলে যায়, কারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলে না।

সরাইখানা থেকে বেরুতেই, মহাবীর তাকে সেলাম দিল—সেলাম সাহেব!

আবদালি সংক্ষেপে বললো—আজ আমরা চলে যাচ্ছি।

—জানি। কানটা কি আজ একবার হেকিম সাহেবকে দেখিয়ে যাবেন? আর তো দেখানো হবে না।

—ব্যথা-বেদনা কিছু নেই। মনে হয়, ক্ষত শুকিয়ে গেছে। আরা যাবার দরকার নেই। সেদিন তুমি যা করে-ছিলে, তোমাকে ধন্যবাদ দিই। খোদা তোমার মঙ্গল করুন। তোমার জন্য কিছু করতে পারলে, আমি সুখী হতাম, কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না।

মহাবীর ইতিমধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে : যেভাবে হোক, নাদিরের কাছে কাছে থাকতে হবে, নয়তো বদলা নেওয়া হবে না। সে বললে—আপনি এখনও আমার উপকার করতে পারেন।

—কি বল?

—আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

—তুমি কি লড়াই জানো?

—আমি খিদমতগার হয়ে যাবো।

—তোমার দেশ ছেড়ে তুমি কাবুল-কান্দাহারে চলে

যাবে, কষ্ট হবে না?

—দেশে আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আমি আপনাদের সঙ্গে ঘুরবো, নানা দেশ দেখা হবে। কাজ করবো, কিছু মাইনেও পাবো। বাদশাহের দরবারে কাজ করে মাইনে পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন মুদীখানা থেকে ধার নিয়ে খেতে হয়, মুদী অপমান করে। এ অবস্থা আর সহ্য হয় না।

—বাদশা তোমাকে ছেড়ে দেবেন তো?

—বাদশাকে কিছুই জানাবো না।

—তা তুমি যদি যেতে চাও, আমার সঙ্গে যেতে পার। তোমাকে সঙ্গে নিতে আমার কোন অসুবিধা হবে না। তোমার ঘোড়া আছে কি?

—সে একটা ঘোড়া আমি জোগাড় করে নেবো।

—বেশ এখুনি তৈরী হয়ে এসো। তা তোমার নামটা তো এখনও জানা হয়নি? নাম কি?

মহাবীর এই নামের ব্যাপারটা আগেই ভেবে নিয়েছিল, বললো—আমার নাম মহম্মদ মুনশী। লোকে আমাকে মুনশী সাহেব বলেই ডাকে।

—বেশ, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে এসো।

জুমা মসজিদে দ্বিপ্রহরে নামাজ সেরে নাদির শা যাত্রা শুরু করলেন।

নগরের বাইরে যেসব তাঁবু পড়েছিল, সে সবের সৈনিকেরা অনেক আগেই যাত্রা শুরু করেছিল। এবার তাদের পিছনে চললেন নাদির শা। পর পর কয়েকটা হাতী। প্রথম হাতীর পিঠে নাদির শা, পাশের হাতীর উপর বাদশা মহম্মদ শা। তারপর বাদশাহের কয়েকজন ওমরাহ, নাদিরের কয়েকজন সেনানায়ক। তার পিছনে তুর্কী কাজিলবাসী ফৌজ— নাদিরের দেহরক্ষী অশ্বরোহী দল। তারপর নাদিরের খিদমতগারের দল। তার পিছনে বাদশাহী অশ্বারোহীরা।

কাজিলবাসী বাহিনীর মাঝে এক সারি ঘোড়া চলেছে, যাদের পিঠে কোন সওয়ার নেই, আছে শুধু মস্ত এক-একটি থলি বাঁধা। এই থলিগুলিতে যাচ্ছে টাকা, মোহর ও হীরাজহরত। আর হাতীর সারির শেষ হাতীটার পিঠে কাপড় ঢাকা দিয়ে চলেছে ময়ূর-সিংহাসন।

বিজয়গর্বে চলেছেন নাদির শা। বাদশা তাকে এগিয়ে দিতে আসছেন দিল্লীর শেষ প্রান্ত অবধি। আর পাঞ্জাবের সুবাদার জ্যাকেরিয়া খান যাবেন লাহোর হয়ে পেশোয়ার অবধি।

সবার শেষে পিছনে হাত-বাঁধা, কোমরে দড়ি-বাঁধা সারি সারি মানুষ চলেছে পদব্রজে। সঙ্গে কৃপাণধারী রক্ষী। দিল্লী শহর থেকে নাদির শা কয়েক শত শিল্পীকে বন্দী করে নিয়ে চলেছেন। এদের দিয়ে তিনি নিজের দেশের উন্নতি করবেন। বন্দীরা কেউ স্থপতি, কেউ তক্ষণ শিল্পী, কেউ ভাস্কর, কেউ স্বর্ণকার, কেউ রৌপ্যকার, কেউ বা চিত্রকর। নাদির শা এদের সৃজন-শক্তিকে সম্পদ বলে ধরেছেন, তাই সোনারূপার মত এদেরও লুঠ করে নিয়ে চলেছেন।

দামামা-বাজিয়ের দল পিছনে জয়বাদ্য বাজিয়ে চলেছে।

দিগ্বিজয়ী নাদির শা দিল্লী থেকে বিদায় হচ্ছেন। (তারিখটা ছিল ৫। ৫। ১৭৩৮)।

দিল্লী থেকে নাদির পেঁছুলেন লাহোর।

লাহোর থেকে পেশোয়ার।

পেশোয়ারের শেষে কাবুল নদীর ধারে গিরিবর্ত্মের মুখে জ্যাকেরিয়া খান নাদিরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। জ্যাকেরিয়া খান পাঞ্জাবের সুবাদার। দিল্লী থেকে তিনি আসছেন নাদিরের সঙ্গে। বাদশাহের ওমরাহদের মধ্যে এমন বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষ বেশী নেই।

বিদায়কালে নাদির বললেন—আমি আপনার উপর বড় সন্তুষ্ট হয়েছি খান সাহেব। বাদশাহের ওমরাহদের মধ্যে আপনি একজন যোগ্যতম মানুষ। আপনার যদি কোন প্রার্থনা থাকে তা আমায় বলুন, আমি সাধ্যমত আপনার প্রার্থনা পূরণ করবো।

জ্যাকেরিয়া বললেন—আমি প্রজাদের কল্যাণ চাই, শাসক হিসাবে সেটাই আমার কাম্য।

নাদির বললেন—আপনার নিজের কাম্য কিছু থাকে তো বলুন, যা আমি করতে পারি।

—আমার একটা প্রার্থনা আপনি পূরণ করতে পারেন শাহানশা, কিন্তু বলতে সাহস হয় না।

—নির্ভয়ে বলুন, বিদায় বেলায় আমি আপনাকে বিমুখ করবো না।

—যেসব শিল্পীদের আপনি বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদেরকে আপনি মুক্তি দিন, এদের আত্মীয়-পরিজনদের মুখে হাসি ফুটে উঠুক।

—এদেরকে দিয়ে যে আমি তেহেরাণ শহরকে দিল্লীর মত সুন্দর করে গড়তে চাই।

—আপনি যথাসময় আমাকে জানাবেন, আমি এক-একটা কাজের জন্য এক-একদল শিল্পী পাঠিয়ে দেবো, তারা এক-একটা কাজ করে ফিরে আসবে। এভাবে বন্দীর মত তারা যাবে না। স্বেচ্ছায় যাবে কাজ করতে। তাতে শাহানশার সুনাম ও মর্যাদা বাড়বে।

নাদির কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—বেশ, সমস্ত বন্দীদের আমি মুক্তি দিলাম। আপনি ওদের নিয়ে ফিরে যান।

জ্যাকেরিয়া কুর্নিশ করে বললেন—শাহানশা নাদির শা মেহেরবান!

জ্যাকেরিয়া খান এবার পিছিয়ে এলেন। হাতে ও কোমরে দড়ি-বাঁধা কয়েক শত বন্দী পথের পাশে সরে দাঁড়ালো, কৃপাণধারী সান্ত্রীরা তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। পিছনে জ্যাকেরিয়া খানের যে পাঞ্জাবী রক্ষীবাহিনীর ছোট দলটি ছিল, তারা এবার বন্দীদের হাতে-পায়ের বন্ধন খুলে দিলে।

বন্দীরা তো অবাক।

মনসবদার জানালো—আমাদের সুবাদার জ্যাকেরিয়া খান তোমাদের মুক্তি ভিক্ষা করে নিয়েছেন। তোমরা এবার ঘরে ফিরে যাও।

অভাবনীয় এ সংবাদে বন্দীরা হৈ-হৈ করে উঠলো। চীৎকার করে উঠলো—সুবাদার খান সাহেবের জয় হোক!

জ্যাকেরিয়া হাতীর পিঠে ছিলেন, আকাশের পানে হাত তুলে বললেন—আমি কিছু না, সবই খোদার মেহেরবানি! আল্লা হো আকবর!

বন্দীরা সমস্বরে বলে উঠলো—আল্লা হো আকবর!

আবদালি ও মহাবীর একটু পিছিয়ে এসেছিল—ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্য। সবটুকু দেখে আবদালি বললো—ভাল কাজে ভগবান সহায় হন।

মহাবীর বললো—জগতে যত অন্যায় হয়, ভাল হয় তার চেয়ে কম। তাই মাঝে মাঝে মনে হয়, ভগবানের চেয়ে শয়তানের জোর বেশী।

—শয়তানকেও ভগবানই সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্ব-শক্তিমান, তিনি যা করান তাই হয়। তাঁর উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

—তাঁর উপর বিশ্বাস নিয়েই তো আমরা বেঁচে আছি, তবু মাঝে মাঝে সে বিশ্বাস টলে যায়।

আবদালি আর কিছু বললো না। ক্ষণপরে বললো—আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি, এগিয়ে চল।

দুজনেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলো। আবদালি আগে, মহাবীর পিছনে।

এর পর কয়েকটা বছর কেটে গেছে।

মহাবীর সিং মুনশী এখন পুরোদস্তুর মহম্মদ মুনশী। সবসময় সে আবদালির পাশে পাশে থাকে। শুধু যুদ্ধের সময় সে পিছনে থাকে তাঁবুতে। এক সময় আবদালি বলেছিল—তুমি ঘোড়ায় চড়তে জান, বন্দুক চালাতে পার, তলোয়ার চালাতেও পার। কাজেই লড়াইয়ে চল।

জবাবে মহম্মদ বলেছিল—ওটা আমায় বলবেন না। মানুষকে খুন করতে গেলেই আমার হাত কাঁপে। আমি পারি না।

হেসে আবদালি বলেছিল—তুমি হিন্দুস্থানের মানুষ কিনা, তোমাদের মেজাজ বড় নরম। মেজাজ শক্ত কর, লড়াই করতে করতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। শাহানশা নাদির শাহের ফৌজে তুমি আছ, তুমি লড়াই করতে ভয় পাবে কেন?

মহম্মদ বলেছিল—ভয় নয়, আমি এ কাজ পারি না। তাহলে তো বাদশার ফৌজেই কাজ নিতে পারতাম। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

এর পর আবদালি আর কিছু বলেনি।

তবে এর মধ্যে যুদ্ধ বড় কম হয়নি। তেমনি চলেছে সীমাহীন অত্যাচার। তার ফলে মধ্য এশিয়ার দিকে দিকে অসন্তোষ দেখা দেয়, অসন্তোষ অনেক জায়গায় বিদ্রোহের মধ্যে প্রকাশ পায়। নাদিরের মত তাঁর কর্মচারীরাও বড় নিষ্ঠুর ছিল। তাদের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। নাগরিকেরা সুযোগ পেলেই রাজকর্মচারীদের খুন করতো, ঘোষণা করতো—নাদিরকে আমরা রাজা বলে মানি না।

খবর যেতো নাদিরের কাছে। নাদির সৈন্য নিয়ে ছুটতেন। নগর দখল করতেন, লুঠ করে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিতেন, বহু লোক খুন হতো।

ইস্পাহান নগরে তো নাদির নাগরিকদের বাড়ীর মধ্যে রেখেই সারা নগর জ্বালিয়ে দিলেন।

খোরাসান নগরে নাদির নাগরিকদের ধরে মাথা কাটার নির্দেশ দিলেন। তারপর সেই ছিন্ন মুন্ডু দিয়ে নগরের মাঝখানে এক মিনার বানালেন। বললেন—মানুষকে এমন শিক্ষা দেবো যে, আমার বিরুদ্ধে আর কোন বিদ্রোহ হবে না।

তবু বিদ্রোহ হয়। হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে নাদির ছুটে বেড়ান মধ্য এশিয়ায়—ইরাণ, ইরাক, আফগানিস্থান। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই।

এ ছাড়া আছে লড়াইয়ের খরচ।

লুঠ করে যা পাওয়া যায়, খরচ হয় তার চেয়ে বেশী। শেষ পর্যন্ত নাদির শা অর্থাভাবে পড়লেন।

পয়সার যত অভাব হয়, নাদিরের মেজাজ ততো নির্মম হতে থাকে। লুঠ ও জুলুমে প্রজারা বিপন্ন হয়ে ওঠে। নাদিরের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাই সর্বত্র দেখা দেয় বিক্ষোভ ও অসন্তোষ। কিন্তু প্রচন্ড শক্তির সংগে কেউ পেরে ওঠে না।

ইতিমধ্যে নাদির দুবার দিল্লীর বাদশাকে স্মরণ করেছেন।

তইমুর লঙের বংশধর বাবর, তাঁর বংশধর দিল্লীর বাদশা, এবং নাদির দিগ্বিজয়ী তইমুরের ভক্ত, সেই কারণে বাদশা নাদিরের প্রীতির পাত্র। দিল্লী থেকে ফিরে আসার দুবছর পরে নাদির বাদশাহের কাছে ভেট পাঠিয়েছেন যত বাদাম, আখরোট, কিসমিস আর তরমুজ একশো দশটি খচ্চরের পিঠে বোঝাই করে, আর তারই সংগে চেয়ে পাঠিয়েছেন বাদশাহের দেয় খাজনা।

বাদশা পঁচিশ লাখ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। (সময় ১৭৪০ অব্দ।)

ছ-বছর পরে নাদির আবার বাদশার কাছে ভেট পাঠিয়েছেন বাদশাহের দরবারের আমীর-ওমরাহদের জন্য একাশিটি ইরাকী ঘোড়া।

বাদশা এবার আর টাকা দিতে পারেননি, বদলে পাঠিয়েছেন একান্নটি যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত হাতী। (সময় ১৭৪৬ অব্দ।)

এই দুবারই নাদিরের দূতের সংগে মহম্মদ মুনশী দিল্লী ঘুরে গেছে। আবদালি নাদিরের প্রিয়পাত্র, আবদালিকে বলে দিল্লী আসতে মহম্মদ মুনশীর কোন অসুবিধা হয়নি।

এখন মহম্মদ মুনশীকে দিল্লীর বাসিন্দা মহাবীর সিং বলে চেনার উপায় নেই। এখন সে পুরোদস্তুর একজন পাঠান, মনসবদার আহমদ আবদালির খিদমতগার।

কিন্তু রাজপুত মহাবীর সিং বাইরে যাই হোক, অন্তরে প্রতিশোধের আকাঙ্খা তার এতটুকু হ্রাস পায়নি। সুযোগ ও কৌশলের অপেক্ষায় সে সব সময়েই সজাগ। সেই উদ্দেশ্যেই সে শাহানশার রক্ষীবাহিনীর কয়েক জনের সংগে ভাব জমিয়েছে। আগে যেটা মুখের আলাপ ছিল, দুবার দিল্লী ঘুরে এসে সেটা হয়েছে অন্তরংগ 'দোস্তি'। এবং তার মাধ্যম হয়েছে গাঁজা। দিল্লী থেকে গাঁজা আমদানি করে মহম্মদ মুনশী কয়েকজনকে গাঁজা ধরিয়ে দিয়েছে। মধ্য এশিয়ার প্রচন্ড শীতের রাতে তাঁবুর মধ্যে যখন রাত কাটে না, থরথর করে কাঁপতে হয়, তখন এক ছিলিম গাঁজা শরীরটাকে গরম করে দেয়। এই গাঁজা যে জুগিয়ে দেয়, কাজিলবাস সৈনিকেরা তাকে খাতির করে।

এই কাজিলবাসদের খাতির পাওয়া সহজ নয়। এরা অতি দুরন্ত অশ্বারোহী সৈনিক। জাতে এরা ইরাণী। মাথায় এদের লাল ফেজ থাকে, সেইজন্য সমস্ত পাগড়ীধারী আফগান সৈনিকেরা এদেরকে বলে 'কাজিলবাস' অর্থাৎ লাল মাথা। এদের দুরন্ত সাহসের জন্য শাহানশা এদেরকে

দেহরক্ষী করেছেন। দেহরক্ষী মানে তাঁবু-রক্ষী। শাহানশা যখন যেখানে গিয়ে তাঁবু ফেলেন, তারই কাছে থাকে কাজিল-বাস সেনাদের তাঁবু। তার পিছনে থাকে আবদালির তাঁবু, কারণ আবদালিও শাহানশাহের প্রিয়জন।

কাজিলবাস সিপাহীরা বড় দাম্ভিক। আফগান বা উজবেক সিপাহীদের তারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

আবদালি আফগান সর্দার, তার খিদমতগার যে মহম্মদ খান, তার সঙ্গে কাজিলবাস সর্দার মহম্মদ খান কাচার-এর পরিচয় ও খাতির হবার কথা নয়, কিন্তু হলো। এবং তা দৈবাৎ।

খোরাসান লুঠ করে যেদিন নাদির বন্দীদের মাথা কেটে নিয়ে সেই মাথা দিয়ে মিনার বানালেন, সেদিন নাদিরের মেজাজ খুব ভাল ছিল। একদিকে যারা বিদ্রোহ করেছিল তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আরেক দিকে অনেক টাকা ও জহরত হাতে এসেছে। খোস মেজাজে নাদির সন্ধ্যাবেলা দরবারে বসে এক-একজন সর্দারকে এক-একটি বখশিস দিলেন। কাউকে একটা হীরে, কাউকে একটা পান্না, কাউকে আবার একটা মুক্তা। কোন কোন অন্তরঙ্গ একছড়া কন্ঠহারও পেয়ে গেল। এসবই সদ্য লুঠের মাল।

আবদালিকে নাদির দিলেন একটা হীরে বসানো আংটি।

তাঁবুর বাইরে এসে আবদালি সেই আংটি দেখালো মহম্মদ মুনশীকে, বললো—তুমি তো বাদশার তোষাগারে অনেকদিন চাকরি করেছ, দেখ তো এই জিনিসটা।

মুনশী জহুরী নয়, কোন দিন হীরে-জহরৎ নিয়ে নাড়া চাড়াও করেনি, কিন্তু তা বলে সে অজ্ঞতা প্রকাশ করলো না। পাকা জহুরীর কায়দায় আংটিটা নাড়াচাড়া করে বললো—আসলী চিজ, কমল হীরে, দশ রতি হবে, দামী জিনিস। এত বড় হীরে হিন্দুস্থানের আমীর-ওমরাহের কাছেও দু-একখানার বেশী নেই।

আবদালি খুশী হলো।

তখনই কথাটা ছড়িয়ে পড়লো যে, আবদালির খিদমত-গার হলো দিল্লীর বাদশাহের তোষাখানার লোক, হীরে-জহরতের সমঝদার।

তাঁবু-রক্ষকদের সর্দার মহম্মদ খান কাচার ছুটে এলো, বললো—দেখ তো আমার জহরতটা কেমন?

শাহানশা তাকে দিয়েছিল একটি চুনির আংটি।

আংটিটা হাতে নিয়ে মুনশী বললো—বাঃ! এও তো আসলী চিজ! হিন্দুস্থানে একে বলে সূর্যমুখী চুনি। এও দশ রতি আন্দাজ হবে। এত বড় চুনি বড় একটা দেখা যায় না, টাকা দিলেও পাওয়া যায় না।

কাচার বললো—কোনটের দাম বেশী, আবদালির হীরে, না আমার এই চুনি?

মুনশী বললো—আপনার এই চুনি।

কাচার হাসতে হাসতে আংটিটা আঙুলে পরে চলে গেল। আবদালির মনে হলো, সে যেন অনেকটা ছোট হয়ে গেছে। তার মুখের পানে তাকিয়েই মুনশী সে কথা বুঝলো, বললো—আপনি আমার কথা শুনে রাগ করবেন না। কাজিলবাস সর্দার বাইরের লোক, শাহানশা'র প্রিয়জন, তাকে খুশী রাখা দরকার। আপনি ঘরের লোক, আপনাকে বোঝানো সহজ। আপনাকে ছোট করলাম, ওকে বড় করলাম, এতে পরে আপনার সুবিধা হবে। আপনাকে বড় করলে ওর ঈর্ষা হতো, আপনার শত্রুতা করতো। শত্রু-বৃদ্ধি করে লাভ নেই।

আবদালি বললো—তাহলে আমার হীরের দাম কম নয়?

মুনশী বললো—হীরে সবচেয়ে দামী। কোহিনুর যে সবসেরা হীরে, সে কি লাল না সবুজ? সে তো সাদা!

আবদালি খুশী হলো। তারপর বললো—কাজিল-বাসরা বড্ড মাথা চাড়া দিয়েছে। শাহানশাহের রক্ষীবাহিনী হয়ে ভেবেছে, ওরা সবাইকার উপরে উঠে গেছে। শাহান-শার নজরে পড়েছে ওদের এই হামবড়া ভাব। এবার পতন হবে।

—পতন হবে?

—হ্যাঁ। শাহানশা নাদির শা কারও হামবড়ামি পছন্দ করেন না। গাছ বড় হলেই তিনি তার মাথা ছেঁটে দেবার ব্যবস্থা করেন।

—ওদেরকে বুঝি এবার দলে ছোট করে দেবেন?

—কি হবে দেখতেই পাবে।

মুনশী আর প্রশ্ন করলো না। তবে একটা কোন ঘটনা ঘটবে যা আবদালির অজানা নয়, সেটা সে বুঝলো। এবং সেই ঘটনায় কাজিলবাসদের ক্ষতি হবে। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করা ঠিক নয় বলেই মুনশী আর কোন প্রশ্ন করলো না।

কথাটা কিন্তু মুনশী ভুললো না। ব্যাপারটা সে অন্য-ভাবে আবদালির মুখ থেকে বলিয়ে নেবার চেষ্ট করলো। রাতে খানা খাবার সময় মুনশী বললো—কাজিলবাসদের শাহানশা পছন্দ করেন না, কিন্তু অমন সাহসী ফৌজও তো আর নেই বলে শুনি।

আবদালি বললো—শাহানশা অতটা বাড়াবাড়ি সইতে পারছেন না। তাই তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করতে চান।

মুনশী বললো—অন্যদলকে রক্ষী নিযুক্ত করবেন?

—শাহানশা নিজে আফগান, তিনি আফগানদেরই পছন্দ করেন। রক্ষী ফৌজ বোধ হয় এবার আমরাই হবো।

—তখন তো কাজিলবাসরা রেগে থাকবে আমাদের উপর। সুবিধা পেলেই আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

—যত রাগই থাকুক, সুবিধা কিছুই আর তারা করতে পারবে না। শাহানশা যে ব্যবস্থা করেছেন, তাতে তারা এই ফৌজ ছেড়ে পালাবে।

—ভয় দেখাবেন?

—না। একেবারে খতম!

—খতম?

—কাজিলবাস ফৌজ শাহানশা আর রাখবেন না। ওদের সবাইকে তাঁবুতে ডেকে পাঠাবেন দরবারে। তারপর দরবার শেষ হবার পর ওরা যখন তাঁবু থেকে বেরুবে, তখন রাতের অন্ধকারে উজবেক ও আফগান ফৌজ ওদেরকে শেষ করবে।

—ওরা অতো বিশ্বাসী, ওদেরকে শাহানশা হত্যা করবেন?

—ওরা বিশ্বাসী হতে পারে, কিন্তু শাহানশা ওদেরকে বিশ্বাস করেন না। সেই জন্যেই ওদেরকে মরতে হবে। দিন স্থির হয়ে গেছে, সামনের অমাবস্যার রাতে এই ঘটনা ঘটবে।

—শাহানশা তো বড় নির্মম!

—চুপ! একথা আর দ্বিতীয় বার উচ্চারণ করো না। মানুষকে খুন করা ওঁর কাছে ছেলেখেলা। দেখলে না, আমি কত সেবা করেছি, সেজন্য কোন দয়ামায়া নেই। খেয়াল হলো কচ্ করে আমার কানটা কেটে নিলেন। খোরাসানে নাগরিকদের মুন্ডু কেটে নিয়ে কয়েকটা মিনার বানালেন, দেখলে না? উনি সাধারণ মানুষের বাইরে। আমি তো অতো কাছে কাছে ছিলাম, তবু আমি ওঁকে চিনতে পারি না।

মুনশী আর কিছু বললো না। খানা খাওয়া শেষ করে সে গাঁজার ছিলিম সাজতে বসলো। শীতটা কদিন বেশী পড়েছে। এই ঠান্ডায় এক ছিলিম গাঁজা না টানলে শরীরটা গরম হয় না। গাঁজার কলকেটা সে আবদালির দিকে এগিয়ে দিল, আবদালিকেও সে গাঁজা ধরিয়েছে।

তারপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে শুয়ে মুনশী মনে মনে হিসাব করতে লাগল, অমাবস্যার আর কদিন বাকি।

কাজিলবাসদের ব্যাপারটা অনেক রাত অবধি মুনশীকে ভাবিত রাখলো। রাজা-বাদশারা কি রকম সাংঘাতিক চরিত্রের মানুষ হয়, তা ভেবে স্তম্ভিত হয়। যারা বিশ্বস্ত-ভাবে সেবা করছে, তাদেরকে অনায়াসে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে কোন দ্বিধা নেই। কৃতজ্ঞতার বালাই নেই। সহজ-ভাবে বিদায় করে দেবার মত হৃদয় নেই। ভাল লাগে না বলে কয়েক শো মানুষকে খুন করতে হবে। এই পৃথিবীর মালিক যেন নাদির শা। কে এই জগতে থাকবে, আর কে থাকবে না, তার ছাড়পত্র দেবেন তিনিই। এই পৃথিবী যেন তাঁর নিজস্ব! কী সীমাহীন দর্প! এক-একটা খেয়ালে হাজার হাজার মানুষ খুন হচ্ছে, দিল্লীতে কয়েক হাজার মানুষ খুন হলো, খোরাসানে মানুষের মুন্ডু কেটে মিনার তৈরী হলো। আবার এই কাজিলবাসদের নিয়ে হবে আর এক হত্যাকান্ডের সূচনা।

মুনশী যত ভাবে, ততো তার মাথা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই নাদির শাহের জন্য সে তার বাপ-মাকে হারিয়েছে। এই ভয়াবহ মানুষটির সংহার সূচনা করতেই তার এখানে আসা, এতদিন আবদালির দাসত্ব করা। শুধু সুযোগের প্রতীক্ষা করতে করতেই তো কয়েকটা বছর কেটে গেল!

মহাবীর মুনশী শুধু ভাবতেই থাকে, রাত বেড়ে চলে।

কাজিলবাসরা শাহানশা নাদির শাহের রক্ষী ফৌজ। নাদিরের তাঁবুর চারপাশ ঘিরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাজিলবাসদের তাঁবু। কয়েক শো কাজিলবাস ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কিছু কিছু ব্যবধানে তাঁবু ফেলেছে। কোন দিক থেকেই তাদের তাঁবু পার না হয়ে নাদিরের তাঁবুতে কেউ পেঁৗছাতে পারে না। এদের নায়ক মহম্মদ খান কাচার।

কাচারের বয়স হয়েছে। কিন্তু দেহের শক্তি-সামর্থ্য এখনও যুবকোচিত।

অতি প্রত্যূষে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন। উঠেই একবার ঘোড়ায় চড়ে তদারক করতে বেরোন, চারিপাশের আর সব তাঁবুর খবরদারি করেন।

আজও তিনি সকালবেলা তদারকি করে ফিরছেন, পথে মুনশীর সঙ্গে দেখা। মুনশী নত হয়ে জানালো—সেলাম। খোদা হাফেজ।—কাচার জবাব দিল: কেমন ঠান্ডা পড়েছে?

—খুব ঠান্ডা হুজুর, রাতে দুবার-তিনবার ঘুম ভেঙে যায়।

—তোমার তো ঠান্ডার দাওয়াই আছে। এক ছিলিম টানলেই তো শরীর গরম হয়ে যাবে।

—ওইটুকু আছে বলেই বেঁচে আছি হুজুর, না হলে এই শীতে জমে যেতাম। আপনাকেও তো এনে দিয়েছি, হুজুর।

—আর চার-পাঁচ দিন পরে আমারটা শেষ হয়ে যাবে। তুমি যদি আর কিছু জোগাড় করতে পার তো আমাকে দিও।

—পাঁচ-সাত দিন পরে আপনার আর দরকার থাকবে না, হুজুর। আপনার মুখের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। আপনি সূর্যের পানে একবার মুখ ফেরান তো, ভাল করে দেখে নিই।

কাচার পূর্ব দিকে মুখ ফেরালো। রোদ পড়লো তার মুখের উপর।

মুনশী একবার সেই মুখের পানে তাকিয়ে বললো—হ্যাঁ, যা বললাম তাই ঠিক, আপনার মুখের উপর মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েছে।

—তুমি কি বলছো?

—ঠিক কথাই বলছি, হুজুর। মুখের ছায়া দেখতে আমি শিখেছিলাম এক বেনারসী দরবেশের কাছে।

—তুমি যথার্থ বলছো?

—আপনাকে মিথ্যা ভয় দেখিয়ে আমার তো কোন স্বার্থ নেই।

কাচারের মুখখানা কালো হয়ে গেল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—আমরা ফৌজের লোক, মৃত্যুকে আমরা অত ভয় করি না।

কাচার ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। মুনশী সেদিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

পরদিন বিকালে নাদির শা কাজিলবাস উপনায়ক মহম্মদ খান কাচারকে ডেকে বললেন—আমার সমস্ত ফৌজের মধ্যে কাজিলবাসদের আমি বেশী বিশ্বাস করি। সেইজন্যই আমি দীর্ঘকাল এদেরকে আমার দেহরক্ষী করে ও শিবির-রক্ষী করে রেখেছি। বর্তমানে আমার মনসবদার ও সুবাদারদের মধ্যে সবাইকে আমার যোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। এই সম্পর্কে ঠিকমত পরামর্শ করার মানুষও আমি পাচ্ছি না। উজির, সেনাপতি যাকে যে কথা বলি, সেই কথাই বাইরে প্রচার হয়ে যায়। তোমরা চারপাশে কতগুলি তাঁবু ফেলেছ?

—দশটা।

—তা আমি জানি। দশটি তাঁবুতে দশজন দলপতি আছে। তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাল সন্ধ্যার পর তুমি আমার দরবারে এসো, কিছু জরুরী কথা আছে।

—নিশ্চয় আসবো হুজুর।

শাহানশা নাদির শা কাচারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন, এ কাচারের কাছে অভাবিত। অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন তিনি। শাহানশার এত অনুগ্রহ তিনি যেন আর

নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছেন না। শাহানশার এই রকম অনুগ্রহ পেলে, চাই কি তিনি একদিন নাদিরের প্রধান সেনাপতিও হয়ে উঠতে পারেন। কাচার তাড়াতাড়ি চললেন দলপতিদের সংবাদ দিতে।

কাচার সব কটি তাঁবুতে খবর দিয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরে আসছেন, পথের ধারে মুনশীর সঙ্গে দেখা—সেলাম হুজুর!

কাচার-এর মন উৎফুল্ল, বললেন—কি খবর?

—আপনার নজরানা নিয়ে এসেছি, হুজুর।

—গাঁজা এনেছ?

—জী, হাঁ। আপনার হুকুম তামিল করেছি।

—এই যে কাল বললে আমার মুখে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। গাঁজার আর দরকার হবে না।

—সেদিন যা দেখেছিলাম, তাই বলেছি হুজুর।

—সেই ছায়া কি কেটে গেল?

—না হুজুর। আমাদের শাস্ত্রে গ্রহের প্রকোপ বাড়ে অমাবস্যা আর পূর্ণিমাতে। আপনার বিপদ সবচেয়ে গুরুতর হবে কাল, কাল অমাবস্যা। অমাবস্যা শান্তভাবে কেটে গেলে, গ্রহের প্রকোপও কমবে।

—কাল রাতে তো শাহানশা আমাকে দরবারে ডেকেছেন, কাল তো আমার শুভদিন।

—হুজুর কাল অমাবস্যা, কাল আপনার সবচেয়ে অশুভদিন।

—তুমি বড্ড বাজে কথা বলছো। কাল হয়তো আমি একটা ইনাম পাব।

—না হুজুর, তা হবে না, আমার গণনা মিথ্যা হবে না।

—তুমি আমাকে বাজে ভয় দেখাচ্ছ।

—না, হুজুর।

—কাল যদি তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণ হয়, তাহলে কি হবে বল?

—আমার কথা মিথ্যা প্রমাণ করার অবকাশ কাল আপনি পাবেন না। কাল শাহানশার তাঁবু থেকে আপনি আর জীবিত ফিরে আসবেন না।

—মানে?

—আপনি ঘোড়া থেকে নেমে আসুন, সব বলছি।

কৌতূহলী কাচার ঘোড়া থেকে নেমে এলেন। মুনশী বললো—শাহানশা কাজিলবাস ফৌজ আর রাখবেন না। আপনাদেরকে কাল তিনি দরবারে ডেকেছেন। সেই দরবারের মধ্যেই আফগান ও উজবেকী ফৌজ আপনাদেরকে মেরে শেষ করবে। তারপর চারপাশের তাঁবু থেকে কাজিলবাসদের মেরে তাড়াবে। আপনারা যদি বাঁচতে চান তো, এখনি দলবল নিয়ে এখান থেকে চলে যান।

—তুমি ঠিক কথা বলছো?

—কাল প্রত্যক্ষ দেখবেন। আজ রাতে আফগান ও উজবেকী সর্দারদের শাহানশা খানা খেতে নিমন্ত্রণ করেছেন, তা জানেন?

—জানি।

—আপনারা বাদ গেলেন কেন?

—আমাদেরকে তো আলাদাভাবে কাল নিমন্ত্রণ করেছেন।

—তাঁবুর চারিপাশে তো আপনারাই পাহারাদারি করেন। আফগান ও উজবেকিরা আসার পর তাঁবুর বাইরে আপনি কান পেতে শুনবেন, ওদের কি কথা হয়; তাহলেই বুঝবেন।

কাচারের মুখখানা আবার কালো হয়ে গেল। অন্ধকারে সে মুখ মুনশী দেখতে পেল না।

কাচার সর্দার আবার ঘোড়ায় উঠে বসলেন, বললেন—বেশ, আমি আজ খবর রাখবো। যদি তোমার কথা মিথ্যে হয় তো, আজ রাতেই তোমার মুন্ডুপাত করবো।

—আমার কথা মিথ্যে হবে না, হুজুর। আমার আবদালি হুজুর তাঁবুতে ফিরে এসে শুয়ে পড়ার পর আমি গিয়ে আপনার তাঁবুতে দেখা করবো। আপনি পাহারাদারদের বলে রাখবেন।

ঠিক আছে।—বলে কাচার সর্দার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

রাতে আবদালি নাদির শাহের ভোজসভা থেকে ফিরে এলে পর মুনশী বললো—হুজুর, আজ রাতে আর গাঁজা খাবেন না। খুব ভাল ভাঙের সরবত বানিয়েছি, এক বদনা খেলেই এক ঘুমে রাত কেটে যাবে, ঠান্ডা আর টের পাওয়া যাবে না। খুব সরেশ সরবত বানিয়েছি।

আবদালি বললো—বেশ, দাও। আজ ভাল করে ঘুমিয়ে নিই, কাল রাতে হয়তো জাগতে হবে।

মুনশী প্রশ্ন করলো—কাল রাতে জাগবেন কেন? হুকুম করেন তো কালও সরবত বানাবো।

—না, কাল রাতে বোধ হয় একটা মারামারি বাধবে।

—লড়াই?

—তা বলতে পারো।

—কোথায় হুজুর? কাদের সঙ্গে?

—এইখানেই, তাঁবুর সামনে। সবই দেখতে পাবে। এখন কই তোমার সরবত দাও।

মুনশী বুঝলো, আবদালি কেন কথা বলতে চায় না। সে সরবতের বদনা এনে আবদালির হাতে দিল।

সত্যই ভাল সিদ্ধির বাদশাহী সরবত। খেয়ে আবদালি খুশী হলো, বললো—খুব তরিবত করে বানিয়েছ তো। বেশ বেশ—

আবদালি তাঁবুর একপাশে শুয়ে পড়লো।

মুনশী বাসনকোসন হাতে নিয়ে তাঁবুর বাইরে গেল। তারপর সবকিছু সাফসুফ করে নিয়ে যখন সে ফিরলো, তখন আবদালির নাক ডাকছে। আলো নিভিয়ে মুনশী শুয়ে পড়লো।

বেশ কিছুক্ষণ মুনশী চুপ করে শুয়ে রইল, তার চোখে ঘুম নেই। ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে চারপাশ স্তব্ধ হয়ে গেল। আবদালির পানে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটা ঝোলা হাতে ঝুলিয়ে মুনশী বেরিয়ে পড়ল।

চতুর্দশী রাত্রির অন্ধকার। তাঁবুগুলি ঠিক নজরে আসে না। মাঝে মাঝে আগুন দেখে বোঝা যায় যে, ওখানে পাহারাদার আছে। তবে কাচারের তাঁবুর নিশানা মুনশীর চেনা। মুনশী সোজা এগিয়ে চললো।

কিছুটা যাবার পরেই হঠাৎ আচমকা ডাক শুনলো—কৌন্ হ্যায় রে?

মুনশী বললো—দোস্ত।

পাহারাদার এগিয়ে এলো, বললো—কৌন্ হো?

—মনসবদার আবদালি সা'বের খিদমতগার।

—কাকে চাও?

সর্দার কাচার সাহেবকে। আগে থেকে খবর দেওয়া আছে।
—যাও।
মুনশী এগুলো। সামনেই শিবির। দরজার পর্দা তুলে মুনশী ডাক দিল—সর্দার সা'ব!
—কে?
—আবদালির খিদমতগার।
—এসো।
ভিতরে অন্ধকার। কাচার বললেন—সামনেই খাটিয়া আছে, বস।
মুনশী দুপা এগিয়ে খাটিয়া পেল, বসলো।
কাচার বললেন—কি খবর?
মুনশী বললো—আপনি হুজুর খবর নিয়েছেন?
—পুরো খবর পাইনি, তোমার খবর কি?
—আফগান ও উজবেকদের কাল তৈরী থাকবার হুকুম হয়েছে।
—তা আমি শুনেছি।
—আপনারাও লড়াই করার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন।
ওরা সংখ্যায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী, আমরা পারবো না।
—তাহলে এখান থেকে আজ রাতেই পালিয়ে যান।
—পালিয়ে গিয়েও নাদির শার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। ভয়ে কেউ কোথাও আশ্রয় দেবে না। নাদির শা আমাদের শেষ করবেই। পালিয়ে কোন সুবিধা হবে না।
—তাহলে অন্য কোন পথ ভেবেছেন?
—ভাবছি, এখনও ঠিক করতে পারিনি।
—আপনি তাহলে ভেবে দেখুন, আমি যাই। আমি তো আবার লুকিয়ে এসেছি।
—না, তুমি একটু বসো। তোমার সঙ্গে একটু আলোচনা করি।
—বলুন।
—এ ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত?
—আপনার কাছে অভয় পেলে বলতে পারি।
—বলো, কোন ভয় নেই।
—এখানে আর কেউ আছে?
—না, এ আমার তাঁবু। আমি একা থাকি।
—তাহলে শুনুন। নাদির শা থাকলে আপনাদের মরতে হবে বলেই তো আপনার ধারণা?
—হ্যাঁ।
—তাহলে নাদির শাকে সরিয়ে দিন। নাদির শা না থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন। নাদির ও কাজিলবাস—এই দুদিক একসঙ্গে থাকতে পারে না।
—সেটা আমার মনে হয়েছে, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?
—অসম্ভব কেন? আপনারাই তো শাহানশার শিবির-রক্ষী। আজ রাত্রেই আপনারা শিবির আক্রমণ করে তাকে শেষ করুন।
—আমরা তো আছি এখানে মাত্র সত্তর জন। পাশেই তো আফগানদের তাঁবু। কোন গোলমাল হলেই তো তারা আমাদের উপর চড়াও হবে।
—গোলমাল কিসের? শেষরাতে নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। ভোর হবার আগেই আপনারা এখান থেকে সরে যাবেন। নাদির শা না থাকলে তাঁর সৈন্যরা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়বে। আবার একজন সুলতান না হওয়া অবধি আপনাদের কোন ভয় থাকবে না।
—তাহলে কথাটা সকলকে জানিয়ে পরামর্শ করতে হয়।
—পরামর্শ করে তারপর তৈরী হবার সময় নেই। আপনি এদের দলপতি। আপনি নিজে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ুন, এক-একটা তাঁবুতে গিয়ে তাদেরকে তৈরি করে সঙ্গে নিন। তারপর সত্তর জন একসঙ্গে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়বেন। তাঁবুর মধ্যে সবাই এখন ঘুমুচ্ছে, আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না।
—তাহলে তুমিও আমার সঙ্গে চল।
—আমাকে কেন?
—তুমি এখন আফগান শিবিরে ফিরে গিয়ে আবদালিকে সব কথা জানিয়ে একটা গন্ডগোলের সৃষ্টি করবে কি না, তা তো বুঝতে পারছি না। এখন আর কাউকেই বিশ্বাস হয় না। তোমাকেও ছাড়বো না।
—আমি আপনাদের জীবন রক্ষা করলাম, আর আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন? বেশ চলুন!
তখনই মহম্মদ খান কাচার পাগড়ী এঁটে তলোয়ার ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

রাত তৃতীয় প্রহর। সমগ্র প্রান্তর স্তব্ধ। অন্ধকারে সত্তর জন সশস্ত্র কাজিলবাস নাদির শার তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়ালো।
কাচার বললেন—এতো জন তাঁবুর মধ্যে যাবে না। কে কে যাবে, তা আমরা এখানেই ঠিক করে নিই। কে কে আমার সঙ্গে ভিতরে যাবে, এগিয়ে এসো—
কেউ আর এগিয়ে আসে না। নাদির শাহের তাঁবুতে ঢুকে তাকে হত্যা করা নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়!
মুনশী হাসলো, বললো—এরা বোধ হয় ভয় পাচ্ছে।
ঘরে আলো জ্বলছে,—একজন বললো : শাহানশা হয়তো জেগে আছেন।
মুনশী বললো—থাকুন, তিনি সাড়া তোলার আগেই আমরা তাঁকে শেষ করবো। তাঁর সঙ্গে আছে চারজন খিদমতগার। সর্বসমেত পাঁচজন। তাদেরকে ভয় করার মত কোন হেতু নেই! মোটামুটি পাঁচজন মানুষ হলেই আমাদের চলবে। তাঁবুর ভিতরে এক-একজনের জন্য এক-একজন। ওরা ঘুমুচ্ছে। ওরা জেগে উঠে সাড়া তোলার আগেই ওদেরকে খতম করতে হবে।
এবার একে একে কয়েকজন কাজিলবাস যুবক এগিয়ে এলো কাচারের কাছে।
মুনশী অন্ধকারে তাদেরকে গুণে ফেললো। তেরোজন। বললো—এই তো অনেক, এদের দিয়েই হবে। চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি।
কয়েকজন এবার গুঞ্জন তুললো—শাহানশার সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে আমাদের সাহস হয় না।
মুনশী বললো—শাহানশা আর বেশীক্ষণ শাহানশা থাকবেন না।
মুনশী সবাইকে নিয়ে সন্তর্পণে তাঁবুর মধ্যে ঢুকলো।
মস্ত তাঁবু। তাঁবুর মধ্যে শ'খানেক মানুষ দরবার করতে পারে। সমস্ত মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা। চার-

কোণে চারটি লন্ঠন জ্বলছে। তার আলোয় তাঁবুর ভিতরটা ভাল করে দেখা যায় না। প্রথমে সকলে খানিক দাঁড়িয়ে দেখে নিল। শেষ দিকে একটা মঞ্চ। সেখানে লাল মখমলের উপর কারা যেন শুয়ে আছে। সেদিকে নজর পড়তেই কাচার বললো—এসো।

সতরঞ্চির উপর দিয়ে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে কজন এগিয়ে গেল।

কার্পেটের উপর শুয়ে আছেন শাহানশা নাদির শা, আর তার পায়ের কাছে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ঘুমুচ্ছে দুজন নফর।

কাচার এগোলেন, তলোয়ার বের করে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। তারপর সেই তলোয়ার বসিয়ে দিলেন নাদিরের গলায়। অত্যাচারী দিগ্বিজয়ী নাদিরের মুন্ডু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই নফর দুজন নিহত হলো।

মুনশী বললো—আর তো ভয় করার কেউ নেই, এবার সবাইকে ডেকে আনি।

কোন কথার অপেক্ষা না রেখে মুনশী ছুটে গেল তাঁবুর বাইরে, যে সাতান্নজন বাইরে অপেক্ষা করছিল, তাদেরকে বললো—এবার ভেতরে যাও। শাহানশার খেলা খতম!

কাজিলবাসরা হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লো।

মুনশী আর ভিতরে গেল না, অন্ধকার আকাশের পানে তাকিয়ে শুধু বললো—এতদিনে আমি মা-বাবার ঋণ শোধ করলাম। ভগবান, আমার এতদিনের সাধনা তুমি সার্থক করলে।

ভোর হয়ে এসেছে। আবদালি ঘুমুচ্ছে। মুনশী তাকে ধরে কয়েকটা ঝাঁকানি দিল—হুজুর উঠুন!

আবদালি উঠে বসলো বটে, কিন্তু তখনও সে ঢুলছে, সিদ্ধির নেশা তখনও কাটেনি।

মুনশী আবার ঝাঁকানি দিল, বললো—হুজুর, চোখে মুখে জল দিয়ে শিগগির তৈরী হোন, বিপদ দেখা দিয়েছে।

আবদালির ঢুলুনি তবু কমে না। চোখ দুটি লাল।

কলসী থেকে এক বদনা জল এনে, মুনশী আবদালির মাথায় এক আঁজলা জল দিল, জল ছিটালো আবদালির চোখে মুখে। আবদালি চেঁচিয়ে উঠলো—এই ও? খবরদার!

—উঠুন হুজুর, বড্ড বিপদ!

আবার জলের ঝাপটা।

এবার কাজ হোল। আবদালি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো, বললো—বদমাশ, বেয়াদব্, এখুনি খুন করে ফেলবো।

—হুজুর! বড় বিপদ!

এবার দুহাতে চোখ কচলে নিয়ে আবদালি বললো—কি হয়েছে?

বড় বিপদ, হুজুর। আগে মাথাটা ধুয়ে নিন, চোখে মুখে জল দিন, সব বলছি।—জলের বদনা নিয়ে আবদালির হাত ধরে মুনশী তাঁবুর বাইরে এলো।

মাথায় ও চোখে মুখে জল দিয়ে আবদালি ধাতস্থ হলো। বললো—কি, হয়েছে কি?

—হুজুর কাজিলবাসরা দল বেঁধে শাহানশার তাঁবুতে ঢুকেছে। এতক্ষণে শাহানশা বোধ হয় খুন হয়ে গেছেন। এবার হয়তো ওরা আমাদের দিকে আসবে।

—শাহানশা খুন! তুমি ঠিক জান?

—আমার তাই মনে হচ্ছে। আপনি লোকজন নিয়ে চলুন, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন।

—তুমি কি বলছো?

আবদালি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বললো—তুমি এখনি আমার লোকজনকে খবর দাও, সবাই তৈরী হয়ে আসুক—একেবারে লড়াইয়ের জন্য তৈরী হয়ে আসবে। যাও—

মুনশী ছুটলো সামনের তাঁবুগুলির দিকে।

আধঘন্টার মধ্যে আবদালির দল এসে পড়লো নাদিরের শিবিরে।

ভিতরে ঢুকে তারা দেখে কাজিলবাসরা তাঁবুর সব কিছু লুঠ করছে। মঞ্চের উপর নাদির পড়ে আছে রক্তাক্ত দেহে। কি করা উচিত আবদালি প্রথমে কিছুই ঠিক করতে পারল না। তারপর কাচারকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো—ব্যাপার কি, সর্দার?

কাচার বললেন—শাহানশা খতম। আমরা সব লুঠ করছি। তুমিও যা পার লুঠে নাও!

কাজিলবাসরা চীৎকার করে উঠলো—লুঠো, লুঠো!

যারা শুধুই বাড়ীঘর জ্বালিয়েছে আর লুঠ করেছে, তাদেরকে লুঠের কথা মনে করিয়ে দিলে আর অপেক্ষা করতে হয় না। আবদালির সঙ্গীরা কাজিলবাসদের সঙ্গে লুঠ করতে লেগে গেল।

বেলা এক প্রহর হতে না হতে, নাদিরের তাঁবুর কোন জিনিসই আর রইল না।

ইতিমধ্যে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। নাদিরের সেনানায়কেরা বিমূঢ় হয়ে পড়লো—এবার কার কথা শুনে তারা চলবে, কাকে বড় বলে মানবে?

কেউ কাউকে বড় বলে মানতে চায় না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দিল।

সন্ধ্যাবেলা আবদালি সব আফগানদের ডেকে বললো—আমাদের উপরওয়ালা এখন কেউ নেই। এখন আমাদের দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল। এখানে এবার কে বড় কে ছোট—এই নিয়ে গোলযোগ বাধবে। আমরা এর মধ্যে থাকবো না।

সন্ধ্যাবেলায় আবদালি সদলে কান্দাহারের দিকে যাত্রা করলো।

তিনদিন পরে হেলমন্দ নদীর ধারে তারা এসে পড়লো। এই তিনদিন মুনশী শুধুই ভেবেছে। যে কাজ করতে সে এসেছিল, কয়েক বছর ধরে যে প্রতিশোধের আকাংখা সে অন্তরে পোষণ করে এসেছে, তা সম্পূর্ণ হয়েছে। যে নাদির শা বহুজনের নিষ্ঠুর হত্যার কারণ ঘটিয়েছে, সেই নাদির শা হত্যাকারীর হাতেই অপঘাত মৃত্যু বরণ করেছে। মুনশীর কর্তব্য শেষ। এবার তাকে ফিরতে হবে। কিন্তু কোথায় ফিরে যাবে? দিল্লীতে? সেখানে তার কে আছে? কার কাছে ফিরবে সে? মুনশী এই সবই ভেবেছে তিনদিন ধরে। খিদমতগারের কাজ আর তার ভাল লাগছে না, এ কাজের প্রয়োজন তো ফুরিয়েছে। কেন আর সে চাকরের কাজ

করবে ?

সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে আবদালি বসে আছে। মুনশী এসে বললো—হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে।

—কী ?

—যে আফগানদের নিয়ে আপনি ফিরছেন, তাদের মধ্যে যোগ্য দলপতি কেউ নেই। আপনি তাদের দলপতি হোন।

—সবাই আমকে মানবে কেন ?

—আজই আপনাকে আমরা সুলতান বানাবো। আপনি কান্দাহারের সুলতান হয়ে বসুন। আমরা আজ এখানে আপনাকে সুলতান করে নিই।

কথাটা আবদালির কাছে খারাপ লাগলো না। তবু বললো—সুলতান যে হবো, সিংহাসন কই ?

—সিংহাসন পরে হবে। ওই যে উঁচু ঢিবিটা আছে, ওরই উপর আপনাকে বসিয়ে আমরা আপনাকে সুলতান করবো।

—কে করবে ? তুমি ? সবাই হাসবে।

—হাসবে না। এইখানে এক ফকির আছেন, সবীর মহম্মদ শা; আমি তাকে ডেকে আনছি। আপনি তৈরী হোন।

তখনই মুনশী ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

খানিক পরে মুনশী ফকির সাহেবকে নিয়ে ফিরে এল। উঁচু একটা ঢিবির উপর বসিয়ে ফকির সবীর মহম্মদ শা আবদালিকে আশীর্বাদ করলেন—আজ থেকে তুমি কান্দাহারের সুলতান হলে, খোদাতালার আশীর্বাদ তোমাকে বড় করুক !

মুনশী দলের সবাইকে ডেকে আনলো। বললো—আজ থেকে আমার হুজুর, আহমদ আবদালি হলেন আহম্মদ শা আবদালি।

পরদিন কান্দাহারে আহমদ শা আবদালি সত্যই সুলতান হয়ে বসলো। মুনশী বললো—হুজুর, এবার আমায় বিদায় দিন আমি স্বদেশে ফিরে যাই।

—তুমি এখানে থাকবে না ?

—না, হুজুর। দিল্লীতে আমি ফিরে যাব।

—বেশ যাও। আমি যদি দিল্লীতে যাই, দেখা হবে।

—নিজাম-উল-মুলক আসফ ঝা বলেছিলেন, আপনি একদিন শাহানশা হবেন, তারই পত্তন হলো। যদি কোনদিন দিল্লী যান হুজুর, নাদির শার মত নরহত্যা করবেন না, এই আমার শেষ মিনতি।

—বেশ, তাই হবে।

আহমদ শা আবদালি দশ বছর পরে দিল্লী এসেছিলেন, দিগ্বিজয়ীর বেশে, কিন্তু তিনি তাঁর সেদিনের প্রতিশ্রুতি রাখেন নি। তিন সপ্তাহ করে তিনি নগর লুঠ করেছিলেন। বহু নাগরিক খুন হয়েছিল, বহু বাড়ীতে আগুন জ্বলেছিল। কোন ঘরে কাপড়জামা, টাকাপয়সা, একখানা তলোয়ার কি একটা গাধা-ঘোড়া পর্যন্ত রেখে যাননি তিনি। নিয়ে গিয়েছিলেন ২৮০০০ উট, হাতী, খচ্চর আর গরুর গাড়ী বোঝাই লুঠের মাল।*

জানো কি ?

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যে সময় গজনীর সুলতান মামুদ লক্ষ লক্ষ নরহত্যা এবং ভারতবর্ষের অপূর্ব-সুন্দর শিল্পীকীর্তিপূর্ণ শত শত দেবমন্দির (সোমনাথ এবং মথুরার মন্দির বিখ্যাত ছিল) ধ্বংস করছিলেন, সেইসময়ই তাঁর সভায় ছিলেন পন্ডিত আলবেরুনী। তিনি ভারতবর্ষে এসে দীর্ঘকাল সংস্কৃত চর্চা করে সে যুগের ভারতবর্ষের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, আচার-আইন, ধর্মীয় সংস্কার, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখে গেছেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই ছাড়াও তিনি জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে বই লিখেছিলেন, অনেক সংস্কৃত বই আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন, কতকগুলি গ্রীক বইও সংস্কৃতে অনুবাদ করেছিলেন।

*'Fall of the Mughal Empire,' Vol. 2, p. 91 দ্রষ্টব্য।

বারীন বসু
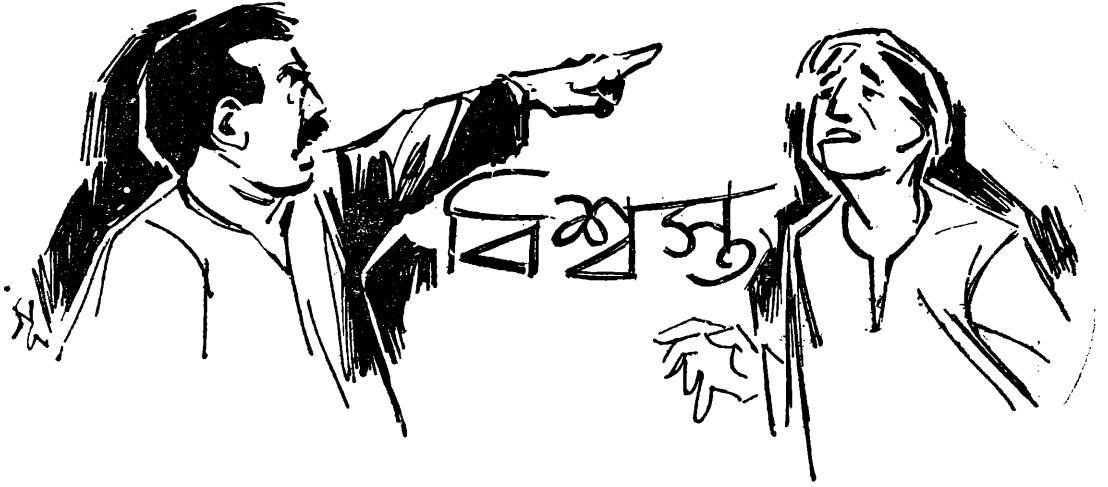
কালীচরণবাবু যে বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, এ আমার ধারণার বাইরে ছিল। বেঁটেখাটো গোলগাল মানুষটিকে বরাবরই খুব নিরীহ বলে ভেবে এসেছি, আর তারই কিনা পেটে পেটে 'এই'?

'এই' বলে 'এই'?

আমার এতদিনকার জমজমাট ব্যবসা একেবারে লাটে তুলে ছাড়লে! পরে, যখন আমি আমীর থেকে ফকির হয়ে গেছি, সারা মুখে চুণকালি পড়েছে, সেই সময়ে কালীচরণ-বাবু এসে কাঁচু মাঁচু মুখ করে বললে আমাকে, "এখন আপনি অধমকে শয়তান ভাবছেন, হয়তো মনে মনে গাল দিয়ে আমার সাতপুরুষকে নরকস্থ করছেন, কিন্তু যেদিন আপনার আর 'ক্রোধে অন্ধ' ভাব থাকবে না, চোখ খুলবে, সেদিন ঠিকই বুঝবেন যে অন্যায় আমি ছিটেফোঁটাও করিনি!"

খিঁচিয়ে উঠে বললাম, "তা করবে কেন। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির যে তুমি। অন্যায় করেছি আমি—তোমার মত কাল-সাপকে দুধকলা দিয়ে পুষে।"

কালীচরণবাবু ধুতির খুঁট দিয়ে মায়াকান্না সামলাতে সামলাতে সরে পড়ল সামনে থেকে।

আবার এল পরের দিন। একই সময়ে। মুখে চোখে একই করুণ ভাব ফুটিয়ে। বলল "যা চুকে বুকে গেছে তা নিয়ে আর ভাববেন না বাবু। তার চেয়ে বরং—"

"বেরোও, বেরোও এখান থেকে," চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, "নইলে তোমার গলা টিপে খুন করে ফেলব এক্ষুনি।" মনে হল না যে খুনের ভয়ে বিচলিত হয়েছে লোকটা। বরং দৃঢ় গলায় বলল, "তুচ্ছ একটা লোককে প্রাণে মেরে কেন পাপের বোঝা বাড়াবেন বাবু?"

আমার আর রাগে জ্ঞান নেই তখন। গলা ফাটিয়ে বললাম, "আমার পাপ পুণ্যের বিচার করবার তুই কেরে বদমাইস?" 'তুই' সম্বোধনে কি চমকাল কালীচরণবাবু? তাই মুখটা অমন অদ্ভুৎ অদ্ভুৎ দেখাতে লাগল!

চমকালে আমি নাচার। ওর মত লোকের সঙ্গে এর চেয়ে বেশী সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয়। শুধু ওরই জন্যে—যাক্! পুরোনো কথা যত পারি ভুলে যাবার চেষ্টা করি। নইলেই যে মাথায় আগুন চড়ে যায়। যেমনি চড়ে যায়। তেমনি চড়েছিল একটু আগেই। কালীচরণবাবু চলে যায় নি তখনো। 'অদ্ভুত অদ্ভুত' মুখটা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠায়। নিরীক্ষণ করছিল আমাকে। হিসাব কষে দেখছিল বোধহয় ভিটেছাড়া হয়ে এই কদিনে কতখানি পাল্টে গেছি আমি।

পাঁচটি বছর বাদে, জেল থেকে সেদিন ছুটি পেলাম, ভাবলুম সমস্ত দুর্ভোগ দুর্যোগের হাত থেকে সত্যিকারের রেহাই মিলল। কিন্তু—

উফ!

আবার সেই কালীচরণবাবু।

জেল গেটের বাইরে কাঁচু-মাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মুক্তির আনন্দ মাটি হয়ে গেল নিমেষেই!

হবে না?

এই কালীচরণবাবুই যে আমার সব সর্ব্বোনাশের মূলে! ও ফাঁস করে দিল বলেই তো আমার ভেজাল ওষুধ ভেজাল তেল তৈরীর কারখানার দফা রফা হয়ে গেল। সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত হল আমার লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি। আমি জেলে পচতে গেলাম।

বিশবছর আমার লোহা লক্কড়ের কারখানায় ম্যানেজারী করলেও, বিশ্বস্ত-কর্মদক্ষ হিসাবে আমার নেকনজরে থাকলেও, কোনদিনই কালীচরণবাবুকে আমার 'গোপন কারবার'এর বিন্দুবিসর্গও জানতে দিই নি। দৈবগতিকে জানল যেদিন, প্রথমটা কেমন হাঁ হয়ে গেল; তারপরই ছুটে থানায় গিয়ে—!

বাবু ট্যাক্সী ডেকে এনেছি। উঠে পড়ুন। আপনার জন্যে বরানগরে বাড়ি ঠিক করে রেখেছি।"

শেষাংশ ১১৩ পৃষ্ঠায়

রাজস্থানে অ্যাটম বোমা ফাটবার পর থেকেই সেই যে হাওয়া হয়ে গেলেন প্রফেসর, আর পাত্তা নেই।

যাবার সময় শুধু বলে গেছিলেন—দীননাথ, খবরের কাগজ পড়ার অভ্যেস আছে?

খোঁচা মেরে কথা না বললে যেন ভাত হজম হয় না প্রফেসরের। আমি রেগে গিয়ে বললাম—আপনার খবরগুলো বাদ দিয়ে পড়ি।

—বেশ, বেশ। তা ভালই কর। রাজস্থানে অ্যাটম বোমা ফাটবার পর সেখানে কি-কি কাণ্ড ঘটেছে, জানা আছে কি?

—খুবই স্বাভাবিক।

—তারপর আকাশ পথে একদল বৈজ্ঞানিক গিয়েছিল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। তারা অনেক কিছুই দেখেছে, সে সবের ফিরিস্তি দিলেও তোমার মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু যে জিনিসটা তাদের মাথাতেও ঢুকছে না, সেইটা দেখবার জন্যেই আমি যাচ্ছি।

কী? জিনিসটা কী?—ভীষণ কৌতূহলে আর গোমড়া হয়ে থাকতে পারলাম না।

একটা ডিম।—বলেই হাওয়া হয়ে গেলেন প্রফেসর।

হাঁ—না কিছুই না বলে চেয়ে রইলাম জুল জুল করে।

প্রফেসর ফোকলা মাড়ি বার করে একগাল হেসে বললেন—দারুণ তাপে বালি কাঁচ হয়ে গিয়েছে।

বাসি খবর।—বেঁকা সুরে বললাম আমি।

—আরও আছে। বিস্ফোরণের পরেই প্রচণ্ড মরুঝড় উঠেছিল। চারদিক থেকে হু-হু করে হাওয়া ছুটে এসেছিল বিস্ফোরণের জায়গায়।

—তা তো আসবেই।

—মরুঝড়ে কোথাও বালি নেমে গিয়েছিল, কোথাও উঠে আসছিল। কোথাও পাতাল পর্যন্ত পেঁৗছেছিল, কোথাও পাহাড় তৈরী করে ফেলেছিল। অদ্ভুত কুয়াশা-ধোঁয়াশায় ঝিকিমিকি বিকিরণ দেখা গিয়েছিল। রেডিও অ্যাকটিভ বালির স্তম্ভ অনেকক্ষণ ধরে দাপাদাপি করেছিল অনেকখানি জায়গা জুড়ে।

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে খবরটা বেরিয়ে গেল সব কাগজেই। শুধু কলকাতার কাগজ নয়, সারা পৃথিবীর সব কাগজেই ফলাও করে ছাপা হল একই হেড লাইন :

প্রাগৈতিহাসিক ডিম

"প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র এবার অভিনব পরীক্ষায় হাত দিয়েছেন। রাজস্থানের মরু অঞ্চলে ভারত সরকারের অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের পর বালি সরে গিয়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটে। পাতাল জঠর থেকে একটা অতিকায় ডিম উঠে আসে। বৈজ্ঞানিকরা গিয়ে দেখে এসেছেন, ডিমটা একদম তাজা। লক্ষ লক্ষ বছর চাপা ছিল মাটির তলায়। বিস্ফোরণের রহস্যজনক বিকিরণের ফলেই বোধহয় শিলীভূত ডিম ফের ফুটতে চলেছে।

ডিম ফুটে কি জানোয়ার বেরোবে, তা এক্স-রে করে জানা গেছে। এমনকি জন্তুটার হাড়ের চেহারা পর্যন্ত প্রফেসর জেনে ফেলেছেন। তাই তিনি কলকাতার চিড়িয়াখানায় খাঁচা বানিয়ে ডিম ফোটানোর ভার নিজের হাতে নিয়েছেন।"

দিন সাতেকের মধ্যেই প্লেনে করে ডিম নিয়ে এলেন প্রফেসর। দলে দলে লোক ছুটল চিড়িয়াখানায় ডিম দেখবার জন্য। দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেল। অফিস-আদালত ছুটি হয়ে গেল। সিনেমা-থিয়েটারগুলো মাছি তাড়াতে লাগল। সারা শহরের ছেলে-বুড়ো, কচি-কাঁচা সব্বাই ভেঙে পড়ল চিড়িয়াখানায়।

ডিম দেখে কিন্তু "আহামরি" কিছু মনে হল না। গা-টা খসখসে, ফাটাফাটা—গণ্ডারের চামড়ার মত। বাদামী রঙ। আকারে বড়। মোটামুটি হাঁসের ডিমের বা মুরগীর ডিমের মত মোটেই চকচকে ঝকঝকে নয়।

ছেচল্লিশ দিনের মাথায় ডিম ফুটে কিন্তু বেরিয়ে এলো পুরাকালের খোকা-দৈত্য। প্রথমে সাপের ল্যাজের মত একটা কুচকুচে কালো ল্যাজ নড়ে উঠল ভাঙা খোলার ফাঁক দিয়ে। তারপর গুটিগুটি বাইরে পা দিল অদ্ভুত একটা সরীসৃপ প্রাণী—দেখতে খানিকটা গোসাপ, খানিকটা গিরগিটির মত।

টেলিভিশন ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ দেখতে পেল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জন্মদৃশ্য।

বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে, তোবড়ানো গাল আরো তুবড়ে, ফোকলা মাড়ির সবটুকু বার করে, অ্যাদ্দিন বাদে জন্তুর নাম ঘোষণা করলেন প্রফেসর;

"ব্রন্টোসরাস"!

সংক্ষেপে, ব্রন্টি। প্রফেসরের দেওয়া আদরের নাম।

খাঁচা ঘরের পাশেই ছোট্ট ল্যাবোরেটরী বানিয়ে নিয়েছিলেন প্রফেসর। ছাই-পাঁশ গবেষণার বিন্দু-বিসর্গও আমাকে বলেননি। ল্যাবোরেটরীর দরজায় কিন্তু সব সময়ে বন্দুকধারী সেপাই দাঁড়িয়ে থাকতো। বুঝতাম না এত গোপনীয়তা কিসের।

ব্রন্টি দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল কালকেতুর মত। রোজ টেম্পো বোঝাই করে কচি বাঁশের কোঁড় আর কলা এসে পৌঁছোতে লাগল চিড়িয়াখানায়। প্রফেসর নিজের হাতে খাওয়াতেন ব্রন্টিকে। আর বাকী সময়টা ল্যাবোরেটরীতে ঢুকে খুটখাট করতেন। খাতার পর খাতা লিখতেন।

ব্রন্টির বয়স তখন একমাস, তখন মাপ নিয়ে দেখা গেল লম্বায় সে পাক্কা আড়াই গজ—মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত। তুরুক তুরুক করে দিব্বি নেচে বেড়ায় খাঁচার মধ্যে। প্রফেসর মাঝে মাঝে অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্রন্টির কাছে গিয়ে দাঁড়ান, চামড়ার গায়ে ঠেকিয়ে কি যেন দেখেন। তারপর বিড়বিড় করে আপন মনে বকতে বকতে ফের ল্যাবোরেটরীতে দৌড়ে আসেন।

ভারী ধোকায় পড়লাম গবেষণা রহস্য নিয়ে। অভিমানও হল খুব। ওঁর ল্যাবোরেটরীতেই বসে বসে ভাবছি, জিজ্ঞেস করব কিনা। প্রফেসার সামনেই বসেছিলেন আমার দিকে পেছন ফিরে। টেলিভিশনের মত একটা মেশিনের কাছে ঝিকিমিকি আলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন।

হঠাৎ খি-খি করে হেসে বললেন—সব কথা জানলেই কি মনটা ঠাণ্ডা হবে?

ভীষণ চমকে উঠে বললাম—কাকে বলছেন?

—তোমাকে।

—আমি তো কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

—মনে মনে তো জিজ্ঞেস করছো।

—কি করে জানলেন?

—এই মেশিনের ওপর তোমার চিন্তার কারেন্ট আছড়ে পড়ছে। চিন্তা পড়বার মেশিন বলতে পারো একে। এই দিয়েই তো ব্রন্টির চিন্তার চেহারা দেখতে পাই। এই হল আমার থট-রীডার।

—কিন্তু গবেষণা কি ওর চিন্তা নিয়ে?

—রাম বলো! গবেষণা হাঁসজারু নিয়ে।

—কি নিয়ে?

—হাঁসজারু! হাঁসজারু! মানে, হাঁস আর সজারু—হয়ে গেল হাঁসজারু। খি-খি-খি......!

—হাসবেন না। হাসলে আপনাকে মোটেই ভাল দেখায় না। হাঁসজারু মানের ব্যাখ্যা শোনবার জন্যে সুকুমার রায়ের বই আছে।

—দীননাথ, তোমার ব্রেনে ঘিলুর পরিমাণটা খুব বেশী নেই। এখনো বুঝলে না আমার মতলব? পৃথিবীর তাবড় জীববিজ্ঞানীদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে চাই আমি। এমন একটা চিড়িয়াখানা তৈরী করতে চাই যেখানে আমার হাতে গড়া সৃষ্টিছাড়া জীবরা দাপাদাপি করে বেড়াবে। কারও মাথাটা হবে কুমীরের মত—ধড়টা আমার ব্রন্টির মত। কারো ডানা থাকবে বাদুড়ের মত—উড়বে অবিকল চীনের ড্রাগনের মত ব্রন্টির দেহ নিয়ে। কেউ হবে সিংহের মত ঝাঁকালো মাথা—ল্যাজ নাড়বে কিন্তু ব্রন্টির মত। ব্রন্টির চেহারার কিছু কিছু আদল সব নতুন জন্তুর মধ্যেই দেখা যাবে। তাদের চেহারা হবে পাহাড়ের মত—স্বভাবটা হবে খরগোশের মত। তারা—

—প্রফেসর! প্রফেসর! দোহাই আপনার। বুঝিয়ে বলুন।

—আরে বোকা ছেলে, ঐ তো ওদিকে রয়েছে ব্যাঘ্র আর সিংহের বাচ্চা—সিংঘ্র। ঘোড়া আর গাধার বাচ্চার নাম কি অশ্বতর নয়? সাত কোটি বছর আগে আদ্দিকালের ঘোড়া ছিল শেয়ালের মত ছোট্ট। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সেই ঘোড়া বড় হতে হতে এত বড়টি হয়েছে। কে জানে জেব্রা আর জিরাফের বাচ্চা কি রকম হবে? মোদ্দা কথা কি জানো দীননাথ, ব্রন্টির জন্ম ডিমের মধ্যে। হাঁস, মুরগী, কুমীর, সাপ, বাদুড়, মাকড়শা—এদেরও জন্ম ডিমের মধ্যে। আমি এদের জোড়াতালী লাগিয়ে নতুন ধরনের ডিম সৃষ্টি করতে চাই যা থেকে বেরিয়ে আসবে এমন সব জানোয়ার যা পৃথিবীতে এর আগে কখনো দেখা যায়নি! খি-খি-খি! আমিই হবো ওদের ভগবান! আমিই হব ওদের

সৃষ্টিকর্তা! নতুন করে সৃষ্টি করবো প্রাগৈতিহাসিক জীবের দলকে—আলিপুরের এই চিড়িয়াখানার মধ্যে!

তুমি তো জানো, এক-এক রকম জীবের এক-এক রকম আকৃতি-প্রকৃতি নির্ভর করে তাদের বিভিন্ন জিনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ওপর। মালার আকারে সাজানো ক্ষুদে দানার মত এই জিন কণিকাগুলো নিয়েই গড়ে উঠেছে জীব-কোষের ক্রোমোসোম। দেখা গেছে, অ্যাটম বোমার বিস্ফারণে যে গামা-রশ্মি বেরোয় তার প্রভাবে বিভিন্ন জিন নষ্ট হয়ে গিয়ে জীবের আকৃতি-প্রকৃতি বদলে যায়। আমি এই গামা রশ্মি দিয়েই বানাবো আমার নতুন দানবদল।

সভয়ে চেয়ে রইলাম প্রফেসরের দিকে। তখন রাত হয়েছে। বাইরে চাঁদনী রাত। ঘরের মধ্যে বার্ণার জ্বলছে, হরেক রকম আলো জ্বলছে নিভছে। প্লেক্সিগ্লাস টেবিল আর প্লাস্টিক মেঝের ওপর রামধনু রঙের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

আচমকা একটা ভাসমান ছায়া দেখলাম। চোখের ভুল নিশ্চয়ই। বেগনী রঙের পাতলা কুয়াশা যেন মেঘের মত জেগে উঠেই মিলিয়ে গেল প্রফেসারের পাশে।

হাঁসজারু, হাতিমি, বকচ্ছপ সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল প্রফেসর দেখতেও পেলেন না।

ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হল পরের দিন থেকেই।

ব্রন্টির খাঁচা পরিষ্কার করতে এসে একজন ঝাড়ুদার চমকে উঠল একটা বেগনী রঙের পাতলা মেঘ দেখে। তখন সবে কাক ডেকেছে। অন্ধকার ভাল করে যায়নি। ব্রন্টির জন্য স্পেশ্যাল ব্যবস্থা অনুযায়ী ঝাড়ুদার বেচারী শীতে কাঁপতে কাঁপতে এসেছিল খাঁচা সাফ করতে। ব্রন্টি তখন ঘুমিয়ে কাদা।

ছায়াটা দেখে প্রথমে ভেবেছিল ভোরের কুয়াশা। কিন্তু কুয়াশা তো সাদা হবে। বেগনী কুয়াশা দেখে তাই পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিল ঝাড়ুদার।

আচমকা নড়ে উঠল পাতলা মেঘটা। ঘুমন্ত ব্রন্টির পাশ থেকে সরে এল শূন্য পথে—সুট করে উধাও হল স্তূপীকৃত বাঁশের কোঁড়ের আড়ালে।

ঝাড়ুদারের কিন্তু স্পষ্ট মনে হল একটা প্রেতমূর্তি, যেন বাতাসের ওপর ভেসে মিলিয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

রাম-রাম বলতে বলতে ঝাঁটা বালতি ফেলেই চোঁ-চাঁ দৌড় দিল ঝাড়ুদার।

একই ঘটনা ঘটল সেইদিন রাত্রে।

দর্শনার্থীরা বিদায় নিয়েছে। চিড়িয়াখানা এখন স্তব্ধ। মাঝে মাঝে কেবল নিশাচরদের অপার্থিব হুংকার শোনা যাচ্ছে।

ল্যাবোরেটরীর মধ্যে আমি আর প্রফেসর। উনি ব্যস্ত টেস্ট টিউব নিয়ে। আমি ব্যস্ত সুকুমার রায়ের "আবোল-তাবোল" নিয়ে।

আচমকা নিস্তব্ধ রাত খান খান হয়ে গেল বন্দুকধারী শান্ত্রীর বিকট আর্তনাদে;

"ভূত! ভূত! ওরে বাবা!"

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম আমি। অমনি স্পষ্ট দেখলাম, আমার পাশ দিয়ে একটা বেগনী রঙের মেঘ সাঁৎ করে ভেসে গিয়ে ঢুকে পড়ল টেবিলের তলায়।

ভাবলাম, বার্ণারের শিখায় ফুটন্ত বাটি থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে ভাসছে বাতাসে। তাই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম বাইরে। প্রফেসরও এলেন পেছন পেছন। ফটো ইলেকট্রিক সেল লাগানো দরজা আপনা থেকেই খুলে গেল সামনে দাঁড়াতেই।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বাঙালী পল্টন যা বললে, তা আজ ভোরবেলাই দেখেছে ঝাড়ুদার। এইমাত্র একটা অদ্ভুত আকৃতি বেগনী মেঘের মতই অদৃশ্য হয়ে গেল দরজার ফাঁক দিয়ে!

বেগনী মেঘ!

খটকা লাগল আমার। ঠিক সেই সময়ে ঘরের মধ্যে আমিও তো দেখেছি একটা বেগনী মেঘকে টেবিলের তলায় অদৃশ্য হতে। তবে কি......

প্রফেসরের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে ফিরে এলাম ল্যাবোরেটরীতে। ঘরে বার্ণার জ্বলছে, কেমিক্যাল ফুটছে। কিন্তু কই, টেবিলের তলায় তো কেউ নেই!

গা ছমছম করে উঠল আমার! প্রফেসর ভ্যাবা গঙ্গারামের মত তাকিয়েছিলেন আমার পানে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন খাতার পাতায় চোখ পড়তেই—এ কী! পাতা উল্টেছে কে?

—পাতা উল্টেছে! মানে?

—আমি তো তেত্রিশ পাতায় সুতো রেখে মার্কা দিয়ে গেছিলাম। একুশের পাতায় সুতো রেখে গেল কে?

আমি জানি কে!—অদ্ভুত কণ্ঠে বললাম আমি।

—কে বলো তো?

টেবিলের তলায় শূন্য জায়গাটা দেখিয়ে বললাম—বেগনী মেঘ।

প্রফেসরও উঁকি মেরে টেবিলের তলা দেখে নিয়ে বললেন,—বেগনী মেঘ! আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না!

—কালকে আপনার পাশেই হাজির ছিল; আমি দেখেছি, আজ ভোরে ঝাড়ুদার দেখেছে। এখন সেপাই দেখেছে। প্রফেসর ভূত কি বেগনী হয়? মেঘের মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়?

স্থির চোখে চেয়ে রইলেন প্রফেসর। আস্তে আস্তে আশ্চর্য আলো জ্বলে উঠল চোখের তারায় তারায়। অদ্ভুত হাসি ভেসে গেল তোবড়ানো গালের ওপর দিয়ে।

বললেন আপন মনে—বেগনী কুয়াশা, তাই না? দাঁড়াও. দেখাচ্ছি মজা!

রাত্রে ল্যাবোরেটরীর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, প্রফেসরও শুয়েছিলেন পাশের ক্যাম্পখাটে। গভীর রাতে বাথরুমে যাওয়ার দরকার হতেই, উঠে পড়ে দেখলাম—পাশের খাট খালি। প্রফেসর নেই।

এত রাতে কি ফের ল্যাবোরেটরীতে গেলেন? বাথরুমে

যাওয়ার পথেই তাই উঁকি মারলাম ল্যাবোরেটরীর দরজা দিয়ে।

প্রথমে প্রফেসরকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু গলা শুনতে পেলাম। কড়া গলায় কাকে যেন ধমকাচ্ছেন—কুশোকচু, খুব অন্যায় করেছো!

কোনো জবাব এল না। কিন্তু ফের বললেন প্রফেসর—আবার মিথ্যে কথা? তুমি কি ভাবো আমি কিছু জানি না? আমার খাতা খুলে গবেষণার ফরমুলা দেখছিলে? চোর কোথাকার?

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর আবার তেড়ে উঠলেন প্রফেসর—খবরদার কুশোকচু; আমার আবিষ্কার চুরি করার ফলটা ভাল হবে না।

কার সঙ্গে এত কথা বলছেন প্রফেসর! উঁকি মারলাম অন্য কোণে। চিন্তা পড়বার সেই মেশিনটার ওপর নীল-সাদা আলো ঝিকিমিকি ঝিকিমিকি নড়ছে। সামনেই টুলে বসে তড়পাচ্ছেন প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র।

আর, মেশিনটার ঠিক মাথার ওপর শূন্যে দুলছে সেই অদ্ভূত বেগনী মেঘের মত কুয়াশার পুঞ্জ।

সামনে আয়না না থাকলেও বেশ বুঝলাম আমার দু'চোখের অবস্থা এখন ছানাবড়ার কাছাকাছি।

এ কী দেখছি সামনে? অপার্থিব সেই বেগনী মেঘ দুলছে...দুলছে...দুলছে! আচম্বিতে দেখে এর আগে শুধু কুয়াশা বলেই মনে হয়েছিল। এখন এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকার ফলে স্পষ্ট দেখতে পেলাম একটা প্রেতমূর্তি—ভূতের বইতে ভূতের বর্ণনা যে রকম থাকে—অবিকল সেই রকম। সারা দেহটা যেন বেগনী রঙের অর্ধস্বচ্ছ কুয়াশা দিয়ে তৈরী। দেহ ফুঁড়ে ওপাশ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ভূতের চেহারা খর্বকায় মর্কটের মত। আলাদীনের আশ্চর্য দৈত্যের মত থট-রীডার মেশিনটার ওপর ভাসছে আর দুলছে! কথা বলছে না। কিন্তু মনের কথা চিন্তার আকারে থট-রীডার মেশিনে ফুটে উঠেছে।

আমি সব সইতে পারি, ভূতকে একদম বরদাস্ত করতে পারি না। বিষম ভয়ে আঁ...আঁ করে চেঁচিয়ে উঠে দুপ-দাপ করে ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলেন প্রফেসর। বেগনী প্রেতচ্ছায়াও পাতলা হয়ে গেল চক্ষের নিমেষে।

আস্তে...আস্তে...বাতাস কাঁপলেই মিলিয়ে যাবে কুশোকচু।—আঁতকে উঠে বললেন প্রফেসর।

কোথায় কুশোকচু? একটা বেগনী মেঘ পিছলে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। প্রফেসর "পাকড়াও...পাকড়াও" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে খপাৎ করে টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলেন ওঁর বিখ্যাত বামন রশ্মি টর্চটা।

বেগনী কুয়াশাটা তখন সবে ফটো-ইলেকট্রিক সেল লাগানো অটোমেটিক দরজার সামনে পৌঁছেছে। মেঘের মতই দরজার ফাঁক দিয়ে গলে যাবার মতলব ছিল বোধহয় ভূত মহাশয়ের। কিন্তু তার আগেই বামন-রশ্মি টর্চের বোতাম টিপলেন প্রফেসর।

আশ্চর্য রশ্মি সটান গিয়ে পড়ল বেগনী কুয়াশার ওপর।

পলক ফেলবার আগেই পিলে চমকানো পরিবর্তনটা ঘটে গেল চোখের সামনে।

শিউরে উঠল যেন বেগনী কুয়াশা। থরথর করে কেঁপে উঠেই তালগোল পাকিয়ে ঘূর্ণিপাকের মত গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে ক্রমশঃই ছোট হয়ে ঠিক যেখানে মিলিয়ে গেল, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম একটা বামন মানুষকে। মাথায় মাত্র দু' ইঞ্চি লম্বা।

—কুশোকচু! এবার পালাবে কোথায়?

অটোমেটিক দরজা কিন্তু সরতে শুরু করেছে দু' ইঞ্চি হাইটের কুশোকচু আবির্ভূত হতেই। পুঁচকে পুঁচকে দুটো হাত তুলে বুড়ো আঙুল দুটো প্রফেসরকে দেখিয়েই সুরুৎ করে ফাঁক দিয়ে উধাও হয়ে গেল বেঁটে ভূত।

ধর! ধর! চেঁচাতে চেঁচাতে প্রফেসর বাইরে ছুটে গেলেন বটে। কিন্তু লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে দু' ইঞ্চি লম্বা কুশোকচুকে আর খুঁজে পেলেন না।

—ব্যাপারটা কী? শুধোলাম আমি ল্যাবোরেটরীতে ফিরে।—কে এই কুশোকচু?

একজন জাপানী বৈজ্ঞানিক।—মুখ আমসি করে বললেন প্রফেসর।—ভারী বদ ব্যোনিক। জানো তো, ভারতের যোগীরা যে কোনো জিনিসকে, এমনকি রক্তমাংসের দেহকেও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে ইথারের মধ্য দিয়ে। আমরা তাকে যোগশক্তি বললেও একটা বৈজ্ঞানিক কারণ নিশ্চয় আছে। কুশোকচু সেই টেলিপোর্ট তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে। ট্রান্সপোর্ট নয়—টেলিপোর্ট। কিন্তু বিজ্ঞানী মহলকে একদম জানায়নি।

—কেন?

—অন্য বৈজ্ঞানিকদের দামী দামী আবিষ্কারগুলো ভূত সেজে চুরি করবে বলে। আসলে ও বৈজ্ঞানিক স্পাই। এক দেশের আবিষ্কার চুরি করে আরেক দেশকে বেচে দেয়। ও যে টোকিও থেকে এসে আমার পেছনে লাগবে, ভাবতেই পারিনি।

—এখন উপায়?

—কি আবার উপায়? যেটুকু জেনেছে—জানুক। বামন রশ্মি দিয়ে বামন করে দিলাম, দেখলে না? ঘুরে মরুক চিড়িয়াখানায়। টোকিও ফিরতে হবে না ইহজন্মে।

—কিন্তু আমি ঘরে দৌড়ে ঢুকতেই মিলিয়ে গেল কেন?

—বিদিগিচ্ছিরি চেঁচিয়েছিলে বলে। হাওয়া কেঁপে উঠতেই বাতাসে গলে গেল ওর সূক্ষ্ম দেহ। মরুক গে! এবার আমি নিশ্চিন্ত মনে ড্রাগন তৈরী করব।

সত্যি সত্যিই মাস কয়েকের মধ্যে একটা ড্রাগন-খোকা বানিয়ে ফেললেন প্রফেসর। অতীতের উড়ুক্কু পাখী 'টেরাডন'-এর মত অনেকটা দেখতে হলেও আকারে অনেক বিরাট। চীনের ড্রাগন স্রেফ গল্প-কথার অলীক প্রাণী ছিল অ্যাদ্দিন। আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তার জন্ম হল

প্রফেসরের দৌলতে। টনক নড়ল চীন দেশের কর্তাদের। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্রকে লোপাট করে পিকিং-এ নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, এই নিয়েও আরম্ভ হলো ষড়যন্ত্র।

কিন্তু হায়রে পৃথিবীর মানুষ! ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারল না, বিপদ আসছে অন্য দিক থেকে।

বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ একদিন প্রফেসরের বামন-রশ্মি টর্চটা উধাও হয়ে গেল টেবিল থেকে!

অমন যে মাটির মানুষ প্রফেসর, তিনি পর্যন্ত রেগে গেলেন টর্চ হারানোয়। তুলকালাম কান্ড হয়ে গেল শান্ত্রীদের নিয়ে। কিন্তু টর্চ পাওয়া গেল না।

কিছুদিন পর থেকেই অদ্ভুত কতকগুলো খবর বেরোতে লাগল পৃথিবীর নানান খবরের কাগজে। বড় বড় চিড়িয়াখানাগুলো থেকে নাকি অদ্ভুত অদ্ভুত জীব-জন্তুগুলো রাতারাতি উধাও হয়ে যাচ্ছে। খাঁচার দরজা বন্ধই থাকছে। কিন্তু ভোরবেলা দেখা যাচ্ছে ভেতরের জানোয়ার যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

প্রফেসারের কানেও সে-সব খবর পোঁছোলো। আন্তর্জাতিক পুলিশ যে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, তাও শুনলেন। বেশী কিছু বললেন না। ওঁর মন তখন ড্রাগন বাচ্ছার দিকে। ভাবছেন, ড্রাগনের সঙ্গে ঘোড়া মিলিয়ে ভয়ংকর পক্ষীরাজ সৃষ্টি করা যায় কিনা। অথবা মাকড়শার মত আট পা-ওয়ালা ব্রন্টোসরাস তৈরী করা সম্ভব কিনা।

আচমকা একই কান্ড আরম্ভ হল আলিপুরের চিড়িয়াখানায়।

এক রাত্রেই খাঁচাঘরের মধ্যে থেকে অদৃশ্য হল বাঘ আর সিংহ, উট আর ভালুক, বনমানুষ আর কুমীর। এমন কি হাতী, গন্ডার আর জলহস্তী পর্যন্ত পাচিল টপকে পালিয়ে গেল সেই রাতেই। কিন্তু গেল কোথায়? চিড়িয়াখানার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে মাছি পর্যন্ত গলে যায়নি!

পরের দিন কলকাতার সমস্ত পুলিশ বাহিনী ছুটে এল চিড়িয়াখানায়। মিলিটারী পুলিস টহল দিতে লাগল সারা শহরে। ভয়ের চোটে লোকজন খিল এঁটে বসে রইল যে-যার ঘরে। কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ! এ কী ভুতুড়ে কান্ড আরম্ভ হল সারা পৃথিবীর চিড়িয়াখানাগুলোয়! এত বড় বড় জন্তুগুলো যাচ্ছে কোথায়?

প্রফেসর মাথা চুলকে বললেন—দীননাথ, ব্যাপার কি বলো তো?

আমিও মাথা চুলকে বললাম—কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে—।

—তবে কী?

—কাল রাত তিনটের পর থেকে ঘুমোতে পারছিলাম না পেট ব্যথার জন্যে। কাঁকড়ার কাটলেট খেয়ে—।

—আর খেও না। কিন্তু কিছু দেখেছিলে কী?

—হ্যাঁ......মানে......।

—কী? কী? কী?

—একটা বড় বল।

—হ্যাঁ। দু' হাত দু'পাশে ছড়িয়ে বললাম—এত বড়।

—বল? ঠিক দেখেছো?

—হ্যাঁ। লাল আলো জ্বলছিল বলটার গায়ে। সাপের ঘরের দিক থেকে সাঁ করে উঠে গেল আকাশের দিকে।

—আগে বলোনি কেন?

—ভেবেছিলাম পেট গরম হয়েছে বলে ভুল দেখেছি।

সব রহস্যের সমাধান ঘটল সেই রাতেই।

ঘুমোতে পারছিলাম না কিছুতেই। মন যেন বলছিল, কিছু একটা ঘটবে আজ রাতে। লাল বলের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে আপনা হতেই।

পুলিস সারা চিড়িয়াখানা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মিলিটারীরাও বন্দুক-কামান নিয়ে তৈরী। গন্ডার দেখলেই গন্ডায় গন্ডায় গুলি ছুঁড়বে।

কিন্তু গন্ডার-ফন্ডারের টিকি দেখা গেল না। রাত ঠিক দুটোর সময়ে শুধু একটা লাল তারা খসে পড়ল আকাশ থেকে। লাল বেলুনের মত ভাসতে ভাসতে নেমে এল চিড়িয়াখানার প্রাঙ্গণে। নিঃশব্দে। এতটুকু শব্দ শোনা গেল না কোথাও।

মিলিটারী বা পুলিসকে বলা হয়নি আকাশের দিকে নজর রাখতে। তারা তাই দেখেও দেখল না। ভাবল, বড়-দিনের হিড়িকে ফানুস ছেড়েছে কেউ সাহেবপাড়া থেকে।

আমার নজর ছিল কিন্তু আকাশের দিকেই। লাল বলটা ব্রন্টির খাঁচার মধ্যে অবতীর্ণ হতেই আমি দৌড়ে গিয়ে ডাকলাম—প্রফেসর! প্রফেসর! এসেছে!

—কে?

—লাল বল।

এর বেশী আর কিছু বলতে হল না। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন প্রফেসর। তীরের মত দৌড়ে বেরোতে যাচ্ছেন বাইরে, এমন সময়ে নিঃশব্দে খুলে গেল অটোমেটিক দরজা। বন্ধও হল একটু পরে। বুঝতে পারলাম কে যেন ঢুকল ভেতরে।

অদৃশ্য মানুষ নাকি? না, অদৃশ্য বনমানুষ?

গাম ছমছম করে উঠল আমার।

আচম্বিতে কে যেন ধমকে উঠল মাথার মধ্যে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে গেলে হয় না?

বুঝলাম না কে ধমকাল। প্রফেসরও ধমক খেয়েছেন বুঝলাম ওঁর মুখ দেখে। কিন্তু আমরা কেউ তো কথা বলিনি।

মাথার মধ্যে আবার সেই ধমক শুনলাম—ভালো জ্বালা তো! প্রফেসরকেও বলিহারি যাই! থট-রীডার যন্ত্র বানিয়েছেন, ধরতেও পারছেন না আমরাও থট-ট্রান্সমিটার দিয়ে কথা বলছি?

ঢোক গিললেন প্রফেসর—কে আপনারা?

—পায়ের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন।

পায়ের দিকে তাকিয়েই আমরা যা দেখলাম, হলফ করে বলছি সে দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি এবং যেভাবে আঁৎকে উঠলাম, এমন ভাবেও কখনো আঁৎকাইনি।

ইঞ্চি দুয়েক লম্বা জনাবিশেক মূর্তি দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার আর প্রফেসরের পায়ের কাছে।

প্রত্যেকেরই তিনটে করে ঠ্যাঙ এবং চারটে করে হাত। দুটো হাত কোমরে রেখে বাকী দুটো হাতে একটা আল-পিনের মত বস্তু তাগ করে আছে আমাদের দিকে।

মাথার মধ্যে ধ্বনিত হল আবার সেই ধমক—উজবুক আর কাকে বলে! পৃথিবীর মানুষ তো। দেখতেই পাহাড়ের মত—বুদ্ধি ছিটেফোঁটাও নেই। হাতীদের মগজ ঘেঁটেই বুঝেছি তোমাদেরও দৌড় কতখানি। দাঁড়িয়ে থাকবে, না ভেতরে যাবে?

যদি না যাই?—মাথা গরম হয়ে গেল আমার বুড়ো আঙুল জীবদের ধমকানি শুনে।—দেব নাকি পা দিয়ে মাড়িয়ে?

পারবে না খোকা! হাতের মেশিনটার বাংলা নাম জেনো পক্ষাঘাত অস্ত্র। বেশী ট্যাঁটামো করলেই জিভটা শুদ্ধ অসাড় করে দেব।

ওরে বাবা! প্রফেসর পর্যন্ত ভয় পেয়েছেন মনে হল। সুড়সুড় করে ভেতরে গিয়ে বললেন—বলো, কি বলবে?

বিশজন তিন ঠেঙে আজব মূর্তি মার্চ করে এল ল্যাবোরেটরীর মধ্যে। প্লাস্টিক মেঝের ওপর ভালো করে দেখলাম ওদের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা। মাথাগুলো স্পেস হেলমেটে ঢাকা। তিনটে ঠ্যাঙ আর চারটে হাত কিন্তু কিলবিল করছে ক্ষুদে ধড়ের চারধারে।

আলপিনগুলো তাগ করেই কথা বলল ওরা। মানে, কথাগুলো মাথার মধ্যে ছুঁড়ে দিল থট-ট্রান্সমিটার দিয়ে।

বলল—আমাদের সময় কম। কাজ অনেক। আমরা এসেছি এই সৌরজগতেরই একটা অ্যাসটেরয়েড, মানে, গ্রহাণু থেকে। বাংলায় তোমরা সে গ্রহকে লিলিপুট গ্রহ বলতে পারো। আমরা এমন একটা চিড়িয়াখানা বানাতে চাই যেখানে এই ছায়াপথের বিভিন্ন গ্রহের জীবজন্তুর নমুনা থাকবে। সবুজ গ্রহ এই পৃথিবীতে নেমে হতাশ হয়েছিলাম তোমাদের পাহাড়ের মত চেহারা আর পোকার মত বুদ্ধি দেখে। এমন সময়ে একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান মানুষকে পেলাম এই চিড়িয়াখানার মধ্যে। প্রফেসর নাট-বল্টু-চক্র, আপনিই সেই মানুষ যার একটি মাত্র আবিষ্কার চুরি করে আমরা আমাদের অভিযান সফল করতে চলেছি।

—চোর কোথাকার! বামন-রশ্মি টর্চটা না বলে নিতে লজ্জা করল না? মুখ গোঁজ করে বললেন প্রফেসর।

—লজ্জা? ওসব পৃথিবীর ডিক্সনারীতে আছে। আমরা এইখানেই ঘুরঘুর করছিলাম। গুগলি আর কেঁচো ধরে খাচায় পুরছিলাম। এমন সময়ে এই ঘর থেকে একটা দু'পেয়ে মানুষ ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল—মাথায় সে আমাদের মতই।

—কুশোকচু!

—হ্যাঁ। জাপানী বৈজ্ঞানিক। তাকে সঙ্গে সঙ্গে খাঁচায় পুরলাম চিড়িয়াখানায় রাখবো বলে। তারপর থট-রেডিও আর থট-ট্রান্সমিটার দিয়ে হদিশ পেলাম বামন-রশ্মি টর্চের। প্রফেসর, টর্চটা আমরাই না বলে নিয়েছি। সারা পৃথিবীর বিদঘুটে জন্তুদের পোকার মত ছোট্ট করে লোপাট করেছি। এখন এসেছি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে।

—অভিনন্দন? চোরদের কাছ থেকে?

বিদায় প্রফেসর।—দরজার দিকে মার্চ করে এগিয়ে গেল তিন পেয়ে লিলিপুটবাসীরা।

আমার বামন-রশ্মি টর্চটা?—কঁকিয়ে উঠলেন প্রফেসর।

—ওটা সঙ্গে নিয়ে গেলাম আপনার স্মৃতি হিসাবে—পরের বারে আপনাকেও নিয়ে যাব। কেমন?

দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল বামন বাহিনী। পক্ষাঘাত অস্ত্রের জন্যেই কিনা জানি না। আমরা এক পা-ও নড়তে পারলাম না। চোখের কোণ দিয়ে শুধু দেখলাম, একটা জ্বলন্ত লাল বল উল্কা-বেগে উঠে গেল আকাশে।

পরদিন সকালে দেখা গেল, প্রফেসরের অত সাধের ব্রন্টি আর খোকা-ড্রাগনও অদৃশ্য হয়ে গেছে খাঁচার মধ্য থেকে!

— — — —

বিশ্বস্ত — ১০৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ

বুকটা হঠাৎ টন্ টন্ করে উঠল। রুণা—আমার মা মরা মেয়ে রুণা—তার কি হল?

কালীচরণবাবু ভিজে গলায় বলল, "কি ভাবছেন বুঝেছি বাবু। রুণা মাকে এখনি দেখতে পারেন।"

হরিচরণ ঘোষের 'স্মৃতিকথা' এইখানেই শেষ। জেল থেকে বেরিয়ে বেশীদিন বাঁচেন নি তিনি। কালীচরণ-বাবুও এখন পরলোকে।

কি বলছ?

স্মৃতিকথার খাতাটা আমি কি করে পেলাম? রুণা দিয়েছে। রুণা এখন একটা নামকরা কলেজের অধ্যাপিকা, আর—

হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। কালীচরণবাবুর কথা বলতে গেলেই রুণার চোখে জল ভরে আসে। ওর ছ'বছর বয়সের সময় ওর বাবা যখন জেলে গেলেন, আর আত্মীয় স্বজনরা 'পরের ঝক্কি' তায় আবার আসামীর মেয়ে ঘরে নিতে ধানাই-পানাই করতে লাগল, কালীচরণবাবুই যে ওকে বুকে টেনে নিয়ে বাবার স্নেহে মানুষ করে তুলেছিল। ওকে ইস্কুল-কলেজে পড়িয়েছে, গান-বাজনা শিখিয়েছে আর সারাক্ষণ কানে মন্ত্রজপার মত উচ্চারণ করেছে, "সৎ থাকো, সৎ থাকো!"

গিরিশ নট্ট ★★★

মৌখালি গ্রাম আকারে বড়। পুব আর পশ্চিমে টানা লম্বা অনেকটা। পুবে বামনখালি সীমানা, পশ্চিমে মিএগা-গঞ্জ অব্দি।

উত্তর আর দক্ষিণে কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম এর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় আকৃতি খানিকটা পটলের মত। পুব আর পশ্চিমে দু' ঠ্যাং ছড়িয়ে মৌখালি যেন দাপট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সবার দণ্ডমুণ্ড হয়ে।.....

মৌখালির দু দণ্ডের মধ্যে আড়াআড়ি খুব পুরনো। প্রায় তিন পুরুষের। কারোর সঙ্গে কারো সদ্ভাব নেই। এমন কি বিবাদেরও শেষ নেই।

এর সূত্র আজ প্রায় অনেকেই ভুলে গেছে। ইতিহাসের পাতা বিবর্ণ। কিন্তু রেওয়াজটা রয়ে গেছে। সাধারণ মানুষের মধ্যেও নিয়মের মত চলে আসছে সেটা। অনেকটা উদয় আর অস্তের মত চির সত্য।

রেষারেষির ধরনটা অবশ্য একালে এসে অনেকটা ভোল পালটেছে। মামলা মোকদ্দমা রাহাজানি দুই পুরুষ অব্দি খুব জমজমাট ভাবেই চলত। আর সম্ভবতঃ তিন পুরুষে আসতে আসতেই দুই গোষ্ঠী খানিকটা নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু বুদ্ধিমান বংশধরেরা হয়ত নিজে-দের ক্ষমতার জোরটা খুব ভাল ভাবেই বুঝে উঠতে পেরে-ছিলেন। তাই বিপদের ধরনও বদলে যায়। 'কার কত আর্থিক সংগতি' এটা প্রমাণ করতেই এখন দু' গোষ্ঠীর প্রাণান্ত। তবু এই 'সংগতির' দাপটের মধ্যেই দ্বন্দ্বটা এখন সীমাবদ্ধ। পুজোর সময়ই প্রমাণের ধুম লাগে বেশি। উভয় পক্ষেরই বিরাট করে পুজো হয়। পাঁচ মাস আগে থেকেই শুরু হয় কুমোর চর্চা ঠাকুর চর্চা। কার ঠাকুর কত বড় কুমোরের হাতে উঠবে, কার ঠাকুর মণ্ডপের চালা টপকাবে, বেশ জাঁক করেই প্রচার শুরু হতে থাকে।

পুব আর পশ্চিমে যত বিবাদই থাক হাট একটাই। হাটে দু' পক্ষের লোকই নিজেদের জাহির করতে গিয়ে প্রায়ই মারামারি করে বসে। যে পক্ষ যত বেশি মার খায় সে পক্ষের তত বেশি জিদ চাপে। ক্ষমতার দৌড় দেখাতে সাতদিনেও উৎসবের জোয়ার শেষ হয় না।

গত সনে পুব মৌখালির মেজ কর্তা রাখাল বাড়ুজ্যের মুখের আদলের সঙ্গে ওঁদের অসুরের সাদৃশ্য নিয়ে রীতি-মত রক্তারক্তি হয়ে গিয়েছিল।

এবার হঠাৎ শোনা গেল পশ্চিম মৌখালির নকুল ভট্চায্ বাদামতলির সেরা ঢাকী মাধব নট্টকে বায়না করে-ছেন। কথাটা হাটের মুখে ছড়িয়ে গেলে পুব মৌখালির ভাসান চক্কোত্তি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে রাখাল বাঁড়ুজ্যেকে খবরটা পৌঁছে দিয়ে ঘন ঘন তামাক টানতে লাগল।

রাখাল বল্লেন—বলছে?

—বলছে মানে? রীতিমত ঢোল পেটাচ্ছে। ওদের ঘটি হালদার তো আমাকে হুমকিই দিলে, ক্ষমতা থাকে তো এবার ঢাকের লড়াইতে এসো।

বলে ভাসান চিন্তিত মুখে কয়েকটা ঘনঘন টান দিল হুঁকাতে। রাখাল থমথমে মুখে চুপচাপ তামাক টানতে লাগলেন। ভাসান ফের বললে—মাধা নট্টকে ওরা আগেই দখল করে নিল? চালটা যদি আগেই আমরা দিতে পারতাম—

—ওরা তাহলে এবার ঢাকী দিয়ে আমাকে জব্দ করতে চাইছে?

গড়গড়ার নলে বিলম্বিত টান দিতে দিতে চোখ বুজে যেন কী ভাবেন রাখাল বাঁড়ুজ্যে।

ভাসান বললে—হ্যাঁ তাইতো মনে হয়। আর—

—আর কি? চোখ মেললেন বাঁড়ুজ্যে।—বলতে বলতে

থেমে গেলে কেন?

—এতকাল আমরাই মান বাঁচিয়ে এসেছি। এবার বোধহয় আর হল না।

কথাটায় রাখাল বোধহয় বিরক্ত হলেন। খানিকক্ষণ কোঁচকানো ভুরুটা তুলে রেখে বললেন—কথাটা বলতে তোমার লজ্জা হল না ভাসান?

ভাসান অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কথাটা পালটানোর উপযুক্ত ভাষাও সে হাতড়ে পেল না।

বাঁড়ুজ্যে বললেন—এতকাল যখন বাঁড়ুজ্যেদের মাথা মাড়িয়ে ওরা যেতে পারে নি আজও পারবে এটা তোমরা ভাবলে কী করে? ভাসান বললে—না না তা কখনো ভাবি না। তবে এবারে যেন ঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছি না। মাধা নট্টকে ওরা আগেই দখল করবে ভাবতে পারি নি!

—তা নিক না। পাল্লা দেবার মত ঢাকী আমাদেরও আনতে হবে।

—কে? মাধাকে টেক্কা দেবার মত কাউকে তো দেখছি না।

রাখাল আবার নিঃশব্দে গড়গড়া টানতে লাগলেন। ভাসান উদ্বিগ্ন মুখে চেয়ে রইল।

হঠাৎ নল থেকে মুখ তুলে রাখাল তাকালেন ভাসানের দিকে। বললেন—মাধা তো কালকের ঢাকী। মাধাকে যে শিখিয়েছে, ঢাকের কাঠিতে যার যাদু খেলে সেই গিরিশ নট্টকে খবর দিতে হবে

শুনে ভাসান অবাক হয়ে গেল। বললে—গিরিশ! কিন্তু সে তো বাজনা ছেড়ে দিয়েছে। বলতে গেলে এক রকম শয্যাশায়ী। সে কি রাজী হবে?

—রাজী? রাখাল বাঁড়ুজ্যে হাসলেন।—টাকার অঙ্ক যখন শুনবে তখন রাজী না হয়ে যাবে কোথায়?

ভাসানের তবু মন মানে না। সে বলে—যদি না পারে? বুড়ো-হাবড়া রোগ-ভোগে মরছে, মাধাকে টেক্কা দেওয়া সহজ হবে?

—যাতে হয় সেরকমই ব্যবস্থা করতে হবে।

ভাসান কথাটা ঠিক বুঝল না। তার মুখের ভাব দেখে রাখাল ফের বললেন—আসল ওষুধ তো সেখানেই। গিরিশ যত না শরীরের দিকে তার চেয়ে বেশি ভেঙেছে মনের দিকে। সেই মনটাকে তাতিয়ে দিতে হবে। মাধার সঙ্গে টেক্কা দেবার আগেই যাতে মাধা ধরাশায়ী হয় সেটাই গিরিশ যাতে করে তার চেষ্টা করতে হবে। বিনিময়ে গিরিশের পুরস্কার যা হবে তা নকুল ভট্চাযের তিন পুরুষেও ভাবতে পারবে না।

ভাসানের চোখ দুটো এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বললে—তাই বলো। এবার বুঝেছি।

—আমি নিজেই যাবো গিরিশের কাছে। ফিরে না আসা অব্দি কথা ছড়িও না। ফিরে এলে ঢোল পেটাবে। দেখি নকুল ভট্চাযের ভাণ্ডারে আর কত আহাম্মকি জমা হয়ে আছে।

এককালে গিরিশ ছিল এদিককার ঢাকের যাদুকর। তার কাঠিতে নাকি কথা বলত। আর ঘুঙুর পরে নাচতে নাচতে সে যখন বোল তুলত তা দেখতে নাকি গ্রামগঞ্জ ভেঙে মানুষ হাজির হত।

গিরিশকে পাওয়াও সবার ভাগ্যে হত না। সে ছিল বাঁড়ুজ্যেদের বাঁধা ঢাকী। বাঁড়ুজ্যেদের সে 'নেমক' খেয়েছে, কেউ তাকে ভাগিয়ে নিতে পারে নি।

সেই গিরিশের হাত থেমে গেল ওর ছেলেটাকে সাপে কাটার পর থেকে। একমাত্র ছেলে। আর তাকেই সমস্ত শিক্ষা উজাড় করে দিতে চেয়েছিল সে। ছেলেটার মৃত্যুতে গিরিশ একদম ভেঙে পড়ল। সে আর কাঠি ছুঁতে চাইল না। অনেক চেষ্টা করেও তাকে ফেরানো গেল না। পাশের গাঁয়ের যাদব নট্ট ওর বন্ধু। অনেক সাধ্যসাধনার পর সে তার ছেলেকে ওর কাছে সঁপে দিয়ে বলেছিল—এও তোমার ছেলে। এত বড় গুণটাকে জলে ভাসিয়ে দেবে কেন? ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও, মানুষের মনে বেঁচে থাকবে।

যাদবের কথার চেয়ে মাধবের ব্যবহারই গিরিশকে বশে এনে ফেলেছিল। তারপর একটি একটি করে মাধব শিখে নিয়েছিল ঢাকের কাঠির যাদুবিদ্যা। গিরিশ বুঝেছিল মাধবের ক্ষমতা। যেন চুম্বকের মত তুলে নিত বোলগুলো। ঢাকের কাঠিতে বোল তুলে সে যখন নাচ ধরত গিরিশ চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দেখত যেন তার ছেলেকেই। পিঠ চাপড়াতে গিয়ে বুক জড়িয়ে ধরে বলত—রাসু তুই আমার মুখ রাখবি। মাধব শুধরে দিত—রাসু নয় মাধা। হ্যাঁ আমি তোমার মুখ রাখব জ্যাঠা।

গিরিশ দেখত মাধাটা অস্থির হয়ে উঠেছে বেরিয়ে পড়ার জন্য। মাধার এ দোষটাকে গিরিশ শোধরাতে পারে না। অধৈর্য মাধা একদিন সত্যি সত্যি মায়া কাটিয়ে সরে গেল। যাবার সময় বললে—আর কেন জ্যাঠা, এবার পরীক্ষা চালাতে দাও। গিরিশ শূন্য দাওয়ায় বসে পড়ে শুধু বলেছিল—মাধাটা বড় বোকা।

এরপর গিরিশ আর কিছু বলে নি। শুধু শুনতে পেত বোলের যাদুতে গ্রামগঞ্জ ভাসিয়ে চলেছে মাধা। ভুলে গেল সে গিরিশের কথা। গিরিশ পড়ল বিছানায়। শুয়ে শুয়ে সে শুনত মাধা নট্টর খ্যাতি—বলত—মাধা কি এল না? উত্তরে বাতাস হু হু করে ভেঙে পড়ত ওর ভাঙা ঘরের ভিত কাঁপিয়ে। মলিন জীর্ণ কাঁথায় শুয়ে শুয়ে গিরিশ শুধু ডাকত—রাসু ঢাকের বোলটা একবার দেতো। হ্যাঁ বাপ ঘুঙুর তালে বোলটা দে। মেজকত্তার ভারি মন টানে ও বোলটায়। আহা দে-দে—

তখন হয়ত বাইরে শোঁ শোঁ ঝড় বইছে। খড়ের চালা খসে খসে উড়ে যাচ্ছে। হোগলার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ছে মাতাল হাওয়া।

—এটা কি মাস রাসুর মা?

—বোশেখ।

—মেজকত্তার ডাক আসবে। বোলটা তুলে রাখতে হয়।

—আর আসবে না। গত সনেই তো জেনে গেল তুমি সব ছেড়ে দিয়েছ। আঙুল তোমার অবশ।

—ও হ্যাঁ তাইতো।

এর মধ্যে মাধব একদিন মাত্র এসেছিল গুরুকে প্রণাম করতে। কিছু টাকাও দিয়েছিল। আর যতক্ষণ পেরেছে নিজের প্রশংসার কথাই শুধু গেয়ে গেছে। গিরিশ ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে—বোল্‌টা একবার শোনা দেখি বাপ।

—এখন সময় নেই জ্যাঠা। আর একদিন এসে শোনাবো।

—তুই ভারি ব্যস্ত নারে?

—আর বোল না জ্যাঠা। বোল শুনতে জমিদাররা পাগল। কাউকে তো অখুশি করতে পারি না।

—বোল্‌গুলো শোনা না।

—আজ নয় জ্যাঠা। উঠি।

সেই মাধা গেল আর আসে নি। গিরিশ শুধু বলেছে. মাধাটা বড় অস্থির—বড় বোকা। আমার দুটো বুদ্ধি-পরামর্শও ধৈর্য ধরে শুনতে চায় না।

গিরিশ বসে বসে ভাবে তার রাসু বেঁচে থাকলে কী এমন করত? বাপের পায়ে প্রণাম করে সেও কি এমনি সহজে সব শিখে নেওয়ার গর্ব নিয়ে চলে যেতে পারত? কাঠির মন্ত্র কি এত সহজেই নিঃশেষ করা যায়!......

উঠোনে দাঁড়িয়ে পরাণ মাঝি ডাকে—গিরিশদা। গিরিশের ভাবনায় ছেদ পড়ে। সে মুখ তুলে তাজ্জব হয়ে দেখে বাড়ুজ্যেদের মাঝি পরাণ।

হুঁকো সরিয়ে সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়—পরাণ যে, কী খবর?

—মেজকত্তা নৌকোয় বসে আছেন।

সে কি! চঞ্চল হয়ে ওঠে গিরিশ—মেজকত্তা নৌকোয়? নিজে এসেছেন তিনি? দেখো তো কান্ড!

পরাণ বললে—তোমার সঙ্গে খুব জরুরী কথা। তুমি যেতে পারবে?

—সে কি কথা, পারব না? মেজকত্তা নিজে যখন অত কষ্ট করে এসেছেন আর আমি যেতে পারব না? চলো চলো।

গিরিশ নৌকোয় এসে রাখালকে একটা দীর্ঘ প্রণাম করে হাত জোড় করে বললে—খবর দিলে তো আমি নিজেই যেতে পারতাম মেজকত্তা।

—গরজ বড় বালাই হে। রাখাল গড়গড়ার নল মুখ থেকে সরিয়ে বললেন—বড় বিপদে পড়েই এসেছি। এত বড় বিপদ যে একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

গিরিশ জোড় হাত দুটি বুকের কাছে রেখেই বলে—উদ্ধার কেন বলছেন মেজকত্তা, বলুন আদেশ। আমার ক্ষমতা দিয়ে নিশ্চয় তা পালন করব।

—কিন্তু তোমার শরীরে কুলোতে পারবে? ভরসা পাচ্ছি না যে।

দেহটা একটু ভেঙ্গে গেছে ঠিকই। কিন্তু আপনার হুকুমের কাজ করতে গিরিশ আজও চেষ্টা করবে মেজকত্তা।

রাখাল খুশি হয়ে বললেন—সেই ভরসায়ই তো এসেছি। যে যাই বলুক আমি তো জানি আমার বিপদের কথা শুনলে তুমি আর হাত গুটিয়ে থাকতে পারবে না। তাই আমি নিজেই এলাম। নিজের চোখে তোমাকে দেখাও হবে কথাটাও বলা যাবে।

—সে আমি শুনবো মেজকত্তা। তার আগে অনুমতি দিন একটু জল খাবারের চেষ্টা করি।

রাখাল বললেন—না হে সে আমি সেরেই এসেছি। ও কাজটা বাইরে আমি করি না।

বলেই রাখাল একটু হাসলেন।

—শোনো—

সব শুনে গিরিশ চুপ করে রইল। রাখাল বললেন—এতকাল মান বাঁচিয়ে এলাম আর এবারই কি ওদের কাছে মাথা হেঁট করে দিতে হবে গিরিশ? তাই তো আর কোন দিকে পথ না পেয়ে—

গিরিশ বললে—না মেজকত্তা, মাথা হেঁট আপনাকে করতে দেব না। এতকাল নুন খেয়েছি কিসের জন্য? মাধা আমার শিষ্য হতে পারে, কিন্তু এখন তো আর গুরু-শিষ্যের ব্যাপার নয়, মান-সম্মানের লড়াই।

—তোমার শরীর যে বড় খারাপ। তাছাড়া মাধব এখন বাজারের সেরা ঢাকী।

—হ্যাঁ ছেলেটা ভারি গুণী হয়েছে। গিরিশ মাথা দুলিয়ে বললে।

—আমি বলি কি, যদি মাধাকে তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে পার। হাজার হোক সে তোমার শিষ্য। যদি যেন তেন প্রকারে ওকে কাৎ করে দিতে পার তো সোনার মেডেলই শুধু নয় টাকার মালা পরিয়ে সমস্ত গ্রাম ঘোরাব। পাঁচ বিঘা জমি পাবে। কাঠ আর টিনের ঘর তুলে দেব।

গিরিশ একটু হাসল। রাখাল ফের বললেন—আমি তাহলে নিশ্চিন্তে ফিরে যাচ্ছি গিরিশ

গিরিশ আবার হাসল।

ফলে পুব আর পশ্চিম মৌখালির লোক দারুণ উত্তেজনায় অস্থির হয়ে রইল নবমীর রাত্রির জন্য। দুই সেরা প্রতিদ্বন্দ্বী—দুই গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা এতো কম কথা নয়।

পশ্চিমের গোঁফে বিদ্রূপ। মুচকি মুচকি হাসি। তারা নিশ্চিন্ত বুড়ো হাবড়া গিরিশ নট্ট শিষ্যের হাতের কানমলা খেয়েই শেষ বিদায় নেবে। বুড়োর ভীমরতি ধরেছে উচিত জবাবই পাবে। পুবের আকাশে খানিক হতাশা। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ গিরিশকে হয়ত শেষ পর্যন্ত ঘাড় হেঁট করেই ফিরে যেতে হবে। পুবের মান-সম্মানও সেই সাথে একেবারে ধুলায় মিশে যাবে।

পশ্চিমের লোকেরা ছড়া বানিয়ে গান গায়:

নকুড়্...নকুড়্...নকুড়্
বাদ্যি বাজায় কে?
পুব জঙ্গলার ধেড়ে নট্ট
কানে আঙ্গুল দে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে এর ওর গায়ে। বলে—হায়-হায়-হায় শেষমেস মড়াধড়া নিয়ে নেমেছে বাড়ুজ্যেরা। শিষ্যের হাতে শেষে কানমলা! হায়—হায়—হায়।

কথাটা শুনে বাজার মুখে নালিশ জানায় পুবের লোকেরা। সন্দেহ তাদেরও চোখে মুখে।

বলে—ভুল হল মেজকত্তা। গিরিশ কি পারে মাধার সঙ্গে?

রাখাল বাঁড়ুজ্যে কান পেতে শোনেন মত প্রকাশ করেন না। শুধু বলেন—টাকার একশোটা মালা হবে, সোনার মেডেল চারটা, পাঁচ বিঘা জমি, টিন আর কাঠের মজবুত ঘর। তোমরা গোঁফে তা দিয়ে ঘরে যাও।

তারপর সেই নির্দিষ্ট দিনের সন্ধ্যেবেলায় অসুস্থ গিরিশ মোলায়েম হেসে কাঁধে ঢাক নিয়ে জায়গায় এসে দাঁড়াল। দুদিকের মধ্যবর্তী বারোয়ারী রাসতলায় চারদিকের গ্রাম ভেঙ্গে লোক হুমড়ি খেয়েছে। আসরের দু' প্রান্তে বসেছেন দুই কর্তা আর তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গোরা। সবার মুখ গম্ভীর। দর্শকও দুটি ভাগে ভাগ হয়ে বসেছে। স্ত্রী-লোকেরা বসেছেন তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বেছে। দারুণ উত্তেজনা। রুগ্ন গিরিশ তার কাঁচা-পাকা বাবরি কাটা চুলে লম্বা ফেটি বেঁধেছে। পরেছে বাবুদের দেওয়া কোরা নতুন ধুতি আর হাফ শার্ট। গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে লাল ফালি কাপড়ের সঙ্গে বড় বড় গোল রুপার মেডেল। কোঁচা ঘুরিয়ে কোমরে গিঁট দিয়েছে। তার কাঁশর ধরেছে বাড়ুজ্যেদের হালের ঢাকী গোবর্ধন কায়েত।

অন্য প্রান্তে মাধব নট্ট। তারও তেল চকচকে কালো মিশমিশে বাবরিকাটা চুল। বলিষ্ঠ দেহ। কুচকুচে কালো গায়ের রং। সাদা জালিকাটা গেঞ্জির ভেতর দিয়ে পুষ্ট বুক ঠেলে উঠেছে। সে শুধু নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল গিরিশের দিকে।

গিরিশ হঠাৎ হাত দুটি জোড় করে সবার উদ্দেশ্যে বললে,—বাবুরা আমি একটা বুড়ো বাঘ। দাঁত নেই, নখ নেই, হাড়ের জোর নেই! তবু ছোকরা বাঘের সাথে লড়াইয়ে নেমেছি। কেউ যদি ভাবেন গুরু-শিষ্যের খেলা, আমি বলব ভুল। আমার শিষ্য কেউ কোনকালে নেই। কেউ শেখালেই কিছু গুরু হয় না। গুরু হওয়ার মস্ত গুণ চাই। সে গুণ আমার নেই।

মাধব হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতেই গিরিশ চোখ ফিরিয়ে নেয়।

—আসলে আমরা দুদিকের দুই শেয়াল আর বাঘ। যদি হেরে যাই তাতে শেয়ালের কোন দুঃখ নেই। কারণ বনের রাজা তো এখন বাঘ। আচ্ছা নমস্কার।

একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সবাই কেমন বাকমুগ্ধ হয়ে পড়েছে। এমন আশ্চর্য কথা শুনতে শুনতে কেউ যেন ভাবতে পারে না আসল জিনিসটা কি।

প্রথম বোলের শব্দেই সবার চমক ভেঙ্গে। শুরু করেছে মাধব নট্ট। ঘুঙুর পরেছে। ঢাক উঠেছে পিঠে। নকসাকাটা কাঁথায় মোড়া বাহারি ঢাক। ষোল মাত্রার বোলে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ ওঠে। ঠেকা দেয় অদ্বিতীয় সাকরেদ গোপাল দাস। তালে তালে সেও নেচে ওঠে। মন নাচে পশ্চিমের মানুষেরও। আহা এমন বোল্ আর হয় না। যেন কথা ফোটে গো। বৃদ্ধেরা মাথা দোলায়—মধু—মধু।

ঘাড় নাচে গিরিশেরও। ভাঙ্গা মুখে মুগ্ধ হাসির আলো মাখিয়ে সে দোল খায়। হঠাৎ তার তন্ময়তা ভাঙ্গে। কে যেন বলে—এবার গিরিশ নট্ট—ওঠো।

গিরিশ চোখ মেলে দেখে মাধা বসে পড়েছে। বড় চোখ দুটো তার থমকে আছে গুরুর দিকে।

গিরিশ উঠে দাঁড়াল। তার ঢাকটা বহুকালের। কোন নকসা কাপড় নেই। বোধহয় বাবুদের দেওয়া নতুন লাল একখানা সালু দিয়ে মোড়া। একটা ফুলের মালা জড়ানো তার গায়ে। গোবর্ধন কায়েত তার পাশে এসে দাঁড়ায়! মধু বোলের জবাব মধু বোলে দিতে হবে। গিরিশের ঘুঙুর পা শব্দ তোলে ঝম্-ঝম্-ঝম্। ঢাকের কাঠি কথা কয়—দ্রিম্—দ্রিম্—দ্রিম্।

গিরিশ দোল খায় বোলের চাটে চাটে। জমে ওঠে আসর! রাখাল বাঁড়ুজ্যে গোঁফের প্রান্তে মোচড় কেটে তাকায় ভাসানের দিকে—কিহে কেমন বোঝ?

ভাসান হাসে—বহুৎ খুব।

—হুঁ হুঁ ওর নাম গিরিশ। মরা হাতীর দামও লাখ টাকা হে।

পুবের লোকেরা সমস্বরে বাহবা দিয়ে ওঠে। আকাশ ভারি হয়ে ওঠে হাত তালিতে। গিরিশ বসল।

আলাপ শেষ হল। এবার শুরু হবে আসল খেল, চাপান কাটান। দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ঢাক ঘাড়ে নিয়ে মুখো-মুখি দাঁড়াল। জোড় কাঠিতে শুরু হবে এবার বোলের কসরৎ। কাঠি শুধু কথা বলবে অফুরন্ত গতিতে। যে গতির হিসেব মেলে না।

ঝুঁকে পড়ল দুই দিকে। এখনই দিতে হবে উৎসাহের বাঁধ খুলে। তরতর্ করে ছুটে চলবে বাহবার চিৎকার। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলতে হবে।

নকুল ভট্চায্ ঠোঁট বেঁকিয়ে আড় চোখে তাকালেন রাখাল বাঁড়ুজ্যের দিকে। রাখাল গোঁফ মুচড়ে দিলেন।

গিরিশ বললে—মাধব নট্ট শুরু হোক।

মাধব বললে—শুরু হোক। আমি তো আছি।

শুরু হল মাধবের ঢাকের গর্জন কড়াৎ-কড়াৎ। গোবর্ধন আর গোপাল বসে পড়েছে। এখন আর কাসির দরকার নেই। শুধু দুই ঢাকের কারবার।

মাধব চাড় দিল ঢাকে। ঢাকের কারদা দেখাতে ঘূর্ণির মত ঘুরিয়ে দিচ্ছে কাঁধের পাশে। কাঁধ বদলে যাচ্ছে এক লহমায়। ঢাকের কাঠি শুধু শব্দ তোলে—কর্র্-করাৎ—কর্র্-ত্রির্র্—

ও পাশে উঠছে গিরিশের আঘাত। ঢাক তার শূন্যে ঘোরে। মাধার ভয়ংকর গতির মত অবশ্য নয়। কিন্তু গিরিশও ঘোরে। ঢাকের শব্দ কাঠির ঘায়ে চেঁচিয়ে উঠছে—কার্-র্-র্-রিঃ--তার্-র্—র্—রাঃ।

উত্তেজনায় ফেটে পড়ল আসর। হাত তালির শব্দ বুঝি শেষ হতে চায় না।

ভূমিকা শেষ হতেই মাধব ধরল বারমাত্রার চাপান। কাঠির যাদুতে যেন বলে উঠছে—বল্রে গুরু বল্—জবাব ইহার বল্।

কাটান জবাব দিতে গিরিশের ঢাক গেয়ে উঠল—জবাব সে তো পাবিই বটে—একটা কথাই বল্। গুরু বলে মানিস যদি—ছেড়ে দিবি ছল্। অল্প জলের পুঁটিরে তুই—

ভাবিস অধিক জল।

গিরিশ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। ছ'মাত্রার কাটান জবাব দেয় আবছা কাঠির ঘায়ে। অদ্ভুত ভঙ্গিতে কাটিয়ে দিতে তার সময় লাগে না। দু' পাশ থেকে শুধুই চিৎকার হর্ষধ্বনি-হাততালি—সাবাস সাবাস। মাধার ঢাক শূন্যে ঘোরে। লাট্টুর মত সে ঘুরতে থাকে ভয়ঙ্কর গতিতে! আবছা কাঠির ঘায়ে চেঁচিয়ে সে কাটান জবাব দেয়, চাপান ছোঁড়ে। মাধা এবার চার মাত্রার চাপান ছুঁড়ে দিল গিরিশের দিকে। গিরিশ তার জবাব দিতে থাকল। চার মাত্রার জবাব দেওয়া গিরিশের কাছে কিছু নয়। কিন্তু শরীরে আর টানে না। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। মনে হয় পৃথিবীটা যেন ঘুরছে। তিন চারবার সে ঢাক ঘুরিয়েছে। তাজ্জব হয়ে গেছে আসরের লোক। কিন্তু গিরিশ জানে শরীর তাকে কি কঠিন জবাব দিচ্ছে তার ফলে। মাধা তার বিপরীতে টাট্‌কা সতেজ গ্রীষ্মের সূর্যের মত দাপিয়ে উঠছে বোলের তালে। কাঠি তার আবছা হয়ে যায়। গিরিশের ভাঙ্গা ঘাম-মেশানো মুখে অদ্ভুত কষ্ট আর হাসির মিশ্রণ। সে ভাবে মাধা বড় বুদ্ধিমান। পরিশ্রান্ত দুর্বল গিরিশকে কোন্ মাত্রায় ফেলে কাবু করা যাবে ছেলেটা টের পেয়ে গেছে। তাই চার মাত্রা ছেড়েছে। যেন তারই অস্ত্র দিয়ে তাকে ঘায়েল করতে চাইছে। কিন্তু যতক্ষণ সে পারবে জবাব দেবে। এই দ্রুত বোল্ সে কতকক্ষণ চালাতে পারবে জানে না। মাধার কাঠি বন্‌বন্ করে বোলের দ্রুত তালে। তেমনি জবাব না হলে কাটান হয় না। মাধা সুযোগ দেয়।

দু' পক্ষই উত্তেজনায় আকাশ ফাটিয়ে দেয়।—সাবাস মাধা নট্ট—সাবাস গিরিশ—জবাব বটে—বাহবা-বাহবা।

কিন্তু একি! গিরিশ ক্রমশঃ ঝিমিয়ে পড়ছে কেন? সে যেন দম নিতেই ব্যস্ত। মাধার চার মাত্রার কাটান দিতে তার চোখ বড় হয়ে ওঠে। ঠেলে বেরিয়ে আসে বুঝি। অত বড় ঢাকের ভারে এতক্ষণে তাকে বেশ ঝুঁকে পড়েছে বলে মনে হয়। মাধার সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দেহটাকে সে আগেই বেশি কাহিল করে ফেলেছে। নিজের ওজন সে ভুলে গিয়েছিল। দম টানতে কষ্ট হয়। বুকটা চুর্‌চুর্ করে। যেন হাঁপরের আগুনের মত খাক্ পুড়ে যাচ্ছে।

রাখাল বাঁড়ুজ্যে নড়ে চড়ে বসেন। মুখে থম্‌থমে বিরক্তি—কী হচ্ছে গিরিশ?

ভাসান দাঁত চেপে বলে—সোজা হয়ে—সোজা হয়ে। তলিয়ে যাচ্ছো যে।

কথা শেষ হয় না। ও পক্ষের উৎসাহের ধ্বনির মধ্যে সহসা গিরিশ সোজা হয়ে ওঠে। এবার যেন কী দেখে সে মাধার দিকে। কাটান দিয়েই সে ধরল ন'মাত্রার চাপান। অদ্ভুত দ্রুত, যেন কাঠি তার হাতে নেই। পাগলের মত মাথাটা তার দুলতে লাগল। বাবরি চুল লেপটে পড়ে মুখের ওপরে। বন্ বন্ ঘুরতে থাকে গিরিশ। অদৃশ্য কাঠি বিন্ মাত্রার কঠিনতম বোল্ তুলে চলেছে। উত্তেজনা তুঙ্গে। নিঃশ্বাস ফেলে না মেয়েরা। রাখাল বাঁড়ুজ্যে সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে থম্‌কে থাকেন।—বাহবা—বাহবা—বাহবা।—

মাধার কাঠি থেমে রইল। সে ঠিক হাতড়ে উঠতে পারে না। ন' মাত্রার কাটান সে খুঁজে পায় না। এক দুই তিন—সময় কেটে যায়। গিরিশ ফের ন' মাত্রা দেয় ওকে ধরবার জন্য। চেঁচিয়ে ওঠে—ধর্—জবাব ধর্ মাধা।

নকুল ভট্‌চায চেঁচিয়ে ওঠেন—মাধা! সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড হৈ হৈ শুরু হয় দু'পক্ষে। মাধা ছুটে এসে হাত চেপে ধরে গিরিশের—জ্যাঠা!

—পারলি না—ন' মাত্রায় ধরতে পারলি না?

—না। তুমি আমায় শেখাও নি।

—শিখলি না তো। বড় অস্থির—বড় বোকা তুই। বড় অহঙ্কার করে ভেবেছিলি খুব বড় ওস্তাদ হয়ে গেছিস—হাঃ।

মাধব চেপে ধরল গিরিশকে। গিরিশ পড়ে যাচ্ছিল। মাধব হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—জ্যাঠা! তোমার মুখ দিয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে।—ও কিছু না—ও কিছু না।

গিরিশ দাঁড়াতে পারল না। দু'পক্ষের লোক আসরে নেমে হৈ হৈ শুরু করে দেয়। তর্কাতর্কি ঝগড়া হাতাহাতিও শুরু হয়ে যায়। ভিড় ঠেলে মাধা গিরিশকে একটা গাছের নিচে এনে শুইয়ে দেয়। বলে—দুটো কথা বলতে গেলাম দিলে তাড়িয়ে। নেমকহারাম বললে গন্ডাখানেক। যদি শুনতে তো এমনটা হোত না। টাকার জন্য এখন প্রাণ যায়।

গিরিশ ওর মুখটা চেপে ধরে বললে—না না টাকা নয়রে টাকা নয়। আমি যে শিল্পী। শিল্পীর ধর্ম বাঁচাতে এসেছিলাম।

দম আটকে আসে যেন গিরিশের। বলে—বুকটা একটু ডলে দে তো বাপ। দমটা কেমন হয়ে আসছে।

চারদিকে প্রচন্ড হৈ চৈ—উল্লাস। ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। মাধব আর গিরিশকে ঘিরে কয়েকজন কৌতূহলী লোক এসে দাঁড়িয়েছে। মাধব সবার দিকে চেয়ে বললে—মেজকত্তা কোথায়? মেজকত্তা?

একটু পরে ভিড় ঠেলে সপারিষদ মেজকত্তা এসে হাজির হলেন। হাতে প্রকান্ড একটা টাকার মালা।

বললেন—এখানে? আর আমি খুঁজে মরছি। ওঠো গিরিশ টাকার মালাটা গলায় পরাব।

মাধব বললে—পরান।

—না না এখানে নয় সবার মধ্যে। ওঠো ওঠো।

মাধব বললে—তা হলে পারবেন না।

ভাসান বললে—উঠতে পাচ্ছে না বুঝি? তা হবে। কম ধকল তো নয়। অত বড় একটা ঢাক নিয়ে—

—ঠিক আছে একটু উঠেই বস পরিয়ে দিই। কাল সকালে তো সমস্ত গাঁয়ে ঘোরানোই হবে।

মাধব এবার উঠে দাঁড়াল। বললে—অপরাধ নেবেন না মেজকত্তা। ওকে বরং কোথায় পোড়াবেন তাই ঠিক করুন। ও আগেই মারা গেছে।

তখনো পুব মৌখালির লোকেরা ধ্বনি দিচ্ছে—বল বল ভাই জিতলো কে—পুব খন্ড আবার কে? পুব খন্ডের প্রাণ কে? মেজকত্তা আবার কে? ইত্যাদি।

সময় যেন ঃ বিশ্বপ্রিয়

সময় যেন উড়ো পাখি, হয় না ধরা তাকে
কাছে এসেই যায় পালিয়ে—কি জানি কোন ফাঁকে!
দিনের পরে রাত চলে যায়
মাসও কাটে, বছর ফুরায়
দুঃখ-সুখের আবেশ ভরা অযুত স্মৃতির পাকে ঃ
জীবন-খাতার পাতাগুলো ভরিয়ে শুধু রাখে।
এখন ভাবি পিছু ফিরে বিষাদ-ঘন মনে,
কি চেয়ে কি হয়নি পাওয়া আপন প্রয়োজনে।
অবুঝ প্রাণের সাধে তখন
খেলার ঝোঁকে ছিলেম মগন,
সময় ধরার সময়টুকু নিইনি কোন ক্ষণে ঃ
তাই ঠেকে আজ সকল কাজে, কাঁদি সংগোপনে।
সময় যেন ভরা নদী, বইছে খরধারে
সে হয় সফল, তার তালে যে শামিল হতে পারে।
নয়তো বা তার ভালবাসার
সরল জীবন আলো জ্বালার
আশায় থেকে হয় ব্যাহত, তাই সে বারেবারে
হালে পানি না পেয়ে হায় সবার কাছেই হারে।
তাইতো বলি, তোমরা যারা খেয়াল-খুশির ঘোরে
তুড়ি ঠুকে সময় কাটাও সময় বৃথা করে,
মনের জোরে পার পেলে আজ
শেষ সময়ে ঠিক পাবে লাজ
বুঝবে যবে, হিসেব মত সময়টাকে ধরে
কেউ রাখনি, হতাশে মন যাবেই সেদিন ভরে॥

খুকুর প্রশ্ন ঃ প্রভাকর মাঝি

আচ্ছা দাদু, তোমায় একটা
প্রশ্ন করতে চাই,
কদিন থেকেই একা একা
ভাবছি আমি তাই।
সকল সময় ব্যস্ত দেখি
হরেক রকম কাজে
পড়তে দেখি কি এক মোটা
কেতাব মাঝে মাঝে।
কখনও বা হিজিবিজি
খাতায় লিখে যাও
চারটে হলেই নিয়ম করে
বাগানট কোপাও।
ভোরে-ভোরে আড়াই মাইল
বেড়িয়ে আসা চাই,
সাড়ে সাতটা হলে পরেই
বাজারে যাও ভাই।
রোজ দুপুরে সবাই জানে
তক্তাপোষে কাত
দেখি না তো পড়তে তোমায়
আমার ধারাপাত।
একটা জিনিস আমার কাছে
অবাক মনে হয়,
কেমনে করে জানলে, দাদু
তিন তিরিক্ষে নয়?

বুঝবে সে-ই ঃ অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কেমন করে রাত আসে আর
কেমন করে চাঁদ হাসে,
ডুব দিয়ে তল পায় কি সবাই
শীতের রাতে মাঘ মাসে?

কেমন করে রোদ ওঠে আর
কেমন করে ফুল ফোটে,
চক্ষু থেকেও অন্ধ যারা
দেখতে তারা পায় মোটে?

কেমন করে মেঘ করে আর
কেমন করে জল ঝরে,
এসব দেখার চোখ আছে যার
বুঝবে সে-ই চট করে।

কাজ চাই

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

তর্কের ঝড় তোলা
নয় কিছু শক্ত
দেশটায় কয়জন
কর্মের ভক্ত ?
আঁধারেই ভয় পেলে !
পারো আলো ধরতে ?
পারো কেউ বিপদেতে
ঝাঁপ দিয়ে পড়তে ?
সহজেই চায় সব
বাজিটুকু মারতে,
হাসিমুখে কাজ করে
কেবা চায় হারতে ?
নিঃসীম উল্লাসে
নামে যদি রাত্রি,
সাহসেতে বুক বেঁধে
কেবা হবে যাত্রী ?
কারিগর চাই ঠিক
গড়ে নিতে দেশটা,
মনোমত হবে তবে
সব পরিবেশটা।
কর্মের এ মঞ্চেতে
আজ শুধু কাজ চাই,
কিশোর আর কিশোরীরা
নাও সেই বার্তাই।

'সেই কন্যার খোঁজে

নিশিকান্ত মজুমদার

ছাড়িয়ে নগর পেরিয়ে পথ গ্রামের পাশে এসেই
সেই কন্যার খোঁজ পেলাম কার্তিকের শেষেই।
ফুরিয়ে দিয়ে ফাগুন দিন ফুলের রঙ-বাহার
কদমরেণু ঝরা বাদর, শাঙন-ভাদর মাহার।
নরম শীতের আমেজমাখা মিষ্টি-মধুর দিন
সেই কন্যার রতন নূপুর বাজায় রিনিঝিন।
অবাক আকাশ দেখছে তারে বেণীর ফাঁস খুলে
সুগন্ধের ছন্দে বাতাস বইছে দুলে দুলে।
সবুজ শাড়ীর শ্যামলিমা দিগন্তিকায় ঢালা
ধানের শীষে গানের কলির কথার মণিমালা।
সন্ধ্যা-সকাল আলপনা তার চলার পথে আঁকা
রুপোলীচাঁদ স্বপ্ন দিয়ে আঙিনা দেয় ঢাকা।
কাজলা দিঘির কালো জলের অথৈ ঢেউয়ের মাঝে
সেই কন্যার কণক কাঁকন গভীর-রাতে বাজে।
পদ্মফোটা সুবাসে তার বাতাস ভুরুভুর
খেজুরপাতার ঝালর ছড়ায় মধুরতর সুর।
সেই কন্যা রাজকন্যা কঙ্কাবতী কনে
রূপকথার শয্যাখানি সাজায় সযতনে।
ঘোমটাঢাকা চাঁদমুখে তার সোহাগ ঝরোঝরো
চম্পাকলি আঙুলে তার কাঁপন থরোথরো।
আলতারাঙা চরণখানি দূর্বা-কোমল ঘাসে
চলতে গিয়ে আঁচল লেগে জড়ায় লাজে-ত্রাসে।
কৃষ্ণকলি চোখের মায়ায় স্বর্গ-চেয়ে সুখ
সেই কন্যার পৌঁছে কাছে ভরলো ফাঁকা বুক !

একঝাঁক টিয়াপাখি

সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

একঝাঁক টিয়াপাখি ধানক্ষেত থেকে
উড়ে গেল ঢেউ দিয়ে সবুজ পাখায়—
জানি না তো দল বেঁধে থাকে ওরা কোথা,
ভাঙা কোন্ দালানেতে, গাছের শাখায় !
শরতের সোনা রোদে খুশি-ভরা দিন,
আউসের মাঠে মাঠে পাকা পাকা ধান—
বাতাসে সুবাস বুঝি পেয়েছিল ওরা
আহ্লাদে হয়েছিল প্রাণ আনচান।

ভর-পেট ভোজ খেয়ে কী যে উল্লাস,
আনন্দে মাতামাতি, কত সোরগোল !
তীক্ষ্ণ বাঁশির সুরে ধ্বনি-ঝংকার—
চঞ্চল পাখনায় প্রাণ উতরোল !
একঝাঁক টিয়াপাখি উড়ে চলে গেল—
দিয়ে গেল মোর মনে সবুজের ঢেউ,
বুক-ভরা খুশি কেন জাগলো হঠাৎ
আমি শুধু জানি, আর জানলো না কেউ।

শক্তিপদ রাজগুরুর
সম্পূর্ণ
উপন্যাস
ঝিকিমিকি জল,
নদী টলমল...

পটলা বলে—তালে বল, মেজো মামাকে লিখে দিই, এবার সুন্দরবনেই বেড়াতে যাবো।

গুপী ওদের রকে বেশ জমিয়ে বসেছে, সামনে ফুচকা-ওয়ালা আলু-মটরের কাঁই একটু করে এক একটা ফুচকার মধ্যে দিয়ে, সাতদিনের বাসি দুর্গন্ধ ওঠা তেঁতুল-জলে দিয়ে এক একটা করে ওদের হাতে দিচ্ছে। গুপী যেন জলভরা ফুচকা সামলাতে ব্যস্ত। বিরাট হাঁ-মুখে একত্রে দুটো ফুচকা পুরে কোঁৎ করে গিলে বলে—তোদের আর বে-বেড়াবার জায়গা নেই র‍্যা? ওই ব-বনবাদাড়েই যাবি?

পি. রায় ওদের দলে নতুন এসে জুটেছে। শীর্ণ লিকলিকে চেহারা, বাবার ওষুধের দোকান, পি. রায় এর মধ্যে বেশ নাম কিনেছে পাড়ায়। ফুটবলের ফরোয়ার্ড—আর ওই তিন-খানা হাড় নিয়ে সেবার খেলার মাঠে নাইন বুলেটস ক্লাবকে গোলমাল বাধাতে দেখে জোর ঠ্যাঙ্গান ও ঠেঙিয়েছিল। অবশ্য চতুর সে, ওরা তৈরী হবার আগেই প্রথম ঘা দিয়ে সরে পড়েছিল। পরে হ্যাঁপা সামলায় গুপী, পটলা, গদাধর-এর দল। পি. রায়কে ত্রিসীমানায় দেখা যায়নি।

দেখা গিয়েছিল পরেরদিন। তখন পি. রায় বীরদর্পে দেশজ ভাষায় বলে,—হালায় মারুম না ক্যান? আমি বরি-শালের পোলা, আইতে শাল যাইতে শাল তবে জানবা বরিশাল, হঃ, জান খাইয়া ফালামু না?

পি. রায় আজ ওদের সুন্দরবনের যাবার কথা শুনে বলে ওঠে—ভেরি নাইস সিলেকশন করছস পটল। সুন্দরবন তো আমাগো দ্যাশেও আছিল। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ কত কি দেখছি, সুট করছি গুপী।

গুপী গম্ভীর হয়ে বলে—র্-র‍্যালা দিসনি বাঙ্গাল। কলকাতায় জম্মো আর বলে কিনা রয়েল বেঙ্গল টাইগার মা-মারছি।

পি. রায় জানায়—তগো মত কাওয়ার্ড না, সুন্দর-বনের নাম শুইনাই কাঠ মাইরা গেছস।

গদাধর দলের ঠান্ডা মাথার ছেলে। ক্লাবের সে-ই সেক্রে-টারী। গদাধর বলে—গোলমাল করলে ফুচকাওয়ালা হিসেবে বাড়িয়ে দেবে।

গুপীর দেহটাও বিশাল, আর কথা বলার সময় মাঝে মাঝে জিভটা আলটাকরায় আটকে যায়। কোন রকমে সেটাকে বাঁধনমুক্ত করে নিয়ে আবার বাক্যপ্রয়োগ করতে হয় কসরৎ করে। বন্ধুরা বলে তোৎলা।

গুপীও কথা বলতে চায় না বিশেষ। তাই জানায় সে—চু-চুপ করেই আছি। ব্-বাঙ্গালটাকে থামা। কই রে ফু-ফুচকা দে।

শালপাতা থেকে একজোড়া জলভরা ফুচকা মুখের মধ্যে দিয়ে গুপী তাড়িয়ে তাড়িয়ে চুষতে থাকে।

পি. রায় ধমক খেয়ে গজরাচ্ছে—কাওয়ার্ড—তগো মত পি. রায় কাওয়ার্ড না।

পটলা জানায়—তাহলে মামাকে লিখে দিই। ওখানেই যাবো।

গদাধর বিবেচনা করে চলে। দলের নেতৃত্ব তার উপর। তাই অযথা বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে না। শুধোয়—বনেই যেতে হবে নাকি?

পটলা জানায়—সোজা কি সুন্দরবনে ঢোকা যায়? একি তোর হাজারীবাগ ন্যাশন্যাল ফরেস্ট? যে জিপে করে ঢুকবি স্পটলাইট ফেলে গাড়িতে বসে রাতের বেলায় বনে বনে ঘুরবি হরিণ, সম্বর, চাই কি বাঘের সন্ধানে। সুন্দরবনের সঙ্গে কোন বনেরই মিল নেই।

এখানে ঢোকা দুঃসাধ্য, আর পথও কিছু নেই। চারি-দিকে ছোটবড় বিরাট নদী।

পি. রায় তখনও শোনায়—নদীর কথা শুনাইস না আমারে! পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, মধুমতী—

—থ্-থামবি? গুপী এবার কুলোর মত হাতের থাবা তুলেছে বিরক্ত হয়ে। কারণ পি. রায়ের হাত-পা নাড়ায় গুপীর একটা ফুচকা ছিটকে পড়েছে।

ফুচকার শোকে গুপীও মরীয়া হয়ে ওঠে।

পি. রায় ওর নাগালের বাইরে সরে এসেছে তার আগেই।

পটলা জানায়—প্রথমে যাবো, মোল্লাখালিতে, লঞ্চ যায়। গঞ্জ জায়গা। ইস্কুল, বি. ডি. ও. অফিস, লোকজন, বাজার আছে। সেখানেই মেজমামার সাপ্লাই ক্যাম্প, জায়গাটাও সুন্দর। সেখান থেকে তবে খাবার জল, চাল, ডাল সব-কিছু নিয়ে জঙ্গলে যেতে হবে, যেখানে বনকাটাই হচ্ছে, সেখানে।

গদাধর বলে—তাহলে মোল্লাখালি অবধিই চল আগে, সেখানে গিয়ে দেখে-শুনে তারপর ব্যবস্থা করা যাবে।

ওদিকে পীতুকে আসতে দেখে পটলা বলে—ওটাকে বলিস নি কিছু। ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকবে, আর হাড় কেপ্পন, স্রেফ ঘাড়ে চড়েই সুন্দরবন চলে যাবে।

পিতাম্বর হাওয়াতেই খবর পেয়েছে। হাতে ওর একটা ট্রান্জিস্টার। গান ছাড়া নাকি থাকতে পারে না সে, শিল্পী মানুষ! আর রেডিও না থাকলে নিজের হেঁড়ে গলাতেই দিনরাত হা-হা করবে। পিতু ওদের চুপ করে যেতে দেখে বলে ওঠে—খবর পেয়েছি। ফাইন হবে কিন্তু সুন্দরবন ভ্রমণ।

খরচা লাগবে কতো জানিস?—পটলা বলে।

পীতু ওটাকে সমস্যা বলেই ভাবে না। জানায়—চালাও পান্সী। লাগে কড়ি দেবে গৌরী সেন। আমি তব হবো সাথী—ব্যস।

গদাধর কিছু বলার আগেই গুপী ধমকে ওঠে।

ফ্-ফ্যালো কড়ি ম্-মাখো তেল। বাস ভাড়া, লঞ্চ ভাড়া এসব আছে।

পটলাও বলে—কিছু তো চাই।

পীতু জানায় নির্বিকারভাবে—হয়ে যাবে। তোদের বোঝা হবো না।

গদাধর রায় দেয়—না। টাকা জমা দিবি, যাবি। নালে—নয়।

পীতু ক্রুদ্ধমনে বলে—ঠিক আছে। তাহলে ক্লাবের ড্রামা ডিরেকশন দেবার জন্যও অন্য লোক দ্যাখ। তখন পীতেকে ডাকিস না। রেজিকনেশন দিয়ে গেলাম। ব্যস—নো কনেক-শন।

পীতুও ওদের নাকের উপর জবাব দিয়ে চলে গেল। গুপী বিপদে পড়েছে। কারণ তার তোতলামির জন্য আর বিরাট দেহের জন্য পার্ট এরা দিতে চায় না থিয়েটারে। ও ইতিপূর্বে ক'বারই ডুবিয়েছিল স্টেজে। একটা ডায়ালগ বলতে গিয়ে আটকে গিয়ে চোখ কপালে তুলে সেবার সেনা-পতি, রাজাকেই নাকি স্-সালা বলেছিল। তাই গুপীকে

পার্ট ওরা দেয় না। তবু পীতু ওকে প্রহরী-দূতের পার্টেও নামায়। সেই পীতুকে এভাবে বিদেয় করতে দেখে গুপী বলে—এটা কি ঠি-ঠিক হল র‍্যা?

পি. রায় গর্জে ওঠে—ঠিক হইছে। কারেক্ট। তাছাড়া ওই ভীতু কলকাতাইয়া মালখানা লইয়া সুন্দরবনে বিপদ হইতো গিয়া।

পটলের মেজমামার সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক দিনের কাঠের কারবার। কয়েক শো লোকজন, কাঠুরিয়া সুন্দরবনে গরাণ, গেওঁ, কেওড়া ইত্যাদি কাঠ কাটে। সেগুলো বোঝাই করা হয় নৌকায়।

ভারতবর্ষের বনভূমি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো। আসাম, হিমালয়ের তরাই, দক্ষিণ-বাংলার সমুদ্রতীরে সুন্দরবন, বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলে সারান্দা, পালামৌ, মধ্য-প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, মাদ্রাজে নীলগিরি, পেরিয়ার প্রভৃতি অঞ্চলের অরণ্যভূমি বিখ্যাত, হিমালয়ের পাদদেশের সর্বত্র অরণ্যের সমাবেশ। হিমালয় অঞ্চলের অরণ্যে দেওদার, পাইন, সরলবর্গীয় গাছের ভিড় বেশী, অন্যান্য বনভূমির প্রধান গাছ শাল, সেগুন, বালই। তাছাড়া পিয়াশাল, হরি-তকী, রোজউড, ধ-আসান, গামাড় ইত্যাদি গাছও মেলে। সর্বত্রই প্রায় এই ধরনের গাছের সমাবেশ। আর অরণ্যভূমি পার্বত্য অঞ্চলে বেশী।

কিন্তু সুন্দরবনের গাছের সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো বনভূমির ভূ-প্রকৃতির মিল নেই। বহু নদনদী দক্ষিণ বাংলার বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। ফলে সমুদ্রের এই মোহনায় অসংখ্য দ্বীপ-বদ্বীপ গড়ে উঠেছে। এই দ্বীপের মত ঠাঁইগুলোতে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের এলাকা। এখানকার সমস্ত অঞ্চলই সমুদ্রের জোয়ার-এর সময় নোনা জলে ডুবে যায়, আবার ভাটার সময় জেগে ওঠে কাদা বুকে নিয়ে।

তাই সমস্ত অরণ্যভূমি প্রতিদিন জোয়ারে ডুবে যায় আবার ভাটায় জেগে ওঠে। আর নোনা জলের মধ্যে শাল, সেগুন, বাঁশ কোনো ধরনের গাছই হয় না।

এখানকার মাটি হয় গেঁও, গরাণ, কেওড়া, গর্জন, ধুন্দুল, হিতাল ইত্যাদি। অবশ্য সুন্দরবনের নামকরণ হয়েছিল সুন্দরী গাছের বনের জন্য। আবার কেউ বলেন এ অরণ্য সুন্দর, তাই একে বলা হোত সুন্দরবন। অবশ্য সুন্দরী গাছ এখন সুন্দরবনে বিশেষ নেই, অন্ততঃ পশ্চিম-বাংলার বন এলাকায়। বর্তমানে বাংলাদেশের সীমানায় সুন্দরবন আরও গভীর, সেখানে বনসম্পদ অনেক বেশী।

গেঁও গাছের গুঁড়ির তক্তা চায়ের বাক্স, ব্রাশ হ্যান্ডেল, লাট্টু ইত্যাদি তৈরী হয়। গরাণ গাছের বাকল-এর কষ ব্যবহৃত হয় চামড়া ট্যানিং-এর ব্যাপারে, কাঠও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কেওড়া গাছের গুঁড়ি থেকে তক্তা ইত্যাদি হয়। আর যে পেন্সিল তোমরা ব্যবহার করো, তা হয় সুন্দরবনের ধুন্দুল কাঠ থেকে। তাছাড়া আছে গোল-পাতা, নারকেল পাতার মত পাতাগুলো ঘর ছাঁওয়ার কাজে লাগে আর এর দামও খুব বেশী। এছাড়া সুন্দরবনে বসন্তকালের পরই মৌমাছির দল নানা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে বিরাট বিরাট মৌচাক গড়ে তোলে। তার থেকে মধু সংগ্রহকারীর দল প্রচুর মধু, মোমও সংগ্রহ করে। আর এর অসংখ্য নদী-খালে হয় প্রচুর মাছ।

তাই সর্বদিক থেকে সুন্দরবন দক্ষিণ-বাংলার হাজার হাজার মানুষের কাছে অন্নদাত্রী। অর্থনৈতিক জীবনে এর অবদানও কম নয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অধিকাংশই ছিল এই সুন্দরবনের গহনে ঢাকা। ক্রমশঃ মানুষ এই অরণ্য কেটেছে, নদীর নোনা জলের হাত থেকে জমিকে বাঁচাবার জন্য বাঁধ দিয়েছে। ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ধান হয়েছে। নদীর ধারে গড়ে উঠেছে ছোট বড় গঞ্জ, আর লোকালয়। এদের যাতায়াতের পথ বলতে ওই নদীই। তবু মানুষ পিছিয়ে থাকেনি। আবাদ অঞ্চলে এখন ফসলও ভালো হয়, আর তার দক্ষিণে শুরু হয় সুন্দরবন। মানুষের বসতি সেখানে আর নেই।

ভারতবর্ষের অন্যান্য বনের মাঝে যাতায়াতের পথ আছে, মাঝে মাঝে আদিবাসীদের গাঁ বসতি দেখা যায়, নদী, ঝর্নার জল আছে, পান করা যায়। বনের মধ্যে আম, জাম, আরও অনেক বনজ ফলমূল হয়, তা দিয়ে মানুষেরা ক্ষুধাও নিবারণ করে।

কিন্তু সুন্দরবনের বুকে এসব কিছুই নেই। গহন বন, মানুষের বসত সেখানে গড়ে ওঠে না। নদীর জল সমুদ্রের জলের সবই নোনা আর বনের কোন গাছে তেমন ফল কিছুই হয় না, যা দিয়ে ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটতে পারে।

বরং এই বনের মধ্যে আছে কুলীন রয়েল বেঙ্গল টাই-গার। এ অরণ্যের তারাই সম্রাট। আছে সাপ, তাছাড়া বন-শুয়োর, হরিণ, গোসাপ, তরকেল; আর বানর আছে অসংখ্য। বনের গাছে গাছে এদের দেখা যায় গাছের ডাল ভাঙছে, লাফাচ্ছে আর হরিণের দলও গাছের নীচে এসে ওদের ভেঙে দেওয়া পাতা বুনোফল খায়। বানরগুলো ওদের খাওয়ায় আর বাঘের আক্রমণ থেকে পাহারাও দেয়। বাঘের নিশানা পেলে বানরদের চীৎকার বদলে যায়, সাবধানী ডাক শুনে হরিণের পাল নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে যায়।

ডাঙ্গায় বাঘের জন্য আর অসংখ্য নদী-খালে আছে কুমীর, কামটের দল। এরা বাঘের চেয়েও হিংস্র। কামটকে ভয় করে না বাদাবনের হেন লোক নেই। আবাদ অঞ্চলের নদীতেও এরা দল বেঁধে থাকে। মানুষ নৌকা থেকে পড়ে গেলে বা নৌকাডুবি হলে এরা দলবেঁধে এসে হাজির হয়, আর ধারালো করাতের মত দাঁত দিয়ে তার মাংস কেটে নেয় বাকী থাকে হাড়গুলো।

এত ধারালো যে যখন কাটে তখন বোঝাই যায় না, জল থেকে উঠলেই তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। কুমিরের অত্যাচার লোকালয়ের ধারেও হয়। গরু-বাছুর গাং-এর কাছে গেলে ল্যাজের ঝাপটায় তাদের জলে ফেলে ধরে নিয়ে ডুব দেয়।

সুন্দরবনের জলে কুমীর-কামট, ডাঙ্গায় বাঘ, সাপ, আর কোথাও খাবার নেই, চারিদিকে অথৈ জল—তবু মানুষের তৃষ্ণার জল এখানে নেই। তাই এই বন আদিম, হিংস্র আর মারমুখী। যেন মানুষকে প্রকৃতি তার রূপরাজ্যের এলাকায় প্রবেশ করতে দিতে চায় না। তার নিভৃত সৌন্দর্যকে সে অজানা রাখতে চায় লোভী মানুষের কাছে, সেই রূপকে দেখার জন্য চায় সাধনা।

—কথাটা ঠিকই কইছস গদাধর! ভেরি কারেক্ট! পি. রায় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। আর গুপী এদিক ওদিক চেয়ে বলে ওঠে—তোর গু-জ্ঞানটা থামা গদাই লঞ্চের দু-দেখা নেই। এদিকে পেটে ডু-ডন মারছে ছুঁচোয়।

পটলা বলে—এত পেটের জ্বালা তবে বের হয়েছিস

কেন?

—মু-মুড়িই স্-স্যাংকসন কর উইথ টাটকা আলুর চ্-চপ।

গদাধর বলে—গেল তুই। পেট যেন ধুয়ে বের হয়েছে। নতুন একটা জায়গায় চলেছিস, তার সম্বন্ধে তাই বলছিলাম কথাগুলো, তা নয়, ওদের পেটের জ্বালা ধরলো।

গুপী বলে—প্-পরে শুনবো। দে, পাঁচ টাকা ম্-ম্যানেজ কর। খেয়ে-দেয়ে নিই। লঞ্চে কিছু য্-যদি না মেলে। এতটা পথ!

পটলা ওর হাতে টাকা দিতে গুপী দৌড়লো তেলেভাজার সন্ধানে।

পি. রায় বলে—কথাটা মন্দ কয় নাই।

জায়গাটার নাম ন্যাজাট। পটল দলবল নিয়ে শ্যামবাজার থেকে বাসে করে বসিরহাটে এসে সেখান থেকে বাস বদলে আরও ষোল মাইল দক্ষিণে ন্যাজাটের গঞ্জে এসে থেমেছে। এখানেই স্থলপথ শেষ। এরপর তাদের যেতে হবে মোল্লাখালি অবধি প্যাসেঞ্জার লঞ্চে।

ওরা ন্যাজাটের লঞ্চঘাটে এসে বসে আছে একটা চায়ের দোকানে। সামনে নদীর বিস্তার। নোনা জলের গাং—ওটা গেছে নীচে সুন্দরবনের দিকে।

পি. রায়-এর লিকলিকে দেহে উঠেছে হাফপ্যান্ট, সরু ঠ্যাং দুটোয় মোজা জুতো। বকের ঠ্যাং-এর মত লিকলিক করছে। মাথায় একটা টুপি আর কাঁধে ঝোলানো এয়ার গান, সব নিয়ে ওকে তালপাতার সেপাই-এর মত দেখাচ্ছো।

পি. রায় বলে—জিনিষ-পত্তর লিষ্টি মত লইছস? ওষুধ-পত্তরও লাগবো। তাই মেডিসিন বক্সও আনছি।

—ওষুধের দোকান করে তুইও ডাক্তার হয়েছিস নাকি? গদাধরের কথায় হাসল পি. রায়। পটলা বলে—দেখে শুনে নে। আর পীতেটাকে ফেলে এলাম।

গদাধর বলে—তখন নিলেই হতো। গান-টান গায়, ভালো সময়টা কাটতো।

পীতাম্বরকে ওরা দলে নেয়নি। সকালে আসতে বলে ভোরেই বের হয়ে চলে এসেছে ওকে এড়িয়ে। পি. রায় বলে ওঠে—ঠিক করছস ঐটারে বাদ দিয়া।

ওরাও বুঝতে পারে, তাদের দিকে চেয়ে দেখছে এখানকার দোকানদার, গঞ্জের অনেক মানুষই। ঘাটে এখান ওখানে নৌকাও রয়েছে। ওই ওদের যাতায়াতের পথ। তারাও দেখছে ওঠা-নামার সময়। দু-একটা নৌকা পাল তুলে চলেছে নদীর বুকে। পি. রায় বলে—নাইস জায়গা। এক্কেবারে আমাগো নদীমাতৃক দ্যাশ বরিশালের মতই।

এমন সময় গুপীকে মুড়ি তেলেভাজা নিয়ে ফিরতে দেখে ওরাও তৈরী হয়। গুপী পথেই একটা চপ টেস্ট করতে করতে এসে বলে—ব্-ব্যাপার স্-সুবিধের নয় রে। দোকানে ক'টা ইয়া-ইয়া ল্-লাশ বসেছিল। খপর নিচ্ছিল, ক্-কোথায় যাবো—ক্-কেন যাবো!

পটলা ওর দিকে চাইল। পি. রায় বলে—ভয় পাইছস পটলা? পটলা জানে বাদাবনে ডাকাতের ভয়ও আছে। পথ-ঘাট অচেনা অজানা লোকের পক্ষে নিরাপদ নয়। তাই বলে—জায়গা ভালো নয় রে। এসব প্রায়ই ঘটে—ওই চুরি ডাকাতি।

গুপীও যেন ভয়ের চোটে প্রিয় খাদ্যগুলো খেতে ভুলে গেছে।

গদাধর বলে—লোকজন রয়েছে চারদিকে, ভয় কি!

হঠাৎ লঞ্চঘাটায় চাঞ্চল্য পড়ে যায়। দূর-দিগন্তে নদীর বুকে দেখা যায় জল কেটে লঞ্চটা এগিয়ে আসছে। এরাও উঠে পড়ে জিনিস-পত্র নিয়ে। গুপীর হাতে মুড়ির ঠোঙ্গা, তেলেভাজা আর কাঁধে ব্যাগ।

গদাধর একটু বাবু গোছের। শ্যামবাজারের বনেদী-ঘরের ছেলে। তাই পরেছে কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবী আর কোচার ফুলটা বাঁ হাতে ধরা। পায়ে বাদা-রের চটি।

গুপী, গদাধর, পটলা আর পি. রায় চলেছে শোভাযাত্রা করে লঞ্চ ঘাটের পাটাতনের দিকে।

ভাটার গাং। জোয়ারের সময় জল নদীর বাঁধে এসে ঠেকে, আবার ভাঁটায় নেমে যায়। তাই ভাটার সময় বেশ খানিকটা পলি কাদা জমে থাকে। আর লঞ্চঘাটার পাটাতন বলতে বাঁশের সরু মাচা মত। তাও জলে কাদায় থিকথিক করছে। ওই দিয়েই যেতে হবে।

পিছনে আসছে গাট্টা-গোট্টা কয়েকটা লোক, দু'চারজন চাষী আর বাউলও একজন রয়েছে। পরনে গেরুয়া জামা-কাপড়, মাথায় পাগড়ী বাঁধা, হাতে একতারা। মুখে একরাশ দাড়ি গোঁফ। পাঁচ মিশেলী যাত্রীর ভিড় জমেছে।

গুপী ওই মোটা লোকগুলোকে দেখিয়ে গদাধরকে বলে—ওই লোকগুলোই শুধোচ্ছিল, চ্-চাহনি দেখেছিস? ব্-ব্যাটা বাউলটাও শুনেছিল ওদের কথা। ড্-ডাকাতের দলের নয়তো র‍্যা!

ভয়ও হয়। লোকগুলো পাট্টা জোয়ান। গদাধরের কেমন বিশ্রী লাগে ওদের চাহনিটা। হাতে ওর হীরের আংটি ঝক-মক করছে। সেটাকে ও লুকোতে পারেনি।

এমন সময় কান্ডটা ঘটে যায়। গদাধরের পা থেকে ছিটকে পড়েছে দামী স্যান্ডেল, একটা পা শূন্যে তুলে গদাধর পিছলে পড়েছে ওই পাটাতন থেকে নীচের হাটুভোর জমাট কাদার উপর, আর পাটাতনের বাঁশে লেশে আদ্দির পাঞ্জাবী একেবারে চায়না সার্ট হয়ে গেছে, দেশী ধুতিখানা দুর্গা প্রতিমায় দোমেটে করার সময় কাদা মাখা ন্যাকড়া চাপানোর মত গায়ে সেঁটে বসেছে। আর পিছল কাদার মধ্যে পড়ে ঢালু গাং-এর জলের দিকে গদাধর চন্দ পাঁকাল মাছের মত গড়িয়ে চলেছে। গাং-এর জলে পড়লে আর বাঁচোয়া নেই। কামটের ভোজে লাগবে।

একজন চাষীই লাফ দিয়ে পড়ে ওর ঠ্যাংখানা খপ্ করে ধরে উজনে টানতে থাকে। গাং-এর দিকে মুখ করে ঝুলছে গদাধর, আর এ টানছে ডাঙগার দিকে। শেষকালে কোন-মতে কায়দা করে বাবুকে তোলা হল। তখন আর চেনার উপায় নেই। একেবারে আলুর দমের কাঁইমাখা আলুর মত দেখাচ্ছে গদাধরকে।

হাসছে সেই লোকগুলো। কে বলে—জামাইবাবুকে তোল কাদার মধ্যি থেকে। শ্বশুরবাড়ী যাবার সাজটা ভালোই হয়েছে।

লোকগুলো হাসছে খিকখিক করে। ওদের মধ্যে কে শুধোয়—বাবু যাবেন কোথায়? বাদাবনে এসে খুব তো ফরফরাইতেছেন, ধুতি, পাঞ্জাবী, চটি। এখন?

গদাধর কটমট করে চাইল। জবাব দেয় পি. রায় লোক-

টাকে—নো টক! কিপ সায়লেন্ট।
লোকগুলো হাসছে—আবার ইংরাজী ফুটানিও দেখছি।
পটল থামালো ওদের। কোন রকমে ওই অবস্থাতে লঞ্চে উঠতেই অন্যান্য লোকজনও হাসতে থাকে। লঞ্চের একটা খালাসি বলে—খাড়া হন বাইরে, নাওয়াইয়া ধোয়াইয়া লই বাবুরে।
এ্যাঁ।—গদাধর চমকে ওঠে। ছোড়াটা ততক্ষণে গাং-এর জল বালতিতে করে তুলে গদাধরের গায়ে হুড়হুড় করে ঢালতে থাকে।—একটু ধুই লন বাবু, লঞ্চ যে কাদায় ভরি যাবে।
শীতে কাঁপছে ঠকঠক করে গদাধর। লঞ্চ চলেছে ফুল স্পীডে গাং-এর বুক দিয়ে। গুপী এইবার মালপত্তর গোছ-গাছ করে মুড়ি তেলেভাজার ঠোঙগা নিয়ে ছাদে এসে উঠেছে। যত্ন করে বসে খেতে হবে।
গুম হয়ে বসে আছে গদাধর। কাদা চড়চড় করছে সর্বাঙ্গে। একটা পুরানো চট ঢাকা দিয়েছে ঠান্ডা হাওয়ার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কাদামাখা মূর্তিকে নীচে নামতে দেয়নি যাত্রীদল।
গদাধর বলে—ফিরে যাবো ভাবছি।
পি. রায় বলে—এখন ফিরনের পথও নাই। বি স্টেডি।
গুপীকে মুড়ি তেলেভাজা নিয়ে আসতে দেখে ধড়ে প্রাণ আসে। গুপী বলে—খেয়ে নে, পেটে কিছু পড়েনি দুপুর থেকে। পেটে কিছু পড়লে মেজাজ ঠান্ডা হবে। নে।
গাং-এর বুকে প্রচন্ড হাওয়া বইছে। গুপী হঠাৎ আর্তনাদ করে ওঠে। হাওয়ার ঝাপটায় হাত থেকে মুড়ির ঠোঙগা ফসকে গেছে আর দমকা বাতাসে মুড়িগুলো ফরফর করে উড়ে চলেছে গাঙ-এর দিকে। নিমেষের মধ্যে এতগুলো মুড়ি উড়ে গেল। আর সেই অসতর্ক মুহূর্তে কয়েকটা গাংচিল এদিক ওদিক থেকে এসে এলোপাথাড়ি ছোঁ মেরে হাতের তেলেভাজার ঠোঙগাটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল।
গুপী আর্তনাদ করে ওঠে—গেল রে। এ্যাই সব নিয়ে গেল ব্যাটারা। মায় ঠোঙগাটা অবধি।
সারেং লঞ্চের ব্রিজ থেকে বলে—উপরে এ সময় মুড়ি আনে বাবু, হাওয়া আর চিলের উৎপাতে গেল তো সব।
পটলা বলে—পি. রায় তুই দাপাস নে, নীচে যা। হাও-য়ায় এবার তুই-ই উড়ে যাবি।
গুপী আফশোষ করে—ও ব্যাটা গেলেও দুঃখ ছিল না। এখন এতটা পথ ব্-বাকি, কি খ্-খাই বল দিকি? এ্যাঁ?
—কেন গাং-এর হাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর বাবু।
ওরা চেয়ে দেখে ওপাশ থেকে সেই বাউল ফোড়ন কাটছে। সে-ও দেখছে ব্যাপারটা। গদাধর জবাব দিল, না।
পটলা বলে ওঠে—তুমি থামো তো হে!
বাউল ততক্ষণে ক'জন যাত্রীর মধ্যে বসে একতারায় সুর তুলছে। ওদিকে বসে আছে সেই মুষকো জোয়ান লোক-গুলো। বিড়ি টানছে আর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।
গুপী দেখছে ওদের। পটলাও লক্ষ্য করছে। তাই পটলা বলে—লোকগুলো যেন ফলো করছে আমাদের। গতিক ভালো নয়।
গুপী বলে—ব্-ব্যাটা বাউলও। ওদের দ্-দলেরই লোক ওটাও।
বাউলের গানের সুর ওঠে নদীতে লঞ্চের বুকে। চার-দিকে চাষী-বাষী যাত্রীদল, দু-চারজন বৌঝিও এসে ছুটেছে। পরম আনন্দে বাউল একতারা বাজিয়ে গান করছে তখন।
—টিকিট!
লঞ্চেই কনডাক্টার রয়েছে বাসের মত। যাত্রীদের কাছে ঘুরে ঘুরে টিকিট আদায় করতে করতে সে এসেছে পটল-দের কাছে।
পটলই টিকিটের দাম দিতে কনডাক্টার টিকিট ধরিয়ে দিয়ে ওদিকে চলে গেল।
গুপী বলে—ব্-বাউল ব্যাটার কাছে টিকিট নিল না, দেখলি! ব্-ব্যাটা গান শুনিয়েই উশুল করে দিল।
বাউলও বেশ জমিয়ে নিয়েছে। মেয়েদের কে যেন দু'খানা সরুচাকলী আর খেজুর গুড় দিল ওকে। বাউল খাচ্ছে। গুপী বলে—ম্-মুড়ির চেয়ে স্-সরুচাকলীই ভালো। ব্-বাতাসে ওড়ে না রে।
খিদেতে পেট জ্বলছে ওদের। বাউল যেন ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে সরুচাকলী খাচ্ছে। কে যেন জলও দেয় তাকে। বাউল খেয়ে-দেয়ে আবার গান শুরু করে।
সেই মুষকো লোকগুলো নামছে গাং-এর ধারে। নামার সময় একটা লোক পি. রায়ের কাঁধের এয়ার গানটা দেখে বলে—এটা কি করবেন বাবু?
পি. রায় দেখছে লোকটাকে। গম্ভীরভাবে বলে সে—তোমার তাতে কি রে মশায়?
হাসছে লোকটা। বলে ওঠে ভারি-গলায়—চলি বাবু। বাদাবন, একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন, আর মেজাজ দেখাতে নাই এখানে। চল্ রে বিল্টে। ও সারেং লঞ্চ ভেড়াও।
লোকটা যেন এখানকার রাজাগজা, এমনি মেজাজে হুকুম করে, আর সারেংও লঞ্চটা নির্জন গাং-এর ধারে ভিড়িয়ে দিল ওদের হুকুমে। লোকগুলো লঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে অভ্যস্তভাবেই কাদায় নামতে যাবে, কনডাক্টার এগিয়ে এসে বলে—টিকিট?
হঠাৎ লোকটাকে দেখে সে থেমে গেল। লোকটা বলে—কি রে, টিকিট লাগবে নাকি এ গাং-এ আমাদের? চিনিস না?
কনডাক্টার কিছু বলার আগেই সারেং হেকে ওঠে—ওদের ফিরি পাশ নটবর। ছেড়ে দে।
কনডাক্টার ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ওরা কাদার বুকেই লাফিয়ে পড়ে গটগট করে চলে গেল বাঁধের দিকে। লঞ্চটা আবার নদীতে ফিরে চলতে থাকে। সারেং, কনডাক্টারের মধ্যে চোখের ইশারায় কি যেন কথা হয়ে গেল।
গদাধর বলে—ব্যাটারা যেন রাজা!
সারেং বলে—ও কথা বলবেন না বাবু, মুখ বুজে থাকাই ভালো এখানে।
বাউল তখনও গান গাইছে।
বেলা পড়ে আসছে। এবার তারা এগিয়ে আসছে মোল্লা-খালির দিকে। তাদেরও পথ শেষ হয়েছে আপাততঃ।

অন্ধকার নেমেছে। সামনে ওই নদীর বিস্তার। ওর ওপা-রেই দেখা যায় আঁধার ঢাকা বনভূমি। লোকালয় এখানেই

শেষ। এরপর শুরু হয়েছে বন আর আদিম বন।

এপাশে কিছু বসতি আছে। হাটতলার টিনের টানা চালাগুলো আজ জনশূন্য। হাটবার নয়—তাই দোকান পশারের ভিড় নেই। বাউল চলেছে, খোঁজ-খবর নিয়েছে তার পথের।

হঠাৎ অন্ধকারে একটা লোক আসতে দেখে দাঁড়ালো। লোকটা চেনা-চেনা। ন্যাজাট থেকে সেই মুষকো ক'জন লোক উঠেছিল লঞ্চে। লোকটা তাদের সঙ্গেই ছিল। দলের বাকী সকলে নেমে গেছে মাঝপথে। কিন্তু বাউল খেয়াল করেনি যে, একজন লঞ্চে রয়ে গেছে।

লোকটারও সন্দেহ হয়েছিল বাউলকে। ঠিক এ এলাকার লোক এ নয়। তার কথাবার্তা আর চেহারা দেখেও সন্দেহ হয়েছিল সেই দলের লোকজনের। তাদের জাল বিছানো আছে এ এলাকায়। তাই ওই নতুন চারটে ছেলে আর ওদিকে বাউলের উপর নজর রেখেছিল তারাও।

হলধর নস্করকে এক ডাকে চেনে এ এলাকার সকলেই। তার নামে ভয়ে কাঁপে আবাদের লোক। পুলিশকেও ঘোল খাইয়ে দিয়েছে হলধরের দলবল। এ অঞ্চলে ডাকাতি, খুন-জখম সবই করে তারা। আর সুন্দরবনের গহন গাং খাড়ি দিয়ে হলধরের দলবল নৌকায় হাজার হাজার টাকার চোরা-কারবার করে। বেআইনি মালপত্র আনা-নেওয়া করে বাংলাদেশ থেকে।

পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাদের গায়ে হাত দিতে পারেনি। অবশ্য হলধর নস্করকে তাই সর্বদিকে কড়া নজর রাখতে হয়। তার লোকজনও নানা জায়গায় ছড়ানো। সুন্দরবনের বাঘের চেয়েও তারা বেশী সন্ধানী আর অনেক বেশী হিংস্র।

বাউলকে দেখেছিল ওরা লঞ্চে। বাউলও তাদের সঙ্গে মিশে কথা বলছে, এ এলাকা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। সেটাতেই হলধর নস্করের সন্দেহ হয়েছিল। আর ওকে এড়াবার জন্যই একটু আগে নেমে পড়েছিল আর ওই চেলাটিকে রেখে গিয়েছিল বাউলকে একটু সমঝে করতে।

বাউল মনের আনন্দেই চলেছে পথ দিয়ে। লোকজন বিশেষ নেই। হঠাৎ ওকে এগিয়ে এসে পথ আটকে দাঁড়াতে দেখে চমকে ওঠে। লোকটা ওকে শুধোয়—কোথায় যাবি? এ্যাই ব্যাটা।

বাউলও জবাব দিতে পারে না কারণ জায়গাটা তাকে খুঁজে নিতে হবে। তাই লোকটার কথায় বলে—কাঠগোলায় যাবো।

লোকটা তৈরী হয়েই এসেছিল। আশেপাশেও দু'একজন রয়েছে তার লোক। এগিয়ে এসে বাউলের ঘাড়ে হাত দিতেই হাতে লেগে ওর নকল দাড়িটা পড় পড় করে উঠে আসে। লোকটা অবাক হয়, চমকে উঠেছে বাউলও।

লোকটা গর্জে ওঠে—শালা, পুলিসের চর, না? এসেছিস হলধর নস্করের গর্তে পা দিতে? তুলে নিয়ে গিয়ে গাং-এর জলে ফেলে দেবো না!

বাউল ভয়ে শিউরে ওঠে। কয়েকটা লোক অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মত ঠেলে উঠে তার দিকে এগিয়ে আসছে। বাউল বুঝেছে ওরা ওসব কাজ সহজেই করে থাকে। প্রাণভয়ে পালাতে যাবে, আর লোকটাও খপ করে ওর চুলের মুঠিটা চেপে ধরে গর্জাচ্ছে—শলা, টিকটিকি, পালাবি মদনার হাত থেকে? খতম করে দেবো না?

কিন্তু বাউল এই ফাঁকে মাথাটা ঝাঁকানি দিতেই বাবরী চুলের পরচুলটা রইল মদনের হাতে আর বাড়তি মাথাটা ছাড়িয়ে নিয়ে অন্ধকারে দৌড়তে থাকে।

মদনও অবাক হয়ে গেছে। পরচুলটা ওর হাতে ঝুলছে আর আসল মালটি দৌড়চ্ছে সামনে দিয়ে। কিন্তু পালাবার পথ নেই, মদনও লেঙি মারতে বাউলের ধাবমান দেহটা ছিটকে পড়ে ওদিকে। ওকে ধরতে যাবে, এমন সময় টর্চের জোরালো আলো আর বন্দুক কাঁধে কাদের আসতে দেখে, বেগতিক বুঝে মদনা সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওর চ্যালারাও।

ধস্তাধস্তির শব্দ শুনে টর্চের আলো ফেলেছে পটল। নদীর ঘাটে লঞ্চ থেকে নেমে ওরা আসছে মামার কাঠগোলার দিকে। সঙ্গে মামার লোকজনও রয়েছে। তারা লঞ্চঘাট থেকে ওদের মালপত্র নিয়ে পথ দেখিয়ে আসছে। এমন সময় ওই লোকগুলোকে অন্ধকারে পালাতে দেখে অবাক হয়। ওদিকে ছিটকে পড়েছে একটা ছেলে, পরণে বাউলের পোষাক।

সে-ও এদের দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে। টর্চের আলোয় ওকে দেখে চমকে ওঠে পটল—তুই! পীতাম্বর! এখানে?

গদাধরও অবাক হয়। পীতাম্বরকে ওরা কলকাতায় এড়িয়ে চলে এসেছিল, সেই পীতে যে এখানে ওই বিচিত্র সাজে এসে হাজির হবে ভাবেনি।

পীতাম্বর ওদের দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়ে বলে—তোরা তো ফেলে চলে এলি, আমিও এই বাউল-বোষ্টম সেজে গান করতে করতে 'ফিরি'তে চলে এলাম মোল্লাখালিতে। যাচ্ছিলাম পটলার মামার ওখানেই।

—তা পথে গড়াগড়ি দিচ্ছিস কেন? থিয়েটারের সাজের বাক্স থেকে দাড়ি, চুল সবই মেরেছিস, ওগুলো বা ছড়ানো কেন?

পটলা শুধোয় ওকে। পি. রায় দেখছে পীতাম্বরকে।

পীতাম্বর অন্ধকারে এদিকে ওদিকে ভয়চকিত চাহনি মেলে বলে—এখন চল মামার ওখানে, পরে সব বলবো।

ওরা অবাক হয় ওর মুখচোখে ভয়ের চিহ্ন দেখে।

পি. রায় বলে—তাই কইস্। এখন চল দেখি, প্যাটে দানাপানি পড়ে নাই। সামথিং নেসেসারী।

গুপীও সায় দেয়—ঠিক ক্-কথা বলেছিস, গা্-মাইরী। চ্-চল দিকি!

পীতু সঙ্গের লোকটাকে শুধোয়—আর কতদূরে তোমাদের বাংলো?

লোকটা অন্ধকারে আলোর নিশানা দেখিয়ে বলে—ওই যে বাবু, এসে গেছি।

সকাল থেকে ধকল গেছে। ওরা পৌঁছবার আগে থেকেই মামাবাবু সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। কাঠের বাংলো। ওদিকে নদীর ধারেই কাঠের তৈরী বাথরুম। আর বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে করাত কল। নদীর ধারেই। ঘাটে নৌকা, ডিঙিগও রয়েছে অনেকগুলো। মাঝি, বাউলিয়া, লোকজনের ভীড়ও রয়েছে।

পীতু একটু নিশ্চিন্ত হলেও ওর ভয় কাটেনি। খাবারদাবারের আয়োজনও এলাহি। এখানকার নদীতে মাছের অভাব নেই। পারসে, ভাঙ্গড়, ভেটকি, গিলেট, পমফ্রেট,

মায় গলদা চিংড়িও মেলে প্রচুর।

মামাবাবু বলেন—মাছ এখানে অনেক মেলে। তবে বেশী খেয়ো না। দু'চারদিন সইয়ে সইয়ে খাবে, নাহলে রক্তামাশায় ধরে যাবে। নোনা জলের মাছ, ফস্‌ফরাস্ বেশী থাকে। তোমাদের ঠিক সইবে না।

পি. রায় সাবধান করে—গুপী এত খাবি না। তর আবার রাক্ষসের ক্ষুধা।

গদাধর ততক্ষণে স্নান সেরে কাদামুক্ত হয়ে ধাতস্থ হয়ে উঠেছে। পীতেকে মুখ শুকিয়ে বসে থাকতে দেখে বলে—কই খা রে! তা দেখালি বটে একখানা খেল। ওভাবে সেজে-গুজে মেক্‌আপ নিয়ে চলে এলি?

পীতে বলে—পয়সা তো দিবি না তোরা? আর ট্রেনে, বাসে, লঞ্চে মাগ্‌না আসতে হবে। তাই ওইভাবেই চলে এলাম। এখন ভাবছি না এলেই ভালো হতো!

মামাবাবু খুশি হয়েছেন ওদের আসায়। বাদাবনে একা একা এই লোকজনের সঙ্গে থাকেন, বাইরের কেউ এলে ভালোই লাগে। তাই বলেন—না, না—আসবে না কেন? তোরাই বা সঙ্গে আনিসনি কেন?

পি. রায় ভালোমানুষী দেখায়—আমিও কইছিলাম মামাবাবু, ওরে নেওয়ার জন্য! তয় ভোটে হাইরা গেলাম।

মামাবাবু বলেন—শুনেছি ভালো গাও। একদিন শোনাতে হবে পীতু।

পীতু শুকনো মুখে ঘাড় নাড়ে—হ্যাঁ, শোনাবো বইকি!

খাওয়া দাওয়ার পর বাংলোর একটা বড় ঘরে ওদের শোবার ব্যবস্থা ছিল, সেখানে এসে হাজির হয়েছে ওরা। রাত নেমেছে।

পি. রায় গুনগুনিয়ে গান গাইছে। গুপীর ভোজন একটু বেশী হয়ে গেছে, তাই ঝিম মেরে টানটান হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। আবছা চাঁদের আলো পড়েছে গাং-এর জলে। রুপোলী স্রোত বইছে।

পটল বলে—নাইস জায়গা মাইরী। দেখবি সুন্দরবনের ভিতরে আরও ভালো লাগবে।

পীতুর মনে স্বস্তি নেই। ওর চোখের সামনে সেই লোকগুলোর হিংস্র মুখখানা ভেসে ওঠে।

পীতু বলে—সুন্দরবনের বাঘ দেখেছিস? এর মধ্যেই আমি তাদের দেখেছি পটলা।

—মানে? অবাক হয় গদাধর।

পীতু বলে—তোরা এসে না পড়লে ওরাই শেষ করে দিত আমায়। তোদের আলো দেখে আর কথার শব্দ শুনে সরে গেছে লোকটা।

গদাধর এগিয়ে আসে। পটলা জানে এখানকার খবর। তাই শুধোয়—কে?

—ওই হলধর নস্করের দলের লোক। ওই লঞ্চেই ছিল তারা। আগে মাঠের ধারে লঞ্চ থামিয়ে নেমে গেল। ওরা ভেবেছে আমি নাকি পুলিশের স্পাই। তাই ওরা চলে গেছে আর দুটো লোককে রেখে গিয়েছিল আমাকে একা পেলেই সাবাড় করতে। শেষই করে দিতো।

পীতুর মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে ওঠে।

পি. রায় বলে—থো ফ্যালাইয়া। শেষ করণের দেরী আছে এহনও।

পটলা বলে—থাম পি. রায়। তোর বাঙালপনা ঠান্ডা করে দেবে। ওর নামে এখানকার লোকজন শিউরে ওঠে।

গুপীও বিছানায় উঠে বসেছে। গুপীর ব্যায়ামপুষ্ট কঠিন দেহটায় কাঠিন্য ফুটে ওঠে। গুপী বলে—তাই বলে যাকে তাকে শেষ করবে? ক'দিন বেড়াতে এসেছি, তারও উপায় নেই।

পটলা কি ভাবছে। বলে সে—ওরা তাহলে আমাদেরও চিনে রেখেছে। মামাবাবুকে বলবো?

গদাধর শোনায়—বললে এখুনি বনে যাওয়াই বন্ধ হয়ে যাবে।

গুপীও শোনায়—ব্‌-বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা। থ্‌-থাম দিকি। ব্‌-বেড়াতে এসেছি, বেড়িয়ে ফিরে যাবো। নে, রাত হয়েছে; শ্‌-শুয়ে পড়।

তবু ভয় যায় না ওদের। পীতুর গা ছমছম করে। বাউল সেজে পয়সা ফাঁকি দিয়ে আসতে গিয়ে এমনি বিপদে পড়তে হবে ভাবেনি।

রাতটা কোনভাবে তবু কেটে গেছে। পথের ধকলে ওরাও সব ভয় বিপদের কথা ভুলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকাল হয়েছে।

সামনেই নদীর বিস্তার। ওপারের বনসীমায় সকালের আলো পড়েছে। ধীরে ধীরে ওদের ভয়টাও যেন মুছে যায় দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে।

নদীর জলে দেখা যায় একটা লঞ্চ এগিয়ে আসছে। পুলিশের লঞ্চ। শান্ত গঞ্জ-গ্রামে সোরগোল পড়ে যায়। কাল রাতে আবাদের ওইদিককার গ্রামে কোন এক জোতদারের বাড়ীতে ডাকাতি হয়ে গেছে। পুলিশেরও খবর মিলেছে যে এসব হলধরের দলেরই কীর্তি। তাই এসেছে, হন্যে হয়ে খুঁজে ফিরছে তাদের। কিন্তু হলধরের দলবলের কোন পাত্তাই মেলে না।

মামাবাবু বলেন—ওদের চোখে ধুলো দিয়ে হলধর সরে পড়েছে। লোকটা ভয়ানক ধূর্ত। বাদাবনের আতঙ্ক। পুলিশ ওকে ধরার জন্য নগদ পুরস্কারও ঘোষণা করেছে পাঁচ হাজার টাকা। কিন্তু ধরবে কে? পুলিশও নানাভাবে চেষ্টা করছে।

গুপী চা খেতে খেতে কথাগুলো শুনছে। বলে সে—প্‌-পাঁচ হাজার টাকা দেবে বলেছে?

মামাবাবু বলেন—কেন? ধরার ইচ্ছে নাকি হে?

গুপী অপ্রস্তুতের মত বলে—না। তবে লোকটা যে ভি. আই. পি. ত্‌-তাই বলছি।

গদাধর বলে—বনে যাচ্ছি কবে মামাবাবু? এতদূর এলাম একটু সুন্দরবন দেখে আসবো না?

মামাবাবু বলেন—দেখি, দু'একদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বনকাটাই যেখানে হচ্ছে সেখানেই আমার বড় বড় নৌকা, লোকজন সব আছে। সেখানেই থাকবে। তবে সব তো জল আর বন। নৌকাতেই থাকতে হবে। আর সেখানকার সর্দার মাঝি ইরফান সঙ্গে করে বনের ভিতরে নিয়ে যাবে তোমাদের। তার কথা ছাড়া এক পা-ও এদিক-ওদিকে যাবে না।

সারা সুন্দরবন অঞ্চলকে কুড়িটা ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। তাদের নামও বিচিত্র। ওই আদিম অরণ্যভূমিতে মানুষের বসতি নেই। মানুষ সাবধানে কাঠ কাটতে যায়, আর

নৌকাতেই থাকে। কোন রকমে সাইজমত কাঠ কেটে সরকারী পাশ করিয়ে চলে আসে। ওই ব্লকগুলোর নাম; আড়বাশী, বুড়ির ডাবর, চামটা, মনসার চর, মায়াদ্বীপ, কেদোর চর, নেতা ধোপানী ইত্যাদি। আর ওদের মাঝে বয়ে গেছে অসংখ্য ছোট বড় নদী-খাল। কোন নদী বা আট-দশ মাইল অবধি চওড়া। রায়মঙ্গল, কালিন্দী, হরিণগাড়া, ঝিলা, গোসাবা, বিদ্যা, মাতলা, মৃদঙ্গ ভাঙ্গা, ভাঙ্গা দুয়ানি, তোরো বাঁকি; এমনি সব বিচিত্র নাম।

এক-একটা ব্লকে কুড়ি বছর অন্তর বনবিভাগের লোক গিয়ে গাছে মার্কা দিয়ে দেয় লোহার হাতুড়ি দিয়ে। কাঠ-মহাজনের লোক ওই গাছ কাটে। বনবিভাগকে ট্যাক্স দিয়ে কুড়ি বছর অন্তর কাটাই হয় এক একটা ব্লক। তাই ঊনিশ বছর ধরে এক এক এলাকায় আবার গাছগুলো বড় হয়ে ওঠে। বনও দুর্গম দুর্ভেদ্য হয়।

এবার বন-কাটাই হচ্ছে খুব বেশী দূরে নয়। এক ভাঁটির পথ। সেখানেই লোকজন নৌকায় থাকে কাজ করার জন্য। তাদের খাবার চাল, ডাল, তরকারী, বিঁড়ি, তামাক, কিছু ওষুধপত্র, দেশলাই, মায় খাবার জলটুকু অবধি এই গঞ্জ থেকে নৌকায় পাঠাতে হয় মাঝে মাঝে। প্রায় দুশো লোকের খাবার-পত্র যায় কয়েকটা নৌকায়।

তেমনি একটা চালানের সঙ্গেই ওদের বনে যাবার ব্যবস্থা করেছেন মামাবাবু। গদাধর ব্যবস্থা দেখে খুশী হয়েছে। ওদের জন্যে আলাদা একটা মাঝারি সাইজের নৌকাকে বাঁশের ছোট ছোট মাচা দিয়ে পাটাতন করা হয়েছে। ছই-এর একটা ঘরও রয়েছে। রাতে থাকা যাবে। চারজন দাঁড়ি মাঝি চলেছে, ওদেরই একজন রান্না করে দেবে।

পি. রায় বলে—দরকার হইলে আমরাই হাত লাগামু অনে। গুপী এরমধ্যে ছই-এর ঘরে তোষক পেতে শয্যা বানিয়েছে। মালবোঝাই বড় নৌকাটার পিছু পিছু ওদের নৌকা যাবে।

মামাবাবু সাবধান করেন—বনে নামবি না পটল। ইরফান সর্দারের কথা মত চলবি। আর পথে কোনও নৌকা দেখলে তোরা কোন কথা বলবি না। মাঝিদেরও সাবধান করে দেন তিনি।

বদর বদর বলে নৌকা ছাড়ল ভাঁটার সময়। সমুদ্রের দিকে চলেছে জলস্রোত, ওরাও সেই স্রোতের টানে ভেসে চলেছে বনের গহনে। গঞ্জের বাড়ি-ঘর আর দেখা যায় না। নৌকাটা এবার বড় গাং-এর ঢেউ-এ লাফাতে লাফাতে চলেছে, দুদিকে ওদের গহন আদিম সুন্দরবন।

পি. রায় খুশীর চোটে বলে ওঠে—মারভেলাস!

গুপী সায় দেয়—ঠি-ঠিক কইছস বাঙ্গাল। ন্-নদী-মাতৃক দে..............।

খুশীর চোটে গুপীর জিভটা ঘনঘন আলটাকরায় আটকে যায়।

এখানকার নদীপথে চলার সময়ও সীমিত। জোয়ারের সময় সমুদ্রের জল ঠেলে এগিয়ে আসে উপরের দিকে। নদীর জল তখন দেখতে দেখতে পনেরো ফিট-বিশ ফিট বেড়ে যায়, তখন সমুদ্রের দিকে নৌকা চালানো যায় না। বনের ভিতরের দিকে ভাঁটিতে এগোনো যাবে না। তাই নৌকাকে তীরের কাছাকাছি এনে নোঙর করতে হয়। জোয়ার থাকবে প্রায় ছ্ঘন্টা। এই ছ-ঘন্টা বসে কাটাতে হবে। আবার ভাঁটার টান শুরু হলে তবে নৌকা যেতে পারবে নীচের দিকে। ছ্ঘন্টা ভাঁটা আর ছ-ঘন্টা জোয়ার। দিনে-রাতে দু'বার করে যাত্রা থামাতে হবে তাদের।

এমনি জোয়ারের সময় তারা নৌকা নোঙর করে বসে আছে বনের ধারে। নদীর খুব ভিতরে যাওয়া যায় না, স্রোতের টান বেশী আর জলও গভীর। তাই বনের কাছাকাছি রয়েছে তারা একটা খালের মধ্যে। দুদিকে ঘন বন।

গাছের ডালে একপাল বাঁদর ওদের অনধিকার প্রবেশ করতে দেখে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে।

গুপী বলে—পি. রায় তোকে ডাকছে ওরা।

পি. রায় তখন থেকেই আফশোষ করছে—একখান বাঘও দেখলাম না রে মশায়। এ কি বন? আমাগো বরিশালের সুন্দরবন হইলে কয়খানই নজরে পড়তো গিয়া।

মাঝি রমজান আলী বলে—বড়শিয়ালের নাম লইবেন না বাবু। কথায় বলে, ত্যানার দ্যাখা—সাপের ল্যাখা। এ যেন্ না ঘটে। নেন্ পাক-সাক হই গেছে। খাই লন।

নৌকার ওপরই উনুনে রান্না হয়েছে, ভাত, তরকারী আর ডাল। মাঝিদের দু'একজন বড় নৌকার লাগোয়া ছোট বোটে দাঁড়িয়ে বালতিতে করে জল তুলে স্নান সেরেছে।

পীতাম্বর বনের মধ্যে এসে একটু ঘাবড়ে গেছে। তার গানও বের হয় না আর। গদাধর বলে—স্নান করে খেয়েনে পীতে।

পীতু বোটে নেমেছে বালতিতে করে জল তুলে স্নান করতে যাবে, হঠাৎ দেখে পাশেই জলে প্রচন্ড ঢেউ তুলে একটা কালো বিরাট কুমীর জেগে উঠেছে। চোখ দুটো লাল, আর মুখখানাও বিশাল।

বালতিটা হাত থেকে ছেড়ে দিতে জল ভরা ভারি বালতিটা পড়েছে কুমীরটার মাথার উপরই। আর সেই অতর্কিত আঘাতে কুমীরটা দাপিয়ে ওঠে। পীতু প্রাণপণ চিৎকার করছে আর কুমীরটাও জলে ঝাপটা মারছে। কলরব আর্ত-নাদ ওঠে, মাঝিরাও ছুটে এসেছে। নোঙর করা নৌকাটা নড়ছে ওই কুমীরের টানে। বালতিটার দড়িটা বাঁধা ছিল নৌকার সঙ্গে, আর ভারি বালতিটা কুমীরের মাথার ওপর পড়েই বালতির হাতলের কোণটা বেকায়দায় সেঁধিয়ে গেছে কুমীরটার চোখের ভিতর। রক্ত ঝরছে আর যন্ত্রণায় কুমীরটা মুক্ত হবার চেষ্টা করছে, কিন্তু উপায় নেই। বেচারা চোখে বড়শী বেঁধা বিরাট মাছের মত দাপাচ্ছে আর প্রাণপণে টানছে নৌকাটাকেই। ল্যাজের ঝাপটায় সঙ্গে বাঁধা ছোট ডিঙিখানাকে যেন চুরমার করে দেবে।

পীতু এই ফাঁকে কোন রকমে লাফ দিয়ে বড় নৌকায় উঠে এসেছে। আর কুমীরের প্রচন্ড টানে নোঙর ছুটে গিয়ে নৌকাটা চলেছে খালের ভিতর দিয়ে। কুমীরটা দাপাচ্ছে আর ওদের টেনে নিয়ে চলেছে বনের গভীরের দিকে।

মাঝিরা চিৎকার শুরু করে। দু'চার জন ধারালো কুড়ুল ছুড়ছে কুমীরটার দিকে। ওর পিঠে, কাঁধের কাছে দু'একটা কুড়ুলও গেঁথে গেছে। পি. রায় এই ফাঁকে ওর এয়ার গানটা বের করে কুমীরটাকে গুলী করতে থাকে, আর সেগুলো কুমীরের শক্ত পিঠে লেগে ছিটকে যায়।

গদাধর বলে—বাঁদরামি থামা পি. রায়। ওতে কিছু হয়?

পি. রায় ক্রমশঃ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে—লইয়া

যাইবো কনে?

গুপী ধমকে ওঠে—শ-শ-শ্বশুর বাড়ি লইয়া যাইবো ত-তরে।

এর মধ্যে মাঝিদের কে একজন কোন রকমে হাঁসুয়া দিয়ে বালতির দড়িটা কেটে দিতে কুমীরটা মুক্ত হয়ে গিয়ে ওদের ছেড়ে ডুব দিল। বোধহয় বন্ধন মুক্ত হয়ে সে এইবার পথ দেখেছে।

ততক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। বেঘোর টানে কুমীরটা ওদের বনের মধ্যে সরু খালে এনে ফেলেছে। আর ভাঁটার টানে তখন জল নামছে, খালের বুকে ঠেলে ওঠে পলিচর। নৌকা বের হবার পথ নেই। দুদিকে ঘন গহন অরণ্য, আধমরা নদীর খাতে এইটুকু জলে পড়ে আছে তারা।

রমজান আলী বলে—বিপদ হই গেল বাবু। আবার জোয়ার না এলি নৌকা যাবে না।

পি. রায় ধমকে ওঠে—ক্যান যাইবো না?

মাঝি বলে—নৌকার তো পেছনে চাক্কা নাই বাবু, ডাঙগার উপর দিই যায় না।

রমজান আলী বলে—সাবধানে থাকবেন বাবু, সন্ধ্যার মুখে বনও ভাল না। বড়শিয়ালের হাঁকাড় শুনতি পান না? চেঁচামেচি করবেন না। মালুম পেয়ে গেলি বিপদ হতি পারে।

অন্ধকার নামছে বনে বনে। দিনের আলোয় সুন্দরবনকে দেখেছিল ওরা নতুন রূপে। মুক্ত আকাশ, বিরাট নদী আর সবুজ হলুদ বনভূমিকে ভালো লেগেছিল। রাতের অন্ধকারে সব এখন ডুবে গেছে। চকচকে কালো হাটু-ভোর কাদার পরই কেওড়া গাছের ডালগুলো নেমেছে, ঘন বন। মানুষ ঢুকতে পারে না এমনি দুর্ভেদ্য, সব এখন জমাট অন্ধকারে ডুবে গিয়ে এক রহস্য পুরীর মত হয়েছে। এর রূপ আলাদা।

অন্ধকারে টর্চ বাল্‌বের মত কি জ্বলছে! গুপী, গদাধর, পীতু ছইয়ের ভিতরে ঢুকেছে। পি. রায় বলে—কাওয়ার্ড তরা দ্যাখ না রাত্রির রূপখান। ওগুলো কি মিয়া?

রমজান বলে—হরিণের পাল। আঁধারে চখু জ্বলতিছে ওদের।

পি. রায় বলে—উঃ, বন্দুকটা ফালাইয়া আইলাম; দেখ-তিস দু'চারটে কিল কইরা দিতাম।

হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শোনা যায় ভারি ক্রুদ্ধ একটা গর্জন। নৌকার ভিতরে থালা-বাসনগুলো ঝন্‌-ঝনিয়ে ওঠে।

গুপী বলে—ব্-ব্-বাঘ!

রমজানের লোকজনও নৌকার খোলে টাঙি, বল্লম, বৈঠা, কুড়ুল নিয়ে তৈরী হয়ে আছে।

তারার আলোয় অন্ধকারে একটু আলো আলো ভাব ফুটে ওঠে। সেই আবছা আলোয় দেখা যায় বনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে বিশাল বাঘটা। সারা গায়ে ছেঁকে ধরেছে জোনাকি পোকার দল। ওর দেহটা দেখে মনে হয় যেন একটা আগুনের পুঞ্জ, আর চোখ দুটোয় নীলাভ একটা তীব্র দীপ্তি ফুটে উঠেছে। বাঘটা ল্যাজ ঝাপটাচ্ছে আর নদীর দিকে কাদায় বন্দী নৌকাটার দিকে চেয়ে চাপা গর্জন করছে।

ছই-এর মধ্যে গুপী আর্তনাদ করে ওঠে—ব-ব্-বা......।

গদাধর জড়িয়ে ধরেছে একটা জলের কলসীকে, আর পি. রায় নিমেষের মধ্যে ছিট্‌কে শরীরটা বাঁশের পাটাতনের ফাঁকে গলিয়ে দিয়ে খোলের মধ্যে ঢুকে গেছে। পীতু অবাক হয়ে দেখছে বাঘটাকে।

রমজান আলী ছই-এর পাশে দাঁড়িয়েছে একটা জ্বলন্ত মশাল হাতে আর চীৎকার করছে—আয় শালা, পুড়িয়ে ছাই করি দেবো। ভুতো, ল্যাজা বল্লম ধরি থাক। নেতাই ব্যাটারে কুপিয়ে গর্দান ফাঁক করি দিবি, এ্যাঁও।

বাঘটা কাদার দিকে চায় আর পা বাড়াবার চেষ্টা করে থেমে যায়। বুঝেছে সে প্রতিপক্ষও তৈরী। কাদার মধ্যে বেকায়দায় পড়ে গেলে ওরাও কুপিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে। তাই নিষ্ফল রাগে সেও গরগর আওয়াজ করে, আর রমজানের দলও গর্জন করছে—আয় ব্যাটা; চলে আয়।

যেন বাকযুদ্ধ চলেছে। বাঘটা এদিক ওদিক ঘুরে পথ না দেখে নিষ্ফল হয়ে ভাঁটার কাদায় পড়ে থাকা দু'একটা মাছ থাবা দিয়ে ধরে মুখে পুরে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে সরে গেল।

পি. রায় ততক্ষণে খোল থেকে ফুরুৎ করে বের হয়ে গদাধরকে কলসী জড়িয়ে বসে থাকতে দেখে বলে—ওটা কি করস রে গদাই, এ্যাই গুপী, বাঘ চইলা গেছে গিয়া। চোখ খোল। হঃ, তগো কারেজ নাই। ধমক দিলাম কইস্যা, আর ওই ব্যাটাও ল্যাজ গুটাইয়া চইলা গেল গা।

পীতু বলে ওঠে—থামবি বাঙ্গাল? কেবল ফুটানি সার। তুই তো খোলে ঢুকে ছিলি।

পি. রায় বলে—নেভার।

রমজান বলে ওঠে—বাতচিত থামান বাবুরা। রাতের বেলায় বাদাবনে মানুষের গলা শোনান দেবেন না। বাঘ তো পাশে পাশেই ঘুরতিছে, বড় বাঘও আছে এখানে। চুপ মারি থাকেন।

ভাঁটার টান ছাড়িয়ে জোয়ার এসেছে। মরা খালের বুক ভরে উঠেছে জলে। রমজান বলে—তাড়াতাড়ি খাল থেকি বার হতি লাগবো নেতাই। চারখানা দাঁড় ফ্যাল।

নোঙর তুলে ওরা কোন রকমে ওই খাল থেকে বের হয়ে আসছে।

গদাধরের দলবল রাতের বেলায় মুড়ি চিড়ে খেয়ে শুয়ে পড়েছে। রাতের অন্ধকারে জমাট আঁধার প্রাচীরের মত বন, তার বুকের খাল থেকে ওরা বের হচ্ছে বড় নদীতে। দাঁড়ের ছপছপ শব্দ ওঠে। নৌকাটা দুলছে তালে তালে, নৌকার গায়ে জলের ঢেউগুলো আঘাত করে চলেছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা জানে না।

হঠাৎ কিসের চীৎকারে ঘুম ভেঙ্গে যায় গুপীর। বাইরে কাদের চাপা গর্জন শোনা যায়। গদাধরকে ঠেলে তুলেছে গুপী। ওরা উঠে বসবার আগেই ছই-এর ঘরের দরজা লাথি মেরে কে যেন খুলে ফেলে ভিতরে এসে হাজির হয়েছে। গর্জন করে ওঠে অন্ধকারে,—ব্যাটাগুলো এখানেই রয়েছে। মদনা, বাঁধ ওগুলোকে। এ্যাই কিতে, শালা শহুরে মাল-গুলো টুঁ শব্দ করলে বল্লমের খোঁচায় কলজে একোঁড় ওফোঁড় করি দিবি।

মশালের আলো হাতে ওরা ঢুকেছে। গুপী, গদাধর, পীতু উঠে পড়ে ওদের দেখে চমকে ওঠে। লণ্ঠের সেই মুষকো লোকগুলোকে ওরা এখানে দেখবে ভাবেনি। পীতু চমকে উঠেছে; মদনাকে সে আগেই দেখেছিল মোল্লাখালির গঞ্জে। কপালের কাটা দাগটার জন্য মদনার মুখখানাকে চেনার অসুবিধে হয় না।

গদাধর শুধোবার চেষ্টা করে—তোমরা কারা?

মোটা লোকটা গর্জে ওঠে—তোদের বাপ। শহুরে টিকটিকিগুলোকে কেটে কুচিকুচি করে গাং-এর জলে ভাসিয়ে দেবো। হলধর নস্করের নাম শুনিসনি?

আ-আমরা ত্-তোমার ক্-কি করেছি য্-যে ম্—মারবে? —গুপীর জিভটা ঘনঘন আটকে যায়।

হলধর গর্জে ওঠে—পিছনে লাগার মজা দেখাবো তোদের, এ্যাই রতন, ওই মোটা তোৎলাটাকে আগে বাঁধ খুঁটির সংগে যেন নড়তে চড়তে না পারে।

মশালের লালচে আলোয় ওদের মুখগুলোয় হিংস্রতা ফুটে উঠেছে। গদাধর, গুপী, পীতেকে ওরা বেঁধে ফেলেছে। পটলা নিরীহ গোছের মানুষ—সে চিঁ চিঁ করছে।

হলধর সর্দার বলে—সব কটাকে এইখানে ফেলে রেখে নৌকাটা টেনে নিয়ে চল বনের আড্ডার দিকে। তারপর এগুলোর বিহিত করবো। হলধরের সংগে চালাকি! লণ্ঠ থেকেই চিনেছি তোদের। এবার বুঝবি মজাটা। এ্যাই ব্যাটা বাউল না? পালের ধেড়ে।

পীতুকে চিনতে পেরে হলধর নস্কর পা দিয়ে একটা খোঁচা মেরে দেয়। কোন রকমে যন্ত্রণা সইবার চেষ্টা করে পীতু।

অন্ধকারে ওরা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। নৌকার মাঝিদের ওরা কায়দা করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রেখেছে বাইরের খোলে আর ভিতরে এরা বন্দী হয়ে পড়ে আছে।

এদের নৌকাটাকে হলধরের দলই দখল নিয়ে ওরাই বনের আরও গভীরে তাদের টেনে নিয়ে চলেছে।

ছইয়ের অন্ধকার ঘরে পড়ে আছে গুপীনাথ, গদাধর, পীতে আর পটলা। হঠাৎ কার ফিস্‌ফিস্ শব্দে ফিরে চাইল। পি. রায় ওদের পায়ের শব্দে বাঁশের মাচার নীচে খোলের মধ্যে সুড়ুৎ করে গলে গিয়েছিল। এবার ওরা চলে যেতে আবার বের হয়ে এসেছে। নীচে থেকে সে-ও দেখেছিল গুপীদের অবস্থাটা।

পি. রায়ের পকেটে একটা ছুরি সর্বদাই থাকে। এয়ার-বন্দুক, ছুরি-টুরি রাখে সে। ছুরি দিয়ে ওদের হাত-পায়ের বাঁধনগুলো কাটতে থাকে। চাপা স্বরে বলে—চুপ মাইরা থাক।

রাত্রি হয়ে গেছে। নৌকাটা থেমে রয়েছে। বোধহয় জোয়ার এসেছে। হলধরের দলের লোকজনও এখন নিশ্চিন্ত। এত সহজে কাজ হাসিল করতে পারবে তারা ভাবেনি। ওরাও খুশীমনে খাওয়া দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে।

আর ওদিককার খোলের উপর হলধর নিজে চিৎ হয়ে পড়ে বিকট শব্দে নাক ডাকাচ্ছে। এ বন জঙ্গল তারই রাজ্য, এখানে সে নিরাপদ। তাই বেশ খানিকটা ধেনো মদ গিলে গভীর ঘুমে মগ্ন। আর দলের লোকজনেরও ক'দিন ক'রাত্রি ধকল গেছে। হলধরকে নেশা করে বেহুঁশ হয়ে যেতে দেখে তারাও এবার সর্দারের পথই নিয়েছে।

পটলা ছই-এর ছোট দরজাটা থেকে উঁকি মেরেও আর কাউকে দেখতে পায় না। আশপাশের নৌকা দুটোতেও সাড়া শব্দ নেই। বড় নৌকার গায়ে বাঁধা ডিঙিগটা জোয়ারের স্রোতে নড়ছে।

পি. রায় তাদের নৌকার মাঝি দুজন আর রহমত মিয়াকে দেখে এগিয়ে যায় সাবধানে। একবার হলধরের বিরাট লাশটার দিকে দেখল। ঘুমের ঘোরে তখন হলধর অচৈতন্য। বিশাল পেটটা নাক ডাকার শব্দে ওঠানামা করছে। পটলা বলে—দেখছিস কি? এখুনি জেগে উঠবে ব্যাটা।

পি. রায় জানে হলধর সর্দার এখন জাগবে না বেশ কিছুক্ষণ। এ নৌকাতে আর কেউ নেই। ওদিকে দড়ি বাঁধা অবস্থায় মাঝি দুজনকে দেখে তাদের দড়িগুলো কাটতে থাকে সে।

গদাধর বলে—ছোট ডিঙিগটায় পালানো যাবে না অন্ধকারে?

রমজান আলীও সায় দেয়—তাই করতি হবে, এখুনিই।

চুপচাপ অন্ধকারে ওই বড় ডিঙিগটা থেকে ওরা নামছে ছোট ডিঙিগটায়। পি. রায় বলে—এ ব্যাটাকেও তোল।

চমকে ওঠে গদাধর—ওই হলধরকে?

পি. রায় বলে—যা কই তা কর। তুইল্যা লইয়া গিয়া পাটাতনের সাথে বাঁইন্দা রাখুম।

গুপীনাথের মাথাতেও বুদ্ধিটা আসে। স্বয়ং ওস্তাদকে তাদের হাতে আনতে পারলে দলের লোকজনও আর কিছু করতে সাহসী হবে না। আর কোন রকমে যদি বেঁধে নিয়ে পালাতে পারে এখান থেকে, বিরাট একটা কাজ করতে পারবে।

পি. রায়ের কথায় গুপীও সায় দেয়—ঠ্-ঠিক ব্-বলেছিস্। ধর, ধর গদাই। ও মিয়া, ওঠাও ওকে।

বিশাল কাঠের গুঁড়ির মত পড়ে আছে হলধর সর্দার, কোনো হুঁস-জ্ঞান নেই। পীতে বলে—যদি জেগে ওঠে?

পি. রায় কর্মটা করে রেখেছে। পাটাতনের নীচে গলে গিয়ে দেখছিল হলধরকে। কাজ সারার পর এদের বেঁধে-ছেঁদে নৌকায় ফেলে রেখে হলধর এক হাঁড়ি মদ আর মাছ পোড়া এনে একা নিশ্চিন্তে গেলবার জন্য এই নৌকায় এসে বসেছিল। আর পি. রায় এই ফাঁকে পাটাতনের নীচে রাখা ওই মদের হাঁড়িটায় ওদের দোকান থেকে আনা ঘুমের ট্যাবলেট ফেলে দিয়েছে গোটা দুয়েক। সেগুলোও মদের সংগে গলে যায়, আর হলধর নস্কর নিশ্চিন্ত মনে সেই দ্রব্যগুলো গেলবার পরই নেতিয়ে পড়েছে। একটাতেই সারা রাত ঘুমোয় মানুষ, দুটোতে ঘুম আরও গভীর হয়। আর চারটে খেলে সেই ঘুম আর ভাংগে না কখনও। দুটো বড়ির কাজ শুরু হয়েছে।

পি. রায় বলে— জাগবো না এখন। ধর।

ছোট্ট ডিঙিগখানার পাটাতনে কোন রকমে মাঝিদের সাহায্যে হলধরের বপুখানা নামিয়ে দাঁড় দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখছে। ছোট ডিঙিগখানা জোয়ারের টানে অন্ধকারে বনের ঘন গাছ গাছালির নীচে দিয়ে ছুটে চলেছে লোকালয়ের দিকে। দাঁড় টানার উপায় নেই। জলে শব্দ পেলে ডাকাতের দলও জেনে ফেলবে।

দূরে অন্ধকারে কালো বিন্দুর মত নৌকাগুলোকেও

আর দেখা যায় না। এরা সাবধানে দাঁড় ফেলে এইবার। ডিঙিগটা জোয়ারের টানে আর দাঁড়ের জোরে এইবার গতি-বেগ পেয়ে ছুটে চলেছে।

এতক্ষণ পালাবার পথ ভাবছিল তারা। বুঝেছিল হলধর নস্করের ওই দলবল তাদের সব কটাকেই শেষ করে অথৈ গাং-এর জলে ফেলে দেবে নাহয় দুর্গম বনে ফেলে আসবে। কেউ তাদের কোন খবরও পাবে না। তাই ওদের হাত থেকে পালাবার চেষ্টাই করতে হবে। তাই ওই ছোট ডিঙিগটাতেই ওরা বের হয়ে পড়েছিল বড় গাং-এ।

এবার খেয়াল হয় ওদের, তাড়াতাড়িতে খাবার জলও সঙ্গে নেয়নি, খাবারও নেই সঙ্গে। কোন দিকে যাবে তাও জানে না। অন্ধকারে দিশেও পায় না তারা।

রমজান মিয়া বলে—কোন দিকে চলতেছি ঠাওর পাই না বাবু। বড় গাং-এর বাতাসও বইতিছে।

ডিঙিগটা লাফাচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় মাথায়। এবার ভয় হয় ওদের, কোন অকুলে চলেছে জানে না তারা। মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়ে ওরা এইবার গহন বনে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নাহয় নৌকাডুবিতেই শেষ হয়ে যাবে।

তবু মাঝি বলে—নৌকা রাখি চল, বাঁ হাতের ট্যাকের মাথায় বড় কেওড়া গাছটার নীচে গেলি পথের হদিশ মিলতি পারে।

সকাল হয়ে আসছে। রাতের অন্ধকারে সুন্দরবনের গহন বনে পথ হারানো স্বাভাবিক ঘটনা। পুরনো মাঝি রমজান মিয়াও তেমনি পথ হারিয়ে বেপথে চলে গেছে। এখানকার সব খালই প্রায় এক রকম, আর গাছ গাছালিও সেই পাঁচ সাত ধরনের! তাই পথ চেনাও মুস্কিল। রাতের অন্ধকারে সব কিছুই এক রকম দেখায়।

খোলা নৌকায় ক'টি প্রাণী বসে আছে। ভোরের বন। মস্ত আকাশ রঙে রঙে ভরে গেছে। রাজ্যের পাখীরা কলরব করে, বাতাস ওঠে খলসে, কেওড়া ফুলের মিষ্টি সুবাস। একদল হরিণ তীরের সবুজ ঘাস ঢাকা জায়গাটা থেকে ওদের দিকে চেয়ে আছে কালো ডাগর চাহনি মেলে। নৌকার মানুষগুলো ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে শেষ রাতের তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়েছে। ওদের সামনে আর বাঁচার পথ নেই। গদাধরের মনে হয়, আর কলকাতার শ্যামবাজারে কোনদিন ফিরতে পারবে না, তিলেতিলে এই গহন বনেই শেষ হয়ে যাবে।

পি. রায় বলে—এত কইরাও বাঁচা যাইব না গদাই।

পটলার গলা শুকিয়ে আসছে। খিদেতে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি জ্বলছে। রাগে গরগর করতে করতে পটলা বলে—ওই হলধর ব্যাটাই এসবের মূল। ওটাকে বাঘের পেটে দিয়েই মরবো তবে।

রমজান আলী জেগে উঠেছে। সন্ধানী দৃষ্টিতে সে ওই কেওড়া গাছ, হেতালের বন আর ওপাশের খালটার দিকে চেয়ে থাকে। যেন স্বপ্ন দেখছে বোধহয়। তবুও ঠাওর করার চেষ্টা করে। রমজান আলীর চোখে এতক্ষণ যে সুন্দরবনের ভুলো শয়তানের ধুলো-পড়া লেগেছিল। এই বন ওদের ধারনায় জিন, পরী আর অপদেবতার রাজ্য। রাতের অন্ধকারে সেই অপদেবতার দল মাঝিদের পথ ভুলিয়ে অরণ্য-গভীরে নিয়ে যায়, নাহয় ভাঁটার টানে তাদের ঠেলে দেয় অকুল সমুদ্রে। তারা আর ফেরে না।

রমজান মিয়া এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে, মনে হয়, তার চোখের সামনে চেনা জগৎ। সেই খাল, বন, ওই হলুদ হেতাল গাছের জঙ্গল, সবই চেনা। উল্লাসে চীৎকার করে ওঠে রমজান—আল্লা মেহেরবান! এই বদর ওঠ, ঘরের কাছে এসে গেছি। রাতভোর কেওড়াগুতে পড়ি রইলাম। তবু পথ চিনতি পারি নাই। ওঠ—।

ওরা দিশে ফিরে পেয়েছে। পটল শুধোয়—কোথায় রয়েছি মিয়া?

রমজান খুশিভরা সুরে বলে—ঘেরের ধারেই এসেছি। আর ভয় নাই বাবু। খালের মধ্যি গেলেই আমাদের নৌকা-বসত, ফরেস্টের বোট, গার্ডদের বোট, সবই পাবেন। বদর-গেরাপি তোল।

ওরা এসে পড়েছে বনের মধ্যে আশ্রয়ের কাছেই। নোঙর তুলে নৌকা বাইতে থাকে জোরে জোরে। খালের মধ্যে এগিয়ে চলেছে তারা।

সুন্দরবনের এক একটা অংশকে সরকারী ভাষায় বলা হয় 'ব্লক'। এমনি কুড়িটা ব্লকে এই অরণ্যকে ভাগ করা হয়েছে। এক একটায় কাঠ কাটাই হয় কুড়ি বছর অন্তর। এবার এই অঞ্চলে কাঠ কাটানো হচ্ছে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিস আসে নৌকায়, তাতেই তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। গার্ড, বন্দুকধারী সেপাই, কর্মচারীরাও থাকে। আর আসে বিভিন্ন কাঠমহা-জনদের ছোট, বড় হাজার দু'হাজার মণি মাল টানা নৌকা, লোকজন কাঠুরিয়ার দল। বনের মধ্যে কোন খালে তারা সারবন্দী নোঙর করে থাকে। ছোট ছোট ডিঙিগ নিয়ে কাঠ কাটাই করে খালের বুকে বড় নৌকায় বোঝাই করতে থাকে। তাই লোকজনের দেখা মেলে এখানে।

নৌকাটা বেয়ে ওরা চলেছে ওই খালের বুকে নৌকা-গুলোর দিকে। হঠাৎ এদের কলবর, চীৎকার আর কথা-বার্তার শব্দে পাটাতনে বন্দী হলধর নস্করের ঘুম এবার ভেঙ্গে যায়। চিৎ হয়ে পড়ে পড়ে একবার ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে ঠিক ঠাওর করতে পারে না, কোথায় এসে পড়েছে। তাই আড়িমুড়ি ছেড়ে উঠতে গিয়ে সর্বাঙ্গে শক্ত নৌকার কাছির কঠিন বাঁধন দেখে হুঙ্কার ছাড়ে হলধর—কি ব্যাপার রে? কোন ব্যাটা মশকরা করেছে মদনা? ব্যাটার গর্দান নেব।

ওর খ্যানখ্যানে গলার স্বরে এদের চমক ভাঙ্গে। ওরা যেন খুশির চোটে এই আড়াই মণি লাশখানির কথা ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ ওর চীৎকারে গুপী ধমকে ওঠে—এ-এ্যাই হলধর, চ্-চুপ মেরে থাক।

হলধর পড়ে পড়েই গর্জায়—চোপ্, কুত্তা কোথাকার। হলধর নস্করকে চিনিস না। বাঁধন খুলে দে বলছি।

পি. রায় তফাৎ থেকে দেখে নেয় বাঁধনটা শক্ত আছে কিনা, দড়ির বাঁধন কষে বসেছে, হলধরকে তাই শোনায় পি. রায়—দিমু অনে সর্দার। ঘুঘু দেখছ এ্যাদ্দিন, এইবার ফাঁদখান দ্যাখ।

গদাধর বলে—নগদ পাঁচ হাজার টাকা প্রাইজ পাওয়া যাবে পি. রায়, পুলিশের হাতে তুলে দিলে। তারপর কল-কাতায় গিয়ে এবার জমিয়ে জলসা করবো।

পীতুও সাহস ফিরে পেয়েছে। তাই সে বলে—যা বলে-

ছিস মাইরী। সেবার ট্যাকা দিতে পারিনি, আর্টিস্টরা কাট্ মারলো। উঃ, চেয়ার ভেঙ্গে, প্যান্ডেলের খুঁটি তুলে তুল-কালাম কান্ড বাধালো পাড়ার মাস্তানের দল। এবার নগদ ক্যাস দিয়ে বাঘা বাঘা আর্টিস্ট এনে জলসা করবো।

হলধর নস্কর গর্জাচ্ছে—খুলে দে বলছি। এ্যাই!

ততক্ষণে নৌকাবসতে সোরগোল পড়ে গেছে। ফরেস্ট অফিসার, বিট অফিসার, গার্ডরা এসে পড়েছে। সুন্দরবনের বাঘকে ওই ক'টা ছেলে যেন জ্যান্ত বন্দী করেছে। বাওয়ালীর দল ছুটে আসে। বাদাবনের ত্রাস ওই নস্কর। কত নৌকা ডাকাতি করে যাত্রীদের মেরেছে তার ঠিক নেই।

ফরেস্ট অফিসার বলেন—গার্ড ডিউটি থাকুক, ওকে পাহারায় রাখতে হবে। আর পেট্রল বোট যাচ্ছে থানায় খবর দিতে। তারা এসে ওকে নিয়ে যাবেন।

হলধর গর্জাচ্ছে—থানা পুলিশে দিলে তোদের চিবিয়ে খাবো।

পি. রায় বলে—এখন চিৎ হইয়া বান্দাই থাকেন নস্কর মশাই। একটু ত্যাল কমুক, তারপর ছাড়ুম।

পটলের মামারও বেশ কয়েকখানা বড় বড় নৌকা, ডিঙিগ আছে এখানে। কাঠুরিয়ার দল থাকে ওই সব বড় নৌকার পাটাতনে ছই-এর মধ্যে। নৌকাতেই বড় বড় উনুনে ওদের রান্না হয়, আর কাঠুরিয়ার দল সকালে স্নান সেরে কাচা কাপড় পরে পান্তা ভাত খেয়ে নেয়, আর হাড়িতে ভাত, তরকারী আর খাবার জল নিয়ে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বনের মধ্যে যায়। অস্ত্র বলতে নৌকার বৈঠা আর গাছ কাটার কুড়ুল। বনের মধ্যে এলোপাথাড়ি গাছ কাটার নিয়ম নেই। বন-বিভাগের লোকেরা যে যে গাছে হাতুড়ি মেরে ছাপ দিয়ে আসবে, সেই সব মার্কা মারা গাছই কাটতে থাকে তারা। ঘন দুর্ভেদ্য বন, মাটিতে জোয়ারের জল ঠেলে ওঠে, তাই পলি কাদায় থিকথিক করছে সারা বন। আর নোনা জলের গাছের শিকড় থেকে বের হয় সরু সরু ধারালো মূল। এদের বলা যেতে পারে নাসিক্য মূল। শূলের মত ধারালো বলে চলতি কথায় শুলো বলেই পরিচিত। অসাবধানে এর উপর পা পড়লে গেঁথে যাবে। পিছলে পড়লে সারা দেহ এই শুলোর উপর মহাভারতের ভীষ্মের শরশয্যা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

পি. রায় বলে—বনের ভিতর যামু না? এত কষ্ট কইরা আইলাম।

গুপীও তৈরী হয়েছে। রমজান আলীর ডিঙ্গিতে চলেছে ওরা চারজন। আগে-পিছে ছোট খাল দিয়ে চলেছে কাঠুরিয়াদের ডিঙিগগুলো। সারা বনকে ওরা ভাবে মা বনবিবির পীঠস্থান বলে। তাই স্নান করে কাচা কাপড়ে মা বনবিবিকে স্মরণ করে তবে গাছে কোপ দিতে নামবে।

জয়ধ্বনি ওঠে বনে বনে—মা বনবিবির জয়। জয় মা বনবিবি।

ডিঙিগ থেকে ওরা বনের বুকে নামলো। পি. রায়, গুপী, গদাধর, পীতু আর পটলা চলেছে। ঘন বনের মধ্যে গরাণ, কেওড়া, বাইন গাছের চারাগুলো এত ঘন যে তা ঠেলে যাওয়া যায় না। কোথাও ছোট তাল গাছের চারার মত হেঁতাল বন। নীচে দিনের আলো ঢোকে না। রমজান আলী বলে—বাঘের রাজ্যি বাবু এই হেঁতাল বন। হলুদ কালো পাতার রঙে বড়শিয়াল এখানে রঙ মিলিয়ে ঘুমো-লুম পড়ি থাকে।

ঘন বনের মধ্যে কয়েক ফিট ধরে জায়গার গাছগুলো কেটে এরা সরু গলিপথ করেছে। সেইটুকু দিয়ে বনের মধ্যে যাতায়াত করে কাঠগুলো বের করে আনার জন্য।

বনে কুড়ুলের শব্দ ওঠে—ঠক্-ঠক্-ঠক্। স্তব্ধ অরণ্য। ওই নীরবতার বুকে জেগে ওঠে মানুষের কন্ঠস্বর আর লোভী কুঠারের শব্দ। প্রকৃতির শান্ত বুকে ওরা যেন চোরের মত সব কিছু লুট করে নিয়ে যেতে এসেছে। সশব্দে গাছগুলো উপড়ে পড়ে। বাতাসে ওঠে বনবালার দীর্ঘশ্বাস। মানুষ প্রকৃতির বুক থেকে এমনি করে বনকে, তার মাটির অতলের কয়লা, লোহা, পাথর ইত্যাদি সম্পদে জবর-দখল করে রেখেছে নিজেদের স্বার্থে।

রমজান আলী কান পেতে কি শুনছে।

—কু-উ-উ-উ...........!

কোন প্রাণীরই ডাক বোধহয়। ক্রমশঃ বনের স্তব্ধতার মাঝে ওই ডাকটা আরো স্পষ্ট, আরো তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। রমজানও তেমনিভাবেই সাড়া দেয়—কু-উ-উ-উ!

দুটো ডাক পরপর উঠছে। একজন কেউ ডাকছে, আর অপরজন সাড়া দিচ্ছে। কোথাও এখানে একটা বিপদের কিছু ঘটেছে।

রমজান বলে—ইরফান জলদি চল উত্তুরের বাদায়। চোট হইছে বোধহয়। ওদেরও যাতি বল।

ঠিক বুঝতে পারে না গদাধরের দল, তবে মনে হয়, বনে একটা কিছু ঘটেছে। পাঁচ ছ'খানা ডিঙিগ নিয়ে ওরা সরু খাল বেয়ে চলেছে বনের দিকে। ডাকটা আরও স্পষ্ট শোনা যায়। এরাও সাড়া দিয়ে চলেছে সেইভাবে।

সুন্দরবনে কেউ দূর থেকে কারোর নাম ধরে ডাকে না। মনে হয়, এটা সংস্কারই। হয়তো বা বাঘকে জানাতে চায় না মানুষের অস্তিত্বের কথা। তাই অন্য কোন প্রাণীর ভাষাতেই সাড়া দেয়। আদিম অরণ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষও বোধহয় এমনি প্রাণীর মতই শুধু শব্দ করে ভাবের আদান-প্রদান করতো। ভাষার ব্যবহার তখন শেখেনি তারা। আজ সেই আদিম আরণ্যক জগতে তাই যেন মানুষও সেই স্বভাবেই ফিরে যায়।

বেশ একটু ফাঁকা চটান মত জায়গা। গাছ গাছালির ভিড় এখানে কম। একটা ডিঙিগ নৌকায় একজন লোক চীৎকার করছে, ওদের আসতে দেখে লোকটা বলে—বড়-শিয়ালে নেছে বাবু মামুরে।

সুন্দরবনের কাঠ ছাড়া আর একটা সম্পদ আছে। সেটা হচ্ছে মধু আর বিরাট মৌচাক থেকে তৈরী আসল মোম। তাতেও বেশ রোজগার হয়। তাই বেশ কিছু লোক পারমিট নিয়ে, অনেকে লুকিয়েই সুন্দরবনে যায় মধু আর মোম সংগ্রহের কাজে।

কাঠমহাজনদের যেখানে কাজ হয় বনে, অনেক নৌকা লোকজন থাকে। ফরেস্টের লোকজনও বন্দুক নিয়ে ঘোরে আর বাঘের ব্যাপারে তারা সাবধান থাকে, তাই বাঘের শিকারে তারা পরিণত হয় কম। বাঘের সহজ শিকারে পরিণত হয় ওই মধু বাওয়ালী আর জেলেদের দল। ওরা বনে মধু আর জেলেরা মাছ ধরার ব্যাপারে বনের নির্জনতম জায়গায় যায়, নদীর ধারে নামে জাল ফেলতে, বাঘও দু-একদিন ওদের উপর নজর রেখে সুবিধামত ওদের ঘায়েল

করে। মধু সংগ্রাহকদের বিপদ পদে পদে।

লোকটা কাঁদছে—মামু আর ফিরব না বাবু। ইয়া বড় বাঘটা চখের নিমিষে থাবা মারি তুলি লই গেল ওইখান থেকি।

ওর কাপড়খানা ডালে লেগে টুকরো হয়ে ঝুলছে, গাম-ছাটায় চাপ চাপ রক্ত। নরম পলি মাটিতে ওদের পায়ের ছাপ মাখানো। জায়গাটায় একটা কান্ড ঘটে গেছে তার চিহ্ন এখনও রয়েছে।

মধু বাওয়ালীর দলে লোকও বেশী থাকে না। তিন চারজন থাকে ডিঙ্গি নিয়ে। বনের যেখানে সেখানে ওরা নামে মৌচাকের সন্ধানে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখে, মৌমাছির দেখা পেলে, তারই পেছনে ছোটে বন-বাদাড় ভেদ করে। একজন নজর রাখে মৌমাছির উপর, অন্যজনের হাতে দা আর ধামা, অন্যজন গোল পাতার মশাল হাতে চলেছে। মৌচাকের সন্ধান পেলে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি-গুলোকে সরিয়ে দিয়ে দা দিয়ে মৌচাকটা কেটে ধামায় পুরে নৌকায় ফিরে তার থেকে মধু বের করে।

এরাও তেমনি ছুটেছিল বনের মধ্যে, বাঘটা এসে ধামা হাতে লোকটাকে চোট করার চেষ্টা করতে সে ধামা দিয়ে বাঘের মুখটা ঠেসে ধরে হাতের দা দিয়ে কোপ দিতে থাকে। বাঘটাও ওর অতর্কিত আক্রমণে তাকে ছেড়ে দিয়ে মৌমা-ছির পিছনে ধাবমান লোকটাকে এক ঝটকায় ঘাড় ভেঙ্গে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

রমজান আলী ভাবনায় পড়েছে। বনের বাঘটা যদি মানু-ষের রক্ত-মাংসের স্বাদ পায়, সে দুর্বার হয়ে উঠবে, আরও মানুষ মারার চেষ্টাই করবে। আশেপাশেই বোধহয় বনের মধ্যে রয়েছে বাঘটা। ওর চাপা গোঁ গোঁ আওয়াজ শোনা যায়।

বনের আরও কাঠুরিয়া, ফরেস্ট গার্ড দু'চারজন এসে পড়েছে। তারাই বলে—মাড়টারে ছাড়াতে হবে, চল।

পি. রায় বলে— আমার শরীরটা ভালো লাগতাছে না।

গুপী ওদের সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী। গদাধরও বলে—চল্ ওদের সঙ্গে।

পীতু আর পি. রায় বেঁধে বসেছে।

রমজান মিয়াই বাধা দেয়—ডর লাগলে যাবেন না বাবু। তবে নৌকায় থাকাও ঠিক না। বাদা বনের বাঘ রাগি গেলে জলে নামিই কান্ড বাধাতি পারে। বরং গাছটায় গাছাল দিই থাকেন।

বড় কেওড়া গাছেই উঠে পড়ে দুজনে। পি. রায় চলেছে উপরের ডালে, নীচের একটা ডালে পীতু। পি. রায়ের হাতে সেই এয়ার গান। আর কাঁধে ঝুলছে ওয়াটার বট্‌ল্।

পি. রায় গাছাল দিয়ে চারিদিকে দেখে বলে—গুড সিনারি। বনে ঢুইকা কি করবি? এখানে আয় গুপী, ফাইন লাগবো।

গুপী গজরায়—স্-সিনারি দ্যাখ তুই। চ্-চাদরখানা দিয়ে বাঁধ, নইলে প্-পড়ে যাবি ত্-তাল পাতার স্-সেপাই। আবার বন্দুক আছে। ল্-লড়তে পারে না ব্-বন্দুক ঘাড়ে। ব্-বসে থাক।

বনের মধ্যে টিন ক্যানেস্তা পিটিয়ে, কলরব করে, ক্যাকার ফাটাতে ফাটাতে ওরা চলেছে। মশালের আগুন জ্বলছে। বিকট শব্দে বন কাঁপিয়ে লোকগুলো বনে ঢুকলো, বাঘের মুখ থেকে ওর আহার সেই মানুষের মৃতদেহটা ছিনিয়ে আনতে হবে।

গহন বন, চলার উপায় নেই। জল, কাদা জমে আছে আর আছে শুলো। পায়ে বিঁধে যেতে পারে। সাবধানে চলেছে ওরা। বাঘটা শিকার ধরে ঘাড়ে ফেলেনি। ওই শুলো গাছ-গুলোর উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে, আর দেহটায় বিঁধেছে শুলোগুলো। রক্ত-মাংসের টুকরো পড়ে আছে।

সেই দাগ ধরে ওরা চলেছে গহন বনের মধ্য দিয়ে, কয়েকটা সাপ ওদের শব্দে ডাল থেকে ফণা তুলে গজরাচ্ছে, কোনটা সরে পালালো। এই অরণ্যের পদে পদে বাধা আর মৃত্যু। প্রকৃতি তার গহনে মানুষের আগমন পছন্দ করে না। তাই বাধা দেয় প্রতি পদক্ষেপে। তবু মানুষ আসে এখানে। ওদের চীৎকার ওঠে স্তব্ধতা নিদীর্ণ করে। ওঠে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ আর ক্র্যাকারের শব্দ।

গাছের উপর বসে আছে দুটি প্রাণী, পি. রায় আর পীতু। ক্রমশঃ বুঝতে পারে এই গাং-এর ধারে জনমানবহীন অরণ্যে তারা দুজনে যেন হারিয়ে গেছে।

কয়েকটা বাঁদর হঠাৎ তাদের বৃক্ষরাজ্যে অন্য কোন শ্রেণীর নবাগত জানোয়ার দুটিকে দেখে একটু বিস্মিত হয়। দেখছে তারা। ক্রমশঃ আরো কয়েকটা বাঁদরও এসে জুটে যায়। তাদের মধ্যে চ্যাংড়া গোছের ক'টা বাঁদর সাহসে ভর করে গাছে এসে উঠেছে। এ তাদের রাজত্ব, এখানে তাদের জায়গা বেদখল করে কেউ গাছে থাকবে এটা সহ্য করবে না তারা।

দাঁত বের করে গর্জায় ওরা। পি. রায় ধমকে ওঠে—এ্যাই। এ্যাই ব্যাটা।

ফচকে বাঁদরটা এগিয়ে এসে ওর জামাটা ধরে টান দেয়, আর ধারালো নখে লেগে টেরিলিনের পাঞ্জাবীটা ফ্যাঁস করে ফেঁসে যায়। ওদিকে আর একটা ধেড়ে বাঁদর পীতুর সামনের ডালে বসে দাঁত বের করে ধমকে ওঠে—ফ্যাঁচ! ফ্যাঁচোর ফ্যাঁচ!

অর্থাৎ—কেন এসেছো এখানে? ইয়ার্কি পেয়েছো?

পীতু মুখ ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে জবাব না পেয়ে ধেড়ে বাঁদরটা বিরক্ত হয়ে পীতুর কানটা টেনে ধরেছে। পীতু চীৎকার করছে—এ্যাই, এ্যাই—।

হঠাৎ গাং-এর দিকে কিসের শব্দ পেয়ে চাইল। ঘন গাছের ঝোপের আড়ালে রয়েছে তারা। তাদের দেখা যায় না। তবু পি. রায় একটা সরু ছিপ মত আসতে দেখে চাইল। দেখেই চিনতে পারে সে। আর বাঁদরগুলো ছিপে করে ওই লোকগুলোকে আসতে দেখে এদের উপর আক্রমণ বন্ধ রেখে সরে গেল এদিক ওদিকে।

পি. রায় বলে ওঠে—ডাকাতের দল না?

পীতুও দেখেছে তাদের। ছিপে রয়েছে গোটা দশেক লোক, আর সেই মদনাও বসে আছে। ওদিকে খালি ডিঙ্গিটা দেখে মদনা বলে—শালারা এইখানেই কাছাকাছি কোথায় সর্দারকে এনেছে।

পি. রায়ের গলা শুকিয়ে গেছে ভয়ে। পীতু কাঁপছে ঠক ঠকিয়ে। নেহাৎ গায়ের চাদরগুলো দিয়ে ডালের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল, নইলে হাত-পা ছেড়ে ছিটকেই পড়তো বোধহয়।

সুন্দরবনের বাঘের ভয়ে গাছে উঠেছিল তারা, কিন্তু

এবার তাদের সামনে এসেছে বাঘের চেয়েও হিংস্র একদল মানুষ। মদনারা খুঁজছে তাদের সর্দারকে। আর এসময় যদি ওদের দেখতে পায়, হাতের ওই ধারালো বল্লম দিয়ে ফালা ফালা করে দেবে। দুটি প্রাণী নীরব ভয়ে জমাট বেঁধে গেছে।

মদনার দল বনে নেমে এগিয়ে আসছে এই দিকেই।

বনের বাঘকে বলা হয় জেন্টেলম্যান অব দি ফরেস্ট। কিন্তু একমাত্র সুন্দরবনের বাঘ ভারতের অন্য সব বনের বাঘের থেকে স্বতন্ত্র ধরনের। বাঘ সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না। এড়িয়ে যায়। মানুষখেকো হয়ে উঠলেই তখন সে মানুষই মারে। নাহলে মানুষকে দেখে ও সরে যায়। কিন্তু সুন্দরবনের প্রতিটি বাঘই মানুষখেকো। মানুষ দেখলেই আক্রমণ করবে সে।

ওরা সাবধানে চলেছে। বাঘটার গর্জন শোনা যায়—গর্-র্-র্-র্।

হুঁশিয়ার! রমজান মিয়ার সাবধানী হাঁক শোনা যায়। ক্যাকার ফাটছে। দেখা যায় খালের ধারে বাঘটা ওই রক্তাক্ত দেহটাকে আগলে বসে আছে। চোখে মুখে রাগের জ্বালা, আর তাড়া খেয়ে গর্জাচ্ছে।

এরাও হুঙ্কার করে। মশালের আগুন জ্বলছে। বিকট শব্দ ওঠে। বাঘটা বেগতিক দেখে মুখের আহার ফেলে লাফ দিয়ে খালের ওপারে চলে গেল। গর্জাচ্ছে সে। আর তাড়া খেয়ে আবার বন ভেদ করে চলেছে সেই ডিঙিটার দিকে, যেখানে একটা মানুষ মেরেছিল সেইদিকেই। ওর মনে হয়—একটা গেছে, আরো মানুষ মিলতে পারে সেখানে। আবার খাবার পাবে। এই লোভে বাঘটা ছুটছে সেইদিকেই।

মদনার দল এগিয়ে আসছে এই গাছটার দিকেই। উপরের দিকে নজর পড়লেই দেখতে পাবে ওদের দুটিকে। তারপর কি করবে ওই ডাকাতের দল তা ভাবতে পারে না পি. রায়। হঠাৎ বন কাঁপিয়ে বিকট হুঙ্কার শোনা যায়। বাঘটা বনের মধ্যেই একসঙ্গে বেশ কয়েকটা মানুষকে দেখে হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। মদনা চমকে ওঠে। বিরাট বাঘটার মুখে রক্তের দাগ, আর ক্রুদ্ধ বাঘটা মাটিতে গুঁড়ি হয়ে বসে ল্যাজ নাড়ছে। জানে ওরা, এইবার লাফ দিয়ে পড়বে তাদের উপরই।

ডাকাতদের মধ্যে এইবার চমক জাগে, বাঘটা গজরাচ্ছে। মদনার দলও এই ফাঁকে দৌড়তে থাকে গা-এর দিকে। ছিপ খানায় উঠছে তারা। বাঘটাও শিকার হাতছাড়া হতে দেখে লাফ দিয়েছে। সবাই ওরা উঠে পড়েছে, একটা লোক তখনও দৌড়চ্ছে। বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্য তখন মরীয়া হয়ে লাফ দিয়েছে নদীর জলেই।

বাঘটা নিষ্ফল আক্রোশে গর্জাচ্ছে। নদীতে লাফ দেওয়া মাত্রই জলে আলোড়ন জাগে। একটা কুমীরের লম্বা মুখটা জেগে ওঠে। লোকটা জলে পড়ে আর্তনাদ করছে। কিন্তু কুমীরটা তীব্রবেগে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে ধরে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে হাঁ করেছে, তার মুখের মধ্যে পড়তেই কুমীরটা তাকে নিয়ে তলিয়ে গেল।

বাঘ গর্জাচ্ছে, আর মদনার দল চোখের সামনে ওই দৃশ্য দেখে শিউরে ওঠে। ভয়ে পালাচ্ছে তারা।

কতক্ষণ কাঠ হয়ে বসেছিল গাছে তা জানে না পি. রায় আর পীতু। ওদের হুঁসও নেই। হঠাৎ চেতনা ফেরে ওদের কলবর শুনে। বন থেকে ফিরছে ওরা। নীচেই মাটি খুঁড়ে কবর দেবে মৃতদেহটাকে।

এ্যাই!—পীতুর খেয়াল হয়।

গুপী ধমকায়—নেমে আয় গাছ থেকে। ও কিরে পীতে? সারা গা-মাথায় কি লেগে তোর? এ্যাঁ?

ওদের ধরাধরি করে নামিয়ে এনে দৃশ্যটা দেখে হাসাহাসি পড়ে যায়। পি. রায়ের প্যান্টের রঙ বদলে গিয়ে বাসন্তী রঙের হয়ে গেছে। আর নীচের ডালে ছিল পীতু, পি. রায় বাঘ আর ডাকাত দেখে ডালে বাঁধা অবস্থাতেই প্রাকৃতিক কর্ম সেরে ফেলেছে ভয়ে। সেই বস্তুগুলো পড়েছে পীতের গায়ে, মাথায়, দুর্গন্ধ ছাড়ছে।

পীতুও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গর্জে ওঠে—তোকে শেষ করে দেবো। এই তোর সাহস? যতো ফুটানি।

পি. রায় ঢোঁক গিলে বলে—তর হইছে কি? চটস্ ক্যান?

বাঘটা শিকার ফসকে যেতে রেগে উঠেছে। বনে বনে তার গর্জন শোনা যায়। রমজান মিয়া বলে—এখানে বেশীক্ষণ থাকাডা ঠিক হবে না বাবু। কাজ কাম সেরে চলেন জলদি।

ওরা কোন রকমে সেই মৃতদেহটাকে গোর দিয়ে একটা গাছের ডালে ছেঁড়া লুঙ্গিতে কিছু চাল একটা বাতিল মাদুর টঙিয়ে রেখে এল।

পটলা দেখছে ওই ব্যাপারটা। সঙ্গের লোকজনের চোখ ছলছল হয়ে ওঠে। গদাধর শুধোয়—এগুলো দিচ্ছো কেন রমজান? ওই চাল, লুঙ্গি, মাদুর?

রমজান কেন, বাদাবনে সব বাওয়ালি, মাঝি, কাঠুরিয়াই জানে এর অর্থ। গহন নির্জন বন। জনমানব থাকে না এখানে।

রমজান বলে—আপনজনকে শেষ বিদায় জানিয়ে যায় বাবু, তাই ওর জন্য রেখে যায় ক্ষুধার অন্ন, পরণের একটু বস্ত আর ওই বিশ্রামের জন্য একটু বিছানা।

বাদাবনের নির্জন গাং-এর ধারে কোন গাছের ডালে দেখা যায় ওমনি ময়লা ন্যাকড়ার পুঁটুলি কাপড় বাঁধা। কোন হতভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিণতির কাহিনীই ফুটে ওঠে ওই সংকেতে। পথচলতি কোন মাঝি, বাওয়ালিও সাবধান হয়, বাঘের নিশানা পেয়ে।

অবশ্য সারা সুন্দরবন অসংখ্য ছোটবড় দ্বীপের সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছে। এগুলোর চারদিকে ছোটবড় নদী, সমুদ্রের খাঁড়ি। বাঘও তেমনি চালাক। এক দ্বীপেই থাকে না তারা। শিকারের সন্ধানে ওই বড় বড় নদী সাঁতরে পার হয়ে এখানে সেখানে যাতায়াত করে।

রমজান বলে—বাঘ তো করেই বাবু, হরিণ অবধি এতবড় নদী সাঁতরে পার হয়ে যায়।

ওরা ফিরছে নৌকা বসতের দিকে। সবাই কেমন চুপ চাপ। ওই মৃত্যুর ভয়টা এদের মনেও গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। তখনও বাঘের হাঁকাড়ি শোনা যায়।

পি. রায় আর পীতু চুপ করে বসে আছে নৌকায়। গদাধর, পটলা আর গুপীকে কথাটা বলা হয়নি। পীতু সন্ধান করছে বিস্তীর্ণ নদীর বুকে, কোন খালের মধ্যে মদনা ডাকাতের ছিপটা দেখা যায় কিনা।

পীতু বলে ওঠে—ব্যাটারা এখানেও এসেছে পটলা। ওই হলধরের চ্যালারা।

পটলা কিছু বলার আগেই গুপী শুধোয়—ক্-কোথায় তারা?

পি. রায় এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল মুখ বুজে। গুপীর কথায় জানায় ব্যাপারটা।

—ছিপ লইয়া সর্দারের খোঁজে আইছে মনে লয়। একটারে গাং-এ কুমীরে সারছে।

গুপীর সাহস বেড়ে গেছে। বনে ঢুকে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গে মোকাবিলা করে এসেছে। এবার ওই ডাকাতগুলোকেও দেখবে সে। নেহাৎ বেকায়দায় গুপী মিত্তিরকে ধরে ফেলেছিল তারা। গুপী বলে—ব্-বাকীগুলোকে আমরাই স্-সারবো।

পীতুর ভয় যায় না। সে বলে—গতিক ভাল নয় রে।

গদাধরও সন্ধানী চোখ মেলে দেখছে চারদিকে। বাদাবনের গাং-এ কুমীর, কামট, বনের ভিতরে বাঘ, সাপ-এর দৌরাত্ম্য, আর তার সঙ্গে জুটেছে ওই হিংস্র ডাকাতগুলোও। পীতু বলে—এমন ফেরে পড়বো জানলে আসতাম না।

গুপী ধমকে ওঠে—ন্-ন্-নেমে যা তাহলে।

পি. রায় প্রাকৃতিক কর্ম সেরে একটু হাল্কা হয়েছে। তাই জানায় সে—পীতেটা নাম্বার ওয়ান কাওয়ার্ড।

পীতু পি. রায়ের ওই কান্ডের পর তার উপর মনে মনে চটে ছিল। এবার ওর ওই মন্তব্যে গর্জে ওঠে—সাট্ আপ্—বাঙ্গাল কোথাকার।

গদাধর বলে থামবি তোরা? মাথা ঠান্ডা কর, বাদাবন থেকে ফিরে গিয়ে শ্যামবাজারের রকে বসে লড়বি। এখানে নয়।

ওরা আপাততঃ চুপ করলো।

বনের বাঘ গোপনে মানুষের গতিবিধির দিকে নজর রাখে, মানুষ তাকে দেখতে পায় না। কিন্তু বাঘ মানুষকে আগেই দেখে ফেলে।

মদনার দলও সুন্দরবনে থেকে থেকে এখানকার বাঘের মত হিংস্র আর চতুর হয়ে উঠেছে। ওই বাঘের তাড়া খেয়ে পালিয়ে গিয়ে বনের গভীরে ঢুকেছে। আর ঘনবনের ফাঁক থেকে লক্ষ্য করেছে এদের। সর্দারকে নিয়ে ওই ব্যাটারাই পালিয়ে এসেছে। আর দূর থেকেও মদনা শকুনের মত সন্ধানী দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখে ওই পটলা, গদাধর, পীতুকে চিনতে পারে।

মদনা গর্জাচ্ছে—ওগুলোকে এবার শেষ করে দেবো।

সর্দারকে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে এসেছে তাদের কাছ থেকে। সর্দার ও মদনাকে এবার সযুত করে দেবে আর এ মদনারই চরম পরাজয়ের কথা। পুলিশে সর্দারকে ধরতে পারলে দলেরও কেউ বাঁচবে না। ধরা পড়ে গিয়ে জেলেই পচতে হবে। তাই মদনাও তৈরী হয়ে এসেছে।

এর মধ্যে দলের একজনকে হারিয়েছে কুমীরের পেটে। নিজেও বাঘের পেটে মারা পড়তো। বারবার হেরে গিয়ে মদনার রাগটা আরো বেড়ে উঠেছে।

মদন বলে—ওই ঘেরের মধ্যেই কোন নৌকায় সর্দারকে এনে তুলেছে। আজ রাতেই দেখা যাবে।

ওদের ডিঙিগটা বড় নদী ছাড়িয়ে খালের মধ্যে নৌকা বসতের দিকে এগিয়ে আসে। পটলারা জানতেও পারে না যে, মদনার দল তাদের সবগুলোকেই দেখেছে। আর আক্রমণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে।

বুদ্ধিটা মদনই বের করেছে। খালটায় কাঠ মহাজনদের অনেক ছোট বড় নৌকা থাকে, তাদের কোনটায় সর্দারকে রেখেছে ওরা সেটা জানা দরকার। নাহলে কোন রকমেই উদ্ধার করাও যাবে না। তাই মদনই বুদ্ধিটা বের করেছে।

বনের মধ্যে কাঠ কাটাই-এর কাজ চলছে। অনেক বাওয়ালী, কাঠুরিয়া নেমেছে বনে। একজন নীচেকার ঘন ঝোপগুলোকে কুড়ুল দিয়ে কেটে সাফ করে নিয়ে তবে বড় গাছটার গুঁড়িতে কুড়ুলের কোপ দিতে থাকে।

মদনের দলের লোকজনও কুড়ুল নিয়ে মাথায় গামছা বেঁধে এদের দলে মিশে গিয়ে গাছ কাটতে শুরু করেছে। আর অবসর সময়ে তামাক খাবার নাম করে আলাপ জমাতে থাকে এদের সঙ্গে। ক্রমশঃ খবরটাও বের করে।

এরা নাকি খুশী হয়েছে। হলধর সর্দারকেই জ্যান্ত ধরে এনেছে কোন বাবুরা। এবার বাদাবনের জানোয়ার ওই হলধরকে ঠান্ডা করে দেবে বাবুরা।

হলধরের দলের লোকগুলোও খুশি হয়ে বলে—ঠিক করেছে।

মদনা কান পেতে শুনছে কথাগুলো। গাছে কোপ মারতে মারতে বলে—ব্যাটাকে ভালো করে আটকে রেখেছে তো? নইলে পালাবে হলধর। ও সব পারে।

বাওয়ালী লোকটা বলে—বাবুদের নৌকায় কায়দা করে রেখে বাবুরাই পাহারা দিচ্ছে তাকে।

মদনার কাজ এগিয়ে গেছে। হলধরের পাত্তা জেনেছে এবার। তাই কাজের ফাঁকে ওই কাঠুরিয়াদের নজর এড়িয়ে এসে ওদের ডিঙিতে উঠে কাঠ বওয়ার নাম করে সরে এসে খালের মধ্যে লুকিয়ে রইল।

এবার সেই নৌকাটাকেও চিনেছে, আর দেখেছে দূর থেকে কোথায় আছে নৌকাখানা। তাই গোপনে সরে এসে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করার কথা ভাবছে।

পটলার দলবল নৌকায় ফিরে এসে দেখে হলধরকে ফরেস্টের গার্ড দুজন পাহারা দিচ্ছে। হলধর গুম হয়ে বসে আছে। হাত-পা কসে বাঁধা। নেশা কেটে গিয়ে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চমকে উঠেছে হলধর সর্দার।

কলকাতার কটা চ্যাংড়া তার মত বিরাট একটা সর্দারকে যে এমনিভাবে জালে ফেলবে তা ভাবতেই পারেনি। রাগে-অপমানে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছে। ছেলেগুলোকে ফিরতে দেখে চাইল হলধর। পটলা বলে—চা খাওয়া হয়েছে সর্দারের?

—চোপ ব্যাটা।—হলধর গর্জে ওঠে।

গুপী বলে—র্-রাগছো কেন?

রাগে গজরাতে গজরাতে হলধর বলে—ছাড়া পেলে তোদের চিবিয়ে খাবো সব ক'টাকেই। একটাকেও ফিরতে হবে না।

হলধর রাগে-অপমানে কিছুই খায়নি। গুম হয়ে বসে আছে। পেট্রল বোটে খবর গেছে বনের বাইরের থানায়। কিন্তু যেতে আসতে সময় লাগবে। তাই সেখান থেকে এখনও লোকজন আসেনি। রাত নামছে।

পি. রায়, পীতু, পটলার দলবল সাবধান হয়ে রয়েছে। রমজান আলীও বলে—একটু জেগে থাকতি হবে বাবু, ব্যাটা হলধরের দলবলকে বিশ্বাস নাই।

কিকে চাঁদনী রাত নামে বনে। ওদিকে তাড়া খাওয়া বাঘটা ঘুরছে বনে বনে। সে-ও নজর রেখেছে নৌকাবসতের দিকে। মদনার দলও সন্ধান রেখেছে। খালে এসেছে জোয়ারের টান। জল বেড়ে বনের কাছ অবধি চলে গেছে। নৌকাগুলোও ঠেলে এসেছে তীরের কাছে। জলে মাঝে মাঝে শব্দ ওঠে। জোয়ারের সময় দু'একটা কুমীর নৌকাগুলোর ধারে পাশে খাবারের সন্ধানেও ঘোরে।

পাটাতনের উপর পীতু আর পটলা বসে আছে। ট্রানজিস্টারে উঠেছে কলকাতা কেন্দ্র থেকে কোন নামকরা ওস্তাদের গানের শব্দ। আবছা অন্ধকার বনে তার কেলোয়াতি গানের গমক তান—হা-হা শব্দে ছড়িয়ে পড়ে।

পটলার ঝিমুনি এসেছে।—গান না আর্তনাদ রে পীতু, থামা বাবু!

পীতু কেলোয়াতি সঙ্গীত নিজেও গায়। অবশ্য পাড়ার লোক বলে ও নাকি স্রেফ বমি করে। পীতু এখানেও পটলার মুখে কেলোয়াতি সঙ্গীতের ওই ব্যাখ্যা শুনে বলে—তুই কি বুঝিস? সুর ব্রহ্ম। আর কতো বড় ওস্তাদ গাইছে জানিস? দ্যাখ্, তান-কর্তব কেমন কড়া ওঁর। আহা!

এমন সময় কান্ডটা ঘটে যায়। ওরা কেউ খেয়াল করেনি। নৌকাটা জোয়ারের জলে নড়ছে ভেবেছিল। কিন্তু সুন্দরবনের এক নম্বর শয়তান ওদের দেখে তাড়া খাওয়া বাঘটা আবছা অন্ধকারে এসে একটা ঝোপের ভিতরে বসে থাবা দিয়ে ওদের নৌকার নোঙরের দড়িটা ধীরে ধীরে টেনে নৌকাটাকে তীরের কাছে এনে ফেলেছে। পীতু তখন তন্ময় হয়ে গান শুনছে। ছই-এর ভিতর রয়েছে হলধর বাঁধা অবস্থায়, না খেয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। আর বাইরে নৌকার উপর বাঁশের চৌকো চৌকো টুকরো দিয়ে পাটাতন করা, তার ওপর ওরা বসে আছে।

বাঘটা নৌকাটাকে তার নাগালের মধ্যে টেনে এনে লাফ দিয়ে একেবারে নৌকার সেই আলগা পাটাতনের উপর এসে পড়েছে। আর পড়তেই বাঘের বিরাট দেহের ভারে আলগা পাটাতনগুলো উল্টে যায়। পটলা আর পীতু ছিটকে পড়েছে খোলের মধ্যে, আর পাটাতনগুলো সেইভাবে নৌকার খোলে পড়ে ভিতরের মুখটাকে ঠেসে বন্ধ করে দিয়েছে।

ফলে বাঘটা ওদের দুজনকে নাগালের মধ্যেও পায় না। রাগে গজরাচ্ছে। নৌকাবসতেও সাড়া পড়ে গেছে।

—বাঘ, বড় শিয়াল নামছে নৌকায়, হুঁসিয়ার।

বাঘটা পাটাতনে বসেই চমকে ওঠে বিকট শব্দে। বাঘের গর্জনই মনে হয়। অন্য একটা বাঘই ওই ছই-এর ভিতর ঢুকে আছে।

হলধর সর্দার ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে আর ওর, বিকট দেহের অনুপাতে মোটা নাক ডাকছে ওই গুরুগম্ভীর স্বরে —ভোঁ-গর-র-র—ফোঁস। বাঘটা হকচকিয়ে গেছে বিপদের ভয়ে।

পিছনে ওই বিকট গর্জন, আর সামনে ওই ব্যা-ব্যা শব্দ উঠছে কালো মত জিনিসটার থেকে। ওস্তাদজী কলকাতা কেন্দ্রের ঠান্ডাঘরে বসে প্রাণপণে ছাগলের মত নাকি সুরে ব্যা-ব্যা করে চলেছে। মানুষ না পাক বাঘটা তবু ছাগলই নিয়ে সরে পড়বে। এই ভেবেই ওই ট্রানজিস্টারটাকেই কেস সমেত তুলে ধরেছে দাঁতে। আর কাঁধে ঝোলানো বেল্টটাও এই ফাঁকে বাঘ মহারাজের নিটোল গলায় বেশ যত্ন করে সেঁটে বসেছে। বাঘটা ওই শিকার নিয়েই লাফ দিয়ে ডাঙগায় উঠে সরে পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ওই মাচানের একটা অংশের বাঁশগুলোর ফাঁকে মহারাজের ল্যাজটা ঢুকে গেছে। বাঘের প্রচন্ড লাফের চোটে মাচানের একটা অংশই ওর ল্যাজে বন্ধ অবস্থাতেই বের হয়ে গেল।

পিছনে চৌকো ঢালের মত লেগে আছে বাঁশের পাটাতন খানিকটা আর গলায় ঝুলছে সেই রেডিও। বাঘটা তুড়ি লাফ দিয়ে বনে ঢুকে গেল। ওস্তাদজীর সাপট তানের শব্দ শোনা যায় বনের মধ্যে-ব্যা-ব্যা-অ্যা।

বাঘও সেই লটবহর নিয়ে উধাও হয়ে যেতে এদের নৌকায় রমজান আলী, গদাধর অন্য সকলেই এসে ওঠে।

পি. রায় সিট্‌কে দেহ নিয়ে দাপাচ্ছে এইবার—আমি থাকলে হালায় বাঘেরে ধইরা ফালাইতাম্।

গদাধর ধমক দেয়—চুপ কর। দ্যাখ ওরা কোথায়? রইল, না বাঘের মুখেই গেল।

পটলা পাটাতনের নীচে চিঁ চিঁ করে জানায়—এই যে এখানে রয়েছি। বের কর।

আর গোলমালে হলধরের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সে হুঙ্কার ছাড়ে—কে রে? কোন ব্যাটা?

নৌকাবসতের লোকজন জেগে গেছে। মশালের আলো জ্বলে ওঠে, ফরেস্ট গার্ডবাবুও এসে পড়েছে।

ফরেস্টার বাবু বলেন—যাক্, কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি এই ভালো। তবে রাতে জেগে থাকবেন সবাই। বাঘটা জ্বালাতন করবে বলে মনে হয়।

গুপী বলে—শুধু বাঘ কেন স্-স্যার। মানুষ-বাঘও আসতে পারে।

অসম্ভব কিছু নয়—ফরেস্ট অফিসারও বলেন।

হলধর গর্জাচ্ছে—আসবেই তো। দেখবি তোদের সব ক'টাকে কেটে গাং-এর জলে ফেলে দেবো নিজের হাতে।

এখানকার মাঝি, কাঠুরিয়ার দলও বুঝেছে ব্যাপারটা। বাঘ এসেছিল সত্যিই। সেটা শিকার না পেয়ে ফিরে গেছে। কিন্তু তাদের এখানেই একটা বাঘের মত প্রাণী রয়ে গেছে। তাকে নিয়েই বিপদে পড়েছে।

ফরেস্ট অফিসার বলেন, গার্ড আর মাঝিদের—সাবধানে থাকবে রাজা। থানায় খবর গেছে, তাদের লোকও আসবে সকালেই। একটা রাত সজাগ হয়ে থাকতে হবে।

পি. রায় সায় দেয়—তাই কন্ অগো। মনে লয় ব্যাটারা ঘুরতাছে এখানে ওখানে সর্দারের খোঁজে।

মদন দলবল নিয়ে একটু তফাতেই খালের উপর এসেছে। সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়বে নৌকার উপর, তার ছিপও তৈরী, সর্দারকে তুলে নিয়ে পাড়ি দেবে। জানে একবার বেরোতে পারলে তার ছিপকে ধরার মত কেউ আর নেই।

রাত্রি হয়ে গেছে। বনে বনে জমাট অন্ধকার নেমেছে। মদনা হঠাৎ বনের মধ্যে গাং-এর ধারে রেডিওর গান শুনে অবাক হয়। তার নৌকার লোকগুলোও শুনেছে মেয়েলি কন্ঠের গান।

মদনা বলে—বাবুরা ডিঙ্গি নিয়ে গান বাজাতে বাজাতে বাদাবনে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। না রে?

ওর চ্যালা একজন তন্ময় হয়ে গান শুনছে। সে বলে—তাই হবে গো!

মদনা গর্জে ওঠে—গান শোনাচ্ছি এবার ওগুলোকে। আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে ঝোঁপের আড়ালে আড়ালে গিয়ে একেবারে ঘাড়ের উপর পড়বো ব্যাটাদের। সব ক'টাকেই জ্যান্ত তুলে আনবি, যেন টুঁ শব্দ না করতে পারে। বুঝলি?

দলের সকলেই মনে মনে খুশি হয়েছে এমনি একটা সুযোগ পেয়ে যেতে। তাই বলে তারা—তাই হবে গো মদন। দ্যাখো না, সব ক'টাকেই তুলি আনবো কল্লা ধরি। চল।

ওরা ছিপ থেকে বনের ধারে নেমে বিড়ালের মত চুপি চুপি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলেছে ওই গানের জায়গা-টার দিকে। হাতে বল্লম, সড়কি, কাটারি। দরকার হলে ওগুলোকে কেটে গাং-এর জলেই ফেলে দেবে। মদনা বলে—হুঁসিয়ারে যাবি। যেন দেখতে না পায় ব্যাটারা।

ওরা চলেছে। গানটা এবার ভালো শোনা যায়। কাছা-কাছি এসে পড়েছে তারা।

রেডিওর ঘোষক কলকাতা থেকে মিষ্টি সুরে ঘোষণা করছে পরবর্তী অনুষ্ঠানের। কোন নামকরা গায়িকা এবার আধুনিক গান শোনাবেন।

চাঁদ, ফুল-টুল নিয়ে একটা গান চলেছে রেডিওতে। গায়িকাও জানেন না কোত্থেকে তার গান ধ্বনিত হচ্ছে বাদাবনে।

বাঘটা ক্লান্ত হয়ে বনবাদাড় ঘুরেও ল্যাজের সেই বাখা-রির পাটাতনকে ছাড়াতে পারেনি, আর গলায় বেকায়দায় ফাঁস লাগা বেল্ট সমেত রেডিওটা বাজছে। তবে সেই গাঁক গাঁক চীৎকার, ছাগলের মত ডাকাডাকি থেমেছে। কি একটা সুর বের হচ্ছে বাঘ মহারাজের গলায় ঝুলন্ত রেডিওটা থেকে, ক্লান্ত, ক্রুদ্ধ হতাশ বাঘটা বসে পড়েছে ঝোপের মধ্যে। একটু দম নিয়ে গলা আর ল্যাজ থেকে ওই বিশ্রী জিনিষগুলোকে ছাড়াবার চেষ্টা করবে।

হঠাৎ কাদের শব্দে ফিরে চাইল। অন্ধকারেই একটা লাঠি এসে পড়েছে বাঘের পিঠে, একটা বল্লমও কে চালি-য়েছিল, সেটা ল্যাজের বাখারির মাচানে আটকে গেছে। বাঘটা গর্জন করে উঠে বিরাট হাঁ মেলে চাইল ওই লোক-গুলোর দিকে।

মদনা সাবধানে দলবল নিয়ে এসে ওই গানের জায়গা-টাকে ঘিরে ফেলে ওদের সব ক'টা ছেলেকেই ধরবার জন্য এগিয়ে আসছে। কে যেন ওদের একটু কায়দা করার জন্যই ঝোপের আড়াল থেকে একটা লাঠি বসিয়েছে। আর সেটা পড়েছে বাঘের পিঠেই। বাঘটাও একটা থাবার ঝাপট মেরেছে লোকটার হাতেই। বেশ এক খাবলা মাংস উঠে গেছে। লোকটা আর্তনাদ করে লাঠি ফেলে সোজা সাম-নের দিকে দৌড়তে থাকে।

মদনাও ভাবেনি যে এমনি বিপদে পড়বে। দলের সকলেই ছত্রভঙ্গ। বাঘটাও এলোপাথাড়ি থাবা চালাচ্ছে, গলায় বাজছে রেডিওতে বিচিত্র সুর, ল্যাজে আটকানো বাখারির চৌকো পাটাতন। বাঘটাও দৌড়চ্ছে আর এরাও পরি-ত্রাহি চীৎকার করতে করতে বনবাদাড় ভেদ করে ছুটছে। নেহাৎ ওই পাটাতনের বাধার জন্যই বাঘটা তেমন জোরে ছুটতে পারছে না, তাই রক্ষে। এরা আহত ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় চীৎকার করে দৌড়চ্ছে, আর পিছু পিছু আসছে মালপত্র সমেত বাঘ মহারাজ। তার গর্জন শোনা যায়, সারা বন কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়ছে বাঘটা, মানুষদের এই ইয়ার্কিতে রেগে গেছে।

ওদের দিক-বিদিক জ্ঞান নেই, প্রাণের দায়ে ছুটছে, পিছনে আসছে বাঘটা। গাছের ডালে ল্যাজের পাটাতন, গলার বেল্ট আটকাচ্ছে। টেনে টেনে ডালপালা সমেত একটা চলন্ত গাছের মত আসছে বাঘটা। আর এরাও দৌড়চ্ছে। নৌকাবসতে সাড়া পড়ে যায়। এরাও বিপদের কথা ভেবে সাড়া দেয়। হয়তো কোনো নৌকার মাঝি লোকজনদেরই বিপদ হয়েছে। তাই তারাও এগিয়ে আসে।

হঠাৎ পি. রায় বলে—আরে, মদনা না? সেই চ্যালাটা।

মদনার পিছনে বাঘ আর সামনে শত্রু, ওরা ভাবতে পারেনি বাঘের তাড়া খেয়ে ওরা এইদিকেই এসে পড়বে, আর এভাবে ফাঁদে পড়বে। ফেরার পথ নেই।

মদনা কাদায় ছিটকে পড়ে পালাবার চেষ্টা করতে গুপীই হাতের বৈঠার কয়েকটা ঘা বসিয়ে দিতে মদনা পাঁকে পড়ে যায়। দু-চারটে ডাকাতও পথ না পেয়ে হাত তুলে চীৎকার করে—প্রাণে মারবেন না বাবু।

মশাল হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। জোরালো টর্চের আলো দেখা যায় লোকগুলো ধুকছে, কেউ বা চোট খেয়েছে, কার কাঁধে বাঘের থাবার কিছুটা দাগ, কেউ বা প্রানের ভয়ে আর্তনাদ করছে আর মদনা কাদায় আধডোবা হয়ে পান-ভূতের মত হয়ে উঠেছে। মুখটা জেগে আছে।

গদাধর হাঁক পাড়ে—গুণে গুণে ব্যাটাদের তোল, আর আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখ ব্যাটাগুলোকে। একটাও যেন না পালায়।

গুপী গর্জায়—ব্-বাঘের পেটে যাবে না? গ্-গানওয়ালা বাঘ ছ্-ছেড়ে দেবে ওদের? য্-যাক না।

মাঝি, বাওয়ালি, কাঠুরিয়ার দল ভাবেনি যে হলধর নস্করের দলকে দল ওদের হাতে এসে পড়বে এভাবে। সব ক'টাকেই তুলেছে ওরা, আর কাছির অভাব নেই। বড় নৌকার পাটাতনে ইয়া বড় বড় নোঙরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, কেউ বা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে।

হলধর নস্কর মদনাকে দেখে বাঁধা অবস্থাতেই গর্জায়—ধরা দেবার আগে মরতে পারলি না?

গুপী বলে—ম্-মালিককে দেখতে এসেছিল কিনা, তা মালিককে ছেৎড়ে পড়ে থাকতে দেখে ম্-মন খারাপ হয়ে ধ্-ধরা দিল।

পি. রায় সিট্‌কে শরীরটা দম নিয়ে ফুলিয়ে বলে—সব ক'টারে এবার গাং-এর জলে চুবানি দিমুনে! ঘুঘু দেখ-ছিলা সর্দার, ফাঁদ খান দ্যাখো এইবার।

মদনা কটমট করে চেয়ে থাকে। আর হলধর গর্জায়—হাতের কাছে পেলি তোরে খতম্ করি দেবো।

লঞ্চের ইঞ্জিনের শব্দ ওঠে। ফরেস্টার ভদ্রলোকও উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন শব্দটা। পটলা শোনায়—লঞ্চ না?

বড় গাং-এর দিক থেকে নীল মাস্টার ল্যাম্প জ্বেলে লঞ্চটা আসছে খালের বুকে। ওর সেই লাইটের জোরালো আলোয় বন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

পুলিশ লঞ্চটায় করে থানা অফিসার, পটলার মামাবাবু আর বেশ কিছু আর্মড্ কনস্টেবল্ রাইফেল সমেত এসে হাজির হয়।

থানা অফিসারই শুধোন—কি ব্যাপার? খবর পেলাম

হলধর নস্করকে নাকি ধরে ফেলেছে একদল ছেলেতে?

পটলার মামাও পটলাকে দেখে শুধোন—ভালো আছিস তো তোরা? হলধর নস্কর একটা দারুণ লোক, তাকে ধরবি তোরা? দ্যাখ কোনো বাজে লোককে ধরে মিছিমিছি এই সব খবর রটিয়েছিস। এতে হলধরেরই সুবিধা হবে।

গুপী জানায়—স্-সুবিধা আর হবে না মামাবাবু, দ-দলকে দল ধরেছি। ওই তো সব রয়েছেন পাটাতনে। উনি সেকেন্ড লীডার ম্-মদন চন্দর আর স্-সর্দার মশায় ছই-এর ভিতরে র্-র-রেস্ট নিচ্ছেন। ওঠার উ-উপায় নেই তাঁর।

তাই নাকি, এতগুলো লোককে ধরেছো তোমরা?—থানা অফিসার মদনকে চিনে অবাক হন।

পি. রায় বলে—এরা বিনা নেমতন্নে আসছেন ঠ্যাকায় পইড়া।

থানা অফিসার বলেন—দারুন একটা কাজ করেছো তোমরা ইয়ং ম্যান। এ এলাকার মানুষের জীবনে শান্তি এনেছো। এই যে নস্কর মশাই, ইস্! এভাবে বেঁধে ফেলে রেখেছে আপনাকে? ওর বাঁধন খুলে হাতকড়ি লাগিয়ে লঞ্চে নিয়ে যাও।

কনস্টেবলরাও সব কটাকেই ওইভাবে তুলেছে লঞ্চে।

পীতু বলে ওঠে—ওদের তো পেলেন স্যার, কিন্তু ছোট-দার ট্রানজিস্টারটা তো গেল। ব্যাটা বাঘ মহারাজ নিয়ে গেল স্যার।

বাঘের রূপটা ঢাকা পড়ে গেছে গাছের ডাল পাতার আড়ালে। তবু রেডিওতে গান ঠিক বাজছে। গান শেষ হয়ে দিল্লী কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বাংলা সংবাদ শুরু হয়েছে।

থানা অফিসার ব্যাপারটা শুনে হাসতে হাসতে বলেন—নতুন ভালো সেট একটা পাবে তুমি।

পঞ্চ-পান্ডব ক্লাব সেবার সুন্দরবন থেকে বিরাট নাম আর যশ কিনে কলকাতার শ্যামবাজারের রকে এসে আসর জমিয়ে ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে বসেছে।

গুপী বলে—এন্তার ফুচকা খ্-খাবো মাইরী। প্-পাঁচ হাজার টাকা রিওয়ার্ড।

গদাধর বলে—থাম তো!

পীতুও শোনায়—নতুন নাটক নামাতে হবে এবার, বেশ জম্পাটি।

পি. রায় জেদ ধরে—আমারেও পার্ট দেওন লাগবো। এই-বার আর ছাড়ুম না পীতে। কারেজ খান দেখছিস তো, বাদাবনের বাঘ, মায় ডাকাতেরে অবধি ফেরে ফালাইয়া খতম্ কইরা দিলাম।

গুপী বলে ওঠে—ত্-তাই ভয় হয়। নাটকখানারেই খতম করে না দিস। তবে পীতু, ওরে দিলে, আ-আমাকেও দিবি কিন্তু প-পার্ট। দেখবি আটকাবে না, নে-নেভার।

এক নাম, অন্য মুখ

ময়ূথ চৌধুরী

স্যামুয়েল বেকার আফ্রিকায় মার্চিসন জলপ্রপাত আবিষ্কার করার পরের দিন স্ত্রীকে নিয়ে নৌকোয় নদী পার হচ্ছেন, এমন সময় অতর্কিতে তাঁদের আক্রমণ করল এক বৃহৎ জল-হস্তী। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন ভোজের লোলুপ প্রত্যাশায় নৌকো ঘিরে ফেলল কুড়িটা কুমীর। জলহস্তীর কল্যাণে (!) নৌকো যখন উল্টে যাওয়ার উপক্রম, ঠিক সেই মুহূর্তে গুলি চালিয়ে জলহস্তীকে আহত করলেন স্যামুয়েল বেকার। জলহস্তীর রক্তে লাল হয়ে উঠল নদীর জলরাশি এবং সেই রক্ত দেখে ক্ষেপে গেল কুমীরের দল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশজোড়া দন্তুর চোয়ালের নিষ্ঠুর দংশনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল জলহস্তীর বিশাল দেহ!

বিল বেকার লন্ডনে রুটি তৈরীর কাজ করত। সে অষ্টা-দশ শতাব্দীর কথা। একদিন সন্ধ্যায় একতাল ভিজে ময়দা নিয়ে রুটি তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সে, এমন সময় তার সামনে উপস্থিত হল পিস্তলধারী এক দুর্বৃত্ত। বিনা-বাক্যব্যয়ে বিল হাতের ময়দা-সমেত পাত্রটি সজোরে ছুড়ে মারল দুর্বৃত্তের মুখে। পিস্তলধারী এমন অপরূপ অভ্যর্থনা কস্মিন্ কালেও আশা করেনি—রীতিমতো হক-চকিয়ে গেল সে, আগ্নেয়াস্ত্রটিও তার হাতছাড়া হয়ে ছিটকে পড়ল মাটির উপর। সেটাকে আবার করায়ত্ত করতে গেল সে, কিন্তু না, তার কোন সুযোগই সে পেল না—চোখের পলকে বিলের বজ্রমুষ্টি তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল। এক্ষেত্রেও যথারীতি পতন এবং মূর্ছা! জ্ঞান ফিরে পেতে তাকে কর্তৃপক্ষের করকমলে সমর্পণ করল বিল।

প্রথম দৃশ্য

বিপিন বাবু হোমিওপ্যাথ সকাল বেলা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন, আর কাগজ পড়েছেন। তাঁর সামনে ডাক্তারী বাক্স, গলায় বুক পরীক্ষার যন্ত্র। বাড়ীর ভেতর থেকে একটা শব্দ আসছে।

বিপিন ঃ সাত সকালে কে এমন ঠকাঠক করছে? একটু শান্তিতে যে কাগজখানা পড়ব, তারও উপায় নেই।

[তাঁর স্ত্রী মাতঙ্গিনীর প্রবেশ।]

মাতঙ্গিনী ঃ গজু কাঠ কাটছে, তারই শব্দ। কাগজ নিয়ে ত বসেছ, ওদিকে ঘরে ত নেই এক চিলতে কাঠ। রান্না হবে কি দিয়ে?

বিপিন ঃ বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু গজুটা কে?

মাতঙ্গিনী ঃ দেখ কান্ড! গজু তোমার ভাগ্নে। বর্ধমানে ছিল, তোমার সেই যে মামাত বোন নিস্তার গো, তারই ছেলে।

বিপিন ঃ সে এসে জুটল কোত্থেকে? এলই বা কবে? কিছু ত শুনিনি!

মাতঙ্গিনী ঃ শুনবে কি করে? তুমি ত ছিলে নবদ্বীপে। হঠাৎ নিস্তার মারা গেল তিনদিনের জ্বরে। গাঁয়ের লোকেরা তখন মা-মরা ছেলেটাকে নিয়ে এল আমার কাছে। কি আর করব? আপন ভাগ্নে, ফেলে ত দেওয়া যায় না!

বিপিন ঃ তা ত যায় না। কিন্তু আজকের দিনে একটা ছেলে পুষতে খরচটা কত তা ভেবেছ? রোজগার ত দিনের দিন কমতে কমতে শূন্য হতে চলেছে!

মাতঙ্গিনী ঃ ভেবেছি, ভেবেছি। খেঁদীর মাকে ত ছাড়িয়ে দিয়েছি সেই জন্যেই। উনুন ধরান, জল তোলা, মাঠে গরু নিয়ে যাওয়া, সব একটু একটু করে চাপিয়েছি ওর ঘাড়ে। বসে বসে খাওয়া হবে না, পরিষ্কার বলে দিয়েছি সে কথা।

বিপিন ঃ খেঁদীর মাকে ছাড়িয়ে দিয়েছ? করেছ কি? ওর মত টকের ডাল আর তেতর সুক্তো কি আর কেউ রাঁধতে পারবে? তাছাড়া নিজের কথাটাও ভাব। এখন ত সকাল সন্ধ্যে তোমাকেই হাঁড়ি ঠেলতে হবে। বয়স হয়েছে না!

মাতঙ্গিনী ঃ দেখই ত আমি কি করি। গজু বলছে ও নাকি রাঁধতেও পারে। হ্যাঁ, শোন সামনের সোমবারে আমারা কিন্তু শ্যাম রায়ের মেলা দেখতে যাব বিষ্টুপুরে। সকালে যাব রাত্রে ফিরব।

বিপিন ঃ বাড়ী আগলাবে কে? এখন ত আর খেঁদীর মা নেই।

মাতঙ্গিনী ঃ কেন গজুই থাকবে। চালাক চতুর ছেলে। তাছাড়া লোক গিসগিস করছে চারদিকে। ভয়টা কিসের?

বিপিন ঃ অন্যদের ভয় ত করছি না।

মাতঙ্গিনী ঃ তবে?

বিপিন ঃ ভয় করছি ওকেই। যদি ঘটিবাটি কম্বল কাঁথা সর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়!

মাতঙ্গিনী ঃ বলছ কি? মাথা খারাপ নাকি? আপন ভাগ্নে, মা-বাপ মরা অনাথা, সে পালাবে তোমার ঘটিবাটি নিয়ে!

[হঠাৎ আওয়াজটা খুব বেড়ে গেল।]

বিপিন ঃ নাঃ কানে ত তালা ধরে গেল। কাটছে কি এত!

মাতঙ্গিনী ঃ কাঁঠাল কাঠের সেই যে পুরানো সিন্ধুকটা ছিল।

বিপিন ঃ অ্যাঁ? ওটা যে আমার মায়ের সিন্ধুক। মা ওতে রাখত বাসন-কুশন, বাতের তেল, লক্ষীর হাঁড়ি, আরো হাজার জিনিস। ওটা কাটা মানে ত আমার মাকেই দুখানা করা।

মাতঙ্গিনী ঃ আহা, কি বুদ্ধি! উই আরশোলার ডিপো, ওটা রেখে ত খালি নষ্ট হচ্ছিল। তার চেয়ে সংসারের কাজে লাগল, সেটাই ভাল হল না!

বিপিন ঃ তা তোমার ঐ বিখ্যাত গজুকে ডাক একবার, দেখি তার চেহারাখানা একবার।

মাতঙ্গিনী ঃ এই দেখ, খেয়ালই করিনি। ওরে গজা, শীগ্গী এদিকে আয়। মামাকে পেন্নাম কর। কি গাধা রে তুই!

[ভেতর থেকে]

গজ্ব ঃ মামাকে এখানে নিয়ে এস মামী। আমার ওঠার উপায় নেই। উঠলে ঘ্বঘ্বটা পালাবে।

বিপিন ঃ ঘ্বঘ্ব ধরেছে ব্বঝি একটা?

মাতঙ্গিনী ঃ ধরবে না? হাজার হলেও ছেলে মান্বষ ত।

বিপিন ঃ ধর্বক। এখন ঘ্বঘ্ব দেখাচ্ছে, এরপর ফাঁদ দেখাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোকুল পন্ডিত মশায়ের পাঠশালা। পন্ডিত মশায় ছেলেদের অঙ্ক করতে দিয়ে কোথায় বেরিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যে গজ্ব, পিন্ট্ব, হাঁদ্ব আর বিল্ব পা টিপে টিপে ক্লাস থেকে উঠে এল। তাদের হাতে বই খাতা।

গজ্ব ঃ চল আমার সঙ্গে। মামা মামী দ্বজনেই বিষ্ট্বপ্বরে গেছে, শ্যাম রায়ের মেলা দেখতে। এই ফাঁকে ম্বড়কি বাতাসা, আমসত্ত, আচার যা আছে সব সাবাড় করি।

পিন্ট্ব ঃ ফিরে এসে যখন টের পাবে, তখন ত আচ্ছাসে ধোলাই দেবে। কি করবি তখন?

বিল্ব ঃ দিলেই হল! ভাঁড়ার ঘরের মেটে দেওয়ালে বড় রকম একটা গর্ত খ্বঁড়ে রাখব। তাহলেই ব্বঝবে চোরে সিঁধ কেটে সব নিয়ে গেছে।

হাঁদ্ব ঃ হ্যাঁ, এত জিনিস থাকতে চোরে আচার, আমসত্ত আর ম্বড়কি, বাতাসা চ্বরি করেছে! তুই একটা নম্বার ওয়ান গাধা।

গজ্ব ঃ কেন, ওগ্বলো কি আর জিনিস নয়? সব চোরই যে শ্বধ্ব বাসন আর কাপড়-চোপড় নেবে, তার কি মানে আছে?

পিন্ট্ব ঃ মোটেই না। এই ত সেদিন ফটকেদের রান্নাঘরে ঢ্বকে পান্তা ভাত পর্যন্ত নিয়ে গেছে চোরে।

বিল্ব ঃ আর টেপ্বদাদের বাড়ী থেকে ঘ্বঁটে নিয়ে যায় নি কার্তিক প্বজোর দিন? আরে চোরের কাছে ঘটিবাটিও যা, ম্বড়ি, আমসত্তও তাই।

হাঁদ্ব ঃ তাছাড়া চোরেরা ত চ্বরি করে খাবারের জন্যেই। হাতে হাতে খাবার পেয়ে গেলে ত তাদের ভালই!

গজ্ব ঃ ওরে পন্ডিত মশায়। ঐ দেখ মেয়েদের ক্লাসে ঢ্বকলেন। ওদের অঙ্ক-টঙ্ক দেখেই কিন্তু এদিকে আসবেন।

পিন্ট্ব ঃ তার আগেই চল হাওয়া হয়ে যাই আমরা। এসে দেখবেন ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নেই।

হাঁদ্ব ঃ তারপর? সন্ধ্যেবেলা ত আসবেন মেজ কাকার সঙ্গে দাবা খেলতে। তখন ত বলে দেবেন এই দল বেঁধে পাঠশালা পালানোর কথা।

বিল্ব ঃ কি আর হবে? পিঠে দ্বচার ঘা মার পড়বে, এই ত। সে ত রোজই পড়ে!

গজ্ব ঃ আমার মামাকে যদি বলে দেন, আমার কিন্তু কিছ্ব হবে না। মারতে এলে মামী সামলাবে।

পিন্ট্ব ঃ মামী তোকে খ্বব ভালবাসে ব্বঝি!

গজ্ব ঃ ছাই বাসে। আমাকে দিয়ে রোজ দ্বদ্বটো চাকরের কাজ করায়। সেই জন্যেই কিছ্বটি বলে না।

বিল্ব ঃ তা তুই এক একদিন জব্দ করে দিতে পারিস না? এই ধর তরকারিতে আচ্ছা করে ন্বন ঢেলে দিলি, নয়ত ভাতের হাঁড়ির তলা ধরিয়ে সকলকে পোড়া ভাত খাওয়ালি।

গজ্ব ঃ একট্ব সব্বর কর, আর একট্ব চেপে বসি। তারপর করছি যা করার। এখন চল পালাই শ্বট শ্বট করে।

পিন্ট্ব ঃ চল। ওহে মার তুমি মোরে কি দেখাও ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়!

হাঁদ্ব ঃ ঠিক, ঠিক। মার ভেবে ভীত কেন আচার খাইতে, দ্বঃখ বিনা স্বখ লাভ হয় কি মহীতে?

[এক দিক দিয়ে ওদের প্রস্থান, অন্য দিক দিয়ে গোকুল পন্ডিত মশায়ের প্রবেশ।]

গোকুল ঃ একি? সবাই পালিয়েছে! বেয়াড়ার একশেষ হয়েছে ত ছেলেগ্বলো। পড়াশোনা এখন দেখছি শ্বধ্ব মেয়েরাই করে। দাঁড়াও, কাল সক্কলকার হাড় একদিকে মাংস একদিকে করছি। হতচ্ছাড়া হন্বমান, গাধা, ইষ্ট্বপিটের দল।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

বিপিন ডাক্তারের বাড়ী। উঠানের চারদিকে অনেক হাঁড়িক্বঁড়ি ছড়ান রয়েছে। রয়েছে কিছ্ব ম্বড়ি চিঁড়েও। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন হারিকেন হাতে বিপিন বাব্ব। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে মাথা চাপড়াচ্ছেন মাতঙ্গিনী।

মাতঙ্গিনী ঃ হায় হায়! আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে গো! এমন সর্বনেশে চোর কোথায় ছিল গো! তুমি শীগ্‌গী প্বলিশ ডাক গো।

বিপিন ঃ কি যে বল তার ঠিক নেই। আচার আর ম্বড়ি চিঁড়ে চ্বরি হয়েছে শ্বনলে প্বলিশে বিশ্বাস করবে? ভাববে আমারই মাথা খারাপ হয়েছে! তব্ব ভাল যে ঘটিবাটি, কাপড় চোপড়, বিছানা, মশারি, দামী জিনিস কিছ্ব নেয়নি। আসলে এসেছিল ভীষণ একটা পেট্বক চোর, ব্বঝেছ। বেছে বেছে শ্বধ্ব খাওয়ার জিনিসগ্বলোই খেয়ে গেছে। যাক, ঠিক আসতে হবে আমার কাছে। তখনই ধরব।

মাতঙ্গিনী ঃ সে আবার কি? তোমার কাছে আসতে যাবে কেন?

বিপিন ঃ নির্ঘাৎ পেট খারাপ হবে ত এত খেয়ে। ওষ্বধ দেবে কে তখন বিপিন ডাক্তার ছাড়া?

মাতঙ্গিনী ঃ বসে থাক সেই আশাতেই।

বিপিন ঃ আচ্ছা, গজাটা কি করছিল? তাকে রেখে গেলে বাড়ী পাহারা দিতে। এই তার পাহারা দেওয়া?

মাতঙ্গিনী ঃ সে কি করবে? সারা সকাল কুয়ো থেকে জল তুলেছে, কাঠ কেটেছে, গোয়াল সাফ করেছে। তারপর দ্বম্বঠো ভাত ফ্বটিয়ে তা ম্বখে দিয়েই স্কুলে দৌড়েছে। তখনই বলেছিলাম, ওকে লেখাপড়া শেখাতে যেও না। তা ত শ্বনলে না। ভাগ্নে দিগগজ বিদ্বান হবে বলে ঠেলে পাঠালে গোক্বলের গোয়ালে!

বিপিন ঃ ভদ্দর লোকের ঘরে জন্মেছে। লেখাপড়া না শিখলে শেষটা সিঁধ কাঠি হাতে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘ্বরবে, নয়ত রেলে ইস্টিমারে লোকের ব্যাগ বিছানা সরাবে!

মাতঙ্গিনী ঃ তা অবিশ্যি ঠিক। কিন্তু লেখাপড়া শিখলে কি বেশী দিন আর কাঠ কাটবে, না গোর্ব চরাবে? এখনি দেখ নি মাথায় কত বড় টেড়ী উঠেছে!

বিপিন ঃ তাও অবিশ্যি ঠিক। তাছাড়া লোকসানও ত কম করছে না ছেলেটা! এই সেদিন কুয়োয় ঘড়াটা ফেলল।

লোক দিয়ে তোলাতে লাগল আট আনা। গরুটা মাঠে কোথায় ছেড়ে দিয়ে এল। গরু ঢুকল গিয়ে পাঁচু মন্ডলের কলাই ক্ষেতে। চটে মটে পাঁচু তাকে জমা দিল খোঁয়াড়ে। ছাড়াতে লাগল সাড়ে পাঁচ আনা। এছাড়া তরকারি নুনে পোড়ান, ভাত ডাল নষ্ট করা......... এসব ত আছেই। এইত পরশু দিন, উনুন ধরাতে গিয়ে ঘরে আগুনই দেবার জোগাড় করেছিল!

মাতঙ্গিনী ঃ তা কি আর উপায় বল। আপন ভাগ্নে, বলতে গেলে ও বাড়ীরই ছেলে।

বিপিন ঃ অঁ, ভারী আমার ভাগ্নে রে। ওর মা সেই নিস্তার না বিস্তার, সে আমার কি করেছিল জান? শুনলে চোখ ফেটে জল আসবে তোমার।

মাতঙ্গিনী ঃ কি করেছিল?

বিপিন ঃ বলছি। তখন আমি নিশ্চিন্দিপুরে মাস্টারী করি। রথের সময় একবার এল আমার ওখানে। একদিন আমার ভীষণ মাথার যন্ত্রণা, প্রাণ যায় যায়, তখন দিল কোথা থেকে একটা তেলের শিশি এনে মাথায় লাগাতে। ব্যাস, তারপরই.........

মাতঙ্গিনী ঃ কি হল? তেড়ে জ্বর এল বুঝি!

বিপিন ঃ আরে না, না। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চুল উঠে গিয়ে ফুটবলের মত তেলপানা হয়ে গেল মাথাটা। নইলে কি রকম ঝাঁকড়া চুল ছিল আমার মাথা ভর্তি!

মাতঙ্গিনী ঃ কৈ বাপু, আমি ত সেই ছোট্ট বেলা থেকেই দেখছি তোমার মাথা জোড়া টাক। আমার জেঠতুত বোন আমসিদি ত তোমার নামই রেখেছিল টাকশাল।

বিপিন ঃ বললেই হল! চুরি হয়ে গেছে, নইলে দেখাতে পারতাম ছোট বেলার সেই ফটোটা।

[হঠাৎ বাইরে হাঁকডাক; অনেক লোক ধরাধরি করে গজুকে নিয়ে উঠানে ঢুকল।]

একজন ঃ ডাক্তার বাবু, ডাক্তার বাবু আছেন?

বিপিন ঃ কি, কি, ব্যাপার কি? কারোকে খুন করেছে, না নিজেই খুন হয়েছে?

আর একজন ঃ কিছু হয়নি, হাঁপিয়ে গেছে, একটু জিরালে আর এক দাগ ওষুধ খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।

মাতঙ্গিনী ঃ কেন? মারামারি টারি করেছে নাকি কারো সঙ্গে?

অন্য একজন ঃ না, না। ক্ষেত্তর গোঁসাইয়ের মেয়ে পানী বিলে ডুবেছিল। তাকে সাঁতরে তুলে এনেছে গজু।

বিপিন ঃ তাহলে ত মুল্লুকের মাথা কিনে নিয়েছে!

গজু ঃ মামী একটু দুধটুধ গরম করে রাখ ত। পাড়ার ছেলেরা মেয়েটাকে গোরুর গাড়ীতে করে এখানেই নিয়ে আসছে মামার কাছে, চিকিচ্ছার জন্যে!

বিপিন ঃ তা ত আনবেই: বিনি পয়সায় ওষুধ দেবে এমন বলদ আর কে আছে এ পাড়ায়!

মাতঙ্গিনী ঃ ঐ ত গাড়ী থামল দরজায়। দেখি কি হল মেয়েটার।

[প্রস্থান]

গজু ঃ এই যে এখানে, এখানে এনে শুইয়ে দে।

[সকলে মেয়েটাকে ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিল।]

চতুর্থ দৃশ্য

বেহুলা নদীর ধারে আম বাগান। বিকেল বেলা ছবি, লক্ষ্মী, রাধা ও বিজয়া খেলা করছে। হাতে ও গলায় ফুলের গয়না পরে তারা ঘুরে ঘুরে নাচছে, আর গান করছে।

গান

আমরা রঙীন আলোর পরী
খেলি খুশীর খেলা
আকাশ জলে বনের কোণে
ছড়াই রঙের মেলা।
ফোটাই ডালে ফুলের হাসি,
পাখীর সুরে বাজাই বাঁশী,
হাওয়ার বুকে সুবাস ঢালী,
জাগাই ছুটির বেলা!

[ঝোপের ভেতর থেকে হঠাৎ বাঘের ডাক। তারপর গজু, হাঁদু, পিন্টু ও বিলুর প্রবেশ।]

গজু ঃ এই মেয়েগুলো, পালা এখান থেকে শীগ্গী পালা। আখের ক্ষেতে বাঘ ডাকছে, শুনতে পাস নি?

ছবি ঃ আহা, বাঘ না হাতী! তোমরাই ত মুখে হাত চাপা দিয়ে হোঁকর হোঁকর করছিলে। আমরা বুঝি আর জানি না!

পিন্টু ঃ আমাদের বয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছিলাম চিনিবাস কাকার চন্ডীমন্ডপে কীত্তন শুনতে। হঠাৎ বাঘ ডাকল।

বিলু ঃ ভাবলাম মেয়েগুলো নম্বর ওয়ান হাঁদা। খালি ঘ্যানর ঘ্যানর করে ব্যাকরণ পড়ে, আর ঘাড় গুঁজে বসে অঙ্ক কষে। না জানে দৌড়তে, না পারে গাছে উঠতে নির্ঘাৎ যাবে বাঘের পেটে.......

হাঁদু ঃ তাইতেই ছুটে এলাম সাবধান করে দিতে। আর ওরা কিনা আমাদেরই দুষছে। বলছে আমরাই বাঘের ডাক ডাকছি।

গজু ঃ তার মানে কারোর ভাল করতে নেই, বুঝলি ত। চল, আমরা চলে যাই। খাক ওদের বাঘেই খাক।

রাধা ঃ বেশ, আসুক বাঘ। খাক আমাদের।

ছবি ঃ যদি সত্যিই বাঘ হয়, তাহলে আসছে না কেন এতক্ষণে মানুষের গন্ধ পেয়ে?

লক্ষ্মী ঃ দূর বাঘ কোথায়? ওরাই আওয়াজ করছিল।

বিজয়া ঃ হাজরাদের ভুট্টার ক্ষেতে ঢুকে পাহারাদারকে রোজ ঐ রকম করে ভয় দেখাত। হঠাৎ সেদিন ধরা পড়ে গিয়ে বেদম মার খেয়েছে। বড়দার কাছে শুনেছি সব আমি।

ছবি ঃ শুধু শুধু আমাদের খেলাটা মাটি করে দিল। অসভ্য, উল্লুক, পাজি ছেলেরা।

রাধা ঃ ছুঁচো, গাধা, ড্যাম, রাসকেল। কাল বলে দোব সব পন্ডিত মশায়কে।

লক্ষ্মী ঃ না বাচ্চু মামা ত দারোগা, তকে বলে পুলিশে ধরিয়ে দোব।

ছবি ঃ কিছু করতে হবে না। আয় চারজনে একসঙ্গে ভেংচি কেটে পালাই।

বিজয়া ঃ চল। শিবতলার মাঠে খেলিগে বরং।

[সকলের ভেংচি কাটতে কাটতে প্রস্থান।]

পিন্টু ঃ বিচ্চু মেয়েগুলো কি শয়তান দেখেছিস!

হাঁদু ঃ আগে থেকে জেনে গেছে কিনা, তাই ভয় পেল না!

গজু ঃ তোরা ত জানিস না, আমার আর এখানে বেশী

দিন থাকা হবে না। মামা মামী ঠিক করেছে আমাকে বিক্রি করে দেবে রাধানগরে এক গোলদারের কাছে দুশো টাকায়।

বিলু ঃ যাঃ বাজে কথা। মানুষ আবার বিক্রি হয়?

গজু ঃ হ্যাঁ রে সত্যিই আমি শুনেছি, রাত্রে ঘাপটি মেরে শুয়ে থেকে। মামা মামী সত্যিই আমাকে বাড়ী থেকে তাড়ানোর ফন্দী করেছে।

হাঁদু ঃ কেন?

গজু ঃ কি জানিস? সেদিনের সিঁধ কাটায় ওরা বিশ্বাস করেনি। বুঝেছে আমিই তোদের সঙ্গে দল পাকিয়ে আচার, আমসত্ত খেয়েছি, তারপর সিঁধ কেটেছি। পন্ডিত মশায়ও এসে বলে দিয়েছেন পাঠশালা থেকে পালানর কথা।

পিন্টু ঃ তাহলে?

গজু ঃ কি আর করব? চলেই যাব। তবে যাবার আগে একটু শিক্ষা দিয়ে যাব পন্ডিত মশায়কে। এখন চল, নিতাই ঘোষের বাগান থেকে ডাব নামাইগে দুতিন কাঁদি।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

বিপিন ডাক্তারের বাড়ীর বারান্দা। দুপুর বেলা বিপিন বাবু ও মাতঙ্গিনী বসে আছেন। সামনে দাঁড়িয়ে গজু। তার হাতে একটা তীর ধনুক। মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরা। খালি গা।

মাতঙ্গিনী ঃ কি করছিলি রে? হাতে তীর ধনুক কেন?

গজু ঃ কাগ তাড়াচ্ছিলাম মামী, তীর মেরে মেরে। তুমি যে চালের গুঁড়ো রোদে দিয়েছ না, কাগ তা ঠোকরাচ্ছিল ঠোঁট দিয়ে।

মাতঙ্গিনী ঃ সত্যি গজু, তুই আমার সোনা ছেলে। কিন্তু বাবা তোকে ত আর বেশী দিন রাখতে পারব না। ইস, বলতেই কান্না পাচ্ছে আমার। খালি মনে হচ্ছে এত মোয়া, আমসত্ত আর আচার আমার খাবে কে?

গজু ঃ কেন মামী, আমাকে কি তাড়িয়ে দিচ্ছ তাহলে?

মাতঙ্গিনী ঃ ষাট, ষাট, তাই কি পারি বাবা? নিস্তারিদি ছিল আমার আপন মামাত ননদ। তার ছেলে তুই, তুই কি আমার পর? আসলে কি জানিস? হ্যাঁ, কৈ বল না গো, তুমিই সব কথা বল না গজুকে বুঝিয়ে। ও ত বোকা ছেলে নয়, বুঝবে।

বিপিন ঃ কি জানিস গজু? আমার আর খাটার ক্ষমতা নেই। আস্তে আস্তে তাই রোজগারটা গেছে বন্ধ হয়ে। নিজেরাই পেট ভরে খেতে পাচ্ছি না দুবেলা। ভেবেচিন্তে তাই ঠিক করেছি, রাধানগরে আমার এক পয়সাওয়ালা বন্ধুর ওখানে রেখে আসব তোকে কাল সকালে। যাবি ত?

মাতঙ্গিনী ঃ এখানে তোকে রাতদিন কত খাটতে হচ্ছে। গরীবের ঘর, আমার ত লোকজন রাখার শক্তি নেই।

বিপিন ঃ সেখানে খাসা রাজার হালে থাকবি। কিছুটি করতে হবে না। শুধু লেখাপড়া করবি, আর খেলাধুলো করবি। এক বেলা খাবি মাছ ভাত, এক বেলা মাংস রুটি। ইয়া তাগড়াই হয়ে যাবে চেহারা দুদিনেই।

গজু ঃ কিন্তু তোমাদের ছেড়ে যেতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে যে। ও হো হো মামাগো, মামীগো, তোমাদের জন্যে ভীষণ মন কেমন করছে যে!

মাতঙ্গিনী ঃ তা আর করবে না বাবা? আপনার জন রক্তের টান ত!

গজু ঃ আচ্ছা মামা, আজ ত বুধবার, বিষ্যুৎ, শুক্কুর, শনি ঃ এই তিনটে দিন যদি থাকি আর। রবিবারে ঠিক চলে যাব।

বিপিন ঃ তাই হবে।

গজু ঃ এখন ত কোন কাজ নেই। এখন তাহলে একটু তরজা শুনিগে বারোয়ারি তলায়। সন্ধ্যের আগেই ফিরব।

[প্রস্থান]

মাতঙ্গিনী ঃ মনে কষ্ট হয়েছে। দেখলে না কেঁদেই ফেলল। আহা!

বিপিন ঃ আরে ও কুমীরের কান্না, ওতে ভুল না। ওকে বেশী দিন রাখলে শেষ পর্যন্ত জেলে ঢুকতে হবে আমার।

[ডাক্তার বাবু আছেন বলতে বলতে এসে ঢুকলেন পান্নালাল বাবু দারোগা ও একজন চৌকিদার।]

বিপিন ঃ ঐ দেখ, নাম করতে করতেই পুলিশ। নিশ্চয় কারোকে খুন জখম করেছে পাজিটা, নয়ত চুরি ফুরি করেছে কোথাও। আমি কিন্তু সরে পড়ছি, বল বাড়ী নেই।

মাতঙ্গিনী ঃ সে আবার কি? আমি মেয়েছেলে, আমি কি বলব পুলিশকে? দাঁড়াও, পালিও না।

চৌকিদার ঃ কৈ ডাক্তার বাবু, এদিকে আসুন। দারোগা বাবু ডাকছেন যে।

বিপিন ঃ দোহাই বাবা, আমি কিছু জানি না। আমি আগেই বলেছি ও একদিন জেলে যাবে। তাইত এখান থেকে তাড়ানর.........

দারোগা ঃ আপনার ভাগ্নে গজেন গুপ্ত?

বিপিন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি করেছে সে এই যে ওর মামী, ওকে বলুন। ওর আস্কারাতেই.........

দারোগা ঃ আপনাদের গজেন সেদিন প্রসিদ্ধ ডাকাত বছির আলীকে ধরায় প্রচুর সাহায্য করেছে পুলিশকে, আচমকা তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খুশী হয়ে তাই তাকে নগদ দুশো টাকা আর একটা বন্দুক দিতে রাজী হয়েছেন। ১৪ই মার্চ দুইই ওদের স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যেন নিয়ে আসে।

বিপিন ঃ আচ্ছা নমস্কার।

দারোগা ঃ নমস্কার।

[দারোগা ও চৌকিদারের প্রস্থান]

বিপিন ঃ শুনলে? শুনলে হতভাগাটার কান্ড! ডাকাতকে পর্যন্ত ভয় নেই শয়তানটার!

মাতঙ্গিনী ঃ শুনলাম। ভালই ত লাগল।

বিপিন ঃ ভাল? ভাব এবার ঐ বন্দুক থেকে কি করে মাথা বাঁচাবে। ও ত সকলকে গুলী করে শেষ করবে। সর্বনাশ হল রে।

মাতঙ্গিনী ঃ এ কি বলছ তুমি? এমন ভাগ্নের মামা তুমি, তাই না মুখটা এমন উজ্জ্বল হল তোমারও।

বিপিন ঃ অ, কি আমার উজ্জ্বল রে!

[দুজনের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

বেহুলা নদীর গা দিয়ে চলে গেছে জংলা পথ। এই পথের ওপর ঝাঁকড়া মাথা লোহাচোরা বটগাছ। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় ছাতা হাতে জনার্দন হাজরা ও গোকুল পন্ডিত মশায়ের প্রবেশ।

জনার্দন ঃ এস গোকুল, একটু বসা যাক গাছ তলায়। পা দুটো বড্ড ধরে গেছে। দুপুর রোদে অত হাঁটা কি পোষায়? তার ওপর ভরপেট খাওয়া হয়েছে!

গোকুল ঃ খাইয়েছে কিন্তু বেশ, তাই না?

জনার্দন ঃ খাওয়াবে না? নাতির অন্নপ্রাশন। তাছাড়া যাতা নয় ত ওর ছেলে। সেকেন্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ। একশো দশ টাকায় মাইনের চাকরি করে জেলা বোর্ডে। সেই ছেলের ছেলে।

গোকুল ঃ তোমার মেয়ের বিয়েতে কিন্তু এমন ভাল করে খাওয়াও নি। অর্ধেক লোক মাছ পায়নি। দইও ছিল না শেষ দিকে।

জনার্দন ঃ আমি ত আর অশ্বিনী চাটুজ্যের মত ধনী নই। তার ওপর আমার ছিল মেয়ের বিয়ে। তাতে ত ঘরে কিছু আসে না, ঘরের পুঁজিই বাইরে চলে যায়।

গোকুল ঃ ওকথা বল না জনার্দন। তোমারও টাকার গতি-গংগা নেই। আসলে তুমি হাড়কিপটে!

জনার্দন ঃ আমি কিপটে?

গোকুল ঃ কিপটে নও ত কি? নইলে তোমার ছেলে নেই, পুলে নেই। একটা মেয়ে, তারও বিয়ে হয়ে গেছে। এই যে গাঁয়ে হাই ইস্কুল নেই, হাসপাতাল নেই, টিউবওয়েল আর পাকা সড়কের জন্যে লোকে মাথা কুটে মরছে, তুমি ইচ্ছা করলেই লাখ তিনেক ঢেলে এসব করিয়ে দিতে পার। পার না?

জনার্দন ঃ পাগল! লাখ তিনেক টাকা আমার চোদ্দ পুরুষেও দেখেনি।

[হঠাৎ গাছের ওপর থেকে একখানা খড়ম পড়ল জনার্দনের পিঠে]

গোকুল ঃ একি, খড়ম এল কোথা থেকে?

জনার্দন ঃ আশ্চর্য ব্যাপার ত।

[সংগে সংগে পড়ল একটা হুঁকো গোকুলের মাথায়।]

গোকুল ঃ হুঁকো! ব্যাপার কি? লোক নেই, জন নেই, ভরা সন্ধ্যে বেলা নদীর ধারে.......

[ছায়া মূর্তির প্রবেশ]

জনার্দন ঃ পালিয়ে এস গোকুল, ভূ-ভূ-ভূ-ত!

গোকুল ঃ পালিয়ে চল, জ-জ-নার-দন-দা!

ছায়ামূর্তি ঃ দাঁড়াও, পাঁলাঁলে কিন্তু ভীষণ বিপদ হবে। জনার্দন, মিথ্যে কথা বললে কেন? তোঁমার লাখ তিনেক টাঁকা নেই? পাঁজি কোঁথাকার, সঁত্যি বঁল আঁছে কিনা?

জনার্দন ঃ আছে, আছে। তিন চার কেন, আটদশ লাখ আছে স্যার।

ছায়ামূর্তি ঃ তঁবে? শীঁগ্রী বঁল তাঁ থেঁকে লাঁখ তিনেক দিঁয়ে আঁজই গ্রাঁমে ইস্কুল, হাঁসপাতাল, আঁর পাঁকা রাঁস্তা কঁরাবে কিনা? নইলে কিন্তু ঘাঁড় ভাংগব তোমার এক্ষুণি!

জনার্দন ঃ করাব, করাব। আমায় ছেড়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি স্যার।

ছায়ামূর্তি ঃ কঁথা দিচ্ছ?

জনার্দন ঃ দিচ্ছি, দিচ্ছি। সাত দিনের মধ্যেই গাঁয়ের লোক ডেকে সমিতি করে তাদের হাতে নগদ টাকা ধরে দোব।

ছায়া ঃ বেঁশ। না যঁদি কঁর, সাঁতদিন পঁরে কিন্তু তোঁমার মুন্ডু নিঁয়ে আঁমি গেন্ডুয়া খেঁলব। আঁমি কে জাঁন?

জনার্দন ঃ না স্যার। চিনতে পারছি না ত। বলুন দয়া করে।

ছায়ামূর্তি ঃ নাঁরাণ ভঁট্টচার্যিকে মঁনে আঁছে? তোঁমার কাঁছারিতে কাঁজ কঁরত। হিঁসেব ভুঁলের জন্যে তাঁকে মেঁরে তাঁড়িয়ে দিঁয়েছিলে। না খেঁয়ে মঁরে গিঁয়েছিল বেঁচারী। সেই নাঁরায়ণ আঁমি।

জনার্দন ঃ মাপ করুন, মাপ করুন ভূত বাবু। আপরাধ হয়েছে, ভীষণ অপরাধ হয়েছে আমার।

ছায়ামূর্তি ঃ বঁহুত আঁচ্ছা। লোঁকের ভাঁল কঁর, তাঁহলেই মাঁপ কঁরব আঁমি। নইলে সাঁতদিন পঁরেই কিন্তু......আঁর গোঁকুল?

গোকুল ঃ বলুন বলুন ভূতবাবু, আ-আ আমি ত কোন দোষ করিনি।

ছায়ামূর্তি ঃ কঁরনি? গঁজু, পিন্টু, বিলু, হাঁদু, এঁসব ভাঁল ভাঁল ছেঁলের নাঁমে তাঁদের বাঁড়ীতে গিঁয়ে নাঁলিশ কঁরনি? মাঁর খাঁওয়াও নি তাঁদের? স্কুল ফাঁকি দিঁয়ে বাঁড়ী গিঁয়ে নিজে ঘুম দাঁওনি ভোঁস ভোঁস করে?

গোকুল ঃ আর করব না হুজুর। কোন দিন কারো নামে কিচ্ছু বলব না আর। কোনদিন আর দুপুরে ঘুমুব না।

ছায়ামূর্তি ঃ ঠিঁক তঁ? মঁনে থাঁকে যেঁন! নঁইলে কিন্তু তোঁমারও ঐ সাঁতদিন। আঁচ্ছা যাঁও এঁখন দুজনেই।

জনার্দন ও গোকুল ঃ তাই হবে হুজুর। নমস্কার।

[এক দিক দিয়ে ভূতের, অন্য দিক দিয়ে দুজনের প্রস্থান।]

সপ্তম দৃশ্য

ময়নার মাঠে বসেছে মস্ত সভা। মঞ্চে গলায় মালা পরে বসে আছেন জনার্দন হাজরা ও সভাপতি গোকুল পন্ডিত মশায়। সামনে অনেক শ্রোতা তাঁদের অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে রয়েছেন।

গোকুল ঃ প্রথমে গাঁয়ের ছোট ছোট মেয়েরা একটু নৃত্য গীতের অনুষ্ঠান করছে। তারপরই আমি দানবীর শ্রী জনার্দন হাজরা মশায়কে তাঁর বক্তব্য বলতে অনুরোধ করব।

[ছবি, লক্ষ্মী, রাধা ও বিজয়ার প্রবেশ]

গান

কোথা থেকে বাতাস আসে, কোথায় চলে যায়?
পাখী কেন রোজ সকালে খুশীতে গান খায়?
কেমন করে বনে বনে,
ফুলরা ফোটে আপন মনে,
আকাশ মাখে সোনার আবীর নিজের সারা গায়!
আমরা পারি বলে দিতে গোপন কথা তার,
বলতে পারি ফুলের পাখীর সকল সমাচার,

বলতে পারি আকাশ জলে কি সুর ভেসে যায়॥
[সকলে গোল হয়ে নাচতে নাচতে প্রস্থান]

জনার্দন ঃ মাননীয় সভাপতি, সমবেত ভদ্র-মহিলা ও মহোদয়েরা, আমি বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত নই। সভা-সভায় দাঁড়ালেই সারা পেটটা কেমন যেন গুড় গুড় করে আমার। আমি শুধু একটা মাত্র কথাই বলছি। আজ আপনারা আমাকে যে সম্মান দেখালেন, তাতে আমি কৃতার্থ। আমার যা বক্তব্য তা বিশদভাবে বলবেন আপনাদের, আমার বন্ধু সভাপতি মহাশয়।

গোকুল ঃ বন্ধুগণ, দানবীর জনার্দন হাজরা শুধু মহান দাতাই নন, সাধুতা এবং বিনয়েও তিনি সকলের আদর্শ। এই গ্রামে একটি পাঠশালা মাত্র ছিল, আর ছিল ছোট্ট একটা দাতব্য চিকিৎসালয়। আজ তাঁরই দানে স্কুলটিকে হাই স্কুলে রূপ দেওয়ার সুযোগ হল। সুযোগ হল হাসপাতালটি বড় করার। এ ছাড়া স্টেশন থেকে যে কাঁচা রাস্তাটা এসেছে গ্রাম পর্যন্ত, তাকে পাকা করারও ব্যবস্থা হচ্ছে। এই পাঁচ মাইল রাস্তা দিয়ে এরপর দুবেলা বাস চলাচল করবে। আর সেই রাস্তার প্রতি মাইলে চারটি করে নলকূপ বসবে। আপনারা জয়ধ্বনি দিন ওর নামে।

সবাই ঃ জয় দানবীর জনার্দন হাজরার জয়।

জনার্দন ঃ উনি সবশুদ্ধ তিন লক্ষ পনের হাজার টাকা এই উপলক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দিয়েছেন। তিনি এজন্যে ওঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন একখানা। সেই সঙ্গেই জানিয়েছেন যে কাজ শুরু হয়ে যাবে শীগ্‌গীরই।

সবাই ঃ আমাদের একটা পোস্টঅফিস চাই, একটা সিনেমা চাই, চাই একটা লাইব্রেরী। একটা............

জনার্দন ঃ হবে, হবে, সব হবে। সে সব কাজে যা লাগবে, তাও আমি দোব। কি হবে আমার টাকায়? এতদিন বুঝিনি, তাই শুধু বোকার মত জমা করেছি। আজ চোখ খুলে দিয়েছেন আমার স্বয়ং ভগবান, দারুন একটি ঘটনার ভেতর দিয়ে।

সবাই ঃ কি ঘটনা স্যার, বলুন একটু আমাদের।

গোকুল ঃ বন্ধুগণ, ওঁর শরীর অসুস্থ, ওঁকে বকাবেন না আর। আমিই বলছি। উনি আর আমি দুজনে আসছি একদিন নদীর ধার ধরে, একটা নিমন্ত্রণ সেরে। হঠাৎ লোহাচোরা বটগাছের ওপর থেকে হল এক দৈববাণী। দুজনেই শুনলাম, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেল ওঁর মতি পরিবর্তন।

[ভীড়ের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গজু এগিয়ে এল।]

গজু ঃ আমি একটা কথা বলব স্যার?

গোকুল ঃ না, না, লক্ষী ছেলে, তুমি বস। বড়দের সভায় ছোটদের কিছু বলতে নেই। তোমার কথা আমিই বলছি সকলকে। এই যে গজু, বিপিন বাবুর ভাগ্নে শ্রীমান গজেন, এও আমাদের গ্রামের একটি উজ্জ্বল রত্ন। সাহসিকতার ও সমাজ সেবার জন্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ওকে উপহার দিয়েছেন নগদ দুশো টাকা, আর এই বন্দুকটি। এই নাও গজু। (বন্দুক দিয়ে) ওর নামেও জয়ধ্বনি দিন আপনারা।

ছেলেরা ঃ থ্রি চীয়ার্স ফর গজেন গুপ্ত! গজু সর্দার জিন্দাবাদ। লং লীভ গজেন ভাই!

[জনার্দন ও গোকুল ছাড়া সকলের প্রস্থান]

জনার্দন ঃ খুব বাঁচিয়েছ ভাই। আমি ত আর একটু হলে বলেই ফেলেছিলাম ভূতের কথা। এইসা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম!

গোকুল ঃ রামো, রামো। তাহলে কি আর গাঁয়ে টেঁকা যেত?

[উভয়ের প্রস্থান]

অষ্টম দৃশ্য

মাতঙ্গিনী ঘরের মেঝেয় বসে সেলাই করছেন। হন হন করে এসে ঢুকলেন বিপিন বাবু। তাঁর হাতে এক গোছা নোট। টাকাগুলো গুণতে লাগলেন তিনি এক এক করে।

বিপিন ঃ গজা, গজা কোথায়? রাধানগরের সেই প্রাণকেষ্ট বাবু এসেছেন। এখনি নিয়ে যাবেন ওকে। এই দেখ দুশো টাকা দাম দিয়েছেন তিনি।

মাতঙ্গিনী ঃ ওকে ত অনেকক্ষণ থেকে দেখছি না। কোথায় গিয়েছে কে জানে! যা মাথায় তুলেছে গাঁয়ের লোক, শেষ পর্যন্ত গেলে হয়!

বিপিন ঃ যেতেই হবে। না গেলে বেঁধে বিদেয় করব আমি। বসে বসে খাওয়াব ওকে আমি? দামড়া পাজি, অকাল কুষ্মান্ড!

মাতঙ্গিনী ঃ ভদ্রলোককে ততক্ষণ চা-টা দাও একটু। ও আসুক।

বিপিন ঃ হ্যাঁ চা দোব, না বাগবাজারের রসগোল্লা এনে খাওয়াব। এ হল ব্যবসা। খদ্দের এসেছ, পয়সা ফেল, মাল নিয়ে সরে পড়। কিন্তু ছুঁচোটা গেল কোথায়? বিপদে ফেললে ত!

মাতঙ্গিনী ঃ দেখ ত মাঝের এই দুয়োরটা খুলে ভাঁড়ার ঘর থেকে কেমন যেন বিড় বিড় শব্দ শুনছি একটা!

[দরজা খুলতেই দেখা গেল লুঙ্গীর মত করে কাপড় পরে গজু একখানা গামছা পেতে তার ওপর নামাজ পড়ছে।]

বিপিন ঃ গজু?

মাতঙ্গিনী ঃ ওকি করছিস তুই, অ্যাঁ?

গজু ঃ আঃ ঈশ্বরের নাম করছি, উৎপাত করছ কেন?

বিপিন ঃ ঈশ্বরের নাম করছিস ত মুসলমানদের মতন করে করছিস কেন?

গজু ঃ মুসলমানরা মুসলমানদের মত করে করবে না ত কার মত করে করবে?

বিপিন ঃ মুসলমান? কে মুসলমান? তুই নিস্তার দি আর অম্বিকা জামাই বাবুর ছেলে না?

গজু ঃ কে বললে? আমি রোকেয়া বিবি ও মকবুল মিয়ার ছেলে। তোমার খুড়তুত ভগিনীপোত তারিণী সেন তের টাকা ঘুষ দিয়ে আমাকে গজু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে, তোমাদের জাত মারতে।

মাতঙ্গিনী ঃ কি সর্বনাশ! আমরা যে তোর হাতের খেয়েছি! তোকে যে ঘরদোর, হাঁড়িকুঁড়ি, সর্বস্বি ছুঁতে দিয়েছি!

বিপিন ঃ জাতধর্ম সব নষ্ট হল! এখন উপায়?

মাতঙ্গিনী ঃ ওরে আমার কি হল রে! ওরে হতচ্ছাড়া গজা, এ তুই কি করলি রে?

[শেষাংশ ৩৩৬ পৃষ্ঠায়]

৬৬ খৃস্টাব্দের কথা। রোম-সম্রাট নিরোর বয়স তখন উনত্রিশ। তাঁর রাজত্বের বয়স হল তের বছর। ঐ সময় সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে তিনি গ্রীসে পাড়ি জমালেন। খামখেয়ালী সম্রাটের মতলবটা ছিল এমনই উদ্ভট যা অতি বড় স্বেচ্ছাচারী শাসকের পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। পুটোলি বন্দর থেকে দশখানা জাহাজে করে তিনি যাত্রা করলেন। পুরো একটা জাহাজই বোঝাই করা হয়েছে নানা রঙে আঁকা থিয়েটারের সিন-সিনারি আর মেক-আপের সাজসরঞ্জাম দিয়ে। বহু নাইট এবং সেনেট সদস্যকেও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে, কারণ তাদের রোমে রেখে দূরদেশে যেতে নিরো ভয় পান। পিছনে শত্রু রেখে গেলে কতরকমের যে বিপদ ঘটতে পারে, সে বিষয়ে জ্ঞান খুব টনটনে। সুযোগ পেলে পথেই তাদের সাবাড় করার একটা গোপন ইচ্ছাও সম্রাটের মনে আছে।

অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন নাটাস, নিরোর সঙ্গিত-শিক্ষক। আছে ক্লডিয়াস, রোমের সেই স্বনামধন্য নকীব, যে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে রাজকীয় আগমন-নির্গমন বার্তা এবং আদেশ-নির্দেশ। বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হাজারখানেক অনুগকেও দলভুক্ত করা হয়েছে। তাদের কাজ হল সময়মত অনুষ্ঠান সভায় জড়ো হওয়া, প্রভু নিরোর গান-বাজনার সময় ঠিকভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা এবং বাহবা দেওয়া। এই বাহবা-পার্টির মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি শ্রেণী বিভাগ। এক একরকম ভাবোদ্গারের জন্য এক একটি দল। কেউ কেউ চাপা শব্দ করে ভাষাহীন উচ্ছ্বাসের ঢেউ বহাবে, একদল দেবে চড়চড় করে হাততালি। কেউ উন্মত্ত চিৎকার করে উল্লাস জানাবে, কেউ দেবে তীব্র শিস, কেউ বা বেঞ্চগুলিকে লাঠিপেটা করে বিকট শব্দঝঙ্কার তুলবে। বাহবা-পার্টির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশটি একজন আলেকজান্দ্রিয়ান ওস্তাদের কাছ থেকে বিশেষভাবে ট্রেনিং নিয়েছে। তাদের সমবেত কণ্ঠের গিটকিরির গুঁতোয় সভার লোকজন হতভম্ব হয়ে যেত।

নিরোর কন্ঠস্বর যেমন কর্কশ তেমনি বেসুরো। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। ঐ ভাড়াটে স্তাবকদের দিয়েই কিস্তিমাত করা যাবে বলে তিনি মনে করেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান গ্রীসে যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেখানে অংশ নিতে হবে এবং জিততে হবে। শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত বিশারদের প্রাপ্য পুরস্কার সেই মহামূল্য মনিহার গলায় পরে যখন তিনি ফিরে আসবেন, তখন মহানগরী রোমে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। সম্রাটের সঙ্গীত-প্রতিভা নিয়ে আড়ালে আবডালেও কেউ ঠাট্টা-তামাশা করতে সাহস করবে না।

ঊর্মিমুখর ভূমধ্যসাগরের সুনীল জলরাশি ভেদ করে তরতর করে এগিয়ে চলেছে রাজকীয় নৌ-বহর। সম্রাটের কামরায় চলছে গানের মহড়া। নিরোকে নিয়ে সঙ্গীত-শিক্ষক নাটাসের ব্যস্ততার সীমা নেই। দু-এক ঘন্টা বাদে বাদেই একজন নুবিয়ান ক্রীতদাস এসে অলিভ-তেল আর সুগন্ধ বৃক্ষনির্যাস দিয়ে রাজার গলা মালিশ করে দিয়ে যাচ্ছে। কাব্য ও সঙ্গীতের তীর্থভূমিতে নিখুঁত কন্ঠস্বর নিয়ে উপস্থিত হবার জন্য সম্রাটের যত্নের অবধি নেই। খাদ্য, পানীয় এবং ব্যায়ামের ব্যাপারেই বা কত সাবধানতা।

একজন মহাবীর যেন দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। নৌবহরের মাঝখান থেকে অনবরত গানের ফোয়ারা উঠছে আর ছড়িয়ে পড়ছে সাগরে।

স্বভাব কবি পলিক্লিস দুনিয়ার কোন খবরই রাখে না। বাস করে হেরোয়ার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে। পেশায় পশুপালক, কিন্তু গ্রীক লোকসংগীতের রত্নখনি হাতের মুঠোয়। আলফিয়ুস নদীর মাইল পাঁচেক উত্তরে, বিখ্যাত অলিম্পিয়া নগরীর খুবই কাছেই সে থাকে। শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য রচনার জন্য দু'দুবার আঞ্চলিক পুরস্কার পেয়েছে। লোকসংগীত শিল্পী হিসাবেও বিজয়ী হয়েছে অনেক প্রতিযোগিতায়। বহু ব্যবহারে বিবর্ণ বীণাটি সব সময়ই তার কাঁধে ঝোলে। বীণা ছাড়া পলিক্লিসের কথা কেউ ভাবতেই পারে না। গায়ক এবং কবি হিসাবে তার যেমন খ্যাতি, তেমনি একরোখা উগ্রস্বভাবের জন্য কুখ্যাতিও কম নয়। চেহারাটি তার ভারী সুন্দর আর স্বাস্থ্যে ভরপুর। সে তল্লাটে পলিক্লিসকে গায়ের জোরে হারাতে পারে এমন কোন লোকই ছিল না। বদমেজাজী লোকের পক্ষে এ এক মস্ত সুবিধা। বিরোধিতা দূরে থাক, সামান্যতম মতের অমিল হলেও সে কাউকে বরদাস্ত করত না। ফলে প্রতিবেশীরা ক্রমে ক্রমে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। স্বভাবের এই দোষটি না থাকলে তার খ্যাতি এতদিনে সারা গ্রীসে ছড়িয়ে পড়ত। মাঝে মাঝে নিজের বিগড়ে যাওয়া মেজাজটা শান্ত করতে গিয়ে সে জনমানবশূন্য দুর্গম অঞ্চলে চলে যেত। মাসের পর মাস কাটিয়ে আসত পাহাড়ের গুহায়। তখন বিশ্বচরাচরের কথা ভুলে শুধু সংগীতের মধ্যেই নিজেকে ডুবিয়ে রাখত।

এহেন পলিক্লিস একদিন সকালবেলা মেষপাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সাথে রয়েছে কিশোর পুত্র ডোরাস। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বেশ কিছু দূরে উঠে যাবার পর হঠাৎ তাদের নজরে এল সবুজ ঘাসে ঢাকা এক নতুন পশুচারণভূমি। ভেড়াগুলোর সাথে সাথে রাখালের মনটাও খুশিতে ভরে ওঠে। আরও দূরে অনেক নীচে চলে যায় পলিক্লিসের দৃষ্টি। ছবির মত সুন্দর অলিম্পিয়া শহরটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারখানা কী? অ্যামফি থিয়েটার অমন জমকালোভাবে সাজানো-গোছানো হয়েছে কেন? নির্জনে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত পলিক্লিস বাইরের জগতের কোন খোঁজ-খবর রাখত না। তাই ওখানকার ব্যাপার নিয়ে সঠিক কিছু আন্দাজও করতে পারল না। ধরে নিল, নিশ্চয়ই কোন উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা নয়, কারণ অলিম্পিয়ার বিধি অনুযায়ী আগামী দু-বছরের মধ্যে তা হতে পারে না বলেই সে জানে। তাহলে ঘটনাটা কী? বোধহয়, গীতিকাব্য অথবা সংগীত প্রতিযোগিতার আসর বসবে।

রাখাল-কবির মনটা দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। পা দুটোও ছটফট করছে। ওখানে গিয়ে কোনমতে নাম দিতে পারলে দু'একটা পুরস্কারও জুটে যেতে পারে। স্বপক্ষে বিচারকদের রায় পেলে কার না আনন্দ হয়? তবে ওসব না হলেও পলিক্লিসের কোন আপত্তি নেই। দেশ-দেশান্তর থেকে যে সব শিল্পীরা আসবেন, তাদের গান আর কাব্যগাথা শুনতে পারাটাও কম কথা নয়। পুত্র ডোরাসের উপর ভেড়াগুলোর ভার দিয়ে অলিম্পিয়ার অ্যামফি থিয়েটার লক্ষ্য করে ছুটলো সে।

শহরতলী এলাকায় ঢুকে সে কোন জনপ্রাণীর সাক্ষাৎ পেল না। আরও তাজ্জব ব্যাপার, রাজপথও একেবারে জনশূন্য। অতুলনীয় এক গানের আসরের কথা ভেবে পুলকিত পলিক্লিস আরও জোরে পা চালাল। যতই সে অ্যামফি থিয়েটারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই জোরালো হয়ে কানে বাজছে চাপা কোলাহলের গমগম শব্দ। ওখানে যে কী বিরাট জনসমাগম হয়েছে, দূর থেকেই তা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বিশাল দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে তার যেন মাথা ঘুরে গেল। এত বড় জনসমাবেশ সে জীবনেও দেখেনি। প্রবেশ পথে এক দঙ্গল সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। তাদের পাশ কাটিয়ে চট করে ভিতরে গলে গেল পলিক্লিস। কিন্তু দরজা ছাড়িয়ে আর এগিয়ে যাবার উপায় নেই। চারদিকে গিজগিজ করছে মানুষ! অত বড় স্টেডিয়ামের কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। আশেপাশে অনেক চেনা লোকজন সে দেখতে পেল। বেঞ্চের উপর একেবারে ঠাসাঠাসি করে বসে তারা মঞ্চের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। বৃত্তাকার দেওয়ালের গায় লেপ্টে আছে কাতারে কাতারে বল্লমধারী সৈন্য। দলের মাঝখানটা দখল করে আছে একদল লম্বা চুলওয়ালা বিদেশী, পরনে ধবধবে সাদা গাউন। সবই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে, কিন্তু কিসের জন্য এতবড় একটা আয়োজন তা বুঝে উঠতে পারছে না।

ঝুঁকে পড়ে একজন পরিচিত লোককে কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বিপদ ঘটল। একজন সৈনিক তাকে বল্লমের বাট দিয়ে খোঁচা মারল, চুপচাপ থাকতে আদেশ দিল রূঢ়ভাবে। পরিচিত সেই লোকটি ভাবল যে, পলিক্লিস বোধহয় একটুখানি বসার জায়গা চায়। তারা সবাই মিলে অনেক চেপেচুপে বিঘৎখানেক জায়গা করে দিল বেঞ্চের কিনারে। পুরানো বন্ধু, করিন্থের নামজাদা চারণগায়ক মেটাসকে মঞ্চের উপর দেখে পলিক্লিস ব্যাপারটা বুঝতে পারল। এটা যে সংগীত প্রতিযোগিতার আসর, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এভাবে রাজ্যশুদ্ধ লোক এসে ভেঙে পড়েছে কেন? বোধহয়, কোন জগদ্বিখ্যাত গায়কের গান শুনতেই। দারুণ কৌতূহল নিয়ে সে বসে রইল।

মেটাস গাইতে শুরু করেছে। ভারী সুন্দর গান। যেমন দরাজ গলা, তেমনি চমৎকার অভিব্যক্তি। কিন্তু কী আশ্চর্য! শ্রোতারা এমন অসাড় কেন? কেউ একটুখানি গুঞ্জন করেও কি বাহবা দিতে পারছে না? সংগীত-পাগল গ্রীকদের এ কী হাল! মরুক গে, যে যা খুশি করুক! পলিক্লিস কারুর তোয়াক্কা করে না। মেটাসকে সে একাই প্রচন্ড উল্লাসধ্বনি তুলে অভিনন্দিত করল। পরক্ষণেই সে অবাক হয়ে দেখল, সৈনিকেরা তার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। চেনা-শোনা মানুষরাও তাকে যেন আজব একটা কিছু মনে করছে। বেপরোয়া পলিক্লিস হাততালিও দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বহুকষ্টে নিজেকে সামলে নিল। কারণ বিশাল জনমন্ডলীর মেজাজ তার বিরুদ্ধে চলে গেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মেটাসও আচমকা আসর ত্যাগ করল। এমন নিরুত্তাপ এবং তাচ্ছিল্যভরা পরিবেশে কোন গায়কই গান করতে পারে না।

তারপর যা ঘটল তা দেখে পলিক্লিসের চোখ কপালে

উঠল। মঞ্চের উপর এক গায়ক এসে দাঁড়ালেন। সংগে সংগে এক বিরাট অংশ ফেটে পড়ল উল্লাসে। কী বিদঘুটে চেহারা লোকটার! তবে নিশ্চয়ই একজন নামজাদা গায়ক-টায়ক হবেন। নইলে শুধু চেহারা দেখেই বা লোকে এমন মাতামাতি শুরু করবে কেন? পলিক্লিস তাঁকে কোন দিন দেখেনি। মানুষটি যেমন বেঁটে তেমনি মোটা। যুবক নয়, তবে খুব বয়স্কও নয়। গলাটা ভীষণ মোটা, একেবারে ষাঁড়ের মত। মস্ত বড় মুখখানা হাঁড়ির মতই গোল। পোশাক-আশাকও উদ্ভট। নীল রঙের অত্যন্ত আঁটসাট জামা গায়ে। কোমরে পেঁচানো সোনালী বেল্টের নীচ থেকে তা আবার ছড়িয়ে ঝুলে পড়ছে। গলা থেকে বুক পর্যন্ত অনাবৃত। গোদা গোদা পা দুটোও উরুর মাঝখান থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ নিরাবরণ। চুলের দুপাশে দুখানি সোনার পাখনা, দু-পায়ের দুই গোড়ালিতেও সোনার পাখনা আটকানো। ফ্যাশানটা রোমান-দেবতা মারকারির অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। পিছনে বীণা হাতে ঘুরছে একটা নিগ্রো ক্রীতদাস এবং পাশে এসে দাঁড়িয়েছে জমকালো গাউন পরা একজন হোমরা-চোমরা স্থূলকায় ব্যক্তি। বোধহয়, সংগীত-বিশেষজ্ঞ কেউ হবে। নীলাম্বর গায়ক ঐ দাসের হাত থেকে বীণাটি নিলো। তারপর ধীরে ধীরে মঞ্চের সামনে এসে উৎফুল্ল জনতার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। পলিক্লিস ভাবল, এথেন্সের কোন আত্মম্ভরী ধনীর দুলালই বুঝি গানের ছুতোয় দেমাক দেখাতে এসেছে। আবার এটাও ঠিক যে, অলিম্পিয়ানদের কাছে থেকে এমন বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করা কোন হেঁজিপেঁজি লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

নীলাম্বর শিল্পী প্রথমে বীণার তারে নানা রকম উৎকট ঝংকার তুলল। তারপর হঠাৎ কানফাটা চিৎকার করে শুরু করল গান। হতচকিত রাখাল-কবির বিস্ফারিত চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গায়ক এখন নীচু থেকে উঁচু পর্দায় স্বরগ্রাম তোলার কসরত দেখাচ্ছে। প্রথমে শুয়োরের ঘোঁৎ ঘোঁৎ, তারপর চাপা ঘড়ঘড়, শেষে বিকট চিৎকার। একটা ঘেয়ো কুকুরই বুঝি অন্তিম আর্তনাদ করছে! গানের নামে এ কী যাচ্ছেতাই কান্ড! সংগীত-তীর্থ অলিম্পিয়ার অ্যামফি থিয়েটারে এ কী অনাচার! গায়ক মশাই হঠাৎ গলা বাড়িয়ে মুখখানা উপরে তুলল। যতটা পারা যায়। শিরদাঁড়া টান করে নিল। শেষে পায়ের আঙুলে ভর করে খানিকটা উঁচুও হল। এবার যা ঘটল তার চেয়ে হাস্যকর ব্যাপার কল্পনাও করা যায় না। দীর্ঘস্থায়ী বীভৎস গর্জনের দম রাখতে গিয়ে গায়কের গলা নাক-চোখ পর্যন্ত টকটকে লাল। রাখাল-কবির মনে হল, সেই ঘেয়ো কুকুরটাকেই বোধহয় কেউ লাথি মেরে বসেছে। আরও আশ্চর্যের কথা, বীণাটাও গায়কের সাথে বিকট সহযোগিতা করছে। কান্ডকারখানা দেখে মাথা গুলিয়ে গেল পলিক্লিসের। গানের এই ভয়াবহ তান্ডব শ্রোতাদের মনেই কোন্ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে? এই বিশাল সমাবেশটা কী মানুষের, না জড়পদার্থের? কড়া সমালোচক বলে গ্রীকদের খ্যাতি আছে। এই অ্যামফি থিয়েটারে বসেই তারা এমন সব গাইয়েকে দুয়ো দিয়ে বিদায় করেছে যারা অন্তত গান জানত। হায় অ্যাপোলোদেব! আজ গানের আসরে বসে বসে সেই গ্রীকরাই কিনা উন্মাদের হুংকার শুনছে গভীর মনোযোগ দিয়ে!

কিন্তু আরও অনেক কিছু তখনও বাকী ছিল। গায়ক মশাই মুখের ঘাম মুছতে শুরু করা মাত্রই গোটা আসর যেন বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল। এমন উন্মত্ত, এমন উৎকট অভিনন্দনের নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। মেষপালক দুহাত দিয়ে নিজের মাথাটা চেপে ধরল। ওটা সুস্থ আছে কিনা তা নিয়েই তার ঘোরতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অথবা এ হয়ত এক ভয়ংকর সাংগীতিক দুঃস্বপ্ন, ঘুম ভেঙে গেলেই যার কথা ভেবে সে ঘামতে থাকবে। কিন্তু না, কোন স্বপনটপন নয়। এই তো প্রতিবেশীরা রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে পাশেই বসে আছে। সমঝদারদের উল্লাসের পালাও চলছেই। সহসা মাঝামাঝি জায়গা থেকে একজনের সুতীব্র চিৎকার গোটা স্টেডিয়ামকে কাঁপিয়ে তুলল। সংগে সংগেই অগণিত কন্ঠ সেই সুরে সুর মিলালো। এর সাথে যুক্ত হল শিস, হাততালি আর বেঞ্চ পেটাবার কানফাটা শব্দ। চারদিক থেকে আওয়াজ উঠছে, 'অতুলনীয়! স্বর্গীয়!' সংগঠিত একটি দল ভীমনাদে গিটকিরি দিচ্ছে। মনে হয় প্রলয়ংকর ঝড়ের ধাক্কায় উথাল-পাথাল সমুদ্রই বুঝি একটানা গর্জন করছে।

এ যে রীতিমত পাগলামী—একেবারেই অসহ্য পাগলামী! এ জিনিস যদি চলতে দেওয়া হয়, তবে তো সবই শেষ। কাব্য ও সংগীতের তীর্থক্ষেত্র গ্রীস তো শেষে কুকুর-বিড়ালের বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হবে! পলিক্লিসের একগুঁয়ে বিবেকটা এবার বিদ্রোহী হয়ে উঠল। যা থাকে কপালে, সে এটা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। বেঞ্চের উপর লাফিয়ে উঠে পলিক্লিস হাত নাড়তে লাগল। জঘন্যতম অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে দেহের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে হুংকার দিল। প্রথমে এটা কেউ খেয়াল করেনি। যত জোরেই হুংকার দিক না কেন, হৈ-চৈ-কোলাহলের মধ্যে তার কন্ঠ হারিয়ে গিয়েছিল। অনেকে এমনও ভেবেছে যে, পলিক্লিস বুঝি ঐ নীলাম্বর গায়ককেই সমর্থন জানাচ্ছে। কিন্তু এক সময় প্রত্যেকের দৃষ্টিই তার উপর এসে পড়ল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল আসর। শ্রোতারা বিস্ময়াভিভূত। টুঁ শব্দটি করতেও সবাই ভুলে গেছে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে কে ঐ বর্বর? কোন্ উদ্দেশ্য নিয়ে ও এই মহতী সংগীত-সভায় এসে উপস্থিত হয়েছে? পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে! ওর অমন সুন্দর দেহটা যে এক্ষুণি টুকরা টুকরা হয়ে যাবে! তবে রোমানরা যাই ভাবুক, গ্রীক শ্রোতারা গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

উজবুকের দল!—গর্জে উঠল ক্রোধান্ধ চারণকবি,—কিসের জন্য এত হাততালি? কেন এই নির্বোধ উল্লাস? তোমরা ভেবেছ কী? অলিম্পিয়া সংগীত প্রতিযোগিতায় একটা হোঁতকা কুকুর হবে বিজয়ী? ওর গর্জনে আর যাই থাকুক, গানের তাল বলে কোন বস্তু নেই। তবু এমন বাহবার ঘটা! হয় তোমরা বধির, নয় তো বদ্ধ পাগল। এই জঘন্য অনাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা জানাবার ভাষাও আমি হারিয়ে ফেলেছি!

সৈন্যরা পলিক্লিসকে শায়েস্তা করার জন্য এগিয়ে গেল। জনতার মধ্যে দেখা দিয়েছে দারুণ সংশয়। সৎসাহস দেখাবার জন্য কেউ পলিক্লিসকে প্রশংসা করছে, কেউ তাকে বাইরে

ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য দাবি জানাচ্ছে। সংগীত-সভায় মধ্যমণি সেই নীলাম্বর গায়ক বীণাটি নিগ্রো দাসের হাতে দিয়ে ব্যাপারখানা জানতে চাইলেন। এ নিয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে কিছুটা পরামর্শও করলেন। তারপরই একজন নকীব মঞ্চের সামনে এসে বজ্রকন্ঠে ঘোষণা করল যে, ঐ উদ্ধত গ্রীকটাকে এখনই কিছু করার দরকার নেই। তাকে এই মঞ্চে উঠে আসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যদি হিম্মত থাকে, তবে তার ক্ষমতা দেখিয়ে এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের অসারতা প্রমাণ করুক।

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল পলিক্লিস। এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে তার একটুও দ্বিধা নেই। তার মনের গোপন কোণে বুঝি এই রকম একটা বাসনাই লুকিয়ে ছিল। তা যখন পূর্ণ হল, তখন গান বলতে কী বোঝায় সেটা ঐ আকাট মূর্খদের দেখিয়ে দিতে হবে। দৃঢ়পদক্ষেপে সে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। সৈনিকদের সাহায্য লাগেনি, জনতাই পথ করে দিয়েছে। কোন রকম বিধি-নিয়মের তোয়াক্কা না রেখে উস্কোখুস্কো চারণকবি মঞ্চে উঠল। কাঁধে ঝোলানো সেই চিরসাথী বিবর্ণ বীণাটিকে তুলে নিল হাতে। বিশাল জনসমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবিচলভাবে বীণার তারে মোচড় দিতে লাগল। সুর ঝঙ্কার ঠিক করে নিতে খুব বেশী সময় নিল না। তারপর রোমান মহলের বিদ্রূপাত্মক হাস্য-ধ্বনি এবং উৎকট অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে সে গান ধরল।

এ ব্যাপারে কোন রকম পূর্ব-প্রস্তুতি ছিল না। স্বভাব-কবি পলিক্লিসের পক্ষে তার প্রয়োজনও নেই। মুখে মুখেই সে গান রচনা করে আর সুর দেয়। সদানন্দ কবির অন্তর মথিত করে উৎসারিত হয় কাব্য ও সংগীতের পূত ধারা। আজও কোন ব্যতিক্রম হল না। দেবাদিদেব জুপিটার এবং তাঁর প্রিয়তমা এলিস যে দেশে মিলিত হয়েছিলেন, সেখানকার ঢেউ খেলানো পার্বত্য উপত্যকা, সার বেঁধে যাওয়া মেঘের চলমান ছায়া, লাফিয়ে চলা নদী জলধারার নৃত্য-পাগল ছন্দ, মেঠো গন্ধে ভরা সুশীতল মলয় বাতাস, প্রদোষের মায়াময় হিমেল পরশ এবং আকাশ-মাটির সৌন্দর্য নিয়ে এক অপরূপ কাব্যগাথা সে গেয়ে গেল। এর মধ্যে কোন সূক্ষ্ম কারিগরির বালাই নেই, আছে শিশুসুলভ সারল্যের অনাবিল রূপায়ণ। প্রতিটি গ্রীকের মনের মধ্যে গিয়ে গেঁথে বসল ঐ কাব্যগীতি। কারণ এ হচ্ছে তাদের প্রিয়তমা মাতৃভূমি গ্রীসেরই বন্দনাগীত। যে গ্রীস নিয়ে তাদের গর্বের সীমা নেই, যার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে মহান পূর্বপুরুষরা যুগে যুগে আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন।

তবু খুব অল্প সংখ্যক শ্রোতাই এ সংগীতকে বাহবা দিতে সাহস করল এবং তাদের কন্ঠ চাপা পড়ে গেল রোমানদের বীভৎস চিৎকারের তলায়। হলের মধ্যে বিদ্রূপাত্মক শিস আর গিটকিরির ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বিড়াল-কুকুর-মোরগের ডাক নকল করে সবাই পলিক্লিসকে দুয়ো দিচ্ছে। এমন একটা তাজ্জব স্বীকৃতি পেয়ে পলিক্লিস যখন আতঙ্কে দিশেহারা, ঠিক সেই মুহূর্তেই নীলাম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী আবার এসে আসর জাঁকিয়ে বসল। সে এবার যা শুরু করল তাতে তার প্রথমবারের গানকে গান বলে মেনে নিতে বোধ হয় পলিক্লিসও আর আপত্তি করবে না। ঘোঁৎ ঘোঁৎ, ঘেউ ঘেউ, হাঁউ মাঁউ কাঁউ,—বিকট আওয়াজের সে কী ঘটা! উন্মত্ত গায়কের সে কী অঙ্গভঙ্গী আর কানফাটা চিৎকার! হায় অ্যাপোলোদেব! তোমার লীলাভূমিতেই বুঝি সংগীতকলার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল! অথচ হর্ষধ্বনি তুলে বাহবা জানাবার কোন বিরাম নেই! মাঝে মাঝে যখনই সে মুখের ঘাম মুছছে তখনই জেগে উঠছে উল্লাসের ঘনঘটা। যাতে পাগল না হয়ে যায় দু-কানে আঙুল দিয়ে ভগবানের কাছে সেই আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগল পলিক্লিস।

অবশেষে অমানুষিক সংগীত প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘটল। তুমুল হট্টগোলই নিষ্পত্তি করে দিল জয়-পরাজয়ের। অলিম্পিয় রত্নহার যে ঐ ভন্ড গায়কের গলায়ই দুলতে থাকবে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। ঘৃণায় রি রি করে উঠল পলিক্লিসের কবিসত্ত্বা। অপরদিকে কান্ডজ্ঞানহীন জনতার কথা চিন্তা করে ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সারাদেহ। হঠাৎ একটা লোক এসে তাকে পর্দার আড়ালে, মঞ্চের একপাশে ঠেলে দিল। কিন্তু হতভম্ব পলিক্লিসের কোন দিকেই খেয়াল নেই, সে যেন পাথর হয়ে গেছে। এমন সময় তার পুরানো বন্ধু করিন্থের গায়ক সেই মেটাস এসে তার হাত ধরল। ভয়ে উত্তেজনায় সে থরথর করে কাঁপছে।

জলদি কর পলিক্লিস, জলদি কর!—কানের কাছে মুখ নিয়ে সে চাপা গলায় বলল,—নীচে ঐ ঝোপের আড়ালে আমার টাট্টু ঘোড়াটা দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। ছাই রঙ আর গলায় লাল বকলেস, দেখলেই তুমি চিনতে পারবে। এক্ষুণি পালাও! নইলে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে ওরা তোমাকে হত্যা করবে।

—হত্যা করবে! তুমি কী বলছ মেটাস! ওই গায়ক-টাই বা কে?

—হা ভগবান! কোথায় আছ তুমি! উনি আর কেউ নন, প্রবল প্রতাপান্বিত রোম-সম্রাট স্বয়ং নিরো। এইমাত্র খবর পেলাম, তোমার আর নিস্তার নেই। নিরোর মত নির্মম অত্যাচারী পৃথিবীতে খুব বেশী জন্মায়নি। আর একটিও কথা নয়, পালাও!

বহু দূরে এক দুরারোহ পর্বতমালার মধ্যে ঢুকে পড়ার পর পলিক্লিস হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। উঃ, কী সাংঘাতিক ফাঁড়াই না কেটে গেছে! নিজের গাঁয়ার্তুমির জন্য আর একটু হলেই তো সে জীবন হারাতে বসেছিল। বন্ধু মেটাসকে সে যখন মনে মনে ধন্যবাদ জানাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ই মহামান্য রোম-সম্রাটের গলায় পরিয়ে দেওয়া হল মহামূল্য রত্নহার। অলিম্পিয় সংগীত-সমাজ-প্রদত্ত সেই দুর্লভ পুরস্কার! বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সংগীত-প্রতিভার স্মারকচিহ্ন! ভ্রূকুটি কুটিল চোখে নিরো এবার সেই দুর্বিনীত সমালোচকের খোঁজ করলেন।

লোকটাকে আমার সামনে নিয়ে এস। ছুরি আর লোহার চেন নিয়ে মার্কাসকেও প্রস্তুত থাকতে বল।—আদেশ দিলেন সম্রাট।

মহামান্য সীজার শুনে হয়ত খুশী হবেন,—সেনানায়ক আরসেনিয়াস প্লেটাস বললেন,—লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। এ নিয়ে একটা বিস্ময়কর গুজবও ছড়িয়ে পড়েছে।

গুজব!—গর্জন করে উঠলেন নিরো,—তুমি কী বলতে চাও আরসেনিয়াস? তাকে নিয়ে গুজব ছড়াবার কী আছে? আমি বলব, লোকটা মহামূর্খ। বর্বরের মত চেহারা আর ময়ূরের মতই বিকট কন্ঠস্বর। আমি একথাও বলব যে,

তার মত অনেক মূর্খ-ই এই আসরে রয়েছে। সেই কুৎসিত গানকেই তারা বাহবা দিয়েছে। নিজের কানে শুনেছি বলেই এমন ব্যাভিচার সহ্য করা যায় না। আমি তো প্রায় ঠিকই করে ফেলেছি যে, অলিম্পিয়া শহরটাকে জ্বালিয়ে দিয়ে যাব। সীজার নিরোকে অসম্মান করার শাস্তিটা তাহলে প্রত্যেকেই মনে রাখবে।

কিন্তু তারা যে তাকে বাহবা দিয়েছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই সীজার।—বললেন আরসেনিয়াস,—তাদের কোন দোষ নেই। আমি যা শুনলাম তাতে তো সম্রাটের মান-মর্যাদা দারুণভাবে বেড়ে গেছে। এমনকি এইজন্যই আপনি বিজয়ী হতে পেরেছেন।

এইজন্যই বিজয়ী হতে পেরেছি! এসব কথার অর্থ কী? তুমি একটি আস্ত পাগল আরসেনিয়াস।—নিরোর মনে সংশয়ের দোলা লেগেছে।

—কেউ তাকে চেনে না সীজার। দূরের ঐ শৈলশ্রেণীর মধ্য থেকে হঠাৎ সে এসে আবির্ভূত হয়েছিল। আবার হঠাৎই সেখানে মিলিয়ে গেছে। মনে রাখবেন সীজার, আগে-পরে নয়, ঠিক আপনার গানের সময়টাতেই সে এসেছিল। এটা কি রহস্যজনক নয়?

কিসের রহস্য? যা বলবে, পরিষ্কার করে বলবে। ঘোর-প্যাচ আমি ভালবাসি না আরসেনিয়াস।—নিরো অধৈর্য হয়ে পড়লেন।

—ক্ষমা করবেন সীজার। তার অসাধারণ বলদৃপ্ত ভঙ্গী আর সৌন্দর্যমন্ডিত মুখখানাও কি আপনার নজর এড়িয়ে গেছে? সবাই বলছে, পর্বতের অধিদেবতা স্বয়ং প্যানই ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়ে একজন মরণশীল মানুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গেছেন। স্বর্গের দেবতা হারল মানুষের কাছে! এ জয়ের কি কোন তুলনা আছে?

ঠিক বলেছ! খুশিতে ঝলমল করে উঠল সম্রাটের মুখ। —তোমার একটুও ভুল হয়নি। আরসেনিয়াস। আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস কি কোন মানুষের থাকতে পারে? উঃ, সত্যিই একখানা জয় বটে! এই রাত্রেই রোমে একজন সংবাদবাহককে পাঠিয়ে দাও। সীজার নিরো কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন সে খবর আগেই পৌঁছানো দরকার।

হাসি গোপন করে অভিবাদন জানালেন আরসেনিয়াস।

[আর্থার কোনান ডয়ালের গল্প **'The Contest'** অবলম্বনে]

মহাজীবনের মণিকণা

শৈলেনকুমার দত্ত

একবার রামকৃষ্ণদেব এসেছেন বিদ্যাসাগরের সংগে সাক্ষাৎ করতে। বিদ্যাসাগর তাঁকে বসাতে যাবার আগেই রামকৃষ্ণদেব মেঝেতে বসে বললেন, 'এতদিন তো শুধু নালা-নর্দমা, ডোবা পুকুর পার হয়েছি, এবার সাগরে এলাম।'

সকৌতুকে বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন, 'এসেই যখন পড়েছেন, তখন খানিকটা নোনা জলই নিয়ে যান। আর যদি জাল ফেলেন, তো কুচো মাছ না হয় ঝিনুকের খোলা উঠতে পারে! তার বেশি কিছু নেই।'

ইংরেজি সাহিত্যের অমর স্রষ্টা চালর্স ল্যাম্ প্রায়ই অফিসে আসতেন দেরিতে। একদিন বড়বাবু তাঁকে হাতেনাত ধরে ফেললেন। ল্যাম্‌কে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ ল্যাম্, আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি দেরিতে অফিস আসেন।'

ল্যাম্ সাহেব একগাল হেসে বললেন, 'কিন্তু এ খবর কি পেয়েছেন যে, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই?'

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা শৈলেশ মজুমদার সাহিত্যিক মহলে বিনয়ী ও নিরীহ বলে সুপরিচিত এবং সম্মানিত ছিলেন। তাঁর এই অনাড়ম্বর ভাবটি তাঁর চরিত্রকে বড় মধুর করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদক, তখন শৈলেশচন্দ্র সহ-সম্পাদক নিযুক্ত হন। নামপত্রে রবীন্দ্রনাথের নামের নীচে সহ-সম্পাদক হিসেবে শৈলেশচন্দ্রের নামও ছাপানো ছিল।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন, 'সহ-সম্পাদক নয়, দুঃসহ সম্পাদক!'

একবার দাদাঠাকুর ট্রেনে যাচ্ছিলেন। পয়সা না থাকায় তিনি মালপত্রের বাড়তি টিকিট কাটতে পারেননি। একসময় চেকার এসে টিকিট দাবী করলেন। দাদাঠাকুর জানালেন, তিনি গরীব ব্রাহ্মণ, পয়সা নেই বলে বাড়তি টিকিট কাটা হয়নি। তবে তিনি এর ভাড়া উসুল করে দেবেন। চেকার ব্যাপারটা বুঝতে না পারায় দাদাঠাকুর বললেন, 'গান গেয়ে শোনাতে পারি। ভিখিরী গান গাইলে পয়সা পায়, আমার মাশুল শোধ দেব গজল গেয়ে।'

বলেই তিনি গাইতে শুরু করলেন—

হাওড়া লিলুয়া বেলুড় বালি
উত্তরপাড়া কোন্নগর
রিষড়া শ্রীরামপুর শেওড়াফুলি
বৈদ্যবাটী ভদ্রেশ্বর।

স্টেশনের পর পর নাম বসিয়ে গান রচনা করে তিনি সকলকে প্রভূত আনন্দ দেন। মালের মাশুল শেষ পর্যন্ত আর আদায় করতে হয়নি চেকারকে।

পদ্মবনে হাতী : শৈলেশ সেনগুপ্ত (শিল্পী)

দক্ষিণারঞ্জন বসু

ভয়ে বাড়িতে ঢোকাই কঠিন।

অপরিচিত লোকেরা তো দূরের কথা, নিকট আত্মীয়-স্বজনরাও সহজে মণিদের বাড়িতে আসতে রাজী হচ্ছে না।

ডিকির ভয়ংকর চিৎকারে, তার বাঘের মত চোখ-দুটোকে জ্বলতে দেখে না ভয় পেয়ে পারে কেউ? মণি তাই এখন বন্ধুদের নেমতন্ন করে না, কাউকেই তাদের বাড়ীতে আর আসতে বলে না।

মণির খুবই দুঃখ এজন্যে। মায়ের কাছে সে অভিযোগও পেশ করেছে এ নিয়ে। বলেছে, বাবা আর কিছু পেলেন না, ভূটানের জঙ্গল থেকে এমনি একটা বাঘ এনে বাবা বাড়ির সদর দরজায় বসিয়ে দিলেন যার ভয়ে বাইরে থেকে মানুষ তো নয়ই কাক-পক্ষীও ভেতরে ঢুকতে ভরসা পায় না। এমন কড়া ব্যবস্থা কি না করলেই চলতো না? আমরা নিজেরা একটু বেশী সতর্ক থাকলেই ভয়ের কোনো কারণ ঘটতো না।

কেন এরকম কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছে সে তো তুমি জানোই বাবা! বছর দুই ধরে তবু তো একটু শান্তিতে আছি। সেবার যেরকম চুরিটা হয়ে গেল, বাড়িতে ডিকি থাকলে তেমন ঘটনা নিশ্চয়ই আর ঘটবে না, এ বিষয়ে তো নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে! সেটা নিঃসন্দেহে খুব বড়ো কথা। তার জন্যে বাঘ এনে যদি তোমার বাবা গেটে বসিয়ে দিয়ে থাকেন ঠিকই করেছেন তিনি।—মা বলেন।

মণি এর পর আর কিছু বলে না। কারণ বছর তিন আগে তাদের বাড়িতে শেষরাতে চোর ঢুকে সবাইকে ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করিয়ে নিয়ে যেভাবে ঘরের সব কিছু লোপাট করে নিয়ে গিয়েছিল সে দৃশ্য মণির মনে পড়ে যায়। সেবারে চুরির পর মণির বাবা সৌমিত্র মজুমদার অনেক টাকা খরচ করে নতুনভাবে ঘরবাড়ি সাজিয়েছেন। কাজেই বাঘই এনে রাখুন বা অন্য যে কোন ব্যবস্থাই করুন না কেন বাড়িতে চুরি বন্ধ করার জন্যে, তাতে বাস্তবিকই কোনো আপত্তি করা চলে না।

কিন্তু বাঘ তো নয়, বাঘের মতোই একটা কুকুর ডিকি।

বাস্তবিকই এই ডিকির জন্যে একটা শালিক পাখি বা চড়ুই পাখিও গেটের ভেতর দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে পারে না।

মাস আট-দশ আগে অবশ্য বড়ো একটা অঘটন ঘটে গেছে। সে জন্যে বহু লোকেরই অনুযোগ শুনতে হয়েছে সৌমিত্র বাবুকে। মণিকেও অনেকে বলেছে, তাদের বাড়িতে অমন একটা মারাত্মক কুকুরকে রাখা ঠিক হয়নি। মণির নিজেরও সেই মত। কিন্তু বাবার কাছে সেসব অভিমত প্রকাশ করার মতো সাহস তার নেই।

তবে আট দশ মাস আগের সেই অঘটন বা দুর্ঘটনার কথা মণিদের বাড়ির কারুর পক্ষেই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে ভূটান থেকে তাঁরই নিয়ে আসা আদরের ডিকি যখন অমন একটা বিশ্রী কান্ড করে বসেছে, তখন সেই বেদনাদায়ক ঘটনার স্মৃতির দহন তো সৌমিত্রবাবুকে সব সময়ই সহ্য করতে হচ্ছে।

সেই ঘটনার জন্যে মণির বাবাকে কোর্ট পর্যন্ত দৌড়োতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি হত্যাকারীর সহায়তার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন নিহত ব্যক্তি চোর বলে প্রমাণিত হওয়ায়।

ঘটনাটি বড়োই মর্মান্তিক।

ডিকি গেটেরই একপাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিকেল গড়িয়ে দিন তখন সন্ধ্যামুখী। ঝোলাঝুলি নিয়ে একটা ভিখারী গেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে লনের পাশের রাস্তা দিয়ে বাড়ির সামনে গিয়ে যেই হাঁক দিয়েছে, 'মা, চারটে ভিক্ষে দেবে গো', অমনি ডিকি একেবারে এক ছুট্টে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ ভিখারীর ওপর। তাকে কামড়ে আঁচড়ে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে যে, হাসপাতালে নেবার কয়েক ঘন্টার মধ্যে সেই ভিখারীর মৃত্যু হয়েছে। মরার আগে দু-চারটে কথা বলে যাবারও সে সুযোগ পায়নি।

সে ঘটনা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব হতে পারে কখনো?

মণির বাবাও ভোলেন নি। বরং এক-এক সময় তিনি বলেই ফেলেন, চোর হলেও ভিখারীটা তো একটা জলজ্যান্ত মানুষই ছিল, কুকুরের কামড়ে লোকটাকে ওভাবে মরতে হলো, ভারি দুঃখেরই কথা। পেটের জ্বালায়ই লোকটা ভিক্ষে করতো এবং বাঁচবার তাগিদেই সে কখনো সখনো চুরিও করে বসতো। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, বাঁচতে গিয়েই বেচারার মরণ হলো!

এমনি ভাষায় মজুমদার মশাই সময় সময় সেই ভিখারীটির জন্যে অনুশোচনা করলেও তাঁর ডিকিকে কিন্তু বাড়িছাড়া করার কথা কখনো ভাবেন নি। বরং ডিকিকে রেখে বাড়ি থেকে সবাই বাইরে বেরিয়ে গেলেও যে ভাবনায় পড়তে হয় না, তা ভেবেই তিনি ডিকির একান্ত অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। বলতে কি, বাড়িতে ডিকির আদরই সবচেয়ে বেশী।

অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একদিন এক প্রতিবেশী বন্ধু ঠাট্টা করে বলেই বসলেন মজুমদার মশাইকে, কুকুরের প্রভুভক্তির কথা অনেক শুনেছি কিন্তু প্রভুর এমন কুকুর-ভক্তির কথা কখনো শুনিনি এবং এমন দৃষ্টান্ত কোথাও দেখিও নি।

কিন্তু ঠাট্টা-ঠিসারা যে যাই করুক না কেন, ডিকির ব্যাপারে কারো কোনো মন্তব্যই মণির বাবা কানে তোলেন নি। সবই তিনি হেসে উড়িয়ে দেন।

এর মধ্যে একটা অদ্ভুত কান্ড ঘটে গেল। আর তার সাক্ষী অনেকেই।

সৌমিত্র বাবু সেদিন তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ করেছিলেন এক প্রাক্তন সহকর্মী বন্ধু বঙ্কিম রায় এবং তাঁর স্ত্রীকে।

লাঞ্চ টাইম হয়ে আসছে। রায় কথা দিয়েছেন, একটু আগে আগেই আসবেন খেতে না বসেই খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করার জন্যে।

সাড়ে বারোটা প্রায় বাজে। মজুমদার মশাই তাই মণি ও ছোট মেয়ে নীলাকে নিয়ে বারান্দার সিঁড়ির সামনে এসে হাজির হলেন বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীকে অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে আসার জন্যে। গৃহিনী রান্নাবান্না দেখাশুনোয় একটু ব্যস্ত ছিলেন। তিনিও সেজেগুজে একই জায়গায় এসে দাঁড়ালেন মিনিট তিনের মধ্যে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হুস্ করে একখানা অ্যাম্বাসেডার গাড়ি গেটের ভেতরে গিয়ে লনের পাশের রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গেই ডিকি ভীষণ জোরে হেঁকে উঠে লনের ওপর দিয়েই তীরবেগে ছুটে

সিঁড়ির কাছে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। শুধু দাঁড়িয়ে পড়া নয়, পাগলের মতো ডিকি তার লকলকে লম্বা জিহবা আর রক্ত চক্ষু নিয়ে একবার গাড়িটার এপাশ এবং আর একবার ওপাশ ছুটোছুটি করতে লাগলো। ভয়ে রায় মশাই গাড়ির কাঁচ তুলে দিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন নামতে সাহস পেলেন না।

সৌমিত্রবাবু তো একেবারে অপ্রস্তুত! বার বার ডেকেও ডিকিকে থামাতে না পেরে তিনি নীচে নেমে এসে তার গলার চেনটা টেনে ধরলেন। তবু ডিকির লাফালাফি থামে না। উত্তেজনায় হয়তো মনিবের ডাকও তার কানে যাচ্ছে না, তার গলার চেন কে একজন টেনে ধরেছে সে-দিকেও সে খেয়াল করতে পারছে না।

তাহলেও বন্ধু নেমে এসে কুকুরটাকে টেনে ধরায় রায় মশাই এবং তাঁর স্ত্রী একটু আশ্বস্ত হলেন তাঁরা ভরসা পেলেন, এবার তাহলে বন্ধুগৃহে নেমন্তন্নটা রক্ষা করা যাবে বোধহয়।

তবু চট করে গাড়ি থেকে নেমে পড়তে খুব একটা সাহস পেলেন না রায় মশাই। পাশের কাঁচটা একটু নামিয়ে বল-লেন বন্ধুকে, ভাই মজুমদার, এমন একটি কুকুর পেলে আমিও বর্তে যেতাম, নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। কিন্তু কে বন্ধু কে শত্রু তা যদি তোমার কুকুর না চিনতে পারে, তাহলে আমরা কী করে আর আসবো তোমার বাড়িতে। দু-একটা সংকেত অন্তত ওকে শিখিয়ে দাও যাতে মিত্রপক্ষের সংগে ভদ্র ও শান্ত ব্যবহার করে ও তাদের আদর পেতে পারে। তাতে ওরও লাভ হবে, অতিথিরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। তাছাড়া তোমারও আর উদ্বেগের কারণ থাকবে না।

রায় মশাইয়ের কথাগুলি বোধহয় বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলো ডিকি। সে বোধহয় একটু লজ্জাও পেলো। হঠাৎ তার লম্ফঝম্প থেমে গেল এবং ঝুলন্ত কান দুটো তার নাচতে আরম্ভ করলো।

মজুমদার ডাকলেন এবার বন্ধুকে, গিন্নীকে নিয়ে তাঁকে নেমে আসতে বললেন।

তাঁরা নির্ভয়ে নেমে এলেন।

আশ্চর্যের বিষয়, ডিকি, একান্তই শান্ত ডিকি, রায় দম্পতির গা ঘেঁষে ঘেঁষেই মাঝের হল অবধি এগিয়ে গেল যেখানে ওরা সবাই গোল হয়ে বসে গল্পে মেতে গেলেন।

সেই গল্প ডিকিও একমনে শুনছিল তাঁদের সঙ্গেই হল ঘরে বসে এবং মাঝে মাঝে কখনো গিয়ে রায় মশাইয়ের আবার কখনো রায়গিন্নীর পা চাটছিল।

এ কি ডিকির ক্ষমা প্রার্থনা?

সস্ত্রীক রায় মশাই তখন ভয়ংকর আতংক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

মহাজীবনের মণিকণা

শৈলেনকুমার দত্ত

নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ি মাইক বস্তুটিকে একদম সহ্য করতে পারতেন না। কোন সভায় বক্তৃতা দিতে গেলে মাইকটি পাশে সরিয়ে রেখে খালি গলায় ভাষণ দিতেন। প্রকাশ্যে বলতেন,—'আমি অমায়িক (অ-মাইক) ব্যক্তি, কাজেই মাইকের আমার প্রয়োজন নেই!'

১৯০৫ সালে প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কলকাতা টাউন-হলে সভা হল ৭ই আগস্ট। সভাপতিত্ব করলেন কাশিমবাজারের রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। সভায় বিলাতী জিনিস বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

বিপিনচন্দ্র পালের অনবদ্য বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্যার নীলরতন সরকার সভার মাঝখানে গলা থেকে নেকটাই খুলে ফেলে দিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ এমন কম্বুকণ্ঠে ভাষণ দিলেন যে দেশের লোক তাঁকে নতুন নাম দিলেন—'সারেন্ডার নট ব্যানার্জী'!

বিধবা বিবাহ প্রচলনের সময় বিদ্যাসাগর একবার শুনলেন যে, কোন একজন ধনী ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করার জন্য লোক নিযুক্ত করেছেন। বিদ্যাসাগর সরাসরি সেই ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। তারপর তাঁর সামনে গিয়ে বললেন, 'আপনি নাকি আমাকে হত্যা করার জন্য লোক লাগিয়েছেন। তাই আমি নিজেই এসেছি আপনার কাছে। ইচ্ছে করলে আমাকে মারতে পারেন।'

ধনী ব্যক্তিটি তখন আড্ডায় বসেছিলেন। সকলের সামনে একথা শুনে তিনি ভীষণ লজ্জা পেয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত কোমল-হৃদয় ছিলেন বলে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কখনও বৈষয়িক কোন কাজে তাঁকে পাঠাননি। একবার খুব বেশি ফসল হবার সংবাদ পেয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে খাজনা আদায় করতে গ্রামাঞ্চলে পাঠালেন।

গ্রামে গিয়ে মানুষের দুরবস্থা দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ পিতাকে তারবার্তা পাঠালেন: 'সেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড!'

উত্তর গেল: 'কাম ব্যাক।'

ডিকি : দক্ষিণারঞ্জন বসু

লিফট বয়
অরুণ
আইনের
সম্পূর্ণ
উপন্যাস

আর কিছুক্ষণ পরেই লাঞ্চ ব্রেক।

আমি অফিস থেকে প্রায় বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। হোটেল শেরাটনে টাটার আমন্ত্রণ ছিল লাঞ্চে।

প্রায় বেরিয়েই যাচ্ছিলাম। এমন সময় বেয়ারা সেই স্লিপটা নিয়ে এলো। যে স্লিপে দর্শনার্থী নাম ঠিকানা লিখে দেখা করার অনুমতি চায়।

এখন দুপুর একটা। লাঞ্চ থেকে ফিরতাম সেই তিনটেয়। ভাবলাম ভদ্রলোককে এতক্ষণ বসিয়ে রাখি কেন। অন্য অফিসাররা রাখে। কিন্তু আমি রাখি না। তাই একটু ব্যস্ত হাতেই বেয়ারার হাত থেকে স্লিপটা টেনে নিয়েছিলাম।

বোর্ণিও ফোম-এর মহার্ঘ একজিকিউটিভ চেয়ারে ক্লান্ত শরীরটা মেলে দিয়ে অত্যন্ত নির্লিপ্ত চোখে স্লিপটার দিকে তাকালাম। আর তাকাতেই............।

মনে হল যেন, আমার স্নায়ুর উৎস কেন্দ্রগুলি থেকে একটা বরফ গলা জলের ফোয়ারা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমার মেরুদন্ড বেয়ে নেমে গেল। বোধহয় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট মানুষের হাত-পা-ও মুহূর্তে এমন শক্ত হয়ে যায় না। মাথার ভেতরে এক ঝাক ঘোলা রক্ত ঝিমঝিম করে উঠলো।

আবার স্লিপটার দিকে তাকালাম। ভুল করিনি তো!

মিঃ হরিসাধন স্যান্যাল

প্রোপ্রাইটার ঃ বেঙ্গল স্টীল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীজ (প্রাঃ) লিমিটেড

মিঃ হরিসাধন স্যান্যাল আর বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ, এই দুটো নাম একসাথে কখনো আমার ভুল হতে পারে! মাথা খারাপ! শুনেছি, শ্রীক্ষেত্রের কোন পাষাণে নাকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পায়ের ছাপ আছে। কিন্তু পাষাণ নয়, আমার হাজারো স্নায়ুবাহী রক্তাক্ত বুকের আড়ালে যে নিষ্ঠুর, ক্রুদ্ধ আর ভয়ানক এক দৈত্যের পদাঘাত চিরকালের মত আঁকা হয়ে আছে তার নাম ঃ মিঃ হরিসাধন স্যান্যাল, প্রোঃ বেঙ্গল স্টীল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীজ (প্রাঃ) লিঃ।

পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে আমার ফ্লাস্কটা নিলাম। ফ্লাস্কের মুখ খুলে জল গড়িয়ে যেতে দিলাম আমার তালুতে। এত তেষ্টা পেয়েছিল! তপ্ত মরুভূমিতে জল পড়ার মত স্যাঁত করে আমি প্রায় আধ ফ্লাস্ক জল এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললাম।

ইন্টারকম্ তুলে আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্ট মিস্ চৌহানকে ডাকলাম।

বাঁদিকের এন্টিরুম্ ঠেলে মিস্ চৌহান ঘরে ঢুকলেন। আমি এখনও বেরোইনি বলে বেচারী লাঞ্চে যেতে পারছে না।

বললাম—আপনাকে আটকে রাখার জন্য দুঃখিত, মিস চৌহান। কিন্তু গোটা কয়েক কাজ............।

কাজ সবার আগে, স্যার।—মহারাষ্ট্রী মেয়েটি বিনিত গলায় বললো।

শুনুন।—আমি স্লিপটা বাড়িয়ে দিলাম ওর হাতে—এই পার্টির কোন ফাইল আছে কিনা দেখুন তো। যদি থাকে, আমাকে সংক্ষেপে ইতিহাসটা জানান। তারপর আপনি লাঞ্চে চলে যান।

—আপনি আজ বেরোবেন না, স্যার?

—না।

—আপনার কী শরীর খারাপ স্যার? আপনাকে একটু অন্য রকম লাগছে।

মুখে হাসি টেনে বললাম—কই না তো। শরীর বেশ ভালই আছে। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি। আর শুনুন, হোটেল শেরাটনে মিঃ টাটাকে একটা ফোন করবেন, বলবেন, আমি বিশেষ কাজে আটকে পড়াতে আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলাম না। এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

—আমি এখনই জানিয়ে দিচ্ছি, স্যার।

মিস্ চৌহান স্লিপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েক মুহূর্ত পরেই ইন্টারকমে তার মিষ্টি গলা ফুটে উঠলো রিনরিন করে।

বললাম—বলুন, শুনছি।

—মিঃ স্যান্যাল বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ-এর জন্য আড়াই কোটি টাকার একটা লোন চেয়েছিলেন। গত ছ'মাস আগে লোন চেয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। তখন ডিরেক্টার ব্যাপারটা মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে আপনি চলে আসাতে ওটা আর এগোয়নি। যাইহোক, লোন পেপার সব তৈরী, আপনি ওটাতে শুধু সই করে দিলেই চলবে।

—আড়াই কোটি টাকা?

—হ্যাঁ, স্যার।

—ওদের কোম্পানীর অবস্থা কেমন?

—ভালো নয়, স্যার। পুরনো মেশিন-পত্র নিয়ে ওরা কম্পিটিশনে দাঁড়াতে পারছে না। বাজারে ওদের শেয়ারের দাম খুব কমে গেছে।

—তবে কী গ্যারান্টিতে ওঁকে ঋণ মঞ্জুর করা হচ্ছিল?

—নতুন মেশিন-পত্র কিনে উনি আবার কারখানা দাঁড় করাতে পারতেন। সেইমত ওঁর স্কীম আমাদের ডেভেলপমেন্ট সেকশান মঞ্জুর করেছিল।

—আই সি। ধন্যবাদ মিস চৌহান, এবার আপনি লাঞ্চে যেতে পারেন।

—ধন্যবাদ স্যার।

—ও, হ্যাঁ। মিঃ স্যান্যালকে জানান, আমি লাঞ্চের পর তার সাথে দেখা করবো।

আমি ইন্টারকম কেটে দিলাম।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বুকের পাঁজরের ভেতরে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি ঝিক ঝিক করে খোচা দিয়ে যাচ্ছে। কি সেই অনুভূতির নাম—আমি জানি না। ডান পাশের অ্যান্টিরুম আমার নিজস্ব বিশ্রামকক্ষ হিসাবে ব্যবহার হয়। আমি দরজা ঠেলে সেই ঘরে ঢুকলাম। দরজা ঠেলতেই এক ঝলক দামী কোলোনের গন্ধ ঝাপটা মেরে গেল। গোড়ালি ডোবা কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে এলাম জানালার পাশে। জানলায় কাঁচের শার্সী আঁটা। কারণ, এ ঘরটাও এয়ার-কন্ডিশান্ড্। জানলার ওয়াইড স্ক্রীন বেলজিয়াম গ্লাসের ভেতর দিয়ে বাইরের জগৎটাকে কেমন স্বপ্নের মত মনে হয়। মনে হয় কেমন রহস্যময়। ষোলো তলার উপর একটা এয়ার-কন্ডিশান্ড ঘর থেকে নিচের খুঁটে খাওয়া মানুষগুলিকে সত্যিই একটু অন্য রকম লাগে! দূরে নীল আরব সাগর শুয়ে আছে। কী বিরাট আর কী বিশাল তার ব্যাপ্তি। আরবের রঙে আর আকাশের রঙে আজ কে তফাৎ করবে! মনে হয়, কে কার আয়না! এত ঘন নীল কী আমি দেখেছি কোনদিন! কিন্তু

এ কি, আরব সাগর ভেদ করে ও কে উঠে আসছে! কী অপরূপ নীল রঙ, ওঃ! আরব সাগর ভেদ করে যে উঠে আসতে চাইছে, যে ঝিলিক মারছে, তাকে আমি চিনি। সে আমার রক্তে মিশে আছে, আমার সমস্ত শৈশব জুড়ে সে দাঁড়িয়েছিল এক আশ্চর্য, অবাক দুনিয়ার মত। নাম তার দলমা, দলমা পাহাড়।

॥ দুই ॥

আমরা ছিলাম দশ ভাই-বোন। আমিই বড়। আমার বাবা ছিলেন টাটা কোম্পানীর সামান্য বেতনের একজন চাকুরে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি প্রতিক্ষণে, জীবন-যাত্রার প্রতিটি বাঁকে—তার নাম অভাব, দারিদ্র্য আর লাঞ্ছনা। তবু এই সর্বগ্রাসী অভাব আর লাঞ্ছনার মধ্যে আমার বাবার একমাত্র সান্ত্বনা ছিলাম বোধহয় আমিই। প্রতিবার ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি আমি। বাবার বন্ধু-বান্ধবেরা বাবাকে সাহস দিত দেখতাম,—তোমার আর চিন্তা কী হে! তোমার এই এক ছেলেই দেখো তোমার সব কষ্ট মুছিয়ে দেবে। উত্তরে বাবা হাসতেন। আমি চোখ বুজলেই এখনও বাবার সেই হাসি দেখতে পাই। তারপর সেই হাসি আমি আরো দেখেছি। পৃথিবী যত আমার আত্মীয় হয়েছে ততই দেখেছি সমাজের নিচু তলার লোকগুলির মুখে সেই হাসি। সেই হাসির নাম কী, আমি জানি না। তবে বেদনায় গাঢ় নীল সেই হাসির রঙ। আমি জানি।

লোকে বলে, ভগবান নাকি সর্ব শক্তিমান। আমরা একেবারে বিশ্বাস হয় না। আসলে ভগবান একটা বোকা, গাড়ল আর বদ্ধ কালা লোক। ওনার হাতে শুধু তিনটে ছাঁচ আছে। সেই ছাঁচে ঢেলে উনি তিন রকম জীবন তৈরী করেন। গরীবের জীবন, মধ্যবিত্তের জীবন আর বড়লোকের জীবন। এই তিন রকম জীবন কখনই কী তাদের নিজস্ব ছাঁচের বাইরে যেতে পেরেছে!

তা না হলে আমি যেবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলাম, তখনও ফল বেরোয়নি, আমার বাবা কারখানা থেকে ফেরার পথে লরী-চাপা পড়ে দুমড়ে-মুচড়ে মারা গেলেন কেন। কেন একটা লোক দশজন অপ্রাপ্তবয়স্ক অসহায়, ভীত প্রাণীকে এই নিষ্ঠুর ভয়াবহ পৃথিবীতে সহায়-সম্বলহীনভাবে ফেলে রেখে চলে যাবে, তিল তিল করে অনাহারে, অর্ধাহারে মরার জন্য, সংসারের তিক্ত উপহাস, তুচ্ছতা আর বিরক্তির শিকার হওয়ার জন্য। এর জবাব আছে কী! আছে। ওই যে, ওই ছাঁচের বাইরে যে আমরা যেতে পারি না। আমাদের জীবন যে ওই রকমই, আগের থেকে ঠিক হয়ে আছে না!

সুবর্ণরেখার তীরে বাবার দেহটা যখন চিতায় তোলা হলো, তখন আগুনের মোহময় পরশের আড়ালে আমার বাবার ঠোঁটে কি পলকের জন্যও একবার দেখেছিলাম বেদনায় গাঢ় নীল সেই হাসিটা? আমি কি কখনও ভেবেছিলাম, আমি বড় হয়ে ওই হাসিটা একদিন খুশীর গোলাপী হাসিতে বদলে দেবো! কি জানি! আমি জানি না।

শুধু জানি, সুবর্ণরেখার তীরে, জামশেদপুরের রাতের আকাশে সেদিন অজস্র নির্লজ্জ তারা উঠেছিল।

॥ তিন ॥

মামা এসে আমায় কলকাতায় নিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য, ওখানে যদি আমার একটা চাকরী-বাকরী হয়। চাকরী করে আমি বাড়ীতে টাকা পাঠাবো, সেই টাকায় সংসার চলবে।

এই প্রথম আমার একটা শহর দেখা। একটা রোগা কালো মত মাথা ন্যাড়া ছেলে সেদিন হাওড়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে অবাক আর ভয়-মিশ্রিত চোখে দেখছিল সামনের দানব সদৃশ হাওড়া ব্রীজকে।

মামা বললেন,—আমরা ওটার ওপর দিয়েই কলকাতায় ঢুকবো।

আমার বিশ্বাসই হতে চায় না। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন ট্রামের পেছন দিকের একটা কামরার কাঠের বেঞ্চে বসে বহু নিচে গঙ্গাকে দেখছিলাম, তখন কে যেন ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলছিলো,—অবাক হয়ো না খোকা। কিছুতেই অবাক হতে নেই। অবাক হলেই হেরে যাবে। এ তো সামান্য যন্ত্র, এরপর দেখবে মানুষই তোমাকে কত-বেশী অবাক করে দিচ্ছে।

গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়ায় আমার ঘুম এসে যাচ্ছিল বোধহয়। কে আমার কানে কানে ফিসফিস করছিল। অনেকটা আমার বাবার গলার মত না!

মামার ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো,—কি রে, ঘুমিয়ে পড়ছিস নাকি? নে, ওঠ ওঠ, নামতে হবে এবার।

অনেক লোকের সঙ্গে সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে আমরা যে অঞ্চলে নামলাম, সেখান থেকে আরো বহুদূর হেঁটে একটা ব্রীজ পেরিয়ে আমরা একটা বস্তিতে ঢুকলাম। এই বস্তিতেই মামারা থাকেন। মামা ব্রীজ পেরোতে পেরোতে জায়গাটার নাম বললেন,—এই নারকেলডাঙ্গা, বুঝলি।

বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর হেড অফিস কলকাতায়। ডালহৌসি স্কোয়ারে মস্ত এক মার্কেন্টাইল বিল্ডিং-এ অফিস তাদের। আমার মামা সেই অফিসে কাজ করতেন। সামান্য একজন কেরাণী।

পরদিন সকালে সেই অফিসে আমার ষাট টাকা মাইনের চাকরী হলো। রাতারাতি আমি হয়ে গেলাম লিফটবয়। এক তলা থেকে ষোল তলা অবধি লিফট চালানো হলো আমার কাজ।

পরদিন সকালেই ফেনা ভাত আর করলা সেদ্ধ খেয়ে মামা আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর অফিসে। লম্বা করিডোর। আধো অন্ধকারে ঝিমঝিম করছে সেই করিডোর। করিডোর জোড়া পুরু কার্পেট পাতা। সেই কার্পেটে হাটতে গিয়ে আমার পায়ের নিচে ঘেমে উঠছিল। ঘামবে না! নোংরা শতচ্ছিন্ন একটা চটি পায়ে দিয়ে আমি ও রকম একটা ঝকমকে কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটছিলাম যে। হাঁটতে হাঁটতে আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, কেউ দেখছে না তো! কেউ বিরক্ত হচ্ছে না তো। কারো সামান্য একটু বিরক্তি বা সামান্য একটু ভ্রূ কুঞ্চন মানেই তো আমার চাকরীটা না হওয়া। আর তার মানে একটা পুরো পরিবারের না খেয়ে মরে যাওয়া। সত্যি কি আশ্চর্য পৃথিবীটা, না!

মামা এতক্ষণ খুব একটা সাহসের ভান করছিলেন। কিন্তু আমি তো সব বুঝি, আমি ছোটবেলা থেকেই অনেক কিছু বুঝি, ওই কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটতে মামারও বুক ঢিপঢিপ করছিল।

মামা স্লিপ লিখে ভেতরে পাঠালেন। বেয়ারা ফিরে এসে

বললো, অপেক্ষা করতে হবে। আমরা সামনের একটা সোফায় বসলাম।

অপেক্ষা শুরু হলো। এয়ার কন্ডিশন করা ঘরের চাপা পরিবেশে এক সময় আমার মাথা ধরা শুরু হলো। কতক্ষণ পর জানি না, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা, কিংবা আরো বেশী; কেননা, আমি সময়ের চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম, আমাদের ভেতরে ডাক পড়লো।

ভেতরে ঢোকার আগে মামা ঝট্ করে পকেট থেকে একটা জবাফুল বের করে আমার মাথায় একবার ঠেকিয়ে আবার বুক পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। আসার সময় এই প্রসাদী জবাফুল মামীমা মামাকে দিয়ে রেখেছিলেন।

একটা মস্ত বড় টেবিলের ওপাশে বসেছিলেন বড় সাহেব। মাথায় সামান্য টাক। গলায় লাল ঝকঝকে টাই। দেখলেই বোঝা যায় ইনি মালিক। মামা প্রায় সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ধরনের একটা নমস্কার করলেন, ওনার সেটি দেখারও সময় হলো না, সামান্য ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন—কী ব্যাপার?

মামা তখন গোপনে আমাকে পেছন থেকে অনবরত ঠেলা মেরে যাচ্ছেন। তখন আমার খেয়াল হলো, মামা আসার সময় পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, দেখা হওয়া মাত্র আমি যেন বড় সাহেবকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। আসলে প্রথমে ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন মনে পড়লো তখন বোধহয় একটু দেরীই হয়ে গিয়েছিলো। মামা আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই সামনে ফেলে দিলেন, আমি সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে সামনের টেবিলে আমার মাথা ঠুকে গেল। কিন্তু আমি তখন চাকরী পাবার জন্য মরীয়া। কপালের বাঁপাশটা ভীষণ ফুলে উঠেছিলো, সেটুকু বুঝতে পারলাম না। পড়ে গিয়ে টেবিলের ভেতরে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে সামনের দুটো পা আঁকড়ে ধরলাম। আর ধরেই বুঝতে পারলাম কোথায় মস্ত ভুল হয়ে গেছে। টেবিলের উপরে তখন প্রচন্ড হাসি শুরু হয়ে গেছে। কে যেন বলছে,—উঃ, বাপী, ছেড়ে দিতে বলো, ভীষণ সুড়সুড়ি লাগছে।

টেবিলের নিচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে বুঝলাম, আমার চাকরী হবে না। সাহেবের পাশেই যে একজন মেয়ে বসেছিল, আমার চোখেই পড়েনি। তাড়াতাড়ির মধ্যে, করুণা উদ্রেক করার জন্য আমি সামনে যে পা দুটো পেয়েছিলাম তার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। লক্ষ্য করার সময় পাইনি। আসলে আমি মেয়েটির পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম।

সাহেবের মুখ আরো গম্ভীর হয়েছে। থমথমে মুখে বিরক্তি আর উপেক্ষা—হোয়াট ননসেন্স!

মামা তখন মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন,—স্যার, আমার এই ভাগ্নেটার একটা চাকরি করে দিন, স্যার। ওর ফাদার একসপায়ার্ড, স্যার। ভেরী, ভেরী পুওর ফ্যামিলি স্যার। না খেয়ে মরে যাবে। আই ড্র ইয়োর কাইন্ড সিমপ্যাথি, স্যার।

—চাকরি কোথায় ঘোষ? বলা নেই কওয়া নেই ওমনি একটা চাকরী চাইলেই হলো?

—স্যার, আপনি না দেখলে ওরা মরে যাবে। ভেরী, ভেরী পুওর ফ্যামিলী, স্যার।

—বুঝেছি। পৃথিবীর গরীব মানুষকেই আমি সাহায্য করতে পারি না। পারি কি? হোয়াট ডু য়্যু সে? আচ্ছা, এখন যাও।

দুঘন্টা বসে থাকার ফলাফল মাত্র এক মিনিটেই শেষ হয়ে গেল! মানুষের ভাগ্য ওরা কত সহজে, কত অল্প সময়ে নির্ণয় করে দেয়! না, আমি আর অবাক হবো না নিশ্চয়ই।

মামা মিনমিন করে কী যেন বলার চেষ্টা করছিলেন। সাহেব অদ্ভুত ঠান্ডা আর নির্লিপ্ত গলায় বলেন—এখন যাও। বিরক্ত করো না। বলে ত্রস্ত হাতে একটা ফাইল টেনে নিলেন।

কিন্তু আমার চাকরি হলো। শাপে বর হলো আমার। ভুল করে যে মেয়েটির পায়ে পড়েছিলাম, সে-ই আমাকে চাকরিটা পাইয়ে দিল।

—বাপী, কি অদ্ভুত মিষ্টি গলার স্বর ওর।

—ইয়েস।

—আমাদের নতুন লিফটের জন্য তুমি একজন লোক খুঁজছিলে না?

হ্যাঁ, খুঁজছিলাম।—সাহেব খুব অবাক হয়ে ফিরে তাকালেন তার দিকে।

—হোয়াই ডোণ্ড য়্যু গিভ দ্য জব টু হিম! কাজটা এই ছেলেটাকে দিয়ে দাও না।

মেয়েটি আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাতে, সাহেব যেন এবার সত্যি সত্যি আকাশ থেকে পড়লেন।

—ডু য়্যু মিন দ্যাট? কিন্তু ইউনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ রায় তার একজন ক্যান্ডিডেটের কথা বলছিলেন।

এই প্রথম মেয়েটি আমার চোখে চোখ রাখলো। আমি মনে মনে বললাম, যদি বলেন, আর একবার কি আপনার পায়ে পড়বো!

—মিঃ রায়ের অনেক ক্যান্ডিডেটকেই তো এই অফিসে কাজ দেওয়া হয়েছে। এবার আমার একজন ক্যান্ডিডেটকে দাও।

কোথা থেকে কি হলো, জানি না। এরপর বাইরের সেই সোফায় বসে অত্যন্ত দ্রুত আমায় লিখতে হয়েছিলো, "মাননীয় মহাশয়, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরে...... আমি উক্ত পদের জন্য........." ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমি রাস্তায় বেরিয়ে এসে মামাকে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করলাম,—মামা, ওই মেয়েটি কে গো? ওই যে মনিবের পাশে বসে ছিলো।

মামা সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন,—ও-ই তো মালিকের মেয়ে। একমাত্র মেয়ে। সাহেবের পর ও-ই এই এত বড় কোম্পানীর পরিচালক হবে। তাই সাহেব ওকে রোজ অফিসে নিয়ে আসেন, কাজ বোঝাতে।

আমি বললুম—নাম কী ওর?

মামা হঠাৎ রেগে গেলেন—তাতে তোর কী দরকার?

তারপর কেমন ক্লান্ত গলায় বললেন—যমুনা স্যান্যাল।

আমি মনে মনে উচ্চারণ করলুম—যমুনাদি!

॥ চার ॥

জীবনের নাম বসে থাকা নয়। জীবনের নাম সুখ

নয়। জীবন মানে চলা আর চলতে চলতে লড়াই করা। লড়াই করে বাঁচা আর সঙ্গের পাঁচজনকে বাঁচিয়ে রাখা। প্রথম দিন থেকেই আমি আমার কাজকে ভালোবেসে ফেললাম। আমি বুঝলাম, এর নামই জীবন। সকাল বেলা উঠে হাঁটতে হাঁটতে ডালহৌসিতে অফিসে আসতাম। একটা ন্যাকড়ায় মামীমা বেঁধে দিতেন চারটে রুটী আর একদলা গুড়। সকাল ঠিক দশটার মধ্যেই আমি আমার লিফটের হাতল ছুঁয়ে ফেলতে পারতাম।

সাঁ করে পিচ্ছিল পেলবতায় গুড়গুড় করে লিফট নেমে আসে গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ক্লিক করে শব্দ করে পরপর লেখা হয়ে যায় ঃ গ্রাউন্ড ফ্লোর। নিপুণ হাতে খুলে ধরি স্টীলের দামী স্লাইডিং ডোর। নামী এবং দামী সাহেব-সুবোরা ব্যস্ত পায়ে উঠে আসেন লিফটে।

বিনীত গলায় লিফটবয় প্রশ্ন করে,—ইয়েস স্যার।

—সিকসটিনথ ফ্লোর।

ষোল তলা। লিফটবয় লম্বা সেলাম ঠুকে ক্লিক করে বোতাম টিপে ধরে। আবার সাঁ, গুড়গুড় করে লিফট নিমেষে উঠে আসে ষোল তলায়। লাল আলোয় জানিয়ে দেয় ঃ সিকসটিনথ্ ফ্লোর। স্টীলের দামী স্লাইডিং ডোর খুলে ধরে লম্বা সেলাম ঠোকে লিফটবয়। দামী স্যুট পরা ফর্সা-ফর্সা সাহেবদের সেটুকু দেখারও ফুরসৎ হয় না। পরমুহূর্তে লিফটের ভেতর বেজে ওঠে ক্লিং-ক্লিং কলিং-বাজার। লিফটবয় দ্রুত চোখ বোলায় ড্যাস বোর্ডে। ফিফ্‌থ ফ্লোরে ডাকছে কোন সাহেব। লিফটবয় দ্রুত নিপুণতায় নেমে আসে আবার পাঁচ তলায়।

বিকেল সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত এই ওঠা আর নামা, নামা আর ওঠা। শুধু দুপুর একটা থেকে দেড়টা, এই আধ-ঘন্টা লিফটের দরজায় একটা পিচবোর্ডের হাতে লেখা নোটিশ ঝোলে। তাতে লেখা থাকে "টিফিন আওয়ার"। জামশেদপুরের সেই কালো মত ন্যাড়া, রোগা ছেলেটা তখন পেছনের গ্যারেজে বসে গোগ্রাসে গিলে যায় তার সকাল-বেলায় বেঁধে আনা চারটে রুটী। দারোয়ান মাধো সিং-এর বউ এক ঘটি জল এনে দিয়ে বলে,—খোকাবাবু, পানি নল সে মাত পিও। লোটা সে পিও।

সাড়ে পাঁচটার পর ক্লান্ত পায়ে ছেলেটা আবার ফিরতে থাকে নারকেলডাঙ্গা। মাঝপথে শেয়ালদায় অফিসের একজনের ছেলেকে পড়িয়ে যায়। সেখানে পায় পনেরো টাকা। অফিসের মাইনে ষাট টাকা। মোট পঁচাত্তর টাকা বাড়ীতে পাঠায় পঞ্চাশ টাকা। মাসের শেষে মামার হাতে তুলে দেয় পঁচিশ টাকা। এইভাবে চলছিল জীবন।

চাকরী পাওয়ার ঠিক দুমাস পর ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরুলো। আমি সমস্ত বিহারের মধ্যে থার্ড হয়েছি। রেজাল্ট বেরোবার পর মামা প্রায় জোর করে আমায় রাত্রের কলেজে আই. কম.-এ ভর্তি করে দিলেন।

প্রতি সপ্তাহে মার চিঠি আসতো। মা আর আমার বোনেরা এখন ঠোঙ্গা বানাচ্ছে। আমার ছোট ছোট বোন-গুলি নাকি খুব ভালো ঠোঙ্গা বানাতে পারছে এখন। আমার ঠিক পরের ভাইটা একটা মুদী দোকানে ঢুকে পড়েছে। ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছিলো ও। আমি মাকে লিখতাম ও যেন পড়া বন্ধ না করে। রাত্রে পড়ে প্রাইভেটে যেন ম্যাট্রিকটা দেয়।

কোথা দিয়ে যেন বছরগুলো হু-হু করে কেটে যাচ্ছিলো। জীবনে কোন উত্থান-পতন নেই। কোনো রকমে দিনগুলো, একইভাবে দিন-রাত্রে ভাগ হয়ে একের পর এক পেরিয়ে যাচ্ছিলো। অবশ্য যেদিন আমার আই. কম.-এর রেজাল্ট বেরুলো, সেদিনের কথা একটু আলাদা। আমি কেমন করে যেন ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করে গিয়েছিলাম। আর সেদিন মামা, কী আশ্চর্য, দুটাকার সন্দেশ কিনে অফিসে তাঁর সহ-কর্মীদের বিলিয়েছিলেন। সেদিন আমরা ভাত খাওয়ার সময় এক টুকরো করে মাছ পেলাম। উঃ, কতদিন পর যে সেদিন মাছের মুখ দেখলাম।

আর একদিনের কথা। আমার নিস্তরঙ্গ দিনগুলির মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা নতুন রকমের দিন। একটা নতুন দিন পেতে হলে আমাদের কত দিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়, না। আমার আই. কম.-এর রেজাল্ট বেরুবার পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। পাশের উত্তেজনাটুকু তখন পুরো-পুরি কেটে গেছে। সেদিনও সকাল দশটা থেকে যথারীতি লিফট চালাচ্ছি অভ্যস্ত হাতে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে বাতী দেখে দ্রুত নেমে এলাম সতেরো তলা থেকে। অভ্যস্ত হাতে দরজা খুলে ধরে সেলাম ঠুকলাম। কে যেন একজন ভেতরে ঢুকে এলো। আমি লিফটের দরজা বন্ধ করার বোতাম টিপতেই ঘড়ঘড় করে স্টীলের স্লাইডিং ডোর দুদিক থেকে মসৃণভাবে বেরিয়ে এসে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর মৃদু কেঁপে উঠে লিফটটা উপরে ঠেলে উঠতে লাগলো। আর ঠিক সেই সময় আমার শরীর এই প্রাণহীন লিফটের মতই একবার কেঁপে উঠলো, দুবছরের অভিজ্ঞতায় এই প্রথম, কেউ একজন আমাকে আমার কথাই জিজ্ঞাসা করছে। লিফটে উঠে কেউ লিফটবয়ের দিকে ফিরে তাকায়, এই প্রথম দেখলাম আমি। তাই শরীর ওরকম আশ্চর্যভাবে কেঁপে উঠলো। লিফটের আরোহীরা লিফটবয়কে তো লিফটেরই এক প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষ মনে করে বলে জানতাম।

পেছন থেকে কে যেন একজন জানতে চাইছে,—তুমি ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করেছো ফার্স্ট ডিভিশনে !—গলার স্বরে কেমন যেন একটা অবাক বিস্ময় লেগেছিলো তাঁর।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ফিরে তাকালাম, আর তাকাতেই আমার মুখ দিয়ে কেমন অজান্তে বেরিয়ে এলো,—যমুনাদি !

উত্তরে তিনি মৃদু হাসলেন। আমার মনে হলো, কী আশ্চর্য সুন্দর তাঁর চোখ দুটো ! আর কী ধপধপে সাদা তাঁর দাঁতের পাটি !

—বি. কম.-এ ভর্তি হবে তো ?

আমি একটা নিস্পন্দ কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছি। যমুনাদির কথার উত্তর দিতে পারছি না।

—কী ?

আমি কোনোমতে বললাম,—জানি না।

তিনি আবার হাসলেন,—আমি জানি, তুমি ভর্তি হবে।

তারপর যমুনাদি এক অবাক কান্ড করে বসলেন, ব্যাগ খুলে আমার দিকে একটা একশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধর-লেন.—নাও, ধরো।

কী করবো ?—আমি আড়ষ্ট গলায় প্রশ্ন করলাম।

—বই কিনবে।

—কেন ?

যমুনাদি এবার হো-হো করে হেসে ফেললেন,—বোকা ছেলে। বই লোকে কেনে কি জন্য, পড়ার জন্য।

বলে তিনি আমার বুক পকেটে টাকাটা গুঁজে দিলেন।

তুমি কি আমায় স্বর্গে তুলে দেবে নাকি হে!—যমুনাদির গলায় তরল কৌতুক।

আমি কিছু না বুঝে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি আঙগুল তুলে আমায় লিফটের উপর ড্যাশ বোর্ড দেখিয়ে দিলেন।

সর্বনাশ! লিফট তখন ষোল তলা ছাড়িয়ে সতেরো তলায় উঠছে। যমুনাদির অফিস পাঁচ তলায়। লজ্জার একশেষ। ঘাবড়ে গিয়ে আমি কী করবো বুঝতে না পেরে হঠাৎ বলে ফেললাম,—একসট্রিমলি সরি!

আর ইংরেজী বলে ফেলে আরেক দফা লজ্জায় কাঁটা হয়ে গেলাম।

যমুনাদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার লজ্জা পাওয়া উপভোগ করছিলেন।

যমুনাদি যখন পাঁচ তলায় নেমে গেলেন, তখন সমস্ত লিফট জুড়ে এক আশ্চর্য মৃদু সৌরভ খেলা করছিলো। কি নাম সেই সৌরভের, যুঁই না চন্দ্রমল্লিকা!

হ্যাঁ, বি. কম.-এ ভর্তি হয়েছিলাম। প্রফেসারেরা জোর করে আমায় অনার্স নেওয়ালেন। কলেজে আমার পুরো ফ্রী।

কিন্তু যমুনাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার ঠিক তিনমাস পরে বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ থেকে আমার চাকরী চলে গেলো। চুরির দায়ে ধরা পড়লাম আমি।

বি. কম.-এ ভর্তি হওয়ার তিন মাস পর আমাদের প্রথম অনার্স পরীক্ষা শুরু হলো। প্রফেসারেরা বললেন—তুমি তো এবার কলেজে ভর্তি হওয়া থেকেই প্রায়ই অনুপস্থিত থেকেছো। অনার্স ক্লাস বোধহয় একটাও করোনি। এই পরীক্ষায় যদি ফেল করো তবে অনার্স কাটা যাবে মনে থাকে যেন।

অনার্স ক্লাস আমি কীভাবে করি! অনার্স ক্লাস করতে গেলে যে আমার সন্ধ্যার দিকে দুটো টিউশানি হারাতে হয়।

শুরু হলো আমার পড়া। লাইব্রেরী থেকে আর বন্ধুদের থেকে অনার্সের সব কটা বই ধার করে নিয়ে এলাম। বাড়ীতে রাত জেগে পড়া শুরু হলো। বাড়ীর পর অফিসেও বই নিয়ে যেতাম। লিফট চালানোর ফাঁকে ফাঁকে অংক কষতাম। এই সময় ঘটনাটা ঘটলো। পরপর সাতদিন রাত জেগে পড়েছি। এক ফোঁটাও ঘুমোইনি। সেদিন সকালে অফিসে যেতে পা টলছিলো আমার। কিন্তু লিফটের বোতামে হাত দেওয়া মাত্র শরীরের সব ক্লান্তি মুছে ফেললাম। অনবরত লিফট ওঠানামা করছে। তার ফাঁকে ফাঁকে বইয়ের দিকে নজর রাখছি। কিন্তু টিফিন পিরিয়ডের পর কী যেন হয়ে গেল। মনে আছে, টিফিনের পর আমি লিফটে ফিরে এসেছিলাম। এসে কয়েকবার লিফট চালিয়েওছিলাম। কিন্তু তারপর আর মনে নেই আমার। লিফট মাঝ পথে থেমে রয়েছে আর তার ভেতরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরপর সাতদিন না ঘুমানোর শোধ বিশ্বাসঘাতক শরীর একদিন দুপুরে সামান্য এক দুর্বল মুহূর্তের সুযোগে পুরোপুরি তুলে নিতে চাইলো।

আর ঠিক সেই সময় মিঃ স্যান্যাল নিচ থেকে অধীরভাবে বেল টিপে যাচ্ছিলেন, লিফটের জন্য। কিন্তু কোথায় কী! পাঁচ তলার কোন এক জায়গায় লিফট থামিয়ে তার ভেতরে বি. কম. অনার্স পরীক্ষার জন্য তৈরী হওয়া লিফটবয় যে গভীর ঘুমে ঢলে পড়েছে।

মিঃ স্যান্যালের ব্যস্ততা ক্রমে বিরক্তি এবং শেষে তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়লো। লোকজনের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেলো। আধ ঘন্টা চেঁচামেচির পর আমার যখন ঘুম ভাঙলো তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কিছু বোঝার আগেই আমাকে একজন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে লিফট নিয়ে নেমে গেলো নিচে।

কিছুক্ষণ পরেই অবশ্যম্ভাবীভাবে ডিরেকটারের চেম্বারে তলব পড়লো আমার। সমস্ত অফিস জুড়ে তখন হৈ-চৈ পড়ে গেছে। মামা কেমন বিতৃষ্ণার চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

বোবা একটা পশুর মতো আমি আবার গিয়ে দাঁড়ালাম সেই টেবিলের সামনে। টেবিলের ওপাশে বসে আছেন মিঃ স্যান্যাল আর তাঁর মেয়ে কোম্পানীর পরবর্তী ডিরেকটার মিস যমুনা স্যান্যাল।

বিনা ভূমিকায় ওপাশ থেকে ভেসে এলো গম্ভীর স্বর—কাজে চরম গাফিলতির দায়ে কোম্পানী তোমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলো। কাল এসে তোমার বাকি কদিনের মাইনে নিয়ে যেও।

গলার ভেতরে কেমন যেন একটা দলা পাকানো কষ্ট জড়ো হচ্ছিলো। আমি ওপর দিকে তাকাতে পারছিলাম না। কিন্তু জানি, টেবিলের ওপাশে আর একজনও এখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেই একজনই এবার বললো—তুমি লিফটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন? তুমি এতটা কান্ডজ্ঞানহীন আমি ভাবিনি।

তুমি! তুমিও আমাকে তিরস্কার করছো! একটা মুহূর্তের আবেগে চালিত হলাম আমি। গলগল করে বলে ফেললাম—আমার পরীক্ষা। সাতদিন একটুও ঘুমাইনি। তাই আজকে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর কোন দিন হবে না, দেখবেন।

বলে ফেলেই বুঝলাম, প্রচন্ড ভুল করলাম। ওপাশে মিঃ স্যান্যাল তখন ফেটে পড়েছেন—রাত জেগে পড়ে এসে এটা তোমার ঘুমাবার জায়গা? স্কাউন্ড্রেল!

—এবারের মতো ক্ষমা করে দিন। আর হবে না।

মিঃ স্যান্যাল যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু যমুনাদি তার আগেই বললেন,—এই প্রথমবার বলে ক্ষমা করা হলো। কিন্তু আর যেন এমন না হয়, কেমন। প্রমিস।

বলে যমুনাদি আমার চোখে চোখ রাখলেন। যমুনাদি আমায় কী প্রমিস করতে বললেন, আমি বুঝলাম না। কোনদিন কোন অন্যায় কাজ না করার প্রতিশ্রুতিই কি আদায় করে নিতে চাইছেন তিনি। আমি যমুনাদির কালো চোখে একটা হাসি ফুটি ফুটি করে উঠতে দেখলাম যেন, এমন হাসি আমি আর একদিন যমুনাদির চোখে দেখেছি, সেদিন তিনি হঠাৎ ব্যাগ থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিলেন।

আমি বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম মিঃ স্যান্যাল অত্যন্ত বিরক্ত স্বরে মেয়েকে বলছেন,—এটা তোর ঠিক ডিসিশন হলো না। তুই জানিস না, ছোটলোকদের

লাই দিলে মাথায় চড়ে বসে।

ছোটলোক! আমার কানে যেন গরম সিসা ঢেলে দিলো কেউ। উত্তরে যমুনাদি কি যেন বললেন, কিন্তু আমি তত-ক্ষণে বাইরে বেরিয়ে এসেছি।

আর এর ঠিক দুদিন পরেই যমুনাদি কিন্তু আমায় আর বাঁচাতে পারলেন না। সেদিন আমি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি।

মামা বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর একদিকে ছাপানো ফর্ম এনে দিতেন আমায়। আমি তার উল্টো পিঠে অঙ্ক প্র্যাক-টিশ করতাম। মামা বোধহয় ওগুলি চুরি করেই আনতেন। অন্য সব কেরানীরাও তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য ওই ফর্ম বাড়িতে নিয়ে যেতো।

আমি সেই ফর্ম অফিসে নিয়ে এসে লিফটে বসে অঙ্ক কষতাম। আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিনি। একটা ফর্ম চুরি করাও চুরি, আবার এক লাখ টাকা চুরি করাও চুরি। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে দুটো শাস্তিই এক। চাকরী চলে যাওয়া। বেশ কিছুদিন ধরেই চলছিলো ব্যাপারটা। কিন্তু এবার ধরা পড়ে গেলাম। কি ভাবে জানি ব্যাপারটা বড় সাহেবের কানে উঠলো। অফিসের লিফটবয় অফিসের ফর্ম চুরি করে তার ভেতরে অঙ্ক কষে।

আবার ডাক। আবার সেই ঘর, আর মধ্যখানের সেই হিমশীতল লম্বা টেবিল। ওপাশে ডিরেকটার আর আগামী ডিরেকটারের পাথরে গড়া মুখ।

ডিরেকটারই প্রথম কথা বললেন, তার মেয়েকে ইং-রেজীতে—তোকে বলিনি, লাই দিলে এরা মাথায় ওঠে।

কী আশ্চর্য কারণে আজ যেন আমার শরীরে বিন্দু-মাত্র ভয় ছিলো না। বোধহয় আমি জেনে ফেলেছিলাম, এবার আমার চাকরীটা যাবেই। আমি যমুনাদির দিকে তাকালাম, যমুনাদিও তখন তাকিয়েছিলেন আমার দিকে। ওখানে তখন রাগ আর ঘৃণার বাঘবন্দী খেলা চলছে। আশা-ভঙ্গের আর কষ্টের একটা আলতো ছায়াও ছিল বোধহয়। কিম্বা কে জানে, ওটা আমার বোঝার ভুলও হতে পারে।

তুমি না এই কদিন আগে কথা দিয়ে গেলে আর কোন অন্যায় করবে না?—মিঃ স্যান্যালের গলায় বিচিত্র এক ব্যঙ্গ।

—ক্ষমা করের দিন।

বলতে লজ্জা করছে না?—তাঁর গলায় ব্যঙ্গের সঙ্গে এবার কিছুটা ঝাঁঝ মিশলো।

না। আপনি তাড়িয়ে দিলে আমরা না খেয়ে মরে যাবো। পেটের কাছে কোন লজ্জা নেই, সাহেব।—আমি কথাগুলি কেটে কেটে উচ্চারণ করলাম।

কি এক অদ্ভুত উপায়ে যেন মিঃ স্যান্যাল মুহূর্তে তার গলার স্বর পাল্টে ফেললেন, বরফের মত ঠান্ডা গলায় বল-লেন—সরি। তোমার জন্য আমরা দুঃখিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারছি না।

আমি বুঝলাম, আমার চাকরি চলে গেল। পাশে যমু-নাদি বসে ছিলেন নিশ্চল একটা ছবির মতো। আমি চলে যাওয়ার জন্য ফিরে দাঁড়ালাম। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো, আমার পিঠে এসে তীক্ষ্ণ দুটো বর্শার মতো বিঁধে গেলো দুজোড়া কালো চোখের ঘৃণা মিশ্রিত চাউনি।

বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ-এর বিশাল গেট দিয়ে যখন বাইরে বেরোলাম, তখন ডালহৌসির আকাশে শীতের সূর্য উচ্চ তাপ ছড়াচ্ছে। একটা খালি ১২ নম্বর ট্রাম হেয়ার স্ট্রীট ধরে গড়গড় করে চলে গেলো হাওড়ার দিকে। ট্রামের খালি সীটগুলি কেমন কঙ্কালের মতো হি-হি করে দাঁত ভেঙ্গাচ্ছিলো যেন কাকে। কাকে! আমার বুকের কোণ থেকে অনেকক্ষণের চেপে রাখা একটা বাতাস বেরিয়ে গেলো হু-হু করে। শূন্য ফুটপাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে ভাবলাম, এরপর কী!

॥ পাঁচ ॥

এর পরের দিনগুলোর কথা কোনদিন হুবহু মনে করতে পারি না। সেই জীবনের ছবিগুলি যখনই মনে করতে গেছি, তখনই একটা বিগড়ে যাওয়া প্রোজেকটার মেশিনের মধ্যে হু-হু করে বেরিয়ে যাওয়া ছবির মতো সেই দিনগুলো পেরিয়ে গেছে। প্রফেসারেরা কী করে যেন আমার গোটা পাঁচেক টিউশানি জোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেই টিউশানি করার পর উড়তে উড়তে আমি বড়বাজারে একটা দোকানে খাতা লিখতে যেতাম। বাড়ী ফিরে রাত দশটার পর পড়তে বসে ভোর চারটের সময় উঠতাম। কী ভাবে যেন সময় কেটে যেতো। তারপর ঘুম। মাপা ঠিক দুঘন্টা। নেপোলিয়নের মতো তখন আমারও মনে হচ্ছে এক একটা ঘুম জীবন থেকে কিভাবে দামী মুহূর্তগুলি ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছটায় উঠে বাড়ীতে বাজার করে দিয়ে আবার উড়তে উড়তে আরেকটা দিনের দিকে ধেয়ে যাওয়া। আর মাসের প্রথমে বাড়ীতে একশ টাকার একটা মানি অর্ডার।

মনে করতে গেলে এইভাবেই ছবিগুলি হু-হু করে পেরিয়ে যায়। এর মধ্যে কবে যেন আমি বি. কম. পরী-ক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিতে। তার সংবাদ বেরিয়েছিলো খবরের কাগজে। আর তার কতদিন পরে যেন, আমি বিস্ময়সৃষ্ট করা নম্বর নিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি থেকে এম. কম. পাশ করলাম। হিসাব করলে দেখা যায় ব্যাপারটা ছ'বছরের। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সব ঘটেছিলো। এক-একটা করে বাঁধা ডিঙোচ্ছিলাম আর আমার জিদ তত বেশী করে পেয়ে বস-ছিলো।

এম. কম.-এর রেজাল্ট বেরোবার পর বিদেশী গভর্নমেন্ট কোলকাতায় তাদের দপ্তর মারফৎ সরাসরি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলো, তাদের ইউনিভারসিটিতে গিয়ে ডক্টরেট করার জন্য। সঙ্গে একটা লোভনীয় অঙ্কের স্কলারশীপ।

বোম্বে থেকে যেদিন বিশাল জাম্বো জেটে চড়েছি বিদেশে পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে সেদিন প্লেনের স্টেয়ারে কেসের সিঁড়িগুলি ভাঙতে বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ-এর লিফটবয়ের পা একটুও কাঁপেনি কিন্তু।

বিদেশ থেকে তখন বাড়ীতে মাসে মাসে পাঁচশ টাকা পাঠাচ্ছি। আমার মা আর ভাই-বোনেরা তখন কোলকাতায় চলে এসেছে। মামার পরিবারের সাথে ওরা তখন শ্যাম-বাজারে এক ভদ্রপল্লীতে উঠে এসেছে।

বাইরে আমি ছিলাম মোট ছ'বছর। এর মধ্যে দেশ-বিদেশের বিখ্যাত সব অর্থনীতির জার্নালে 'উন্নতশীল

দেশের শিল্প বিকাশ ও সরকারের ভূমিকা' সম্বন্ধে আমার বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ বেরিয়ে পন্ডিত মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

দেশে ফিরে এলাম ভারত সরকারের আমন্ত্রণে। এসে যোগ দিলাম, ইন্ডাস্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশনের সহকারী প্রধান হিসাবে। এটি ভারত সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। দেশের ভারী শিল্পকে ঋণ যোগানই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

এক বছর যেতে না যেতেই আমাদের ডিরেক্টার বদলি হয়ে চলে গেলেন বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান উপদেষ্টা হয়ে। আর তাঁর শূন্য চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হলো। আমার নিয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কিছু হৈ-চৈ উঠেছিলো অবশ্য। এত অল্প বয়সে এত গুরুত্বপূর্ণ পদে সাধারণত কাউকে দেওয়া হয় না। কিন্তু আমার পেছনে বিদেশের ছ'বছরের ইতিহাসটা অদ্ভুত যাদুর মত কাজ করছিলো।

আজ আমার চেম্বারের দরজায় বড় বড় হরফে আমার নাম ঝুলছে, নামের পাশে অনেকগুলি দেশী-বিদেশী সাংকেতিক অক্ষরের সারি, যেগুলি আমার বিভিন্ন সাফল্য আর প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে জ্বলজ্বল করছে। আর আমার নামের ওপর যে মর্যাদাটুকু সগর্বে মাথা তুলে আছে তার নাম, ডিরেক্টার, আই. এফ. সি. আই.। এর বলে আমি আজ দেশের কোটিপতি শিল্পপতিদের দন্ডমুন্ডের কর্তা। আর এরই বলে আমার দরজায় আজ ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ-এর দোর্দন্ড-প্রতাপ ডিরেক্টার মিঃ হরিসাধন স্যান্যাল। মাত্র দশ বছর আগেও যার অফিসে আমি লিফট চালিয়েছি। আশ্চর্য!

॥ ছয় ॥

বহুদিনের জমা বরফ গলে যাচ্ছে।

একটা ক্রুদ্ধস্বর কানের কাছে কর্তৃত্ব নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গমগম করছে—ছোটলোকদের আস্কারা দিলে মাথায় চড়ে বসে।

আমি বললুম—শান্ত হও।

কিছুক্ষণ পর সেই স্বর আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

আমি বিনীত গলায় ফিসফিস করে বললুম—আমি ঠিক এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, স্যার।

—সাহেব, কফি দেবো?

চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার চাপরাশী দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ও অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমাকে নিজের মনে বিড় বিড় করতে দেখে ও অবাক হয়েছে বোধহয়।

—দাও।

চাপরাশী চলে যেতে আমি টেবিলের উপর থেকে আমার প্রিয় সিগারেট চারমিনার ঠোঁটে তুলে নিয়ে আগুনের নরম পরশে ভিজিয়ে নিলাম ওকে। তিনটে বেজে গেছে। লাঞ্চ আওয়ার শেষ। আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালাম। কাঁচ ভেদ করে দৃষ্টি মেলে দিলাম বাইরের রৌদ্রবিধৃত পৃথিবীতে। দূরে আরব সাগর থমথম করছে। আজ হাওয়া অফিসের খবর শুনতে ভুলে গেছি। ঝড় আসবে নাকি!

চাপরাশী কফি দিয়ে গেল। ওকে বললাম, বাইরে একজন সাহেব অপেক্ষা করছেন। ওকে আমার অফিসে নিয়ে গিয়ে বসাও। আমি অফিসে ঢুকতেই একজন তটস্থ হয়ে তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানালো, —গুড মর্নিং, স্যার।

আমি আড় চোখে চাইলাম। এই দশ বছরে অনেকটা বয়স বেড়ে গেছে ওই ভদ্রলোকের। মাথার চুল আর একটাও কালো নেই। চোখের নীচে গভীর কালো রেখাগুলি সদ্য এসে জায়গা জুড়ে নিয়েছে বলে মনে হলো। বিচিত্র কী! ওনার কারখানা গত ক'বছরে যে সংকটময় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে আর কতদিন তিনি অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন, সন্দেহ।

আমি আমার একজিকিউটিভ চেয়ারে এসে বসলাম। তারপর অত্যন্ত ঠান্ডা গলায় প্রশ্ন করলাম—বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?

তিনি চোখ তুলে তাকালেন। আমার চোখে চোখ পড়লো তার।

না, তিনি চিনতে পারলেন না আমায়।

এতদিন পর একজন লিফট বয়কে কেই বা মনে রাখে!

—স্যার আমরা একটা লোনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম, সেটা............

জানি।—আমার গলার স্বর অত্যন্ত নির্লিপ্ত। লক্ষ্য করলাম টেবিলের ওপর তার হাত দুটো অসহায় কৃপাপ্রার্থীর মত জোড় হয়ে আছে।

এবার তোমার পালা। এবার তুমি আমার কাছে দয়া চাও। দিন কেমন পাল্টায় তাই না, মিঃ স্যান্যাল!

—স্যার, আমাদের লোনটা স্যাংশন হয়ে গেছিলো। এর আগে যিনি ডিরেক্টার ছিলেন,............

তিনি ঘড়ঘড়ে আড়ষ্ট গলায় আরো কী যেন বলার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু আমার নির্লিপ্ত গলা তাকে আরো থামিয়ে দিলো— সরি, মিঃ স্যান্যাল। আপনার কাগজ পত্র আমি নিজে সব পরীক্ষা করে দেখেছি। আমার পক্ষে আপনাকে ঋণ মঞ্জুর করা সম্ভব নয়। কারণ, আপনার কারখানার অবস্থা এখন এমন নয় যাতে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি, আপনি টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

আমার অনুত্তেজিত ঠান্ডা গলার প্রত্যাখ্যান আস্তে আস্তে তার মুখে ছাইয়ের মতো রঙ ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। তাঁর হাত আর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিলো। আহা, বেচারা!

কিন্তু স্যার, আপনি আমাদের অর্ডার বুক দেখুন। আগামী এক বছরে আমাদের দশ কোটি টাকার উপর অর্ডার হয়ে আছে। ওগুলি করতে পারলে, আপনাদের টাকাটার গ্যারান্টি থাকছে। উনি অর্ডার বুকের ফাইল টেবিলের ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

আমার নির্লিপ্ত গলার স্বর এবার বরফের শীতলতা অর্জন করলো—সরি, মিঃ স্যান্যাল। ডিসিশন্ হ্যাজ বিন টেকেন অলরেডি এগেনস্ট ইয়োর পিটিশন। উই ক্যান্ট ডু এনিথিং, এনিমোর, আমাদের আর কিছু করার নেই। আগামী অর্থনৈতিক বছরে আবার নতুন করে অ্যাপ্লাই করবেন। তখন ভেবে দেখবো কী করা যায়।

স্যার………।—তাঁর গলা দিয়ে একটা আর্তস্বর না আর্তনাদ, কি বলবো, বেরিয়ে এলো। মনে হলো, একটা ডুবো আতঙ্কিত মানুষ হাত বাড়িয়ে সামনে কিছু ধরার চেষ্টা করছে। তার ঘোলাটে চোখে বাঁচার করুণ মিনতি।

এমন ঘোলাটে চোখে আমিও কী একদিন তাঁর কাছে এইভাবে বাঁচার মিনতি জানিয়েছিলাম?

—আপনি দয়া না করলে আমি মরে যাবো, স্যার। আমাদের এতদিনকার প্রতিষ্ঠান, এত লোকের রুজি-রোজগার সব বন্ধ হয়ে যাবে। পুলিশ আমার হাতে হাতকড়া লাগাবে। আমার পাওনাদাররা আমায় ছিঁড়ে খাবে। উঃ, আমি পাগল হয়ে যাবো! আমি জানি, এটা আপনার হাতে, আপনি একটু দয়া করলেই এটা হয়ে যায়।

আমাকে আর বিরক্ত করবেন না, প্লিজ। এবার আপনি যান।—আমি একরকম প্রায় ঘাড়ধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিতে চাইলাম।

তিনি কেমন বোবা দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি ধপ করে আবার বসে পড়লেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। তিনি কম্পিত দুহাতের ফাঁকে মুখ গুজতে চাইলেন।

আমি জানি ভদ্রলোককে এখন অন্ধকার ভবিষ্যত হাঁ করে গিলে খাচ্ছে। একটা অসহায় চাপা কান্নায় তিনি ভেঙে পড়তে চাইলেন।

কী নিষ্ঠুর আমাদের এই পৃথিবীটা দেখুন, মিঃ স্যান্যাল। এখানে একজন মানুষ আর একজনের অনুকম্পা ছাড়া বাঁচতে পারে না। কেন, বলুন তো কেন? কেন এই বিচিত্র নিয়ম? এই নিয়মটার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হয় না? ভেঙে চুরে পুরনো পৃথিবীর নিয়মগুলিকে নরকে পাঠাতে ইচ্ছা হয় না? একদিন আপনার দয়ার ওপর আমাকে বাঁচতে হয়েছিলো। আজ আপনাকে হতে হচ্ছে। পৃথিবীর সব মানুষই কারো না কারোর দয়ার ওপর বেঁচে আছে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। দশ মিনিট! পনের মিনিট! হতে পারে। টেবিলের ওপারে ভদ্রলোকের কান্নার বেগ তখন অনেকটা কমে এসেছে। শরীর আস্তে আস্তে স্থির হয়ে আসছে। শুধু মাঝে মাঝে একটা গোঙানীর অস্পষ্ট ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

আমার প্রতিশোধ আমি নিয়েছি। আমি ডাকলুম, যেভাবে দশ বছর আগে ডাকতুম,—স্যার।

টেবিলের ওপাশের দেহটা চমকে উঠলো। তিনি টেবিলের ওপর থেকে মাথা তুললেন, কান্নায় ভেজা লাল চোখ দুটোতে অজানা বিস্ময়।

তাঁর অর্ডার বুকের ফাইল বাঁ হাতে নাচাতে নাচাতে নরম গলায় বললুম—আমাকে চিনতে পারছেন, স্যার?

জানি না, আমার গলায় সামান্য ব্যঙ্গের ছোঁয়া লেগেছিলো কিনা

ওঁর বিস্মিত চোখে অসহায় চাউনি।

ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির রেখা ফুটিয়ে বললাম,—আমার চেম্বারে ঢোকার আগে আমার নামটা নিশ্চয় আপনার চোখ এড়িয়ে যায়নি। বেশ বড় বড় করেই লেখা আছে কিন্তু ওটা।

বিড়বিড় করে উনি আমার নামটা উচ্চারণ করলেন।

—হ্যাঁ। মনে পড়ে না। অবশ্য মনে পড়ার কোন কারণও নেই। মনে পড়লেই বরং অবাক হতুম। একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হতো সেটা। একজন সামান্য লিফট বয়কে দশ বছর পর কে-ই বা মনে রাখে, বলুন?

লিফট বয়!—তিনি কোন মতে কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন।

আমি তখন আমার একজিকিউটিভ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। পেছনে জানালার সামনে এসে দাঁড়াতে চোখে পড়লো সমুদ্র। সেখানে সোনালী গাঙচিলেরা উড়ে যাচ্ছে একা একা। পাখীদের কী স্মৃতি থাকে! বোধহয় থাকে না। নিচে ধোঁয়ার মত অস্পষ্ট বোম্বে শহর।

হ্যাঁ, লিফট বয়।—যেন নিজেকে শোনানোর মত করেই আমি ফিসফিস করে কথাগুলি উচ্চারণ করছিলাম।

—আপনাদের অফিসে লিফট চালাতাম আমি। দশ বছর আগে। মামার সাথে একটা রোগা ন্যাড়া কালো মত ছেলে আপনার অফিসে কাজ খুঁজতে গিয়েছিলো, মনে পড়ে না আপনার? আপনি তাকে লিফট চালাবার চাকরী দিয়েছিলেন। ছেলেটির চোখে বোধহয় কিছু স্বপ্ন ছিলো। তাই সে রাত জেগে কলেজের পড়া করতো। রাত জাগার জন্যই একদিন সেই রোগা কালো ছেলেটি লিফটের মধ্যে অসহায়ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। এই ভয়ঙ্কর অপরাধে আপনি সেদিন তাকে লাথি মেরে সিঁড়ির মুখ থেকে নিচে ফেলে দিয়েছিলেন। অনেক দিনের কথা। এতদিনের কথা কী মনে থাকে?

দূরের গাঙচিলগুলি একটা মালার মতো হয়ে উড়তে উড়তে দূর, আরো দূরে সমুদ্রের রহস্যময়তার দিকে চলে যাচ্ছে। আর সেই রহস্যময় দূর থেকে ফেনার মালা গড়িয়ে এসে পড়ছে কাছের তটরেখায়। মনে হচ্ছে, জানলার সামনে আমার পা কেউ পেরেক দিয়ে পুতে রেখেছে। ঘরের দিকে ফিরতে পারছি না।

যখন ফিরলাম তখন দেখলাম, মিঃ স্যান্যাল আমার চেম্বার ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। একটা চরম ক্লান্তিকর পরাজয়ে তাঁর মাথাটা ঘাড়ের ওপর থেকে বুকের ওপর ঝুকে পড়েছে। আমি কি এই পরাজয়টুকু দেখার জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম।

আমার শূন্য অফিস ঘরে একা সম্রাটের মতো বসে রইলাম। কিন্তু হঠাৎ কী হলো কে জানে! একটা বেহায়া কন্ঠস্বর, যেটা আমাকে আমার ছোটবেলা থেকে তাড়া করে ফিরেছে, আমার কানের কাছে ছিঃ, ছিঃ ছিঃ করে বেজে উঠলো।

অবসন্ন শরীরে আমার মোটা গদীমোড়া চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লাম। সেই বেহায়া কন্ঠস্বরটাকে ঘর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলাম প্রাণপণে।

নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ আর দ্বেষ তুই সরকারী ব্যাপারে কাছে লাগাচ্ছিস। এই সততা নিয়ে তুই নতুন শিল্পময় ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখিস। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

ঘর থেকে সেই কন্ঠস্বরটা কিছুতেই যাচ্ছে না।

প্রতিশোধ মানে কি লোককে খুন করা!

দেশের একটা বড় কারখানার টুটি টিপে ধরে মেরে ফেলা!

তুই জানিস, ক'শ লোকের অন্নসংস্থান হয় বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ-এর কল্যাণে।

আমি জানি না, জানি না। জানতে চাই না। দু'হাতে মাথা টিপে ধরে আমি টেবিলের ওপর মাথা নামালাম।

ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!

বেহায়া কন্ঠস্বরটা কিছুতেই এই ঘর ছেড়ে যাচ্ছে না। জয় যে এভাবে এক চরম লজ্জাকর পরাজয়ে বদলে যায় তা এর আগে জানতাম না।

সেদিন বাড়ী ফিরে সারারাত বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ-এর অর্ডার ফাইল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। নামী, দামী কোম্পানীর অর্ডার সব। চার কোটি টাকার মতো বিদেশী অর্ডার। যা দেশে নিয়ে আসতে পারবে বহুমূল্য বিদেশী মুদ্রা।

অর্ডার বুকের এক-একটা করে পাতা উল্টেছি আর আমার সামনের অ্যাসট্রেতে এক-এক করে জমে উঠেছে পোড়া চারমিনারের স্তূপ।

তারপর বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ সংক্রান্ত আমাদের অফিসিয়াল ফাইল নিয়ে পড়েছি। ফাইল যখন শেষ করেছি তখন প্রায় চারটে। আমার নিজস্ব নোটবুকের অনেকগুলি পাতা তখন বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রীজ-এর সম্বন্ধে অজস্র খুঁটিনাটি তথ্যে ভরে উঠেছে।

ফাইল বন্ধ করে আমার বাংলোর বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম কয়েক মুহূর্ত। তখনও ভালো করে অন্ধকার কাটেনি। বারান্দা থেকে নেমে এসে নিচের বাগানে দাঁড়ালাম। ঘাসের বুকে অজস্র টলটলে শিশিরের শরীরে আমার পা ডুবে গেল। পায়ের আঙ্গুলের নখে শিশিরের ছোঁয়া অদ্ভুত এক কনকনে আরাম ছড়িয়ে দিল ক্লান্ত রাত জাগা শরীরে। আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রেণু রেণু করে সেই আরাম ভোগ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ভোরের আকাশে আলোর এক পাতলা চাদর খুলে গেল। খুলে গিয়ে আকাশের ঠিক দু'আঙ্গুল নিচে খেলে বেড়াতে লাগলো। আর কিছুক্ষণ পরই সকাল হবে।

হঠাৎ পেছন থেকে কার কন্ঠস্বরে চমকে উঠলাম।

—আজ এত ভোরে উঠে পড়েছিস যে, বড়! অন্যদিন তো ডেকে তোলা যায় না।

পেছনে ফিরে দেখি, মা। মা বাগানে পুজোর ফুল তুলতে এসেছিলো। হাতের সাজিতে ফুল ভরা। সাদা কাপড়ে মাকে ঠিক দেবীর মত লাগছে। আমার মা কী সুন্দর দেখতে!

আমি এগিয়ে গিয়ে মাকে প্রণাম করলাম। হঠাৎ আচমকা একটা প্রণাম পেয়ে যাওয়াতে মা কিন্তু একটুও অবাক হলো না।

—কাল সারারাত ঘুমুসনি কেন? তোর চোখের কোলে এক রাতেই কালি পড়ে গেছে।

মায়ের চোখে কিচ্ছু লুকোনো যায় না। আমি হেসে বললাম—আজ ঘুমোবো, মা।

মা বাগান ছেড়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন।

গাছের পাখীরা আস্তে আস্তে জাগছে।

আমি আবার জয়ের স্বাদ পাচ্ছি।

॥ সাত ॥

পরদিন অফিসে সাড়ে পাঁচটা কখন বেজে গেলো টেরই পাইনি। সেই সকাল সাড়ে নটায় এসে অফিসে ঢুকেছিলাম। এসেই আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্টেন্টকে ডেকে পাঠিয়েছি। ডেকে পাঠিয়েছি তিনজন আন্ডার সেক্রেটারীকে, ফিনান্স কন্ট্রোলারকে, লিগ্যাল অ্যাসিস্টেন্সকে। আমার নিজস্ব ছোট্ট নোট বই থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নোট দিয়েছি, প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি, আর একপাশে তিনজন টাইপিস্ট প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দ্রুত আঙ্গুলে টাইপ করেছে। আলাপ-আলোচনার পর টাইপ হয়ে সমস্ত কাগজ যখন আমার টেবিলে এলো তখন, ঘড়িতে ঠিক পাঁচটা পাঁচ। দ্রুত চোখে সমস্ত কাগজ-পত্রে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি। তারপর সাইন করার আগে ফিল্ড ইন্সপেকসন ডিপার্টমেন্টের সিনিয়ার তদন্তকারী অফিসার মিঃ সুব্রহ্মনিয়মকে ডেকে পাঠিয়েছি আমার অফিসে।

মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম যখন আমার অফিসে ঢুকলেন, তখন ঠিক পাঁচটা পনেরো।

ইয়েস স্যার।—সুব্রহ্মনিয়ম অফিসে ঢুকে নির্দেশ চাইলেন।

—মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম, বেঙ্গল স্টীল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীজ-এর তদন্তের ব্যাপারটা তো আপনার ছিলো তাই না?

—হ্যাঁ, স্যার।

—আচ্ছা, ওদের ডিরেক্টার মিঃ স্যান্যাল বোম্বেতে এসে সাধারণত কোন হোটেলে ওঠেন জানেন আপনি?

—তিনি তো স্যার নিজের বাড়ীতেই ওঠেন।

—নিজের বাড়ী! বোম্বেতে তার নিজের বাড়ী আছে নাকি?

—হ্যাঁ স্যার, মেরিন ড্রাইভ অঞ্চলে তার নিজের একটা হালফ্যাশানের কটেজ আছে।

—ঠিকানাটা দিতে পারেন একটু?

—নিশ্চয়ই স্যার। আমার ফাইলে আছে। জেনে নিয়ে এক্ষুণি জানাচ্ছি আপনাকে।

—ধন্যবাদ।

মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম বেরিয়ে যাওয়ার পরই কাগজে সই করলাম আমি। ভারত সরকারের ইন্ডাস্ট্রীয়াল ফিনান্স করপোরেশন বেঙ্গল স্ট্রীল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীজকে আড়াই কোটি টাকা ধার দিচ্ছে দশ বছরে শোধ করার কড়ারে। আমার সই করার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঋণ মঞ্জুর হয়ে গেলো।

সই করা কাগজ-পত্রগুলি একটা লম্বা হলুদ খামে বন্ধ করে ভরে নিলাম। এবার এই খাম আমি নিজের হাতে তুলে দেবো মিঃ স্যান্যালের হাতে। মিঃ স্যান্যালের অবস্থা তখন কেমন হবে! এবার আমার সত্যিকারের জয় হতে যাচ্ছে। অনেক হাল্কা লাগছে এখন নিজেকে।

আজ রাতে একটা অদ্ভুত সুন্দর ঘুম হবে আমার। ঠিক এই সময় মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম মেরিন ড্রাইভ অঞ্চলে মিঃ স্যান্যালের ঠিকানাটা জানালেন আমায়। ঘড়িতে তখন ঠিক সাড়ে পাঁচটা।

লিফটে করে নেমে এলাম গ্রাউন্ড ফ্লোরে। তারপর দৃঢ় নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলাম আমার প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্ট-এর দিকে। গেটের সিকিউরিটি শশব্যস্ত হয়ে সেলাম ঠুকলো। ওর অভিবাদন ডান হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বাঁহাতে গাড়ীর দরজা খুললাম। হাতের অ্যাটাচীটা পেছনের সীটে ছুড়ে দিয়ে সামনের কালো বোতামে বাঁহাতের

তর্জনী রাখলাম। নতুন প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের শরীর কোমল ছন্দে গুড়্গুড় করে কেঁপে উঠলো।

আই. এফ. সি.-এর ডিরেক্টার অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, চার পাশের লোকজন শশব্যস্ত হয়ে পথ ছেড়ে দিলো।

আমার গাড়ী পথে নামলো।

॥ আট ॥

ঠিক ছটার সময় মেরিন ড্রাইভে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পেঁছে গেলাম। গাড়ী পার্ক করে হাতে অ্যাটাচী কেসটা নিয়ে রাস্তায় নামলাম। রাস্তা পার হয়ে ওদিকের ফুটপাতের ওপর বাড়ীটার গেটের কাছে পেঁছোলাম। গেট পার হয়ে ভেতরে স্টোনচিপস ফেলা সুন্দর পথটার উপর পা রাখলাম। আর ঠিক সেই সময় বাড়ীর ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এলো একটু ব্যস্তভাবেই। পথের ওপর আমার পা আটকে গেছে। যে এগিয়ে আসছে তাকে আমি কত চিনি। কতদিন পর দেখছি। দশবছর! দশ বছরে একটুও বদলায়নি। শুধু মুখের ওপর সামান্য একটু গাম্ভীর্যের ছায়া পড়েছে মনে হয়। সাদা সিল্কের একটা শাড়ীতে কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওঁকে। বিকেলের হাল্কা হাওয়ায় কপালের ওপর আলতো চুলগুলি উড়ছিলো। সেই একজন তখন কপালের চুল সরাতে সরাতে দাড়িয়ে পড়েছে। পথের ওপর তার পা-ও কী আটকে গেছে! আমার দিকে বিস্ময়মাখা চোখে চেয়ে আছেন। আমাকে চিনতে পারছেন কি তিনি। আমি কিন্তু চিনতে পারছি। আমি বাজি ধরছি, তিনি আমায় ঠিক চিনতে পারবেন।

এবার এক পা, দুপা করে তিনি এগিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে।

—কে!

আপনিই বলুন না।—আমি সামান্য হেসে ওঁর দিকে তাকালাম।

তিনি দুমুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার কালো চোখে এবার ধীরে ধীরে হাসি ফুটছে।

—তুমি! সেই লিফট বয়!

অবাক উচ্ছাস ঝরলো তার গলায়। যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না।

আমি তখনও নীরবে হাসছি—আমি।

—তুমি এত বড় হয়ে গেছো!

—আমি একটুও বড় হইনি, যমুনাদি।

—তুমি এখানে এলে কী করে?

—ভেতরে চলুন বলছি। মিঃ স্যান্যাল কোথায়?

যমুনাদির মুখে ছায়া পড়লো। একটু থেমে বললেন,—আমাদের খুব বিপদ, জানো?

বিপদ, কেন?—আমি আশঙ্কিত হলাম।

—বাবার কাল রাতে হার্ট অ্যাটাক হয়েছিলো। সময় মতো নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে পারায় বিপদ আপাতত কেটে গেছে মনে হয়। কিন্তু বাবাকে বোধহয় আর বাঁচানো যাবে না।

যমুনাদি চাপা নিশ্বাস মোচন করলেন।

কেন, যমুনাদি?—আমার গলায় উদ্বেগ ফুটলো।

যমুনাদি ব্যস্ত গলায় বললেন—চলো, যেতে যেতে বলছি। এখন বেরুতে না পারলে নার্সিং হোমে পেঁছুতে দেরী হয়ে যাবে।

—চলুন।

—তোমার কাজ নেই তো?

আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে বললুম—নার্সিং হোমের নামটা বলুন।

যমুনাদি নার্সির হোমের নাম জানালেন। আমরা দ্রুত পায়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে আমার গাড়ীর কাছে পেঁছালাম। যমুনাদি কৌতুহলী চোখে থমকে দাঁড়ালেন—তোমার গাড়ী!

আমি নীরবে মাথা নাড়লাম।

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে বললাম—কী ব্যাপার বলুন তো?

যমুনাদি উইন্ড স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রাস্তা দেখছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে থেকেই বললেন,—ব্যাপারটা আমিও ঠিক জানি না। ইদানিং আমাদের কোম্পানী প্রায় শেষ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিলো। বাবা আই. এফ. সি.-তে ঋণের জন্য আবেদন করেছিলো। আবেদন প্রায় মঞ্জুরও হয়ে গিয়েছিলো। এবার আমরা বোম্বে এসেছিলাম সেটা ফাইনাল করতে।

গাড়ী হু-হু করে এগোচ্ছে সী-ভিউ নার্সিং হোমের দিকে। কালো অ্যাসফল্টের রাস্তা একটা চকচকে ফিতের মতো কাঁপতে কাঁপতে পেছনে সরে যাচ্ছে।

—কাল বাবা গিয়েছিলেন আই. এফ. সি.-র অফিসে। কিন্তু ফিরে এলেন একটা মরা মানুষ হয়ে। বাবার দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হলো বাপী?' বাবা কথা বলতে পারছিলেন না। সমস্ত মুখ সত্যি সত্যি ছাইয়ের মত সাদা দেখাচ্ছিলো। ঠোঁট দুটো কাঁপছিলো থরথর করে, ফিস ফিস করে বললেন, 'আমরা ধ্বংস হয়ে গেলাম।' আমি বাবার কথা বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু বাবার অবস্থা দেখে বুঝলুম, আমাদের একটা বিরাট বিপদ এগিয়ে আসছে। ভয়ে ভয়ে বললাম 'তোমার যে ঋণ পাওয়ার কথা ছিলো সেটার কী হলো?' বাবা শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে, বললেন, 'হলো না। নতুন একজন ডিরেক্টার এসেছেন, তিনি দেবেন না।' তখনও আমি ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিনি। ভাবলাম, আজকাল সব জায়গায় যা চলছে, এখানেও বুঝি তারই পুনরাবৃত্তি। নতুন ডিরেক্টার বোধহয় বাবার কাছে ঘুষ চাইছিলেন। কিন্তু বাবাকে সরাসরি না বলাতে বাবা বোধহয় বুঝতে পারেন নি। তাই বলছেন ঋণ পাবেন না। নতুন ডিরেক্টারের ওপর ঘৃণায় আমার শরীর জ্বলে উঠলো। এতবড় গুরুত্বপূর্ণ পদে কী ধরনের পাজি শয়তান লোক বসে আছে দেখো। ঠিক করলাম, আমি নিজে তার সাথে দেখা করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবো 'কত টাকা দরকার আপনার, বলুন।'

ঘৃণায় যমুনাদির মুখ কুঁচকে উঠেছিলো। দিনের শেষ আলো ছড়াচ্ছে সূর্য। আমার আড়ষ্ট হাত আলতোভাবে স্টিয়ারিং ছুঁয়ে ছিলো।

যমুনাদি বললেন, আমি বাবাকে সেই ইঙ্গিত দিলাম, বললাম, 'বাবা অত ভেঙে পড়ছো কেন? তিনি হয়তো কিছু টাকা-পয়সা চাইছেন' বাবা বললেন, 'না রে না। ওসবে তার মন ভরবে না। আমাকে ও কোন দিনই লোন দেবে না। আমার সাথে যে ওর ব্যক্তিগত শত্রুতা!' আমি অবাক হলুম—ব্যক্তিগত শত্রুতা! কে সেই ডিরেক্টার? বাবা বললেন, 'তার নাম তোকে আমি বলতে পারবো না। কাউকেই

বলতে পারবো না। লোন না পাই, তাতে দুঃখ ছিলো না, কিন্তু আজ যে অপমান, যে লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছি, তাতে আমার কোমর ভেঙে গেছে। আমি আর কোনদিনই উঠে দাঁড়াতে পারবো না।' বিড়বিড় করে এই কথাগুলি বলতে বলতে নিজের ঘরে উঠে গেলেন বাবা। আধ ঘন্টা পরে বাবার ঘরে দুধ নিয়ে যেতে দেখলাম, বাবা মেঝের ওপর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসে বললেন, 'মনে হচ্ছে হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এখনই কোন ভাল নার্সিং হোমে নিয়ে যান।'

বেগুনী নিওন আলোয় সামনের পথ রিমঝিম করে রহস্য ছড়াচ্ছিলো। বিপরীতগামী গাড়ীর ক্বচিৎ তীব্র হেড লাইট সেই রহস্যময়তা ভেদ করে কখনো কখনো জ্বলে উঠছিলো।

গাড়ীর ভেতর তখন এক অদ্ভুত স্তব্ধতা ছেয়ে আছে। আমি কি এখন যমুনাদিকে কোন সান্ত্বনার কথা বলবো?

কিন্তু অনেকক্ষণ পর যমুনাদিই সেই স্তব্ধতা ভাঙলেন,—পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর, জানো। এখানে সব সময় কেউ না কেউ তোমার শত্রুতা করবে। তোমাকে কিছুতেই বড় হতে দেবে না, উঠে দাঁড়াতে দেবে না। সেই ডিরেক্টারকে গিয়ে আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, আমার বাবার সাথে না হয় আপনার শত্রুতা আছে, কিন্তু ঋণ না পেয়ে কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে যে শখানেক গরীব পরিবার না খেয়ে মরে যাবে তাদের সঙ্গে আপনার কী শত্রুতা ছিল। কিন্তু কী হবে জিজ্ঞাসা করে। ওই স্বার্থসর্বস্ব লোকগুলি শুধু ব্যক্তিগত দ্বেষ আর হিংসাই চরিতার্থ করতে জানে। এর চেয়ে আর বড় কিছু এরা জানে না।

যমুনাদি বাইরের দিক থেকে এবার আমার দিকে ফিরে চাইলেন—বাবাকে বোধহয় আর বাঁচানো যাবে না। আমি সকালে গিয়ে বাবাকে দেখে এসেছি। তিনি যেন কেমন হয়ে গেছেন। বাবার সেই মনের জোরটাই বাবার কাছ থেকে কে যেন কেড়ে নিয়েছে। বাবা চলে গেলে আমি একদম একা হয়ে যাবো!

যমুনাদির গলার স্বরে একটা চাপা কান্না হু-হু করে উঠলো যেন।

—এই দেখ, এতক্ষণ নিজের কথাই বলছি শুধু। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়নি! তোমার খবর কী?

—বলার মতো আমার কোন খবর নেই, যমুনাদি।

গাড়ীটা নার্সিং হোমের সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি পেছন থেকে অ্যাটাচী কেসটা নিয়ে বললাম—চলুন, আপনার বাবাকে দেখে আসা যাক।

—বাবা, তোমাকে দেখে খুব অবাক হবেন।

—চিনতে পারবেন আমাকে?

—কেন পারবেন না? আমি পারিনি!

এয়ার কন্ডিশানড কেবিনের পর্দা সরিয়ে যমুনাদি ভেতরে ঢুকলেন। আমি যমুনাদির পেছনে এসে দাঁড়ালাম। একদিনেই মিঃ স্যান্যালের চেহারা অর্দ্ধেক হয়ে গেছে।

যমুনাদিকে দেখে উনি হাসলেন।

—কেমন আছো, বাপী?

—ভালো।

—এই দেখো, কাকে এনেছি। চিনতে পারো একে? কে বলো তো?

যমুনাদির পেছনে এবার আমার দিকে চোখ পড়াতে তিনি যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন।

ধড়ফড়িয়ে তিনি উঠে বসার চেষ্টা করলেন বিছানায়,—স্যার, আপনি...........!

আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁকে বাঁধা দিলাম,—আপনি উঠবেন না, শুয়ে থাকুন প্লীজ।

কিন্তু বৃদ্ধকে আটকানো গেলো না, যমুনাদিকে বললেন, --এঁকে তুই কোথায় পেলি!

যমুনাদি তখন কোথাও একটা গোলমাল আছে, আঁচ পেয়েছেন। বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করলেন,—একে তুমি চিনতে পারছো তো বাবা, এ আমাদের সেই লিফট বয়।

লিফট বয়, লিফট বয়!--উনি তখন নিজের মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছেন—মা, কাল তুই জিজ্ঞাসা করছিলি না, আই. এফ. সি.-র নতুন ডিরেক্টার কে। এই দেখ, এই সেই ডিরেক্টার। যাকে একদিন আমি আমার অফিস থেকে চুরির দায়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

আমি সঙ্কুচিত হলাম।

যমুনাদি বুঝি চোখের সামনে পৃথিবীটা ভেঙে যেতে দেখলেও এত বেশী অবাক হতেন না, এইভাবে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য, তারপরই যমুনাদির মুখের রঙ পাল্টাতে শুরু করলো। তার চোখে ধীরে ধীরে ঘৃণা ফিরে আসতে লাগলো। আসবেই তো, আমিই যে তার বাবার এই অবস্থার জন্য দায়ী। যমুনাদি ফিস ফিস করে বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছিলে বাপী, এই লোকটা থাকতে আমরা কোনদিনই সরকারী ঋণ পাবো না। কারণ, একদিন যে তুমি এর উপকার করেছিলে, যখন ভাই-বোন সহ না খেতে পেয়ে মরার অবস্থা, তখন যে তুমি একে চাকরী দিয়েছিলে। লিফট বয়কে লোকে লিফট বয়ের চোখেই দেখে, কিন্তু ওর পড়াশোনার উৎসাহ দেখে আমি যেচে ওর সঙ্গে কথা বলতাম। ভেবেছিলাম যদি ছেলেটি একদিন বড় হয়ে বাড়ীর দুঃখ দূর করতে পারে। ও বড় হয়েছে ঠিকই, কিন্তু গায়ে ছোটলোকের রক্ত পাল্টাবে কি করে! তুমি ঠিকই বলেছিলে, এদের লাই দিলে এরা মাথায় চড়ে বসে। এরা কোনদিনই বদলায় না।

যমুনাদি উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিলেন, আমার দিকে ফিরে বললেন—ছিঃ, তুমি এত নীচ!

আমি দ্রুত হাতে অ্যাটাচী খুলতে খুলতে বললাম,—আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম যমুনাদি,—আমি একটুও বড় হইনি।

আমার হাতে তখন সেই খামটা উঠে এসেছে। খামসহ হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম,—এই নিন মিঃ স্যান্যাল, এতে আপনার ঋণপত্র আছে। আশা করি এবার আপনার কারখানা আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে। আপনি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠুন, এই প্রার্থনা করি। নার্সিং হোমে এসে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। নমস্কার।

অ্যাটাচী হাতে তুলে নিয়ে দৃঢ় পায়ে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে এক টুকরো বিষণ্ণ মেঘ তখন আকাশের ঘাড় ধরে ঝুলে আছে। কোথায় যেন একটা তীক্ষ্ম নিঃশ্বাস আমার বুকের ভেতরে খোঁচা দিচ্ছে, সেটা কিছুতেই বেরিয়ে আসছে

না। বাড়ীতে ফিরে খুব ভালো করে স্নান করতে হবে।

গাড়ীর দরজায় হাত রাখতেই শুনতে পেলাম পেছন থেকে কেউ ডাকছে—একটু শোনো।

পেছনে ফিরে দেখি যমুনাদি দ্রুতপায়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। চাপা উত্তেজনায় যমুনাদি তখন হাঁপাচ্ছেন,—তুমি খুব মহৎ, না! খুব বড় তুমি, না! কাল এক প্রস্থ অপমান করে সাধ মেটেনি? আজ বাড়ী বয়ে এসে মহত্ব দেখিয়ে আরেক প্রস্থ অপমান করতে চাও? তুমি ভেবেছো বারবার তুমিই শুধু জিতে যাবে। এই নাও, তোমার মহত্ব তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

যমুনাদি হলুদ খামটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

আমি কী করবো, বুঝে উঠতে পারলাম না। যমুনাদির সঙ্গে আরেক প্রস্থ তর্ক করতে আমার এখন আর ইচ্ছা করছে না। আমি এই মুহূর্তে বাড়ী ফিরতে চাই। অবসাদ আর ক্লান্তি সমস্ত শরীর জুড়ে খেলা করছে। আমি কোন মতে ক্লান্ত গলায় বললাম,—আপনি কাকে জয় বলছেন, কাকে মহত্ব বলছেন, আমি জানি না। সত্যিই জানি না, বিশ্বাস করুন। আমি শুধু পৃথিবীটা আর একটু সুন্দর দেখতে চেয়েছিলাম। আর একবার আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন না। ওটা আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।

যমুনাদির হাতের খাম হাতেই ধরা রইলো। গতকাল থেকে যে দীর্ঘ উত্তেজনা আর টানা-পোড়েন শুরু হয়েছে, যমুনাদি বোধহয় তার ধকল আর সহ্য করতে পারছেন না। আমার মত যমুনাদিও বুঝি এই মুহূর্তে বাড়ী ফিরতে চান। কিন্তু আমার বাড়ীতে মা আছেন, যমুনাদির বাড়ীতে আছেন কী! যমুনাদির ক্লান্ত চোখের পাতায় দুফোটা জল চকচক করছে। আর এই চোখের জলগুলি এত ছোঁয়াচে!

—যমুনাদি, তুমি বলেছিলে এই পৃথিবীটা নাকি বড় নিষ্ঠুর। আমার কিন্তু তা মনে হয় না। পৃথিবীটা কিন্তু সত্যি সত্যি খুব সুন্দর জায়গা। কেননা, এখানে মানুষ থাকে। মাঝে মাঝে আমরা অবশ্য কিছু ভুল করে ফেলি। কিন্তু সেটুকু শুধরে নিতে আর কতক্ষণ। এসো না, আমরা সবাই মিলে পৃথিবীটাকে আবার চমৎকার একটা বসবাসের জায়গা করে তুলি!

যমুনাদি এবার সত্যি সত্যি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। গাড়ীর দরজায় মুখ রেখে তিনি চোখের জল চাপার চেষ্টা করছিলেন। আমি বললাম,—তোমার মনে আছে যমুনাদি, একদিন সামান্য একটা লিফট বয়কে তুমি কুশল জিজ্ঞাসা করেছিলে। যাকে সবাই লিফটের একটা যন্ত্রই ভাবতো। তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি বি. কম. পড়বে আমি জানি।' বলে ব্যাগ থেকে একশ টাকার একটা নোট বের করে দিয়েছিলে। বলেছিলে, 'বই কিনো।' তুমি জানো না যমুনাদি, সেদিন একটা ছোট্ট কিশোর ছেলের পৃথিবী তুমি কতখানি প্রসারিত করে দিয়েছিলে। তার পরিবর্তে তাকেও তুমি কিছু করতে দাও। কী, দেবে না?

যমুনাদি তখন গাড়ীর ওপর থেকে মুখ তুলেছেন। কান্না-ধোয়া যমুনাদির মুখখানি কী পবিত্র! বললাম—যমুনাদি, তুমি বাবার সঙ্গে দেখা করে এসো। আমি তোমাকে বাড়ী পেঁৗছে দেবো।

যমুনাদির চোখের জলের আড়ালে এখন একটা আলতো হাসি চিক চিক করছে। জামশেদপুরের বিশাল আকাশে এমন মেঘ আর রৌদ্রের খেলা দেখেছি আমি।

যমুনাদি বললেন—তুই কি দেবতা? তোর মাথা মেঘ ফুঁড়ে আকাশ ছুঁয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম—আমি লিফট বয়।

যমুনাদি বললে—দাঁড়া ফিরে আসি। তারপর তোর ঠাট্টার জবাব দেবো।

যমুনাদি নার্সিং হোমের দিকে পা বাড়ালেন।

আকাশের বাগানে তখন একরাশ ঝকঝকে রুপোলী ফুল ফুটেছে।

পাশের সমুদ্র থেকে ভেসে আসছে রাশি রাশি টাটকা বাতাস।

আঃ, বেঁচে থাকায় কী আনন্দ!

গল্প হলেও সত্যি

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় চিত্রকলার নবজাগরণের অগ্রদূত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের উড়িয়া চাকরের বিয়ে হচ্ছিল না কন্যাপণের টাকা দিতে না পারায়। কথাটা যেদিন অবনীন্দ্রনাথের কানে এল, সেদিন তাঁর হাতে সাহায্য করবার মতো টাকা ছিল না। সেইদিনই তিনি একটা ছবি এঁকে ফেললেন—একটি লোক ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। ছবিটা কয়েকদিনের মধ্যেই বিক্রি করে তিনশ টাকা মিলল, সেটা সম্পূর্ণ চাকরকে দান করলেন অবনীন্দ্রনাথ।

বীরু চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী

আজ তোমাদের একদল অদ্ভুত ছেলে-মেয়েদের কাহিনী বলব যারা লালিত-পালিত হয়েছিল বন্য হিংস্র প্রাণীদের স্নেহযত্নে। কালক্রমে তারা সব মনুষ্যদেহী জন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। যেভাবেই হোক দুর্ঘটনাক্রমে কিংবা পথ হারিয়ে কিংবা বাবা-মায়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে, তারা সব গিয়ে পড়েছিল বাঘ ভাল্লুক নেকড়েদের আশ্রয়ে. অতঃপর ঈশ্বরের কি মহিমা, ঐ সব হিংস্র বন্য প্রাণীরা এই সব মানব শিশুদের নিজ সন্তানতুল্যভাবে কেমন করে লালন-পালন করে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সেসব কাহিনী শুনলেও তাজ্জব লাগে। এবারে শুরু করা যাক ঘটনাঃ

১৯২০ খৃস্টাব্দ। মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন রেভারেন্ড জে. এ. সিং নামক জনৈক মিশনারী।

ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যে নেমে আসতে যাজকমশায় ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা গোদামুরী গ্রামের একটা উন্মুক্ত স্থানে তাঁবু ফেললেন। সহসা চীৎকার করতে করতে সেখানে এসে উপস্থিত হল কোরা উপজাতীয় এক যুবক।

জঙ্গলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সাংঘাতিক ভীত সেই যুবক কোনমতে বলে উঠল—বাবু! মানুষ বাঘ! ঐ যে ওখানে।

যাজকমশায় কান খাড়া করে জঙ্গলের দিক থেকে আসা অদ্ভুত এক চিৎকার শুনলেন। এটা প্রথম নয়, এর আগেও তার কানে এসেছে আধা মানুষ, আধা প্রাণী ধরনের এই সব মানুষ ভূতেদের কথা। এরা নাকি রাতের বেলা হিংস্র নেকড়েদের সঙ্গে দিকবিদিকে শিকার করে বেড়ায়।

তদন্ত করা হল না সেদিন, রাত হয়ে গেছে। তাই পরদিন জঙ্গলে খুঁজতে খুঁজতে এক সময় যাজক ও কিছু সঙ্গী একটা গাছের ডালে উঠে কিছুদূরে দেখতে পেল বেশ উঁচু একটা উই-এর ঢিবি। কোরা যুবকটিও সঙ্গে ছিল সে বলে উঠল, ঐখানেই আমি দেখেছি হুজুর।

গাছের ডালে বসে ওরা সেইদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে বসে রইল। প্রায় এক ঘণ্টা বাদে অকস্মাৎ সেই ঢিবি থেকে বেরিয়ে এল বড় একটা নেকড়ে, তার পেছনে দুটি বাচ্চাসহ আরেকটি নেকড়েও এল। গাছে বসে থাকা যাজক ও সঙ্গীরা সহসা চমকে উঠল একটা ব্যাপার দেখে। এদের পেছন পেছন বেরিয়ে এল দুজন আজব আকৃতির প্রাণী। তাদের হাত আছে, পা আছে, চেহারা ঠিক মানুষের মত. মাথাভর্তি নোংরা ও লম্বা চুল। তারা হাতে পায়ে হামা-গুড়ি দিয়ে মাটি আঁচড়াতে আচড়াতে বেরিয়ে এল। তাদের হাবভাব চলনভঙ্গী সবই নেকড়েদের মত। অবিশ্বাস্য হলেও যাজকমশায় স্থির নিশ্চয় হলেন এরা অবশ্যই মানুষ।

কদিন বাদে যাজকমশায় সশস্ত্র কিছু লোক সঙ্গে এনে ঢিবিটা খুঁড়তে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল কুকুর সদৃশ একটা নেকড়ে গর্ত থেকে এক লাফে বেরিয়ে সামনের গভীর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর করালদংস্ট্রা মেলে তাড়া করে বেরিয়ে এল নেকড়ে-মা। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীদলের একজনের বিষাক্ত তীরের আঘাতে সে মুহূর্তে নিহত হল। এরপর আরও খুঁড়ে গর্তের শেষ প্রান্তে দেখা গেল দুটি নেকড়ে বাচ্চা এবং আগে দেখা সেই দুটি আধা মানব শিশু গুটিসুটি মেরে শংকিত চাউনী নিয়ে বসে রয়েছে।

নেকড়ের বাচ্চা দুটি কিন্তু তেমন বাধা দিল না। বাধা দিল সেই নেকড়ে মানব শিশু দুটি বিকটভাবে দাঁত বের করে উদ্ভট হিংস্র চীৎকারে। বহু কষ্টে যাজকমশায় ওদের দুজনকে কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়ে এলেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মেদিনীপুরের এক অনাথাশ্রমে।

সেখানে এনে যাজক ও তাঁর স্ত্রী দুজনে মিলে এই আধা মানব শিশু দুটিকে তাদের হিংস্রবন্যতাকে মুছে ফেলে প্রকৃত মানব শিশুতে রূপান্তরিত করবার অসাধ্য সাধনে ব্রতী হলেন।

দুটি শিশুই মেয়ে। একজনের বয়েস হবে দুবছর অপরজনের আট। বড়র নাম রাখলেন কমলা আর ছোটর অমলা। পরে জানা যায় দুজনেই নেকড়ের দুধ খেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। এদের প্রাণী-স্বভাব থেকে পুরোপুরি মানুষ করে তোলা যত সহজ ভেবেছিলেন তাঁরা, কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল তা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

নেকড়ে মানবী দুজন মাটি থেকে উপুর হয়ে খাবার খেত আর জল পান করত কুকুর বেড়ালের মত। রান্নাকরা কোন খাদ্য তারা আদৌ গ্রহণ করত না। পচা এবং কাঁচা মাংস তারা খুবেই তৃপ্তিসহকারে খেত। খাবার সময় কেউ কাছে গেলে তীক্ষ্ন দাঁত বের করে তেড়ে কামড়াতে আসত।

দিনের বেলা ঘরের এক অন্ধকার কোণে চুপচাপ বসে থাকত। উজ্জ্বল আলো আদৌ সহ্য করতে পারত না। রদ্দুরে চোখ দুটি তাদের প্রায় বুজে আসত।

অপরদিকে রাত্রিকালে অন্যরূপ দেখা দিত তাদের। তখন তাদের যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসত। প্রবল অন্ধকারে তাদের চোখগুলো থেকে ধূসর রক্তবর্ণ আলো বিচ্ছুরিত হত। বড় মেয়ে কমলা কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই দুহাত দুপায়ে বা হামাগুড়ি দিয়ে চলত। ঐ অবস্থায় এত দ্রুত দৌড়তে পারত যে, কোন মানুষের পক্ষে ওদের সঙ্গে দৌড়ে পাল্লা দেওয়া দুষ্কর ছিল। রাত্রে একজনের গায়ে আরেকজন জড়াজড়ি অবস্থায় ঘুমতো। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে বাদে জেগে উঠে বিকট কানফাটা গভীর গলায় চীৎকার করে উঠত।

জঙ্গল থেকে যদি কোন নেকড়ের ডাক শোনা যেত অমনি কমলা-অমলা ঐ জান্তব ভাষায় চিৎকার করে তার জবাব দিত।

যাজকও তাঁর স্ত্রীর অক্লান্ত সেবা শুশ্রুসা সত্ত্বেও অমলা দেড়বছর বাদে মারা গেল। পাক্কা ছদিন পর্যন্ত কমলা তার 'বোন' যেখানে মারা গেছে সে স্থান ত্যাগ করল না. আর এ ছদিন সে জলটুকুও খেল না। শোকে দুঃখে একেবারে নিরম্বু উপবাস। সে যে মূলত মানুষ তার প্রমাণ পাওয়া গেল তার চোখের জলে। সারাক্ষণ তার চোখ দিয়ে শোকাশ্রু ঝরছিল।

প্রায় দুবছর বাদে সর্ব প্রথম কমলা দুপায়ে ভর দিয়ে কোন মতে দাঁড়াতে শিখলো।

১৯২৬-এ সে কারুর সাহায্য না নিয়ে বছর দুয়েকের শিশুর মত দু এক পা মাত্র হাটতে সমর্থ হল। প্রথম প্রথম তাকে পরানো ফ্রক জামা সে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে উলঙ্গ হয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেত। পরে অবশ্য অপরাপর শিশুদের মত জামা পোষাক না পরে সে অনাথ আশ্রমের বাইরে বের হত না।

চৌদ্দ বছর বয়সে সে মাত্র গোটা পঞ্চাশ শব্দ কথা উচ্চারণ করে বলতে শিখলো। যাজক ও তাঁর স্ত্রী স্থির নিশ্চয় হলেন যে এবার তারা এই নেকড়ে বালিকাকে সুস্থ স্বাভাবিক মানবীতে রূপান্তরিত করতে পারবেন।

কিন্তু তা হল না। মেয়েটির মধ্যে মানব প্রকৃতির চেয়ে জান্তব প্রকৃতি এত বেশী বলবতী ছিল যে সামান্য রোগ-ভোগের পর প্রায় সতের বছর বয়সে কমলা মারা গেল।

* * * *

এবার ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের কাহিনী। স্থান আরবীয় মরুভূমি। সেখানে আবিষ্কৃত হল গ্যাজেলি (আরবদেশীয় মৃগ) বালক।

প্রখ্যাত লরেন্স অব অ্যারেবিয়াকে যে দল সাহায্য করেছিল সেই রুওয়াল্লা উপজাতীয় প্রিন্স লরেন্স আল-সালান একদা ইরাকতুর্কী সীমান্তের পান্ডববর্জিত মরুভূমিতে গ্যাজেলি হরিণ শিকারে গিয়েছিলেন।

এক সময় একপাল হরিণ তাদের নয়নগোচর হল। সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স ও তার সঙ্গীদল গাড়ি চালিয়ে তাদের দিকে তাড়া করে গেল। কাছাকাছি আসতে একটা জিনিস দেখে তারা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। একটি মনুষ্যাকৃতি বালক সেই ধাবমান হরিণদের মধ্যে তড়িৎবেগে দৌড়ে চলেছে। অবিশ্বাস্য প্রায় ৫০ মাইল গতিতে সে ছুটে চলেছে গ্যাজেলি হরিণ পালের সঙ্গে। বিশ্ব রেকর্ডধারী মানুষ দৌড়বীরদের প্রায় দ্বিগুণ গতিতে দৌড়চ্ছে সে।

সঙ্গীদের গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করে প্রিন্স প্রাণপণে গাড়ি চালিয়ে হরিণ দলকে ধরবার চেষ্টা করলেন। মাইলের পর মাইল চললো পশ্চাদধাবন। আশ্চর্য, হরিণ পরিবৃত সে অর্ধমানব ছেলেটিও অচিন্তনীয় গতিতে দৌড়ে যেতে লাগলো।

প্রিন্সের নিজের ভাষায় শোনা যাক এবারঃ অকস্মাৎ দেখলাম সেই বালকটি কিসে একটা হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল বালির মধ্যে। কাছে আসতে দেখতে পেলাম একটা পাথরে লেগে ছেলেটির পা জখম হয়ে গেছে।

আমাদের পানে সে সাংঘাতিক ভীত সন্ত্রস্ত নয়নে চাইতে লাগলো, ধরতে গেলে পিছিয়ে যেতে লাগলো আর গ্যাজেলি হরিণদের ধরনে অদ্ভুত এক চীৎকারধ্বনী বের হতে লাগলো তার মুখ থেকে।

যাই হোক জোর করে ধরে বেঁধে তাকে আমার বাড়ি নিয়ে গেলাম। খাওয়াবার চেষ্টা করলাম, পোষাক পরাবার চেষ্টা করলাম কিন্তু সব কিছুতেই সে বাধা দিল। খেল না পরলো না। প্রথম দিন বারকয়েক সে পালাবার চেষ্টা করল। ছাত থেকে ছাতে লাফিয়ে লাফিয়ে অবশেষে রাস্তায় পড়ে চো চা দৌড়। তৎক্ষণাৎ আমরা ঘোড়া এবং মোটর নিয়ে পিছু নিলাম। শেষ পর্যন্ত পাক্কা দু'ঘন্টা বাদে তবে তাকে ফের ধরতে সমর্থ হলুম।

এর পর ওকে নিয়ে হাজির করি ইরাক-পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর ডাক্তার জালবাউট-এর কাছে। তিনি এই গ্যাজেলি বালককে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে জানান এর বয়েস হবে বছর পনের। যদিও খুবই রুগ্ন আকৃতির তবু স্বাভাবিক যুবা মানুষের চেয়েও শক্তিশালী। ওর সারা দেহ পাতলা লোমাবৃত। ওর হাবভাব চঞ্চল ও সন্দিগ্ধ, ঠিক গ্যাজেলি হরিণের মত। মানুষের ভাষা জানে না বোঝে না। শুধু হরিণদের ভাষাই ওর আয়ত্বে।

ডাক্তার জালবাউটের মতে এ বালক একটি অস্বাভাবিক জান্তব আচার আচরণে রূপান্তরিত। ছেলেটি খায় দায় চলে ফেরে ডকে চিৎকার করে অবিকল গ্যাজেলি হরিণের মত। ডাক্তারের অভিমত যে এই বালক পুরো পনের বছর পর্যন্তই হরিণদের দ্বারাই লালিত পালিত হয়েছে। শৈশবে হয়ত সে হরিণের দুগ্ধই পান করেছে। তারপর বয়েস বাড়লে হরিণ-দের সঙ্গে বেরিয়ে মরুভূমির লতাগুল্ম খেতে শিখেছে।

উক্ত খাদ্য একটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে কিছুকাল ঠিকই, তবে এ সময় ধরা না পড়লে ওর হয়ত পুরো যুবক হওয়ার আগেই পুষ্টির অভাবে মৃত্যু হয়ে যেত। মরুভূমিতে যেমন প্রায়ই ঘটে থাকে এ ছেলেটি হয়ত তেমনি এক হয় পথ হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা মায়ের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। তারপর গ্যাজেলি হরিণরা ওকে পেয়ে নিজেদের সন্তানদের সঙ্গে ওকে পরম আদরে মানুষ করতে থাকে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই হরিণ বালকটিই হল সারা বিশ্বের দ্রুতগামীতম বালক। প্রচলিত মানুষের যাবতীয় দৌড়ের বিশ্বরেকর্ড এ নিমেষে ভেঙ্গে দিতে পারত।

হাসপাতালে থাকাকালীন তার মধ্যে বণ্যতার দুর্দমনীয় ডাক আর মানুষের সহজাত স্বাভাবিক কৌতূহল বৃত্তির আহ্বান এই দুটি শক্তির মধ্যে অনবরত সংঘর্ষের অব্যক্ত ভাব লক্ষ্য করা গেছে।

অসংখ্যবার সে বনের ডাকে সারা দিয়ে মরুভূমিতে পালিয়ে গেছে। প্রথমবার সে একদিন জানালা দিয়ে দেখলো বালির মধ্য দিয়ে একপাল গ্যাজেলি হরিণ চলেছে। চোখের নিমেষে সে জানলা গলে লাফিয়ে পড়ে উধাও হয়ে গেল। প্রায় আধ ঘন্টা ধরে গাড়ি নিয়ে পশ্চাদধাবণ করে ওকে সেবার পাকড়াও করা হয়।

আরেকবার নিরুদ্দেশ হবার পর প্রায় বারো ঘন্টা তল্লাসী চালিয়ে পাক্কা ষাট মাইল দূরে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ও ধুলোবালি মাখা অবস্থায় পাওয়া যায়। যে পুলিস দল ওকে খুঁজে পেয়েছে তারা জানিয়েছে, আমরা সমানে দুঘণ্টা ধরে গাড়ি নিয়ে ওর পিছু পিছু ছুটেছি। ছেলেটা ঠিক গ্যাজেলি হরিণের মত তীব্র বেগে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গিয়েছে। পরম ক্লান্ত হয়ে ও পড়ে যাবার পর তবে আমরা ওকে ধরতে সমর্থ হয়েছি।

অত্যন্ত বলশালী দেহ আর সহজাত প্রখর বুদ্ধি বলে

হয়ত এই মরুভূমির টারজান কোন না কোন দিন সম্পূর্ণ সুস্থ মানব যুবাতে পরিণত হয়ে যাবে।

* * * *

আবার ফিরে যাওয়া যাক ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। মিঃ স্টুয়ার্ট বেকার নামক সাহেব উত্তর কাছারের এক পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া একটি চিতা-বালকের কাহিনী বর্ণনা করেন। সাহেবকে ধুঙ্গি নামক গ্রামে বছর সাতেকের একটি বণ্য বালক দেখবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়।

তখনও বালকটি আধা-বণ্য অবস্থায় ছিল। সারা দেহে অজস্র শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন। আর ঐ বয়সেই প্রবল ছানি পড়ায় ছেলেটি প্রায় অন্ধই বলা যায়।

ছেলেটির বাবা তার এই আধা-বণ্য ছেলে সম্বন্ধে এক বিচিত্র গল্প বলে।

পাঁচ বছর আগে তার স্ত্রী দুবছরের শিশু সন্তান নিয়ে ধান ক্ষেতে কাজ করতে যায়। আলের ধারে বাচ্চাটাকে রেখে স্ত্রী কাজ করতে থাকে।

এর কিছুদিন পূর্বে গ্রামবাসীরা দুটো চিতাবাঘের বাচ্চা মেরে ফেলেছিল। সেই পূর্বোক্ত সন্তান হারা মা-চিতা এই শিশুটিকে একসময় লক্ষ্য করে এবং তার মাতৃ-হৃদয় একে নিজ সন্তানের মত সস্নেহে তুলে নিয়ে যায়।

চার বছর বাদে মা-চিতাকে একদিন দেখা যায় জঙ্গল দিয়ে হেঁটে যেতে। আর তার পেছন পেছন অদ্ভুত একটি মানুষের মত বাচ্চা দুহাত দুপায়ে হামাগুড়ি অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছে।

একটি নির্ভুল নিশানার গুলি খেয়ে মা-চিতা প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। আর তার সেই বিচিত্র বাচ্চাটিকে ধরে নিয়ে আসে গ্রামবাসীরা। অতঃপর একটা জন্মদাগ দেখে ওর আসল মা তার বহুদিন হারানো সন্তানকে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সনাক্ত করে।

ছেলেটি ভয়নক হিংস্র হয়ে উঠেছিল। তার বিরাট বিরাট তীক্ষ্ণ নখর হয়ে গিয়েছিল। হাটুতে আর হাতের চেটোতে কঠিন কড়া পড়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পর্যন্ত সে বালক শুধু কাঁচা মাংস খেত, এমনি হাতের কাছে পাওয়া বহু মুর্গী ধরে ধরে কাঁচাই খেয়ে ফেলেছিল সে। রান্না করা খাবার খাওয়ার অভ্যেস করাতে আর সামান্যতম জামা পরাতে এর পরেও বহুদিন লেগেছিল। তবে মাঝে মাঝে ওঠা জঙ্গলের ভেতর থেকে চিতাবাঘের চিৎকার ওকে খুবই উতলা করে তুলত। নিদারুণ চাঞ্চল্যে ছটফট করতে থাকত সে।

* * * *

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদের কাছে সাত বছরের একটি নেকড়ে বালক পাওয়া যায়। সে বৃক্ষমূল আর কাঁচা মাংস ছাড়া কিছুই খেত না।

এই তো কিছুকাল আগে লক্ষ্ণৌর কাছে এক জঙ্গলে আরেকটি নয় বছরের নেকড়ে বালককে ধরে এনে হাসপাতালে রাখা হয়েছিল বহুদিন। সেও চার হাত পায়ে হাঁটতো, কাঁচা মাংস নেকড়েদের মত করালদংস্ট্রা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। বছর পনের পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, তারপর মরে গেল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'রামু'।

* * * *

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকাতে দুজন মাউন্টেড পুলিস অফিসারের দ্বারা একটি 'বেবুন-বালক' আবিষ্কৃত হয়েছিল। গভীর বনমধ্যে এক প্রান্তরে পুলিসদ্বয় দেখে একপাল বেবুন চলাফেরা করছে। তাদের মধ্যেকার একটি আজব জীবের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। যদিও সেটাও বেবুনদের মতই দুহাত দুপায়ে লাফালাফি করছিল তা সত্ত্বেও তার আকৃতি যেন মানুষের মনে হল। বহু চেষ্টায় তাকে ধরে ফেলা হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী গ্রাহামস্টাউন হাসপাতালে। সেখানে সে বহুদিন পর্যন্ত কাঁচা শষ্যকণা ও ফলমূল ছাড়া আর কিছু মুখে তোলেনি।

ডাক্তারগণ বহু ধৈর্যে বহু যত্নে বহুদিন ধরে তাকে কালক্রমে 'মানুষ' করে তোলে। সে বর্তমানে সুস্থ সবল স্বাভাবিক ও বুদ্ধিমান একজন ফার্ম কর্মীরূপে জীবনযাপন করছে।

যদিও 'ভাল্লুক আশ্রয়ে মানুষ' এমন সংবাদ বিরল তবু হিমালয়ে একদা বাপ মা যখন জঙ্গলে কাজে ব্যস্ত তখন ছোট্ট দুটি জমজ ছেলেমেয়েকে এক ভালুক মা নিয়ে যায় এমন দৃষ্টান্তও নথীবদ্ধ আছে।

বহু বছর বাদে তাদের যখন ধরা হয় তখন তারা সুন্দর দুজন যুবক-যুবতী হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের বহু চেষ্টায়ও যখন অর্ধসভ্য মানুষের পরি-বর্তন করা সম্ভব হল না, বাধ্য হয়ে ফের তাদের অভ্যস্ত বণ্যজীবনে বন মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারাও মহানন্দে জঙ্গলের মধ্যে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যায়।

* * * *

সবচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা হল রুমানিয়ার সেই জোয়ানা নাম্নী মেয়েটির কাহিনী। এই মেয়েটি একা গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাস করেছিল অবিশ্বাস্য রকমের পাকা সাত বছর। তাকে সভ্যতায় আনা হল। বিয়ের ঠিক হল একটি ছেলের সঙ্গে কিন্তু শেষ অবধি এই 'নেকড়ে কন্যাকে' সভ্যসমাজে ধরে রাখা গেল না, সে বনের ডাকে ফের ফিরে গেল অসীম অরণ্যে।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে। সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে এই জোয়ানা ম্যানড্রিলা সে বছর রুমানিয়ার তাদের ছোট্ট গ্রাম সুগ্যাগ থেকে ঘুরতে ঘুরতে চলে যায় গভীর জঙ্গলে বুনো ফুল তুলতে।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সেই গহণ অরণ্যে সে পথ হারিয়ে ফেলে। প্রথমটা নিদারুণ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু বিস্ময়ের কথা সে কিছুক্ষণ পর থেকেই সে মানিয়ে নেয় জঙ্গল-জীবন। সেটাই হয়ে ওঠে তার বাসস্থান, আর সেখানকার প্রাণীরা হয় তার নিত্য সহচর। গ্রীষ্মভর সে বেরি জাতীয় ফল খেয়ে কাটাত, শীতকালে গাছগাছড়ার শেকড় বাকড় নখ আর দাঁতের সাহায্যে খুবলে খুবলে খাওয়া শুরু করল।

একদা একটা ভেড়ার মাংস নিয়ে আহাররত একদল নেকড়ের কাছে সে উপস্থিত হয়। বোধ করি তাদের পেট

ভর্তি হয়ে গিয়েছিল কানায় কানায় তাই তারা তাদের ভুক্তাবশিষ্ট মাংস ওকে খেতে দেয়।

সেইক্ষণ থেকে নেকড়েরা ওকে তাদের একজন করে নেয় আর জোয়ানাও নির্ভয়ে ওদের সংগে ওদের গর্তে বসবাস করা আরম্ভ করে।

পরবর্তী সাত বছর নেকড়েরাই ছিল মেয়েটির নিত্য সংগী। সে ওদের ভাষা শিখে নিয়ে ওদেরই মত তীক্ষ্ম তীব্র চীৎকারে ভাব আদান প্রদান করতে লাগলো।

এর পর জংগলে একদা ক্যাম্প ফায়ার দেখে কৌতূহলে জোয়ানা বন্য পশুদের মত অতি নিঃশব্দে ও সন্তর্পনে এগিয়ে যায় সেই আগুনের দিকে ঝোপের আড়াল দিয়ে।

ক্যাম্পফায়ারের চারদিকে বসা লোকগুলোর একজনের আগুনের আভায় সহসা নজর পড়ে যায় হামাগুড়ি দেওয়া জোয়ানার জংগলাবৃত আবছা দেহের প্রতি। সে রাইফেল তুলে অমনি দ্রুম্ করে গুলি চালিয়ে দেয়।

বিস্মিত সেই লোকটা দেখে ছায়া ছায়া মতন উসকো খুসকো চুলওয়ালা আধা পশু আধা মানুষ গোছের একটা মূর্তি হামাগুড়ি থেকে এক লাফ মেরে গাছের আড়ালে চলে গেল।

—ওরে। এ নিশ্চয় ওয়ারউল্‌ফ্ (মানুষ-নেকড়ে), লোকটার এ চিৎকার শুনে সব মানুষগুলো তাদের বন্দুক রেডি করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

ভীত সন্ত্রস্ত জোয়ানা নিমেষে দৌড়ে গিয়ে তার নেকড়ের গর্তে ঢুকে পড়ে। কিন্তু লোকগুলো তাদের সংগে আনা শিকারী কুকুরদের সাহায্যে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে উপস্থিত হয় সেই নেকড়ের গর্তে।

চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে জোয়ানাকে। দেখে শুনে দারুণ আতঙ্কগ্রস্থ জোয়ানা উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকগুলো দেখে একটা কোমর অবধি চুল ঝুলে পড়া উলংগ মেয়ে গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে উঠল। বিস্ময়ের তাদের আর সীমা রইল না।

—এই খবরদার গুলি করো না। এ যে দেখছি একটা মেয়ে! অবিশ্বাস্য বিস্মিত কণ্ঠে একজন চীৎকার করে ওঠে।

তারা মেয়েটাকে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু জোয়ানা নেকড়েদের মত দারুণ হিংস্র হয়ে ওদের প্রবলভাবে বাধা দিতে লাগলো। আচড়ে কামড়ে দানবীয় শক্তিতে সে উন্মত্তের মত লম্পঝম্প করতে থাকলো।

অতগুলো লোকের সংগে পারবে কেন সে। অচিরেই বণ্য মেয়েটাকে ওরা ধরে বেঁধে নিয়ে চলে এল নিকটবর্তী গাঁয়ে। সেখানে নিয়ে ওর সনাক্তকরণও হয় গেল একসময়।

বহুমাস অতিবাহিত হল ওর আসল বাপ মায়ের ওকে কিছুটা মানবিক রূপে ধাতস্থ করতে। ওকে পোষ মানাতে। এমনকি তিন বছর কেটে যাওয়ার পরও ওর দিকে তীক্ষ্ম নজর রাখা হতে লাগলো, কেননা তখনও ওর কাছে অব্যক্তে প্রবল এক আকর্ষণ ছিল অরণ্যের প্রতি। সভ্য সমাজ ওর ভাল লাগে না। দুরন্ত টানে ওকে টানছে জংগল জীবন।

জোয়ানা রান্না করা খাবারকে ঘৃণা করত। ঘরের মধ্যে ঘুমতে চাইত না আদৌ। আর পোষাক আষাক পরতে তো প্রবলভাবে বাধা দিত।

এতদসত্ত্বেও কালক্রমে সে একটি সুন্দরী নারীতে রূপান্তরীত হল। পেট্রু নামক একটি ছেলে ওকে বিয়ে করতে চাইলে, জোয়ানাও রাজি হয়ে গেল সে বিয়েতে। বাবা মাও খুব খুশী। সন্তান সন্ততি সহ ঘর সংসার হলে জোয়ানার অরণ্যপ্রীতি কমে যাবে অচিরে।

অতএব বিয়ে স্থির হয়ে গেল। বিয়ের দিনও ঠিক।

বিয়ের কদিন আগে জোয়ানা তার ভাবী স্বামী পেট্রুর সংগে একদা নির্জন এক প্রান্তরে গেল ভেড়া চরাতে। জোয়ানা বসে বসে দেখছিল ভেড়াদের আর পাশে বসে পেট্রু তার রাইফেলটাকে পরিষ্কার করছিল।

এমন সময় ঘটলা এক কান্ড। অকস্মাৎ থরথরিয়ে কেঁপে উঠে চরম উল্লাসে দাঁড়িয়ে পড়ে জোয়ানা বলে ওঠে, ঐ দেখো নেকড়েরা। পেট্রু চেয়ে দেখো ওরা এদিকেই আসছে। আমি জানি, আমি জানতাম ওরা আসবেই। ওরা আসবেই।

চকিতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো পেট্রু আর তার রাইফেল তাক্ করলো নেকড়েদের দিকে। কিন্তু তার গুলি করবার আগেই মেয়েটা ঝটিতি পেট্রুর হাতের রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে কাদা মাটির মধ্যে মাজ্‌ল্‌টা সম্পূর্ণ গুজে দিল। ফলে রাইফেলটা বেকার হয়ে গেল।

অতঃপর বিস্মিত ও হতচকিত পেট্রু দেখলো তার বিয়ের কনে সহসা দুহাত দুপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে গেল এগিয়ে আসা নেকড়ের পালের দিকে।

—জোয়ানা!! ভগবানের দিব্যি, ফিরে চলে এস। ওরা তোমায় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

এর জবাবে সে জোয়ানার কণ্ঠে বিদ্রুপের এক হাসি শুনতে পেল। পেট্রু কাঁদা থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে তার পেছনে পেছনে দৌড়লো। অন্তত যাতে গদা হিসাবেও সে আগ্নেয়াস্ত্রটাকে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু হায় বড় দেরী হয়ে গেল।

জোয়ানা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে সেই নেকড়ের পালের মধ্যে। আশ্চর্য, আর সমস্ত নেকড়েরা ওকে ঘিরে বিকট চিৎকার ও কিচির মিচির অদ্ভুত শব্দ করতে করতে লাফালাফি করে চলেছে। মনে হয়, হারিয়ে যাওয়া ওদের আপনজনকে ফিরে পেয়ে উল্লাসে ওরা ফেটে পড়ছে।

পেট্রুর দৃষ্টিসীমার মধ্যে দেহের যাবতীয় পোষাক-আষাক মুহূর্তে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে জোয়ানা ফের বণ্য প্রাণীদের মত উলংগ হয়ে ওদের সংগে সংগে নিমেষে জংগলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পেট্রু সাশ্রুনয়নে চেয়ে চেয়ে দেখলো তার ভাবী বিয়ের কনের শ্বেতশুভ্র বিবস্ত্র দেহ চোখের সামনে থেকে দ্রুত বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বনের ডাক এসেছে, পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যে ওকে সুসভ্য সমাজে আর ধরে রাখতে পারে, আটকাতে পারে। তাই সে তার অতিপ্রিয় নেকড়েদের ডাকে সাড়া দিয়ে, সুসভ্য সমাজের ভাবী স্বামী, মা বাবা সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করে, তার আসল আপনজন নেকড়ের পালের সংগে মিশে গেল।

চিড়িয়াখানায় সাপের খানা

• অবনীভূষণ ঘোষ •

চিড়িয়াখানায় কত ধরনের না জীবজন্তু রাখা থাকে। এসব জীবজন্তু দেখে আমরা আনন্দ পাই। কেবল আনন্দ পাই না, জ্ঞানও লাভ করি। নিজের চোখে দেখে আমরা বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের আকৃতি-প্রকৃতি ধরন-ধারণ জানতে পারি। কোন একটি লোকের পক্ষে দেশে দেশে বনে বনে ঘুরে সব জন্তু দেখে বেড়ান তো সম্ভব নয়। চিড়িয়াখানায় আমরা একই জায়গায় দেশ-বিদেশের বন্য জন্তু জানোয়ার পাখি দেখতে পাই। এটা বড় কম সুবিধের কথা নয়।

কলকাতার কাছে আলিপুর চিড়িয়াখানার কথাই ধর' কত বিচিত্র ধরনের প্রাণী সেখানে রয়েছে। এসব জন্তু-জানোয়ারকে তবিয়তে রাখা এক রাজসূয় ব্যাপার! মাত্র তাদের খাবারের কথাই ভাব। হরেকরকম এদের খানা-পিনা। অবাক হয়ে যেতে হয়। এই চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারদের কাউকে কাউকে তোমরা খেতে দেখেছ। হিংস্র বাঘ-সিংহ সদ্য-দেওয়া মাংসের খণ্ড বড় বড় দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছে, তাও তোমাদের চোখে পড়ে থাকবে। কাউকে কাউকে নিজের হাতেও তোমরা খেতে দিয়েছ। মায় শুঁড়ওলা জীবন্ত খাহাড়গুলিকেও!

তবে এই ফাঁকে তোমাদের বলে রাখি, হাতি কেবল তোমাদের হাতের কলা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকে না। তাদের জন্যে মুখরোচক খিচুড়িরও বরাদ্দ থাকে। সেই খিচুড়ি তারা পরিতোষ সহকারে খায়। যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি খাঁচার আড়ালে বসে তোমাদের দিকে মিটিমিটি চায়, প্রতিদিন অন্য খাদ্যের সঙ্গে তার চা-টোস্ট না হলে প্রাতরাশ সম্পূর্ণ হয় না। বড় শৌখিন জীব শিমপান্‌জি।

কিন্তু সাপকে কোনদিন খেতে দেখেছ কি? দেখ নি। না দেখাই স্বাভাবিক। কারণ পরে বলছি। যা হ'ক আলি-পুর চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন সাপকে কি খেতে দেওয়া হয়, তা জানার ইচ্ছা তোমাদের নিশ্চয়ই জাগে।

কথায় বলে, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা। কিন্তু তোমরা জেনে রাখ, সাপ কলা কেন—কোনও ফলমূলই খায় না। সাপ আমিষাশী। আর দুধও সাপের খাদ্য নয়—যদিও তেষ্টার সময় জলের বদলে সাপ দুধ খেতে পারে।

বুধবার কোনদিন তোমরা যদি আলিপুর চিড়িয়াখানায় যাও, দেখবে সাপ-ঘর সকাল থেকে বেলা বারটা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। ঐ দিন ঐ সময়েই সাপদের খেতে দেওয়া হয় কিনা। এমনিতেই বন্দী অবস্থায় সাপ অনেক সময় কিছু খেতে রাজি হয় না। তার উপর তার সামনে দিয়ে লোক চলাচল করতে দেখলে সে খাবেই না। এই কারণে বুধবার সকালে সাপ-ঘর বন্ধ রাখা হয়। কোন দর্শককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তা হলে কি চিড়িয়াখানায় সাপদের সপ্তাহে মাত্র একদিন খেতে দেওয়া হয়? হ্যাঁ, সাপদের সপ্তাহে মাত্র একদিনই খেতে দেওয়া হয়। বেঁচে থাকতে সাপের বেশি রসদের প্রয়োজন হয় না। শীতকালের কয়েক মাস তো সাপ কিছুই খায় না। শীতের সময় সাপ-ঘরে গেলে দেখবে, সাপগুলো সব শুয়ে আছে কম্বলের তলায় নিশ্চল নিথর হয়ে। তখন তাদের শীত-নিদ্রা। সাপের একটা নাম বায়ুভুক। বাতাস খেয়ে সাপ বেঁচে থাকে। একথা কিন্তু ঠিক নয়। মাত্র বাতাস গ্রহণ করে কোন প্রাণী টিকে থাকতে পারে না। শীতনিদ্রার সময় সাপ বাইরে থেকে কোন আহার্য গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু তার দেহে যে খাদ্য—যে মেদ জমা থাকে, তাই ব্যয় করে সে বেঁচে থাকে।

আলিপুর চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন সাপকে কি খেতে দেওয়া হয়, তা দেখার উদ্দেশ্যে আমি কয়েকবার বুধবার সকালে সাপ-ঘরে গেছি। বলা বাহুল্য, কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে। যা দেখেছি, মোটামুটিভাবে তোমাদের এখন তা

বলছি।

সাপ-ঘরে যে সাপ আমাদের সহজেই চোখে লাগে, তা হল দৈত্যাকার অজগর। কাচঘরের উপর যে নামটা লেখা থাকে, তা অবশ্য ময়াল। অজগর ও ময়াল—একই সাপের দুটি নাম। দানবটা কাচঘরের মধ্যে দেহ গুটিয়ে থাকে! খোলা জায়গায় থাকলে যঃ পলায়তি স জীবতি—এই পথ নিতে হত। অজগর যেমন মোটা, তেমনি বড়। দেখলেই লাগে ভয়। গায়ের তাকত খুব, সুবিধা পেলে বাঘকেও ঘায়েল করে। তবে এ সাপ বিষহীন।

বন্য অবস্থায় অজগর একটা ভেড়া বা ছাগল অনায়াসেই গিলে ফেলতে পারে। বেশ কয়েকদিন আগের কথা বলছি। চিড়িয়াখানায় বন্দী এক একটা অজগরকে তখন খেতে দেওয়া হত মাঝারি আকারের এক একটা জ্যান্ত মুরগি।

ব্যাপারটা ঘটল কেমন শোন।

সাপ-ঘরের সাপদের তদারকের জন্যে থাকে রক্ষক। বিভিন্ন সাপের ধরন-ধারণ সম্পর্কে সে বেশ ওয়াকিফহাল। ঐ রক্ষক জ্যান্ত একটা মুরগির পা দুটো দড়িতে বেঁধে লম্বা একটা লোহার শিকের আগায় তাকে নিল ঝুলিয়ে। মুরগির পা বেঁধে নেওয়ার কারণ, তার পায়ের ধারল নখরের আঘাতে যাতে বন্দী অজগরের দেহ ক্ষত-বিক্ষত না হয়। তারপর একটা অজগরের ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে রক্ষক উপরের ডালাটা খানিকটা খুলে ফেলল। আর ঝুলিয়ে দিল মুরগিশুদ্ধু লোহার শিকটা। অজগরটা এতক্ষণ নির্জীব হয়ে শুয়েছিল। কাচঘরের ডালাটা খুলতে না খুলতেই সেটা আধহাত মাথা উঁচিয়ে উপরের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টি ফেলল। সে বেশ বুঝতে পেরেছিল, উপর থেকে আসছে তার সাপ্তাহিক ভোজ। মুখের কাছে ঝলন্ত মুরগিটা আসতেই মুহূর্তে ছোঁ মেরে কামড়ে অজগর সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকার দেহ দিয়ে পাকিয়ে ধরল তাকে। সামান্য মুরগি, তার উপর আবার পা-বাঁধা। দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু অজগর সাপের স্বভাবই এই যে তার শিকারকে জড়িয়ে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা। প্রায় আধ ঘন্টা পরে ঘুরে এসে দেখলাম, ক্ষুধিত অজগর মুরগিটাকে সম্পূর্ণ গিলে ফেলেছে। প্রায় দুঘন্টা পরে আবার ঘুরে এসে দেখলাম, সাপটার পেটের একটা অংশ তখনও ফুলে। বুঝলাম মুরগিটা তখনও একদম হজম হয়ে যায়নি।

এ অজগরটিকে খেতে দেওয়া হয়েছিল তার কাচঘরের উপরের ডালা খুলে। কিন্তু বেশির ভাগ সাপকে খেতে দেওয়া হয়, তাদের ঘরের পিছনের জানালা থেকে। সাপ দেখবার সময় এ জানালা তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। তার দেওয়া জানালা।

আর একটি অজগরের খাওয়া দেখলাম। দৈত্যটা জলের মধ্যে মাথা ডুবিয়ে ছিল। তাতে মুরগিটা তার নজর এড়ায় নি। সে ঠিকই সজাগ ছিল। মুরগিটাকে কাছে নিয়ে যেতেই অজগরটা জলের উপর মুখ তুলে ঝট্ করে সেটাকে ধরে আবার জলের নিচে চলে গেল।

আর একদিন একটা অজগরের সাপ্তাহিক ভোজ ছিল প্রায় এক হাত লম্বা একটা ইঁদুর। ইঁদুরটাকে অবশ্য তখন তখনই মেরে দেওয়া হয়েছিল। জ্যান্ত ইঁদুরই দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু জ্যান্ত ইঁদুর বন্দী অজগরের গা কামড়ে পাছে তাকে জখম করে, সেই ভয়ে তাকে মেরে দেওয়া হয়েছিল। অত বড় ইঁদুরটার লাশ চোখের সামনে পড়ে থাকলেও অজগরটা কোন সাড়াশব্দ করছিল না। কিন্তু রক্ষক লোহার শিকটা দিয়ে যেই লাশ-টাকে একটু নাড়িয়ে দিয়েছে, অমনি অজগরটা ঝট্ করে গিয়ে সেটাকে কামড়ে ধরল।

ইদানীং সাপের খাওয়া দেখতে গেছলাম। দেখলাম, মুরগির বদলে এখন এক একটা অজগরকে খেতে দেওয়া হচ্ছে একত্রে বাঁধা কয়েকটি জ্যান্ত চড়ুই পাখি।

এই হল অজগর সাপের খাওয়া। এক হপ্তার খাওয়া। আবার সাত দিনের দিন তাকে খেতে দেওয়া হবে।

সাপ-ঘরের রক্ষককে সবচেয়ে হুঁশিয়ার হতে হয় সর্পরাজ শঙ্খচূড়কে খেতে দেওয়ার সময়। অজগরের মত বড় না হলেও শঙ্খচূড়ও বেশ বড় সাপ। অজগর বিষহীন, শঙ্খচূড় মারাত্মক বিষধর। সারা পৃথিবীতে যত বিষধর সাপ আছে, তাদের মধ্যে শঙ্খচূড়ই সবচেয়ে বড়। এর ফণা আছে। ফণা ধরে একবার দাঁড়ালে কার সাধ্য এর সামনে এগোয়। এর ছোবলে হাতির মত বড় জানোয়ারও মারা যায়। শঙ্খচূড়ের প্রকৃতি যেমন উগ্র। তেমনি ক্ষিপ্র এর গতি। সাপের বুদ্ধি বড় কম; সাপের রাজ্যে শঙ্খচূড়ই সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

শঙ্খচূড়ের ভোজ বড় অদ্ভুত। অন্য সাপ এর মুখ-রোচক খাদ্য। সাপ পেলে অন্য প্রাণীতে আর এর মন সরে না। বিষধর ও বিষহীন—দু ধরনের সাপই শঙ্খচূড় উদরসাৎ করে। বিষহীন ঢেমনা সাপ বোধ হয় তোমরা ভাল করেই চেন। গাঁয়ে যারা বাস কর, তারা তো নিশ্চয়ই চেন। বেশ বলিষ্ঠ বড় সাপ। অনেক সময় ইঁদুরের খোঁজে বাড়ির ভিতরেও ঢোকে। কোথাও কোথাও বলা হয় একে দাঁড়াশ। এই ঢেমনা সাপই শঙ্খচূড়কে খেতে দেখেছিলাম একবার।

সাপ-ঘরের রক্ষক শঙ্খচূড়ের ঘরের জানালা খুলে দূর থেকে লোহার শিকটা তার গায়ে ঠেকাতেই ফণা তুলে দাঁড়াল সর্পরাজ। তেড়ে এল না অবশ্য। রক্ষক তখন একটা জ্যান্ত মাঝারি আকারের ঢেমনার লেজের দিকে ধরে দূর থেকে দুলিয়ে তার সামনে মাঝে মাঝে এগিয়ে দিতে লাগল। দু-তিনবার এরকম করতেই সর্পরাজ খপ্ করে ধরল ঢেমনার মুখটা। তারপর আরম্ভ করল তাকে গিলতে। ঢেমনাটা গিলে ফেলতে শঙ্খচূড়ের প্রায় দুঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লেগেছিল। মেটেলি ছোট সাপ, কমজোরি বিষধর। কখনও কখনও মুখটা বের করে পুকুরের জলে ভেসে থাকে। ঢেমনার বদলে এই মেটেলিও অনেক সময় শঙ্খচূড়ের ভোজ হয়। সেক্ষেত্রে একটাতে আর পেট ভরে না, সর্পরাজের উদরপূর্তি করতে দুই-তিনটে মেটেলি সাপের দরকার হয়।

ঢেমনার খাওয়া দেখতে বেশ মজার। এরা খুব চটপটে

[শেষাংশ ১৭৬ পৃষ্ঠায়]

আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। কোশলের রাজধানী শ্রাবস্তী নগরে সুপ্রবন্ধ ছিলেন একজন নাম-করা ধনী গৃহস্থ। তাঁর টাকার খ্যাতির চেয়ে বেশি ছিল তাঁর দানধ্যানের খ্যাতি। সেই সুপ্রবন্ধের বুড়োবয়সের একমাত্র সন্তান হল হস্তক। অনেক পুণ্য করলে মানুষের অমন রূপেগুণে অপরূপ ছেলে হয়। তাঁকে দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যে মিষ্টি ব্যবহারে দেশের লোকে মুগ্ধ। সব চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, হস্তক যেদিন জন্মালেন সেইদিনই তাঁর বাবার হাতীশালায় ভূমিষ্ঠ হল একটি সোনার হাতী। হাতীটা জীবন্ত, কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন কাঁচা সোনা দিয়ে এক সুদক্ষ ভাস্করের হাতের তৈরি উজ্জ্বল বিরাট স্বর্ণ প্রতিমা। সুপ্রবন্ধ বুঝলেন এও তাঁর পুণ্যের ফলে তাঁর ঘরে এসেছে। কিন্তু পাছে ঐ সোনার পাহাড়টির উপর রাজ্যের বা দস্যুদের নজর পড়ে তাই তিনি সেটিকে সযত্নে লুকিয়ে রাখলেন অন্দর মহলে। হাতীটা বড়ো শান্ত, চুপচাপ থাকে, যেখানে রেখে দাও সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দেয়। কেবল হস্তককে দেখলে চঞ্চল হয়ে ওঠে, শুঁড় নাড়ে, তাঁর আদর পাবার জন্য নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে। হস্তকও তাকে বড়ো ভালোবাসেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। কলসী করে হাঁড়ি করে ভারীরা দুধ আনে, পায়েস আনে, হস্তক স্বর্ণকুঞ্জরকে নিজের হাতে খাওয়ান। মানুষে হাতীতে এত ভাব—যেন দুজন প্রাণের বন্ধু। এ-ওর মুখের কথা বোঝে, ও-এর মনের কথা না বলতেই বুঝে নেয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হস্তকের কাজের দায়িত্ব বাড়ে। তাঁর বাবার বিষয়সম্পত্তির তদারক করতে হয়, বাড়ির লোকের অতিথিসজ্জনের দেখাশোনা করতে হয়। তারই ফাঁকে ফাঁকে একটু সময় পেলেই তিনি বেরিয়ে পড়েন বন ভ্রমণে। শহরের বাইরে কাছাকাছি যেসব বাগান উপবন রাজা বা ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের শখের জন্য ও চিত্ত-বিনোদনের জন্যে তৈরি করিয়েছেন তারই একটা-না-একটাতে ঢুকে পড়েন, শিশুর মতো আনন্দে বিহ্বল হয়ে প্রকৃতির শোভা দেখে বেড়ান। সর্বত্রই উদ্যানরক্ষীরা এবং মালীরা তাঁকে চেনে এবং ভালোবাসে, কেউ কিছু বলে না।

একদিন ঐভাবে বেড়াতে বেরিয়ে হস্তকের দেখা হয়ে গেল মহারাজ প্রসেনজিতের মেয়ে চীবর কন্যার সঙ্গে। রাজকন্যা সখীদের সঙ্গে উদ্যান ভ্রমণে এসে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলছিলেন, হঠাৎ দেখলেন কন্দর্পকান্তি এক যুবা-পুরুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। হস্তকও আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন, দেখলেন দেবকন্যার মতো অপরূপ সুন্দরী একটি তরুণী মেয়ে রূপের প্রভায়, হীরে মুক্তোর ছটায় বনপথ আলো করে এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনে। দুজনেই বিস্ময়ে নির্বাক, দুজনেরই চোখের পলক পড়ে না। তারপর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে রাজকন্যা ফিরে গেলেন সখীদের সঙ্গে রাজপ্রাসাদে, তাঁর মনটি পড়ে রইল সেই বনপথে। হস্তকও ফিরে গেলেন তাঁর বাবার বাড়িতে, তাঁর মনটি জুড়ে রইল ফুলে-ভরা কর্ণিকার গাছের তলায় দেখা সেই কর্ণিকার ফুলের মতো সুন্দর রক্তমাংসের তৈরি দেবীপ্রতিমাটি। রাজার উপবন থেকে ফেরার পথে হস্তক মালীদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনে এসেছিলেন মেয়েটির পরিচয়। বুঝলেন, তাঁর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়।

সেই থেকে হস্তকের কোনো কাজে মন লাগে না। খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে স্বস্তি নেই, রাতের পর রাত জেগে কাটে। দিনের পর দিন তিনি সুযোগ পেলেই গিয়েছেন উপবনে উদ্যানে, যদি কোথাও আর একবার চোখের দেখা হয় রাজকন্যার সঙ্গে, কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁর আর হল না। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে একবারই ছেঁড়ে।

এদিকে সুপ্রবন্ধের চোখে পড়েছে ছেলের ভাবান্তর। অমন হাসিখুশি জোয়ান ছেলে, যার চারদিকে সারাক্ষণ

আনন্দের ধারা বইত, সে যেন হঠাৎ গোমড়ামুখো বুড়ো হয়ে পড়েছে। তার মুখে হাসি নেই, চোখের কোণে কালি পড়েছে, শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। হস্তককে জিজ্ঞেস করে কোনো উত্তর পান না, ছেলে বলে 'কিছুই হয় নি।' শেষ পর্যন্ত একদিন বুড়ো বাপের উপরোধ অনুরোধ ঠেলতে না পেরে হস্তক তার মনের কথা বললেন, সেই উদ্যান বিহারে গিয়ে রাজকন্যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা জানালেন। শেষ পর্যন্ত মুখ ফুটে বললেন, "তার সঙ্গে বিয়ে না হলে আমার আর বাঁচবার ইচ্ছে নেই।" সুপ্রবন্ধের মুখে কথা সরে না। বললেন, "ওরে, মহারাজ প্রসেনজিতের সামান্য প্রজা আমরা, ঘরে যতই টাকা থাক সেই রাজ চক্রবর্তী রাজাধিরাজের বংশগৌরব রাজমর্যাদা আমরা কোথায় পাব? তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে কোনো রাজারাজড়ার সঙ্গে সমান ঘরে, তিনি আমার ঘরে মেয়ে দিতে রাজি হবেন কেন? তুমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার আশা ছাড়ো। স্বঘরে সুন্দরী মেয়ের অভাব নেই। শ্রাবস্তীতে না মেলে জম্বু দ্বীপের নগরে গ্রামে কোথাও না কোথাও রাজকন্যার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে মিলবে। আমি দেশে দেশে ঘটক পাঠাব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

বাবা তো বললেন, কিন্তু হস্তকের মন মানে না। তিনি স্পষ্টই জানালেন, কোশল রাজের মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে তিনি বিয়ে করবেন না কোনো দিন। সুপ্রবন্ধ তখন হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন, বললেন, "তাহলে আমি আর কি বলব? রাজার সঙ্গে দেখা করো, তাঁকে খুশি করো। তোমার ভাগ্যে যদি থাকে তবে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। তুমি খুব ভাগ্যবান, তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আমার ধনসম্পদ বেড়েছে, সেই সঙ্গে ঘরে এসেছে ঐ আশ্চর্য সোনার হাতী। কোশলেশ্বরের স্বর্ণ-প্রতিমা মেয়েকে যদি তুমি তাঁর সম্মতি নিয়ে ঘরে আনতে পারো, তাহলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না তবু ভয় করে, হয়তো রাজসভায় অপমানিত হবে, আঘাত পাবে; লোক হাসবে তোমার দুঃসাহস দেখে।"

হস্তক কি আর সে কথা জানেন না—তাঁর সে ভয় নেই! তবু তিনি হাল ছাড়বার পাত্র নয়। ভাবলেন, 'এদিকেও মরেছি, ওদিকেও মরেছি, দেখাই যাক না।' কিন্তু রাজসভায় যেতে হলে প্রজাকে কিছু ভেট নিয়ে যেতে হয়। কি নিয়ে যাবেন তিনি? সোনা-রুপোর পাত্র, হীরা-জহরত-মণি মাণিক্যের অলঙ্কার? সে তো রাজার অনেক আছে, তা দিয়ে কি তাঁকে খুশি করা যাবে। আর পাঁচজনে যা নিয়ে যায় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নতুন কিছু বিচিত্র বস্তু নিয়ে যেতে চান তিনি। ভাবতে ভাবতে হস্তক গেলেন তাঁর সোনার হাতীর কাছে। তার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "কি করি বলো বন্ধু! রাজাকে কেউ কোনো দিন দেয়নি এমন কি জিনিস নিয়ে যাই তাঁর কাছে?" তাঁর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তেই সেই সোনার হাতী হাঁটু গেড়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে; পরক্ষণেই সে উঠে দাঁড়াল। হস্তক অবাক হয়ে দেখলেন সোনার হাতীর আড়াই হাত লম্বা সোনার দুটি গজদন্ত তাঁর পায়ের কাছে পড়ে আছে। স্বর্ণকুঞ্জর বন্ধু তাঁর মনের কথা বুঝে রাজাকে ভেট দেবার জন্য সে দুটি খসিয়ে দিয়েছে তাঁকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে।

হস্তকের চোখে জল এল, তবু পশু বন্ধুর দেওয়া উপহার তিনি গ্রহণ করলেন। ফাঁপা হলেও সেই সোনার দাঁত জোড়ার ওজন কি কম? দুজন জোয়ান চাকর হিমসিম খেয়ে গেল সে দুটিকে রথে তুলতে। কুমার হস্তক বহুমূল্য বসনভূষণে সাজসজ্জা করে রাজকুমারের মতোই গিয়ে দেখা দিলেন রাজসভায়। বেত্রবতী রাজার আদেশ নিয়ে যখন তাঁকে সভাকক্ষে নিয়ে গেল তখন তাঁর পিছনে দুজন সুসজ্জিত অনুচর গেল হাতীর দাঁত নিয়ে, হস্তক মহারাজ প্রসেন-জিতের সিংহাসনের তলায় সে দুটি রেখে তাঁকে প্রণাম করলেন। সভার লোক তাঁকে দেখবে না তাঁর আনা উপহার দেখবে ভেবে পায় না। রাজারও চোখে পাতা পড়ে না। এত রূপ মানুষের হয়! শেষ পর্যন্ত রাজার প্রশ্নের উত্তরে হস্তক তাঁর পরিচয় দিতে প্রসেনজিৎ যেন একটু নিরাশ হলেন। আহা, এ যদি কোনো রাজপুত্র হত, তাহলে একে নিজের জামাই করা যেত। মনের কথা মনে রেখে রাজা হস্তকের সঙ্গে কিছুক্ষণ শিষ্ঠালাপ করলেন, তাঁদের বিষয়-সম্পত্তির, তাঁর বাবার এবং আত্মীয়দের কুশল সংবাদ নিলেন। রাজা তাঁর কোনো উপকারে লাগতে পারেন কিনা জানতে চাইলে হস্তক বললেন, "আপনাকে দেখতে পেয়েই আমি উপকৃত হয়েছি। আমি শুধু মাঝে মাঝে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করতে পেলেই ধন্য হব।"

রাজা এমন ধনী অথচ নির্লোভ প্রজার পরিচয় আগে কখনও পাননি। রাজাকে এই রকম দুর্মূল্য ভেট যে দেয় সে নিশ্চয় রাজার কাছে কিছু পাবার আশা করে আসে! প্রসেনজিৎ হস্তককে বললেন, "তুমি যখন ইচ্ছা হবে আমার কাছে আসবে, তোমার জন্য আমার প্রাসাদের এবং সভার দ্বার অবারিত রইল।"

সেই থেকে হস্তকের রাজবাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ হল। রাজা মন্ত্রী, সভাসদেরা সকলেই তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ, দেখতে দেখতে তিনি যেন রাজ-সভার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁকে না হলে সভা জমে না। বিবাদের বিচার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা সবেতেই তাঁর পরামর্শ নেন রাজা। তাঁকে তিনি চাকরি দিতে চান, কিন্তু তিনি তাতে রাজি নন। উল্টে দু'দিন অন্তর তিনি তাল তাল সোনার তৈরি এক একটা অদ্ভুত জিনিস এনে হাজির করেন সভাতে। তাঁর স্বর্ণকুঞ্জর স্বেচ্ছায় তাঁকে নিজের এক-একটি অঙ্গ খসিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে তার সে অঙ্গটি কিন্তু আবার গজিয়ে ওঠে। হস্তক কোনো দিন নিয়ে যান হাতীর কান, কোন দিন হাতীর এক-একটি পা। সেগুলি অবশ্য রথে চড়ানো যায় না, গরুর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হয়, বাঁশে বেঁধে ভারীরা রাজসভায় নিয়ে গিয়ে ফেলে। রাজা প্রসেনজিৎ সত্যিই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যেদিন হস্তক একটি প্রকাণ্ড সোনার চাদর বিছিয়ে দিলেন সভাস্থলে, সেটির বলিচিহ্নিত খসখসে গায়ে ছোটো ছোটো সোনার লোম দেখে বোঝা গেল—সেটির পরিচয়—সেটি

একটা প্রকাণ্ড সোনার হাতীর গায়ের চামড়া। সেই করি-চর্মের উপরে হস্তকের অনুচরেরা এনে নামাল প্রকাণ্ড একটা সোনার হাতীর মাথা। তার চোখ দুটিতে মানিক জ্বলছে, তার কপালে এবং শুঁড়ে অলকাতিলকার মতো বিচিত্র বর্ণের মিনার কাজ! মহারাজ প্রসেনজিৎ সেদিন হস্তককে ধরে বসলেন, "তুমি আমাকে এত দিচ্ছ, আমি তোমাকে কিছু না দিয়ে শান্তি পাচ্ছি না। তুমি কি চাও বলো, আমি রাজভাণ্ডার উজাড় করে দেব তোমাকে।"

হস্তক বললেন, "মহারাজ, আমার কাঞ্চন-মণিমাণিক্যের অভাব নেই—দেখতে পাচ্ছেন, আপনার রাজভাণ্ডারের প্রতি আমার কিছুমাত্র লোভ নেই।"

প্রসেনজিৎ বললেন, "তবে কিসে তোমার লোভ আছে বলো, আমার সাধ্য হলে নিশ্চয় দেব তোমাকে, কথা দিচ্ছি।"

হস্তক বললেন, "মহারাজ, যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে, রাজকুমারী চীবর কন্যাকে দান করুন আমাকে। এর চেয়ে বড়ো প্রার্থনা আর আমার কিছু নেই।"

সভার মধ্যে যেন বজ্রপাত হল। সভাসদেরা নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে আছেন ধনী যুবকের স্পর্ধা দেখে, এই বুঝি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সভার পিছনে লাল পাথরের জালির ফাঁকে রাজকুমারী চীবরকন্যা অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে এসে এতক্ষণ হস্তকের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। হস্তক যখন হঠাৎ তারও অন্তরের প্রার্থনা রাজার কাছে জানিয়ে বসলেন তখন তিনি প্রমাদ গণলেন, মনে মনে প্রাণ-পণে দেবতাদের ডাকতে লাগলেন, "রক্ষা করো, এই হতভাগ্য নির্বোধকে রাজরোষ থেকে রক্ষা করো।"

প্রসেনজিৎ কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখলেন, তাঁর বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, হস্তক যে এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করতে পারেন তা ছিল তাঁর কল্পনার অতীত। যে একদণ্ড আগে ছিল অত্যন্ত প্রিয়, সে এক মুহূর্তে তাঁর অপ্রিয় চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। একবার মনে হল, যুবকের উদ্ধত রসনা কেটে ফেলবার আদেশ দেবেন, একবার মনে হল কশাঘাত করে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেবেন, পরক্ষণেই মনে পড়ল তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা। রাজার বাগ্দান যদি ব্যর্থ হয় তবে তার অকীর্তি দেশে দেশে রটে যাবে, তাঁর আর মুখ দেখাবার পথ থাকবে না প্রজাদের কাছে। অনেকক্ষণ নীরব থেকে তিনি হস্তককে বললেন, "তুমি কাল এস, আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও।"

সভাশুদ্ধ সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল, হস্তক আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরলেন। প্রসেনজিৎ সভা ভঙ্গ করেও সভাকক্ষ ছেড়ে গেলেন না, সিংহাসনে বসে ভাবতে লাগলেন, কি কর্তব্য? অর্বাচীনের স্পর্ধার শাস্তিদান না সত্য রাখার কুলগৌরব হানি স্বীকার।

বুড়ো মন্ত্রী সভাসদেরা চলে যাবার পরেও বসেছিলেন, রাজাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে বললেন, "মহারাজ, আপনি হঠাৎ না বুঝে প্রতিজ্ঞা করে সত্যিই ভুল করেছেন। যাই হোক এখন সরাসরি 'না' বললে আপনার শীলমর্যাদা যাবে আবার সম্মতি জানালে কুলমর্যাদা যাবে। এ ক্ষেত্রে আমার মতে একটা শর্তসাপেক্ষে আপনি মত দিন। বোঝা যাচ্ছে, হস্তকের একটা সোনার হাতী ছিল বাড়িতে। হয়তো বহু পুরুষের সঞ্চিত শত শত মণ সোনা দিয়ে সেটি তৈরি হয়েছিল, কিন্তু হস্তক দিনের পর দিন সেটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে রাজভাণ্ডারে তুলে দিয়েছে, এখন আর সে হাতীর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। এখন যদি রাজা শর্ত আরোপ করেন যে, রাজকন্যাকে বিয়ে করতে হলে হস্তককে সোনার হাতীতে চড়ে রাজবাড়িতে আসতে হবে তবে সেটা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব হবে না; ফলে রাজকন্যাকে বিয়ে করবার আশা তাকে ছাড়তে হবে।"

পরদিন হস্তক সভায় আসতেই প্রসেনজিৎ তাঁর কাছে তার শর্তের কথা জানালেন। হস্তক, "যে-আজ্ঞা মহারাজ" বলে হাসিমুখে বাড়ি ফিরে গিয়ে বাবাকে জানালেন সব কথা; স্বর্ণকুঞ্জরকেও বললেন গিয়ে রাজার ছলনাপূর্ণ সম্মতির বিবরণ। স্বর্ণকুঞ্জরের তো মাথা কাটতেই আবার মাথা গজিয়েছে, কোনো অঙ্গে তার কাটাকুটির কোন চিহ্ন নেই। সে আনন্দে নেচে উঠল, তখনি সে যেতে তৈরি। তাকে সে-দিনের মতো অপেক্ষা করতে বলে হস্তক তার বাবার সঙ্গে বিয়ের শোভাযাত্রার আয়োজন করলেন, জ্ঞাতিকুটুম্বদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন, তারপর শুভ দিনক্ষণ দেখে বরযাত্রী-দের নিয়ে মহাসমারোহে, রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন। মহারাজ প্রসেনজিৎ দেখলেন শোভাযাত্রার বাজনার তালে তালে পা ফেলে মণিমাণিক্যে স্বর্ণালংকারে ঝলমল করতে করতে এগিয়ে আসছে মহাকায় এক স্বর্ণকুঞ্জর, আর তার পিঠে মণিখচিত সোনার ময়ূরাসনে আলো করে বসে আছেন বাসন্তী রঙের চীনাংশুকে এবং কিরীটকুণ্ডলে মণিহারে অপরূপ সাজে সজ্জিত দ্বিতীয় কার্তিকেয়ের মতো রূপবান কুমার হস্তক। রাজার মনের সমস্ত বিরূপতা এক নিমেষে কোথায় ভেসে গেল, তিনি নিজে কিছু পথ এগিয়ে এলেন হস্তককে বরণ করে নিতে। পুরাঙ্গণাদের হুহু ধ্বনি, ঘন ঘন শঙ্খ-ধ্বনির এবং লাজবর্ষণের ও পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে হস্তক হাতীর পিঠ থেকে নেমে রাজাকে প্রণাম করলেন। সেই মুহূর্তে রাজার কি কৌতূহল হল, বললেন, "আমি তোমার হাতীতে একবার চড়ে দেখব?" অনুচরেরা হাতীর গায়ে মই লাগিয়ে দিল, রাজা হাতীর পিঠে উঠে বসলেন। চারদিকের জনতা জয়ধ্বনি করে উঠল, বললে, "আহা, যেন ঐরাবতের পিঠে মহেন্দ্র!" কিন্তু হাতী আর নড়ে না, খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। যেন শিল্পীর হাতে গড়া একটা বিরাট স্বর্ণমূর্তি। রাজা লজ্জা পেয়ে নেমে পড়লেন হাতী থেকে, অমনি হাতী পা মুড়ে বসে হস্তককে পিঠে তুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল, প্রাসাদ তোরণে গিয়ে থামল একেবারে। রাজা বললেন, "হস্তক, তুমি দেবানুগৃহীত পুরুষ, আমার বিশ্বাস তোমাকে কন্যাদান করলে আমার বংশের অমর্যাদা হবে না। তুমি আমার মেয়েকে সুখী করতে পারবে।" শুভলগ্নে অগ্নিসাক্ষী করে প্রসেনজিৎ কন্যাদান করলেন।

তারপর সাতদিন ধরে চলল বিবাহোৎসব। নাচ, গান, ভূরিভোজ, দানসত্র। কুমার হস্তক বউ নিয়ে ধুমধাম করে

বাড়ি ফিরলেন। সুখস্বপ্নের মতো দিনগুলি কাটতে লাগল তাঁদের। বৃদ্ধ বয়সে সুপ্রবন্ধের আনন্দ আর ধরে না। রাজকুমারী তাঁকে বাবা' বলে, তাঁর স্ত্রীকে 'মা' বলে ডাকলেন! তাঁদের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন, স্বভাব গুণে মিষ্টি কথায় দুদিনে তাঁদের আপজন হয়ে গেলেন। বাড়ির লোকেরা পাড়ার লোকের যেমন চোখ জুড়িয়ে গেল তাঁর রূপে—তেমনি প্রাণ জুড়িয়ে গেল তার সরল সুন্দর ব্যবহারে। সবাই বলল, "অনেক পুন্যে এমন বউ হয়।"

[চিড়িয়াখানায় সাপের খানা ঃ ১৭২ পৃষ্ঠার পর]

আর পেটুক। রক্ষক এদের ঘরে কয়েকটা ব্যাঙ ছুঁড়ে দিতে না দিতেই এক একটা ঢেমনা এক একটা ব্যাঙ কামড়ে ধরল, আর গিলতে শুরু করল। কোন কোন ঢেমনা তার মাথার চার-পাঁচ গুণ বড় একটা ব্যাঙকে কামড়ে ধরেছে। ব্যাঙটা এমনিতেই তার মুখে সহজে ঢুকছে না। তার উপর সেটা তার পেট ফুলিয়ে দিয়েছে যতদূর সম্ভব। দুজনের মধ্যে কসরত লেগে গেছে যেন! কিন্তু ঢেমনা ছাড়বার পাত্র নয়! শেষ পর্যন্ত সে ব্যাঙটাকে গিলেই ফেলল! একটা সাধারণ দৈর্ঘ্যের ঢেমনা মাঝারি আকারের ২০টি ব্যাঙ পরপর খেতে পারে। তারপর এক সপ্তাহ তার আর কোন খাবার দরকার হয় না। কোন কোন ব্যাঙকে ঢেমনা জ্যান্ত অবস্থাতেই গিলে ফেলে। পেটের মধ্যে গিয়েও কখনও কখনও তারা বেঁচে থাকে এবং ক্যা-ক্যা করে ডাকতে থাকে। সর্পবিশারদ ওয়াল সাহেব এরূপ অনেক ব্যাঙকে ঢেমনার পেট থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ঢেমনার পেট থেকে বেরিয়ে ব্যাঙগুলো কিছুক্ষণ নিশ্চল থেকে লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

বেলেসাপ বালির উপর—কখনও কখনও বা তার মধ্যে মড়ার মত পড়ে থাকে। এ তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। কিন্তু সাপ-ঘরের রক্ষক যেই তাদের ঘরে কতকগুলো জ্যান্ত চড়ুই ছেড়ে দিয়েছে, অমনি এক একটি চড়ুই পাখিকে এক একটা বেলেসাপ ত্বরিতগতিতে কামড়ে তাদের দেহ দিয়ে পাকিয়ে ধরল। অজগরের মত বেলেসাপও তাদের শিকারকে দেহ দিয়ে পাকিয়ে মারে। বেলেসাপ বিষহীন। একে দুমুখো সাপও বলে। তবে সত্যি সত্যি এর দুটি মুখ থাকে না—অন্য সব সাপের মত একটা মুখই থাকে।

গাছের ডালে থাকে সবুজ রঙের লাউডগা সাপ! নিশ্চয়ই দেখেছ তোমরা। এ সাপগুলিকে দেওয়া হল কতকগুলো জ্যান্ত টিকটিকি। তারা অবশ্য তখনই তা খেল না। জানলাম পরে খাবে। লাউডগা কমজোরি বিষধর সাপ।

কালনাগিনীও গাছের সাপ। এদেরও রসদ জ্যান্ত টিকটিকি। কালনাগিনীদের ঘরে কয়েকটি টিকটিকি ছেড়ে দেওয়া মাত্র তাদের মধ্যে লেগে গেল হুটোপাটি—তা ধরার জন্যে। লোকে বলে, কালনাগিনী মারাত্মক বিষধর সাপ। আসলে কিন্তু এ সাপ কমজোরি বিষধর।

বৃক্ষবাসী বিষহীন বেতআছড়ারও ভোজ জ্যান্ত টিকটিকি।

গোখরো-কেউটে আমাদের পরিচিত সাপ। সাপুড়েরা পেট-মোটা বাঁশি বাজিয়ে এদের নিয়ে খেলা দেখায়। রক্ষক এদের ঘরের জানালা খুলে ছুড়ে দিল কয়েকটা জ্যান্ত ব্যাঙ। কোন কোন সাপ ব্যাঙ ধরল কপাৎ করে। একই ব্যাঙকে ধরতে গিয়ে কোন কোন সাপ পরস্পরকেও দংশন করে বসল। গোখরো-কেউটে মারাত্মক বিষধর সাপ।

চন্দ্রবোড়াও মারাত্মক বিষধর সাপ। চন্দ্রবোড়ার মুখরোচক খাদ্য ইঁদুর—যদিও চিড়িয়াখানায় তাকে ব্যাঙই খেতে দেওয়া হল।

শাঁখামুটি সাপ দেখেছ নিশ্চয়ই। রঙের বাহার ভারি সুন্দর। গায়ের উপর কাল ও হলদে চওড়া ডোরা পর্যায়-ক্রমে থাকে। শাঁখামুটিও মারাত্মক বিষধর। তবে নির্জীব অলস প্রকৃতির, সহজে কামড়ায় না। বন্দী অবস্থায় শাঁখামুটি সহজে খেতে চায় না। তার উপর শঙ্খচূড়ের মত এরও প্রধান খাদ্য সাপ। সেজন্যে এ সাপকে খাওয়ান বেশ ঝামেলার ব্যাপার। সাপ-ঘরের রক্ষককে বেশ সাহস দেখাতে দেখলাম। জানালার ভিতর দিয়ে গলে সে একেবারে শাঁখামুটির ঘরের মধ্যেই ঢুকে গেল। তারপর এক একটা শাঁখামুটির মাঝখানটা ধরে তুলে তার সামনে এক একটা জ্যান্ত মেটেলি সাপ দোলাতে লাগল। শাঁখামুটিটা মেটেলি সাপটাকে কামড়ে ধরতেই তাকে রেখে দিল। অবশ্য শাঁখামুটির ঘরের জলাধারে মেটেলি সাপ ছেড়ে দিয়েও শাঁখামুটিকে খাওয়ান যায়। সেক্ষেত্রে শাঁখামুটি জলাধারে নেমে ঐ মেটেলি সাপ ধরে। বাঙলা দেশে শাঁখামুটিকে বলে শঙ্খেখনা।

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য

ক্রুক্ষিয়াম্ নটোবোরিয়াম্

সোমশুভ্রবাবুর বাগান করার ভারি শখ। বিশেষ করে ফুলের বাগান। বাড়ীতে বেশ এক ফালি জমি আছে, তাতে নেই এমন ফুলের গাছ কমই আছে। বেল, জুঁই, টগর, হাস্নুহানা প্রভৃতি দেশী গাছ থেকে শুরু করে নানারকম সৌখীন রংচংএ বিদেশী ফুলের গাছ—কোনটাই তিনি বসাতে ছাড়েন নি তাঁর ঐ ছোট্ট বাগানে! তাঁর বাগানের চন্দ্রমল্লিকাগুলো দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। ডালিয়াগুলো স্থলপদ্মের চেয়েও বড়। তাছাড়া কত যে বিদেশী ফুলের গাছের ছড়াছড়ি তার নামও সাধারণ লোকে জানে না।

দেশবিদেশ থেকে নানা রকম সৌখীন ফুলের চারা সংগ্রহ করা সোমশুভ্রবাবুর একটা বাতিকই বলা চলে। কিন্তু শুধু সংগ্রহ করলেই তো হয় না, সেগুলো বাঁচিয়ে রাখার জন্যও কম মেহনত করতে হয় না। তা সেদিকেও তাঁর আলস্য নেই। সেবার হল্যান্ড থেকে নানা রঙের কতকগুলি টিউলিপ আমদানী করেছিলেন তিনি। সেগুলো যে এখনও বেঁচে আছে তাই নয়, তাদের রঙের ঝলক যেন আরও বেড়ে গেছে ওঁর হাতে। কৃত্রিম উপায়ে ঐ ফুলের রং বদলানো যায় এ তথ্য জানার পর ওটাও তাঁর একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন সকালে উঠেই যথারীতি খুরপি নিয়ে বাগানে চলে এসেছেন তিনি। সকাল বেলার চা-টা এই বাগানে বসে বসেই 'কাজের ফাঁকে ফাঁকে চুমুক দিয়ে খেয়ে নেন, কড়া রোদ উঠবার আগেই যাতে বাগানের কাজ এগিয়ে যেতে পারে। হঠাৎ একটা বড় সাজি হাতে একজন লোক এসে পাশে দাঁড়াল। হাঁকল—'বাবু!'

'কে?'

'আমি নটোবরো।'

'ওঃ, কি খবরো বলো?'

নটবর বহুদিন কলকাতায় আছে। সুন্দর বাংলা বোঝে, বলতেও পারে। তবে এখনও হসন্ত শব্দগুলি ঠিকমত মুখে আসে না—টেনে বলতে গিয়ে ও-কারের মত শোনায়! তাই সোমশুভ্রবাবুও রসিকতা করে ওর সঙ্গে কথা বলার সময় হসন্তগুলিকে ওকারান্ত করে উচ্চারণ করেন। বলতে বলতে এখন এইটেই অভ্যেস হয়ে গেছে।

নটবর খুঁজে পেতে সোমশুভ্রবাবুকে নানা দুষ্প্রাপ্য ফুলের চারা এনে দেয়। যেভাবে আনে সেটা হয়তো খুব সরল পথ নয়। সোমশুভ্রবাবু জেনেও না জানার ভান করেন আর নটবরকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত দিয়ে

খুশী করে দেন। তাই নটবরের তিনি একজন বড় খদ্দের—আধুনিক ভাষায় ক্লায়েন্ট।

'এবারে আপনাকে এমনো একটা ফুলেরো গাছো দিবো যা আপুনি ভাবি পারিবেন না।'—নটবর জানাল।

'কোত্থেকে পাবে? তোমার বন্ধু ক্রুষ্ণো দেবে বুঝি?'

ক্রুষ্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণ নটবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে মালীর কাজ করে করে হাত পাকিয়েছে। নানা রকম দুষ্প্রাপ্য গাছ সংগ্রহ করার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। তারই কিছু কিছু সে নটবর মারফৎ সোমশুভ্রবাবুকে সরবরাহ করে।

নটবর আবার বলল, 'সে এক অদ্ভুতো গাছো। সন্ধ্যার পরে জোনাকরো মতো করি জ্বলে।'

'তাই নাকি?'—সোমশুভ্রবাবু পুলকিত হয়ে উঠলেন। গভীর সমুদ্রের কোন কোন প্রাণী গা থেকে আলো বার করতে পারে; ডাঙ্গাতেও এ জাতীয় পোকা-মাকড় কিছু কিছু আছে, যাদের মধ্যে জোনাকি একটা। প্রাণী ছাড়া কোন কোন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদেরও নাকি এ ক্ষমতা আছে। এরকম একটা গাছের শখ তাঁর বহুদিনের। নটবর হয়তো তারই সন্ধান এনেছে জেনে পুলকিত হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

নটবর আরো জানাল, এ অতি দুষ্প্রাপ্য গাছ, একমাত্র আমেরিকা ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না। ক্রুষ্ণো অনেক কষ্টে একটি যোগাড় করেছে। অনেকেই নিতে চাইছে। কিন্তু নটবর যদি নেয়, তবে সে আর কাউকে দেবে না। তবে, হ্যাঁ, দামটা একটু বেশিই পড়বে। অন্ততঃ শ পাঁচেক টাকার কমে সে ছাড়বে না।

দাম শুনে সোমশুভ্রবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেও সেভাব সামলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, নিয়ে এস। আজই।'

'আজো না হলি কালো নিশ্চয় আনিবো। সন্ধ্যারো পরো।'

পরদিনই নটবর গাছ নিয়ে এসে হাজির। টবের ওপর একটা কাচের বাক্সের মধ্যে গাছটি বসানো। ছোট্ট একটা গাছ, বোধহয় এক ফুটের চেয়ে বেশি উঁচু হবে না। তবে পাতাগুলো বেশ বড় বড় আর সংখ্যায়ও অনেক। ফুল এখনও ফোটেনি, তবে দু ডালের ফাঁকে কচি পাতার মুকুল দেখা যাচ্ছে। কাচের বাক্সটার ওপর দিকে খানিকটা জায়গায় ঝাঁঝরির মত অসংখ্য গুঁড়ি গুঁড়ি ছিদ্র রয়েছে, খুব সম্ভব বাতাস ঢোকাবার জন্য।

নটবরের পরামর্শমত সোমশুভ্রবাবু গাছটা নিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, তারপর সেটি টেবিলের ওপর বসিয়ে ঘরের সুইচটা নিভিয়ে দিলেন। প্রথম দু-তিন মিনিট কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না, কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরেই মনে হল, পাতাগুলো যেন আগের চাইতে একটু উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আরো দু-তিন মিনিট গেল। এবারে শুধু উজ্জ্বল নয়, মনে হল, পাতাগুলো যেন কেমন চিকমিক করছে। আরো কয়েক মিনিট পরে তার ঝিকিমিকি যেন আরো বেড়ে গেল।

নটবরের মুখে হাসি। সোমশুভ্রবাবু ড্রয়ার খুলে তার হাতে গুনে গুনে পাঁচশ টাকা গুঁজে দিলেন।

সোমশুভ্রবাবু জীবনে অনেক রকম গাছ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছেন, কিন্তু এমন অদ্ভুত গাছের কথা কখনও শোনেন নি। মুগ্ধদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। কী নাম গাছটার, কে জানে! তাঁর বন্ধু হীরু বাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। হীরু-বাবু বোটানিস্ট। সোমশুভ্রবাবু কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্রই নন। এটা তাঁর নেহাৎই শখ।

তা, নাম জানা না থাক, আপাততঃ নিজেই একটা নাম দিয়ে দিলে ক্ষতি কী তবে হ্যাঁ, বিজ্ঞানীদের মত নামই দিতে হবে। নটোবরো এটা এনে দিয়েছে ক্রুষ্ণের সাহায্যে। 'ক্রুষ্ণিয়াম্ নটোবোরিয়াম্' নাম রাখলে কেমন হয়? লোকে ভাববে, খাঁটি বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম। কে আর খোঁজ রাখছে!

গাছটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন আর আশ মেটে না তাঁর। হঠাৎ কী মনে হল, কাচের বাক্সটার ওপরে যেখানটায় ঝাঁঝরির মত ছিদ্র করা ছিল সেখানটায় আঙুল রাখলেন তিনি। পরক্ষণেই মনে হল, যেন একটা গরম হাওয়ার হল্কা এসে লাগল তাঁর আঙুলে। আবার আঙুল দিলেন। এবারে আরও গরম মনে হল। তার মানে, গাছটা জোনাকির মত ঠান্ডা আলো দিচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তাপও ছড়াচ্ছে। কিন্তু কই, তা হলে তো পাতাগুলো পুড়ে যেত! সেরকম কোন লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না!

এইভাবে চলল দিন তিনেক। গাছটা এখনও সজীব রয়েছে, তবে পাতাগুলি আর আগের মত অত গাঢ় সবুজ লাগছে না, সবুজ রং অনেকটা হাল্কা হয়ে আসছে। কিন্তু অন্ধকারে তার ঝিকিমিকি কমেনি, আর উত্তাপটাও যেন ক্রমেই একটু একটু বাড়ছে।

গাছটা শেষ পর্যন্ত বাঁচবে তো?

নটবর এর মধ্যে একদিন এসে খোঁজ নিয়ে গেছে

আর পই পই করে বারণ করে গেছে, গাছটাকে যেন কাচের বাক্স থেকে বার করে আনা না হয়। তাহলে ও আর আলো দেবে না, হয়তো বাঁচবেও না। কিন্তু কাঁচের বাক্সের মধ্যে থাকলেই যে বেঁচে যাবে, তারই বা নিশ্চয়তা কী? অতগুলো টাকা দিয়ে কিনেছেন!

অবশ্য দিনের বেলা বাক্সটাকে আর তিনি অন্ধকার ঘরে রাখেন না। কারণ, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী না হলেও তাঁর জানা আছে যে, গাছ দিনের বেলা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নেয় আর সূর্যের আলোর সাহায্যে তা দিয়ে তৈরি করে শ্বেতসার বা স্টার্চ যা নাকি ওর একটি প্রধান খাদ্য। অন্ধকার ঘরে রাখলে সূর্যের আলো পাবে না, কাজেই শ্বেতসারের অভাবে নিস্তেজ হবেই। কিন্তু সূর্যের আলোয় রেখেও তো তেমন ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না! মাটিটা কি বদলে দেওয়া দরকার? কিন্তু না জেনে ওটা না করাই ভালো। তাহলে? অগত্যা সোমশুভ্রবাবু হীরুবাবুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করাই ঠিক করলেন।

হীরুবাবু একটা নামকরা কলেজের বোটানীর অধ্যাপক। গাছগাছড়া সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান তাঁর। সোমশুভ্রবাবুর কাছে ঐ অদ্ভুত গাছের কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন তিনি। আর তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে তখনই ছুটে এলেন দেখতে। এরকম অদ্ভুত গাছের কথা তিনিও শোনেন নি কখনও।

প্রায় ঘন্টাখানেক খুঁটিয়ে দেখলেন হীরুবাবু। তারপরে বললেন, 'হুঁ।'

তার পরই প্রশ্ন করলেন, 'তোমার আঙুলে কি রং মেখেছ নাকি? অত লালচে লাগছে কেন?'

'না, রং মাখি নি তো! কয়েকদিন থেকে আঙুলের ডগাটা কেমন টনটন করছে। একটু ফুলেছে মনে হয়, তাই লাল হয়েছে। ও কিছু না।'

হীরুবাবু আর কিছু না বলে সেদিনকার মত বিদায় নিলেন।

মুখে 'কিছু না' বললেন বটে, কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই বোঝা গেল, সোমশুভ্রবাবুর আঙুলের টন-টনানিটা উপেক্ষা করার মত নয়। আঙুলটা পাকার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। এখন আর চিকিৎসা না করলেই নয়।

ডাক্তার দেখে বললেন, 'ঘা-টা বেশ পাকিয়েছেন দেখছি! হাড়ে গিয়ে না ঠেকে। একটা এক্স-রে করুন।'

এক্স-রে করা হল। যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তা-ই। আঙুলের ভিতরকার অনেকগুলো কোষ আর টিশু একদম নষ্ট হয়ে গেছে, আর ঘা গিয়ে পৌঁছেছে প্রায় হাড়ের ওপর। খুবই চিন্তার কথা।

হাতের যন্ত্রণায় সোমশুভ্রবাবু অস্থির হয়ে পড়লেও বাগানের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। ভোরে উঠে একবার বাগানে ঘুরে আসতে না পারলে তাঁর দিন কাটতে চায় না। তার সেই অদ্ভুত গাছটা! হ্যাঁ, সেটা তো তাঁর একটা মস্ত বড় সম্পত্তি। সেটা যাতে না মরে যায়, সে ভাবনা তো আছেই।

গাছটা কিন্তু মরে নি। আরও ঝিলিক মেরে চলেছে সে প্রতিরাত্রে। কাচের বাক্সের ভিতরটা এখন সর্বদা গরম হয়ে থাকে। সেদিন একটা আরশোলা উড়ে এসে বসেছিল কাচের ঢাকনার সেই ছেঁদাগুলোর ওপর, আর বসতে না বসতেই ধড়ফড় করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। উড়ে পালাবার আর অবসর হল না। তার আগেই সব শেষ!

রাতে ঝিলিক মারলেও গাছের পাতাগুলির সেই হাল্কা সবুজ রংও যেন আর থাকছে না, ক্রমেই সাদাটে হয়ে আসছে। দিনের বেলা এ পরিবর্তন বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। বিজ্ঞানী না হলেও সোমশুভ্রবাবু জানেন, গাছের আয়ুর পক্ষে এটা খুব শুভ নয়।

দিন চারেক পরে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের দিকে এক জরুরী টেলিফোন এল। টেলিফোন করছেন হীরুবাবু।

'আচ্ছা, গাছটা তুমি কোথা থেকে যোগাড় করেছিলে হে?'

'নটবর দিয়েছিল। পাঁচশ টাকা নিয়েছিল আমার কাছ থেকে।'

'নটবর আবার কে?'

'ও একটা গাছের দালাল। মালীদের কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য গাছ সংগ্রহ করে বিক্রি করে।'

'কারা সেই মালী? চোরাই মাল বিক্রি করে না তো?'

'তা কী করে বলব? তবে এ মালীটির নাম শুনেছি কৃষ্ণ। ও বলে ক্রুষ্ণ। উঃ!'—কথাটা শেষ করবার আগেই হঠাৎ আঙুলের যন্ত্রণায় সোমশুভ্রবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন!

হীরুবাবুর বিস্মিত কণ্ঠে ভেসে এল টেলিফোনের তারে—'ও কী হল! হঠাৎ চোট পেলে নাকি'?'

'না ভাই, কয়েকদিন ধরে আঙুলটা নিয়ে বড় ভুগছি। এক্স-রে করিয়েছি। ডাক্তার ভয় দেখাচ্ছে, কয়েকটা টিশু নষ্ট হয়ে হাড় পর্যন্ত এগিয়ে গেছে ঘা।'

'একটু ধর।'

মনে হল, হীরুবাবু ইংরেজীতে কারো সঙ্গে কথা

বলছেন। তারপরই বললেন, 'বাড়ীতে আছ তো? আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে এখনই আসছি।'

আঙুলের যন্ত্রণা আরো বেড়েছে। যন্ত্রণা কমাবার জন্য একসঙ্গে গোটা দু-তিন অ্যাসপিরিন বড়ি খেয়ে নিলেন সোমশুভ্রবাবু। হীরুবাবু হয়তো এখনই এসে পড়বেন বন্ধুকে নিয়ে।

একটু পরেই দেখা পাওয়া গেল তাঁর। সঙ্গের বন্ধুটি বাঙালী নন—বিদেশী। ইংরেজ কিংবা আমেরিকান হতে পারেন।

হীরুবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন,—'আমার বন্ধু ডক্টর অ্যাপেল। ডক্টর মানে, চিকিৎসক নন—মস্ত বড় নামকরা বোটানিস্ট। নামটাও দেখছ না, গাছ থেকেই পেড়ে নিয়েছেন যেন!'

সত্যিই, পাকা আপেলের মতই টুসটুসে চেহারা ডক্টর অ্যাপেলের। কিন্তু, মনে হল, তিনি খুব চিন্তিত। রসিকতাটা হজম করে নিয়ে বললেন, 'আপনার সেই গাছটা একবার দেখতে এসেছি। কে দিয়েছিল বললেন? কৃষ্ণ?'

'না, কৃষ্ণকে চিনি না আমি। তার বন্ধু নটবর দিয়েছিল। তবে বোধহয় কৃষ্ণের কাছ থেকেই এনে থাকবে।'

টেবিলের ওপর গাছটা যেন আজ আরও বেশি ঝলমল করছে। ডক্টর অ্যাপেল কাছে গিয়ে একবার চমকে উঠলেন। তারপর সামলে নিয়ে বললেন, 'কৃষ্ণ আমারই মালী। গাছটা ও চুরি করেছে। কিন্তু সব-কিছু না জেনে নিয়ে কিনে আপনি ঠিক করেন নি। কারণ, এটি যেমন আশ্চর্য, তেমনি বিপজ্জনকও বটে।'

আঙুলটা আবার টাটিয়ে উঠল। সোমশুভ্রবাবু আবার 'উঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ডক্টর অ্যাপেল বললেন, 'কী হল?'

তারপর ওঁর আঙুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি ঐ কাচের বাক্সের ছেঁদায় আঙুল ঢুকিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এঃ, বড্ড অন্যায় করেছেন। তা, আপনারই বা কী দোষ? জানবেনই বা কী করে? তবে একজন বোটানিস্টকে জিজ্ঞেস করে কেনা উচিত ছিল। কিন্তু গাছটা তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফোটোসিন্থেসিস বন্ধ হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। ঐ ছোট্ট ছোট্ট ফুটো দিয়ে আর কতটা কার্বন ডাই-অক্সাইড ঢুকতে পারে বলুন?'

হীরুবাবু বললেন, 'চল, তোমাকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

তিনজনে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে একটা সোফায় বসলেন। হীরুবাবু শুরু করলেনঃ

'আমার এই বন্ধু ডক্টর অ্যাপেল আমেরিকার সেন্ট টমাস ইউনিভার্সিটির নামকরা প্রফেসর। উদ্ভিদ-বিজ্ঞান নিয়ে নানা অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা করা এঁর বাতিক। সম্প্রতি দু'বছরের কনট্রাক্ট নিয়ে ইনি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে এসেছেন। কিন্তু বাতিক যাবে কোথায়? এখানে এসেও চলছে তাঁর রকমারি সব পরীক্ষা। সম্প্রতি মাস কয়েকের ছুটি নিয়ে ইনি দেশে গিয়েছিলেন, আর তখনই এই অদ্ভুত গাছটি সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন। গাছটি এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছ নয়, শুধু এর স্বাভাবিক বিশেষত্ব হচ্ছে ওর প্রচুর পাতা, যাকে আমরা বলি ফোলিয়েজ। আর বাকি যা বিশেষত্ব, সেটা ডক্টর অ্যাপেলের সৃষ্টি।

'আর একটু খুলেই বলি। তুমি নিশ্চয়ই জান, গাছেরা দিনের বেলায় সূর্যের আলোর সাহায্যে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার তৈরি করে, যাকে বলা হয় ফোটো-সিন্থেসিস। বাংলায় ওর নাম দেওয়া হয়েছে সালোক-সংশ্লেষ। আর এও বোধহয় শুনেছ যে, বাতাসে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে, তার সবটা একজাতের নয়; কার্বন ডাই-অক্সাইডের মধ্যে আছে কার্বন আর অক্সিজেন। কিন্তু ঐ কার্বনও আবার বিভিন্ন ধরনের। প্রায় ২৫০০০ ভাগ সাধারণ কার্বনের সঙ্গে মিশে আছে একভাগ রেডিও কার্বন, যাকে বলা হয় কার্বন-১৪। সাধারণ কার্বন হচ্ছে কার্বন-১২। কার্বন-১৪ থেকে প্রতি মুহূর্তে বেরিয়ে আসছে বিটা-রশ্মি বা ইলেকট্রন-কণা, যা নাকি তেজস্ক্রিয় রশ্মি, আর সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে তৈরী হচ্ছে নাইট্রোজেন। অবশ্য পরিমাণে হয়তো খুব বেশি নয়। কেননা এক গ্রাম কার্বন-১৪ ভেঙ্গে আধ গ্রাম কার্বন-১৪-তে পরিণত হতেই লাগে প্রায় ৫৬০০ বছর।

'কার্বন-১৪ও আবার তৈরী হচ্ছে নাইট্রোজেন থেকে। কী করে? বাতাসে সর্বদাই রয়েছে প্রচুর নাইট্রোজেন আর মহাকাশে রয়েছে কসমিক রে বা ব্যোম-রশ্মি। এই কসমিক রে-র মধ্যে আবার আছে নিউট্রন, যা সর্বদাই তা থেকে ছুটে বেরুচ্ছে। কোন নিউট্রন-কণা যদি নাইট্রোজেন পরমাণুর ওপর ঘা মারতে পারে, তাহলেই ঐ নাইট্রোজেন পরিবর্তিত হয়ে

যায় কার্বন-১৪তে আর একটা প্রোটন-কণা বেরিয়ে আসে। প্রতিনিয়তই চলছে এই ব্যাপার বাতাসে, যদিও, আগেই বলেছি, ওতে যে কার্বন-১৪ তৈরী হচ্ছে তার পরিমাণ অতি সামান্য এবং ঐ পরিমাপটার হেরফেরও হচ্ছে না। তাই বাতাসে যে সামান্য কার্বন ডাই-অক্সাইড রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে প্রতি ২৫০০০ ভাগের এক ভাগ তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪; বাকিটা সাধারণ কার্বন, অর্থাৎ কার্বন-১২।

'গাছেরা যখন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, তখন তারা এই দুরকম্ কার্বন ডাই-অক্সাইডই শোষণ করে। আর তার মধ্যে কার্বন-১৪ নামমাত্র থাকায় তাতে ওদের কোনও ক্ষতি করে না। ডক্টর অ্যাপেলের খেয়াল হল, কোন গাছকে যদি কার্বন-১২-র বদলে শুধু কার্বন-১৪ দিয়ে তৈরী কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করিয়ে ফোটো-সিন্থেসিস চালাতে দেওয়া হয়, তাহলে কী হয় দেখতে হবে। যেমন ভাবা, তা-ই করলেন তিনি। নাইট্রোজেনকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে কার্বন-১৪ পাওয়া যাবে, আর এই নিউট্রন আজকাল প্রচুর তৈরী হচ্ছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর বা পরমাণুচুল্লীতে। অবশ্য তা থেকে ওদের আলাদা করে ধরে নিয়ে আসা সহজ কথা নয়। কিন্তু তাও করলেন তিনি। কী করে বিশেষভাবে তৈরী সংকর ধাতুর পাত্রে কিছু নিউট্রনকণা সংগ্রহ করলেন তিনি, সে কাহিনী এখানে বলবার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই হবে, যেভাবেই হোক, তিনি তা হাসিল করলেন। তবে খুব সামান্য পরিমাণ নিউট্রনই নেওয়া হল। কারণ, জিনিসটি এত ভারী যে, তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। যাই হোক, ঐ কাচের বাক্সে গাছটিকে টবে বসিয়ে উনি ওর বাতাসে ঐ নিউট্রন দিয়ে আঘাত করবার ব্যবস্থা করলেন। ফলে ওর ভিতর যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ছিল, তার মধ্যে কার্বন-১৪-র পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে শেষে প্রায় সবটাই হয়ে গেল কার্বন-১৪ দিয়ে তৈরী কার্বন ডাই-অক্সাইড। হবেই বা না কেন, বাতাসের শতকরা আশিভাগই যে নাইট্রোজেন।

'এর ফল কী দাঁড়াল? কার্বন-১৪ হচ্ছে একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ। সুতরাং তা দিয়ে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হবে, তাও হবে তেজস্ক্রিয়। ঐ কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে যে কার্বোহাইড্রেট তৈরী হতে লাগল তাও হল তেজস্ক্রিয়, আর সে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ওর পাতা থেকে সর্বক্ষণ বেরুতে শুরু করল! ফোটোসিন্থেসিস তো পাতার মধ্যে পাতার সবুজ দানার সাহায্যেই হয়। দিনের বেলা আলোর মধ্যে ঐ তেজস্ক্রিয় রশ্মি চোখের নজরে না এলেও অন্ধকার ঘরে রাখলেই সেটা দিব্যি চোখে পড়বে। গাছের পাতা চিকমিক করার কারণটা এই। আর তেজস্ক্রিয় রশ্মি তো জোনাকির মত ঠাণ্ডা আলো নয়, তাই তাপও সে ছাড়বেই। কাজেই কাচের বাক্সের ভিতরটা যে ক্রমেই গরম হয়ে উঠবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

'ফোটোসিন্থেসিসের জন্য শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড আর সূর্যালোক ছাড়াও কিছুটা জলীয় বাষ্প দরকার, দরকার অক্সিজেন বেরিয়ে যাবার পথ। আর সে জন্যই কাচের বাক্সের ঢাকনায় খুব ছোট ছোট ছিদ্র করে ঝাঁঝরা করে নিয়েছিলেন আমার বন্ধু ডক্টর অ্যাপেল। গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কাচের বাক্সের ভেতর নতুন করে তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাই-অক্সাইড ভরে দেবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

'বেশ চলছিল তাঁর পরীক্ষা। এরই মধ্যে তোমার কৃষ্ণ যে ওটি টুক করে টাকার লোভে বেচে দেবে তা উনি ভাবতেও পারেন নি। ফলে, হয়েছে কি, উনি ঐ বৃক্ষহারা হয়ে মরমে মরে আছেন, পুলিশে খবর দিয়েছেন, আর তুমি কিছু না জেনে কেবল আজব শখ মেটাবার জন্য এই বিপজ্জনক গাছের মালিক হয়ে বিপদে পড়েছ। এই ছেঁদায় আঙুল ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে বারে বারে উত্তাপ পরীক্ষা করার সময়ে তোমার আঙুলেও ঐ তেজস্ক্রিয় রশ্মি নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা এসে লেগেছে। আর তেজস্ক্রিয় রশ্মির ভয়াবহ ফল তো জানই—তোমার আঙুলের টিশু নষ্ট করে দিয়ে হাড়ে গিয়ে ঠেকেছে। এর পরের ধাপই হচ্ছে হাড়ের ক্যানসার, যা নাকি এক দুরারোগ্য রোগ। ভগবানকে ধন্যবাদ, এখনও হয়তো ততদূর গড়ায়নি। কিন্তু অবিলম্বে অপারেশন না করলে সে আশঙ্কা আছেই।'

হীরুবাবু চুপ করলেন।

'কী হবে তা হলে!'—সোমশুভ্রবাবু সোফার মধ্যে প্রায় এলিয়ে পড়লেন। ডক্টর অ্যাপেল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ভয় নেই. এখনও আপনার কেসটা নিশ্চয়ই তত মারাত্মক হয়নি—ক্যানসারের ধাপে পৌঁছোয় নি। তবে একটু ভোগাবে।'

'নিয়ে যান আপনার গাছ। উঃ!'

'হ্যাঁ, ওঁর জিনিস ওঁকে দিয়ে দাও। আর তোমাকেও হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।'

হীরুবাবু ধীরে ধীরে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সামনা-সামনি দুটি বাড়ি।

দত্তবাড়ি আর মিত্রবাড়ি।

দুই বাড়ি বাসিন্দারের মধ্যে ভারি ভাব।

দুই বাড়ির ছোট ছেলেরা এক সঙ্গে খেলাধুলো করে। একটা ভালো বই পেলে দত্তবাড়ির ছেলেরা মিত্র-বাড়ির ছেলেদের না পড়িয়ে লাইব্রেরীতে সে বই ফেরৎ দেয় না। মিত্রবাড়ির দিদিমণিরা নতুন ধরনের সেলাইয়ের কোনো নমুনা পেলে দত্তবাড়ির মেয়েদের সেগুলো ডেকে দেখাবে। দুই বাড়ির গিন্নিরা যখনই নতুন কোনো রান্না করেন—বাটি ভর্তি করে অন্য বাড়িতে অবশ্যই পাঠাবেন।

আর দুই বাড়ির কর্তারা এক সঙ্গে বসে সকালে খবরের কাগজ পড়েন রাজনীতি আলোচনা করেন, ঘন ঘন তক্তপোষে চাপড় মারেন। আর সন্ধ্যাবেলা তাস, পাশা কিম্বা দাবা খেলেন।

এইভাবে দুই বাড়ির মিত্রতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এক বাড়ির ছেলে কিংবা মেয়ে পাশ করলে আর এক গৃহের অধিবাসীরা গিয়ে মিষ্টি আদায় করে আসেন। আবার এক বাড়ির গিন্নি ব্রত-উদ্যাপন করলে সামনের বাড়ির সবাই মিলে পাতা পেতে প্রসাদ গ্রহণ করতে বসে যান।

পাড়ার প্রতিবেশীরা সবাই জানেন, দারুণ রদ্দুরে পাথরে ফাটল ধরতে পারে, কিন্তু দত্তবাড়ি আর মিত্তির বাড়ির মানুষের মনে কখনো ফাটল ধরবে না, কিম্বা মনোমালিন্য হবে না। এইভাবে দুই বাড়ির মিল ও একতা নিয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে রীতিমত ঈর্ষারও সঞ্চার হয়ে থাকে। কেন, দত্ত আর মিত্রবাড়ি ছাড়া কি পাড়ায় আর মানুষ নেই?

কিন্তু দত্ত ও মিত্রবাড়ির মানুষেরা একেবারে অচল আর অটল। তারা প্রতিবেশীদের কথা শুনবেও না, অন্য কোন পরিবারের সঙ্গে মেলমেশাও করবে না।

এই রকম যখন পাড়ার পরিস্থিতি তখন হঠাৎ দত্ত-বাড়ির এক জামাই শ্বশুর বাড়িতে ছুটি যাপনের জন্যে এসে উপস্থিত হল। জামাইটি সম্প্রতি ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে পরীক্ষায় কৃতি হয়ে ফিরে এসেছে। শীঘ্রই শাসনবিভাগে উচ্চ পদ লাভ করবে,—এমন খবরও পাওয়া গেছে।

এ হেন জামাইয়ের আদর শ্বশুর বাড়িতে ডবল করে হবে,—এ কথা বলাই বাহুল্য। আবার জামাইটি ইউরোপ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে—সকল রকমে গুণান্বিত আর শিক্ষিত একটি বাহন, একটি প্রচণ্ড বলশালী কুকুর। সেই কুকুরের দেহ সৌষ্ঠব দেখতে দত্তবাড়িতে ভীড় জমে গেল। জামাইকে দেখতে যত না জনসমাবেশ হল—তার চাইতে বেশি ভীড় জমে গেল, প্রচণ্ড সারমেয়টির

বিশাল দেহ দেখতে, আর ততোধিক গুরু গম্ভীর তার তর্জন-গর্জন শুনতে।

পাড়ার ছেলের দল ত' ইস্কুল পালিয়ে কুকুরটির মধ্যাহ্নভোজন দেখতে সমবেত হতে লাগল। এক একজন এক-এক নামে ডাকতে লাগল।

দত্তবাড়ির জামাই ত' সগর্বে ঘোষণা করে জানালো, এই বিশেষ গুণে গুণান্বিত সারমেয়টি ইংলণ্ডে দৌড় শিক্ষালাভ করেছে, প্যারিসে ফ্যাসন দুরস্ত হয়েছে বার্লিনে নাচ শিক্ষা করেছে, আর সোভিয়েট রাশিয়ায় চোর ধরবার কায়দা আয়ত্ত করেছে। শুধু তাই নয়,—সুইজারল্যাণ্ডে এই প্রচণ্ড কুকুর পর্বত আরোহণ বিদ্যা আয়ত্ব করেছে, আর রাত্রে কি করে পাহারা দিতে হয়—তার বিদ্যালাভ করেছে সুইডেনে।

এ হেন কুকুরের কেরামতি দেখতে দত্তবাড়িতে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যায় যেন মেলা বসতে লাগল। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এসে এই সর্বগুণ-সম্পন্ন কুকুরটির ফোটো তুলে নিয়ে গিয়ে ফলাও করে বিভিন্ন দৈনিকে, সাপ্তাহিকে সচিত্র বিবরণী প্রকাশ করতে লাগল। স্বভাবতই এইসব উত্তেজনার মধ্যে মিত্তির বাড়ির ছেলেরা একটু পেছনে পড়ে গেল। দত্ত-বাড়ির ছেলেরা আর যখন-তখন তাদের ডাকাডাকি করে না। জামাইবাবুর কুকুর নিয়েই তারা দিন-রাত মসগুল হয়ে আছে। জামাইয়ের যত না আমন্ত্রণ আসে, তার চাইতে বেশি এনগেজমেন্ট লাভ হয়—এই কন্টি-নেন্টাল কুকুরের। দেশের ডিটেকটিভ দল ইতিমধ্যেই এই সারমেয়ের সাহায্য নিয়ে বহু ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। দেশের নেতারা এই কুকুরটিকে নিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে ফোটো তুলছেন। প্রদেশের রাজ্যপাল কুকুরটিকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে "সারমেয় সন্ধ্যা" উদ্‌যাপন করেছেন। সেই সমাবেশে কুকুরটি তার যত গুণাবলী প্রদর্শন করে দেশের জ্ঞানী-গুণী-বিজ্ঞানীদের অবাক করে দিয়েছে।

শোনা গেল, কয়েকটি সিনেমা কোম্পানী এই কুকুরটিকে 'হিরো' করে অভিযানমূলক কাহিনী তোল-বার আয়োজন করে ফেলেছে। আবার শোনা যাচ্ছে, হিমা-লয়ের পর্বত আরোহণ দল এই কুকুরটিকে সঙ্গে নিয়ে তাদের আগামী অভিযান আরম্ভ করবে। তাই নিয়ে খবরের কাগজে আলোচনার বিরাম নেই।

এই সকল চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলীতে দত্তবাড়ির ছেলেরা-মিত্তির বাড়ির ছেলেদের ডাকতে বেমালুম ভুলে যাচ্ছে। কাজেই মিত্তির বাড়ির ছেলেদের মনে প্রথমে অভিমান—, পরে অপমান বোধ জেগে উঠছে! হলই বা জামাইবাবুর সর্বগুণান্বিত সারমেয়—! তাই বলে ওদের একবার ডাকবে না! এ কেমন কথা?

দুই বাড়ির প্রীতির-সেতু যখন প্রায় ভাঙে-ভাঙে—এমন সময় পাড়ার সবাই অবাক হয়ে দেখলে, মিত্তির বাড়িতেও জাপান ফেরৎ জামাই এসে হাজির।

এই জামাইয়ের সঙ্গে রয়েছে—জাপানে জন্ম, আর সিঙ্গাপুরে শিক্ষিত এক অপরূপ ছোট্ট বানর।

এই ছোট্ট শ্বেত কপির নাকি গুণের সীমা নেই! সে জাপানী প্রথায় তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে পারে—, নানা ধরনের পোশাক পরে যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করতে পারে। প্রাচ্য-নৃত্যে তার জুড়ি পাওয়া নাকি দুরূহ ব্যাপার। দত্তবাড়ির জামাইয়ের কুকুরের গুণাবলী যখন প্রায় ম্লান হয়ে এসেছিল, সেই সময় মিত্তির বাড়ির জামাইয়ের জাপানী বানর নতুন করে পাড়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

মিত্তির বাড়ির জামাইয়ের এই জাপানী বাঁদর প্রতি মুহূর্তে তার পোশাক পরিবর্তন করত। সেও এক দেখ-বার বিষয়। বিভিন্ন ও বিচিত্র এই জাপানী বাঁদরের পোশাক পরে তোলা অজস্র ফোটো নিয়ে "তথ্যকেন্দ্রে" এক অপরূপ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। আর দেশের ছেলেমেয়েরা তাই দেখতে ভীড় জমাতে লাগল।

মিত্তির বাড়ির জামাইয়ের জাপানী বাঁদর যখন শহরে নতুন করে আলোড়নের সৃষ্টি করল, তখন মিত্তির বাড়ির ছেলেরা ইচ্ছে করেই দত্তবাড়ির ছেলেদের ডাকল না, খবর দিল না, এমন কি আমন্ত্রণ করে এই অভিনব জাপানী বাঁদর দেখালো না।

ফলে—দত্তবাড়ির ছেলেরা মনে মনে ফুলতে লাগল, আর তেলে-বেগুনে জ্বলতে লাগল!

কিন্তু এই দোষে তারা নিজেরাও দোষী। দত্ত বাড়ির জামাইয়ের সারমেয় যখন প্রায় বিশ্বজয় করে ফেলেছিল, তখন মিত্তির বাড়ির ছেলেদের ওরা হয়ত ইচ্ছে করেই খবর দেয়নি! হয়ত ওদের মনে এই কথা জাগছিল, দেখুক না দত্তবাড়ির জামাইয়ের কুকুরের কেরামতি! হয়ত সেই ঢিল—এখন পাটকেল হয়ে ফিরে আসছে! জাপানী বাদরের কাছে—ইউরোপের কুকুর প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে এলো।

এমন সময় গোটা পাড়ার লোক হৈ-হুল্লোড় শুনে একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

সিনেমা কোম্পানীর ট্রাক এসেছে—, ক্যামেরাম্যানরা ছুটোছুটি করছে, সাউণ্ড ট্রাক নিয়ে টেকনিশিয়ানরা

ব্যস্ত, গোটা পাড়াটাকে এক রকম অবরোধ করে ফেলা হয়েছে। দত্তবাড়ির কুকুরটাকে 'হীরো' করে এক নামকরা সিনেমা কোম্পানী ছবি তুলবে।

এইসব দেখে মিত্তির বাড়ির ছেলেরা রাগে গজরাচ্ছে। তারা কিছু কইতেও পারে না, সইতেও পারে না।

জাপানী বানর কি শেষ পর্যন্ত ইউরোপের কুকুরের কাছে ম্লান হয়ে যাবে?

আবার হঠাৎ ঘোষণা শোনা গেল,—সিঙ্গাপুরের শিক্ষিত জাপানী শ্বেত-কপি নিউ এম্পায়ারে তার যাদু বিদ্যা প্রদর্শন করবে, আর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন।

মিত্তির বাড়ির ছেলেদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। আর দত্তবাড়ির ছেলেরা রাগে আর লজ্জায় তাদের হাত কামড়াতে লাগল।

কি করে ওই ক্ষুদে বানরটাকে জব্দ করা যায়! দত্তবাড়ির জামাই তার ক্ষুদে শ্যালকদের ডেকে এক গোপন পরামর্শ সভা বসালে।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করলে, বলুন ত' জামাইবাবু, কি করে ওই এক রত্তি জাপানী বাঁদরকে জব্দ করা যায়? আপনি ত' সারা 'কন্টিনেন্ট' ঘুরে এসেছেন, একটা পথ আপনাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

দত্তবাড়ির জামাই অনেক ভেবে চিন্তে উত্তর দিলে, জার্মানী থেকে আমি একটা নতুন ধরনের বন্দুক এনেছি —সেটা দেখতে অনেকটা লাঠির মতো। এই বন্দুক ছুঁড়ে মারলে, সাধারণ বন্দুকের মতো শব্দ হয় না। কোনো ফাঁকে যদি ওই বিচ্ছু বাঁদরটাকে তাক করা যায়—তাহলে সেই ক্ষুদে শয়তানের আর রক্ষা নেই। বন্দুকের শব্দও হবে না। আর পুলিস ওটাকে লাঠি বলে মনে করবে। আসল খুনেকে কেউ খুঁজেই পাবে না।

জামাইবাবুর উর্বর মস্তিষ্কের এই পরামর্শ পেয়ে দত্তবাড়ির ছেলেরা বিশেষ উল্লসিত হয়ে উঠল।

—হ্যাঁ, যে করেই হোক, ওই বিচ্ছু বাঁদরটাকে সাবাড় করতেই হবে।

ওদিকে মিত্তির বাড়ির ছেলেরাও শলা-পরামর্শ করলে, ওই দুর্দান্ত কুকুরটার দফা নিকেশ করতে হবে।

মিত্তির বাড়ির জামাই বুদ্ধি দিলে, ভালো 'মাটন' কিনে এনে তাতে বিষ মাখিয়ে এক ফাঁকে কুকুরটার সামনে ফেলে দিতে হবে। এখন ত' ওর সিনেমা তোলা হচ্ছে, একটা লোককে কিছু টাকা দিলে সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে। ওই বিষ মাখানো মাংস খেলে—বাছাধনকে আর দেখতে হবে না।

মিত্তির বাড়ির জামাইয়ের এই পরামর্শ শুনে শ্যালকের দল খুব খুশী। ওদের পাড়ার একটি ডোমকে কিছু টাকা দিয়ে হাত করতে হবে। বাকি কাজটা সে-ই হাঁসিল করতে পারবে।

দুই বাড়ির ছেলের দল তখন নিজের নিজের ষড়যন্ত্র নিয়ে মেতে উঠেছে।

দত্তবাড়ির ছেলেরা লাঠির মতো বন্দুক নিয়ে রাত্তিরের অন্ধকারে তাক করে বসে আছে ছাদে। কখন সুযোগ পাওয়া যায়।

আবার ওদিকে মিত্তির বাড়ির ছেলেরা ডোমের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত মনে কুকুরের সুটিং দেখছে।

দুই বাড়ির দুটি দলই তৎপর হয়ে আছে।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল,—দত্তবাড়ির কুকুরের পিঠে চেপে মিত্তির বাড়ির বিচ্ছু বাঁদর মজাদার সব খেলা দেখাচ্ছে।

ক্যামেরাম্যান চীৎকার করে বলছে, লোকজন সব সরে যাও—এই দৃশ্যটা আমাদের সিনেমায় চমৎকার দেখাবে।

পরিচালক হাঁকলেন,—স্প্লেনডিড্—বিউটিফুল!!

দত্তবাড়ি আর মিত্তির বাড়ির ছেলের দল—অবাক হয়ে সেই সিনেমার দৃশ্য তোলা দেখতে লাগল!

একটু হাসো !

শাশ্বত সেন

শিক্ষক—আজ বিকেলে স্কুলের মাঠে ফুটবল ম্যাচ হবে। তাই দেখে কাল তার ওপর একটা প্রবন্ধ লিখে এনো।

ছাত্র পরের দিন পড়ে শোনাল—দারুণ বৃষ্টি, সারা মাঠে হাঁটু-জল। খেলা হল না।

বড় ভাই—তুই মোগল, আমি পাঠান। আমি তোকে মারলেই তুই পড়ে যাবি। কেমন?

কিন্তু দাদা, যুদ্ধে তো মোগলরাই জিতেছিল।—ছোট ভাই ইতিহাসের নজীর দেখায়।

ওসব বাজে কথা—বড় ভাইয়ের জবাব।

তুমুল যুদ্ধ। ঘরের জিনিসপত্র ভাঙার শ্রুতিমধুর শব্দে মায়ের আগমন এবং পাঠানকে পিটুনি।

দেখলে তো দাদা,—ছোট ভাই মন্তব্য করে, যুদ্ধে মোগলরাই জিতেছিল!

গরিবের কথা বাসী হলে মনে ধরে! আমি স্বয়ং শ্রীচন্দ্রকালী দাস 'সাহিত্যশ্রী' প্রথমাবধি যে কথা বলে আসছি তা আপনারা এখন কানে তুলছেন না বটে—
ভূমিকা না করে আসল কথাটা বলে ফেললেই তো হয়।

লোকে বলে, আমার তুল্য প্রেত-বিশেষজ্ঞ ভারতে দুটি নেই। লোকে এও বলে—

আঃ, লোকে কী বলে তা কে শুনতে চাইছে? লোকে তো আড়ালে রাজার মাকেও ডাইনি বলে। আপনি কী বলেন সেটাই শুনতে চাই।

হেঁ হেঁ হেঁ, ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোয়েন্দা যে আমার কথা শুনতে পেলে আর কিছুই চান না, তা কি আর আমি জানি না? তবে কি জানেন, আত্মপ্রচারে আমি বরাবরই পরাঙ্মুখ। যাক, যে কথা বলছিলাম। মিস্টার পাণ্ডের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারছি, সব কিছুর পেছনে এক খলস্বভাবের ভূতের কারসাজী বিদ্যমান।

এখানেও ভূত!
আজ্ঞে হ্যাঁ, অতি দুষ্টপ্রকৃতির ভূত। আমার প্রেতের অনিষ্ট গ্রন্থে আমি এবম্প্রকার ভূতের লক্ষণ বর্ণনা করেছি। এখানেও দেখুন, অমাবস্যার রাত মুণ্ডমালা গলে কাপালিকের আবির্ভাব, বণিকের কবন্ধ!

২৪ প ৭৫

পড়ুন।

দৈনিক বার্তা
ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের অদ্ভুত আবির্ভাব
মহুয়ামিলনে ত্রাসের সঞ্চার
শয়নকক্ষে ব্যবসায়ীর মুণ্ডহীন দেহ
ইন্দ্রজিৎ রায়কে জরুরী তারবার্তা প্রেরণ

ইন্দ্রজিৎ রায়কে তারবার্তা প্রেরণ
মহুয়ামিলন, ১লা সেপ্টেম্বর, প্রসিদ্ধ লৌহব্যবসায়ী দীননাথ ঘোষকে গতকাল ভোরে নিজশয়নকক্ষে মুণ্ডহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শ্রীঘোষ দিন কয়েক পূর্বে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকার একটি দাবী-পত্র পান। ঐ পত্রে তাঁহাকে প্রাণনাশের হুমকিও দেখানো হয়। স্থানীয় সাক্ষে ইহাও প্রকাশ যে, কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা জনৈক কাপালিককে ঘটনার দিবসে ব্যবসায়ীর বাসভবনের সম্মুখে ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়।

হুম্! তা আমরা কি এখন?
হ্যাঁ, দীননাথ ঘোষের বাড়িতেই যাচ্ছি।

সন্ধ্যার মহুয়ামিলন
কাহিনী • চিত্রনাট্য • সংলাপ
দিলীপকুমার চট্টোপাধ্যায়
চিত্ররূপায়ণ
নারায়ণ দেবনাথ

আচ্ছা ব্রজবিলাসবাবু, দীননাথবাবুর সঙ্গে আপনার টার্মস্ কি রকম ছিল?
পিতা-পুত্রের মতো। বাবার অভাব উনি কোন দিনই আমাকে টের পেতে দেননি। জানেনই তো, কাকা ছিলেন নিঃসন্তান, কাকীমাও বহুদিন আগে গত হয়েছেন। তাই কোন ব্যাপারেই আমাকে না হলে কাকার চলত না।

অথচ একটু আগেই আপনি বললেন যে, ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চিঠির বিষয়ে আপনার কাকা আপনাকে বিন্দু-বিসর্গও জানান নি। তাই না?
হ্যাঁ। এবং সেটাই আমার কাছে বিরাট একটা হেঁয়ালি, মিস্টার রায়। মাঝে মাঝে সন্দেহ জাগে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড আদৌ কোন চিঠি দিয়েছিলো কিনা।

সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন ব্রজবিলাসবাবু, কারণ সে চিঠি আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আচ্ছা আপনার চোখে কি—
কনজাংটিভাইটিস! আমাকেও ধরেছে হাজারিবাগে পা দেওয়া মাত্র!

আপনি চুপ করুন। আচ্ছা ব্রজবিলাসবাবু, আপনারই কাকা কি কোন উইল করে গেছেন?
হ্যাঁ। আমাকেই তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন।

কানাঘুষায় কানে এসেছে আপনি নাকি তান্ত্রিক-সংসর্গ করেন। একি সত্যি?
হ্যাঁ। দেখুন, আমি বিয়ে-থা করিনি। ছেলেবেলা থেকেই আমার সাধু-সংসর্গের দিকে ঝোঁক। কোন দিন শেষে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করি, এই ভয়েই সম্ভবত কাকা আমাকে বৈষয়িক বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চেয়েছিলেন — ব্যবসার একটা বড় অংশ আমিই দেখতাম।

দুর্ঘটনার দিন যে কাপালিককে এ বাড়ীর কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে, তিনিই কি......
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ আমি অন্তত ঐ ধরনের কাউকে সেদিন দেখিনি।

আচ্ছা আপনি আসতে পারেন। অনুগ্রহ করে আপনার পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্টার তলাপাত্রকে পাঠিয়ে দেবেন।
এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কেমন বুঝছেন পাণ্ডেজী?
কই, আমি তো তেমন-----

বুঝবেন, বুঝবেন! আমাদের মতো সাধু-সংসর্গে কিছুদিন থাকলেই সব বুঝতে পারবেন! আমি আর ইন্দ্রজিৎবাবু, বুঝলেন কিনা, যাকে বলে অভিন্ন—

আসতে পারি?
আসুন মিঃ তলাপাত্র। বি সিটেড প্লীজ।

আচ্ছা মিস্টার তলাপাত্র, ব্রজবিলাসবাবুর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে আপনি কত দিন কাজ করছেন?
এই অক্টোবরে তিন বছর পূর্ণ হবে।

দীননাথ ঘোষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল?
ও শিওর! ওভারঅল সুপারভাইজ অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন দেখাশোনা উনিই করতেন কিনা!

ওর সঙ্গে মেলামেশার ফলে ওঁর চরিত্র সম্পর্কে নিশ্চয়ই একটা ধারণা আপনার জন্মেছে। খুব খোলামনেই বলুন তো, ওঁকে কী প্রকৃতির মানুষ বলে আপনার মনে হয়েছে।

টু বি ফ্র্যাঙ্ক অর্থাৎ খোলাখুলি বলতে গেলে, লেট সিনিয়ার ঘোষের মধ্যে যে ডেপ্থ্ অ্যান্ড উইটিনেস অর্থাৎ গভীরতা এবং রসবোধ আমি মার্ক করেছি, তা এই প্রফেশনের লোকের মধ্যে ইউজুয়ালি দেখা যায় না। ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চিঠি পাবার পর ওঁর রিঅ্যাকশান দেখে আমি তো স্টানড্ হয়ে গেছলাম!

কেন?
চিঠি পাবার পরদিন সকালে আমাকে ডেকে পাঠালেন উনি তারপর হাসিমুখে বললেন, 'শোনো হে ফুটোপাত্র'—আমাকে ঐ বলে সম্বোধন করতেন উনি—'কালকে আমি ভেবেছি সারারাত্র, মগজে ঘিলু নেই কো কণামাত্র তার, যে লেখে আমাকে অমন পত্র'।

চমৎকার! এমন ব্যঙ্গপূর্ণ ছড়া আমি বহুকাল শুনিনি। 'শোনো হে ফুটোপাত্র। কালকে আমি ভেবেছি সারারাত্র। মগজে ঘিলু নেই কো কণামাত্র। তার, যে লেখে আমাকে অমন পত্র।' চমৎকার!
আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, এটা বুঝি নেহাতই হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার। কিন্তু চিঠিখানা আমার হাতে তুলে দিতে সেটা পড়ে আমার তো হার্ট-বিট মানে হৃৎস্পন্দন রীতিমতো বেড়ে যাবার জোগাড়!

আশ্চর্য তো! ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের চিঠি আপনাকে দেখিয়েছেন, অথচ ব্রজবিলাসবাবুকে····
দেখানো দূরের কথা, জুনিয়ার ঘোষকে এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানাতে বার বার আমাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন উনি।

কেন বলুন তো? ওঁদের মধ্যে সম্পর্ক তো খুবই ভাল ছিল শুনেছি।
জুনিয়র ঘোষ অবশ্য সেইরকমই বলে থাকেন।
আপনি কী বলেন?
দেখুন, এইসব ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্সে মানে পারিবারিক বিষয়ে আমার কিছু বলা----
আপনি নির্ভাবনায় সবকিছু খুলে বলতে পারেন মিস্টার তলাপাত্র। আপনার চাকরির ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।
না, ও ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ আজই রেজিগ্নেশন লেটার সাবমিট করে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি।
বলেন কি? কেন?
না, মানে ঠিক অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না।
আসুন ডক্টর দে! আমরা আপনার জন্যেই ওয়েট করছি।
সো কাইণ্ড অব ইউ। নমস্কার মিস্টার রায়, অধমের নাম বনবিহারী দে।
মিস্টার রায়কে আপনি চিনলেন কেমন করে? আগে থেকে পরিচয়-টরিচয়--
নট অ্যাটল। মিস্টার রায়ের মতো ওয়ার্ল্ড-ফেমাস মানুষকে দেখলেই চেনা যায়।
এখন তবে আসি।
বলুন ডক্টর
নতুন কিছু বলবার নেই। আমি প্রথম দিনই যা বলেছি এখনও তাই বলছি -- ইট্‌স্ এ কেস অব ব্রুটাল মার্ডার। ক্লোরোফর্ম বা ঐ ধরনের কোন কিছু দিয়ে দীননাথবাবুকে বেহুঁশ করে আততায়ী ধারালো ছোরা দিয়ে তাঁর মাথাটি ধড় থেকে আলাদা করে ফেলেছে। সংজ্ঞাহীন থাকার ফলে দীননাথবাবু কোন রকম আওয়াজ করার সুযোগ পাননি।

আচ্ছা ডক্টর দে, আপনি জীবিত অবস্থায় দীননাথবাবুকে শেষ কবে দেখেছেন ?
খুনের দিন মৃত্যুর মাত্র ঘন্টাখানেক আগে। দীননাথবাবুর কাছ থেকে আর্জেন্ট কল পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি চলে আসি। রাত তখন দশটা।

অত রাত্রে হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন? কী ট্রাবল হয়েছিল ওঁর ?
সত্যি কথা বলতে কি, ফিজিক্যাল কোন ট্রাবলই ওঁর ছিলনা, মেন্টালি উনি খুবই উইক হয়ে পড়েছিলেন। কেবলই বলছিলেন,'আমি বোধহয় আর বাঁচবনা ডাক্তার ! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে! ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের ভূত চেপেছে আমার মাথায় !

কী শিশুসুলভ কথাবার্তা ! ব্ল্যাক ডায়মণ্ড মোলো কবে যে, ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপবে !

ভালো কথা, পোস্ট মর্টেমের রিপোর্টটা তো আমাকে জানালেন না মিস্টার পাণ্ডে।
আপনার রিপোর্টের সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

কিন্তু খুনটা হয়েছে কখন্‌?
রাত এগারোটা থেকে সোয়া এগারোটার মধ্যে।

অত রাতে !···স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, খুনী এ বাড়িরই একজন, আগে থেকে এ বাড়িতে ছিল সে।

এ বাড়িরই লোক। অর্থাৎ ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এ বাড়ীরই একজন জেনে—নাঃ, আমি আর ভাবতে পারছি না! কেমন যেন সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!
ডক্টর দে ঠিকই বলেছেন মিস্টার পাণ্ডে— খুনী খুনের বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই এ বাড়ীতে ছিল।
ওহে বাপু, কী নাম যেন তোমার?
এজ্ঞে গুরুচরণ।
তা বাবা গুরুচরণ, চলো দিকিনি বাথরুমটা একবার দেখিয়ে দেবে।

কস্তুম্?
ভূ-ভূ-

কস্তুম্?
শ্রীচন্দ্রকালী দাসং সাহিত্যশ্রীং!

দেবভাষার অবমাননা করিওনা মাতৃভাষায় উত্তর দাও। কিজন্য এখানে আসিয়াছ?
ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে ধরিতে।

কেন? কী করিয়াছে সে?
দীননাথ ঘোষের মুণ্ডপাত করিয়া তাহার সিন্দুক ভাঙিয়া লক্ষাধিক টাকা হাতাইয়াছে।

টাকা হস্তগত করিয়াছে! আমি তো তাহাকে শুধু মুণ্ডচ্ছেদের নির্দেশ দিয়াছিলাম।

আপনি! মুণ্ডচ্ছেদ!!
হ্যাঁ, মদীয় আদেশেই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড দীননাথের মুণ্ড কর্তন করিয়াছে। অমন একটি সুলক্ষণযুক্ত নরমুণ্ডের আমার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছিল।

মার দিয়া কেল্লা ! ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে আমিই ক্যাচ করবো !
প্রভু, নির্ভয়ে একটি প্রশ্ন করতে পারি ?
করো।

ব্ল্যাক ডায়মণ্ড কে প্রভু ? সে কি এ বাড়ীরই লোক ?
রে পাষণ্ড ! দ্বিতীয় বার এ কথা উচ্চারণ করিলে আমিই তোর মুণ্ড ছেদন করিব ! নির্বোধ ! ভাবিয়াছিস কী ? আমারই প্রিয় শিষ্যকে আমি বিপদ-সাগরে নিক্ষেপ করিব !

ভুল হয়ে গেছে প্রভু ! আমি নিতান্তই অবোধ ছাগশিশু প্রভু ! এবারকার মতো ক্ষমা করে দিন।

ক্ষমা করিলাম। তবে ইহাও জানিয়া রাখ, যে ব্যক্তি আমার শিষ্যের অমঙ্গল সাধনে লিপ্ত হইবেক, তাহাকে আমি কদাপি ক্ষমা করিব না— আমার রোষানলে সে ভস্মীভূত হইবেক ! তোমার টিকটিকি বন্ধুকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিও। নহিলে—একী !

কী বুঝছেন 'সাহিত্যশ্রী' ? নরমুণ্ড গলে কাপালিকের রহস্য টের পাচ্ছেন তো ?
কাপালিক না কচু ! ভণ্ড বদমাইস একটা ! আমাকে পর্যন্ত রীতিমত ভেবড়ে দিয়েছিল মশাই ! কে লোকটা, আন্দাজ করতে পারলেন ?

তা একটু পারছি বইকি। তবে কিনা অন্ধকারে একপলকের দেখা, ভুলও হতে পারে। দেখতে যদি ভুল না করে থাকি, তবে লোকটা নির্ঘাত পাগলা শনি।
পাগলা শনি! সেটি কে?
শনিপ্রসাদ, পয়লা নম্বরের গাঁটকাটা পকেটমার। কিছুদিন ধরে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের দলে ভেড়বার আশায় তার পক্ষে বেগার খেটে যাচ্ছে। খাটছে অবশ্য ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের অনুমতি নিয়েই। যাক গে, চলুন এবার মিস্টার পাণ্ডেকে নিয়ে নিহত ব্যক্তির ঘরটা একবার দেখে আসা যাক।
আসুন মিস্টার রায়, এটাই দীননাথ ঘোষের শোবার ঘর।
নাঃ, এবার খুনের কোন ক্লুই রেখে যায়নি ব্ল্যাক ডায়মণ্ড!
আরে বুক-শেলফের ওপর ওটা কী?
মুভি ক্যামেরা। বাঃ, দারুণ জিনিস তো!
ক্যামেরা··· মুভি ক্যামেরা··· মুভি··· মুভ — মুভমেন্ট — ইউরেকা!

মিস্টার পাণ্ডে, এ বাড়ীতে যাঁরা থাকেন তাঁদের প্রত্যেককে মিনিট দশেকের মধ্যে এই ঘরে হাজির করার ব্যবস্থা করুন। খুবই ইন্টারেস্টিং খবর আছে।
খবর··· মানে দীননাথবাবুর মৃত্যুসংক্রান্ত?

ও শিওর!

পরিচয় করিয়ে দিই। স্বনামধন্য ইন্দ্রজিৎ রায়, সাহিত্যিক চন্দ্রকালী দাস—

উঁহু, হোলো না। শ্রীচন্দ্রকালী দাস. 'সাহিত্যশ্রী', বিশুদ্ধ ভূতত্ত্বর—

ওই হোলো। ইনি হচ্ছেন পি. আর. ও ফণীন্দ্র নাগ, ইনি দীননাথবাবুর ভাইপো ব্রজবিলাস ঘোষ, পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট অটল তলাপাত্র, প্রাইভেট সেক্রেটারি দানী ঘোষ, স্টেনোগ্রাফার মলয় চাকী, আর ইনি হলেন রবীন্দ্র সোম — দীননাথবাবুর সেলস ম্যানেজার। এঁরা সকলেই এ বাড়ীতে থাকেন এবং দীননাথবাবুর ঘরে এঁদের সকলেরই অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল।
আরে আসুন, আসুন!

আমার বোধহয় অনধিকার প্রবেশ হয়ে গেল। অ্যাটাচি কেসটা ভুল করে ফেলে গেছলাম।

আরে তাতে কী হয়েছে? আপনিও বসুন বরং।

বন্ধুগণ! ইতিপূর্বে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের সঙ্গে বহুবার আমার মোলাকাত হয়েছে। প্রতিবারই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও প্রতিবারই সে একটা-না-একটা অতি সূক্ষ্ম ভুল নিজের অজান্তেই করে ফেলেছে। আর সেই ভুলের সূত্র ধরেই তাকে গ্রেপ্তার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এবারই প্রথম ব্ল্যাক ডায়মণ্ড এমন সতর্কভাবে কাজ করেছে যে, বিন্দুমাত্র সূত্রও সে খুনের পেছনে রেখে যায়নি—এমন কিছু আমার চোখে অন্তত পড়েনি। তাই এক্ষেত্রে ব্ল্যাক ডায়মণ্ডকে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হোতো না যদি না— থাক সে কথা।

না না, থাকবে কেন? বলেই ফেলুন।
যদি না নিহত ব্যক্তি স্বয়ং খুনীকে ধরবার ব্যবস্থা পাকা করে যেতেন।

তার মানে!

অ্যাবসার্ড।

আশ্চর্য তো!

সত্যমেব জয়তে।

হাউ স্ট্রেঞ্জ!

ব্যাপারটা দয়া করে একটু খুলে বলুন তো মিস্টার রায়। আমি ঠিক·····

খুলেই বলছি। দীননাথ ঘোষ ছিলেন আশ্চর্যরকমের তীক্ষ্ণধী। ব্ল্যাক ডায়মণ্ড তাঁকে যাতে খুন করতে না পারে, সে ব্যাপারে তিনি সাধ্যমতো সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর খুন হবার সম্ভাবনা যে বিলুপ্ত হয়নি এটা তিনি অনুমান করেছিলেন,

কারণ কূট-কৌশলী ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের কীর্তি-কলাপের কিছু কিছু খবর তিনি রাখতেন। কিন্তু খুন করেও যাতে সে পার না পায় তার জন্যে অত্যন্ত চমকপ্রদ এক কৌশল আগেভাগেই অবলম্বন করেছিলেন তিনি, নিজের ঘরে এই অটোমেটিক মুভি ক্যামেরাটিকে এমনভাবে সেট করেছিলেন যে, এ ঘরে যা কিছু ঘটবে সবকিছুই তাতে ধরা পড়ে। এবং বলাই বাহুল্য, খুনের দৃশ্য এই ছোট ক্যামেরাটিতে নিখুঁতভাবে বিধৃত আছে। এ কী!

বন্ধুগণ! আপনারা অহেতুক বিচলিত হয়ে এই ঘর থেকে বাইরে চালিত হবেন না। বন্ধুবর ইন্দ্রজিৎ স্বয়ং যখন ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন, তখন কোনক্রমেই সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারিবে না!

ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ী. আমার ওপর ভারি রাগ ওর প্রথম থেকেই। এই যে বলতে বলতেই এসে গেছেন ওঁরা।

এ কী! ডক্টর দে!!

হ্যাঁ, ডক্টর দে-ই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড। ডাক্তারই যে ব্ল্যাক ডায়মণ্ড সেটা তাঁকে জেরা করতে গিয়েই আমি টের পেয়েছিলাম। ডাক্তারকে যখন আমি প্রশ্ন করি 'দীননাথবাবুকে জীবিত অবস্থায় শেষ কবে আপনি দেখেছেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'খুন হবার ঠিক একঘন্টা আগে' এবং এর কিছুক্ষণ বাদে ডাক্তারই মিস্টার পাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করেন 'খুনটা হয়েছে কখন'? কিন্তু নিছক কথার ভুলের ভিত্তিতে তো কাউকে অ্যারেস্ট করা চলে না—প্রমাণ চাই। অথচ, আগেও বলেছি, দীননাথ ঘোষকে খুন করতে গিয়ে কোন ক্লুই ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ফেলে যায়নি। তবে উপায়? সহসা মুভি ক্যামেরাটাই যেন দৈব-প্রেরিত হয়ে আমাকে উপায় বাতলে দেয়—একটা চমৎকার ফন্দি খেলে যায় মাথায়। অবশ্য ব্ল্যাক ডায়মণ্ড মুভি ক্যামেরা ঘটিত আমার আষাঢ়ে গল্পের ফাঁদে পা দেবে কিনা, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাক ডায়মণ্ডের মতো ক্ষুরধারবুদ্ধি লোকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হল—সোনার পাথরবাটির মতোই অলীক অটোমেটিক মুভি ক্যামেরার অস্তিত্বে বিশ্বাস করল সে। যাই হোক, বেশী কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। রাতও কম হয়নি।

গুড নাইট!

মিঠুকে নিয়ে

পরেশ ভট্টাচার্য

সূর্য ওঠার আগে মিঠুই আমার ঘুম ভাঙালো। নয়তো ইচ্ছে ছিল একটু বেলা করে উঠবো। শেষ নভেম্বরের এই ঠাণ্ডার মধ্যে এতো ভোর নাই-বা গেলাম মসুরী।

অন্য কেউ ডাকলে সে ডাক কানে নিতাম না। কিন্তু মিষ্টি মেয়ে মিঠুর ডাক কানে না নিয়ে পারলাম না।

ঘরের দরজা খুললাম। সর্বাঙ্গে শীতের পোশাক জড়িয়ে মিঠু এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে।

কি গো মিঠু,—দু হাতে মিঠুর চিবুক স্পর্শ করে সুর মিশিয়ে বললাম, তুমি ডাক দিয়েছো কোন্ সকালে—কেউ তা জানে না।

—তুমি গান জানো জেঠু?

—না গো না, মিঠু, গান আমি জানি না। তবে গান শুনতে ভালোবাসি। তুমি গান জানো না?

না।—মিঠু বলে, তবে মা বলেছে, এবারে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেবে। ওই ছাখো, তোমাকে ডাকতে পাঠালো বাবা—সেই কথাটাই বলতে ভুলে গেছি। জানো, বাবার ঘড়িটা ঠিক চারটেয় ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

—তুমি যাও, আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

—মা বলেছে, আমাদের ঘরে গিয়ে চা খাবে।

বলে মিঠু ধর্মশালার বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে তাদের সতেরো নম্বর ঘরের দিকে চলে গেল।

আমরা আছি তের নম্বর ঘরে, ওরা আছে সতেরো নম্বরে। মাঝে তিনটি ঘরের ব্যবধান।

মিঠু চলে যেতে মনোজ আর দেবুর ঘুম ভাঙালাম। ওরা কি সহজে উঠতে চায়! তাছাড়া পাশের ঘরের বন্ধুদের সঙ্গে দাবা খেলেছে রাত বারোটা পর্যন্ত, তারপর ঘুমিয়েছে। সেদিক থেকে আমার ঘুম হয়েছে ঠিক। হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া সেরে রাত দশটা বাজতেই কম্বলের আড়ালে নিজেকে ঢেকে-ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

অনিচ্ছাতেও উঠতে হলো দেবু আর মনোজকে। তৈরী হয়ে নিতে হলো যথারীতি।

মিঠুর ঘরে রীতিমতো জলযোগের আয়োজন। প্যাঁড়া, ক্ষীরের জিলিপি আর গ্লাস ভর্তি চা।

যেমন মিঠুর স্বভাব, তেমনি ওর বাবা-মা—দিলীপ আর শিবানী। পরিচয় এদের সঙ্গে পথেই, কিন্তু পথের পরিচয় যেন মনের কাছে পৌঁছেছে। কদিনের আলাপে-সান্নিধ্যে যেন পরস্পরের আত্মীয় হয়ে পড়েছি। হয়তো এ পরিচয় শেষ পর্যন্ত ঘরে গিয়ে পৌঁছবে না, তবু এখন তো এর চেয়ে সত্যি আর কিছু নেই।

দেরাদুনের আগরওয়াল ধর্মশালার এতক্ষণে ঘুম ভাঙছে। আমরা ইতিমধ্যে ধর্মশালার বাইরে বাস স্ট্যাণ্ডে এসে পৌঁছেছি। ধর্মশালার বারান্দা দিয়ে নামার সময়ে উত্তরে দৃষ্টিপাত করেছি—মসুরী পাহাড়চুড়ায় শহরের আলো তখনো জলছে।

দারুণ ঠাণ্ডা বললে ভুল হবে, তবে ইতিমধ্যে দেরাদুন শহরে শীত কিছুটা পড়েছে। তবে এখান থেকে রওনা হবার আধঘণ্টা বাদে আরো শীতের মধ্যে আমরা পৌঁছবো। তারপর মসুরীতে কনকনে ঠাণ্ডা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

যে বাস ছাড়ার কথা ছটায়, সেই বাস ছাড়লো সাড়ে ছটার'ও পরে। তবে দেরাদুন শহর থেকে মসুরী এমন কিছু দূরের পথ নয়। সওয়া ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছনো যায়। খুব বেশী তো দূরত্ব নয়—উপত্যকার কয়েক মাইল পথ পেরিয়ে সামনে পাহাড়ে গিয়ে ওঠা। একেবারে শহরের কেন্দ্রবিন্দু লাইব্রেরী রোডে গিয়ে বাস দাঁড়াবে। তারপর পায়ে হেঁটে ছোট শহরটিকে পরিক্রমা করা। ভিতরে চলার জন্য মানুষে-ঠেলা রিক্সা অবশ্য আছে, তবে সে রিক্সা সর্বত্র তো যেতে পারে না। দর্শনীয় যা কিছু পায়ে হেঁটে দেখাই সবচেয়ে ভালো।

দেরাদুন থেকে বাস ছেড়ে পাহাড়ী পথে এক জায়গায় বাস দাঁড়ালো। যাত্রীদের কাছ থেকে এখানে মসুরী প্রবেশের জন্যে টোল ট্যাক্স্ দিতে হয়।

মিনিট পাঁচেকে জন্য বাস দাঁড়ালো। তারই মধ্যে এক ফাঁকে নেমে গেছে মনোজ। কিনে এনেছে গরম পকোড়া। পকোড়া চিবোতে শীতের মধ্যে মন্দ লাগছে না।

যত ওপরে উঠছি, শীত তত জাঁকিয়ে পড়ছে। হাত পা জমে যাবার যোগাড়। বাসের জানালার কাচ যদিও তোলা, তবু শীতের আসার পথ বন্ধ নেই।

মিঠু চলতি বাসের জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। কখনো তার চোখের সামনে অতল-স্পর্শী খাদ, কখনো পাহাড়ের দেয়াল।

পাহাড়ের অঙ্গ জুড়ে সবুজ অরণ্য। কোথাও বা জনপদ, কোথাও বা কারো নিভৃত কুটির রচনা করা।

এক সময় মিঠু নীচে দূরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললে, ওই ছাখো জেঠু ওই শহর থেকে আমরা এসেছি।

দেরাদুন থেকে যেমন মসুরী দেখা যায়, তেমনি মসুরীর পাহাড়ের ওপর থেকে দেরাদুন শহর এবং উপত্যকা চোখে পড়ে। ওপর থেকে নীচের উপত্যকা দেখতে বেশ লাগে। পটে-আঁকা ছবির মতো মনে হয়। সবচেয়ে সুন্দর লাগে পাকা পিচমোড়া মসৃণ সড়কগুলো দেখতে। মনে হয়, ক্লান্ত সরীসৃপ বিশাল অবয়ব ছড়িয়ে রেখে বিশ্রাম করছে। কিংবা মনে হয়, আকাশ-কন্যার চুল বাঁধার ফিতেটা ওপর থেকে পড়ে গেছে—ছড়িয়ে রয়েছে মাটির ওপর।

আমি যখন সরীসৃপের কথা বললাম, মিঠু চুপ করে রইলো। কিন্তু আকাশ-কন্যার কথা বলতে মিঠু বললে, দূর! তাই হয় নাকি? আকাশ তো শূন্য—হাতের মুঠোয় ধরা যায় না, সেখানে কিছু থাকে নাকি? সব বানানো কথা।

—জিজ্ঞেস করে ছাখো না তোমার মা-বাবাকে।

বাবা-মার কাছ থেকে একই জবাব পেল মিঠু—তোমার জেঠুই ওসব খবর জানেন। জ্যাঠা মশাই যে আকাশ-কন্যার বাড়ি যাওয়া-আসা করেন।

তোমার মনোজকাকা যেমন গরম পকোড়া খাওয়ালো তেমনি আমি আকাশ-কন্যার বিয়েতে বরফের গরম পকোড়া খেয়েছিলাম।—আমি বলি।

—বরফ আবার গরম হয় নাকি?

—কেন হবে না? সব কিছু তো গরম হয়, তেমনি বরফও।

মনোজকাকা,—মিঠু এবারে দেবু আর মনোজকে চেপে ধরলো—তোমরাই বলো না, জেঠু সত্যি কথা বলছে?

তোমাদের জেঠু তো মিথ্যে কথা বলে না।—মনোজ বললে, আমরা যা কিছু দেখি সব কিছুকেই গরম করা যায়।

মিঠু ওদের দু জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগলো। তারপর আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গে আকাশ-কন্যার দেশে যাবো।

—সেই দেশেই তো আমরা যাচ্ছি। তুমি, আমি, তোমার বাবা-মা, মনোজ কাকা, দেবু কাকা সবাই যাচ্ছি আকাশ-কন্যার দেশে।

অবশেষে সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথ শেষ হলো। বাস থেকে নেমে এলাম রাজপথে।

প্রথম যাত্রীবাহী বাস দেরাদুন থেকে মসুরীতে এলো। শীতে গোটা শহর ঠকঠক করে কাঁপছে। তবু তো শীত পড়তে আরম্ভ করেছে সবে। ডিসেম্বর, জানুয়ারীর সকাল হলে আমরা এমন বাঙালীর সাজে দাঁড়াতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

রাজপথে সর্বাঙ্গে রোদ মেখে দাঁড়িয়ে আছি। সকালের মিষ্টি রোদ—প্রচণ্ড শীতের মধ্যে এর সামান্য স্পর্শটুকুও মধুর।

কয়েকজন রিক্সাওয়ালা এসে ঘিরে ধরেছে আমাদের—শহর ঘুরিয়ে দেখাবে, রিক্সা পিছু বিশ টাকা। যত বলি, আমরা পায়ে হেঁটেই ঘুরবো, রিক্সার দরকার নেই, তবু তারা নাছোড় বান্দা। শেষ পর্যন্ত আমরা হাঁটতে আরম্ভ করে যখন বেশ কিছুদূর এগিয়ে এসেছি, তখন তারা সঙ্গছাড়া হলো।

মনোরম পথ আর তার চেয়ে মনোরম পটভূমিকা। এরই মধ্যে মসুরী শহর। একদিকে যতই আধুনিক সাজে সাজানো হোক না, তবু পরিবেশ জুড়ে মৌলিকতা বজায় রয়েছে।

পাহাড়ের অঙ্গ জুড়ে শীতের দেশে সবুজ সরল-বর্গীয় বৃক্ষের বিন্যাস। এছাড়া রয়েছে নানা জাতের অর্কিড।

মানুষের হাতের স্পর্শও এখানে পড়েছে। রচিত হয়েছে সুন্দর সুন্দর ছোট-বড় উদ্যান।

চলতে চলতে মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনে এসে পৌঁছলাম। সুন্দর সাজানো-গোছানো উদ্যান। মাঝে কৃত্রিম ফোয়ারা আর খেলাঘরের হ্রদ। সেখানে ছোট ছোট নৌকো বাঁধা।

মিঠু স্বচ্ছন্দ প্রজাপতির মতো ছুটে ছুটে বেড়াতে আরম্ভ করলো বাগানে। তারপর চললো নৌকো চড়ার পালা। একসময় মিঠুকে বলতে শুনলাম, এ দেশটা ছবির চেয়েও সুন্দর।

উদ্যানের মধ্যে মুক্ত অঙ্গনে হোটেল রেঁস্তোরা। এবারে সবারই কিছু খাওয়ার পালা।

খোলা আকাশের নীচে চেয়ার টেবিল পাতা। আমরা একান্তে জায়গা করে নিলাম।

বরফের পকোড়ার কথা এখনো ভোলেনি মিঠু। বললে, জেঠু, আমি কিন্তু গরম গরম বরফের পকোড়া খাবো।

—বেশ তো তাই খাবে। আকাশ-কন্যার দেশে এসেছো, এখানে লঙ্কাও মিষ্টি লাগে।

—দূর, তাই হয় নাকি!

—দেখবে খেয়ে? ঠিক আছে, আমি বলছি লঙ্কার আর বরফের পকোড়া দিতে।

যেখানে পকোড়া ভাজা হচ্ছিল, সেখানে গেলাম। আলু, ফুলকপি, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ সাজানো রয়েছে।

মিঠু বললে, কই বরফ কই?

বললাম, আমরা তো বরফের রাজ্যেই এসেছি, দেখছো না, কী শীত! এখানে সব কিছুই তো বরফের তৈরী। লঙ্কা এখানে মিষ্টি, গরম এখানে ঠাণ্ডা, তারপর আর কি বলবো, হাঁটতে এখানে ভালো লাগে, একটুও কষ্ট হয় না, রোদ্দুর এখানে কতো মিষ্টি! তাই না?

ঠিক এইকটি কথার অবসর। মিঠু আচমকা পাহাড়ের ওপরে সিঁড়ি-পথের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, জেঠু, ওই বুঝি আকাশ-কন্যা?

পাহাড় দেশের একটি কিশোরী নেমে আসছে। পরনে নানা বর্ণের ঘাঘরা, অঙ্গে নানা বর্ণে রঞ্জিত পোশাক, হাতে ফুলের ঝাঁপি। তাজা গোলাপ নিয়ে আসছে।

বললাম, না না, ওরা আকাশ-কন্যার ফুলবাগানের মালিনী। আকাশ-কন্যাকে যখন-তখন দেখা যায় না। শুধু পূর্ণিমার রাতেই তাকে দেখা যায়—তাও মাটিতে নামে না।

—তবে?

—হাওয়ার রথে ঘুরে বেড়ায়। মাটির কাছাকাছি আসে, কিন্তু মাটিতে নামে না।

মিঠুর চোখে-মুখে বিস্ময়। পাহাড়ী কিশোরী চলে গেল ঝরনার পাশ দিয়ে।

এদিকে রেস্তোরাঁর বালক-বন্ধুটি প্লেটে-প্লেটে গরম পকোড়া দিয়ে গেল, সঙ্গে বড় একটা প্লেটে লঙ্কা ভাজা। একটি গোটা লঙ্কার পুর দেওয়া বেসম ভাজায় কামড় দিলাম। তারপর একটি মিঠুর হাতে দিয়ে বললাম, খাও।

প্রথমে কিছুতেই খাবে না মিঠু। কিন্তু যখন সবাই একটির পর একটি মুখে পুরে চিবোতে আরম্ভ করলো, তখন মিঠু একটি না নিয়ে পারলো না। ভয়ে ভয়ে প্রথম কামড়টা দিলে, তারপর কচমচ করে চিবোতে আরম্ভ করলো। বললে, সত্যি জ্যেঠু, ঝাল-ঝাল আবার মিষ্টি-মিষ্টি! আমাকে আরো চারটে দিতে বলো না।

—চারটে, পাঁচটা নয়?

—তবে ছটা।

—ছটা, না সাতটা?

একদফা হাসির রোল উঠলো আমাদের মুক্ত-অঙ্গন মজলিশে।

জলযোগের পর আবার আমরা চলতে আরম্ভ করি। ভ্রমণকারী আরো মানুষের সঙ্গে দেখা হয় পথে। কত অচেনা মুখ চেনা হয়ে ওঠে। খানিকবাদে সেই চেনামুখ আবার মন থেকে হারিয়ে যায়।

কখনো চড়াই কখনো উৎরাই, বেড়াতে বেড়াতে আমরা গান হিলের উপরে এসে উঠি। গান হিল থেকে চারদিকের পরিবেশ আর বিস্তৃত পটভূমিকা দেখা যায়। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে এখান থেকে দূরের তুষার-শিখর দেখার ব্যবস্থা আছে। আকাশ-পরিষ্কার থাকলে কাছের শিখরগুলো খালি চোখেই দেখা যায়। কেদারবদ্রী অঞ্চলের শৃঙ্গগুলো তো এখান থেকে বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে। তবে সব কিছু নির্ভর করে আকাশের ওপর।

উত্তরের আকাশ সাদা মেঘে ঢাকা। কোন কিছু দৃষ্টির দর্পণে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

গান হিল থেকে নামার পর মিঠু বললে, খিদে পেয়েছে।

শুধু মিঠ রই নয়, আমরা সবাই ক্ষুধার্ত।

লাল টিব্বা যাওয়ার পথে খোলা আকাশের নীচে বসলো আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজের আসর। আসার পথে, একটি হোটেল থেকে মুখ-হাত ধুয়ে রুটি, তরকারী, মিষ্টি, কলা আর আপেল কিনে নিয়ে আমরা বেরিয়েছি। সঙ্গের জলপাত্রে জল তো আছেই।

রুটির টুকরো মুখে পুরে মিঠু বললে, আকাশ-কন্যার দেশে আমরা চড়ুইভাতি করছি, তাই না জেঠু ?

ঠিকই বলেছে মিঠু। আজ আমরা এখানে সবাই মিলেছি নীল আকাশের নীচে খোলা মনের মেলাতে। মাথার ওপরে আকাশ, চারদিকে পাহাড়, আর নীচের দিকে আর এক দেশ।

—জানো মিঠু, যখন বাইরে বেড়াতে আসতে হয়, মনের লাগামটাকে শিথিল করে দিতে হয়। যত বাইরে বেড়াবে, মনটা তত ছড়িয়ে যাবে। নতুন দেশ, নতুন মানুষ—কত কি ! দ্যাখো আর শেখো। দেখারও শেষ নেই, শেখারও শেষ নেই।

আমরা সবাই চক্রাকারে বসেছি। মাঝে খাবারের পাত্র। যে যেমন খুশি তুলে নিচ্ছে।

—যে খাবার বেশী থাকবে, সে সব কে খাবে বলো তো মিঠু ?

—দেবু কাকা।

দেবু তখন আলুকপির তরকারী সহযোগে বেশ মৌজ করে রুটি চিবোচ্ছে। মিঠুর কথাতে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। হাসতে গিয়ে বিষম লাগালো দেবু। মুখ থেকে খানিকটা রুটি-তরকারী ছিটকে পড়লো। পরক্ষণে সামলে নিয়ে এক ঢোক জল খেলে দেবু। বললে, ঝাঁকুনিতে পেটে খানিকটা জায়গা হলো।

ভোজন-পটু দেবু। তবে ভোজন-বিলাসী নয়। ভালো-মন্দ তার কাছে সবই সমান। খেতেও ভালবাসে, খাওয়াতেও ভালোবাসে।

বেলা দুটো বাজে। আবার আমাদের চলার পালা আরম্ভ হলো। এবারে যাচ্ছি লাল টিব্বায়। পাহাড়ের এক শিখর থেকে আর এক শিখরে।

সেই একই দৃশ্যপট। পাইন-পপলারের নিবিড় বিন্যাস, আর শীতের দেশের নানা জাতের বৃক্ষ, লতা, গুল্ম।

মিঠুর আনন্দের শেষ নেই। চঞ্চল প্রজাপতির মতো পাখা মেলে চলেছে। মেয়েকে ধরতে গিয়ে তার মা শিবানীর পায়ে হোঁচট লাগলো। পায়ের বুড়ো আঙুল চেপে বসে পড়লো শিবানী। না, এমন কিছু লাগেনি। শীতের মধ্যে একটু চোট লাগলেই সর্বাঙ্গ রি রি করে ওঠে।

মা-মেয়ে হাত ধরাধরি করে চলেছে লাল টিব্বার দিকে। আমার দু চোখে তখন মা-মেয়ের ছবিটাই স্পষ্ট।

কেন চিড়িয়াখানা

✻ সুতপা চক্রবর্তী ✻
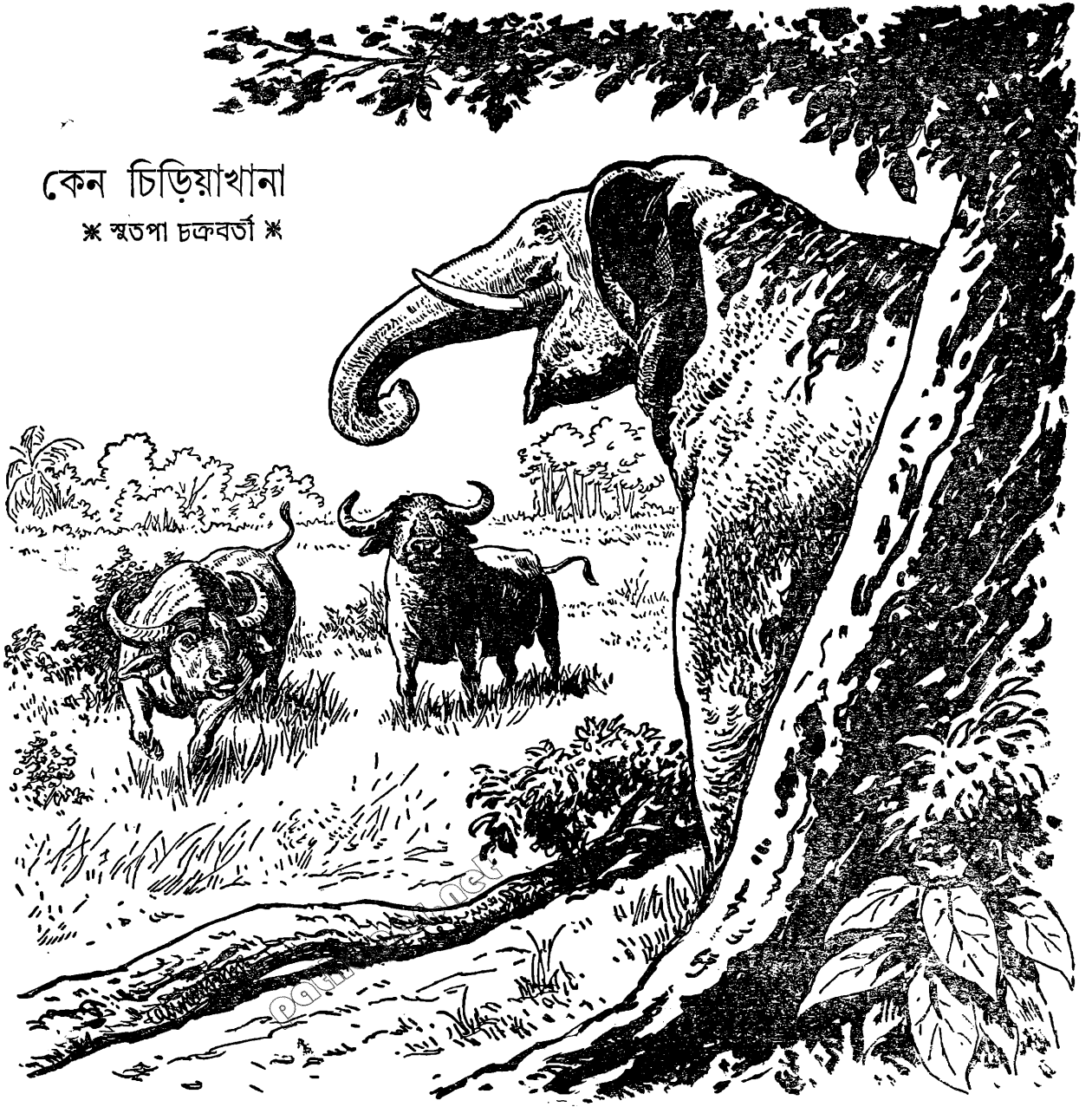
ছোট্ট একটি মেয়ে চিড়িয়াখানায় জলার ধারে অনেকক্ষণ ধরে হরেক পাখির মেলা দেখার পর অভিভূত হয়ে তার বাবাকে বলেছিল, এইখানে আমাদের একটা বাড়ি করো না বাবা, আমি তাহলে বাড়ি থেকে কোথাও বেরোবো না, সারা দুপুর বসে শুধু পাখি দেখবো।

তার বাবা ছোট মেয়ের এই চমৎকার ইচ্ছেটি পূরণ করতে পারবেন না জানি, কিন্তু চিড়িয়াখানা—সে আর কত দূর! এই শহরে যেখানে অধিকাংশ বাড়িতে কৃপণ বাতাসের আনাগোনা, আলো অপরিমিত, গাছ-গাছালিও প্রায় সুদূর স্বপ্নের মতো, সেখানে পাখিদের এমন জটলা

দেখার মতো সৌভাগ্য হয় কজনার? আর চিড়িয়াখানা যাওয়া? সে তো বছরে একটি দিনের ব্যাপার!

কলকাতা শহরে অনেক বনেদী বাড়ি আছে, এখনও তারা কেউ কেউ পাখি পোষেন, সৌখীন জীবও কিছু কিছু পুষে থাকেন। দিনগুলো যখন একালের মতো উড়ে চলত না, জীবন যখন ব্যস্ততার ভারে নুয়ে পড়েনি, সে সময় পশু-পাখি ফুল-লতা-পাতা, এদের সাহচর্যই বেশি ছিল মানুষের জীবনে। সেদিনের মানুষের কাছে অলস মন্থর সময় কাটাবার যেমন পরিপূর্ণ সুযোগ ছিল, তেমনি সেই সময়গুলি ভরে তোলবার জন্য ছিল নানা সৌন্দর্যময় উপকরণ। সেদিনের মানুষ জানতো পশু-পাখিকে, জানতো তাদের অনাবিল জীবনের আনন্দকে। আর এই আনন্দ নিয়েই ভরে উঠত তাদের জীবন।

এই আনন্দ থেকে শিক্ষার অংশটুকুকেও বাদ দিতে পারি না আমরা। এখন আমরা শিক্ষামূলক অনেক উপকরণই হয়ত ছোটদের হাতে তুলে পারি, কিন্তু পারি কি শিক্ষার মূল উৎস সেই সরলতার সঙ্গে শিশু এবং কিশোরের পরিচয় ঘটাতে?

নাগরিক জীবনে এ নিয়ে আক্ষেপ বৃথা। তবু যেখানে যেখানে ছড়ানো রয়েছে জীবনের সরল সুন্দর দিকগুলি, তার দিকে আমরা হয়ত আরো একটু মনোযোগ দিতে পারি। কলকাতার বুকে এই যে প্রায়-উধাও-হওয়া গড়ের মাঠ, বর্ষায় স্নাত, শরতে শিশির-সিক্ত কলকাতায় ঋতু-বদলের পালা একমাত্র যেখানে পা ছোঁয়ালেই অনুভব করা যায়, সেখানে শিশু ও কিশোর মুখের মেলা দেখা যায় কই!

আর তেমনই বিরল দর্শক চিড়িয়াখানায়। একমাত্র শীতকাল বাদ দিলে কলকাতার বাসিন্দা কেউই তো চিড়িয়াখানার দিকে সচরাচর পা বাড়ান না। কলকাতায় যাঁরা বেড়াতে আসেন, কেবল তাঁদেরই দেখা যায় বছরের অন্যান্য সময় চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াতে, আর দেখা যায় চোখে স্বপ্ন, হাতে ইজেল-রঙ-তুলি নিয়ে কিছু শিল্পী ছেলে-মেয়েকে।

অথচ শহরে চিড়িয়াখানা থাকার সুবিধে এই, জীবজগতের বহু পরিচয় আমরা ওদের এই আস্তানা ঘুরেই পেতে পারি। ওদের হাবভাব, রকমসকম, স্বভাব-চরিত্র—এ সবেরই পরিচয় মেলে ওখানে। খাঁচার ভেতরে অতি নিরীহ হয়ে যে হিংস্র জীবগুলো ঘোরাফেরা করছে, মনে হতে পারে, এখানে এসে তাদের স্বভাব পালটে গেছে, তাদের স্বরূপ এখানে এলে বুঝি জানা যাবে না। কিন্তু তা মোটেই নয়। হিংস্র জীবের মধ্যে তেমন কোন কারণ ঘটলে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। একবার আমাদের সামনে একটি ছেলে দুষ্টুমি করে এক-টুকরো জলন্ত সিগারেট ছুঁড়েছিল বাঘের খাঁচায়। বাঘ মশাই-এর সে কী তর্জন-গর্জন! তার সে রুদ্ররূপ একবার যে দেখেছে সে কোনদিন ভুলবে না। চোখের আগুন ঠিকরে পড়েছিল রয়েল বেঙ্গলের—দুটো জলন্ত চোখ মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল অত ভিড়ের মধ্যে ঠিক সেই ছেলেটির দিকেই। বেচারা তো খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে ভয়েই এতটুকু!

গল্প শুনেছিলাম, আসামে না কোথায় যেন হঠাৎ একটি নিরীহ হাতীর শিকার হয়ে মারা পড়েছিল জলজ্যান্ত একটি মানুষ। হাতীর কাছে আসতেই হাতী তাকে শুঁড় দিয়ে তুলে এক আছাড়! পোষা হাতীর এহেন আচরণে সবাই স্তম্ভিত হন। পরে জানা গিয়েছিল, খুব শৈশবে ঐ লোকটিই নাকি সরু একটি পিনের ডগা দিয়ে হাতীটির গায়ে প্রায়ই খোঁচা দিত। অনেকের অনুমান, দীর্ঘকাল পরে হাতী তার বদলা নিয়েছিল ঐভাবে।

জীবজন্তুরা এমনিতে নিরীহ। কিন্তু বুদ্ধির চেয়ে তাদের বল বেশি—তাদের নানারকম আচরণে সেটাই প্রমাণিত হয়।

চিড়িয়াখানায় ফুলমালার ঘটনাও অনেকেরই অজানা নয়। সেও তার মাহুতকে রেয়াত করেনি।

জীবজন্তুর মধ্যে অতটা বলশালী নয় যারা, তাদের আচরণে মজা আছে প্রচুর। বিশেষ করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তো এ বিষয়ে সবচেয়ে সরেস। চিড়িয়া-খানায় ওদের কাছে ছোটদের ভিড় তাই লেগেই থাকে।

শিম্পাঞ্জী মশাই-এর বৈকালিক চা-পানের দৃশ্যই কি কম উপভোগ্য !

কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার বয়স এবারে একশো বছর পূর্ণ হবে। চিড়িয়াখানার কর্তৃপক্ষ নানাভাবে উৎসব পালনের আয়োজন করছেন। সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৭৫টি চৌবাচ্চাসহ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি অ্যাকোয়ারিয়ম তৈরি করছেন ওঁরা। এতে থাকবে রঙ-বেরঙের মাছ, থাকবে কচ্ছপ পোষার ব্যবস্থা। সোয়া লক্ষ টাকা দিয়ে তৈরী হচ্ছে আধুনিক জলাধার, সেখানে থাকবে সীলমাছ। ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলের একজোড়া সী-লায়নের জন্য নাকি এ জায়গাটি আগে থেকেই 'বুক' হয়ে আছে। চিড়িয়াখানায় এই জাতের প্রাণী এখানে এই প্রথম। সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে অতিআধুনিক পঞ্চাশ কামরা বিশিষ্ট সরীসৃপ-ভবন নির্মাণের জন্য। এই ভবনের চাতালে থাকবে বিভিন্ন ধরনের কুমীর, আর প্রকোষ্ঠগুলিতে অন্য নানা ধরনের সরীসৃপ।

বিদেশী জীবজন্তু আনবার জন্যও তোড়জোড় চলছে ভালোই। বিদেশ থেকে দুলক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে আসছে একজোড়া করে জিরাফ, উটপাখি, জেব্রা, সেক্রেটারি বার্ড, পুমা, বিষাওরিকস নামে এক ধরনের হরিণ যার শিং তলোয়ারের মত বাঁকানো, মোষের মত দেখতে এক জাতীয় ঘোড়া যার নাম ন্যু, টেপির, ওয়ালাবী ও জাগুয়ার।

চিড়িয়াখানা তো শুধু হরেক রকম জীবজন্তুর আবাসই নয়, বিশ্বের জীবজন্তুদের বিচিত্র সমাবেশের স্থানও এটা। এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা, আহার-বিহার ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও ভৌগোলিক পরিবেশের নমুনাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবজন্তুদের খাওয়ার ব্যাপারটাও বিচিত্র। তৃণভোজীরা খায় ঘাস, পাতা, খড়, ভুষি, খোল। মাংসাশী প্রাণীরা খায় বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মাংস। পাখিদের জন্য চাই ফল, দানাশস্য, কীট-পতঙ্গ। শিম্পাঞ্জীর চাই চা-টোস্ট। কেউ আবার খিচুড়ি, কেউ তার সঙ্গে সেদ্ধ মাংস। কোন কোন জীব খায় দুধের সঙ্গে হাঁসের ডিমের কুসুম আর পিঁপড়ের ডিম। হাতীর প্রধান খাদ্য গাছের পাতা ও কলাগাছ, এ ছাড়াও তারা খায় চাপাটি, গুড়, খিচুড়ি, ধান, ছোলা। কোন কোন পাখির জন্য পিঁপড়ের ডিম, পোকামাকড়, ডিমের কুসুম, কারো জন্য ছাতুর সঙ্গে লিভার ভাজা। এ ছাড়া দানাশস্য ও ফল তো আছেই। পরিপাকযন্ত্রকে ঠিক রাখার জন্য কোন কোন পাখিকে তার আকার অনুযায়ী বিভিন্ন আকারের কুচি পাথরও খেতে দেওয়া হয়। যে সব পাখি জল খায় না, তাদের দেওয়া হয় রসালো ফল।

পশুপাখিদের জন্যও চাই দুধ, ঘি, মাখন, আর তার জন্য আছে দুধের কার্ড রেশন কার্ডের ব্যবস্থা।

সাপেরা যখন ছমাস ঘুমিয়ে কাটায়, তখন তাদের খাবার কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন তাদের নিদ্রা ভাঙে এবং তারা চলে-ফিরে বেড়ায়, তখন কি আর বিনা খাবারেই থাকে? তবে তখন খেলেও ওদের রোজ খাবার দরকার হয় না—সপ্তাহে একটি দিন খেলেই যথেষ্ট। সে সময় ওদের দেওয়া হয় ব্যাঙ, মুরগি, টিকটিকি, পানিসাপ, আরশুলা এইসব।

ওদের খাওয়ার আয়োজন যেমন, তেমনই আবার অসুখ হলেও চাই ওষুধ এবং পথ্য। সবারই কি আর এক পথ্য, এক ওষুধ? কাউকে ভাতের মণ্ড, কাউকে দই, কাউকে বা বার্লি কিংবা মাংসের সুপ।

বাঘ-সিংহের একেবারে ক্ষুদে বাচ্চা, যারা মায়ের দুধ পায় না, খায় বোতলে করে বেবিফুড। সঙ্গে দরকার হলে ভিটামিন।

এমনিভাবে নানাদিকে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় চিড়িয়াখানায় জীবজন্তুদের সংসার ভালোই চলছে। শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আরও কিছু নতুন ব্যবস্থাপনা হয়ত যোগ হবে, নতুন নতুন জীবজন্তুর আগমন দেখতে দর্শক-সমাগমও তুলনায় বেশি হবে। কিন্তু চিড়িয়াখানা বছরে একটিমাত্র দর্শনীয় দিন না হয়ে শিশুদের কাছে যাতে প্রায়ই দর্শনীয় হয়ে ওঠে তার জন্য তার আকর্ষণ মাঝে মাঝেই বাড়াতে হবে বই কি!

কর্ণ-সংবাদ : গোবিন্দ গোস্বামী

চশমা এঁটে রাজা ভাবেন
হাজার পুঁথি দেখে :
কী প্রয়োজন মাথার পাশে
কানদুটোকে রেখে ?
ভগবানের থাকলে বিচার
গজাতো না কান
হতো না যে কানকাটাদের
এমন অপমান।

: বলুন তবে মন্ত্রী মশাই
কিজন্যে এই কান
সঠিক জবাব দিয়ে তবেই
বাঁচাবেন গর্দান !
মন্ত্রী ভাবেন, এ আবার কী
রাজায় পাতেন ফাঁদ
গদির লোভে পা গলিয়ে
প্রাণ বুঝি বরবাদ !

মন্ত্রী বলেন চুলকে মাথা,
হুজুর বাহাদুর,
কানের গুণে শোনেন কত
রাগ-রাগিণীর সুর।
কান টানলে আসবে মাথা
কান মলে দিন সাজা
গুজবে কান দেবেন যদি
খবর পাবেন তাজা
কান রয়েছে বলেই যত
ধরতে পারেন ভুল
মহারানীর মহামূল্য
কানে দুলছে দুল !
রাজা বলেন, ওসব জবাব
শিশুর মুখেই সাজে !

হাজার টাকা প্রতি মাসে
দিচ্ছি কি এই কাজে ?

মন্ত্রী কাঁদেন, হায় ভগবান !
এ কী বিষম দায় !
কানের টানে সত্যি বুঝি
মাথা এবার যায় !
অনেক ভেবে শেষকালেতে
মন্ত্রী বলেন হেসে,
জ্ঞানী গুণী মহান রাজা
বাস করে যেই দেশে

পড়েন তিনি হাজার পুঁথি
কত যে সব লেখা
খালি চোখে যায় না তো তার
অনেক কিছুই দেখা
তাইতো জানি চশমা নেবার
হয় যে প্রয়োজন
মহারাজার চোখে যে তার
প্রমাণ বিলক্ষণ,
কান দুখানা না থাকলে যে
চশমা আঁটা বৃথা
এমন সহজ প্রশ্ন করে
জানেনও নি কি তা ?
সাবাস মন্ত্রী !—বলেই রাজা
মৃদু হাস্যে কন,
কর্ণ ছাড়াও চশমা পরার
আছে প্রয়োজন
সেই খবরটা না জেনে আজ
হলেন যখন হেয়
এখানে আর থাকার চেয়ে
না থাকাটাই শ্রেয়।

নাগরদোলা

অশোককুমার সেনগুপ্ত

'এক নম্বরে রাজভোগ দুটো, দুকাপ চা, ছ নম্বরে কেক চা, পাঁচ নম্বরে সিঙ্গাড়া, নিমকি, চারনম্বরে দু কাপ যাচ্ছে।' গুরুচরণের উদ্দেশে বলতে বলতে পানু ঝটপট গিয়ে দাঁড়াল চার নম্বর টেবিলের সামনে। ঘদঘদে কালো এক ভদ্রলোক গুম হয়ে বসে। পাশে কালো রোগা আর একজন। এতক্ষণ কথা বলছিল পরস্পরে। চায়ের দেরী-তে বোধ হয় ক্ষুব্ধ। তবে ঝটতি ওই মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল পানু। এক নম্বরের জোড়া খদ্দের কত্তার কাছে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে মৌরি নিচ্ছে। পানু গলা লম্বা করল, 'এক টাকা পঁচিশ।' তারপর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের উদ্দেশে হাঁক পাড়তে থাকল, 'আসুন দাদারা আসুন, গরম চা, নিমকি, সিঙ্গারা, গোল্লা, জিলিপি।'

দাকান পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মোথায় পাতলা খড়ের ছাউনি, ছিটে বেড়ার দেওয়াল। কোনটার আবার দেওয়াল বাঁশের টাটের। বেশীর ভাগই হোটেল আর খাবারের দোকান, চা তেলেভাজার, মুড়ির, মিষ্টির। স্টেশনারীও আছে গোটা কয় ক্ষুদে ক্ষুদে। কাঠের লম্বা ঠ্যাং খাড়া করে পান বিড়ির দোকানও ভিড়ে মিশে আছে।

খড়ের চালের উপর খাড়া টিনের নীল রঙ জমিতে সাদা অক্ষরে লেখা 'গুরুচরণ কেবিন' রোদ লেগে জ্বলছে। মিষ্টি থেকে তেলেভাজা মুড়ি সবই মেলে। সামনের শো কেসে সব সাজান। পাশেই উনুন। মালিক গুরুচরণ পাল। তারিনীই একমাত্র কারিগর। রসগোল্লা পানতুয়া সন্দেশ বানায় অবশ্য গুরুচরণ নিজে। কার্তিক আর পানু
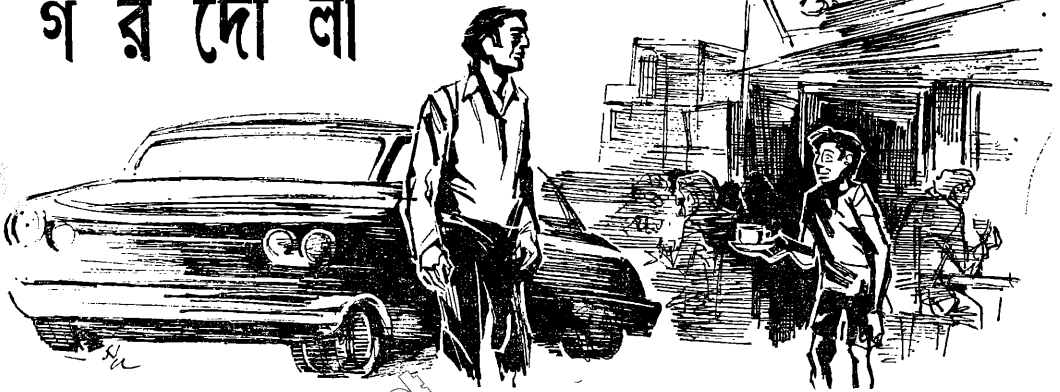
পানুর বেশীক্ষণ দাঁড়ান হল না। পাঁচ নম্বরের রোগা ফরসা ছিপছিপে ছোকরার ডিস খালি, হাঁক পাড়ছে, চা চাই। ঝট করে তারিনীদার কাছ থেকে কাপ ডিস তুলে ছুটল পানু। না, দম ফেলার ফুরসত আজ জুটবে না। চরকির মত ঘুরপাক খেতে হবে এ টেবিল সে টেবিলে। কার্তিকের অসুখ করেছে। কাল বিকেলের বাসে গাঁয়ের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিল কত্তা। একাই তাকে সামাল দিতে হবে। তবে তারিনীদাও হাত লাগাবে। চেয়ার ছেড়ে কত্তা গুরুচরণও তেমন খদ্দের হলে ছোটাছুটি করবে। কিন্তু খদ্দেরের টেবিলে পৌঁছে দেবার মূল ভার তো তার।

স্টেশনের বাইরে দোকানের সারি বসা এই চত্বরটা এখন সরগরম। এটা বাস স্ট্যাণ্ডও বটে। সাইকেল রিক্সা একধারে দাঁড়ায়। তবে দোকানই বেশী। সারি সারি খদ্দেরের টেবিলে পৌঁছে দেয়।

আজ শুধু একা পানু, তাই না দাঁড়ানর অবসর পাচ্ছে না! শীতের দিন তবু হাফপ্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা শরীরটা ঘামছে। খদ্দেরের ভিড় কমছেই না। বাইরে ঘদঘদে রোদ। ওদিকে স্টেশনের ভেতরে শব্দ বাজছে একটা গাড়ীর। সাইকেল রিক্সা প্যাঁক প্যাঁক করছে একটানা। হুইসেল বাজছে বাসের। কোনটা ছাড়ছে কোনটা ঢুকছে। এখান থেকে বাস গাঁ গঞ্জ বড় সহরে তো বাস যাচ্ছে না। পিচ ঢালা রাস্তা কালো সাপের মত লম্বা হয়ে শুয়ে স্পর্শ করে আছে এ গাঁ সে গাঁ, এ সহর সে সহর।

কেবিন বেশ খালি। ওধারে লুঙ্গি গেঞ্জি পড়া উসকো খুসকো একটা মানুষ শাল পাতার ঠোঙায় মুড়ি খাচ্ছে।

বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পানু। অমনি গুরুচরণের হাঁক, 'এই পেনো উনুনে কয়লা দে।'

ধীরে পায়ে হেঁটে হাতুড়ি নিয়ে কয়লা ভাঙ্গতে বসল পানু।

গুরুচরণ লোকটাকে পানুর কিন্তু অপছন্দ নয়। লোকটা সময় সময় খুবই ভাল। কার্তিকের লুকিয়ে চুরিয়ে জিনিষ তুলে খাওয়ার অভ্যাস আছে। চড় চাপড় ওকে মারে গুরুচরণ। কিন্তু কখনই তার গায়ে হাত তোলে নি। বরঞ্চ কখনও কখনও আদরও করে। তার কথা শুনে মুখটা দুঃখী দুঃখী মানুষের মত হয়।

গুরুচরণের মোটা সোটা কালো শরীর, পুরু ঠোঁট, বড় চোখ, গোঁফ রাখে চওড়া, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, গলার স্বরও অত্যন্ত ভারী। ওর কাছে পানুর রোগা প্যাংলা ছোট্ট শরীরটা ইঁদুর ছানার মত মনে হয়। প্রথম প্রথম তো ভয় করত মানুষটাকে পানুর। এখন সুন্দর সয়ে গিয়েছে।

গুরুচরণ বলে, 'শেখ পেনো শেখ। সব কাজেই শেখার আছে বুঝলি! মাঝে মাঝে দেখি তুই কি ভাবিস, কাজে গোলমাল করিস্। গোল্লা চায়নি লোকটা দিলি নামিয়ে। আঁ।' ফিকফিক হাসে, 'আজ তো আবার চড়ই খেলি একটা লোকের কাছে। তোর দোষ নেই। তারিনী চিনি দেয়নি তুই কি করবি। এ সব সহ্য করতে হবে। খদ্দের লক্ষ্মী। কত মেজাজের মানুষ আছে, মানিয়ে নিয়ে পকেটে টান মারতে হবে সবার। হুঁ, তার নাম বাবা ব্যবসা! শিখে নে তারপর নিজেই একটা কেবিন খুলে বসবি।'

দোকানে লোক না থাকলে কত্তার প্রাণে স্ফূর্তি এলে পানুর সঙ্গে গল্পও করে। তবে সে আর কতটুকু সময়। স্টেশনের ধারে এই কেবিন। ভিড় লেগেই আছে। চায়ের খদ্দেরই বেশী। বিকেলের দিকে ঘুগনি, আলুর দম। তবু ফাঁকফোঁকড় আছে বৈকি! কিন্তু গল্প আর কি! সেই তো পুরোন কথা। পানু কতবারই তো শোনাল। তবে বলতে ভারী ভাল লাগে তার। শিরশির করে শরীর। বলতে বলতে সে যেন সেই গাঁয়ে চলে যায়। মাটির ঘর মাটির দাওয়া সামনে উঠোন, আবার ঘাষের ঝোঁপ, পুকুর ডোবার মধ্যে সে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। লালপেড়ে ময়লা শাড়ীপরা মাকেও সে দেখতে পায়। হাতে কাঁচের চুড়ি, মাথার চুল এলো। লোকের বাড়ী ধান ভেনে মুড়ি ভেজে দিয়ে আসা ক্লান্ত অবসন্ন মুখ। মায়ের গলাও তার কানে বাজে, পানু তুই বড় হলে আমার দুঃখু ঘুচবে বাবা। তখন বড় হবার জন্যে পানুর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফেটে পড়তে চাইত তীব্র আকুলতায়। কিন্তু কপাল, মা থাকল না। একদিনের অসুখেই মারা পড়ল। আর বাবা! না, বাবাকে দেখেনি পানু। কাজের জন্যে নাকি কলকাতা গিয়েছিল বাবা। আর ফেরেনি। লোকে নানা কথা বলত। কেউ বলত, গাড়ীচাপা পড়ে মরেছে! কেউ বলত, বিয়ে করে নতুন সংসার করেছে। মায়ের কিন্তু বিশ্বাস ছিল না ওসব। বলত, জানিস পানু তোর বাবাকে কেউ নিশ্চয় ধরে রেখেছে। ছাড়া পেলেই পালিয়ে আসবে। কখনও বলত, টাকার লোভ তো খুব খারাপ, জানিস পানু, তোর বাবা টাকার লোভে পড়েছে। রোজগার করছে, জমাচ্ছে। একসঙ্গে এক কাঁড়ি টাকা এনে আমাকে অবাক করে দেবে। কিন্তু বাবা মা থাকতে এল না। তারপরও না। তখন মামার ঘরে গেল পানু। আর সেই মামাই এখানে দিয়ে গেল তাকে। এই গুরুচরণ কেবিনে।

এই তো তার গল্প। এর মধ্যে বাবাকে ঘিরে কল্পনাই বেশী।

গুরুচরণ শোনে। শুনে মন্তব্য করে, 'হু বাপ তোর বেঁচে আছে পেনো। আর মা তোর ঠিক কথা বলেছে, টাকা ভারী পাজী জিনিসরে। লোভে পড়েছ কি টুঁটি টিপে খতম করে দেবে। হেঁ হেঁ এই যে লোক দেখিস, কত যায় আর কত আসে, সব বেটাই খতম হয়ে আছে।'

গুরুচরণের কথার সঠিক অর্থ বোঝে না পানু। তবে এটুকু বোঝে বাবা তার বেঁচে আছেন। অনেক টাকা হয়েছে তার। রাত্রিবেলায় এই 'গুরুচরণ কেবিনে'র ঝাপ ফেলে ভেতরে টেবিলে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতে থাকতে সে ভাবে, কলকাতা বাবার কাছে একবার যাবে। আমি পানু বললে বাবা নিশ্চয়ই চিনতে পারবে—নিশ্চয়ই! তারপর কি আসতে দেবে বাবা! উ-হুঁ! তাই দেয়। ভাল জামা কাপড় কিনে দেবে। স্কুলে ভর্তি করে দেবে। রোজ স্কুল যাবে পানু। একদিনও কামাই করবে না। কত লেখা-পড়া শিখবে পানু, কত দেশে বেড়াতে যাবে, কত লোক তার সুনাম করবে। আহা, মা দেখতে পারে না।

'পেনো হাত ধুয়ে চা দে!' ঠোটে বিড়ি রেখে হাঁক পাড়ল গুরুচরণ, 'বলি খদ্দের আগে না কয়লা ভাঙা আগে! অঁা, এখনও খদ্দের দেখে উঠতে শিখলি না।'

হাত ধুতে ধুতে তারিণী অবশ্য চা দিল খদ্দেরকে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল পানু। বাস থেকে নেমে রিক্সায়

উঠছে একটা তার মতই ছেলে। চকচক করছে রঙীন জামা জুতো, সঙ্গে মাও! কি ফরসা রঙ। ওধারে ঝুনঝুনিওয়ালা এসেছে। প্যাঁক প্যাঁক করে একটা বাস হাঁক মারছে। রোদের কি তেজ। কে বলবে এখনও শীত যায়নি! সকালের ভিড়টা যেন এখন কমল। ট্রেনের সময় নয় কিনা।

'পেনো খদ্দের নেই, এ সময় বাজারটা তাহলে দিয়ে আয়।' নিচু হয়ে ক্যাশ বাক্সের ডালা খুলল গুরুচরণ।

ঠিক যেন এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। রোদে হাঁটতে হাঁটতে বটের শিতল ছায়ায় দাঁড়াতে বলার নিমন্ত্রণ। পানুর বুকের মধ্যে সুখের ঢেউ বয়ে গেল। বাজার যাওয়া তারপর পোঁছে দিয়ে আসা কত্তার ঘরে, এ সময়টাই কেবল তার ছুটি তার স্বাধীনতা। গুরুচরণ বড় বিশ্বাস করে তাকে। কার্তিক তারিণীকে বাজারে পাঠায় না।

তারিণী বলল, 'এখন এখান থেকে কোথায় যাবে, ময়দাটা মাখুক বরঞ্চ।'

গুরুচরণ ওকথার ধার দিয়ে গেল না। বলল, 'শোন আলু নিবি এক কেজি, একটা ফুলকপি, বেগুন, মূলো, চুনো মাছ আড়াইশ। হ্যাঁ, চটপট যাবি আসবি। ময়দা মাখতে হবে আবার।'

তারিণীর দিকে তাকাল পানু। রাগ হয়েছে। লোকটা রোগা, উঁচু দাঁত, তামাটে রঙ। তার পিছনে লাগবেই। সব সময়ই বিচ্ছিরি মুখে বসে থাকে। গুরুচরণ লোকটা ভাল বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগে কান পাতে না। তারিণীর রাগের কারণ আছে। ব্যাপারটা হল মালিকের অনুপস্থিতিতে তারিণী প্রস্তাব করেছিল খেয়ে নে পয়সাও কিছু সরা। লোকটা খাটিয়ে মারছে। কত আর দেয়। তার সঙ্গে যোগ করেছিল ফাঁক পেলেই সরাবি। আর আমাকে সরাতে দেখলে কিছু বলবি না। কিন্তু পানু রাজী হয়নি। বলেছে, তুমি যা খুসী কর, আমি চুরি করতে পারব না। ব্যস্ সেই থেকে রাগ ওর। সে চুরিতে সম্মত না হলে তারিণীর চুরি করা তো চলে না। কার্তিক অবশ্য তারিণীদার দলে। সরাচ্ছে দু'জন মিলে। কিন্তু ওদের সঙ্গী সে নয় বলে পুকুর চুরি করতে পারে না। ঠাট্টা করে তারিণী। মালিক না থাকলে কার্তিককে বলে, 'সাধুবাবা আছে, খুব সাবধান।'

'গুরুচরণ লোকটা চালাক। কিছুটা আঁচ পায়। আড়ালে তাকে জিজ্ঞাসাও করেছিল, হ্যাঁরে তারিণী আমি না থাকলে পয়সা মারে না?'

'আমি তো জানি না!' পানুর বুক ভয়ে গুর গুর করেছে।

'তোকে ভাগ দেয়?'

'না।' পানু বলেছে, 'ভাগ দেবে কেন?'

'হুঁ।' মাথা ঝাঁকিয়ে গুরুচরণ বলেছে, 'তুই অবশ্য মিথ্যেবাদী নস, কিন্তু তারিণীটা চোর, নজরে রাখিস।'

তা দোকান আর কতটুকু সময় ছাড়ে কত্তা। বাইরের কাজ তো তাকে দিয়েই করায়।

পানু গায়ে রঙচটা ছিটের জামা চড়িয়ে পকেটে তিনটে টাকা আর ব্যাগ ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

গুরুচরণ বলল, 'দেখো, আবার কোথাও যেন আড্ডা দিও না!'

স্টেশনের চত্তরটা ছাড়িয়ে গোটাকয়েক বাড়ী, থানার কম্পাউণ্ড, হাইস্কুলের নিচু পাঁচিল পেরিয়ে পিচঢালা পথ ক্ষুদে মফঃস্বল সহরের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশেই বাজার। বাজারটা দ্রুত সেরে বাঁ হাতি পথ ধরবে পানু। তারপর সাদা দোতালা বাড়ীটার সামনে দাঁড়াতে হবে। উহুঁ হাঁক পাড়তে হবে না। কিংবা গেটটা পার হয়ে এক চিলতে ফুলের বাগান পেরিয়ে সবুজ দরজা কি জানলায় খুটখাট শব্দ করতে হবে না। হয়ত উদগ্রীব চোখ মেলে একটু ঘুরঘুর করতে হবে তাকে। নাও হতে পারে। জানলার কালো রঙের ফাঁকে মুখ রেখে নোটন হয়ত অপেক্ষা করে আছে তারই।

নোটনের ভাল নাম অমিতাভ। আলুর দম খেতে আসে কেবিনে। সেই থেকে আলাপ। রাস্তায় নিজে ডেকে কথা বলেছে। তারই বয়সী। ভারী ভাল ছেলে। ক্লাশ ফোরে পড়ে। বাজার থেকে ফেরার পথে রোজই দেখা হয়। সামান্যক্ষণের দেখা, তাতেই কথা হয়। পানুর দুঃখের কথা শুনে চোখ ছলছল করে নোটনের। ওই বলেছে 'তা বাবা যখন কলকাতাতে থাকে, তখন চিঠি দাও একটা।'

ভেবে রেখেছে পানু বাবাকে একটা চিঠি দেবে সে।

নোটন খুব ভালবাসে তাকে, সেদিন সন্দেশ দিয়েছিল। চকলেট বিস্কুট প্রায়ই দেয়। আর সে তারিনীদার জন্যে আলুর দমের এক চাঁক আলুও বেশী দিতে পারে না। তবে কাঁই একটু বেশী দেয়।

নোটনকে দেখে পানুর লেখাপড়া শিখতে সাধ হয়। অ আ ক খ অবশ্য জানে। কিন্তু স্কুলে যাওয়া হয়নি। আহা লেখাপড়া শিখলে কত বড় হয়ে যেত। কাপ ডিস

ধোয়া, তারিণীর দাঁত খিচুনি, মিষ্টিকথাতে কত্তার রক্ত বের করে খাটান থেকে সে মুক্তি পেত।

নোটন ক্ষুদে পাঁচিল ছোট্ট গেটটায় চেপে এপাশ ওপাশ করছিল। ধবধবে সাদা প্যাণ্ট, ঘন নীল কলার ওয়ালা গেঞ্জি, গোলগাল মুখ, কোঁকড়ান চুল। ফরসা নয় শ্যামলা মুখ। টানা বড় চোখ। পানুকে দেখে ছুটে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। প্যাঁক প্যাঁক শব্দ তুলে একটা রিক্সা ছুটে গেল। পিচ নয় সিমেণ্ট বাঁধাই রাস্তা এটা। দু'ধারে নর্দমা, নতুন নতুন রঙের বাড়ী। ভিড় নেই রাস্তায়। ওধারে মাঠে লম্বা দড়ি বাঁধা একটা গরু চরছে।

পানু বলল, 'স্কুলে যাবে না?'

'যাব। এখনও দেরী আছে। এই তো মাস্টারমশাই পড়িয়ে গেলেন। তুমি কিন্তু আজ সকাল সকাল এসেছ।'

'হুঁ। পানু বলল, 'আজ খুব কাজ। কার্তিক নেই কি না।'

'আমার কাজ করতে খুব ভাল লাগে! কার্তিকের জায়গায় আমাকে নিলে খুব মজা হত।'

পানু বলতে যাচ্ছিল, কাজ করার কষ্ট তো জান না, তাই ওরকম কথা বলছ। কিন্তু বলল না। বলল, 'বারে তোমার বাড়ীর লোক রাজী হবে কেন?'

ম্লান হল নোটন। বলল, 'সে জানি।'

'নোটন আমি বাবাকে চিঠি দেব!' একটুক্ষণ চুপ থাকার পর পানু বলল।

'ঠিক আছে, দাও না। পোস্টকার্ড দেব। লিখেও দেব এখন।

দু'জনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চিঠি লেখার পরিকল্পনাও করে ফেলল। পোস্টকার্ডে লেখা হবে, 'বাবা আমার খুব কষ্ট। দোকানে কাজ করি। আমাকে নিয়ে যাও। ইতি পানু।' আর ঠিকানার জায়গা, হুঁ সেখানে লেখা হবে কমল সাহা, কলকাতা, পানুর বাবা। ব্যস্ তারপর বাবা এসে নিয়ে যাবে।

পরিকল্পনা হলেও চিঠি লিখে পাঠাতে দু'দিন আরও লেগে গেল। মোটা মোটা অক্ষরে পোস্টকার্ড ভর্তি করে নোটন লিখে রেখেছিল। লেটার বাক্সে ফেলে এল অবশ্য দু'জনে।

পানুর তারপর কি সুখ কি আনন্দ! শিরশির করতে থাকল শরীর। চিঠি পেয়ে বাবা আসবে। তাকে নিয়ে যাবে। হুঁ, ট্রেন এলেই তাকে নজরে রাখতে হবে। দোকানে এসে জিজ্ঞাসা করলে বলতে হবে, আমিই পানু বাবা।

শীতে এখন বেড়েছে। রাত্রিতে কনকনে হাওয়া দোকানের ফাঁকফোঁকর দিয়ে লম্বা লম্বা জিভে যেন কাঁথায় জড়ান শরীরটাকে তার চাটে। একদিন আবার বৃষ্টি হয়ে গেল। মেঘ জমে থাকল তার পরের দিনও। শীতের প্রচণ্ডতা বাড়ল। কিন্তু টেবিলের উপর কুঁকড়ে শুয়ে থাকা পানুর কষ্টবোধ তীব্র হল না এতে। যেন গরম গরম বাতাস তার উপর বুলিয়ে দেয় কেউ। ভাবতে ভাবতে পানু ভেসে বেড়ায় বাবার হাত ধরে এখানে সেখানে কলকাতা সহরের পথে পথে। ঘুম আচমকা ভেঙ্গে গেলে মনে হয় কেউ খুটখাট করল নাকি? ডাকল নাকি পানু আমি এসেছি, আয় বাবা বলে?

কার্তিক কাজে যোগ দিয়েছে। তার কাছে বলেই ফেলল পানু, 'জানিস আমি আর ক'দিন, বাবা এসে আমাকে নিয়ে যাবে।'

গুরুচরণের কানে যেতে সে অবাক। পানুর মামার কাছে তো তার সব শোনা আছে। ঠোঁটে বিড়ি রেখে অবাক করা গলায় বলল, 'তাই নাকি? তা বাবা তোর এসেছিল নাকি এখানে?

'না। আমি চিঠি দিয়েছি। আসবে।' পানু সলজ্জ-ভঙ্গীতে বলল।

'ঠিকানা জানিস?' গুরুচরণ মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল।

'বাবা তো কলকাতায় থাকে। কলকাতা লিখে চিঠি দিয়েছি।'

নিশ্চিন্তের হাসি ফুটে উঠল গুরুচরণের মুখে। যাক, ও ঠিকানা জানে না। কলকাতা যেন একটা গাঁ। তারপর ভাবল, আহা বেচারা। আর ভাঙ্গল না। বলল, 'ভাল। ভাল। কলকাতা গিয়ে যেন আমাদের ভুলে যাস না।'

কটা দিন কেটে গেল। ট্রেন থামলে অপেক্ষা, উৎসুক চোখে এই মানুষের মিছিলে বাবার মুখ খোঁজার একটানা পরিশ্রম তাকে হতাশ করে ফেলল। তারপরে মনে হল, বাবা কি এসে ফিরে গেল নাকি?

নোটন বলল 'না। না। ফিরে যাবে কেন? বাবা তার ছেলেকে কি চিনতে পারে না?'

'মানে আমি তো তখন খুব ছোট ছিলাম। আমার তো বাবাকে আবছা করে মনে আছে।'

'বাবার কিন্তু তোমাকে খুব ভাল করে মনে আছে। বাবারা কক্ষণো ভুলে যায় না ছেলেকে।'

'তাহলে আসছে না কেন ?'

'আসবে। চিঠিটা যাক আগে! দেরীও তো হয় চিঠি যেতে। মাসীমার চিঠি কলকাতা থেকে এসেছিল এক মাস পর। আবার কখনও তিনদিনেও আসে। ধর চিঠিটা ব্যাগের কোণাতে আটকে থাকল। ঝাড়ার পরও পড়ল না।' নোটন বড় বড় চোখ করে বলল 'হতেও তো পারে এমন!'

পানুর মুখে চোখে একটা বেদনার রেখা ফুটে উঠল, 'আহা ঝাড়ার পর হাত তো ভরতে হয়। আমি কিন্তু ব্যাগে হাত ভরে চিঠিটা ঠিক বের করতাম।'

'তুমি তো আর পিয়ন নও।'

পানু ভাবল আহা আমি যদি পিয়ন হতাম। বাবার কাছে কত তাড়াতাড়িই না চিঠিটা পৌঁছে দিতাম।

সেদিন নোটনের সঙ্গে রাস্তায় কথা বলছে পানু এমন সময় নোটনদের ঘরের জানলায় চশমা পরা একটা মুখ, ডাক পড়ল, নোটন। নোটন।

ঘাড় ঘুরিয়ে নোটন দেখে নিয়ে বলল, 'আমার মেসোমশাই। কলকাতাতে থাকে!' তারপর ছুটে গেল, সামনে কি যেন বলল ফরসা গোলগাল মুখ, বড় টাকওয়ালা মানুষটার কাছে। তারপর হাসি মুখে ফিরে এল, 'এস পানু।'

এই প্রথম নোটনদের বাড়ীতে ডাক তার। কিন্তু মানুষটা কে? বুক গুর গুর করতে থাকল পানুর। নোটনের সঙ্গে গল্প করার জন্যে ধমকে দেবে? বলবে নাকি কোনদিন এ বাড়ীর সামনে যেন না দেখি!

'উনি কে নোটন?'

'আমার মেসোমশাই। কলকাতায় থাকেন।'

কলকাতার মানুষ শুনে পানু ড্যাবড্যাবে চোখে দেখল, দরজা খুলে বাইরে এসেছেন মানুষটা। ভাবল, বাবার খবর কি জানেন নোটনের মেসোমশাই।

দরজার সামনে অর্ধবৃত্তাকার গায় খয়েরী সিমেণ্ট করা এক চিলতে দাওয়া। ওর উপর দাঁড়িয়ে পড়লেন নোটনের মেসোমশাই। পাজামা, খালি গায়ে হাওয়াই সার্ট, ধবধবে মোটাসোটা শরীর। সার্টের পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বের করে ধরালেন। সামনে তারা যেতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম তোমার?'

'পানু!'

'নোটনের ক্লাসে পড় তুমি?'

'না।'

নোটন বলল 'মেশোমশাই স্টেশনের কাছে পানু একটা দোকানে কাজ করে। খুব ভাল ছেলে। ওর বাবা কলকাতায় চলে গিয়েছে। মাও নেই। ওর বাবাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।'

'কলকাতায় কোথায় থাকে ওর বাবা? ঠিকানা কি?'

পানু ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকাল।

'তাহলে চিঠি লিখেছ কি করে?'

'কেন, কলকাতা, কমল সাহা, পানুর বাবা লিখে দিয়েছি। আমিই তো লিখেছি।' নোটন বলল। হা হা করে হাসলেন নোটনের মেসোমশাই। শরীরটা দোলা খেল কিছুক্ষণ। বললেন, বেচারা।

ওরা দু'বন্ধু অবাক।

মেসোমশাই সিগারেট টানতে টানতে কি যেন ভাবলেন। ভ্রূ উঠে থাকল উপরে। এক গাল ধোঁয়া ছাড়ার পর বললেন, 'আচ্ছা পানু তুমি কলকাতা যাবে?'

পানু অবাক হঠাৎ আমন্ত্রণে। হুঁ পর্যন্ত বলতে পারল না বেচারা!

মেসোমশাই বললেন, 'আমাদের বাড়ীতে কাজ করবে। তারপর তোমার বাবার যদি সন্ধান পাওয়া যায় তখন বাবার কাছে চলে যাবে। তবে হ্যাঁ, বিরাট সহর। খুব সাবধানে থাকতে হবে।'

'চলে যা পানু, চলে যা।' নোটন বলল, 'মেসোমশাই খুব ভাল। দোকানে তো খুব খাটনি হয়।'

'আমার ওখানে বেশী খাটতে হবে না। তোমাকে দেখে ভাল লাগল বলে বলছি।'

কাজ করার জন্যে নয় কলকাতা একটা মানুষকে আশ্রয় করে যাওয়ার আনন্দই ডুবিয়ে দিল পানুকে। বুক যেন ফেটে পড়তে লাগল উল্লাসে। বলল, 'আমি যাব।'

'তোমার দোকানদার যদি না যেতে দেয়।'

'কেন দেবে না! আমি বলব আমি কাজ করব না দোকানে।'

গুরুচরণের রাগ, তাকে ভয় দেখান, কলকাতাকে ঘিরে একটা আতঙ্ক তৈরীর চেষ্টা, বড়লোক মানুষ বলে সস্তায় তাকে চাকর করে নিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি বোঝান, কোনটাই কাজে লাগল না। ওই কলকাতাতে পানুর বাবা আছে না! এই সুযোগ সে ছাড়ে! তারপর নোটনের মেসোমশাই কত ভাল মানুষ।

শুধু ট্রেনে চড়ার পর নোটনের মেশোমশাই মাসীমা আর ছোট্ট মেয়ে দীপার পাশে বসে যখন হু হু করে তার

ট্রেন চলতে থাকল একটার পর একটা স্টেশন ছেড়ে, কত মানুষ উঠল, নামল, কত হকার জানলায় হাঁক পেড়ে গেল পান বিড়ি সিগারেট, ভেতরে বিক্রী হতে থাকল কমলালেবু কলা থেকে তালা সেপটিপিন চিরুনি, মানুষের মুখ আর মুখ বিব্রত করে তুলল, দু'পাশে মাঠঘাট নদী গাছ গাছালি গ্রাম সহর পিছনে সরে যেতে থাকল, তখন পানুর মনে হল বাবা যদি গুরুচরণ কেবিনে আসে তাকে দেখতে পাবে না! আবার ফিরে যাবে। কলকাতা গিয়ে সে ভুল করছে নাকি? কিন্তু আর তো কোন উপায় নেই। ফেরা যায় না। একটা সান্ত্বনা অবশ্য তাকে এই যাত্রায় দুঃখ দিল না, তা হল বাবা তো ওখানেই ফিরে যাবেন, একদিন দেখা হবেই।

নোটনের মেসোমশাইয়ের নাম অনন্ত চ্যাটার্জী। তিনকামরার এক ফ্ল্যাটে থাকেন। চাকরী করেন একটা ওষুধ কোম্পানীতে। বেশ বড়সড় চাকরী। বাড়ীতে মানুষ বলতে বৃদ্ধ বাবা, দু'ভাই, মেয়ে দীপা আর নোটনের মাসীমা। ভাইদের একজন, যার নাম অনঙ্গ সে কলেজে পড়ে। আর একজন স্কুলে পড়ে নাম অর্ণব। ফ্ল্যাট-বাড়ীটার দোতালায় পাশাপাশি কামরাগুলো। একধারে রান্নাঘর, বাথরুম। একজন ঝি আছে। বাসন মেজে ঘর ধুয়ে সে চলে যায়। রান্না করে নোটনের মাসীমা।

পানুর প্রথম কাজ হল মাসীমার সাহায্য করা, অনঙ্গর সঙ্গে গিয়ে বাজার থেকে থলে বয়ে নিয়ে আসা আর দীপার সঙ্গে খেলা করা। গুরুচরণ কেবিনের মত খাটনি নেই। বরঞ্চ সারাদিনই আরাম করে বসে থাকা।

অঢেল সময়ে তাই পানুর ভাবনাকে ছেয়ে থাকে তার বাবা।

সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ী ছোটে এধার থেকে ওধার, কত মানুষ যায় আসে, পানু অবাক চোখে দেখে। দেখে বাড়ীর উপর বাড়ী, বাড়ীর পর বাড়ী। সব মেশামেশি হয়ে আছে। কত রঙ, কত রকমের জানলা কত অদ্ভুত গড়ন। তারপর রাস্তা। যেন জটপাকান একরাশ সুতো। এদিক সেদিক চারদিকেই খেই। পানুর মনে হয় কলকাতার সীমানা নেই। সাহস হয় না তাই একা বেরুতে। রাত্রিতে চারিদিকে আলো জ্বলে, তখন মনে হয় সেই মফঃস্বল সহরের কালীপূজোর রাতের কথা। সারাদিনে অজস্র শব্দ গাড়ীর মানুষের সহর কলকাতার দিকে দিকে বিস্ফোরণের, রাত্রিতে কেমন যেন শুদ্ধ হয়ে যায়। আচমকা একটি গাড়ীর হয়ত শব্দ বাজে। আর সে শুনতে পায় অনেকদূর ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ। কতদূরে রেললাইন স্টেশন পানু জানে না। শুধু ভাবে বাবার কথা। এ সহরেই তো বাবা আছেন, কিন্তু কোথায়!

অনন্তবাবুর বৃদ্ধ বাবা মানুষটি ভারী সুন্দর। টকটকে ফরসা রঙ। মাথার চুল পাকা। গায়ের মাংসপেশী ঝুলে পড়ছে। দাঁত নেই লাঠি হাতে হাঁটেন। রোজ সকাল বিকেল কাছের পার্কে বেড়াতে যান।

'কি নাম তোমার?' পানুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

'পানু!'

'পানু নয় প্রাণগোপাল নাম তোমার।' শ্লেষ্মাজড়ান গলা কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে বলেছেন, 'প্রাণ মানে কি জান তো?'

'উঁহুঁ। পানু ঘাড় নেড়েছে।'

'তাহলে জানটা কি? আঁ! শুনে রাখ প্রাণ মানে জীবন। নাও দশবার বলে মুখস্ত কর।'

শুধু ওই নয় 'অশ্ব' মানে 'ঘোড়া' আর 'হয়' মানেও 'ঘোড়া', 'বারি' মানে 'জল', 'তরী' মানে 'নৌকা', 'সরণী' মানে পথ ইত্যাদি অজস্র শব্দের অর্থ ওই রকম দশবার আওড়ায়। শুধু আওড়ান নয় পরে আবার সময় বুঝে প্রশ্নও করেন।

'বল দেখি প্রাণগোপাল 'সবিতা' মানে কি?'

'পদ্য।'

হায় হায় করে ওঠেন বৃদ্ধ মানুষটি, 'আঁ সব গণ্ডগোল করে ফেললি? ওরে 'কবিতা মানে পদ্য। আর সবিতা হল সূর্য। ডোবালি ডোবালি আমাকে। গবেট একটা তুই। মাথাতে কিছু নেই।

আবার কখনও জিজ্ঞাসা করে দেখেন, 'বল দেখিনি প্রাণগোপাল অরণ্য মানে কি?'

'বন।'

'সাবাস! আমি জানি যে তুই ভারী ইন্টেলিজেন্ট। বাঃ বাঃ। আচ্ছা 'বারী' মানে কি?'

'হাতী।'

'ইয়া।' বুড়ো মানুষটা লাফিয়ে ওঠেন, 'কাজ হচ্ছে! কাজ হচ্ছে! আসলে কি জানিস শেখানর কায়দা। আর ওই যে গোপীনাথ মাস্টার, রিটায়ার করে ইস্তক আমার কাছে বসে, বলে কিনা, মশাই, বুঝবেন কি, চিরকাল তো ফাইল আর নোট করে কাটিয়েছেন, ছেলেদেরকে শেখান অতি কঠিন কাজ। চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমার। কত ছেলেকে শেখালাম রক্তক্ষয়

করে। হুঁ কঠিন কাজ না ছাই। এই তো তোকে শেখাচ্ছি। বই নেই, শ্লেট নেই অর্থ শব্দের অর্থ শিখছিস্। নিয়ে গিয়ে তোকে দাঁড় করাব একবার ওর কাছে।'

অনঙ্গ কম কথা বলে। প্যান্ট সার্টে সব সময় বাবু। বাজারে গিয়েও পাঁচবার মাথার চুল ঠিক করতে চিরুনি বুলায়। গায়ের জামা প্যান্ট টকটকে রঙের সবসময়। বাজারে গেলেও সারা রাস্তা নীরব থাকে। পানুর সম্পর্কে কিছু জানতে মোটেই আগ্রহ নেই। পানুকে বলেছে, 'বুঝলি পানু, বৌদি যদি কোন জিনিষের দাম জিজ্ঞাসা করে বলবি জানি না।'

'কেন?'

'কেন আবার কি? আঁ! বলবি জানি না। ব্যস।'

পানু আর কথা বলে নি। তবে বুঝেছে বৈ কি অনঙ্গবাবু বাজার থেকে পয়সা সরান। ধরা যাতে না পড়েন তাই ঘাট বাঁধা।

দীপা ভারী ভাল মেয়ে। এই সবে প্রথম ভাগ পড়ছে। তাকে দাদা বলে। সব জিনিষের ভাগ দেয়। মাকে বলে, 'ও মা পানুদাকে কেন বিস্কুট দাও না চায়ের সঙ্গে।'

অনন্তবাবু কম কথা বলেন। একদিন কেবল বলেছেন, কি পানু ভাল লাগছে তো?'

'হ্যাঁ।' পানু ঘাড় কাৎ করেছে।

নোটনের মামীমা বড় বেশী কথা বলেন। বাবা তার কলকাতাতে আছে অথচ পানু বাবার দেখা পাচ্ছে না শুনে কত দুঃখ। তার গাঁয়ের কথা, মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন।

অর্ণব একটু অন্য ধরনের ছেলে। রোগা ছিপছিপে চেহারা, তীক্ষ্ণ চোখ। বাড়ীতে ওর বড়দাকে অসম্ভব ভয় করে। সব সময় ছেলের খেলাতে মন, বড়দার বকুনি থেকেই একদিন জেনেছে পানু। স্কুল থেকে ফিরে চা জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যায়। প্রায়ই বন্ধুরা আসে। একদিন ওর একবন্ধু পানুকে দেখিয়ে কে জিজ্ঞাসা করাতে অর্ণব বলেছিল, আমাদের চাকর। পানুর খুব কষ্ট হয়েছিল।

অর্ণব পানুর সব পরিচয়ই জেনে নিয়েছে। তবে কোন কৌতূহল নেই। বরং নিজের সম্পর্কে জানাতেই সে ব্যস্ত। চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হাত নেড়ে গলগল করে কথা বলে। বোধকরি বড়দা প্রায়ই তাকে বকেনি, বাইরের ছেলে এই পানুর কাছে, চোখ বুঁজে তো শুনতে হয়; কিন্তু একলা পেলে পানুকে তার সম্মান তো ঠিকঠাক রাখতে হবে, তাই কথা বলে যেন সম্মান ফেরানর চেষ্টা করে!

'জানিস পানু দাদা তো খেলার কিছু বোঝে না। হুঁ যদি দেখত না আমার একদিন খেলা, তাহলে বুঝত। বলত, যা অনু বই রেখে মাঠে যা। আরে বাবা ভাল প্লেয়ারের কি কম দাম নাকি? চল না একদিন আমাদের ফুটবল খেলা দেখে আসবি।'

পানু বলেছে, 'যাব।'

'তবে লুকিয়ে যেতে হবে। দাদা টের পেলেই এক চোট নেবে আমাকে। বলবে, তোকে নষ্ট করছি।'

'তাহলে গিয়ে কাজ নেই।'

'ফুঃ এই তোর সাহস! গর্ত খুঁড়ে ঢুকে থাক দাদার ভয়ে, বুঝলি।' অর্ণব ছিঃ ছিঃ করেছে। মুখ বেঁকিয়ে বলেছে, 'আমি ভয় করি না। দোষ করলে ভয় করতাম! এটা কি দোষ? কিরে?

পানু না বুঝেই বলেছে, 'না দোষ নেই।'

'এই তো বাবা সব বুঝিস্। খুশী হয়ে অর্ণব বলেছে, 'জানিস আর একটু বড় হলে আমি আউট।'

,মানে!' সরল চোখে পানু জিজ্ঞাসা করেছে।

,পালাব। বোঝ না, দাদার বকুনি তো চিরকাল সহ্য করতে পারি না। শুধু পড় আর পড়। তবু যদি ফেল করতাম। আরে বাবা পাস তো করি!'

'তুমি ফেল কর না কোনদিন?'

'কক্ষনো না। তবে টায়েটুয়ে পাস করি। কিন্তু খেলাতে!'

'আমার খুব পড়তে ইচ্ছে করে!'

করবেই তো। যেন অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি অর্ণব, নিতান্ত বালক নয় এমন ঢঙে বলেছে, 'আমার ইচ্ছে করে না তোর করে। পড়লে অবশ্য তোরও করত না, বুঝলি!'

অর্ণবকে ঘিরে পানুর মনে একটা সম্মানের ছায়া পড়ছিল। দাদা না থাকলে ওর বেপরোয়া ভঙ্গী, হাত নেড়ে চমৎকার কথা বলার দক্ষতা, এই বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়ে বিরাট পরিকল্পনা, বিখ্যাত খেলোয়াড় হওয়ার আকাঙ্খা, কলকাতা সহরের খুঁটিনাটি তথ্য, সিনেমায় আডভেঞ্চার বই দেখার পর নিজের জীবনে তার প্রয়োগ করার স্বপ্ন—কানুর শুনতে শুনতে মনে হত, সে বিরাট একজনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে খুঁজে পাওয়ার

জন্যে যে এরই সাহায্য দরকার, তা'ও যেন বুঝেছিল। আর বলতে তো অর্ণব এককথাতেই রাজী, নিশ্চয়ই খুঁজে দেব তোর বাবাকে। শুনেই কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়েছে। এই কথাটা তো জীবনে সে কারও কাছেও শোনেনি।

কিন্তু কানু জানত না এই অর্ণবই তার সামনে কি ভয়ঙ্করভাবেই না দাঁড়াবে খুব শীঘ্রি, যার ফলে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে অনির্দেশের পথে।

নোটনের মাসীর বাড়ীতে পানুর জীবন একভাবেই বোধ হয় কেটে যেত। কিন্তু বিধাতা পুরুষ ভারী মজাদার মানুষ। জীবন স্রোত নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি তার হাতে। স্রোতের গতিমুখ কোন দিকে যে কখন ঘোরান তা মানুষ টের পায় না। ভাগ্যের খেলা বলে সান্ত্বনা কিংবা সুখ খুঁজে নেয়।

একদিন অর্ণবের জামা থেকে একটা সিগারেট বেরুল। নোটনের মাসীমা সিগারেট নিয়ে একেবারে জামা সমেত মেসোমশাইয়ের কাছে। তারপর ঘরে তুলকালাম কাণ্ড। মেশোমশাইয়ের ফরশা মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। ঘরে পায়চারি করে বেড়াতে থাকলেন তিনি। অর্ণব ঘরে নেই। তারই ফেরার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকল সকলে।

পানুর তো শুনে বুক গুর গুর করতে লাগল। ও ফিরলে না জানি কি কাণ্ড হবে। পানুর মনে হতে থাকল যেন অপরাধী সে। আসলে তার বাবাকে খুঁজে দেবে বলেই না ওর ভাবনা। যদি ওর বড়দা মারে আর ঘর থেকে বেড়িয়ে যায় ও, তখন কে খুঁজে দেবে তার বাবাকে ?

নিচে নেমে ফ্লাটবাড়ীটার দরজার সামনে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অর্ণবের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল পানু। এলেই খবরটা দেবে। হুঁ আগে থেকে খবর পেলে অন্ততঃ প্রস্তুত হতে পারবে! কিন্তু সে জানত না এই আগে সংবাদটা জানাবার বোকামি তারই বিপদ ডেকে আনবে। জড়িয়ে পড়তে হবে তাকে।

অর্ণব ফিরতেই গলগল করে বলে ফেলল কানু।

প্যান্টের পকেটে হাত রেখে অর্ণব মুহূর্তকাল ভাবল। ঘাড় উঁচু করে একবার দেখে নিল উপরে কেউ উঁকি মারছে কি না তারপর বলল, 'এর জন্যে ভাবনা কি। তুই তো আছিস।'

ফ্যালফ্যাল চোখে তাকাল পানু। বোধগম্য হল না তার কথাটা।

অর্ণব মাথা নাড়াল। একটি উপায় আবিষ্কারের চমৎকার বুদ্ধি ঘুরপাক খেয়ে তার মাথাটা ঝাকাচ্ছে। পানুর চোখে চোখ রেখে বলল, 'হুঁ, তুই বলবি তোর সিগারেট। আমার পকেটে রেখেছিলিস্। মাঝে মাঝে খাস। নেশা ছিল আগে। এখানে এসে কেটেছে। দাদা তোকে কিছু বলবে না। দোকানে কাজ করতিস তুই। সেখানেই অভ্যেস হয়েছিল।'

'বারে আমি তো খাই না।'

'আহা বলতে কি দোষ! তোকে আমি চকলেট খাওয়াব এখন। চল। চল। এ ছাড়া আর পথ নেই। হুঁ বাবা কেমন বুদ্ধি বের করলাম বল দেখি। নিজের আচমকা মাথায় আসা প্ল্যানে মুখে খুশীর তরঙ্গ উঠল। তারপর পানুর দিকে তাকিয়ে কি যেন মনে হতে বলল, 'কি রে ডোবাবি নাতো। পিঠ চাপড়ে বলল, 'না ডোবাবি না। তোমাকে ম্যাটিনিতে একদিন একটিপ সিনেমা দেখাব।'

পানু শব্দ করল না। তাকে প্রায় টেনেই উপরে তুলল অর্ণব। তারপর ভাল ছেলের মত ঘরে ঢুকল।

কিন্তু ফ্যাসাদে ফেলল তাকে পানু। মিথ্যে সাজান কথা সে বলল না। অর্ণব যখন, 'সে সিগারেট খায়, নিজের চোখে দেখেছে, তার পকেটে রাখার কাজটা ওর' বলে পানুর দিকে আঙুল দেখিয়ে ভাল ছেলের মত, বলে বসল, 'স্বীকার করে নে না পানু, দোকানে কাজ করতিস, ওখানে অভ্যেস হয়েছে, লজ্জা কি, বড়দা তোকে মারবেন না', তখন ড্যাব ড্যাবে চোখে পানু তাকাল কেবল। হ্যাঁ বেরুল না মুখ দিয়ে।

'কি পানু, তুই সিগারেট খাস ?'

'না।'

'সিগারেট তুই রেখেছিলিস ?'

'না।'

'মিথ্যে কথা বলছিস ?'

'না।' পানু মাথা নাড়ল।

পরবর্ত্তী ঘটনা অর্ণবের পিঠে বেতের বাড়ি, চাকাচাকা দাগ, আর্তনাদ, চড়চাপড় তার সঙ্গে ভর্ৎসনা। মেরেই বোধহয় ফেলতেন অর্ণবের বড়দা। রাগে তিনি তো মানুষ ছিলেন না। বাঁচাল ওর বৌদি।

না, পানু এরকম চায় নি। তারও ভারী কষ্ট হল। কিন্তু কি করে দেখাবে পানু তার কষ্টটা।

এই ঘটনার পর মানুষখেকো বাঘের চেয়েও হিংস্র হয়ে উঠল অর্ণব। জলন্ত চোখে সে পানুকে যেন গিলে ফেলতে

[শেষাংশ ২৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

রক্ত-প্রবাল

সম্পূর্ণ উপন্যাস

সঙ্কর্ষণ রায়

॥ এক ॥
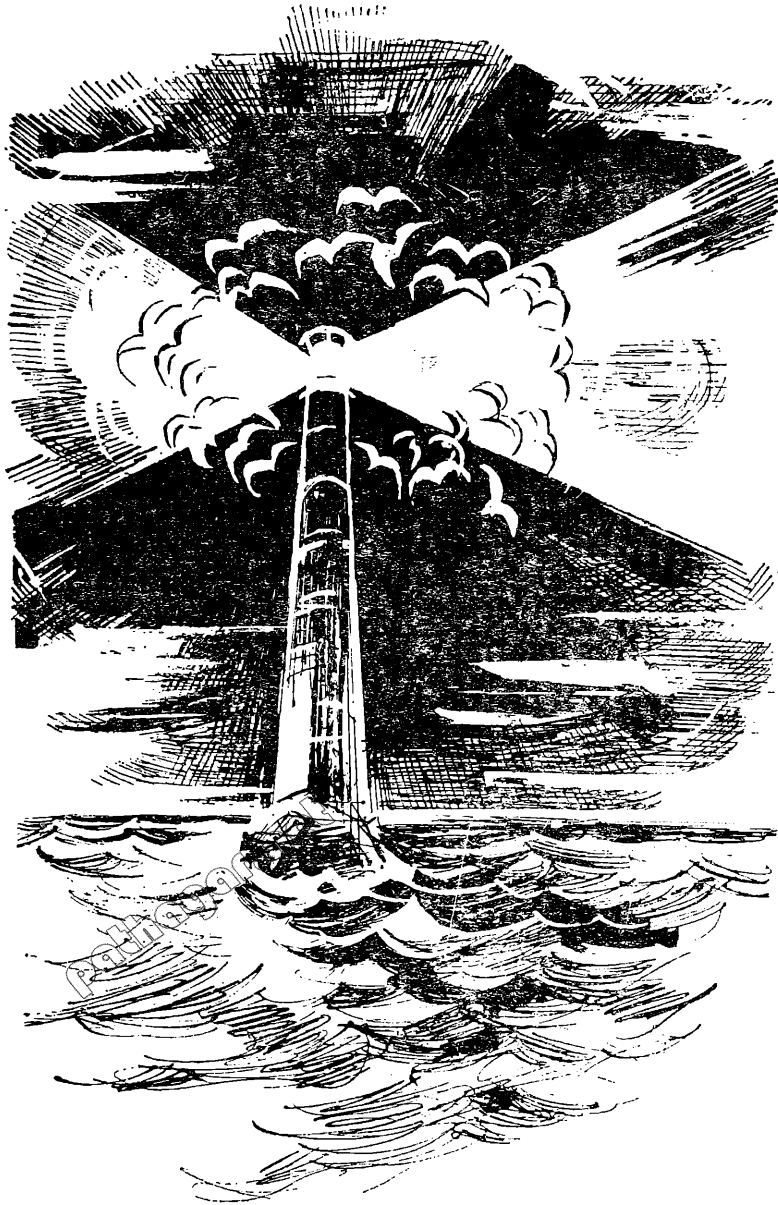
কোচিন হারবার স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়েছে রাত নটায়। ট্রেনের একটি চার বার্থের প্রথম শ্রেণীর কামরায় আছেন বিখ্যাত রসায়নবিদ কল্যাণ বসু, তাঁর স্ত্রী কাবেরী এবং ছেলেমেয়ে কুনাল ও করবীকে নিয়ে। কল্যাণের সহকারী সুবীর সিংহের আসন অন্য একটি কামরায় রিজার্ভ করা আছে। কিন্তু সে এখন এই কামরাতে বসে সুহেলি দ্বীপ থেকে কুনাল যে বাক্সটি এনেছে তা পরীক্ষা করছে।

সুহেলি দ্বীপ আরব সাগরের মধ্যে অবস্থিত লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের অন্যতম দ্বীপ। কেরালার উপকূল থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে রয়েছে এই প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ। সমুদ্রের কীট প্রবাল শ্রেণীবদ্ধ হয়ে প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টি করেছে। প্রবাল কীটের গায়ে থাকে চুনাপাথরের আবরণ। চুনাপাথর চূর্ণ হয়ে সাদা রঙের মাটির আবরণ রচনা করেছে দ্বীপের ওপরে।

কুনাল গিয়েছিল সুহেলি দ্বীপে। গিয়েছিল নটরাজন নামে একজন লোকের সঙ্গে। কোচিনের শঙ্কর-গৌরীর মন্দিরের মোহান্তকে হত্যা করে নটরাজন তাঁর কাছ থেকে চুরি করেছিল একটি প্রাচীন নকশা। নকশাটিতে গুপ্তধনের হদিস আছে। গুপ্তধন মানে শঙ্কর-গৌরী মন্দিরের অধিকাংশ সোনা, হীরা-জহরৎ। প্রায় তিন শো বছর আগে পর্তুগীজরা যখন কোচিনে হামলা করে, তখন এই সব সোনা ও হীরা-জহরৎ লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের কোন একটি দ্বীপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। নকশায় দেওয়া হদিস অনুযায়ী সুহেলি দ্বীপই হচ্ছে সেই দ্বীপ।

এই গুপ্তধনের কথা অবশ্য জানত না কুনাল। সে তার বাপ কল্যাণের সঙ্গে এসেছিল কোচিনে। কল্যাণ কলকাতা থেকে কোচিনে এসেছিলেন শঙ্কর-গৌরীর মন্দিরের মোহান্তর হত্যার তদন্ত করতে। কল্যাণকে এই খুনের তদন্ত বন্ধ করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনে প্ররোচিত করার জন্য নটরাজন কুনালকে ধরে নিয়ে যায়। তার একটি ছোট জাহাজ ছিল। সে জাহাজে এ্যাকুয়ারিয়াম দেখাবে বলে সে কুনালকে জাহাজে নিয়ে তোলে। তারপর জাহাজ ছেড়ে দেয়। জাহাজ ছাড়ার আগেই সে তার কাফ্রী সহকারী মারফত কল্যাণকে চিঠি পাঠায়। তাতে লেখা ছিল যে কল্যাণ তাঁর তদন্তের কাজ বন্ধ করে কলকাতা ফিরে গেলে পর কুনালকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই চিঠি পাওয়ার পর পুলিশ অফিসার মুর্গেশনের পরামর্শে কুনালু তার সহকারী সুবীরকে ডেকে পাঠালেন এবং নিজে কাবেরী ও করবীকে নিয়ে গেলেন কোচিনের কাছাকাছি জেলেদের একটি গ্রামে। সেখানে মৎস্য বিভাগের বিশ্রামগৃহে আশ্রয় নিলেন। কল্যাণ সপরিবারে কোচিন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মুর্গেশন রটিয়ে দিলেন যে কল্যাণ তদন্তের কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে গেছেন। ইতিমধ্যে সুবীর এসে তদন্তের কাজের দায়িত্ব নিল।

কল্যাণ তদন্তের কাজ বন্ধ করে কোচিন ছেড়েছেন এ খবর নটরাজনের কাছে পৌঁছালো কিনা জানা নেই। এ খবর পেয়ে থাকলেও সে কুনালকে ছেড়ে দেয় না। কারণ গুপ্তধনের সন্ধানে সে তখন কুনালের সাহায্য নিচ্ছে।

নকশায় দেওয়া হদিস মত সুহেলি দ্বীপে নটরাজন কুনালকে নিয়ে মাপজোঁক করে। মাপজোঁক করতে করতে যেখানে গুপ্তধন থাকার কথা, সে জায়গাটি খুঁজে পায় তারা। তারপর সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করতে করতে মাটির কয়েক ফুট নীচে একটি গহ্বরের সন্ধান পায়। গহ্বরের মুখ কাঠের তক্তা দিয়ে ঢাকা ছিল। তক্তা ভেঙে গহ্বরের মধ্যে কুনালকে নামিয়ে দেয় নটরাজন। গহ্বরের তলায় ছোট একটি চৌকো বাক্স পায় কুনাল। বাক্সটি লম্বায় আট ইঞ্চি এবং চওড়ায় চার ইঞ্চি। এই সেই বাক্স। কী ধাতু দিয়ে তৈরি বোঝা যাচ্ছে না, তবে বাক্সটি রীতিমতো হাল্কা। তার মধ্যে যাই থাকুক তার ওজন খুবই নগণ্য।

গুপ্তধন বলতে সোনা-হীরা-জহরৎ ইত্যাদি মূল্যবান জিনিসই বোঝায়। কিন্তু এ হেন ছোট একটি হাল্কা বাক্সের মধ্যে তাদের কোনটিই আছে কি না সন্দেহ।

বাক্সটি হাতে নিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে নটরাজন। সে চুপ চাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ। বাক্সটির মধ্যে কী আছে জানার জন্য প্রচন্ড কৌতূহল বোধ করছিল কুনাল। কিন্তু নটরাজন বাক্সটি না খুলে তার কাঁধে ঝোলানো ঝুলির মধ্যে পুরে ফেলল। তারপর কুনালের হাত ধরে চলে এল সমুদ্রের তীরে। এখানে তার নৌকো বাঁধা ছিল। এই নৌকোতে করে জাহাজ থেকে সুহেলি দ্বীপে এসেছে তারা। কুনালকে নিয়ে নৌকোতে উঠে বসলেও নটরাজ নৌকো ছেড়ে দিল না। সে কুনালকে গুপ্তধনের ইতিহাস বলে আগাগোড়া। প্রায় চার শো বছর আগে শঙ্কর-গৌরী মন্দিরের অধিকাংশ সোনা-হীরা-জহরৎ নিয়ে আসা হয় কোন একটি দ্বীপে। তখন কোচিন পর্তুগীজরা দখল করে নিয়েছে এবং তারা শহরের আশেপাশে সবকটি মন্দিরে হানা দিয়ে মন্দিরের ধন-সম্পদ লুটপাট করে নিয়েছে। বলা বাহুল্য শঙ্কর-গৌরী মন্দিরে হানা দিয়ে কিছুই পায় না তারা।

গুপ্তধনের হদিস দেওয়া নকশাটি মাদুলির মধ্যে পুরে শঙ্কর-গৌরী মন্দিরের মোহান্তরা তাঁদের হাতে বেঁধে রাখতেন। নটরাজন সব কথা কুনালকে বললেও কী করে সে মাদুলিটা পেয়েছে তা বলে না। কিন্তু তা না বললেও কুনাল যে তাকে মোহান্তের হত্যাকারী বলে সন্দেহ করছে তা সে বুঝতে পারে। কুনালের মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি মেলে সে বলে, তুমি গুপ্তধনের ভাগ চাও না মোহান্তকে কে খুন করেছে তা জানতে চাও?

নটরাজনের প্রশ্নের উত্তরে কুনাল বললে, গুপ্তধনের ভাগ আমি চাই নে—যদিও গুপ্তধন সম্বন্ধে আমার প্রচন্ড কৌতূহল। কিন্তু গুপ্তধনের আগে আমি মোহান্তর হত্যাকারী সম্বন্ধে জানতে চাই। কারণ মোহান্তর হত্যার তদন্ত করতে আমার বাবা কোচিনে এসেছেন।

নিমেষে কঠোর হয়ে ওঠে নটরাজনের মুখ। সে তার কাঁধের ঝুলি থেকে বের করে একটি বেগুনী রঙের ছোট কাঁচের ছিপি আঁটা শিশি ও স্টেনলেস স্টিলের একটি সিরিঞ্জের বাক্স। সিরিঞ্জের বাক্স থেকে সিরিঞ্জ বের করে নটরাজন শিশির মধ্যে সিরিঞ্জের ছুঁচ ঢুকিয়ে দেয়। তারপর খানিকটা জল-রঙের তরল পদার্থ সিরিঞ্জের মধ্যে টেনে নিয়ে সে কুনালের দিকে এগিয়ে যায়।

বজ্রমুষ্টিতে কুনালের একটি হাত চেপে ধরে নটরাজন কঠিন স্বরে বললে, তোমার মত অতিরিক্ত কৌতূহলপরায়ণ বুদ্ধিমানদের বাঁচিয়ে রাখা ক্ষতিকর, কাজেই এই যন্ত্রণা-

হীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করেছি তোমার জন্য...........

সঙ্গে সঙ্গে কুনাল চিৎকার করে উঠে নটরাজনের সিরিঞ্জ-ধরা হাতটিকে কামড়ে দেয় প্রাণপণ শক্তিতে। সঙ্গে সঙ্গে নটরাজনের গলা থেকে একটা চাপা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে এবং শিথিল হয়ে যায় তার সিরিঞ্জ-ধরা হাতের মুঠো। বিদ্যুদ্বেগে সিরিঞ্জটি ধরে ফেলে নটরাজনের হাতের মধ্যে বিঁধিয়ে দিল কুনাল এবং সিরিঞ্জের পেছনে চাপ দিয়ে তার ভেতরকার জল-রঙের পদার্থটি ঢুকিয়ে দেয় তার দেহের মধ্যে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নটরাজন নেতিয়ে পড়ে নৌকোর পাটাতনের ওপরে চিৎ হয়ে পড়ে যায়। আর এক সেকেন্ডও দেরি না করে নটরাজনের ঝুলি থেকে বাক্সটা তুলে নেয় কুনাল। তারপর বেগুনী রঙের শিশিটা পকেটে পুরে নৌকো থেকে নেমে চলে যায় দ্বীপের অন্য প্রান্তে জেলে-দের গ্রামের দিকে।

জেলেদের একটি নৌকোতে করে কুনাল চলে আসে কাবারথি দ্বীপে। তারপর সেখানকার এ্যাডমিনিস্ট্রেটারের সাহায্যে কোচিনগামী জাহাজে চেপে বসে।

কোচিনে পৌঁছেই কুনাল খবর পেল যে কল্যাণ সকলকে নিয়ে কোচিনের কাছে জেলেদের গ্রামে ডাক-বাংলোতে আছেন। সে সেখানে পৌঁছতেই তাকে নিয়ে সোরগোল পড়ে যায়। সকলে যখন তাকে নিয়ে মেতে আছে তখন সুবীর কুনালের আনা বাক্স ও তরল পদার্থ ভরা শিশিটি পরীক্ষা করে। তাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে তরল পদার্থ ভরা শিশিটি। শিশির মধ্য থেকে দু-চার ফোঁটা তরল পদার্থ তুলে নিয়ে সে পরীক্ষা করে। পরীক্ষা করে সে দেখে—যে এই তরল পদার্থটিই মোহান্তর পোষাকে লেগেছিল। জলের মত জিনিস, কাজেই চোখে নজরে আসে না—তার গন্ধ থেকে তার অস্তিত্ব টের পেয়েছিল সুবীর। অ্যালকহল দিয়ে ধুয়ে মোহান্তর পোষাক থেকে তরল পদার্থটি তুলে নিয়ে সে শিশিতে ভরছিল। তারপর তাকে পরীক্ষা করে-ছিল। পরীক্ষা করে বুঝেছিল যে তরল পদার্থটি শরীরে ইঞ্জেকসন করলে সরাসরি হৃৎপিন্ডে আক্রমণ করে দেহের রক্তের মধ্যে কোন স্বাক্ষর না রেখে। আফ্রিকার কোন একটি বিরল আগাছা থেকে বোধহয় এই তরল পদার্থটি প্রস্তুত করেছিল নটরাজন। সুবীর বুঝতে পারে যে বিষ-বিজ্ঞানে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ ছিল নটরাজন।

এই বিষ প্রয়োগ করে নটরাজন শঙ্কর-গৌরীর মন্দিরের মোহান্তকে হত্যা করেছে। হত্যা করেছে গুপ্তধনের হদি-সের জন্য। হদিস মানে একটি নকশা। সেই নকশার সাহায্যে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে খুঁজে বের করেছে সুহেলি দ্বীপ। তারপর সুহেলি দ্বীপের মধ্যে খোঁজাখুঁজি মাপজোক ও খোঁড়াখুঁড়ি করে উদ্ধার করেছে এই ছোট বাক্সটিকে।

রুপোর পাত মোড়া ছোট বাক্স। রীতিমতো হাল্কা। এর মধ্যে হীরে-জহরৎ-সোনা জাতীয় কোন জিনিস লুকানো থাকা অসম্ভব ব্যাপার। বাক্সটি খোলার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খোলা যায় না। কল্যাণ বললেন, বহুকাল ধরে বন্ধ আছে বলে জ্যাম হয়ে গেছে। খুলতে হলে ভাঙতে হবে।

ভাঙবেন না।—পুলিশ অফিসার মুর্গেশন বলেছিলেন ঃ ওর মধ্যে আর যাই থাক কোন গুপ্তধন নেই—কাজেই ভাঙলে কোন ক্ষতি হবে না।

না না, বাক্সটা ভাঙবেন না।—ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে উঠেছিল সুবীর ঃ গুপ্তধন না থাক বাক্সটি সুন্দর।

মুর্গেশন বললেন, ঠিক আছে, বাক্সটা আপনার জিম্মাতে থাক। কিন্তু একটা কথা সুবীর বাবু, যে নকশারটির জন্য নটরাজন মোহান্তকে খুন করলে, তাতে শুধু এই তুচ্ছ বাক্সের হদিস দেওয়া আছে! অথচ শুনেছিলাম যে পর্তু-গীজদের ভয়ে মন্দিরের বেশির ভাগ হীরে-জহরৎ-সোনা আরব সাগরের কোনও একটি দ্বীপের মধ্যে লুকানো হয়েছিল।

সুবীর বলল,—তা হয়তো হয়েছিল।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে মুর্গেশন বললেন, এই বাক্সের মধ্যে কী তা লুকোনো আছে?

—না। এই বাক্সের মধ্যে বিশেষ কিছু আছে—বলে মনে হয় না।

—তা হলে কী আছে এই বাক্সের মধ্যে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি সুবীর। কারণ বাক্সটি খোলা যাচ্ছিল না। বাক্সটি না খুলে তার মধ্যে কী আছে তা আন্দাজ করা যায় না।

মাদ্রাজগামী কোচিন-মাদ্রাজ এক্সপ্রেসের প্রথম শ্রেণীর কামরার মধ্যে বসে বাক্সটি পরীক্ষা করছে সুবীর। কুনাল ছাড়া আর কারুরই বাক্সটি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ নেই। কাবেরী ও করবী পাশাপাশি বসে উল-বোনার একটি জটিল প্যাটার্ন বোঝার চেষ্টা করছে। কল্যাণ পড়ছেন একটা বই। শুধু কুনাল ঝুঁকে পড়ে সুবীরের সঙ্গে বাক্সটিকে পরীক্ষা করে।

লম্বায় আট ইঞ্চি, চওড়ায় চার ইঞ্চি—বাক্সটি আকারে খুবই ছোট। আগাগোড়া রুপোর পাত দিয়ে মোড়া বলে বোঝা যাচ্ছে না বাক্সটি কী ধাতু দিয়ে তৈরি হয়েছে। সুবী-রের মনে হচ্ছে বিশেষ ধরনের লোহা বা ইস্পাত।

ইস্পাত।—কল্যাণ তার বই থেকে ভ্রু কুঁচকে তাকালেন সুবীরের মুখের দিকে ঃ চার পাঁচ শো বছর আগে পর্তু-গীজরা যখন এ দেশে আসে, তখন ইস্পাত আবিষ্কৃত হয়ে-ছিল কী?

সুবীর জবাব দিল, পৃথিবীর আর কোথাও না হলেও এ-দেশে হয়েছিল বলে মনে হয়। কারণ প্রাচীন বা মধ্যযুগে ভারতীয়রা ধাতুবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিল। ইস্পাত না হলেও বিশেষ ধরনের লোহা, যাকে বলে Wrought Iron দিয়ে বাক্সটা তৈরি হতে পারে। কুতব মিনারের পাশের লৌহ স্তম্ভটি "রট্ আয়রণ" দিয়ে নির্মিত। "রট আয়রণ" ইস্পাতের চেয়েও সেরা—তাতে মরচে ধরে না।

কুনাল বললে, লোহা বা ইস্পাত নয়, আমার মনে হচ্ছে রুপোর পাতের আড়ালে সোনা আছে—বাক্সটা সোনা দিয়েই তৈরি। বাক্সের মধ্যে কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না—কাজেই বাক্সটাই গুপ্তধন।

গুপ্তধন মাত্র একটা সোনার বাক্স!—মৃদু হাসি ফুটে ওঠে সুবীরের মুখে ঃ না ভাই, গুপ্তধন বাক্সের মধ্যে আছে।

—কিন্তু বাক্সের মধ্যে কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। নাড়াচাড়া করলে কোন শব্দ হচ্ছে না....... যা ওজন, তা বাক্সেরই ওজন ....

—আর কিছু না হোক, বাক্সের মধ্যে গুপ্তধনের হদিস

আছে।

আবার হদিস!—কুনাল চোখ বড় বড় করে তাকায় সুবীরের মুখের পানে ঃ শঙ্কর-গৌরীর মন্দিরের মোহান্তকে খুন করে একটা হদিস চুরি করল নটরাজন। সেই হদিস আর একটা হদিসেরই হদিস দেবে শুধু!

সুবীর বললে, তা হতে পারে। যেখানে অত সোনা-রুপো হীরে-জহরত লুকিয়ে রাখা আছে, সেখানকার হদিস কী অত সহজে মেলে ভাই। এমনও হতে পারে যে এই দ্বিতীয় হদিস হয়তো আর একটা হদিসেরই হদিস দিচ্ছে.........

—আর বলবেন না সুবীরদা! আমার মাথার ভেতরটা কি রকম ঝিম ঝিম করতে শুরু করেছে!

সুবীর ও কুনালের কথোপকথন এতক্ষণ না শুনলেও এই হদিসের প্রসঙ্গটা করবীর কানে গিয়েছিল। সে খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, হদিসের হদিস, তারও হদিস, তারও......... উঃ কী মজা!

নিশ্চয় মজা।—সুবীর মৃদু হেসে বললে ঃ কিন্তু মজাটা পুরোপুরি উপভোগ করতে হলে তোমাকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে—উল-বোনা রেখে চলে এস এদিকে।

সঙ্গে সঙ্গে হাসি থামিয়ে করবী বললে, না ওতে আমার কোন মজা নেই।—বলে আবার সে কাবেরীর সঙ্গে উল-বোনায় মন দেয়।

কুনাল অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে, বাক্সটা খোলার চেষ্টা করুন সুবীরদা। ওর মধ্যে আর একটা হদিস যদি থাকে, বাক্সটা না খুললে তো তার নাগাল মিলবে না।

খোলার চেষ্টা তো করে যাচ্ছি ভাই।—বাক্সটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললে সুবীর ঃ কিন্তু পারছি কই। একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কুনাল, বাক্সর ডালাটা কোন দিকে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন আগাগোড়া নিরেট একটা বাক্স—তার কোন ডালাই নেই।

কুনাল বললে, ডালা নেই এমন বাক্স কী হয়! হয়তো বাক্সের সঙ্গে বেমালুম মিশে আছে বলে ঠিক ঠাহর হচ্ছে না। হয় এদিক, নয়তো ওদিক—দুদিকের একদিকে আছে নিশ্চয়ই। ভাল করে দেখলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে.........

—ভাল করেই তো দেখছি ভাই। কিন্তু.........

বলে আবার বাক্সের ওপরে ঝুঁকে পড়ে সুবীর। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন তার ডালার কোন হদিস পায় না, তখন একটা নকশা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রুপোর পাতের ওপরে খোদাই করা একটি নকশা। কিসের নকশা বুঝতে পারে না সুবীর। পকেট থেকে একটা লেন্স বের করে নকশাটিকে ভাল করে পরীক্ষা করে সে। পরীক্ষা করতে করতে তার মনে হল নকশাটি আসলে খোদাই করা কয়েকটি অক্ষর। অক্ষরগুলো কোন ভাষায় তা অবশ্য সে বুঝতে পারে না। হয়তো মলয়ালম বা তামিল কিংবা দাক্ষিণাত্যের অন্য কোন ভাষায় লেখা কয়েকটি হরফ।

কী দেখছেন অত মন দিয়ে?—উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে কুনাল।

এই নকশাটিকে দেখছিলাম।—সুবীর জবাব দিল ঃ আসলে কিন্তু নকশা নয়—কতগুলো হরফ সাজানো আছে। কোন ভাষার হরফ তা অবশ্য বুঝতে পারছি না।

সুবীরের হাত থেকে লেন্সটা তুলে নিয়ে কুনালও হরফগুলোকে পরীক্ষা করে। হরফগুলো এমনভাবে সাজানো আছে যে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বাতিঘর বা লাইট-হাউসের ছবি।

লাইটহাউস।—কুনাল বললে ঃ নকশা বা হরফ নয়, একটা লাইটহাউসের ছবি।

লাইটহাউসের ছবি!—সুবীর হেসে ফেলল ঃ লাইট-হাউস কোথায়, কতকগুলো হরফ সাজানো আছে। ওগুলো হরফ ছাড়া আর কিছু নয় ভাই।

কুনাল কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি একটু দেখ না বাবা। দেখে বল এগুলো নকশা, হরফ না লাইটহাউসের ছবি.........

বাক্সটা হাতে নিয়ে লেন্সের সাহায্যে, অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে কল্যাণ বললেন, হরফই বটে। প্রাচীন তামিল ভাষায় লেখা হরফ।

কী লেখা আছে বাবা?—কুনাল উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—কী লেখা আছে তা তো বলতে পারব না। হরফ চিনলেও ভাষাজ্ঞান তো নেই। তবে হরফগুলো ছবির মত সাজানো আছে।

—লাইটহাউসের ছবি বাবা।

—উঁহু। আমার মনে হচ্ছে এক ঝাঁক গাংচিলের ছবি।

আর আমার মনে হচ্ছে এটা একটা নকশা।—সুবীর বললে।

কল্যাণ মৃদু হেসে বললেন, ছবি বা নকশা যাই মনে হোক, ওগুলো যে তামিল হরফ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তামিল-ভাষী কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিলেই বোঝা যাবে।

কুনাল বললে, কলকাতায় গিয়ে তামিল ভাষা জানা কাউকে পাব কোথায় বাবা?

দরকার নেই।—গম্ভীর মুখে বললে সুবীর ঃ ওটার পাঠোদ্ধার করতে হলে আমরা নিজেরাই করব—দরকার হলে আমি নিজে তামিল শিখে নেব। খবরদার কুনাল—করবী তুমিও মনে রেখ, এই বাক্সের ব্যাপারে কারুর সঙ্গেই আলোচনা করবে না। মেসোমশাই, মাসিমা—আপনারাও মনে রাখবেন............

কামরা শুদ্ধ সকলেই চুপ। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

বাক্সটা হাতে নিয়ে আবার তাকে পরীক্ষা করে সুবীর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। হঠাৎ বাক্সের উপরে বিশেষ কিছু একটা সুবীরের নজরে আসতেই সে একটু মন দিয়ে পরীক্ষা করে। আর কেউ তা লক্ষ্য না করলেও কুনাল দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সুবীর কী দেখছে তা দেখার আগ্রহ হয় তার। সে হাত বাড়িয়ে বলে, বাক্সটা আমাকে দিন না সুবীরদা—আমি একটু দেখব।

চল, আমার কামরায় গিয়ে দেখবে।—বলে বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুবীর।

কল্যাণ বললেন, তোমার কামরায় ও যাবে কী—ওখানে তো আর একটা প্যাসেঞ্জার আছে!

সুবীর বললেন, তা আছে। কুনাল ঐ কামরায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসলে সে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।

করবী বললে, আমিও যাব কুনালের সঙ্গে।

না।—কাবেরী গম্ভীর গলায় বললেন ঃ এই উলের প্যাটার্নটি না বুঝে নেওয়া পর্যন্ত তুমি এখান থেকে নড়তে পারবে না।

॥ দুই ॥

প্রথম শ্রেণীর বগীর কামরাগুলো সব করিডর দিয়ে যুক্ত করা। করিডর দিয়ে বগীর উত্তরদিকের একেবারে শেষ কামরায় গেল সুবীর ও কুনাল। দু-বার্থের কামরা—দুজন প্যাসেঞ্জার এখানে শুতে পারে। সুবীর নিজের বার্থ দখল এবং জিনিসপত্র রাখার জন্য যখন প্রথম এ কামরায় ঢুকেছিল, তখন একজন কুলি এই কামরার মধ্যে ঢুকে নীচের বার্থের নীচে একটি লম্বা কালো রঙের ট্রাঙ্ক রেখে দিয়েছিল। ট্রাঙ্কের উপরে আঁটা লেবেলে ট্রাঙ্কের মালিকের নাম লেখা আছে "ওয়াই গোবিন্দরাজন।" কুলির সঙ্গে তখন গোবিন্দরাজন ছিলেন না—কাজেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়নি সুবীরের। এখনও কুনালকে নিয়ে কামরায় ঢুকে গোবিন্দরাজনের দেখা পায় না সুবীর। হয়তো তিনি অন্য কোন কামরায় আছেন—কিংবা বাথরুমে। তাঁর ট্রাঙ্কটি অবশ্য বার্থের নীচে রাখা আছে। তাঁর অন্য কোন জিনিস নেই। নীচের বার্থের দুপাশে লাগানো শেলফের উপরে জলের বোতল, ফ্লাস্ক বা ব্রিফকেস জাতীয় কোন জিনিসও নেই। হয়তো গোবিন্দরাজনের সব জিনিসই তাঁর ট্রাঙ্কের মধ্যেই রাখা আছে।

নীচের বার্থে পাশাপাশি বসে কুনাল ও সুবীর। বাক্সটা সুবীরের কাঁধে ঝোলানো থলের মধ্যে রয়েছে। থলি থেকে বাক্সটা বের করে আবার পরীক্ষা করে সুবীর। খানিকক্ষণ খুব মন দিয়ে বাক্সটাকে উল্টোপাল্টে দেখতে গিয়ে হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুবীরের মুখ।

দেখেছ কুনাল, ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল সুবীর ঃ বাক্সের একপাশে দুটো ফুটো!

ফুটো!—বাক্সের উপরে ঝুঁকে পড়ে কুনাল ঃ কিসের ফুটো।

—এই দেখো।

সুবীরের দৃষ্টি অনুসরণ করে বাক্সের এক পাশে এক জোড়া ফুটো দেখতে পায় কুনাল। খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে ফুটোটার দিকে তাকিয়ে থেকে সে বললে, কিসের ফুটো এই দুটো সুবীরদা?

মৃদু হেসে সুবীর বললে, কিসের ফুটো বুঝতে পারলে তো গুপ্তধনের হদিস পেয়ে যেতাম।

—কিসের ফুটো বুঝতে পারলে গুপ্তধনের হদিস পেয়ে যেতে! বলো কী সুবীরদা!

সুবীর আর কিছু না বলে বাক্সটা তার কাঁধের থলির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

কুনাল বললে, বাক্সটা ঢুকিয়ে রাখলে কেন সুবীরদা? আরও একটু পরীক্ষা করে দেখলে হত না!

সুবীর বললে, আর পরীক্ষা করে কী হবে! যা যা দেখার আছে, সবই তো দেখে নিয়েছি।

—বাক্সটা খোলার চেষ্টা করবে না!

—চেষ্টা করে লাভ নেই, কারণ খোলা যাবে না।

—তা হলে আর কী হবে বাক্সটা দিয়ে!

—বাক্সের তলায় তামিল ভাষায় কী লেখা আছে বুঝতে পারলে বাক্সটাকে কাজে লাগানো যাবে হয়তো।

—তামিল-ভাষী কাউকে দিয়ে পড়িয়ে নিলে হয় না সুবীরদা!

—না। আমরা ছাড়া বাক্সটার রহস্য অন্য কেউ জেনে ফেলুক তা আমি চাই না। আমি নিজে তামিল ভাষা শিখে ওগুলোর পাঠোদ্ধার করব।

তুমি তামিল ভাষা শিখবে!—কুনাল চোখ বড় বড় করে তাকায় সুবীরের মুখের দিকে।

নিশ্চয়ই!—সুবীর গম্ভীর মুখে বললে।

এমন সময় কামরার মধ্যে ঢুকল বগীর এ্যাটেন্‌ডেন্ট। সে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কুনালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, ইনি নিশ্চয়ই ওয়াই গোবিন্দরাজন নন!

না!— সুবীর জবাব দিল ঃ এর নাম কুনাল বোস। এ অন্য কামরায় রয়েছে।

—তা হলে ওয়াই গোবিন্দরাজন কোথায় গেলেন?

—তা তো বলতে পারব না—কারণ ওঁকে আমি দেখি নি। আমি যখন প্রথম এই কামরায় ঢুকি, তখন গোবিন্দরাজনের বাক্সটা কামরার মধ্যে রেখে গিয়েছিল একজন কুলি। গোবিন্দরাজন তখনো গাড়িতে ওঠেন নি। আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে মাল তুলে দিলেও গোবিন্দরাজন নিজে আর গাড়িতে উঠতে পারেন নি।

—মাল যখন তোলা হয়েছে তখন গোবিন্দরাজন নিশ্চয়ই স্টেশনে হাজির ছিলেন। তা হলে গাড়িতে উঠতে পারেন নি কেন?

—হয় তো কোনও কারণে গাড়ি মিস্ করেছেন।

আশ্চর্য ব্যাপার!—এ্যাটেন্‌ডেন্ট গম্ভীর মুখে বললে ঃ সময়মত স্টেশনে হাজির থেকেও ট্রেন মিস্ করলেন—ভদ্রলোকের কী মাথা খারাপ হয়েছে!

সুবীর বললে, তা হতে পারে। কিন্তু ওঁর বাক্সটা নিয়ে কী করা যায়?

—আমার নিজের কিছুই করার নেই। যাঁর বাক্স, তিনিই ব্যবস্থা করবেন।

—কিন্তু তিনি তো গাড়িতে ওঠেনই নি।

—ওঠেনেই নি সে কী বলা যায়। হয় তো অন্য কোনও বগীতে আছেন।

বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল বগীর এ্যাটেন্‌ডেন্ট।

কুনাল বললে, গোবিন্দরাজনের জায়গাটা যখন খালি রয়েছে, আমি তোমার সঙ্গে এই কামরাতেই থাকব।

সুবীর বললে, তা থাকতে পার—কিন্তু গোবিন্দরাজন এলেই তোমাকে কামরা ছেড়ে দিতে হবে।

কল্যাণকে বলে সুবীর তার কামরাতেই কুনালের শোবার ব্যবস্থা করে দিল। নীচের বার্থে কুনালের বিছানা পেতে ওপরের বার্থে নিজের জন্য একটি চাদর বিছিয়ে নেয় সুবীর। মাথায় বালিশের বদলে বাক্স ভর্তি থলিটা ভাজ করে রাখে।

ঐ বাক্সটি তুমি মাথায় দেবে সুবীরদা!— কুনাল অবাক হয়ে বললে ঃ তোমার মাথায় লাগবে না!

লাগবে বৈ কি!—সুবীর বললে ঃ এমনই লাগবে যে রাত্রে আমার ঘুম আসবে না।

তা হলে ওটা আর কোথাও রেখে দাও।

—না! আর কোথাও রাখলে ওটা চুরি যাবে।

—চুরি যাবে! কিন্তু কে চুরি করবে সুবীরদা! বাক্সটা সম্বন্ধে একমাত্র নটরাজনের আগ্রহ থাকতে পারত—কিন্তু সে তো মরেই গিয়েছে।

—নটরাজন ছাড়া আর কারুর বাক্সটার দিকে নজর নেই, তা কী বলা যায়!

—আমরা ও নটরাজন ছাড়া একমাত্র পুলিশ অফিসার মুর্গেশন বাক্সটি সম্বন্ধে জানেন। কিন্তু জানলেও তিনি নিশ্চয়ই বাক্সটা চুরি করার চেষ্টা করবেন না।

—আর কোন কথা নয় কুনাল, এবারে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।

শুয়ে পড়ে কুনাল। উপরের বার্থে খানিকক্ষণ বসে থাকার পর সুবীরও শুয়ে পড়ে। শুয়ে সে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে নীল "নাইট লাইট" জ্বালিয়ে অন্য আলোগুলো নিভিয়ে দেয়।

॥ তিন ॥

বার্থের উপরে শুয়ে এপাশ ওপাশ করে কুনাল—কিন্তু তার ঘুম আসে না। উপরের বার্থের দিকে তাকায় সে। বার্থের গদির নড়াচড়া দেখে সে বুঝতে পারে যে সুবীরও ঘুমোয় নি। সে ডাকাল, সুবীরদা.........

বল।—সুবীর সাড়া দিল।

—চল না সুবীরদা আমরা কোচিনে ফিরে যাই।

—কেন?

—ওটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে হবে না?

—নিশ্চয়ই। বাক্সটার উপর খোদাই করা হরফগুলোর পাঠোদ্ধার করি আগে—তারপর—

—সে কী আর কলকাতায় গিয়ে পারবে সুবীরদা! কোচিনে চল......... মুর্গেশনের সাহায্য নাও.........

—ঠিক আছে, কাল সকালে তোমার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করব—তারপর যা করার তা করা যাবে।

—যাই কর সুবীরদা, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে আছি।

—ঠিক আছে। এবারে ঘুমোও.........

ঘুমোবার চেষ্টা করে কুনাল—কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। বেশ কিছুক্ষণ বার্থের উপরে চোখ বুজে শুয়ে থাকার পর যখন কুনালের চোখে তন্দ্রা ঘনিয়ে আসে, তখন হঠাৎ কার গরম নিঃশ্বাস যেন তার মুখে চোখে এসে লাগে।

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে চোখ মেলে তাকায় কুনাল। "নাইট-লাইটের" অস্ফুট আলোয় তার মুখের উপরে ঝুঁকে পড়া একটি কালো মুখ দেখতে পায় সে। চোখ দুটি তার জ্বল জ্বল করছে। ঠিক যেন নটরাজন! কিন্তু নটরাজন তো মরে গিয়েছে—সে আসবে কোথা থেকে! তা ছাড়া কামরার দরজা তো বন্ধ! বন্ধ দরজা দিয়ে কী কোন মানুষ ঢুকতে পারে!

অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে কুনালের গলা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় নাইট-লাইট, কামরাটা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর সে অস্পষ্ট একটা কন্ঠস্বর শুনতে পায়—ঠিক যেন নটরাজনের গলার স্বর, চুপচাপ শুয়ে থাক—নইলে.........

ভয়ে নিথর হয়ে শুয়ে থাকে কুনাল। অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু অন্ধকার যেন নড়ে চড়ে। হঠাৎ সুবীর আর্তনাদ করে ওঠে, আলো—আলো.........আলো জ্বেলে দাও। কুনাল.........

বার্থের ওপরে উঠে বসে সুইচের দিকে হাত বাড়ায় কুনাল। সঙ্গে সঙ্গে সেই কন্ঠস্বর, আলো নয়...... আলো জ্বালাবে না........

সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে নেয় কুনাল।

আলো জ্বালছ না কেন কুনাল!—সুবীর তার বার্থের উপর স্থির হয়ে বসে থাকে।

বার্থ থেকে নেমে এসে সুবীর আলো জ্বেলে দেয়। কামরার মধ্যে কেউ নেই। দরজা বন্ধ। কুনাল বিস্ফারিত চোখে তাকায় সুবীরের মুখের দিকে। সুবীর তার পাশে বসে বললে, কোথায় গেল বল তো লোকটা! আমার বালিশের তলায় হাত দিয়ে বাক্সটা টেনে বের করার চেষ্টা করছিল! তারপর আমি তোমাকে ডাকতেই সরে পড়ে......

কোথায় লোক সুবীরদা!—কুনালের গলার স্বর কাঁপেঃ কামরার দরজা তো বন্ধ........ কামরাতেও কেউ নেই......

—কিন্তু আমার মাথার নীচে সে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল.........

—সুবীরদা, আমি যেন নটরাজনকে দেখলাম ...... তার গলার স্বর শুনলাম.........

—নটরাজন! সে আসবে কোথা থেকে—সে তো মরে গিয়েছে!

—জ্যান্ত কোন মানুষ তো বন্ধ দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকতে পারবে না সুবীরদা......... কাজেই ....

সুবীর হতবুদ্ধি! কোন কথাই বলতে পারে না সে।

কুনাল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমার একটুও ভাল ঠেকছে না সুবীরদা—চল এই কামরা থেকে এখনই বেরিয়ে যাই।

দাঁড়াও, চাদর বালিশ সুটকেসে ঢুকিয়ে নিই।—সুবীর কুনালের রবারের বালিশ থেকে হাওয়া বের করতে করতে বললে।

—তাড়াতাড়ি কর সুবীরদা।

ক্ষিপ্রগতিতে চাদর দুটি ভাজ করে বার্থের নীচে সুটকেসটা খোলে সুবীর। চাদর ও বালিশ সুটকেসের মধ্যে ঢোকাচ্ছে সুবীর, এমন সময় সুটকেসের পাশে রাখা ট্রাঙ্কটির দিকে নজর গেল কুনালের।

তাড়াতাড়ি চল সুবীরদা।—হঠাৎ আর্তস্বরে বলে ওঠে কুনাল ঃ আর এক সেকেন্ডও দেরি না.........

কামরা থেকে তারা দুজন যখন বেরিয়ে এল, ট্রেন তখন একটি স্টেশনে থেমে আছে।

চল এই স্টেশনেই নেমে পড়ি।—কামরা থেকে বেরিয়েই বললে কুনাল।

এই স্টেশনে নেমে পড়ব কী!—সুবীর অবাক হয়ে বললেঃ চল তোমার বাবার কামরায় যাই।

—বাবার কামরার চেয়ে অনেক কাছে আছে গাড়ি থেকে বেরোবার দরজা। চল সুবীরদা.........

—কিন্তু এখানে নেমে করবে কী!

—কোচিনে ফিরে যাব .... তারপর মুর্গেশনের সাহায্য নেব .... আমাদের ভীষণ বিপদ সুবীরদা!

কিসের বিপদ!—সুবীর হতবুদ্ধির মত তাকাল কুনালের দিকে।

মরা মানুষ আমাদের তাড়া করেছে।—কুনাল কম্পিত স্বরে বললে ঃ এর চেয়ে বড় বিপদ আর কী আছে!

বলে সুবীরের হাত ধরে টানতে থাকে কুনাল।

আর কোন কথা না বলে সুবীর কুনালের হাত ধরে গাড়ি থেকে প্লাটফর্মে নেমে পড়ে।

বগীর এ্যাটেন্‌ডেন্ট তাদের দুজনের দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে বললে, আপনাদের টিকিট হাওড়া পর্যন্ত—আর আপনারা এখানে নেমে পড়ছেন!

সুবীর বললে, বিশেষ একটা জরুরী ব্যাপারে নেমে পড়তে হচ্ছে আমাদের। তুমি 'বি' কম্পার্টমেন্টের ডক্টর বোসকে বলে দিও যে আমি ও কুনাল এখানে নেমে পড়েছি। কেন নামলাম তা তাঁকে পরে চিঠি লিখে জানাব।

॥ চার ॥

কোচিনে পেঁছে সোজা মুর্গেশনের বাড়ি গেল সুবীর ও কুনাল।

আগাগোড়া সব কথা শুনে মুর্গেশন মৃদু হেসে বললেন, মরা মানুষ কখনো কারুর পিছু নিতে পারে না। যদি সত্যিই তেমন কিছু ঘটে থাকে—অর্থাৎ মরা নটরাজন তোমাদের পিছু নিয়ে থাকে, আমার কিছুই করার নেই। তবে নটরাজনের ছদ্মবেশে যদি কোন বদমায়েশ তোমাদের দুজনের পেছনে লেগে থাকে তাকে শায়েস্তা আমি করে দিতে পারব।

কুনাল বললে, কিন্তু মিস্টার মুর্গেশন—কোন মানুষের পক্ষে কী বন্ধ দরজা ভেদ করে রেলের কামরায় ঢোকা বা কামরা থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সম্ভব?

—কখনোই না—এ হেন ভুতুড়ে ব্যাপার কখনোই সম্ভব নয়। কোন ভয় নেই কুনাল, কোন দুষ্টু লোক যদি তোমাদের ওপরে হামলা করে, আমি তাকে ধরে ফেলব ঠিক।

তারপর সুবীরের দিকে তাকিয়ে মুর্গেশন বললে, এবারে বল, তোমরা কী করতে চাও? ঐ গুপ্তধন খুঁজে বের করবে তো?

নিশ্চয়ই।—সুবীর জবাব দিল : তার জন্য সমুদ্রের ধারে একটি নির্জন জায়গায় গিয়ে থাকতে চাই।

কুনাল বললে, এমন একটি জায়গা, যেখানে ঐ ইয়ে—মানে—

নটরাজনের ভূত গিয়ে পেঁছতে পারবে না!—মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বললেন মুর্গেশন : ঠিক আছে, তেমনি একটি জায়গাই আমি ঠিক করে দেব তোমাদের জন্য। কিন্তু একটা কথা, ঐ গুপ্তধন তোমরা খুঁজে পেলেও, তা কিন্তু শঙ্কর-গৌরী মন্দিরেরই সম্পত্তি হবে।

তা তো হবেই।—সুবীর গম্ভীর মুখে বললে : গুপ্তধনে আমাদের কোন লোভ নেই। তা খুঁজে বের করতে পারলেই আমরা খুশি।

মুর্গেশন একটা পিস্তল সুবীরের হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, এটা তোমার কাছে রাখ—দরকার হলে কাজে লাগিও। ....

কোচিনে সমুদ্রের ধারে এক ডাক-বাংলোয় আশ্রয় নিয়েছে সুবীর ও কুনাল। পুরানো ও পরিত্যক্ত পি. ডাব্লিউ. ডি-র ডাক-বাংলো। এখানে কেউই আসে না বা থাকতে চায় না। ইলেকট্রিসিটি নেই—কাজেই কেরোসিন ও লন্ঠন সংগ্রহ করতে হয়েছে। অন্যান্য জিনিসপত্র ও খাদ্য সামগ্রীও মজুত করতে হয়েছে, কারণ কাছাকাছি কোন বাজার বা দোকানপাট নেই। এখানে থাকার ব্যবস্থা মুর্গেশন করে দিয়েছেন। প্রায় রোজই তিনি নিজে এসে খোঁজ-খবর নেন—কাজেই কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

এমনি একটি নিরিবিলি জায়গাই আপনাদের দরকার ছিল।—ডাক-বাংলোর সামনের বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসে একটি বই পড়তে পড়তে বললে সুবীর।

কী বই পড়ছ সুবীরদা?—পাশে আর একটি ইজি-চেয়ারে বসে কুনাল প্রশ্ন করে।

—এই দেখো না।

বইটা হাতে নিয়ে কুনাল দেখে সেটা তামিল ও ইংরেজীতে লেখা সহজ তামিল ভাষা শিক্ষার বই।

বইটা হাতে নিয়ে বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টোতে উল্টোতে কুনাল বললে, শিখতে কী পারলে কিছু?

—তামিল ভাষার কথার বলছ! বাক্সটার পেছনে যা যা লেখা আছে, শুধু তাদের পাঠোদ্ধার করতে চাই—তার জন্য যতটুকু শেখার শিখেছি।

—তার মানে বাক্সটাতে যা লেখা আছে তার পাঠোদ্ধার তুমি করে ফেলেছ?

সুবীর কুনালের প্রশ্নের জবাব দেবার আগে ডাক-বাংলোর বাইরে মুর্গেশনের জীপ এসে দাঁড়াল।

জীপ থেকে নেমে মুর্গেশন এলেন ডাক-বাংলোর বারান্দায়।

একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে মুর্গেশন কুনালের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, বুঝলে কুনাল, আমার কোয়ার্টারে যে চারজন কনস্টেবল পাহারা দেয়, তারাও তোমাদের মত ভূত দেখতে শুরু করেছে। রাত্রিতে আমার কোয়ার্টারের বাগানে নাকি একটা ছায়ামূর্তি ঘুর ঘুর করে বেড়ায়—আলো ফেললেই অদৃশ্য হয়ে যায় তা।

নিমেষে গম্ভীর হয়ে ওঠে কুনালের মুখ। সে কোন কথা বলে না।

ভয় পেয়ে গেলে নাকি!—কুনালের পিঠে হাত রেখে বললেন মুর্গেশন : দেখ কুনাল, ভূত যদিও আমি বিশ্বাস করি না, তবু এইটুকু বলতে পারি যে মানুষের মত ক্ষতি করার ক্ষমতা ভূতের নেই। অর্থাৎ মানুষ ছাড়া মানুষের ক্ষতি আর কেউই করতে পারে না। অতএব সাবধান হলে মানুষ সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। ....

মুর্গেশন চলে গেলে পর কুনাল গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সুবীর বললে, ব্যাপার কী কুনাল, অমন গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন?

তোমার ঐ বাক্সটার কথা ভাবছিলাম সুবীরদা।—কুনাল জবাব দেয় : এ বাক্সটা তুমি বালিশের নীচে রেখে শুতে পারবে না।

কেন?—সুবীর অবাক হয়ে তাকাল কুনালের মুখের পানে।

—ঐ বাক্সর জন্য তোমাকে হয়তো মেরেই ফেলবে ......

হো হো করে হেসে উঠে সুবীর বললে, ঐ বাক্সর কথা তুমি আমি ও মুর্গেশন ছাড়া আর কেউই জানে না। বাক্সর জন্য আমাকে মেরে ফেলতে হলে তুমি আর মুর্গেশন ছাড়া—

ও কী বলছ সুবীরদা!—কুনাল আর্তস্বরে বলে ওঠে।

—তুমি বা মুর্গেশন নিশ্চয়ই আমাকে বাক্সর জন্য মেরে

ফেলবে না। আমার কাছ থেকে তোমার বাক্সটা কেড়ে নেবার প্রশ্নই ওঠে না—আর মুর্গেশনের ওটা সম্বন্ধে কোন আগ্রহই নেই। আমি ওঁকে অনুরোধ করেছিলাম বাক্সর উপরে লেখা তামিল হরফগুলোর পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করতে—কিন্তু তিনি বললেন এ ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। বাক্সে খোদাই করা হরফগুলোর দিকে তিনি তাকালেনও না একবার ....

—বাজে কথা রাখ সুবীরদা। আমি কিসের ভয় পাচ্ছি তা আশা করি তুমি বুঝতে পারছ।

—ভূতের ভয় পাচ্ছ তো! কিন্তু মুর্গেশনের মতই ভূত আমি বিশ্বাস করি না।

—কিন্তু সেদিন রাত্রে ঐ ট্রেনের কামরায়—

—যার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার হয়েছে সে ভূত নয় মানুষ। কিন্তু সে কী করে বন্ধ কামরার মধ্যে ঢুকল বা কামরা থেকে অদৃশ্য হল তা আমি বলতে পারব না।

কুনাল আর কিছু না বলে চুপ করে থাকে। ....

সেদিন রাত্রে কুনাল তার খাট থেকে বালিশ নিয়ে এল সুবীরের খাটে এবং তার পাশেই শুয়ে পড়ে।

সত্যিই ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে!—মৃদু হেসে বললে সুবীর ঃ একা নিজের খাটে শুতে সাহস পাচ্ছ না!

কুনাল গম্ভীর মুখে বললে, ভয় নয় সুবীরদা, তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই আমি তোমার পাশে শুচ্ছি!

চোখ বড়ো বড়ো করে কুনালের মুখের দিকে তাকিয়ে সুবীর বললে, আমার নিরাপত্তা! তুমি আমার বডি-গার্ড হবে নাকি।

দরকার হলে হব।........

—কুনাল ঘুমোতে পারে না। সুবীর শুয়ে পড়ার মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘুমিয়েছে, তার থেকেই বোঝা যায় যে তার নিজের বা বাসের নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন উদ্বেগ নেই তার মনে। কুনাল শুয়ে শুয়ে মুর্গেশনের কোয়ার্টারের বাগানে ছায়ামূর্তির আনাগোনার ফল ভাবে। ছায়ামূর্তির কোন বর্ণনা অবশ্য দেন নি মুর্গেশন। কাল মুর্গেশন এলে তাকে সে জিজ্ঞেস করবে তাঁর কোয়ার্টারের পাহারাওয়ালা যাকে দেখেছে সে দেখতে কেমন। ট্রেনের কামরায় সে যাকে দেখেছে, সে কী—

হঠাৎ অস্পষ্ট পায়ের শব্দে কানে আসতেই কুনালের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। সে চমকে বিছানার ওপরে উঠে বসে। তারপর ঘরের মধ্যে টর্চের আলো ফেলে তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কেউ নেই ঘরের মধ্যে। একটা টিকটিকিও দেখা যাচ্ছে না। তা হলে সে কী ভুল শুনেছে!

খানিকক্ষণ বসে থেকে কুনাল আবার শুয়ে পড়তেই আবার সেই শব্দ তার কান আসে। ঘরের মধ্যে নয়, বাইরে বারান্দায় কে যেন পায়চারি করছে। আবার উঠে বসে কুনাল। বারান্দার দিকের জানালার দিকে তাকায় সে। জানালার শার্সির ওপরে মাঝে মাঝে অস্পষ্ট একটা আলো এসে পড়ছে। কিসের আলো বুঝতে পারে না সে। কেউ হয়তো আলো হাতে বারান্দায় পায়চারি করছে।

হঠাৎ ঐ আলোকে আড়াল করে দাঁড়ায় একটা ছায়ামূর্তি। জানালার শার্সির ওপরে ফুটে ওঠে একটা মাথা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য—তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে কুনাল সুবীরকে বললে, আর কতদিন এখানে থাকবে সুবীরদা?

বেশী দিন না।—সুবীর জবাব দিল ঃ মনে হচ্ছে হদিস পেয়ে গিয়েছি—এবারে বেরিয়ে পড়ব।

—কোথায় যাবে সুবীরদা?

—মুর্গেশনের সঙ্গে পরামর্শ করে তা ঠিক করব।

সেদিন মুর্গেশন আসতেই সুবীর তাকে প্রশ্ন করে আচ্ছা মিস্টার মুর্গেশন, কোচিনের কাছাকাছি কোন বাতিঘর মানে লাইট-হাউস আছে কী, যাকে গাং চিলেরা ঘিরে রাখে?

মুর্গেশন অবাক হয়ে সুবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, আছে, মানে তার গল্প শুনেছি—কিন্তু তার কথা তুমি জানলে কী করে?

—শুনেছি ....

—কোথায় শুনেছ! এখানকার জেলেদের কাছ থেকে কী?

—না—ঐ বাক্সের ওপর খোদাই করা হরফ থেকে—

—পাঠোদ্ধার করেছ বুঝি? শোন সিনহা এখানকার জেলেদের মধ্যে নানারকম গল্পকথা প্রচলিত আছে—তাদের মধ্যে সমুদ্রের ধারে এমনি একটি জায়গার কথা আছে যেখানে একটি বাতি ঘরকে ঘিরে গাং চিলেরা আসর জমায়। কিন্তু সে বাতিঘর দিনের বেলায় দেখা যায় না।

রীতিমত ভুতুড়ে ব্যাপার আর কী। ভুতুড়ে ব্যাপার বলেই আমি তা বিশ্বাস করি না।

—ভুতুড়ে ব্যাপারে আমারও বিশ্বাস নেই মিস্টার মুর্গেশন। কিন্তু আমার ধারণা কাছেই কোথাও পর্তুগীজরা এদেশেই আসার আগে এখানকার রাজা একটি বাতিঘর বানিয়েছিলেন।

—তা হতে পারে। কিন্তু তা কী আর আস্ত আছে এখন! হয়তো সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে।

—সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে যাক বা সমুদ্রের ধারের বালির সঙ্গে মিশে থাক, তার চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় গেলে তার সন্ধান পাব।

—প্রশ্নের উত্তর এখানকার জেলেরাই দিতে পারবে।

মুর্গেশন চলে গেলে পর সুবীর বললে, চল, এখানকার জেলেদের সঙ্গে আলাপ করা যাক।

কুনাল হতবুদ্ধির মত তাকিয়েছিল সুবীরের দিকে। সে বললে, বাতিঘরকে ঘিরে গাং চিলেরা আসর বসায়—তারা আমাদের কোন কাজে আসবে সুবীরদা?

—তারা শুধু নয়, বাতিঘরটাও আমাদের কাজে আসবে। কী করে তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঐ বাক্সের ওপরে—

চুপ করো সুবীরদা!—সুবীরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে কুনাল ঃ ও সব কথা আমাদের কাজকর্ম চুকে যাওয়ার পর বলো। এখন মনে রেখ, দেওয়ালেরও কান আছে।

সুবীর অবাক হয়ে কুনালের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, কিন্তু তুমি, আমি ও ডাক-বাংলোর চৌকিদার ছাড়া আর কেউই তো নেই এখানে.........

—কাল পর্যন্ত তাই জানতাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—বলে থামল কুনাল।

কী মনে হচ্ছে?—সুবীর উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—এখন থাক সে কথা সুবীরদা।

—ঠিক আছে, এ নিয়ে আর কোন আলোচনা করব না। এখন চল, যাওয়া যাক জেলেদের আড্ডায়।

—জেলেদের আড্ডায় কেন সুবীরদা?

—ঐ বাতিঘরের খবর নিতে হবে না! দাঁড়াও, চৌকিদারকে ডাকি।

চৌকিদারকে ডেকে জেলেদের আড্ডার খবর নেয় সুবীর। চৌকিদার বললে, এখান থেকে মাইল খানেক দূরে একদল জেলে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকে। ওখানে গিয়ে ওদের সর্দারের সংগে দেখা করুন। আশি বছরের বুড়ো—এখানকার সব খবরই রাখে।

ঠিক আছে, ওখানেই যাব আমরা।—সুবীর উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে।

কিন্তু যাবার জন্য সুবীর ও কুনাল তৈরি হতেই আকাশে মেঘ ঘনায়—ঘন কালো মেঘ। সংগে সংগে প্রচন্ড ঝড় শুরু হয়। এই ঝড়ের দরুন পুরো দুদিন দুরাত ডাকবাংলোয় বন্দী হয়ে থাকে তারা।

॥ ছয় ॥

সমুদ্রের ধারে ঝাউগাছের পাতা দিয়ে তৈরী ঝুপড়ি। কাছেই জেলেদের কয়েকটি নৌকো বালির ওপরে তুলে রাখা হয়েছে। সমুদ্রের ধারে নোঙর করা আছে কয়েকটি বড়ো বড়ো নৌকো।

ঝুপড়ির মধ্যে কয়েকজন ছেলে মাছ ধরতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। তাদের মধ্যে আছে একজন আশি বছরের বুড়ো। বোধ হয় সে-ই সর্দার। দুহাত নেড়ে সে সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছে।

সুবীর কুনালের হাত ধরে এই ঝুপড়ির দিকে এগিয়ে আসে। তাদের দুজনকে দেখে জেলেদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়—তারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তাদের দিকে।

বুড়ো সর্দারের সামনে দাঁড়িয়ে সুবীর ভাঙগা ভাঙগা মলয়ালম ভাষায় বললে, সর্দার, তুমি তো এ সমুদ্রের সবই জান। তুমি শুধু এখানকার জেলেদের নয়, সমুদ্রেরও সর্দার।

নিমেষে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সর্দারের মুখ। সে গদ-গদ স্বরে বললে, জানি বৈ কি—এ সমুদ্রের সব জানি আমি। কোথায় কী মাছ পাওয়া যাবে শুধু তাই নয়, মুক্তার খবরও রাখি। মুক্তা-ঝিনুক চাই নাকি তোমাদের?

সুবীর বললে, না সর্দার, মুক্তা আমাদের চাই নে। আমরা চাই একটি বাতিঘরের ঠিকানা। সেই বাতিঘর যার চারদিকে গাঙ চিলেরা ঝাঁক বেঁধে থাকে।

সংগে সংগে গম্ভীর হয়ে ওঠে সর্দারের মুখ। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললে, অমন কোন বাতিঘরের খবর তা আমি রাখি নে বাবু!

মৃদু হেসে সুবীর বললে, তোমার মুখের ভাবে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তুমি খবর রাখ ... হয়তো গিয়েছ সেখানে...

না না, কক্ষনো না।—সর্দার শিউরে উঠে বললে : অমন ভুতুড়ে জায়গায় আমি কখনোই যাই নি—যেতে পারি না!

—যাও নি তো জানলে কী করে যে জায়গাটি ভুতুড়ে!

—না গিয়েও কী জানা যায় না!

—তা হলে জায়গাটির হদিস তুমি আমাকে দিতে পার?

এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয় না সর্দার।

পকেট থেকে একটা এক শো টাকার নোট বের করে সুবীর বললে, এ দেখ সর্দার, একশো টাকার নোট। এটা আমি তোমাকে দেব যদি জায়গাটির হদিস আমাকে দাও।

চক চক করে ওঠে সর্দারের চোখ দুটি। সে সুবীরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললে, ওটা আমাকে দাও তুমি—আমি আমার জেলের দলের মধ্যে একজনকে হুকুম দিচ্ছি, সে তোমাদের ওখানে নিয়ে যাবে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ বাবুজি, যারা ওখানে যায়, তারা ফেরে না— তোমরাও ফিরবে না।

সুবীর বললে, যে জেলেটি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সে-ও নিশ্চয়ই ফিরবে না।

—না ফিরবে না! সে না ফিরলেও কোন ক্ষতি নেই, কারণ তাকে আমি হাঙগর দিয়ে খাওয়াব ভাবছিলাম। এই একটু আগেই আমি আমার লোকদের বলছিলাম ওর হাত-পা বেঁধে গভীর জলের মধ্যে হাঙগরদের আড্ডায় ওকে রেখে আসতে।

—কেন?

—অপরাধ করেছে সে। তার শাস্তি তাকে দিচ্ছি।

—এরা অপরাধ করলে তার শাস্তি বুঝি তুমিই দাও?

—হ্যাঁ। এদের দন্ডমুন্ডের কর্তা আমি—অপরাধীর সাজা আমিই দিই।

তারপর সর্দার তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটিকে উদ্দেশ্য করে বললে, যাও, তুমি এদের ঐ গাঙ চিল পাহারা দেওয়া বাতিঘরে নিয়ে যাও। ওখানে ওদের পেঁছে দেওয়ার পরও যদি বেঁচে থাক তো বেঁচে গেলে ....

বেঁচে যে ফিরব না সে তো তুমিই জানোই সর্দার!—যুবকটি ম্লান হেসে বললে : ভূতের খপ্পরে পড়ার পর কী আর—

—বরুণদেব দয়া করলে তুমি বেঁচে ফিরে আসতেও পার। যদি বেঁচে অক্ষত শরীরে ফিরে আস, তা হলে জানব যে তুমি নির্দোষ।

যুবকটি সুবীরের দিকে তাকিয়ে বললে, আসুন বাবুজী আমার নৌকোয় আসুন। ছোট ডিঙ্গী, কষ্ট হবে একটু...

তোমার ডিঙিগতে নিয়ে যাবে কেন!—সর্দার সুবীরের হাত থেকে একশো টাকার নোটটি তুলে নিয়ে বললে : নৌকো করে নিয়ে যাও।

তোমার নৌকো!—সর্দারের মুখের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো যুবকটি : আমরা যদি না ফিরি, নৌকোটা ফিরে পাবে কী করে?

—জানি আমার নৌকো আমি ফিরে পাব না। সে বাবদে আমি বাবুজীর কাছ থেকে আরও দুশো টাকা নেব। এই দুশো টাকা অবশ্য জমা থাকবে আমার কাছে। যদি তোমরা বেঁচে বর্তে নৌকোটা নিয়ে ফিরে আস, টাকাটা বাবুজীকে আমি ফেরৎ দিয়ে দেব।

—ঠিক আছে, টাকাটা নিয়ে নাও বাবুজীর কাছ থেকে কিন্তু আগে আমাকে বুঝিয়ে দাও কোথায় আছে বাতিঘরটা।

—দিচ্ছি বুঝিয়ে, এদিকে এস।

বলে সে লোকটাকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে তাকে কি সব বলল। তারপর উত্তর দিকে হাত বাড়িয়ে বোধ হয় বুঝিয়ে দিল যে তাকে সেদিকেই যেতে হবে।

মিনিট পাঁচেক ধরে লোকটার সঙ্গে কথা বলার পর সর্দার সুবীরের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দেয়। সুবীর তার ব্যাগ থেকে আরও দুশো টাকা বের করে সর্দারের হাতে রাখে।

এবারে যাও বাবুজী পেম্মনের সঙ্গে।—সর্দার সুবীরের কাঁধে হাত রেখে বললে ঃ ভগবান বরুণদেব তোমাদের সহায় হোন ....

পেম্মন সুবীরের দিকে চেয়ে বললে, পরশু ভোরে রওনা হব বাবু—আজ ও কাল দিন ভাল নয়—তা ছাড়া কাল জলদেবতার মন্দিরে পুজো দেব ....

দিনক্ষণ দেখে, পুজো দিয়ে রওনা হবে মানে!—সর্দার ঝাঁজালো স্বরে বলে ওঠে ঃ আট-ঘাট বেঁধে যেতে চাও, যাতে বেঁচে বর্তে ফিরে আস! না, আমি সেটি হতে দিচ্ছি নে—কাল ভোরেই তোমাদের রওনা হতে হবে!

মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে পেম্মন বললে, আমি বেঁচে-বর্তে ফিরি তা তুমি না চাইতে পার—কিন্তু বাবুরা তো কোন দোষ করেন নি, তাঁরা যাতে বহাল তবিয়তে ফিরে আসেন আমাদের সেটা দেখা উচিত। এই বাবুটির জন্যই আমি দিন দেখে, পুজো-আর্চা করে রওনা হতে চাইছিলাম ....

সর্দার আর কিছু না বলে চলে গেল।

পেম্মন বললে, আমিও চলি বাবুজী। পরশু খুব ভোরে চলে আসবেন এখানে আপনারা।

ডাক-বাংলোতে ফেরার পথে কুনাল বললে, ঐ লোকটাকে ভাল করে দেখেছ তো সুবীরদা?

দেখেছি বৈ কি।—সুবীর জবাব দিল ঃ টিপিক্যাল একজন জেলে ....

—একজনের সঙ্গে লোকটার চেহারার মিল আছে।

—মিল থাক বা যাই থাক, লোকটা জেলে ছাড়া আর কিছু নয়।

কয়েক সেকেন্ড নিঃশব্দে হাটবার পর কুনাল বললে, ঐ লোকটার বদলে অন্য কোন জেলেকে নিয়ে গেলে হয় না সুবীরদা!

সুবীর অবাক হয়ে কুনালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কেন, ঐ লোকটাতে তোমার আপত্তি কিসের! তাছাড়া ঐ ভুতুড়ে বাতিঘরের দিকে যেতে অন্য কোন জেলে কী আর রাজি হবে।

কুনাল আর কিছু না বলে চুপচাপ হাঁটতে থাকে।

ডাক-বাংলোতে ফিরেই চিঠি লিখতে বসে গেল কুনাল। সুবীরকে সে বললে যে তার বাবাকে সে চিঠি লিখছে। বাবাকে ছাড়া সে মুর্গেশনকেও একটা চিঠি লিখল—সে কথা অবশ্য বলল না সে সুবীরকে।

॥ সাত ॥

নির্দিষ্ট দিন ভোরে পেম্মনকে অনুসরণ করে সুবীর ও কুনাল সমুদ্রের ধারে নোঙর করা বড়ো নৌকোটিতে গিয়ে উঠল। সমুদ্রের জলের মতই নৌকোটির রঙ নিবিড় নীল। তার পালের রঙও নীল। সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিলে তাকে সমুদ্র থেকে তফাৎ করা যাবে না।

পেম্মন নোঙর খুলে নৌকোটা ছেড়ে দিতেই সুবীর বললে, আগাগোড়া সব নীল রঙ লাগিয়ে রেখেছ—নৌকোটাকে তো সমুদ্র থেকে তফাৎই করা যাবে না!

তা তো যাবেই না।—পেম্মন বললে ঃ তফাৎ করা যায় না বলেই মাছ ও হাঙরে নিশ্চিন্তমনে চলে আসে নৌকোর দিকে এবং জালের মধ্যে কাতারে কাতারে ধরা পড়ে যায়।

—কিন্তু যদি কোন বিপদ ঘটে—কাছাকাছি নৌকো বা জাহাজের যাত্রীদের নৌকোটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে কী করে?

—লাল নিশানা আছে বাবুজী, তাই তুলে দেব।

নৌকোর মাঝখানে ছোট্ট একটি কামরা আছে—জাহাজের কেবিনের ক্ষুদে সংস্করণ। সেই কেবিনের মধ্যে গিয়ে বসল সুবীর ও কুনাল। কেবিনের সামনের দেওয়ালের অনেকটা কাঁচ দিয়ে মোড়া। তার মধ্য দিয়ে তারা দেখতে পায় যে নৌকোটা উত্তর দিকে যাচ্ছে। নীল সমুদ্র। তীরের সাদা বালির পাশে ঝলমল করছে নিবিড় নীল জলের বিস্তার। পশ্চিম দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে, জল শুধু জল। দেখে মনে হয় যেন পূর্বদিকের ডাঙ্গা বাদ দিলে সারা পৃথিবী জুড়ে জল ছাড়া আর কিছুই নেই। জলের মধ্যে গতির আবেগ আছে। কোনও নির্দিষ্ট দিকে স্রোত বোঝা যায় না, কিন্তু যতদূর নজর যায় ঢেউয়ের ওঠা নামার শেষ নেই। ঢেউয়ের পর ঢেউ। অনিঃশেষ জলরাশির মধ্যে অন্তহীন উত্থান ও পতন। এমনি অবিশ্রান্ত চঞ্চলতা কুনালের মনকে দোলা দেয়। জল মানেই কী অবিশ্রান্ত চলা ও চাঞ্চল্য!

গতি বা চাঞ্চল্য বাদ দিলে সমুদ্র সমুদ্রই নয়। কাজেই সমুদ্র মানে জল শুধু নয়, জলের সঙ্গে ঢেউ—ঢেউয়ের ওঠা-নামা এবং ঢেউ বেয়ে জলের এগিয়ে চলা।

ঢেউ যেন জলের মুকুট। ঢেউয়েরও মুকুট আছে—ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা।

পূর্বদিকে অর্থাৎ ডানদিকে ডাঙ্গা। সাদা বালির বেলাভূমি। জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে তার আয়তন সরু ও চওড়া হয়। এখন ভাঁটার সময়। নীল জলকে ছুঁয়ে আছে সাদা বালির ফালি। জলের মত বালিও ঢেউ-খেলানো। বালির শেষে খাড়া পাড়ের ওপরে নারকেল গাছের সমাবেশ।

কোন গ্রাম ও লোকালয় চোখে পড়ছে না। নির্জন সমুদ্রতীর। সমুদ্রও ফাঁকা। কাছাকাছি কোন নৌকো বা জেলে ডিঙ্গি নেই। এমনও হতে পারে যে এদিকে সমুদ্রের তীর ঘেঁষে যেতে কেউ সাহস পায় না।

সমুদ্রের ঢেউ যত প্রতিকূল হোক নৌকো চলছে। অর্থাৎ পেম্মন চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী ভাবে সে চালিয়ে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না, কারণ তাকে দেখা যাচ্ছে না। তারা যখন এই কেবিনে ঢোকে তখন সে কেবিনের ডান পাশে ছিল। ওপাশে কেবিনের চেয়েও ছোট একটি কামরা আছে—সেই কামরার দরজার সামনে সে তখন দাঁড়িয়ে ছিল।

নৌকোর গতি হঠাৎ বেড়ে যায়। সুবীর চমকে উঠে বললে, এ কী—নৌকো এত জোরে চলছে কেন?

তাই তো।—কুনালও হতবুদ্ধি।

কান পেতে কী যেন শোনে সুবীর। তারপর অস্ফুট

স্বরে সে বললে, শুনেছ কুনাল?

সুবীর যা শুনেছে তা অবশ্য শুনতে পায় না কুনাল। সমুদ্রের ঢেউ ছাড়া অন্য কোন শব্দ তার কানে আসে না।

সুবীর বললে, চল বাইরে যাই।

বাইরে এসে পেম্মনকে দেখতে পায় না ওরা।

পেম্মন কী উধাও হয়ে গেল নাকি!—কুনাল আর্তস্বরে বলে উঠল ঃ তা নৌকোটাকে চালাচ্ছে কে!

সুবীর বললে, ঐ পাশের কেবিনের মধ্যে থেকে পেম্মনই চালাচ্ছে। বুঝলে কুনাল, এটা সাধারণ নৌকো নয়। চল ভেতরে গিয়ে দেখি।

ঐ কেবিনের দরজা খোলাই ছিল। সুবীর ও কুনাল ভেতরে ঢুকে দেখে যে পেম্মন চাকা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এ ধরনের চাকা মোটর বোটের মধ্যে দেখা যায়। নৌকোর হালটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে—এই চাকা।

কেবিনের মধ্যে ঢুকতেই মৃদু যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পায় কুনাল ও সুবীর। পেম্মনের দিকে তাকিয়ে সুবীর বললে, এটা তা হলে মোটর বোট।

হ্যাঁ স্যার।—ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে জবাব দিল পেম্মন ঃ এইমাত্র আপনাদের কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কী করে ডেকে আনি আমি আপনাদের এখানে—কারণ আমি তো আর 'রাডার'-এর চাকা ছেড়ে চলে যেতে পারি না।

সুবীর গম্ভীর মুখে বললে, কী দরকার তোমার আমাদের কাছে?

—তেমন কিছু নয়, আপনাদের নকশাটা দেখতে চাইছিলাম।

—নকশা! আমার কাছে তো কোন নকশা নেই! তা ছাড়া নকশার দরকার কী তোমার! বাতিঘর কোথায় তা তো তুমি জানোই।

আমতা আমতা করে পেম্মন বললে, তা অবশ্য জানি—মানে সর্দারের কাছ থেকে তার হদিস মোটামুটি পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু নকশাটা দেখতে পেলে সুবিধা হত।

কঠোর হয়ে ওঠে সুবীরের মুখ। পেম্মনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বললে, তোমাকে আগেই বলেছি আমি যে আমার কাছে কোন নকশা নেই।

—নকশা না থাক, আর কিছু......

—আর কিছুই নেই। তবে জায়গাটির বিবরণ আমার জানা আছে—তুমি যাতে চিনে নাও, তার জন্য সাহায্য করতে পারি তোমাকে।

—তা হলে তো আপনাকে আমার কাছেই থাকতে হয়।

—তা না হয় থাকব।

বলে সুবীর কুনালের মুখের দিকে তাকিয়ে ইশারা করে। কুনাল সঙ্গে সঙ্গে পেম্মনের কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাশের কেবিনে গিয়ে ঢোকে। তারপর তাদের সুটকেস ও খাবারের ঝুড়ি নিয়ে সে আবার পেম্মনের কেবিনে ঢোকে।

কুনাল আবার যখন পেম্মনের কেবিনে ঢুকল, সুবীর তখন গম্ভীর মুখে বসে আছে পেম্মনের পাশে। কুনাল কেবিনে ঢুকতেই সে তাকে ইশারা করে দরজার কাছে বসার জন্য। কুনাল সেখানে বসে পড়ে।

॥ আট ॥

বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছিল কুনাল। যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সে ধড়মড় করে উঠে বসে দেখে যে পেম্মন ও সুবীর বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। দুজনের মুখে চোখে উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে।

নৌকো তখন চলছে না। তার এঞ্জিনের কোন শব্দ নেই। বাইরে সমুদ্র অশান্ত হয়ে উঠেছে। ঢেউগুলো আকারে অতিকায় হয়ে উঠে নৌকোটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কুনালের ভয় হচ্ছে নৌকোটা বুঝি ডুবেই যাবে।

পেম্মন ও সুবীরের দৃষ্টি অনুসরণ করে কুনাল দেখল যে একটা পাহাড়ের নীচে নৌকোটা দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়টা সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত জেগে আছে।

ফেনিল উচ্ছ্বাসে সমুদ্র উথাল পাতাল হচ্ছে—কিন্তু তবু নৌকোটি নিশ্চল। কুনাল বুঝতে পারে যে নৌকোটিকে পাহাড়ের পাথরের সঙ্গে শক্ত করে নোঙর করা রয়েছে।

খানিকক্ষণ ব্যগ্র দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকার পর পেম্মন সুবীরকে বললে, সর্দার বলেছিল যে এই পাহাড় থেকে বাতিঘর দেখা যাবে। কিন্তু কই, কোথাও কোন বাতিঘর দেখতে পাচ্ছি না। আপনার নকশাটা বের করুন না বাবুজী, হয়তো তার মধ্যে বাতিঘরের হদিস দেওয়া আছে।

তোমাকে আমি আগেই বলেছি যে আমার কাছে কোন নকশা বা নকশা-জাতীয় জিনিস নেই!—সুবীর ঝাঁজালো স্বরে বলে উঠল ঃ তা ছাড়া এত সহজে বাতিঘরটা দেখতে পাবে তা কী হয়। ভাল করে খোঁজ, তবে না খুঁজে পাবে!

—কিন্তু কোথায় খুঁজব?

—ঐ পাহাড়টির চারদিকে খুঁজতে হবে।

—নিশ্চয়ই খুঁজতে হবে। তা ছাড়া সমুদ্রের মধ্যেও খোঁজাখুঁজি করতে হবে। নৌকোর সঙ্গে ছোট্ট একটি ডিঙ্গি-নৌকা বাঁধা আছে—আসুন ঐ নৌকোতে করে যাই.........

কুনাল এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে পেম্মনের মুখের দিকে। যদিও ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে কথা বলছিল, তবুও কুনালের মনে হচ্ছিল যে সে ইংরেজী ভালোই জানে। তা ছাড়া তার কথা বলার ভঙ্গীটাও তার কাছে পরিচিত। ঠিক যেন—

কুনাল।—সুবীরের ডাকে কুনালের চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। সে সুবীরের দিকে তাকায়।

সুবীর বললে, পেম্মন ও আমি ডিঙ্গিতে করে একটু ঘুরে আসি—তুমি ততক্ষণ—

আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।—সুবীরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কুনাল বললে ঃ তার আগে একটু খাওয়া-দাওয়া করে নেওয়া যাক।

—ঠিক আছে, খেয়ে নেওয়া যাক।

—খাবার আমিই সাজাচ্ছি সুবীরদা—তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও।

তারপর পেম্মনের দিকে তাকিয়ে কুনাল বললে, তুমিও খাবে আমার সঙ্গে।

খাবারের ঝুড়ি থেকে খাবার বের করে নেওয়ার পর কুনাল ছোট একটি বাক্স খুলে ফেলল। বাক্সটিতে সুবীর ওষুধ-বিষুধ সাজিয়ে রেখেছে। বাক্সটা হাতড়ে একটি শিশি

বের করে সে।

খানিকক্ষণ বাদে সকলে খেতে বসে গেল। টিনের মধ্যে সংরক্ষিত রান্না করা মাংস, স্যান্ডুইচ ও কলা। এমনি গোগ্রাসে খেল পেম্মন যে মনে হল বুঝি দিন দুই তার খাওয়া হয় নি।

খাওয়া শেষ হলে পর সুবীর বললে, চল পেম্মন, যাওয়া যাক।

পেম্মন মৃদু হেসে বললে, বড় হেভি খাওয়া হয়ে গিয়েছে বাবুজী—একটু বিশ্রাম করে নিলে হত না!

—বিশ্রাম করতে চাও তো কর বিশ্রাম, কিন্তু পাঁচ মিনিটের বেশি নয়।

—হ্যাঁ বাবুজী, পাঁচ মিনিটের বিশ্রামই যথেষ্ট। কিন্তু এ কী বাবুজী, আমার যে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে!

—পড় না শুয়ে, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।

পেম্মন আর কোন কথা না বলে সটান শুয়ে পড়ল মেঝের ওপরে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে।

ও যে ঘুমিয়ে পড়ল কুনাল!—সুবীর পেম্মনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললে ঃ ওর হঠাৎ এমনি ঘুম পেয়ে গেল কেন বলতে পার?

কুনাল বললে, ঘুমোক না—তাতে ক্ষতি কী! চল তুমি ও আমি ডিঙিতে করে বাতিঘরটা খুঁজে বের করি।

—কিন্তু ও যে বলেছিল আমাদের সঙ্গে যাবে!

—তুমি কী চাও ঐ লোকটা আমাদের গুপ্তধন খোঁজার ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ুক!

—না, তা চাই নে।

—তা হলে লোকটাকে ঘুমোতে দিয়ে চল আমরা যাই।

কেবিনের বাইরে এসে চারদিকে তাকাল সুবীর ও কুনাল। সমুদ্রের বুকে দ্বীপের মত জেগে থাকা ডাঙ্গা ছাড়া চারদিকে জল শুধু জল। তীর থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছে তারা।

কিন্তু কোথায় বাতিঘর! নিঃসীম জলরাশির মধ্যে নীল ঢেউ ও সাদা ফেনা ছাড়া আর কিছু নেই। তা হলে কী এই পাহাড়ের মধ্যে কোথাও বাতিঘর বসানো আছে! কুনাল পাহাড়ের দিকে তীক্ষ্ন-দৃষ্টিতে তাকায়।

পাহাড়ের দিকে দেখছ কী!—সুবীর বললে ঃ বাতিঘরটা পাহাড়ে নেই।

তা হলে কোথায় আছে!—কুনাল হতবুদ্ধির মত তাকাল সুবীরের মুখের দিকে।

—অন্ধকার হোক .... তারপর দেখতে পাবে ......

অন্ধকারের মধ্যে কী দেখতে পাবে তা বুঝতে পারে না কুনাল। কিন্তু সে আর কোন প্রশ্ন না করে অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করে।

কাঁধের ঝোলা থেকে দূরবীন বের করে সুবীর দূরবীনের মধ্য দিয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে। নিঃসীম জলরাশির মধ্যে ও রকম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী দেখছে সুবীর? অন্ধকারের মধ্যে যা প্রকাশ পাবে দিনের আলোয় কী তার আভাস পাচ্ছে কিছু?

ব্যগ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুবীরের মুখের দিকে তাকায় কুনাল। কিন্তু সুবীর অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তার মুখের ভাবে ভয় পেয়ে যায় কুনাল।

কী হয়েছে সুবীরদা?—কুনাল ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে।

সুবীর দূরবীনটা কুনালের হাতে দিয়ে বললে, দক্ষিণদিকে তাকিয়ে দেখ।

দূরবীন চোখে দিয়ে দক্ষিণদিকে অনেক দূরে একটা মোটর লঞ্চ দেখতে পায় কুনাল।

দেখেছ তো!—সুবীর উত্তেজিত স্বরে বললে।

দূরবীনটা সুবীরকে ফেরত দিয়ে কুনাল বললে, হ্যাঁ দেখেছি—একটা মোটর লঞ্চ।

—এদিকেই আসছে না!

—আসুক না। এসে পেম্মন ছাড়া আর কাউকে পাবে না নৌকোর মধ্যে। চল আমরা ডিঙ্গিটা নামিয়ে ফেলি ....

॥ নয় ॥

ছোট্ট জেলে-ডিঙি। কুনালের মনে হল সমুদ্রের সীমাহীন জলোচ্ছ্বাস তাকে যেন গ্রাস করে ফেলবে। প্রথম প্রথম একটু ভয় করলেও ক্রমশঃ সে যেন সমুদ্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে—তার মনে হয় সে যেন চারপাশের জলোচ্ছ্বাসের মত সমুদ্রেরই অবিচ্ছেদ্য-অংশ। তারপর আর তার কোন ভয় থাকে না। সে মুখ তুলে তাকায় সুবীরের দিকে। সুবীর মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বললে, ভয় করছে না তো?

না।— কুনাল জবাব দিল।

—সমুদ্রের মধ্যে পাড়ি দেব কিন্তু।

—তা দাও কিন্তু যাবে কোন দিকে?

কুনালের হাতে দূরবীনটা তুলে দিয়ে সুবীর বললে, দূরবীন দিয়ে দেখে তুমিই ঠিক কর কোন দিকে যাব আমরা।

দূরবীন চোখে দিয়ে দূরের সমুদ্রকে কাছে পায় কুনাল। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে কোথাও কোন ব্যতিক্রম সে দেখতে পায় না।

বল কোন দিকে যাওয়া উচিত আমাদের।—সুবীর মৃদু হেসে বললে।

কোথাও তেমন কিছু তো দেখতে পাচ্ছিনে।—কুনাল বললে ঃ জল শুধু জল ....

কিন্তু ওখানে ওগুলো কী!—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে কুনালের গলার স্বর।

—ভাল করে দেখ তুমি।

—মনে হচ্ছে এক ঝাঁক সাদা রঙের পাখি.........

—ওগুলোই গাঙ চিল।

—সমুদ্রের মধ্যে এক জায়গায় ঝাঁক বেঁধে আছে ওরা। জলের মধ্যেই আছে।

—ওদিকেই যাব! কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তো বাতিঘর!

—ওদিকে যেতে যেতেই বাতিঘর দেখতে পাব। তুমি ডিঙ্গিটার দাঁড় ধর—আমি হাল ধরছি।

দাঁড় ধরলেও কুনালকে দাঁড়ের ওপরে বেশি বল প্রয়োগ করতে হয় না—কারণ সুবীর নৌকো যেদিকে চালাতে চাইছিল, সমুদ্রের স্রোত তখন সেদিকেই বইছিল। দাঁড় চালাতে কুনালের কোন পরিশ্রম না হলেও সুবীরের হাল ধরে থাকতে মেহনত হচ্ছিল। নৌকোটা সোজা যাতে গাঙ চিলের ঝাঁকের দিকে এগিয়ে যায়, ঠিক সেভাবেই হাল ধরেছিল সুবীর।

গাঙ চিলগুলো ওখানে ঝাঁক বেঁধে আছে কেন সুবীরদা?

—কুনাল প্রশ্ন করে।

ওখানে ওদের আস্তানা বলে ওরা ওখানে ঝাঁক বেঁধে আছে।—সুবীরের জবাব।

—জলের ওপরে ওদের আস্তানা—বল কী সুবীরদা!

—জলের ওপরে তো ঠিক নয় ....

—কিন্তু আমি তো জল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে—দূরবীনের মধ্য দিয়েও শুধু জলই দেখেছি।

কুনালের এই কথার উত্তরে সুবীর একটু কেবল হাসল।

আকাশ মেঘে ঢাকা। কাজেই কখন সূর্য অস্ত গেছে বুঝতে পারে না সুবীর ও কুনাল। মেঘের আবরণের দরুন পশ্চিম আকাশের সোনালী রঙও চোখে পড়ে না। ক্রমশঃ আঁধার ঘনিয়ে আসে। আকাশ থেকে কালো ছায়া নেমে এসে সমুদ্রের নীল রঙের ওপরে যেন কালো চাদর বিছিয়ে দেয়। নীল সমুদ্র দেখতে দেখতে কালো সমুদ্র হয়ে ওঠে। মেঘে-ঢাকা আকাশের রঙও কালো হয়ে যায়। তার-পর দেখতে দেখতে আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানকার শূন্য-স্থান যেন অন্ধকার দিয়ে পূর্ণ হয়। আকাশ ও সমুদ্র জোড়া একটানা নিশ্চিন্ত অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই যেন নেই।

অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই অন্ধকারের মধ্যে লোপ পেলেও গাঙ চিলের ঝাঁকটি যেন অন্ধকারের বুকে শ্বেত পদ্মের মত ফুটে থাকে।

হঠাৎ এক পরম বিস্ময় আত্মপ্রকাশ করে অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে—গাঙ চিলের ঝাঁকের শুভ্রতাকেও তা করে ফেলে আচ্ছন্ন ....

॥ দশ ॥

অন্ধকার পুরোপুরি ঘনিয়ে আসার আগে গাঙ চিলের ঝাঁকটি যেখানে শ্বেত পদ্মের মত ফুটে ছিল, সেখানে একটি রক্ত-রঙের আলোর স্তম্ভ সমুদ্রের বুক ফুঁড়ে উঠল আকাশ পানে। কুনাল স্তম্ভিত ও বিস্মিত। সে ভেবে পায় না এ কিসের আলো—সমুদ্রের বুকে কোথা থেকে আসছে।

এ কিসের আলো সুবীরদা?—উত্তেজিত স্বরে প্রশ্ন করে কুনাল।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সুবীর এক দৃষ্টে আলোর স্তম্ভ-টির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে ঐ আলোর দিকে তাকিয়ে থাকার পর সুবীর বললে, এই তা হলে বাতিঘর!

বাতিঘর কোথায় সুবীরদা?—প্রায় চীৎকার করে বলে কুনাল ঃ এ তো শুধু আলো ....

—আলোর একটা উৎস আছে নিশ্চয়ই ......

—আলো তো জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে!

—জল নিশ্চয়ই আলোর উৎস হতে পারে না।

—তা হলে কী?

একটু বাদেই দেখতে পাবে।

আলোর স্তম্ভটি লক্ষ্য করে নৌকোটি চলে। সমুদ্রের স্রোত যেন ঐ দিকেই ধেয়ে যাচ্ছে—কাজেই নৌকোটা বেশ দ্রুতগতিতে ঐ আলোর স্তম্ভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

আলোর স্তম্ভটির কাছাকাছি এসে আর একটি বিস্ময়-কর দৃশ্যের মুখোমুখী হল সুবীর ও কুনাল। আলোর নীচে অন্ধকার। এই অন্ধকারের আকারও স্তম্ভের মত। একটি কালো পাথরের স্তম্ভ বা স্তম্ভের আকারের পাহাড়, যা সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে। আলোর স্তম্ভটির শুরু এই কালো পাহাড়ের মাথা থেকে।

কিন্তু এতক্ষণ কোথায় ছিল এই পাহাড়?

এটা শুধু কুনালের মনের প্রশ্ন নয়, সুবীরের মনেও এই প্রশ্ন জাগে।

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে পাহাড়কে ঘিরে ফেনিয়ে ওঠা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে সুবীর। এই জলোচ্ছ্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুবীরের হঠাৎ মনে হল যেন ভাঁটার টানে জল নেমে যাওয়াতেই এই পাহাড়টা আত্মপ্রকাশ করেছে। এতক্ষণ জোয়ারের জল-রাশির মধ্যে পাহাড়টি ডুবেছিল। যে গাঙ চিলের ঝাঁককে সুবীর ও কুনাল সমুদ্রের মধ্যে দেখেছে, আসলে তারা পাহাড়ের চূড়াকে ঘিরে জটলা পাকিয়েছিল। পাহাড়ের চূড়ার দিকে কয়েকটি গুহার মধ্যে তাদের এখন দেখতে পায় কুনাল।

এই পাহাড় থেকেই বেরিয়ে আসছে রক্ত-রঙিন আলো —পাহাড়ের চূড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে যেন। অবিকল যেন একটি বাতিঘর।

সুবীর বললে, এই আলো কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারলেই ....

বলতে বলতে থেমে যায় সুবীর।

বুঝতে পারলে কী?—কুনাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুবীরের মুখের দিকে।

—বুঝতে পারলে কী সে পরের কথা—এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে আমরা উঠব কী করে।

—তাই তো সুবীরদা! এই পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ওঠা তো অসম্ভব ব্যাপার!

ততক্ষণ সমুদ্রের জল আরও নেমে গিয়ে পাহাড়ের আরও খানিকটা অংশকে উদঘাটিত করে। সমুদ্রের জলের নেমে যাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে পাহাড়ের উঁচু হয়ে ওঠা যেন এই পাহাড়ে চড়ার সমস্যাটির সমাধানের হদিস দেয়। সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সুবীরের মুখ। সে বললে, কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা কর—পাহাড়ে চড়ার চেষ্টা না করেই আমরা চড়াও হব পাহাড়ের চূড়ায়।

কী করে!—কুনালের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে ওঠে।

—এখন ভাঁটা চলছে। ভাঁটার পর জোয়ার শুরু হবে। জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে জল উঠতে থাকবে—পাহাড়টা ডুবে যাবে। সেই সঙ্গে আমাদের ডিঙিটাও উঠে যাবে—আমরা এই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে যাব। ....

জোয়ার শুরু হল রাত দশটার পর। জলের মধ্যে প্রচণ্ড আবর্ত জাগে। ডিঙির হাল শক্ত করে ধরে রাখে যাতে ডিঙিটা এই আবর্তের টানে ভেসে না যায়।

জল উঠছে। পাহাড় ডুবছে। পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। ঐ তো আলোর স্তম্ভ। পাহাড়ের চূড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসছে উজ্জ্বল রক্ত-রঙের আলো। চোখ ধাঁধানো এই আলোর মধ্যে ঢোকার আগে সুবীর নৌকোটাকে পাহাড়ের গায়ের একটি গুহার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। গুহার মধ্যে ঢুকে নৌকোটা আটকে থাকে। খুব শক্তভাবেই আটকে থাকে যাতে পাহাড় জলে ডুবে

গেলেও নৌকোটা স্রোতের টানে ভেসে না যায়।

পাহাড়ের চূড়ার ওপরে উঠে পড়ে সুবীর ও কুনাল। চূড়াটির আকার গোল। মোটামুটি সমতল—দাঁড়াতে অ-সুবিধে হয় না। চূড়ার মাঝখানে একটি গহ্বর। ঐ গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে রক্ত-রঙের চোখ ধাঁধানো আলো। গহ্বরটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মত দেখতে। এই আলো যেন জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসা লাভার স্রোত।

এই ঠান্ডা আলোর সঙ্গে অবশ্য আগ্নেয়গিরির লাভার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। পাহাড়টাও আগ্নেয়গিরি নয়, কারণ এই লাল আলোয় সুবীর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে যে পাহাড়টা প্রবাল দিয়ে গড়া। লাল আলোয় প্রবালের রঙ বোঝা যায় না। কাজেই পকেট থেকে ছোট টর্চ বের করে তার আলোয় পাহাড়ের প্রবালের স্তূপ পরীক্ষা করে সুবীর। নীল প্রবাল।

পাহাড়টা প্রবালের পাহাড়—অতএব ঐ গহ্বর আগ্নেয়-গিরির জ্বালামুখ নয়। ওটা হয়তো প্রবাল বেষ্টিত লেগুন (lagoon)—কিংবা জল-বাতাসের ক্রিয়ায় ক্ষয়ে গিয়ে উৎ-পন্ন হওয়া গহ্বর।

গহ্বরের কাছাকাছি এল সুবীর ও কুনাল। গহ্বরের মুখটা কাঁচের মত স্বচ্ছ পাথর দিয়ে আটকানো। পাথরটা হয়তো স্ফটিক বা কোয়ার্ট্জ। এই স্বচ্ছ পাথর ভেদ করে বেরিয়ে আসছে লাল আলো। তার মধ্য দিয়ে গহ্বরের ভেতরে তাকাতে সুবীরের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ক্রমশঃ অবশ্য এই চোখ-ধাঁধানো আলো তার সয়ে আসে এবং ভেতরের দিকে তাকাতে আর কোন অসুবিধে হয় না।

॥ এগার ॥

গহ্বরের মধ্যে পরম বিস্ময়। কল্পনারও অতীত এক আশ্চর্য দৃশ্য।

গহ্বরের ভেতরের দেওয়ালগুলি রক্ত-প্রবাল দিয়ে গড়া। একপাশে রক্ত-প্রবালের শিবলিঙ্গ—শিবলিঙ্গের পাশে গৌরীর মূর্তি, রক্ত-প্রবাল খোদাই করা রক্ত-গৌরী। গৌরী মূর্তির দু চোখে দুটি খুব বড়ো আকারের রক্ত বর্ণের চুনী বসানো। আরও চুনী বসানো আছে সামনের দুটি প্রদীপ-স্তম্ভে। প্রদীপ-স্তম্ভ দুটিও রক্ত-প্রবাল দিয়ে তৈরি। তাদের মাথায় রক্ত-চুনী বসানো—ঠিক যেন আগুনের শিখা। আরও রাশি রাশি চুনী রয়েছে শংকর-গৌরীর সামনে বড়ো সোনার থালায়। চুনীর সঙ্গে আছে হীরা, পান্না, নীলা ও মুক্তা। রক্ত-প্রবাল দিয়ে খোদাই করা একটি পূজা-রীর মূর্তিও রয়েছে। সে বসে আছে সোনার আসনে। তার চোখ দুটি নীলা দিয়ে গড়া।

এই রক্ত-রঙিন আলো বেরিয়ে আসছে রক্ত-প্রবাল থেকে। আলোর মধ্যে চুনী পাথরেরও অবদান আছে। রক্ত-প্রবাল ও চুনীর সঙ্গে হীরা-পান্না-নীলা-মুক্তারও দ্যুতি এসে মিশেছে। চোখ-ধাঁধানো আলো, কিন্তু আশ্চর্য রকম স্নিগ্ধ।

সুবীর নির্বাক, স্তম্ভিত। তার পাশে কুনালের চোখ-দুটি বিস্ফারিত।

খানিকক্ষণ এক দৃষ্টে গুহার ভেতরের রক্ত-প্রবাল ও মণি-রত্নের ঘটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর কুনাল বললে, ভেতরে যাবে না সুবীরদা?

যেতে হলে ভেতরে যাবার গুপ্ত-পথের খোঁজ নিতে হবে।—সুবীর জবাব দিল ঃ এখান দিয়ে তো ঢোকা যাবে না!

—কোথায় আছে সেই পথ?

কোমরের সঙ্গে বাঁধা একটি থলি থেকে বাক্সটা বের করে সুবীর বললে, এই গুহা মন্দিরের মধ্যে ঢোকার গুপ্ত-পথের হদিস এই বাক্সের মধ্যে আছে। এই বাক্সটা আসলে এই গুহা-মন্দিরেরই একটা মডেল। এর ওপরে দুটো ফুটো আছে—ট্রেনে ফুটো দুটোর কথা বলেছিলাম তোমাকে, নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি?

—না ভুলি নি। কিন্তু কী হবে ঐ ফুটো দুটো দিয়ে?

ঐ ফুটো দুটোর মধ্য দিয়ে গুহা-মন্দিরের মধ্যে কী কী আছে, ভেতরে ঢোকার গোপন রন্ধ্রপথ ইত্যাদি দেখতে পাবে........

তাই নাকি!—কুনাল উত্তেজিত হয়ে উঠল ঃ কিন্তু এই অন্ধকারে দেখব কী করে!

অন্ধকার কোথায় কুনাল!—সুবীর মৃদু হেসে বললে ঃ এমনি চোখ ঝলসানো লাল আলো রক্ত-প্রবাল থেকে বেরিয়ে আসছে—এই আলোতেই দেখব।

বাক্সটা আলোর মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে সুবীর। ফুটো-দুটোর ওপরে চোখ রেখে বলে, এই তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ভেতরের মন্দির .... শিবলিঙ্গ .... গৌরী-মূর্তি ...... পূজোরী ...... সুড়ঙ্গ পথ ...... অলিগলি ...... উঃ যেন গোলক ধাঁধা।

কিন্তু ভেতরে ঢোকার পথ কই!—কুনাল অধৈর্য হয়ে ওঠে ঃ এই কাঁচের মত পাথর ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকতে হবে কী!

—না, এ পাথর কেউই ভাঙ্গতে পারবে না। ভেতরে ঢোকবার গোপন সুড়ঙ্গ-পথ রয়েছে এই পাহাড়ের একে-বারে নীচে। ভাঁটার সময় জল যেখানে নামে, তারও নীচে...

—তার মানে জলের নীচে নেমে তারপর সুড়ঙ্গ-পথের সন্ধান পাব। কিন্তু আমরা তো ডুবুরীর পোষাক আনি নি, জলের মধ্যে নামব কী করে!

একটা বিশেষ জায়গায় ডুব দিলেই সুড়ঙ্গ-পথে ঢোকার লোহার দরজা পেয়ে যাব। সেই দরজার ওপরে কবজা আছে, তাতে হাত দিয়ে চাপ দিলেই দরজা খুলে যাবে। তার-পর সুড়ঙ্গ-পথে আমরা ঢোকা মাত্র দরজা আবার আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

কুনাল নীচের দিকে তাকিয়ে বললে, এই পাহাড়টা তো একটা চৌকো স্তম্ভের মত খাড়া নেমে গিয়েছে নীচের দিকে—খাড়াই বেয়ে নীচে নামব কী করে সুবীরদা?

যেভাবে উঠেছি, সেভাবেই নামব।—সুবীর জবাব দিল ঃ আমাদের ডিঙ্গিটাতে বসে থাকব—ভাঁটার সময় যখন জল নামবে, তখন ডিঙ্গিশুদ্ধ নেমে যাব।

ততক্ষণে জোয়ারের জল ফেঁপে-ফুলে উঠে পাহাড়টাকে ডুবিয়ে দিয়েছে পুরোপুরি। সুবীরের আশঙ্কা হল বুঝি জলের আবর্ত তাদের পাহাড়ে চূড়ো থেকে ছিটকে ফেলে দেবে। পাহাড়ের চূড়ার ওপরে উবু হয়ে বসে পাথর আঁকড়ে ধরে অনেক কষ্টে আত্মরক্ষা করে তারা। ইতিমধ্যে গুহার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে গাঙ চিলের ঝাঁক। তাদের দুজনকে ঘিরে তারাও বসে পড়ে পাহাড়ের চূড়োর ওপরে।

সমুদ্রের জলে পাহাড়টি পুরোপুরি ডুবে গিয়েছে। কিন্তু পাহাড়ের চূড়ো থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত-রঙের আলো জলের আবরণ ভেদ করে বেরোতে থাকে। জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেও তার দীপ্তি এতটুকু ম্লান হয় না।

॥ বার ॥

ভাঁটা শুরু হয় শেষ রাত্রের দিকে। জল ধীরে ধীরে নেমে যায়।

যে গুহার মধ্যে ডিঙিগটা আটকানো আছে, তার মধ্যে ঢুকে পড়ে সুবীরও টেনে বের করে ডিঙিগটাকে। তারপর কুনালের হাত ধরে তাকে নামিয়ে আনে ডিঙির ওপরে।

ডিঙির মধ্যে পাশাপাশি বসে অপেক্ষা করে সুবীর ও কুনাল। ভাঁটার জলের সঙ্গে ডিঙিশুদ্ধ তারা নেমে যায় ধীরে ধীরে।

ভাঁটা শেষ হতে হতে ভোর হয়। দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় প্রবাল-পাহাড়টিকে। স্তম্ভের আকারের নীল প্রবালের পাহাড়। ভেতরের রক্ত-প্রবালকে বেষ্টন করে আছে নীল প্রবাল। রক্ত-প্রবালের মত জৌলুস না থাকলেও রোদের ছোঁয়া লেগে ঝলমল করে নীল প্রবালের পাহাড়।

দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-প্রবালের লাল আলো নিষ্প্রভ হয়ে যায়—পাহাড়ের মাথায় আর কোন আলো দেখা যায় না।

ওপরে দিকে নয়, এবারে নীচের দিকে তাকাও।—ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলে ওঠে সুবীর ঃ জোয়ার শুরু হওয়ার আগেই সুড়ঙ্গ-পথটিকে খুঁজে বের করতে হবে।

ডিঙি নিয়ে পাহাড়ের চারপাশে খানিকক্ষণ ঘুরপাক খাওয়ার পর এক জায়গায় ডিঙিগটাকে থামায় সুবীর। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় পাহাড়ের নীচে একটি বিশেষ জায়গায়।

এখানে জলের মধ্যে ঘূর্ণী সৃষ্টি হয়েছে এবং নীল প্রবালের মধ্যে লালচে রঙের ছোপ আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঐ ঘূর্ণীর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে সুবীর বললে, আমার মনে হচ্ছে এখানে ডুব দিলেই সুড়ঙ্গ-পথের মুখ পেয়ে যাব। বুঝলে কুনাল, এখানে সুড়ঙ্গ আছে বলেই ভেতরের রক্ত-প্রবালের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

কুনাল বললে, এখন কী করব আমরা সুবীরদা?

—ঐ ঘূর্ণীর মধ্যে ডুব দিয়ে—

চুপ সুবীরদা, চুপ!—হঠাৎ চাপা উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল কুনাল।

কী হয়েছে কুনাল!—ভ্যাকাচাকা খেয়ে সুবীর হতবুদ্ধির মত তাকায় কুনালের মুখের দিকে।

ঐ দেখ।—কুনাল ফিসফিসিয়ে বলে।

কুনালের দৃষ্টি অনুসরণ করে সুবীর পেছন ফিরে দেখে যে পেম্মন জল থেকে ডিঙির ওপরে উঠে এসেছে। তার পরনে সাঁতারুর জাঙিয়া ছাড়া আর কিছু নেই। কোমরে পলিথিনে মোড়া একটি পুঁটলি ঝুলছে। সর্বাঙ্গ জলে ভেজা। চুলের মধ্যে সাদা লবণের ছোপ লেগেছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে সাঁতার কেটে এসেছে এখানে।

পেম্মন!—সুবীর চমকে উঠে বললে।

পেম্মন নই, আমি নটরাজন।—কুনালের মুখের ওপরে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললে নটরাজন ঃ আশা করি তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ?

হ্যাঁ পেরেছি।—কুনাল জবাব দিল।

—দেখতেই পাচ্ছ যে আমি মরি নি। ঐ তরল পদার্থটা তুমি পুরোপুরি আমার শরীরে ইঞ্জেক্ট করতে পার নি..... কাজেই আমি সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম শুধু। আমি জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে যদি নৌকোটাকে উল্টে দিয়ে আমাকে জলের মধ্যে ফেলে দিতে, তা হলে অবশ্য আমি ডুবে মরতাম। কিন্তু তুমি তা কর নি—কারণ তুমি ধরেই নিয়েছিলে যে ঐ তরল পদার্থটি আমার শরীরে ইঞ্জেক্ট করা মাত্র আমি মরে গিয়েছি।

কুনাল নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে নটরাজনের মুখের দিকে, তার মুখে কোন কথা ফোটে না।

এবারে তোমাদের দুজনকে একটা প্রশ্ন করতে চাই।—কুনাল ও সুবীর দুজনেরই মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি হেনে বললে নটরাজন ঃ তোমরা কী মুর্গেশনকে বলেছিলে আমাদের নৌকোটাকে অনুসরণ করার জন্য?

কুনাল বললে, হ্যাঁ, কোচিন থেকে রওনা হওয়ার আগে আমি তাঁকে লিখেছিলাম আমাদের নৌকোটাকে অনুসরণ করার জন্য ....

—আমাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার মতলব ছিল বোধ হয় তোমার! কিন্তু সে তার মোটর লঞ্চ নিয়ে আমার নৌকোয় এসে আমাকে ধরার চেষ্টা করতেই আমি জলে ঝাঁপ দিলাম। ভাল কথা, আমার খাবারে তোমরা কী মিশিয়ে দিয়েছিলে যে খাওয়া মাত্র প্রচন্ড ঘুম পেয়ে গেল আমার?

ঘুম-পাড়ানী ওষুধ।— কুনাল জবাব দিল ঃ সুবীরদার বাক্স থেকে বের করে নিয়েছিলাম।

—তেমন কিছু জোরালো নয় ওষুধটা। কারণ মুর্গেশন আমার নৌকোতে এসে পৌঁছানো মাত্র আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। যাক গে সে কথা, এখন আসল কথায় আসা যাক। এই পাহাড়, পাহাড়ের ভেতরকার গুপ্তধন সব আমার ....

সব তোমার!—ঠাট্টার সুরে বলে ওঠে সুবীর ঃ কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে ঢুকবে কী করে?

—ঢুকব .... বাক্সটা দাও ....

—বাক্স দিয়ে কী করবে?

—বাক্সের মধ্যে গুহার মধ্যে ঢোকবার পথের হদিস দেওয়া আছে—তাই দেখে—

—বাক্সটা তো তোমাকে দিতে পারি নে!

তা হলে মর।—বলে কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে সুবীরের দিকে তাক করে নটরাজন।

সঙ্গে সঙ্গে সুবীরও তার পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে। নটরাজনের দিকে তা তাক করে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে সে বললে, আমাকে মারলে তো আমি যখ হয়ে এই গুপ্তধন আগলাব—তারপর আর কী পারবে তুমি গুহার মধ্যে ঢুকতে?

সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা নামিয়ে ফেলল নটরাজন। তারপর সুবীরের মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে বললে, ঠিক আছে—তোমাকে আমি মারব না কিন্তু তোমরা দুজনে এক্ষুণি চলে যাও এখান থেকে।

সুবীর বললে, নিশ্চয়ই যাব। কারণ গুপ্তধনের লোভ

আমাদের নেই। ভেবেছিলাম ভেতরে ঢুকে একটু দেখব শুধু—কিন্তু তুমি আসতে তা হয়ে উঠল না।

তোমরা না ঢোকো, আমাকে ঢুকতে দাও—উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল নটরাজন ঃ দাও আমাকে ঐ বাক্সটা ....

—না, দেব না।

—যদি কেড়ে নিই!

—কেড়ে নেবার চেষ্টা করলেই গুলী খেয়ে মরবে।

—তুমি গুলী করার আগেই আমি গুলী করব।

—তাতে তো আমারই লাভ। আমি যখ হয়ে—

না না!—শিউরে ওঠে নটরাজন।

তা হলে আমরা কেউ কাউকে মারবার চেষ্টা করব না।—সুবীর হাসতে হাসতে বলে ঃ তুমি আমি দুজনেই বেঁচে থাকব।

—এই মুহূর্তে চলে যাও তোমরা এখান থেকে।

—তা যাচ্ছি। কিন্তু তুমি এখানে থাকবে কোথায়!

—এই পাহাড়েই থাকব।

বলে ডিঙি থেকে জলে নেমে সাঁতার কেটে নটরাজন পাহাড়ের গায়ে একটি গুহার মধ্যে আশ্রয় নিল।

একটু বাদেই জোয়ার আসবে নটরাজন।—সুবীর বললে।

নটরাজন বললে, জোয়ার এলে জলে ভেসে থাকব—তারপর জলের সঙ্গে সঙ্গে উঠে যাব পাহাড়ের ওপরে ....

॥ তের ॥

কলকাতায় ডক্টর কল্যাণ বসুর বাড়ির বসার ঘরে বসে আছে সুবীর, কুনাল, করবী, কাবেরী ও কল্যাণ। সুবীর সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছে সে কী করে রক্ত-প্রবাল ও অন্যান্য মণি-রত্নমন্ডিত গুহা-মন্দিরের হদিস পেল।

বাক্সের ওপরে খোদাই করা তামিল হরফগুলির ওপরে হাত বুলিয়ে সুবীর বললে, ট্রেনে কুনাল বলেছিল যে বাক্সের ওপরে খোদাই করা হরফগুলো এমনভাবে সাজানো আছে যে দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বাতিঘর। হরফগুলো দেখে মেসোমশাইয়ের মনে হয়েছিল যেন গাঙ চিলের ঝাঁকের ছবি খোদাই করা আছে। কোচিনে গিয়ে তামিল ভাষা শিখে ঐ হরফগুলোর পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে দেখি যে তাতে বাতিঘর ও গাঙ চিলের ঝাঁকের কথাই লেখা আছে। এই হল বাক্সের রহস্য। বাক্সের মধ্যে গুহা-মন্দিরে ঢোকার জন্য যে সুড়ঙ্গ-পথের হদিস দেওয়া হয়েছে, সে পথ অবশ্য দেখা হয়নি—কাজেই রহস্যভেদ পুরোপুরি করে উঠতে পারি নি।

বাক্সের মধ্যে যত রহস্য থাক, তার চেয়েও রোমাঞ্চকর নটরাজনের ব্যাপারটা।—সুবীর বলে চলে ঃ আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না নটরাজন কী করে ট্রেনের বন্ধ কামরার মধ্যে ঢুকল।

কুনাল বললে, ঐ কালো ট্রাঙ্কের মধ্যে লুকিয়ে ছিল নটরাজন। গোবিন্দরাজনের নামের লেবেল লাগিয়ে সে তার বিশ্বস্ত কোন অনুচরকে দিয়ে তোমার কামরার বার্থের নীচে ট্রাঙ্কটাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

কিন্তু তুমি জানলে কী করে?—কুনালের মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সুবীর।

—আমরা ট্রেন থেকে নামার আগে তুমি যখন তোমার সুটকেস গোছাচ্ছিলে, আমি তখন ট্রাঙ্কটাকে নড়ে উঠতে দেখেছিলাম ....

—কিন্তু তুমি তো তখন আমাকে বল নি সে কথা—বা দেখিয়েও দাও নি?

ব্যাপারটা আমার কাছে তখন ভুতুড়ে বলে মনে হয়েছিল—কুনাল মুখ নীচু করে বললে ঃ তাই বলি নি কিছু।

—নটরাজন জানল কী করে যে আমরা কোচিনে যাচ্ছি!

—বাক্সের মধ্যে থেকে সে শুনেছিল আমাদের কথাবার্তা। আমরা কোচিনে যাব, মুর্গেশনের সাহায্য নেব, সব শুনেছিল সে। তারপর কোচিনে মুর্গেশনের কোয়ার্টারে হানা দিয়েছিল। তাকে কোয়ার্টারের বাগানের মধ্যে ঘুর ঘুর করতে দেখে ভয় পেয়েছিল মুর্গেশনের পাহারাওয়ালারা। ভয় আমিও পেয়েছিলাম যখন সে আমাদের ডাক-বাংলোয় এসে আমাদের ওপরে নজর রাখতে শুরু করল। তারপর সুবীরদা মুর্গেশনকে বললেন বাতিঘর ও গাঙ চিলের ঝাঁকের কথা এবং মুর্গেশন সুবীরদাকে পরামর্শ দিলেন জেলেদের বুড়ো সর্দারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সব আড়াল থেকে শুনেছিল নটরাজন এবং আমাদের অনেক আগে জেলেদের সর্দারকে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তাকে হাত করে ফেলেছিল। তারপর যা যা ঘটল সব তার সাজানো ব্যাপার।

সুবীর বললে, যত দুধর্ষ, দুর্দান্ত ও কূট-বুদ্ধিপরায়ন হোক না কেন, নটরাজনের কিন্তু কুসংস্কার আছে। যেমন ধর, সুদিন দেখে ও পুজো দিয়ে সমুদ্র যাত্রা করা, কিংবা পাছে আমি যখ হয়ে গুপ্তধন আগলাই, সেজন্যে আমাকে না মেরে ছেড়ে দেওয়া.........

কুনাল বললে, জেলেদের আস্তানায় ওকে জেলে সেজে থাকতে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে বেঁচে আছে। যদিও নিখুঁত মেক-আপ নিয়েছিল, তবু ওকে চিনতে আমার অসুবিধে হয় নি। তারপর তোমাকে বললাম, ওর বদলে অন্য কোন জেলেকে নিয়ে যেতে। কিন্তু তুমি আমার কথা কানে তুললে না। কাজেই মুর্গেশনকে লিখে দিলাম আমাদের অনুসরণ করতে.........

একটা কথা কুনাল।—সুবীর বললে ঃ ট্রেনের কামরায় নটরাজন ট্রাঙ্ক থেকে বেরোল কী করে?

ট্রাঙ্কের তালা লাগাবার কবজাটি বোধ হয় ভেতর থেকে খোলা ছিল।—কুনাল জবাব দিল ঃ এটা অবশ্য আমার আন্দাজ.........

কল্যাণ বললেন, আশ্চর্য দুঃসাহস লোকটার! সমুদ্রের মধ্যে ঐ নির্জন পাহাড়ে থেকে গেল—তাও এমন একটি পাহাড় যা জোয়ারের সময় জলে ডুবে যায়! লোকটা ওখানে থাকবে কী করে—বেঁচে থাকবেই বা কী করে?

সুবীর বললে, রক্ত-প্রবালের পাহাড় থেকে চলে আসার আগে এ প্রশ্ন আমি নটরাজনকে করেছিলাম। আমার প্রশ্নের জবাবে সে বললে যে যেভাবে গাঙ চিলগুলো ওখানে থাকছে এবং বেঁচে আছে, সেভাবেই সে ওখানে থাকবে এবং বেঁচে থাকবে..........

• নটরাজন •

চুরি-ডাকাতি নেই কোন দেশে? হিসেব নিয়ে দেখা গেছে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে যেমনি সব কিছুই উন্নত ধরনের তেমনি সে দেশের চুরি-ডাকাতিও অতি উন্নত মানের। ইউরোপ কিম্বা আমেরিকায় যে ধরনের চুরি-ডাকাতি হয়, আর সেই সব কাজে সেখানকার অপরাধীরা যতটা বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দেয়, তা বোধহয় সময় সময় অন্য দেশের অপরাধীদের কাছে ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। আবার সেই অপরাধীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেখানকার পুলিসবাহিনীও যতটা ঝুঁকি নেয় তাও কম বিস্ময়কর নয়। বিলেতের মাটিতে তেমনি এক দুর্ধর্ষ ডাকাতির কাহিনীই আজ তোমাদের শোনাতে বসেছি। পৃথিবীর অপরাধের ইতিহাসে এই কাহিনীটিই 'দি ব্যাটল অব হীথরো' নামে অভিহিত।

মহানগরী লণ্ডনের একটি বিমান ঘাঁটির নাম হীথরো এয়ারপোর্ট। রাতদিন দূরপাল্লার বিমানের আনাগোনা এখানে। যাত্রী ও পণ্যবাহী উভয় ধরনের বিমানই ওঠানামা করে এই বিমান ঘাঁটিতে। বিরাট বিমান ঘাঁটির একপ্রান্তে রয়েছে মস্ত বড় গুদাম ঘর। মূল্যবান পণ্যসামগ্রী এনে রাখা হয় এখানে। কড়া সিকিউরিটির বন্দোবস্ত। সতর্ক এখানকার কাস্টমস-এর লোকজনের দৃষ্টি। মাছিটি পর্যন্ত ঘেঁসতে পারে না এই গুদাম ঘরের কাছে।

কিন্তু কেন এমন কড়াকড়ি? কি এমন মূল্যবান পণ্য-সামগ্রী এনে রাখা হয় এই গুদাম ঘরে যার জন্যে এমন সতর্কতা?

হ্যাঁ, মূল্যবানই বটে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড বা ডলার মূল্যের সোনার বাট আসে এখানে। প্রায় প্রতিদিনই আসে এই বহুমূল্য সোনা। দু'চারদিন এখানেই থাকে কড়া সিকিউরিটির মধ্যে। তার-পর আবার চালান হয়ে যায় অন্যত্র। এই সোনার ওপরই একদিন নজর পড়লো বিলাতের একদল দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যালের।

ঊনিশশো আটচল্লিশ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি। মেঘাচ্ছন্ন লণ্ডনের আকাশ। যখন তখন বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে আবার ঘন কুয়াশা। সপসপে ভিজে রাণওয়ের ওপর এসে নামলো একখানা বড় বিমান। ওখানা আফ্রিকার জোহেন্সবার্গ থেকে নিয়ে এসেছে অনেকগুলি সোনার বাট যার মূল্য দশ লক্ষ ডলার। সেই বহুমূল্য সোনা এসে উঠলো এয়ারপোর্টের ঐ গুদাম ঘরে। সতর্ক পাহারায় সেই সোনা বন্দী হয়ে রইলো মস্ত বড় একটা লোহার সিন্দুকের মধ্যে।

এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসার ডোনাল্ড ফিস একজন কর্মঠ ব্যক্তি। অতীতে তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টার। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি এখানকার সিকিউরিটি অফিসারের চাকরি নিয়েছেন। অত্যন্ত সতর্ক ও কর্মঠ ব্যক্তি এই ডোনাল্ড ফিস।

মিঃ ফিস্ কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছিলেন যে কয়েক-জন বিশেষ ব্যক্তি যেন হঠাৎ এই বিমানবন্দর সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। লোকগুলোর কথা-বার্তা কিম্বা আচার-আচরণে তাদের যেন ঠিক ভদ্রলোকের গোষ্ঠীতে ফেলা চলে না। বিমানগুলোর ওঠা-নামা ও মালপত্র সম্বন্ধেই যেন তাদের কৌতূহল বেশি। বিমান-গুলো কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, কি কি ধরনের পণ্য বহন করে আনে, সেগুলো কোথায় রাখা হয় প্রভৃতি খবরেই যেন তাদের উৎসাহ।

একদিন এয়ারপোর্টের মধ্যেই সেই দলটির সাথে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল ডোনাল্ড ফিসের। দলে তিনজন ছিল তারা। এয়ারপোর্টের একজন সাধারণ কর্মচারীর কাছ থেকে দলটি খবর সংগ্রহের চেষ্টা করছিল সেই মুহূর্তে।

মিঃ ফিস এগিয়ে গিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, আমার কাছ থেকেই আপনারা কারেক্ট খবর পেতে পারবেন। আফ্রিকা সম্বন্ধে খবর জানতে চাচ্ছিলেন তো? হ্যাঁ,

জোহেন্সবার্গ থেকে আজই সকালে একখানা বিমান এসেছে।

মিঃ ফিসের এগিয়ে এসে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কথা বলায় লোকগুলো প্রথমটায় একটু অস্বস্তিবোধ করে। তারপর ওদের মধ্যে একজন মিঃ ফিসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কিছু মনে করবেন না, মিস্টার। আমাদের একজন বন্ধুর ঐ প্লেনে আসবার কথা ছিল কিনা, তাই।

ও, তিনি আসেন নি বুঝি?—জিজ্ঞেস করেন মিঃ ফিস।

—মনে হয় আসেন নি।

মিঃ ফিস জানেন, ওদের সেই তথাকথিত বন্ধুর নাম-ধাম ঠিকানা প্রভৃতি জিজ্ঞেস করে তিনি এখনই ওদের জেরার মুখে বিপাকে ফেলতে পারেন। এমনকি তিনি প্যাসেঞ্জারদের লিস্ট দেখাবার প্রস্তাবও করতে পারেন, কিন্তু ওদের তাতে সতর্ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। তাই তিনি ওপথে না গিয়ে কেবল বললেন, আপনাদের কোন খবরও দেননি তিনি?

—না, তাই তো আমরা একটু চিন্তিত।

তাই স্বাভাবিক।—একটু থেমে মিঃ ফিস আবার বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, ওয়েল, বলুন, আর কিভাবে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি?

নো, থ্যাংকস।—লোকগুলো চলে যায়।

মিঃ ফিস কিছুক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে চিন্তা করেন। তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পুলিসী চোখ ভুল দেখেনি। এই দলটি সম্বন্ধে তিনি এর আগেও কিছু রিপোর্ট পেয়েছেন। আজ তো ওদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখাই হয়ে গেল। এখন তাঁর কর্তব্য কি?

মিঃ ডোনাল্ড ফিস ফিরে আসেন নিজের দপ্তরে। তারপর টেলিফোন তুলে স্থানীয় ডিভিশনাল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টারের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন—হ্যাল্লো ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, ইট ইজ সিকিউরিটি অফিসার ডোলাল্ড ফিস স্পিকিং ফ্রম হীথরো এয়ারপোর্ট।

ইয়েস।—ওপাশ থেকে ভেসে ওঠে গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

—আজ সকালে জোহেন্সবার্গ থেকে প্লেনে দশ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনা এসেছে এখানে। সোনার বাটগুলো যথারীতি গুদাম ঘরের সিন্দুকে রাখা হয়েছে। কড়া সিকিউরিটির বন্দোবস্তও আছে সেখানে।

—ইয়েস, তারপর?

—দেখুন ইন্সপেক্টর, দিনকয়েক ধরে আমি খবর পাচ্ছি যে, একদল লোক হঠাৎ যেন এই এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে অতিরিক্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, ঐ জোহেন্সবার্গ সম্বন্ধেই ওদের কৌতূহল খুব বেশি। আজ ঐ দলটির সঙ্গে আমার নিজেরই দেখা হয়েছে।

—কিছু সন্দেহ করছেন, মিঃ ফিস?

হ্যাঁ, সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে।—মিঃ ফিস জবাব দেন।

রিজিওন্যাল ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক মিঃ ফিসের পরিচয় জানতেন। তাই তিনি টেলিফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, আপনার কাছে যখন ব্যাপারটা সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে তখন এটা ইয়ার্ডে জানানোই উচিত। এক্ষুনি তাদের খবর দিচ্ছি।

—হ্যাঁ, যা হয় কিছু করুন। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো ঠেকছে না,

—ঠিক আছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

খবরটা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পৌঁছতেই ফ্লাইং স্কোয়াড থেকে চীপ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট উইলিয়াম চ্যাপম্যান ও চীফ ইন্সপেক্টর রবার্ট লী এসে হাজির হন হীথরো এয়ার পোর্টে।

সিকিউরিটি অফিসার মিঃ ফিসের দপ্তরে এসে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, উই আর ফ্রম স্কোয়াড।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সি. আই. ডি-তে অনেক ধরনের স্কোয়াড থাকলেও কেবলমাত্র স্কোয়াড বলতে ফ্লাইং স্কোয়াডকেই বোঝায়।

মিঃ ফিস উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করেন তাদের সঙ্গে। তারপর তাদের খাতির করে বসিয়ে বলতে লাগলেন নিজের সন্দেহের কথা।

শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে ওঠে স্কোয়াড অফিসার-দের মুখ। মিঃ ফিস থামতেই উইলিয়াম চ্যাপম্যান জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা, লোকগুলোকে কি ক্রিমিন্যাল বলে মনে হয় আপনার?

একটু ভেবে জবাব দেন মিঃ ফিস, অনেক কাল পুলিসে চাকরি করেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু মাত্র বলতে পারি যে ভদ্রলোক বলতে যা বোঝায় ওরা ঠিক তা নয়। তাছাড়া জোহেন্সবার্গ থেকে ওদের সেই বন্ধুর আসার ব্যাপারটা যে একদম ভূয়া তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।

রবার্ট লী এই সময় জিজ্ঞেস করেন, আশা করি আপনি ঐ লোকগুলোর চেহারার মোটামুটি একটা বর্ণনা দিতে পারবেন।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে রবার্ট লী বললেন, নিশ্চয় পারবো। আর,ওরা যদি আপনাদের কোন পরিচিত ক্রিমিন্যাল হয়ে থাকে তবে তো সি. আর. ও-তে ওদের ফটো ও রেকর্ড পাওয়া যাবে।

চ্যাপম্যান বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন, মিঃ ফিস: আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাদের কোন পরিচিত ক্রিমিন্যাল। নতুনের পক্ষে এমন একটা কঠিন কাজে হাত লাগানো সম্ভব নয়। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো দয়া করে একবার আমাদের সঙ্গে ইয়ার্ডের সি. আর. ও-তে চলুন। দেখা যাক ওখানকার ক্রিমিন্যালদের এ্যালবাম থেকে এদের কাউকে চিনে বের করতে পারেন কিনা।

মিঃ ফিসকে সঙ্গে নিয়ে চ্যাপম্যান ও রবার্ট লী সোজা চলে আসেন সি. আর. ও-তে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সি. আর. ও. অর্থাৎ ক্রিমিনাল রেকর্ড অফিসে রাখা হয় পরিচিত অপরাধীদের কোষ্ঠী-ঠিকুজির হিসেব। শুধু তাই নয়, বড় বড় অ্যালবামে রাখা হয় তাদের প্রত্যেকের ছবি ও সেই সঙ্গে তাদের অতীত অপরাধের ফিরিস্তি।

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একখানা ছবির

ওপর এসে নজর আটকে যায় মিঃ ফিসের। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে ছবিটা দেখতে দেখতে তিনি বললেন, মনে হচ্ছে এই ছবিটা একটু পুরানো। তবে আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। এই সেই লোকটি। এর সঙ্গেই আমি কথা বলেছিলাম।

চ্যাপম্যানের নির্দেশে রবার্ট লী কেবল ছবির নম্বরটি টুকে নেন নিজের নোটবুকে। মিঃ ফিস বাকি দুজন ক্রিমিন্যালের খোঁজে ওল্টাতে থাকেন এ্যালবামের পাতা।

কিন্তু না, আর দুজনের খোঁজ পাওয়া গেল না। অবশ্যি তাতে কিছুই যায় আসে না। যতটুকু পাওয়া গেছে তাতেই চ্যাপম্যান ও রবার্ট লী খুশি। দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল ঐ লোকটা। ওর অপরাধের ফিরিস্তি দেখলেই বোঝা যায় যে এমনি ধরনের সোনা-দানা লুঠ করতেই সে অভ্যস্ত। দুদুবার পুলিসের হাতে ধরা পড়েও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে লোকটা ছাড়া পেয়ে গেছে। বাকি লোক দু'জন সম্ভবতঃ ওর সাকরেদ। বোধহয় নতুন এসেছে এ লাইনে! তাই এখনও পুলিসের খাতায় নাম ওঠেনি ওদের।

চীফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট উইলিয়াম চ্যাপম্যান এবার নিঃসন্দেহ হন যে সিকিউরিটি অফিসার মিঃ ফিসের অনুমান মিথ্যে নয়। ঐ লোকটির মত একজন দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যাল দলবল নিয়ে শুধু শুধু হীথরো এয়ারপোর্টে ঘোরাফেরা করছে না। একটা কিছু উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে এবং সেই উদ্দেশ্যটি যে মহৎ কিছু নয় তাতেও কোন সন্দেহ নেই। দশ লক্ষ ডলার মূল্যের ঐ সোনার বাট-গুলোর ওপরই বোধহয় ওদের নজর।

এমনি একটা পরিস্থিতিতে যে কোন দেশের পুলিশ বাহিনীই হয় ঐ সোনা ভর্তি লোহার সিন্দুকটা আরও কড়া পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করতো নয়তো রাতারাতি ঐ সোনা এমন কোন নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখতো যেখানে দুর্বৃত্তদের নাগাল পৌঁছতে না পারে। কিন্তু স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিখ্যাত ফ্লাইং স্কোয়াডের চীফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট উইলিয়াম চ্যাপম্যানের ইচ্ছে তা নয়। আর নয় বলেই বোধহয় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এমন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। সোনার বাটগুলোকে নিরাপদে রাখা যেমন তাদের কর্তব্য তেমনি তাদের ইচ্ছে ঐ দুর্বৃত্তরা হাতেনাতে ধরা পড়ুক যাতে ভবিষ্যতে ওরা আর এ ধরনের অপরাধ করতে না পারে। বেড়ালের ভয়ে মাছের থালাটা তাকের ওপর তুলে রাখলে হয়তো মাছ রক্ষা পাবে কিন্তু বেড়াল যে দুধের বাটিতে মুখ দেবে না তার স্থিরতা কোথায়? তার চাইতে খোদ বেড়ালটাকে বেঁধে রাখতে পারলে মাছ-দুধ দুটোই রক্ষা পাবে।

এবারে তাহলে খোঁজ করতে হবে ঐ দুর্বৃত্তের দলটি সম্বন্ধে, জানতে হবে ঐ দলে আর কে কে আছে। তার চাইতেও বড় কথা ঐ দলের প্ল্যান সম্বন্ধে জোগাড় করতে হবে সঠিক খবর।

কাজটি নিঃসন্দেহে দুরূহ। কিন্তু ফ্লাইং স্কোয়াডের অভিধানে দুরূহ বলে কোন শব্দ নেই। কাজেই এমনি একটা কাজে চ্যাপম্যান নিয়োগ করলেন একজন মহিলাকে।

মহিলাটি কিন্তু সাধারণ কোন মহিলা নয়। মেয়ে পুলিস। পদাধিকারে একজন তীক্ষ্ন বুদ্ধিমতী ডিটেকটিভ সার্জেন্ট।

ঘন্টা কয়েকের পরিশ্রমেই মহিলাটি খুঁজে বের করলে দলের সেই নেতাকে। তারপর আরম্ভ হলো তাকে শ্যাডো করা অর্থাৎ তার পিছু নেওয়া। মহিলা ডিটেকটিভ সার্জেন্ট ছায়ার মত অনুসরণ করতে থাকে সেই দলপতিকে।

বড় রাস্তার ফুটপাথ ধরে হেঁটে চলেছে সেই দলপতি! একটু দূরে থেকে তাকে অনুসরণ করে চলেছে সেই মেয়ে ডিটেকটিভ। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও হাতের ব্রীফ কেসটি দেখে তাকে কোন কোম্পানীর প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছু মনে হওয়ার উপায় নেই। সামনে এগিয়ে চলা সেই দলপতির দিকে যেন একেবারেই নজর নেই তার। কোম্পানীর কাজের কথা ভাবতে ভাবতেই যেন সে এগিয়ে চলেছে আপন মনে।

ওয়াটারলু অঞ্চলের একটা রিপেয়ারিং শপ। গাড়ির টায়ার টিউব সারানো হয় ওখানে। সামনের দিকটা রিপেয়ারিং শপ্ হলেও পেছনে একটা মাঝারি ধরনের 'কাফে'—চায়ের দোকান। এই দোকানের খদ্দেরদের অধি-কাংশই হচ্ছে গাড়ির ড্রাইভার ও নিম্নশ্রেণীর মজুর। পথচারী দু'একজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাও মাঝে মধ্যে ঢুকে পড়ে এখানে। দলপতি সেই লোকটি রিপেয়ারিং শপটিকে কাটিয়ে সোজা ঢুকে যায় সেই কাফেতে। এক মুহূর্ত ইতঃস্তত করে সেই মেয়ে ডিটেকটিভও অনুসরণ করে তাকে।

কাফেতে তখন মাঝারি ধরনের ভিড়। দলপতি লোকটি ভেতরে ঢুকতেই একটা টেবিল ঘিরে বসে থাকা তিন-চার-জন লোক শিস দিয়ে তাকে কাছে ডেকে নেয়। ওরা যেন এতক্ষণ এই লোকটির জন্যেই অপেক্ষা করছিল। দলপতি ঘরের চারদিকে একবার সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে এক-খানা চেয়ার টেনে বসে পড়ে তাদের পাশে। তারপর অপেক্ষাকৃত নীচু কণ্ঠে কথা বলতে থাকে তাদের সঙ্গে।

যেন ভয়নক ক্লান্ত লাগছে এমনি একটা ভঙ্গিতে ভেতরে ঢোকে সেই মেয়ে ডিটেকটিভ। একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় চারদিকে। তারপর তেমনি ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঐ দলটির পাশের টেবিলে এসে বসে কফির অর্ডার দেয়।

দুর্বৃত্তের দলটি তখন আপন মনে আলোচনা করে চলেছে নিজেদের মধ্যে; সামনে গরম কফির কাপ থাকলেও সেই মেয়ে ডিটেকটিভের কান দুটো কিন্তু খাড়া হয়ে থাকে পাশের টেবিলের সেই আলোচনার দিকে।

যেমনি সঠিক ওদের খবর তেমনি নিখুঁত ওদের পরি-কল্পনা। গুদাম ঘরের কোন সিন্দুকের মধ্যে ঐ সোনার বাটগুলো রাখা হয়েছে, ওখানকার গার্ডের সংখ্যা কত, সিন্দুকের চাবি কার কাছে থাকে, ক'ঘন্টা অন্তর গার্ড বদল হয় প্রভৃতি সমস্ত খবরই তাদের নখদর্পণে। এমনকি প্রতিদিন গভীর রাতে যে একটি চায়ের গাড়ি ঐ গুদাম-ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় এবং একজন এয়ারপোর্টের 'লোডার' অর্থাৎ কুলীশ্রেণীর লোক যে ওখান থেকে চা

নিয়ে গিয়ে গার্ডদের মধ্যে বিতরণ করে সেই খবরটিও তাদের অজানা নয়। আর, এই চায়ের গাড়িটিকে কেন্দ্র করেই তারা রচনা করেছে তাদের পরিকল্পনা।

মেয়ে সার্জেন্টের কফি খাওয়া শেষ হয়েছিল। আর এখানে বসে থাকা চলে না, তাতে এদের মনে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। উঠে দাঁড়ায় সে। তারপর পে-কাউন্টারে কফির দাম শোধ করে বেরিয়ে আসে কাফে থেকে। কিন্তু বেরিয়ে এলেও একেবারে চলে যায় না সে। রাস্তার উল্টো দিকের বাস স্টপে দাঁড়িয়ে নজর রাখে ঐ কাফের দিকে। দলটির পরবর্তী কার্যকলাপের দিকে নজর রাখতে হবে তাকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই কাফের সামনে এসে দাঁড়ায় মাঝারি ধরনের একটা চায়ের গাড়ি। গাড়িটাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ড্রাইভার সরাসরি গিয়ে ঢোকে সেই কাফেতে।

একটু পরেই কিন্তু বেরিয়ে আসে সেই ড্রাইভার। এবার তার সঙ্গে সেই দলপতি ও একজন সাকরেদ। কিন্তু আশ্চর্য তাদের পোশাক। এইটুকু সময়ের মধ্যেই তারা নিজেদের পোশাক পাল্টে চা-বিক্রেতার পোশাক পরে নিয়েছে। গায়ে ময়লা প্যান্ট-শার্ট। বুকের ওপর একটা ময়লা এ্যাপ্রণ। মাথায় ক্যাপ কোণাকুণিভাবে কাত হয়ে রয়েছে এক পাশে।

ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হয়ে ওঠে মেয়ে সার্জেন্টের। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাববার মত সময় নেই। দলপতি ও তার সেই সাকরেদ গাড়ির পেছন দিকের মস্ত বড় চায়ের পাত্রের কাছে এসে বসতেই গাড়িটা চালাতে শুরু করে সেই এয়ারপোর্টের দিকে। মেয়ে সার্জেন্টও একটা ট্যাক্সি ডেকে অনুসরণ করে তাদের।

বাইরে তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ট্যাক্সির মধ্যে বসেই মেয়ে সার্জেন্ট নিজের গায়ে চাপায় একটা বর্ষাতি, পাল্টে নেয় মাথার টুপিটা—যতটা সম্ভব নিজের পোশাক পাল্টে নেবার প্রচেষ্টা।

চায়ের ভ্যান এসে দাঁড়ায় গুদামঘরের সামনে। ছোট একটা চায়ের পাত্র হাতে গুদামঘর থেকে বেরিয়ে আসে একটি কুলীশ্রেণীর লোক। চা নিতে গিয়ে দলপতির সঙ্গে তার নীচু কণ্ঠে কিছু কথা হয়। সেই সঙ্গে দলপতি একটা ছোট্ট মত কাগজের প্যাকেট গুঁজে দেয় কুলীটির হাতে। তারপর এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে যায় চায়ের ভ্যান। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবকিছুই লক্ষ্য করে সেই মেয়ে সার্জেন্ট।

যথারীতি সব খবর চলে যায় স্টকল্যান্ড ইয়ার্ডের ফ্লাইং স্কোয়াডে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসার ডোনাল্ড ফিসের দপ্তরে এসে হাজির হন চীফ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট উইলিয়াম চ্যাপম্যান ও ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর রবার্ট লী। আর, একটু পরেই সেখানে ডাক পড়ে এয়ারপোর্টের গুদামের সেই কুলীটির।

প্রথমটায় কুলীটি কিছুই কবুল করতে চায় না। কর্কনি উচ্চারণে কেবল বলে, আই নো নাথিং, কিছুই জানি না আমি।

এবার চ্যাপম্যান নিজের ও রবার্টের পরিচয় দিতেই কুলীটির চোখে-মুখে ফুটে ওঠে একটা শঙ্কার ছায়া। সর্বনাশ, ইতিমধ্যে স্কোয়াড খবর পেয়ে গেছে! তবে তো আর পরিত্রাণের কোন পথই নেই।

শান্ত গম্ভীর সুরে বলতে থাকেন চ্যাপম্যান, চা-বিক্রেতার ছদ্মবেশে চায়ের গাড়ি নিয়েই বুঝি ওরা প্রতিদিন এখানে আসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে?

মাথা নেড়ে সায় দেয় কুলীটি।।

—রাতেও কি ওরাই চা নিয়ে আসে?

—না, রাতে আসল চায়ের গাড়িটিই আসে।

চ্যাপম্যান বুঝতে পারেন এয়ারপোর্টের সিকিউরিটির চোখে ধুলো দিতেই দুর্বৃত্তরা এই পথটি বেছে নিয়েছে।

আবার জিজ্ঞেস করেন চ্যাপম্যান, কবে ওরা ডাকাতির দিন ঠিক করেছে?

এবার একটু সময় ইতঃস্তত করে কুলীটি। তারপর একসময় হতাশ সুরে বলে ফেলে, আজই রাতে।

—কটায়?

—বারোটায়।

—তখন কি ওরা ঐ চায়ের গাড়িতে করেই আসবে?

—হ্যাঁ।

—চায়ের সেই আসল গাড়িটা যদি তখন এসে হাজির হয়?

জবাব দেয় লোকটি, না সেই গাড়ি আজ আর আসবে না। চাকা ফেটে ওটা আজ রাস্তায় পড়ে থাকবে।

—দলে থাকবে কজন?

—ছ-সাতজন। গাড়ির মধ্যে লুকিয়ে থাকবে তারা।

একটু সময় চিন্তা করে চ্যাপম্যান আবার জিজ্ঞেস করেন, আজ তোমার হাতে ওরা কিসের প্যাকেট দিয়ে গেছে? কি আছে ওতে?

আবার একটু ইতঃস্তত করে লোকটি। তারপর বললে, ওষুধের গুঁড়ো।

—কিসের ওষুধ?

—ঐ ওষুধে মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে।

—গার্ডদের চায়ের কাপে তোমাকে বুঝি ঐ ওষুধ মিশিয়ে দিতে হবে?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে লোকটি।

—তারপর কি করতে হবে তোমাকে?

একটা ঢোক গিলে জবাব দেয় কুলীটি, গার্ডেরা ঘুমিয়ে পড়লে আমাকে বাইরে এসে টর্চের আলো জ্বালিয়ে সিগন্যাল দিতে হবে। ওরা তখন এসে গার্ডের কাছ থেকে চাবি নিয়ে সিন্দুক খুলে মাল সরাবে। ফিরে যাবার সময় ওরা গার্ডদের চায়ের কাপে ভালো চা ঢেলে রেখে যাবে যাতে পরে আমার ওপর দোষ না পড়ে।

ইয়েস! মনে মনে চিন্তা করেন চ্যাপম্যান ও রবার্ট লী। নিখুঁত ব্যবস্থা। চায়ের কাপের অভুক্ত চায়ের মধ্যে কেমিক্যাল পরীক্ষায় যাতে ঐ ওষুধের সন্ধান না পাওয়া যায় সেদিকেও ওদের নজর। বাস্তবিক, প্রশংসা করতে হয় ওদের।

নিঃস্তব্ধতা বিরাজ করে ঘরের মধ্যে। কুলীটি দাঁড়িয়ে

আছে মাথা নীচু করে। তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন মিঃ ফিস। হাতের পেন্সিলটা কপালে ঠেকিয়ে চিন্তা করছেন চ্যাপম্যান। আর রবার্ট লী তাকিয়ে আছেন তার বসের দিকে।

সহসা চ্যাপম্যান নিঃস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কুলীটিকে বললেন, ওয়েল, ওয়েল! দুর্বৃত্তেরা তোমাকে যে নির্দেশ দিয়েছে তা তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। পারবে তো?

কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে কুলীটি, কেবল বোকার মত মুখ করে চ্যাপম্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে।

—ইয়েস, ইয়েস গুড ওল্ড ম্যান, তোমাকে তাই করতে হবে। ওদের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে। এতটুকু ভুল-চুক হলে চলবে না। বুঝলে?

কিন্তু—কুলীটি কিছু বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু চ্যাপম্যান তাকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলতে থাকেন, এমনকি গার্ডদের চায়ের কাপে ঐ ওষুধের গুঁড়োও মিশিয়ে দিতে হবে তোমাকে।

বেশ।—দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললে কুলীটি, তারপর আমি কি করবো?

তারপর?—আবার একটু চিন্তা করে চ্যাপম্যান বললেন, তারপর গার্ডেরা ঘুমিয়ে পড়লে বাইরে এসে ওদের নির্দেশ মত টর্চ জেবলে সিগন্যাল দিয়ে সরে পড়বে।

—কিন্তু ব্যাপারটা—

—না, কোন ব্যাপারেই তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না, যা বলছি তাই করবে তুমি। পারবে তো?

একটু ভীরু স্বভাবের কুলীটি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ভীত কণ্ঠে বললে, তাতে আমার কোন বিপদ হবে না তো?

মৃদু হেসে চ্যাপম্যান বললেন, না না, বিপদ হবে কেন তোমার? ওতে আমাদেরই সাহায্য করা হবে। বরঞ্চ না করলেই বিপদে পড়বে।

—অলরাইট, তাই করবো আমি।

—ঠিক আছে, এবার নিজের কাজে যাও। সাবধান, ঘুণাক্ষরেও যেন এ কথা কেউ না জানতে পারে।

কুলীটি চলে যেতেই মিঃ ফিসের সঙ্গে আলোচনায় বসেন চ্যাপম্যান ও লী। চ্যাপম্যান তাদের বোঝাতে থাকেন নিজের পরিকল্পনার কথা।

এক সময় সিকিউরিটি অফিসার মিঃ ফিস বললেন, ক্রিমিনালদের ফাঁদে ফেলতে গিয়ে আমরা বোধহয় একটু বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি, মিঃ চ্যাপম্যান।

মৃদু হেসে চ্যাপম্যান জবাব দেন, নো রিস্ক নো গেইন—ঝুঁকি ছাড়া কার্যসিদ্ধি হয় না।

মিঃ ফিস আবার বললেন, তাহলে বরঞ্চ ঐ সোনার বাটগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন। দুর্বৃত্তেরা এসে সিন্দুক খুলে কিছুই পাবে না। মাঝখান থেকে ওরা ধরা পড়বে আমাদের হাতে।

চ্যাপম্যান আবার একটু হেসে মিঃ ফিসকে বললেন, দেখুন মিঃ ফিস্ সিন্দুকের মধ্যে সোনার বাটগুলো থাক কিম্বা নাই থাক ওরা যখন সিন্দুক খুলবে তখন যদি ওরা আমাদের হাতে ধরা পড়ে তাহলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি! ওল্ড বেইলী কোর্টে বিচারে ওদের শাস্তি হবেই। কিন্তু শূন্য সিন্দুকের বদলে সত্যিকারের সোনার বাট সরাবার মুহূর্তে যদি ওরা ধরা পড়ে তাহলে বিচারের সময় বিচারকের মনে ব্যাপারটা গভীর রেখাপাত করবে। তাতে ওদের শাস্তির মেয়াদ বেড়ে যাবারই সম্ভাবনা। কাজেই ঝুঁকি একটু নিতেই হবে আমাদের। দশ লক্ষ ডলারের রিস্ক নিয়েও সোনার বাট শুদ্ধই ওদের হাতে নাতে ধরতে চাই আমি।

—কিন্তু দুর্বৃত্তেরা যদি কোন রকমে আমাদের হাত থেকে ফস্কে যায়?

দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দেন চ্যাপম্যান, তাহলেও সোনার বাটগুলোকে কিছুতেই আমরা ফস্কে যেতে দেব না, মিঃ ফিস।

॥ দুই ॥

গভীর রাত। ঘুমিয়ে পড়েছে মহানগরী লণ্ডন। ঝির-ঝিরে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলো কেবল আবছা আলোর রশ্মি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মধ্যে হুস্ করে ছুটে যাচ্ছে দু'একখানা মোটর গাড়ি মহানগরীর রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে হীথরো এয়ারপোর্টেও। রাণওয়ের দু' পাশে সারি সারি আলোর মালা আকাশের উড়ন্ত বিমানকে সংকেত জানাতে স্থির হয়ে আছে। উঁচু টাওয়ারের ওপর অবস্থিত শক্তিশালী সার্চলাইট বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দিচ্ছে এয়ারপোর্টের অবস্থিতি।

একটু আগেই রাতের শেষ বিমানখানা ছেড়ে গেল। প্রায় জনশূন্য এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ। দু'একজন কর্মী তখনও নিজেদের কাজ করে চলেছে আপনমনে। শেষ রাতের বিমানের দু'চারজন যাত্রী ব্যাগ-ব্যাগেজ নিয়ে লাউঞ্জের গদীমোড়া আসনে বসে বসে ঢুলছে কিম্বা ধূমপান করছে। এই সময়-টুকু এমনিভাবে কাটিয়েই শেষ রাতের বিমানের সঙ্গে আকাশে উঠে তারা পাড়ি জমাবে দূর দেশে।

এয়ারপোর্ট এলাকায় অবস্থিত দামী মালপত্রের সেই গুদামঘরের চেহারার মধ্যেও কিন্তু আজ কোন বিশেষত্ব নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই যে সেখানে একটি ভয়ানক নাটক অনুষ্ঠিত হতে চলেছে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই কোথাও। প্রতিদিনের মত আজও সেই গুদামঘরের বাইরের উজ্জ্বল আলোটা জ্বলছে। স্ট্রং রুমের বাইরে পাহারা দিচ্ছে এয়ার-পোর্টের সিকিউরিটি স্টাফ। মৃদু কণ্ঠে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে নিঃশঙ্ক চিত্তে তারা পায়চারি করছে কোন কিছু ঘটবার সামান্যমাত্র আভাস নেই কোথাও।

তাহলে কি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ফ্লাইং স্কোয়াড অপ্রস্তুত? নাকি চীফ সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ইউলিয়াম চ্যাপ-ম্যানের পরিকল্পনা কোন রকমে বানচাল হয়ে গেছে?

না, তেমন কিছুই হয়নি। সবই ঠিক আছে। পরিকল্পনা মতই এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি স্টাফদের আজ অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কি জন্যে তাদের সরানো হলো তা তারা নিজেরাই জানে না। কেবল জানে যে আজ আর তাদের

ঐ গুদামঘরের পাহারায় থাকতে হবে না। তার বদলে সিকিউরিটি স্টাফদের পোশাক পরে এই মুহূর্তে যারা ডিউটি করছে তারা সবাই ফ্লাইং স্কোয়াডের লোক। শিখিয়ে পড়িয়ে প্রস্তুত করেই তাদের ঐ ডিউটিতে নিয়োগ করা হয়েছে। কোন পরিস্থিতিতে তাদের কি ধরনের কাজ ও অভিনয় করতে হবে তা তাদের পাখী পড়া করে শিখিয়ে দিয়েছেন স্বয়ং চ্যাপম্যান।

হ্যাঁ, অভিনয়ই বটে। সিকিউরিটি স্টাফের অভিনয়। এই অভিনয়ের সাফল্যের ওপরই নির্ভর করছে ফ্লাইং স্কোয়াডের সাফল্য তথা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সুনাম।

স্ট্রং রুমের মধ্যে সিন্দুকের পেছনে লুকিয়ে থেকে খোদ উইলিয়াম চ্যাপম্যানও সেই কথাটাই ভাবছিলেন। শুধু তিনিই নন, চীফ ইন্সপেক্টর রবার্ট লী ছাড়া ফ্লাইং স্কোয়াডের আরও কয়েকজন দুর্ধর্ষ সার্জেন্টও লুকিয়ে বসে আছে সেই সিন্দুকের পেছনে। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হলেও দেহে আছে তাদের শক্তি, মনে আছে সাহস। ঐ ক্রিমিন্যালদের আজ হাতেনাতে ধরতেই হবে।

চ্যাপম্যান ভাবছিলেন, যদি শেষ পর্যন্ত তার পরিকল্পনা মত কাজ না হয়? যদি সবকিছু ভেস্তে যায়? যদি ক্রিমিন্যালেরা ধরা না পড়ে? তার চাইতেও বড় কথা, যদি ঐ সোনার বাটগুলো হস্তগত করে কোনরকমে কৌশলে তারা সরে পড়ে?

না, এমন একটা পরিস্থিতির কথা ভাবতেও পারেন না উইলিয়াম চ্যাপম্যান। এটা ঠিক যে একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি। এমন এক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর কোন দেশে কোনকালে কোন পুলিস বাহিনী এ ধরনের ঝুঁকি কখনও নিয়েছিল কিনা সন্দেহ। মনে মনে কেবল উচ্চারণ করেন উইলিয়াম চ্যাপম্যান—নো রিস্ক নো গেইন—সুষ্ঠুভাবে কার্য সিদ্ধি করতে গেলে ঝুঁকি নিতে পিছিয়ে গেলে চলবে না। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মন নিয়েই তিনি এমন একটা ঝুঁকি নিয়েছেন।

পাশের ঘরে টেবিলের সামনে একখানা চেয়ার টেনে বসে আছেন এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসার ডোনাল্ড ফিস। টেবিলের ওপর রক্ষিত টেলিফোনের সাদা রিসিভারটার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন তিনি। ঐ টেলিফোনের সাথে সরাসরি সংযোগ রয়েছে বিখ্যাত '৯৯৯' অর্থাৎ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনফর্মেশান রুমের। সেখানে সতর্ক হয়ে রয়েছে একজন অপারেটর। পাশের ঘরে উইলিয়াম চ্যাপম্যানের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র মিঃ ফিস রিসিভার তুলে খবরটা জানিয়ে দেবেন ইনফর্মেশন রুমকে। সঙ্গে সঙ্গে সেই অপারেটর বেতার যোগে ইথারের তরঙ্গে ছড়িয়ে দেবে সেই খবর। ফ্লাইং স্কোয়াডের যে মোবাইল ভ্যানগুলো নগরীর চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তারা তখন একযোগে হীথরো এয়ারপোর্টের প্রতিটি পথ আগলে এগিয়ে আসবে এয়ারপোর্টের দিকে। চ্যাপম্যান ও তার দলের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেও সাঁড়াশী আক্রমণের ধাঁচে এগিয়ে আসা স্কোয়াডের এই ভ্যানগুলোর হাত থেকে তাদের পরিত্রাণ নেই। দুটো চক্ষুকে সহস্র চক্ষুতে পরিণত করে প্রতিটি ভ্যানের মধ্যে জেগে রয়েছে অতন্দ্র প্রহরীর দল। তাদের হাতে ধরা পড়তেই হবে।

ছকে বাঁধা পরিকল্পনা মত সব কাজ সম্পূর্ণ। এখন কেবল প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা। উপস্থিত সকলের কানগুলোই খাড়া হয়ে রয়েছে একটিমাত্র শব্দ শোনবার জন্যে—মোটর গাড়ির শব্দ—সেই চা-গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ।

সিকিউরিটি গার্ড-রূপী স্কোয়াডের কনস্টেবলেরা আপন মনে ধীরে ধীরে পায়চারি করে ডিউটি দিচ্ছে। ওদের একজনের কাছেই স্ট্রং রুম ও সিন্দুকের চাবির গোছা। আর, ঐ চাবির গোছাটাই হবে ক্রিমিন্যালদের প্রথম লক্ষ্য।

সিকিউরিটি গার্ডদের কাছ থেকে একটু দূরে বসে আছে সেই এয়ারপোর্টের কুলীটি। আজকের নাটকের প্রথম দৃশ্যেই অভিনয় করতে হবে তাকে। বিমর্ষ মুখে কুলীটি চেয়ারে বসে গার্ডদের আচার-আচরণ লক্ষ্য করলেও আসলে কিন্তু সে চিন্তামগ্ন। বেইমানী করতে চলেছে সে ঐ দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যালদের সঙ্গে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় বা কি? ফ্লাইং স্কোয়াড যখন আসরে নেমে পড়েছে তখন তো তার নিজের আর পরিত্রাণ নেই। রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। এমনি অবস্থায় যে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই তার।

কিন্তু সেই অভিনয় মুহূর্তে যদি কোনরকমে ঐ ক্রিমিন্যাল দলের কাছে সে ধরা পড়ে যায়? সর্বনাশ, তাহলে তো সেই মুহূর্তেই তার ভবলীলা সাঙ্গ হবে। স্কোয়াডের অফিসারদের সাধ্য হবে না তাকে বাঁচায়। ক্রিমিন্যালেরা সেই মুহূর্তে বেইমানীর শাস্তি তাকে হাতে হাতেই দেবে। কাজেই খুব সাবধানে তাকে কাজ করতে হবে! এমনভাবে তাকে অভিনয় করতে হবে যাতে কোনরকমেই ওরা সন্দেহ করতে না পারে।

এক একটি মিনিট যেন এক একটি যুগ। স্ট্রং রুমের ভেতরে সিন্দুকের পেছনে আত্মগোপন করে প্রতীক্ষা করছেন সদলবলে চীফ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট উইলিয়াম চ্যাপম্যান, পাশের ঘরে টেলিফোনের পাশে প্রতীক্ষারত সিকিউরিটি অফিসার ডোনাল্ড ফিস, প্রহরীর কাজ করতে করতে প্রতীক্ষা করছে সিকিউরিটির বেশধারী ফ্লাইং স্কোয়াডের কনস্টেবলেরা, আর অদূরে একখানি চেয়ারে বসে বিমর্ষ মুখে প্রতিরক্ষারত এয়ারপোর্টের সেই কুলিটি, প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় বিভোর।

অবশেষে এক সময় অবসান হলো সেই প্রতিক্ষার। বাইরে তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই একখানা চা-গাড়ি এসে দাঁড়ালো গুদাম ঘরের অদূরে

গাড়ির শব্দ কানে যেতেই চঞ্চল হয়ে উঠলো গুদামঘরের প্রতিটি প্রাণী। সিন্দুকের আড়ালে উইলিয়াম চ্যাপম্যান তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে ফিস ফিস করে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করলেন, ডোনাল্ড ফিস চেয়ারের ওপর একটু সোজা হয়ে বসে ঝুঁকে পড়লেন টেলিফোনের দিকে, নকল পাহারাদারের পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে ইশারা করে আবার পায়চারি করতে লাগলো, আর সেই কুলীটি হঠাৎ একবার শিউরে

উঠে একটা ঢোক গিলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

আরম্ভ হলো অভিনয়। কুলীটি টেবিলের ওপর থেকে এলুমিনিয়মের চায়ের পাত্রটা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সম্ভবতঃ নিজের অভিনয় অংশটুকুর কথা একবার ভেবে নেয়। আর সেই সঙ্গে বোধহয় একবার ভগবান যীশুকে স্মরণ করে। তারপর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

গাড়ির ওপর রক্ষিত মস্তবড় চায়ের পাত্রটির কাছেই বসে ছিল দলের সর্দার। কুলীটির ছোট পাত্রে চা ঢালতে ঢালতে মৃদু কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করে, এভরি থিং ও. কে.?

ইয়েস।—জবাব দেয় কুলীটি।

—কোন রকম সন্দেহজনক কিছু নেই তো কোথাও?

নো।—মাথা নাড়ে কুলীটি।

—এবার তোমাকে কি করতে হবে মনে আছে তো?

—ইয়েস।

—সেই ওষুধের গুড়োর প্যাকেটটা সঙ্গে আছে তো?

এবার আর মুখে কোনো জবাব না দিয়ে কেবল মাথা নেড়ে সায় দেয় কুলীটি। এতক্ষণে তার ভয় হয়েছে যে বেশি কথা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠতে পারে, আর তাতে তার নিজেরই বিপদের আশঙ্কা ষোলো আনা।

অল রাইট।—বলতে থাকে সেই সর্দার, যেমনিভাবে শিখিয়ে দিয়েছি ঠিক তেমনি ভাবে নিজের কাজ করে যাও! ওরা ঘুমিয়ে পড়লেই টর্চ জেবলে আমাদের সংকেত দেবে। এই কাজের জন্যে মোটা টাকা বকশিস পাবে তুমি।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চায়ের পাত্র হাতে ঘুরে দাঁড়ায় কুলীটি। তারপর সর্দারের প্রায় চোখের সামনেই পকেট থেকে ওষুধের গুড়ো বের করে তার সবটুকু সেই পাত্রের চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায় গুদামঘরের দিকে।

মনে মনে খুশি হয় দলের সেই সর্দার। পরিকল্পনামতই কাজ এগিয়ে চলেছে। এবার সেই সোনার বাটগুলো হস্তগত করতে পারলেই সে নিশ্চিন্ত। আর তারা যে তা পারবেই তাতে তার এতটুকু সন্দেহ নেই। চায়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ পেটে পড়লেই সিকিউরিটি গার্ডেরা নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়বে ওদের কাছ থেকে কোনরকম বাধাই পাবে না তারা। কিন্তু সে তখনও জানতো না যে তার অগোচরে আরও একটি পরিকল্পনা সেদিন প্রস্তুত। সেই পরিকল্পনার রচয়িতা ফ্লাইং স্কোয়াডের চীফ সুপারিন্টেন্ডেণ্ট উইলিয়াম চ্যাপম্যান নামক একজন ব্যক্তি।

চা পরিবেশন শেষ করে চায়ের গাড়িটি এবার চলতে শুরু করে ধীরে ধীরে। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া হলো না! হঠাৎ গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিনে গোলযোগ। গাড়ির ড্রাইভার নেমে এসে বনেট খুলে গাড়িটাকে চালু করবার জন্যে কৃত্রিম প্রচেষ্টা করতে লাগলো। আসলে এমনিভাবে সময় অতিবাহিত করাই তাদের উদ্দেশ্য। নজর তাদের গুদাম ঘরের দিকে। কখন ওখান থেকে টর্চ জেবলে নির্দেশ আসবে—সব ঠিক আছে। এবার কাজ শুরু করো।

চায়ের পাত্র হাতে কুলীটি ঘরে ঢুকে একটু সময় স্থির হয়ে দাঁড়ায়। তারপর কাপে চা ঢেলে এগিয়ে দেয় গার্ডদের দিকে।

হাড়-কাঁপানো শীতের রাতে হাতের কাছে গরম চায়ের মত লোভনীয় বস্তু। ওর স্বাদ পেতে তাদের জিভগুলো বোধহয় নিসপিস করতে থাকে। কিন্তু উপায় নেই। তারা জানে ওর মধ্যে মেশানো আছে বিষাক্ত ঘুমের ওষুধ। ঐ চায়ের এক চুমুক পেটে পড়লেই ভয়ঙ্কর ঘুম নেমে আসবে তাদের চোখে।

ছদ্মবেশী গার্ডেরা চায়ের কাপ হাতে মৃদু হেসে পরস্পরের দিকে একবার তাকায়। তারপর কাপগুলো থেকে খানিকটা করে চা বেসিনের মধ্যে ফেলে দিয়ে কাপগুলো টেবিলের ওপর রেখে দেহভার চেয়ারের ওপর এগিয়ে দিয়ে এমনভাবে চোখ বুজে থাকে যেন চা খেতে খেতেই তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুরু হলো আসল অভিনয়। অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে গার্ডেরা। টেবিলের ওপর তাদের অর্ধভুক্ত চা। দেয়াল ঘেঁসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই কুলীটি। নজর তার গার্ডদের দিকে। ওদের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই সে শুরু করবে তার পরবর্তী কাজ।

গভীর ঘুমে অচেতন গার্ডদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে আসে সেই ইঙ্গিত। গাঢ় ঘুমে প্রায় নাক ডাকতে ডাকতেই সে একটা চোখ মেলে কুলীটির দিকে তাকিয়ে ইশারা করেই আবার নাক ডাকতে শুরু করে।

এবার কুলীটি টেবিলের ওপর থেকে তুলে নেয় একটা টর্চ। ইতস্ততঃ করে কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণেই দ্রুত পায়ে বাইরে এসে হাতের টর্চ জ্বালিয়ে ইশারা করেই আবার ফিরে আসে ঘরের মধ্যে।

কুলীটির নিজের অভিনয় শেষ হলো এতক্ষণে। আর কিছু করণীয় নেই তার। এবার তার ছুটি। কিন্তু এই মুহূর্তে সে যাবে কোথায়? ঐ ভয়ঙ্কর ডাকাতগুলোর আশেপাশে থাকা তার চলবে না, আবার এই সময় বাইরে যাওয়াও নিরাপদ নয়। কাজেই হাতের টর্চটি নিয়েই সে এসে ঢোকে পাশের ঘরে যেখানে মিঃ ফিস কান দুটো খাড়া করে টেলিফোনের দিকে চোখ রেখে স্থির হয়ে বসেছিলেন।

কুলীটি ঘরে ঢুকতেই মিঃ ফিস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান তার দিকে। কুলীটি একবার ঘাড় নেড়ে ককনি উচ্চারণে বলে ওঠে—আই হ্যাভ ডান মাই ডিউটি। আমার কাজ আমি করেছি।

নিস্তব্ধ রাত। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ঘরের মধ্যে কেবল দেয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দ। ঘুমে সচেতন সিকিউরিটি গার্ডেরা। টেবিলের ওপর তাদের অর্ধভুক্ত চা।

হঠাৎ দরজার সামনে দেখা দেয় এক ছায়ামূর্তি। না, ছায়ামূর্তি নয়, একজন জীবন্ত মানুষ। লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা। মুখোশের আড়ালে ঢাকা তার মুখখানা।

এবার আর একজন এসে দাঁড়ায় প্রথম ব্যক্তির পাশে। তারপর আরও একজন। প্রত্যেকের মুখেই মুখোস।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে লোকগুলো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ঘরের মধ্যে, বোধহয় ঘরের আবহাওয়াটা একবার যাচাই করে নিতে চায়। তারপর নিঃসন্দেহ হয়ে ঘরের ভেতর

প্রবেশ করে।

না, এতটুকু ব্যতিক্রম হয়নি কোথাও। পরিকল্পনামতই কাজ এগিয়ে চলেছে। দলের সর্দার সেই কুলীটির খোঁজে একবার ঘরের চারিদিকে তাকায়। কিন্তু দেখতে পায় না তাকে। লোকটি গেল কোথায় তবে? তাহলে কি পাশের ঘরে গিয়ে বসে আছে? বোধহয় তাই। হয়তো এমন একটা ঘটনার মুখোমুখি হতে লোকটি ভয় পাচ্ছে। যাক গে, ওকে নিয়ে ভাববার মত কিছু নেই। লোকটি তার নির্দেশ মতই নিজের কাজ নির্ভুলভাবে শেষ করেছে।

মুখোশ-আঁটা দলপতি এবার এসে দাঁড়ায় সিকিউরিটি গার্ডদের সামনে। অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে তারা। কেউ হেলে পড়েছে চেয়ারে। কেউ বা উপুর হয়ে টেবিলের ওপর মাথা রেখে হাত ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। টেবিলের ওপর রয়েছে তাদের অর্ধভুক্ত চা।

দলপতি একবার ঘাড় ফিরিয়ে তার সঙ্গীদের দিকে তাকায়। মুখোসের আড়ালে তার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দেয়। এ হাসি তার জয়ের হাসি, এ হাসি ওই হতভাগ্য গার্ডদের প্রতি তার অনুকম্পার হাসি। হায় বেচারা, এই শীতের রাতে সবটুকু গরম চা-ও ওরা খেতে পারলো না। তার আগেই অচেতন হয়ে পড়লো গাঢ় ঘুমে।

না, আর দেরি নয়। আসল কাজে হাত দিতে হবে এবার। এসব কাজে সময়ের দাম অনেক, প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। প্রথমেই স্ট্রং রুম ও সিন্দুকের চাবিগুলো হস্তগত করা দরকার।

আরম্ভ হলো তল্লাসী। নিদ্রাভিভূত সিকিউরিটি গার্ডদের প্রত্যেকের ওভারকোটের পকেটেই হাত ঢুকিয়ে সেই দলপতি ও তার সাকরেদরা খুঁজতে থাকে চাবির গোছা। লোকগুলো বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে। কাজেই কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই ওদের কাছ থেকে।

অবশেষে একজনের ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে সেই মূল্যবান চাবির গোছা পাওয়া গেল। মূল্যবানই বটে। এই মূল্যবান চাবিগুলোর সাহায্যেই সিন্দুকের ভেতরের সেই বহু মূল্যবান সোনার বাটগুলোকে তারা হাতের মুঠোয় পুরবে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে দলপতি সেই চাবির গোছা হাতে নিয়ে এগিয়ে যায় স্ট্রং রুমের দিকে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সে। না, এমনিভাবে ঐ সিকিউরিটি গার্ডদের ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না। যদিও ওদের ঐ ঘুম ভাঙতে এখনও অনেক দেরি, তবুও সাবধানের মার নেই। ওদের জন্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করে তবেই তারা তাদের আসল কাজে হাত লাগাবে।

দলপতি আবার সদলে ফিরে আসে গার্ডদের কাছে। তারপর তার নির্দেশে দলের লোকেরা শক্ত দড়ি দিয়ে একে একে গার্ডদের বাঁধতে থাকে।

এতেও কিন্তু তাদের সেই কাল-ঘুম ভাঙে না। আর তা ভাঙবেই বা কেমন করে? জাগ্রত অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকলে সেই ঘুম ভাঙানো কি এতই সহজ?

তেমনি নির্দেশই ছিল সেই ছদ্মবেশী গার্ডদের ওপর। উইলিয়াম চ্যাপম্যান ও রবার্ট লী তাদের করণীয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোন অবস্থাতেই তাদের ঐ ঘুম ভাঙবে না যতক্ষণ না তারা নির্দেশ পাচ্ছে চ্যাপম্যানের কাছ থেকে।

হাতের কাজ শেষ করে দলপতি সদলে এসে দাঁড়ায় স্ট্রং রুমের সামনে। তারপর খুলতে থাকে ভারি তালাগুলো।

স্ট্রং রুমের সেই অপরিসর ঘরের মধ্যে অল্প অন্ধকার। ভেতরটা বেশ গরম। একটা অল্প জোরের আলো ঘরের সেই অন্ধকারকে যেন আরও রহস্যময় করে তুলেছে। দেয়ালের একপাশে একটা মস্ত বড় লোহার সিন্দুক। ঐ সিন্দুকের মধ্যেই রয়েছে সেই ঈপ্সিত বস্তু—দশ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনার বাট।

দলপতি চাবির গোছা হাতে নিয়ে এগিয়ে যায় সিন্দুকের দিকে। সঙ্গীরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সিন্দুক খোলামাত্র হাতে হাতে সেই সোনার বাটগুলো তারা এনে তুলবে গাড়িতে। তারপর, এয়ারপোর্টের গেটের প্রহরীদের চোখের সামনে দিয়েই বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে যাবে তারা। এতটুকু সন্দেহ হবে না তাদের। চায়ের গাড়ি চা পরিবেশন করে বেরিয়ে যাচ্ছে এতে সন্দেহ করার মত কী থাকবে?

'ক্লিক' করে একটি শব্দ হলো। দলপতির হাতে সিন্দুকের প্রথম তালাটি খুলে গেল। তারপরে পর পর আরও কয়েকটি তেমনি শব্দ। একে একে সব কটি তালা খুলে যেতেই দলপতি তার পেশীবহুল হাতের চাপে সিন্দুকের ভারি ডালাটা খুলে ফেললো। ভেতরে সারি সারি সোনার বাট।

বিরাট ঐশ্বর্য এবার তাদের হাতের মুঠোয়। সেই বাটগুলোর দিকে চোখ পড়তেই প্রত্যেকের চোখই উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সেই উজ্জ্বলতায় মিশে রয়েছে লোভের আগুন। দু'দশ হাজার নয়, দশ লক্ষ ডলার মূল্যের সোনার অধীশ্বর তারা। আগামীকাল সকালে যখন এই বিরাট চুরির ঘটনা জানাজানি হয়ে যাবে তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকবে লণ্ডনবাসীরা। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্তাদের কপালে। চর-অনুচর নিয়ে শিকারী বেড়ালের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে তারা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে হয়তো দলপতি তার দলবল নিয়ে লণ্ডনের কোন এক বিলাসবহুল হোটেলে আনন্দে মশগুল হয়ে খানাপিনায় ব্যস্ত হয়ে থাকবে। সোজা কথা তো নয়, তখন তারা দশ লক্ষ ডলারের মালিক। দু' হাতে খরচ করতে তখন আর তাদের বাধা কোথায়?

দলপতি একবার ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের দিকে তাকায় যার একমাত্র অর্থ তারা প্রস্তুত কিনা। সঙ্গীরাও নিঃশব্দে ঘাড় ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দেয় যে তারা প্রস্তুত। খুশি মনে দলপতি এবার হাত বাড়িয়ে প্রথম সোনার বাটখানি তুলতে যেতেই যেন বাজ পড়ে ঘরের মধ্যে!

—স্টপ! থামো! যে যেখানে আছো ঠিক তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। এক চুল নড়াচড়া করতে চেষ্টা করো না।

দৈববাণী নাকি? সত্যিই তাই। আবছা অন্ধকারের মধ্যে ঠিক দৈববাণীর মতই শোনায় উইলিয়াম চ্যাপম্যানের সেই

গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

ভুত দেখার মত প্রথমটায় দারুণ চমকে ওঠে গোটা দলটি। দলপতির হাত থেকে সোনার ভার বাটখানা খসে পড়ে মেঝেয়। সঙ্গীদের হাতে সেখানা তুলে দেওয়ার আর অবসর পেল না সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই সেই ভাবটুকু কাটিয়ে ওঠে তারা। বিপদ—মস্ত বড় বিপদ তাদের সামনে। জালে আটকে পড়েছে তারা। পুলিসের শক্ত জাল, সম্ভবতঃ খোদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডই ছড়িয়ে রেখেছে এই জাল। কিন্তু ওরা টের পেল কেমন করে, তবে কি দলের মধ্যেই কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, নাকি সেই কুলীটা?

কিন্তু এ প্রশ্ন নিয়ে এখন চিন্তা করার সময় নেই। বাঁচতে হবে এবার। বাঁচতে হবে গোটা দলটিকে, দশলক্ষ ডলারের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে এবার কোন মতে পালিয়ে বাঁচতে হবে।

মুহূর্তে সদলে ঘুরে দাঁড়ায় দলপতি। লক্ষ্য তাদের স্ট্রং-রুমের দরজার দিকে। ঐ দরজা দিয়েই পালাতে হবে।

কিন্তু ওকি? দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে কারা? ভুঁই-ফোড়ের মত ওরা কোত্থেকে উদয় হলো?

ইউলিয়াম চ্যাপম্যান ও রবার্ট লী ততক্ষণে তাদের সঙ্গীদের নিয়ে সিন্দুকের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে স্ট্রং-রুমের দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। ওদিকে চ্যাপম্যানের কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সিকিউরিটি গার্ড-দের কপট নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছে এতক্ষণে। তারাও নিজেদের হাত পায়ের বাঁধন খোলার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

যাতাকলে আঁটকে পড়েছে ইঁদুর কিম্বা খাঁচায় আঁটকে পড়েছে একদল বাঘ অথবা জঙ্গলের খেদায় বন্দী হয়েছে একদল বুনো হাতি। কিন্তু তাই বলে চুপ করে সেই বন্দীত্ব মেনে নিতে পারে না তারা। আঁচড়ে-খামচে কিম্বা শক্ত শুঁড়ের সাহায্যে খেদার কাঠের গুঁড়ি ভেঙ্গে তছনছ করে মুক্তির পথ খুঁজতে তারা চেষ্টা করবেই।

নিরস্ত্র দু'দল-ই। স্ট্রং-রুমের মেঝেয় পড়েছিল একটা ভারি সাঁড়াশী। দলের মধ্যে একজন সেটা তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারে পুলিসের দিকে। একজন সার্জেন্টের মাথায় এসে আঘাত করে সেই ভারি বস্তু। দর দর করে রক্ত ঝরতে থাকে ক্ষতস্থান দিয়ে।

আরম্ভ হয় দু'দলে দ্বন্দ্বযুদ্ধ। স্ট্রং রুমের মধ্যে রক্ষিত ছোট চেয়ার টেবিল দিয়েই প্রথমটায় সেই যুদ্ধের সূচনা। অবশেষে হাতাহাতি লড়াই।

ইলেকট্রিক বালব ভেঙ্গে গিয়ে অন্ধকার হয়ে ওঠে সেই অপরিসর স্ট্রংরুম। মেঝেয় আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে ওঠে কেউ। কেউ বা নাকে-মুখে প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দেয়ালের ওপর। চোখের পলকের মধ্যেই একটা লঙ্কা-কাণ্ড শুরু হয়ে যায় ঘরের মধ্যে। কিন্তু যার জন্যে এত কাণ্ড সেই সোনার বাটগুলো খোলা পড়ে থাকে সিন্দুকের মধ্যে। ঐ দশ লক্ষ ডলারের দিকে কিন্তু সেই মুহূর্তে নজর দেবার কেউ থাকে না।

পাশের ঘরের হৈ-চৈ শুনে মিঃ ফিস কিন্তু টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়েছেন নিজের হাতে। ডায়ালে তিনটি 'নয়' ঘুরিয়ে দিতেই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনফর্মেশন রুমে জেগে ওঠে একটি কণ্ঠস্বর—'হ্যাল্লো।' পরক্ষণেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে বেতার সংকেত—হ্যাল্লো স্কোয়াড কারস, ইট ইজ ইয়ার্ড স্পিকিং! হীথরো এয়ারপোর্টের প্রত্যেকটি রাস্তা আটকে পুলিস গাড়িগুলো এগিয়ে যাও। ক্রিমিন্যালস আর ইন অ্যাকশন ইন এয়ারপোর্ট।'

বেতার সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস ভ্যান-গুলো তীব্র সার্চলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে যায় এয়ারপোর্টের দিকে। বেজে ওঠে এয়ারপোর্টের বিপদ সংকেতজ্ঞাপক বাঁশি। আর ওদিকে সেই গুদাম ঘরের মধ্যে তখনও চলেছে দু'দলের মধ্যে মরণপণ লড়াই যা নাকি পরবর্তী কালে 'ব্যাটল অব হীথরো এয়ারপোর্ট' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

ধরা পড়লো গোটা দলটি। একজনও পালাতে পারলে না। কিন্তু এর জন্যে ফ্লাইং স্কোয়াডকে কম খেসারত দিতে হয়নি। সেদিন পুলিসবাহিনীর মধ্যে কেউ নিহত না হলেও গুরুতর আহত হয়েছিল অনেকেই। হাসপাতালে শয্যা নিতে হয়েছিল অনেককেই। ক্রিমিন্যালদের মধ্যেও কেউ কেউ ওল্ড বেইলীর আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবার আগে হাসপাতাল ঘুরে আসতে হয়েছিল।

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। বুদ্ধির লড়াই। সার্থক হয়েছিল চীফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট উইলিয়াম চ্যাপম্যান ও চীফ ইন্সপেক্টর রবার্ট লী'র পরিকল্পনা। দীর্ঘ মেয়াদের কারাবাস জুটেছিল সেই দলপতি ও তার সঙ্গীদের কপালে। সিন্দুক খুলে সোনার বাট সরাবার মুহূর্তে ধরা পড়েছিল বলেই তাদের শাস্তির মেয়াদ এত দীর্ঘ হয়েছিল।

বিচার পর্বের শেষে ওল্ড বেইলীর আদালত ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি অফিসার ডোনাল্ড ফিস উইলিয়াম চ্যাপম্যানের সঙ্গে করমর্দন করে বলেছিলেন—কনগ্রাচুলেশন! অভিনন্দন জানাচ্ছি!

জবাবে চ্যাপম্যান মৃদু হেসে বলেছিলেন—থ্যাঙ্ক ইউ।
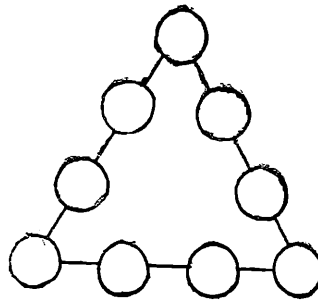
ধাঁধার সমাধান

গুপীমামার কথাবার্তা থেকে যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তা থেকে ফাইনাল খেলার ফলাফলটা ধাপে ধাপে বের করে নিতে হবে এইভাবে :

(১) মোট গোল হয়েছে ২২টা এবং সাতটা খেলার সবকটা ফলাফলই ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ফলাফল সাতটা ১-০, ২-০, ২-১, ৩-০, ৩-১, ৩-২ এবং ৪-০ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। যেমন, ১-০ এর বদলে ৪-১ হলে মোট গোল সংখ্যা ২৬ হয়ে যায়।

(২) ২২টা গোলের মধ্যে মাহীন্দ্র, অন্ধ্র, মোহনবাগান এবং সার্ভিসেস করেছে মোট ৭+৫+৪+৪=২০ খানা। সুতরাং বাকী চারটে দল করেছে মোট ২ খানা। এদের মধ্যে আবার মহীশূর, লীডার্স এবং ইস্টবেঙ্গল গোল করেছে সমান সংখ্যায়। সুতরাং এদের প্রত্যেকের স্বপক্ষে গোলের সংখ্যা ০ এবং নেভির স্বপক্ষে ২।

(৩) নেভির থেকে মোহনবাগানের স্বপক্ষে গোলসংখ্যা বেশি। সুতরাং (২) থেকে পাওয়া যাচ্ছে মোহনবাগান-নেভি : ৩-২, কারণ সম্ভাব্য ফলাফলগুলোর মধ্যে বিজিত দলের ২ গোল একমাত্র এই ফলাফলেই সম্ভব।

(৪) ইস্টবেঙ্গল, মাহীন্দ্র এবং নেভির বিপক্ষে গোলের সংখ্যা সমান। সুতরাং (২) এবং (৩) থেকে পাওয়া যাচ্ছে সার্ভিসেস-ইস্টবেঙ্গল : ৩-০।

(৫) মোহনবাগানের স্বপক্ষে মোট গোল ৪। সুতরাং সেমিফাইনালে মাহীন্দ্রর বিরুদ্ধে (প্রতিপক্ষ মহীশূরের গোলসংখ্যা যেহেতু ০, মাহীন্দ্রই সেমিফাইনালে উঠেছে) মোহনবাগান ১ গোল দিয়েও হেরেছে, কারণ সেমিফাইনাল পর্যন্ত মাহীন্দ্রর বিপক্ষে গোল দাঁড়াচ্ছে ১, কিন্তু দলটির বিপক্ষে মোট গোল ৩। সুতরাং মাহীন্দ্রকে আরও একটা খেলতেই হচ্ছে। এ থেকে অতএব আরও পাওয়া যাচ্ছে যে, ফাইনালে মাহীন্দ্রর বিরুদ্ধে ২ খানা গোল হয়েছে।

(৬) এদিকে সার্ভিসেসের স্বপক্ষে মোট গোল ৪, কিন্তু দলটি ইস্টবেঙ্গলকেই দিয়েছে ৩ খানা। সুতরাং সেমিফাইনালে দলটি অন্ধ্রকে (অন্ধ্রই সেমিফাইনালে উঠেছে, কারণ প্রতিপক্ষ লীডার্সের স্বপক্ষে গোলসংখ্যা ০) ১ গোল দিয়েও হেরেছে, কেননা (৫) থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে, ফাইনালে উঠলে সার্ভিসেসের স্বপক্ষে গোলসংখ্যা আরও ২ বেড়ে যেত। সুতরাং অন্ধ্রই ফাইনালে উঠে মাহীন্দ্রর বিপক্ষে ২ গোল করেছে।

(৭) অন্ধ্রের স্বপক্ষে মোট গোল ৫, এর মধ্যে ২ খানাই ফাইনালে। ফলে বাকী ৩ খানা গোল দিয়ে দলটি যেহেতু দুটো খেলায় জিতেছে এবং সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে খেয়েছেও ১ খানা, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অন্ধ্র-লীডার্স : ১-০ এবং অন্ধ্র-সার্ভিসেস : ২-১।

(৮) বিজিত দলের ১ গোল যেহেতু সম্ভাব্য ফলাফলগুলোর মধ্যে ২-১ বা ৩-১ মাত্র এই দুরকমে হতে পারে, (৫) এবং (৭) থেকে পাওয়া যাচ্ছে মাহীন্দ্র-মোহনবাগান : ৩-১।

(৯) মাহীন্দ্রর স্বপক্ষে মোট গোল ৭ এবং সেমিফাইনালে দলটি দিয়েছে ৩ খানা। বাকী ৪ খানা অতএব মহীশূর এবং অন্ধ্রের বিপক্ষে। এদিকে সম্ভাব্য ফলাফলগুলোর মধ্যে বাকী আছে ২-০ এবং ৪-০। আবার (৬) থেকে পাওয়া যাচ্ছে অন্ধ্র ফাইনালে ২ গোল করেছে। সুতরাং মাহীন্দ্র-মহীশূর : ৪-০ এবং ফাইনালে অন্ধ্র-মাহীন্দ্র : ২-০।

অর্থাৎ ফাইনালে অন্ধ্র পুলিশ ২-০ গোলে মাহীন্দ্র অ্যাণ্ড মাহীন্দ্রকে হারিয়ে শীল্ড জিতেছিল সেবার।

চোর গবা মিত্তির স্বয়ং। নির্ঘাৎ ইনশিওরেন্স-এর টাকা হাতাবার জন্যে তার এই তঞ্চকতা। বাইরে থেকে ভাঙলে শো-কেসের কাঁচ দোকানের মধ্যে পড়তো—ফুটপাতে নয়। গবার ছোট ঘরে ফিউজ বোর্ড। সেই ঘরেই গবা হিসেব-পত্র করছিল। বাইরের কারুর পক্ষে ওর দৃষ্টি এড়িয়ে মেন-সুইচ বন্ধ করা অসম্ভব। অতএব—

নাগরদোলা

[২১৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

চায়। দাঁতের উপর দাঁত চেপে একটা গর্জনও মধ্যে মধ্যে ছাড়ে।

পানুর সাহস হয় না কথা বলতে। জিজ্ঞাসা করতে সাধ হয় ওকে খুব লেগেছে কি না। লেগেছে বৈকি। কষ্টও হয়েছে। তার দোষেই তো। মিথ্যে কথা বলতে তো পারত। কিন্তু বেরুল না যে মুখ দিয়ে মিথ্যেটা। তবে তা যখন বের হয়নি তখন অর্ণবের মত যন্ত্রণা পেতে তার আপত্তি নেই। হ্যাঁ ও যদি চায় ওরকম করে মারতে তাহলে অরাজী হবে না পানু। পিঠ পেতে দেবে।

কিন্তু অর্ণব তখন লেজ আছড়াচ্ছে, মুখে গরগর শব্দ করছে, নখগুলো শাণাচ্ছে, শিকারের উপর কিভাবে ঝাপাবে তার পরিকল্পনা করছে। আর সে যে কি ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা! পানুর অসহায় অবস্থা, প্রকৃতই তার উপর সহানুভূতিভরা দৃষ্টি এবং মিথ্যে না বলতে পারার যন্ত্রণা দগ্ধতা তার দৃষ্টিতে পড়বে কেন?

সুযোগ পেয়ে পানুকে ধরল অর্ণব, 'এই যে যুধিষ্ঠির, খুব তো পিটুনি খাওয়ালে। চাকর হয়ে আমার সঙ্গে লাগতে গিয়েছ। মজাটা টের পাওয়াচ্ছি।'

পানু বলল 'সত্যি আমার খুব কষ্ট হয়েছে।' চোখ ছলছল করে উঠল তার।

ভ্রূক্ষেপ করল না অর্ণব। বলল, 'আর ন্যাকামো করতে হবে না। শোন পাততাড়ি এবার গোটাও চাঁদ। আমার পিছনে লেগেছ, এ বাড়ীর ভাতও তো তোমার উঠল। শত্রুকে বাড়তে তো দিতে পারি না।'

পানু নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

'বলি বুঝেছ। কেটে পড় এখান থেকে। নইলে খতম করে দেব।' মাথা নাচিয়ে অর্ণব বলল, 'যেভাবে তুমি খতম হতে চাও তাতে অবশ্য রাজী আছি। যদি বল জলে বিষ মিশিয়ে খাব, তাই রাজী, যদি বল পেটে চাকু চালাও তাতে রাজী, কিংবা স্রেফ রিভলবারের একটা গুলি।'

পানু তবু নীরব।

'কি কেটে পড়তে রাজী নস? যাবি না?'

পানুর অসহায় চোখে দয়া প্রার্থনার আকুলতা ফুটে উঠল।

পকেট থেকে একটা বাঁট বেরিয়ে এল অর্ণবের। তার পর টিপতেই ঝট্ করে একটা তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল ইস্পাতের ফলা ঝকমকিয়ে উঠল। চোখ নাচিয়ে ধীরে ধীরে সেটা পানুর পেটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকল। প্রায় ছুঁই ছুঁই অবস্থা হতে পানু ঝট করে সরে গেল। কিন্তু ছুরির ফলাও এগুল।

'কি যাবি?'

'হুঁ।'

'এই তো ভাল ছেলে। আজই কেটে পড় চাঁদ। বাড়ীর কাউকে বলতে যেও না বুঝেছ। তাহলে কিন্তু কুচিয়ে কুচিয়ে কাটব এখান থেকে আমাদের ক্লাবে তুলে নিয়ে গিয়ে। কাল যেন দেখতে না পাই।'

পানু শব্দ করল না। তার চোখের সামনে ছুরির ফলাটা কেবলই নাচছে।

হাওড়া স্টেশনে যে কি ভাবে এসে পৌঁছাল তা নিজেই ভাবতে পারছে না পানু। চারিদিকে মানুষ আর মানুষ। যেন মেলা লেগেছে। কত যে রাস্তা। সরু চওড়া আঁকা-বাঁকা সোজা। গাড়ী ছুটছে হুসহুস। কত বিচিত্র গাড়ী, কত রঙ। বিশাল বিশাল অট্টালিকা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে বিজ্ঞাপনের রঙিন ছবি নিয়ে। চারদিকে কি ভীষণ ব্যস্ততা। আর কত রকমের শব্দ গাড়ীর মানুষের। কত বিচিত্র পথ যে ঘুরেছে। দু'পা টনটন করছে যন্ত্রণায়। হ্যাঁ গুরুচরণ কেবিনে গিয়ে হাজির হবার জন্যেই হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে সে বেরিয়েছে।

স্টেশনের ভেতর এলোমেলো ঘুরে ভয়ে ভয়ে সে এক সময় প্ল্যাটফর্মে ঢুকেছে। না, কেউ বাধা দেয়নি। কিন্তু কত ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, কত যাত্রী উঠানামা করছে। সে কোনটায় উঠবে। ভাবতে ভাবতে একসময় বসে পড়ে প্লাটফর্মের উপর। ইঞ্জিনের বাঁশির শব্দ শোনে, স্টেশন ছেড়ে যাওয়া গাড়ীর বাজনা শোনে, মাথার উপরে অদৃশ্য কণ্ঠস্বরে ট্রেনের নাম ছাড়ার সময় বাংলা হিন্দী ইংরাজীতে ঘোষণা করতে শোনে, মানুষের হাঁকডাক হকারদের চিৎকার শোনে। আর ভাবে কি করবে সে। ঝিমিয়ে আসে সর্বাঙ্গ। পেট খাঁ খাঁ করছে। বার কয়েক জল খেয়েছে। আর জল খাওয়ার উৎসাহও নেই। অবসাদে ভরে ওঠা শরীর এই শক্ত প্লাটফর্মে তাকে শোবার জন্য টানে।

পানু ভাবে কিন্তু গুরুচরণ কেবিনে কি তার জায়গা

খালি আছে? হয়ত নেই। নতুন কাউকে নিয়েছে। নোটনের কাছে গিয়ে অবশ্য দাঁড়াতে পারে। গেলে তো আবার তাকে কলকাতায় পাঠানর ব্যবস্থা হবে। তাছাড়া কেন এসেছে বলবে সে কি করে!

হঠাৎ একটা ডাকে চমক খেয়ে তার জ্ঞান হল। উঠে বসল দ্রুত। সামনে মোটা সোটা ধবধবে ফরসা এক মহিলা। ছাপা শাড়ী, মাথায় ঘোমটা। হ্যাঁ তার দিকে ঝুঁকেই মহিলাটি দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে কোথায়। আলো জ্বলছে চারিদিকে। ফ্যাল ফ্যাল চোখে দেখার পর সব মনে পড়ল পানুর। হুঁ হাওড়া স্টেশন। কিন্তু অত শব্দ কোথায় গেল। মানুষজনও বিশেষ নেই। ওধারে একটা খয়েরী ট্রেন কেবল দাঁড়িয়ে।

'এই খোকা হামার সাথে যাবি।' মহিলাটি আধা হিন্দী আধা বাংলাতে যা বললেন তা হল—ট্রেন লেট করে এসেছে। এখন অনেক রাত গাড়ী পাওয়া যাবে না। স্বামীর অসুখ। সালকিয়াতে থাকে। চিঠি পেয়েই সে চলে এসেছে। সঙ্গে লোকও আনে নি। এখন হেটে তার সঙ্গে যেতে হবে। পয়সা দেবে অবশ্য তাকে। একলা রাত্রিবেলায় যেতে তার ভয় করছে।

উঠে দাঁড়াল পানু ওর সঙ্গে যাবার জন্যে। বলল, 'চলুন।'

'চল বেটা হামার সাথে।' মোটা সোটা মহিলাটি যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন 'তোকে খুশ করে দেব আমাকে পৌঁছে দিলে।'

পানু শুধু সঙ্গী হল। জিনিসপত্র কিছুই নেই যে বইতে হবে। রাস্তা সে চেনে না। পাশে পাশে কেবল হাটতে থাকল হাওড়া স্টেশন থেকে বেরিয়ে নির্জন জনশূন্য রাত্রির পথে।

ল্যাম্পপোস্টের নিঃসঙ্গ লালচে আলোধরা পথের দু'ধারে অনেক অনেক স্তব্ধ বাড়ী পার হয়ে অনেক বাঁক নিয়ে একটা দোকানের ঝাঁপে ধাক্কা দিতে থাকলেন মহিলা। ভেতরে আলো জ্বলছে। ঝাঁপ খুলল একজন মানুষ। তারপর 'ও মাইজী' বলে চেঁচিয়ে উঠল।

পানু দেখল একটা লোহালক্কড়ের দোকান। মাঝে খ'টের উপর শুয়ে আছেন একজন মোটাসোটা মানুষ। সাড়া শব্দ নেই। এ যে মহিলার স্বামী তাতে সন্দেহ থাকল না পানুর।

মহিলাটি দ্রুত বিছানার পাশে গেলেন। তারপর লোকটির উদ্দেশে অজস্র প্রশ্ন ছুড়ে মারতে থাকলেন। সবই অবশ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত। লোকটি বেশী ভীতু। কিংবা এই মহিলাই বোধ হয় রাগী। পানুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে এক সময় বললেন, এই বেটা ছিল বলে আসতে পারলাম। হামার কেউ নেই। পানুকে বললেন, 'কি বেটা চলে যাবি? দেখ্ তোর মাইজীর কি বিপদ।'

পানু বলল, 'না যাব না।'

'তুই কে আছিস বেটা? তুই কেন শুয়েছিলিস?'

'আমার কেউ নেই মাইজী। ঘর নেই। মা'বাবা নেই।'

'লেকিন আমি আছি। বস্ বেটা। বস।'

মহিলাটির স্বামী ভোররাত্রে মারা গেলেন। আর পানুও আটকে গেল পরদিন। শব সৎকারের পরও ছাড়া পেল না। এদিকে মহিলাটির কান্না বুক চাপড়ানর সঙ্গে পানুর যে কতবড় ভূমিকা, তাকে পৌঁছে দেওয়াতে তা বারবার বলতে থাকলেন। তাকে হাওড়া স্টেশনেই থাকতে হত সঙ্গে পানু না এলে, মৃত্যুর সময় স্বামীর মুখে সে জল দিতে পর্যন্ত পারত না। বলতে থাকলেন, এ ভগবানের দয়া, ভগবানের দয়া। ভগবানই একে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কাজ মিটে যাবার পর কান্না ভেজা স্বরে বললেন, 'বেটা হামার কেউ নেই। যাবি আমার সাথে? তোরও তো কেউ নেই বেটা!'

ঘাড় কাৎ করল পানু। বলল, 'যাব।'

'পালিয়ে আসবি না?'

'না?'

'তুই আমার বেটা হবি? আমাকে দেখবি।'

'হ্যাঁ।'

দু'হাতে জড়িয়ে মহিলা তাকে কাঁদতে থাকলেন।

এর পরবর্তী ঘটনা সে এক বিরাট কাহিনী। পানুর ভাগ্যের চাকা যে এবড়োখেবড়ো পথ ছেড়ে মসৃণ পিচঢালা পথের উপর গড় গড় করে ছুটতে থাকল, এটুকু বললেই যথেষ্ট হয়।

দীর্ঘ পনের বছর পর একটা কালো অ্যামবাসেডর গাড়ী এসে দাঁড়াল গুরুচরণ কেবিনের সামনে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল প্যান্টে সার্টে টিপটপ এক বলিষ্ঠ চেহারার যুবক। ব্যাক ব্রাশ চুল। সারা শরীরে অর্থ প্রাচুর্যের চিহ্ন। এক পলক থমকে দাঁড়িয়ে সে দেখল, খড়ের চাল, সাদা অক্ষরে লেখা নীল জমি 'গুরুচরণ কেবিন' সাইনবোর্ড। ভেতরে টেবিল বেঞ্চি। দেখল ঠোঁটে বিড়ি রেখে মালিক চিৎকার করছে, এই কার্তিক

তিন নম্বরে কত রে? উনুনের সামনে বসে চা তৈরী করছে তারিণীদা। সেই টেবিল সেই বেঞ্চি সেই আসবাব-পত্র, কালিপড়া কড়াই, শো কেসে পেতলের গামলায় মিষ্টি, ডিসে সন্দেশ।

'আসুন স্যার আসুন।' গুরুচরণ ডাকল চেয়ারে বসে। সাহেবী সাজে বলেই বুঝি স্যার ডাক। কার্তিক বেরিয়ে এল 'আসুন বাবু আসুন। কি দেব?'

ঠোঁটে সামান্য হাসি দেখা দিল। না, চিনতে পারেনি তাকে। পনের বছরে তার তো নাম পরিবর্তন হয়নি। সেই ছিপছিপে ছেলেটি আর সে নেই। পরিবর্তন হয়েছে শরীরের, মনের। সে তো এখন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল। মাঝের ছবিগুলো ভেসে উঠল মনের পাতায় ঝটঝট করে। উত্তরপ্রদেশের সেই গ্রাম, মাইজীর স্নেহ তাকে ভাল করে তোলার অদম্য পরিশ্রম লেখা পড়া শেখ', বি. এ. পাশ করা. ওই সমাজের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া, কাঠের বিরাট কারবার ফাঁদা সব—সব। অবশ্য সবই ঈশ্বরের দান। সবই তার ভাগ্যের ব্যাপার। মাইজীর সহায়তা শুধু একটা ঘটনা। বাবুজী কৃপণ ছিলেন, শুধু জমিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু না, হাতে পেয়ে সে নষ্ট করেনি, কাঠের কারবারে সে অর্থ কয়েকগুণ হয়েছে। তাই না আজ বাড়ী গাড়ী। তাই না এ সাজ সজ্জা। তাই না মনে করতেই সে ছুটে আসতে পেরেছে এখানে। দাঁড়াতে পারছে বুক টান টান করে।

ভাবতে গিয়ে 'গুরুচরণ কেবিনে'র সামনে গাড়ীর হর্ণের শব্দ মানুষের চিৎকার, হাঁক ডাক সব বিস্মৃত হয়ে সে জীবন দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানায়। ভোজবাজির মত কাণ্ড, এ তো জীবন দেবতারই এক সুন্দর খেলা। তাকে ভেঙ্গে আবার নতুন করে এই গড়া।

এখান থেকে যাবার ইচ্ছা নোটনের কাছে। না, নোটনও চিনতে পারবে না। তারপর সে যাবে কলকাত্তার সেই ফ্ল্যাটে। কে জানে ওরা সেই ফ্ল্যাটে আছে কি না। নোটকের কাছে ঠিকানা নেবে না হয়।

'আসুন স্যার আসুন!' কার্তিক হাত কচলে ডাকল, সব ভাল জিনিস স্যার! কিছু ভেজাল নেই।

পা পা করে ভেতরে ঢুকে বেঞ্চিতে নির্বাক হয়ে বসে সে ভাবল, কেন এল সে? সে যে বড় হয়েছে, বিরাট কারবারী, অঢেল টাকা তার, অহঙ্কার দেখাতে? অর্ণব চ্যাটার্জীর মুখোমুখি দাঁড়াতে?

না। না। তা নয়। মাথা ঝাঁকাল নিজের। তারপর মনে হল আচ্ছা গুরুচরণদা যদি প্রশ্ন করে, বাবাকে তো খুঁজতে গিয়েছিলে? পেয়েছ বুঝি? বাবা বোধ হয় বিরাট বড়লোক হয়েছিলেন? না!

ধক্ করে উঠল বুক। এখনও ব্যথার সেই জায়গাটা আছে। পীড়া দেয়। কে জানে বাবা কোথায় আছেন! মানুষ তো জীবনে সব পায় না! কিন্তু গুরুচরণদাকে কি বলব? সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও জুগিয়ে গেল, না বাবাকে পাইনি, তবে মাকে খুঁজে পেয়েছি।'

মা। মা তো তোমার কবেই গাঁয়ে মারা গিয়েছিলেন গো!

'উহুঁ। মা তো মারা যাননি। আসলে বাবাই মারা গিয়েছেন।'

'তাই নাকি? তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, এই যে এসেছি মা কত ভাবছেন। কালকেই ফিরে যেতে হবে। বুড়ো হয়েছেন তো একদণ্ড ছেড়ে থাকতে পারেন না। তা আপনি কেমন আছেন? তারিণীদার দেখছি শরীর খারাপ হয়েছে? আচ্ছা এ কি কার্তিক?

পায়ে পায়ে সে এগিয়ে চলল গুরুচরণের দিকে। পায়ের পাতায় তার লজ্জা সঙ্কোচের জড়তা। নিচু গলায় চাপাস্বরে সে গুরুচরণের সামনে গিয়ে বলল, 'আমি আপনার পানু গুরুচরণদা, আমাকে চিনতে পারছেন না?'
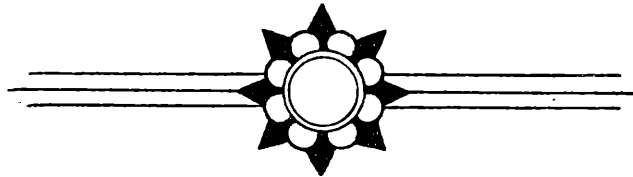
শরতের রূপকথা

আদিত্য রায়চৌধুরী

কাজল মেঘের কালির চিহ্ন তুলেছে কে ছই হাতে,
ঝক্‌ঝকে ধোয়া নিকানো মুছানো আকাশের অঙিনাতে

সোনা-রোদ্দুরে চোখ ঝলসায়,
সুনীল ছন্দে পাখির ডানায়,

শঙ্খচিলের হাতছানি ভাসে মায়াময় নীলিমাতে।
শরৎ এসেছে সোনালী আলোর থৈ থৈ বন্যাতে॥

সবুজ পাতার শয্যাটি ছেড়ে ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি,
শিশির ধোয়ানো স্নিগ্ধ মুখেতে পরনে হলদে শাড়ি।

বৃন্তের ওই দুয়ারটি খুলে।
শিউলি মেয়েটি যেন সব ভুলে

চুপি চুপি তার পা টিপে টিপে হাতে গন্ধের ঝারি।
পথের ধূলায় নেমে এসে, দেখো, আঁচল
বিছালো তারই॥

যাযাবরী ওই তাতারী মেঘের দস্যুরা করে ভিড়,
নীল আকাশের তেপান্তর সে হল্লায় অস্থির,

দূরে এক পাশে ঢেউ তুলে চলে,
সুনীল আকাশ সমুদ্র জলে,

কান্দাহারের রাজকন্যার ময়ূরপঙ্খীটির—
উদ্ধত যতো সাদা খোলা পাল উদ্দাম অস্থির॥

এসেছে শরৎ, শরৎ এসেছে নির্ভার মন-প্রাণ,
ঢাকীর কাঠিতে আকাশে ছড়ায় আনন্দময় গান,

বন্ধু গো, দুর্ভাবনাকে ভুলি,
এসো করি আজ সেই কোলাকুলি,

যেথা খোলাখুলি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতি অনুসন্ধান,
এসেছে শরৎ, তোলো গো বন্ধু সেই মাধুরীর দান॥

শরৎ ঃ তোমার কাছে ঃ অপূর্বকুমার কুণ্ডু

যে ছেলেটা ঘুরছে একা এমন পুজোর দিনে,
একটা নতুন জামা তাকে দেয় নি তো কেউ কিনে।
পুজোর খুশী ছই চোখে তার অশ্রু হয়ে ঝরে—
কেউ তো তাকে ডাকছে না হায় একটু আদর করে।
শরৎ, তুমি একটু যেও ঐ ছেলেটার কাছে—
তোমার আলোর ধারায় যেন নতুন করে বাঁচে।

যে মেয়েটা সকাল ছপুর ইস্টিশানের ধারে
কয়লা বাছে, মা ছাড়া তার কেউ নেই সংসারে।
পুজোর দিনে যায় না তো কেউ ঐ মেয়েটার পাশে,
ছঃখিনী মা ছঃখ চেপে চোখের জলে ভাসে।
শরৎ, তুমি একটু যেও ঐ মেয়েটার কাছে,
শিউলি ফুলের গন্ধে যেন নতুন করে বাঁচে॥

শিশিরে ঃ রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

হেমন্ত অনেক দূরে নয়—
সে কথা সকালে ঝরা ফুলের পাপড়ি ভরা
শিশিরের ঘামছিটে পেলে পরিচয়।
সে ফুলটি হাতে তুলে দেখি চিকচিক ছুলে
ছড়িয়ে রয়েছে যেন হীরে-কুচি কত—
অথবা অভ্রের ঝুরো পুজোর নৈবেদ্য-চুড়ো
শারদীয় সারা কাজে আদরের যত।
ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে চলে চলে গিয়ে
প্রাপ্তিতে শিশিরভেজা ঠাণ্ডার ছোঁয়াচ—
সামান্য বাতাসে ফেরে সুদূর আকাশ ঝেরে
মাটির ঘাসের সোঁদা ঘ্রাণের মেজাজ।
ফিরে আসে প্রতিবার ভাষার অজানা হার,
জীবনের ছন্দে ছন্দে আনন্দ দোলায়—
বৃষ্টি-ধোয়া শরতের নীলাম্বর প্রভাতের
আলোকিত আভাসের সুন্দর মেলায়।

শরৎ এলো ঃ করুণাময় বসু

পাঠশালাতে ছুটির ঘণ্টা বাজলো ঢঙ ঢঙ,
নীল আকাশে কে আঁকালো ইন্দ্রধনুর রঙ।
উত্তরেতে হাঁসের সারি
মেঘের দেশে দিচ্ছে পাড়ি,
বাজছে দূরে খুশির সুরে নদীর জলতরঙ।

রোদে এখন হীরে-মানিক, মাঠে সবুজ ধান
পাতার ফাঁকে দোয়েল পাখির ছোট্ট খুশির গান।
গাঁয়ের বাউল একতারাতে
কী সুর বাজায় সন্ধ্যেরাতে,
রাখাল ছেলের বাঁশির তানে ভাটিয়ালির টান।

প্রজাপতির ঝাঁক বসেছে ফুলের পাড়ায় পাড়ায়,
পদ্মবনে মৌমাছিরা আপনমনে বেড়ায়।
মা এসেছে, পুপুন হাসে,
বলছে, পুজোর গন্ধ আসে,
আটচালাতে মায়ের মূর্তি, দেখবি যদি আয়।

পড়া ঃ রবি ভট্টাচার্য

পড়-পড়া করে কেন কর জ্বালাতন ?
পিছলিয়ে পড়ে নাকি দাদু গত হন।
জল পড়ে, পাতা নড়ে, বাজ পড়ে—বাজ!
বিয়ের মন্ত্র পড়ে রঘু ভট্চায।
চাল পড়ে তেল পড়ে ওঝা রামশিস
বিষ ঝাড়ে আর খোঁজে হারানো জিনিস।
শীত পড়ে, হাঁক পড়ে, খেজুরের রস
মনে পড়ে পিঠে-পুলি মন করে বশ।
আজ যা ঘটনা শুনি চাপা পড়ে কাল,
অসময়ে কারো কারো পিঠে পড়ে তাল।
টাক পড়ে মাথা জুড়ে, ছানি পড়ে চোখে
গোলমালে কেটে পড়া ভালো বোঝে লোকে।
পাখি পড়া করে তাকে ঠিকানা ও নাম
বলে দিদি, তবু ভুল করে বলরাম।
পালে যেন বাঘ পড়ে পুলিসের গাড়ি
হাতেনাতে ধরা পড়ে ডাকাতের ধাড়ি।
পেটে পড়ে কিছু যদি মন থাকে খুশী,
টান পড়ে ইলিশে কি ? খেয়ে গেল পুষি।
এত পড়া পড়ে দিই, লিখি বসে ছড়া,
তবু সেই ঘ্যান ঘ্যান—পড়া-পড়া-পড়া!

।। বরিশালের বদরুদ্দিন আলি ।।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

বরিশালের বদরুদ্দিন আলি
কথাবার্তা কেমন যেন একটু বাঁকা-বাঁকা,—
মাঝে মাঝেই যখন তখন যাকে তাকে গালি।
তাঁর সঙ্গে কথা বলা, একটু সময় সঙ্গে তাঁর থাকা
অসম্ভব। রুক্ষ স্বভাব বদমেজাজী বদরুদ্দিন আলি।
হয়তো তাঁকে বলল কেউ নমস্কার করে,
"মিঞা সাহেব, কেমন আছেন ? ভালো ?"
গোমড়া মুখে উদ্ধত স্বরে
বলবেন, "তোমার কী হে তাতে ?
এসব প্রশ্ন করার তুমি কে ?" মুখটি করে কালো
লোকটি হয়তো চলে গেল মাথাটি নীচু করে।
কী আসে যায় তাতে
বরিশালের বদমেজাজী বদরুদ্দিন মিঞার!
প্রতিবেশী সবার সঙ্গে এমনি রোজ রূঢ় কঠিন হয়ে
চলত তাঁর। শেষে কথা বলত না কেউ আর
সঙ্গেতে তাঁহার।
দূর থেকে সব চেয়ে দেখত অবাক বিস্ময়ে।
[এডোয়ার্ড লিয়র অবলম্বনে]

নিজেই আমি ঃ শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

খুব ভোরে কেউ ডাক দিলো যে
তুলবে চলো ফুল,
ডাকলো যে তার খুব চেনা স্বর,
হয়নি শোনার ভুল।

বললো কে আজ সারা বেলা,
নদীর ধারে করবো খেলা,
কিংবা দুজন আপন মনে
ছুটবো সবুজ মাঠে;
ফিরবো ঘরে, অনেক পরে,
সূর্য গেলে পাটে।

কার চেনা স্বর ভাসলো কানে,
আমি ছাড়া কেই বা জানে,
সঙ্গী হবার ডাক দিয়ে যে
করতে বলে খেলা,
কেউ নয় সে, নিজেই আমি,—
আমার ছেলেবেলা!

দুই বাংলার ছড়া ঃ বিমল সেন

ঠাকুমা ছিলেন বরিশালে
ঠাকুরদাদা খুলনায়
ষোল সালের সাইক্লোনেও
সরেননি একচুল না
ছেচল্লিশে একবেশীতে
কোথাও পেলেন কূল ?
না।

ছয়জদ্দি, সামাল সামাল
আবালগাথির বাঁক
সামনে ডাকাত-ডিঙ্গি এবং
পাশেই ঘূর্ণিপাক
কামাল মাঝি নৌকাসমেত
মাঝগাঙে ঝাঁপ দিয়া
উঠলি ভেসে স্বাধীন দেশের
রাজধানীতে গিয়া।

একধামা না, দুই ধামা না,
হাজার হাজার ধামা
ভর্তি 'গুরু' পাঞ্জাবি আর
বেলবট পায়জামা
পেলেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা
পাঁচশো বছর পরে
সুতানুটির নরম মাটির
গভীরে—নাচঘরে॥

আহারতত্ত্ব

সুশীলকুমার গুপ্ত

আমাদের নিতুমামা ছিল বড় খাইয়ে,
রাতারাতি হয়ে গেল নামজাদা গাইয়ে।

আহারের সাথে যত ব্যাভারের যোগাযোগ
প্রমাণ করতে গেলে দশ কিলো রাজভোগ।

দেখালে সে, ঝিঙে খেলে শিঙে লোকে ফুঁকবেই,
কই খেলে মই চড়ে নাচবেই ধেই ধেই।

আণ্ডা খেলেই হাতে ডাণ্ডার হুমকি,
কফি পানে ট্রফি পাবে ভাগ্যের চুমকি।

নাড়ুতে কামড় দিলে ঝাড়ু নিয়ে ছুটবে,
আচারে নাচার হয়ে মাথা ছাদে কুটবে।

শরবতে আধুনিক কবিতার মহরত,
চিনি চেখে মিনি বাসে পাড়ি দিতে হবে পথ।

পটলে অটল থাকে, দুধে বুঁদ নিশ্চয়,
মুরগির ঠ্যাঙ দাঁতে চিবলেই ব্যাঙ হয়।

চীজ খেলে ব্রিজ খেলে, মুড়ি খেলে মারে গুড়ি,
রুই খেয়ে 'মুই' বলে দেয় লোকে তিন তুড়ি।

স্যালাডে ব্যালাড লেখে, সুপে মন নিশ্চুপ,
মোয়া মুখে ধোয়া মনে ছায়াছবি অপরূপ।

তার এই গবেষণা স্বদেশে ও বিদেশে
সুখ্যাত যেই হল ওঠে জোরে সে হেসে।

ভুল করে নিতুমামা খেলে শেষে ছক্কা,
থিসিসের ইতি টেনে বলে, 'সব ফক্কা!'

আলমারিটার জন্যে ঃ সুনীতি মুখোপাধ্যায়

বই কিনেছেন বিলাসবাবু
হাজার হাজার কেতাব,
শহরবাসীর কাছে পেলেন
পাঠক নামের খেতাব।
নতুন কোন জাঁদরেল বই
নজরে তাঁর এলে
বিলাসবাবু নেবেন কিনে
নগদ টাকা ঢেলে।
বাড়ি ফিরেই করেন তাকে
যত্নে তালা-বন্ধ,
বইয়েতে হাত দিলেই তিনি
করবেন গাল-মন্দ।

কেউ যদি চায় পড়তে,
বলেন, 'পরের জন্যে কেন
গেলাম খরচ করতে!'

এমন কি বই চাইলে বকেন
পুত্র কিংবা কন্যে,
বলেন, 'আমি বই কিনেছি
আলমারিটার জন্যে।'

সম্পূর্ণ উপন্যাস

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

৩২ প ৭৫

ইউসোবিও

॥ এক ॥

ট্রামটা আসছে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজিয়ে।

রাস্তাটা ভিজে ভিজে। রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ছোট্ট একটি ছেলে ট্রাম লাইনের ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো মানুষ চেহারা। মুখ দেখলে কিছু বোঝার উপায় নেই। কিন্তু চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে মাথায় তার একটা কিছু ঘুরছে।

শুধু ঐ ছেলেটিই নয়—ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ট্রাম লাইনের ধারে আরো চার-পাঁচটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভালমানুষের মত মুখ করে। সকলেরই গায়ের রং কুচকুচে কালো। রোগাটে চেহারা। একমাথা কোঁকড়ানো ছোট ছোট চুল।

ট্রামটা কাছে আসতেই পটাপট লাফিয়ে উঠে পড়ল ছেলেগুলি। চলন্ত ট্রামে উঠতে ওদের একটুও কষ্ট হল না। হ্যান্ডেল ধরে দিব্যি উঠে পড়ে গেটের কাছেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ওদের কনডাক্টারের ওপর। না, একটু দূরেই আছে। এখনো ওদের দেখেনি। দেখলেই ভাড়া লাগবে। তখন ঝটপট নেমে পড়তে হবে। ধরে ফেললেই মুশকিল। পকেটে তো কারো পয়সা নেই। ভাড়া দিতে পারবে না। দু-চারটে চড়-চাপড় পড়তে পারে গালাগাল তো আছেই। অবশ্য ওরা তার ভারী পরোয়া করে। ও সব দিকে নজর দিতে গেলে কি আর রোজ রোজ ট্রামে চড়া হয়। উঃ, ট্রামে চড়তে কি ভালই যে লাগে! কিন্তু বজ্জাত কন্ডাক্টারগুলোর জন্য কি সে উপায় আছে? উঠলেই নামিয়ে দেয়। গালা-গালি দেয়। আর সুযোগ পেলেই গায়ে হাত তোলে। না হয় ওদের পয়সা-টয়সা নেই, তাই বলে কি ওরা ট্রামে চড়বে না? কি রকম ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজিয়ে ঘড় ঘড় করে চলে।

সেদিনও কন্ডাক্টার তাড়া লাগাতেই ওরা ঝপাঝপ নেমে পড়ল চলন্ত ট্রাম থেকে। নেমেই হো-হো করে হাসি। কি মজাই যে হল। সকাল বেলাতেই ট্রাম চড়া। কি মজা!

ওদের মধ্যে একটি ছেলের হাতে এক থলে বাজার। সব থেকে ছোট সে-ই। কোনদিন বাজারে-টাজারে সে যায় না। নেহাত সেদিন বাড়ীতে কেউ নেই। তাই মা ওকে বাধ্য হয়েই বাজারে পাঠিয়েছেন। রান্না চাপিয়ে দিয়েছেন বলে নিজে যেতে পারেন নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছোট ছেলেকে বাজারে পাঠিয়েছেন। কিন্তু পাঠিয়ে অবধি বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে ওঁর। এত দূরে বাচ্চা ছেলেকে পাঠিয়েছেন। কত আজে-বাজে লোক আছে বাজারে। বড্ড চিন্তা হচ্ছে। ছেলে-টাও তেমনি। ফেরার নামই নেই।

ফিরবে কি করে? বাজার থেকে বেরুতেই বন্ধুদের সংগে দেখা। তারপরই তো ট্রামে চড়া। ট্রাম থেকে নেমে ওরা হৈ-হৈ করে এগিয়ে চলেছে পাড়ার দিকে। একদিনে কে কতবার ট্রামে চড়েছে সেই গল্পই হচ্ছে ওদের।

পাড়ার মাঠে তখন দারুণ ফুটবল খেলা হচ্ছে। কোথা থেকে একটা রবারের বল জোগাড় হয়েছে। ওরা বাতাবি লেবু কিম্বা ন্যাকড়ার বলে খেলে। রবারের বল কেনার পয়সা কোথায় পাবে। তাই রবারের বলে খেলা দেখে ওরা থমকে দাঁড়াল। পাগুলো নিশপিশ করছে। একটু খেলতে পারলে হত। খেলতেই হবে। ওরা হৈ-চৈ করে মাঠে নেমে পড়ল। হাতে যে বাজার, সে বাড়ী গেলে রান্না হবে, মা যে তার জন্যে খুব ভাবছেন—এ কথা ভুলেই গেল ছেলেটা। মাঠের পাশে থলেটা রেখে সে খেলতে শুরু করল।

সে কি খেলা! রবারের বল পেয়ে আনন্দ আর ধরে না। মনের সুখে খেলছে তো খেলছেই। ভুলে গেল স্কুলে যাবার কথা, ভুলে গেল কাজের কথা—সঙ্গে যে বাজার রয়েছে এ কথাও বেমালুম ভুলে গেল সেই ছেলেটি। একটা রবারের বল নিয়ে সারা মাঠ জুড়ে দাপাদাপি করে চলল একদল ছেলে।

গা-হাত-পা কেটে, জলে-কাদা মেখে বাজারের থলে নিয়ে ছেলেটি যখন বাড়ী ফিরলো ততক্ষণে ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পেরিয়ে গেছে।

চিন্তায়, ভাবনায় তার মা ভয়ে কাঁটা হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। নিজের ভুলের জন্য নিজেই বিরক্ত। কেন যে ঐটুকু ছেলেকে বাজারে পাঠালেন। কি বিপদ-আপদ হল কে জানে! রান্না-বান্না মাথায় উঠলো তাঁর। বাড়ীতে আর কেউ নেই। তাই তিনি বাড়ী ছেড়ে ওকে খুঁজতে যেতেও পারছেন না। দেখতে দেখতে বেলাও অনেক হয়ে গেল।

এমনি সময় ঐ অবস্থায় বাড়ী ফিরল ছেলেটি।

ওকে দেখেই মা ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন। কোথায় ছিল এতক্ষণ, কি করছিল—এ কথা বুঝতে তাঁর একটুও দেরী হল না। রাগে দুঃখে তিনি জ্বলে উঠলেন। এমন ছেলেকে কি করে ঠান্ডা করতে হয় তা তিনি ভালভাবেই জানেন।

॥ দুই ॥

মোজাম্বিকের ফেরেরা-পরিবার বেশ বড়সড়ই। আট-আটটি ছেলে-মেয়ে। কিন্তু বড্ড গরীব ওরা। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। অভাব-অনটন লেগেই আছে। তাতে কি হবে। আটটি ছেলে-মেয়ের হৈ-হুল্লোড় আর চেঁচা-মেচিতে বাড়ীটা সব সময় গমগম করে। ছোটরা মার খেত বড়দের কাছে। তবে সব থেকে বেশী খেত ঐ রোগা লিকলিকেটা। সকলে মিলে ওকে ঠেঙাত। নিরীহ, গো-বেচারা স্বভাবের ছেলে তো? নিজেকে বাঁচাতে পারতো না। পড়ে পড়ে মার খেত।

ছোট্ট ছেলে। বাড়ীর বাইরে বিশেষ যেতে পারে না। কিন্তু বাইরে যাবার জন্যে সে ছটফট করে। বাইরের জগত-টার আকর্ষণ ওর কাছে দারুণ। জানলা দিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে কবে সে বাইরের জগত-টাকে আপন করে পাবে।

ওদের গলির পাশে একটা ছোট্ট মাঠ। মাঠ না বলে এক ফালি জমি বলাই ভাল। পাড়ার ছেলেরা খেলায় মেতে ওঠে ওখানেই। চামড়ার বল কোথায় পাবে! রবারের বলই সব সময় পাওয়া যায় না। ছেলেটি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মাঠের দিকে। ওর ইচ্ছে করে মাঠে নেমে সকলের সংগে বল খেলতে। পা দুটো নিশপিশ করে। কিন্তু উপায় নেই। মা কিছুতেই বেরুতে দেবেন না।

দাদাদের খাতার পাতা ছিঁড়ে গোল করে তার ওপর ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে বল বানায় সে। তারপর বাড়ীর মধ্যেই সুরু হয় তার খেলা। ছোট্ট বাড়ী। কোথায় খেলবে? কখনো সেই ন্যাকড়ার বল গিয়ে পড়ল রান্নাঘরে রান্নার

মধ্যে, আবার কখন দিদির মুখে। এই নিয়ে হৈ-হৈ কান্ড। মার কাছে মার খাওয়া তো আছেই।

বেশীদিন আর বাড়ীর মধ্যে আটকে রাখা গেল না তাকে। রেখেই বা কি লাভ হচ্ছিল। সুযোগ পেলেই তো রাস্তায়। ট্রামে চড়া আর বল খেলা।

ফেরেরাদের বাড়ীর ঐ ছেলেটি—যার জন্ম ১৯৪২ সালের ২৫শে জানুয়ারী, নাম ইউসোবিও—কিন্তু দারুণ খেলে। ঐটুকু ছেলে, পায়ের আড় ভাঙেনি এখন, কিন্তু খেলা দেখ—ঠিক যেন বড়দের মত। বল ধরা, পাশ দেওয়া, সট মারা—এ যেন ওর জন্মগত অধিকার। ওর বয়সী ছেলেরা কিছুতেই ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না। পায়ে বল পড়লে ও যেন পাগল হয়ে ওঠে। একদিন ওরা সকলে মিলে বড়দের চামড়ার বলের খেলা দেখে এসেছে। কত বড়, কি সুন্দর বল! খেলেও আরাম আছে। কবে যে ওরা চামড়ার বলে খেলবে! চামড়ার বল? রবারের বলই জোটে না ওদের। খেলার বল জোগাড় করতে পারে না ওরা। কি যে দুঃখ। এত গরীব ওরা যে এক পয়সা, দু পয়সা করে জমিয়ে একটা বল কিনবে সে উপায়ও নেই।

আর একটু বড় হতেই ইউসোবিওকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন তার মা। ভারী মজা এখন তার। এই তো সে চাইছিল। প্রায় সারাটা দিন বাড়ীর বাইরে। খেলার মাঠেই কেটে যেত তার সময়। বন্ধুরা মিলে একটা দল গড়ে ফেলল। দলের নাম দেওয়া হল ব্রেজিলিয়ান্স। শুধু দলের নামই নয়—খেলোয়াড়দের নামও এসে গেল ব্রেজিল থেকে। সেরা সব খেলোয়াড়। বিশ্বজোড়া নাম। এক ডাকে সকলে চেনে। ব্রেজিলিয়ান্স দলের ছোট্ট ছোট্ট খেলোয়াড়রা নিল সেই জগতজোড়া নামগুলো। কেউ হলো গ্যারিঞ্চা, কেউ ডিডি; ইউসোবিওর নাম হল নোনে।

ব্রেজিলিয়ান্স প্রতিযোগিতায় খেলতে নামল। ছ'টা দল খেলছে। প্রত্যেকটা খেলায় জিতলেই টাকা পাওয়া যাবে। ব্রেজিলিয়ান্স দারুণ খেলল। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেগুলোর কি দাপট। কোন দল দাঁড়াতেই পারল না তাদের সামনে। প্রত্যেকটা খেলাতেই জিততে লাগল তারা। জেতার পুরস্কার হিসাবে টাকাও জমতে লাগল। প্রতিযোগিতার শেষে দেখা গেল অনেক টাকাই এসে গেছে ওদের হাতে।

ব্যস, আর কি চাই! চামড়ার বল কেনা হল। সকলের গায়ে উঠল জার্সি। বুটও কেনা হল। জার্সি গায়ে দিয়ে বুট পরে ব্রেজিলিয়ান্সের পাঁচকে পাঁচকে খেলোয়াড়রা রাতারাতি যেন মস্ত বড় খেলোয়াড় হয়ে গেল।

পড়াশোনার দিকে কিন্তু একটুও নজর নেই ইউসোবিওর। সুযোগ পেলেই ক্লাস থেকে পালায়। ক্লাসে থাকলেও পড়া পারে না। মন তার সব সময় ফুটবল মাঠের দিকে। যে মাস্টার মশাইরা খেলা ভালবাসেন তাঁদের কাছে ইউসোবিওর সাত খুন মাপ। কিন্তু সকলে তো আর সমান নন। তাই কেউ কেউ তার ওপর দারুণ চটা। তাঁদের ধারণা, কিচ্ছু হবে না ছেলেটার। গোল্লায় যাবে। শুধু খেলে বেড়ালে কি আর পড়াশোনা হয়, না পরীক্ষায় পাশ করা যায়। যত্তো সব.........।

ফাদার হেনরিক ছিলেন ইউসোবিওর ওপর দারুণ চটা। লেখাপড়া ছাড়া তিনি আর কিছু বুঝতেন না। আর ইউসোবিওর লেখাপড়ার সঙ্গে কোন সম্পর্কই ছিল না। ক্লাসে তাকে খুঁজেই পাওয়া যেত না। ফাদার অবশ্য জানতেন তাকে কোথায় পাওয়া যাবে।

সেদিন ক্লাস থ্রির সঙ্গে ফোরের ম্যাচ হচ্ছে। ক্লাস থ্রির ইউসোবিও ঠিক দু-তিনটে গোল দেবেই। সেদিনের খেলাটা তাই খুব জমে উঠেছে। ক্লাস ফোর দারুণ লড়ছে। কিন্তু ইউসোবিওকে কেউ রুখতে পারছে না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লাস থ্রি ৩—১ গোলে এগিয়ে গেল। ফোরের কপালে দুঃখ আছে। কত গোলে হারতে হবে কে জানে!

ওদিকে হয়েছে কি ইউসোবিওকে ক্লাসে না দেখে ফাদার হেনরিক তাকে খুঁজতে বেরুলেন। তিনি জানতেন কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। সোজা এসে হাজির হলেন খেলার মাঠে। যা ভেবেছেন ঠিক তাই। ফুটবল খেলছে ইউসোবিও। ফাদার দূর থেকে দেখলেন ইউসোবিওকে কেউ রুখতে পারছে না। ঐটুকু ছেলে কি খেলাই না খেলছে! তাহলে কি হবে! রেগে গেলেন ফাদার। ক্লাস-পালিয়ে এই সব হচ্ছে। লেখাপড়ার নাম নেই। দাঁড়াও, আজ তোমার মজা দেখাচ্ছি। খেলার মাঠ থেকে সকলের সামনে দিয়ে কান ধরে নিয়ে যাব। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ফাদার হেনরিক ততক্ষণে দাঁড়িয়েছেন ক্লাস ফোরের গোলের পেছনে।

ঠিক তখনই ইউসোবিওর পায়ে এল বল। বাঁ পা, ডান পা করে বল নিয়ে এগিয়ে এসে প্রচন্ড জোরে সে গোলে মারলো। বুলেটের মত বলটা ছুটে গেল। গোলে ঢুকলো না বলটা। পোস্টের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা লাগল ফাদার হেনরিকের মাথায়। টলে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে কোন রকমে সামলে নিলেন ফাদার।

আর সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত চমকে উঠল ইউসোবিও।

ফাদার হেনরিক ততক্ষণে দুটি ছেলেকে পাঠিয়েছেন ইউসোবিওকে ধরার জন্য।

কিন্তু কোথায় সে!

মাঠ ছেড়ে ইউসোবিও তখন রাস্তা ধরে ছুটছে ঝড়ের বেগে.........

॥ তিন ॥

একটু একটু করে বড় হচ্ছে ইউসোবিও। আরো ভাল খেলছে সে। স্কুল আর পাড়ার মাঠ ছাড়িয়ে তার খেলার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সকলেই শুনছেন ইউসোবিও নামে একটি বাচ্চা ছেলে নাকি দারুণ খেলছে। প্রত্যেকটি খেলাতেই সে নাকি গোল করে। তাকে কেউই রুখতে পারে না। বড়রাও পেরে ওঠেন না তার সঙ্গে। বড় হলে সে যে মস্ত খেলোয়াড় হবে সে কথা তখন সকলের মুখে মুখে। যাঁরা তার খেলা দেখেছেন তাঁদের তো বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

ইউসোবিওদের বাড়ীর কাছেই থাকতেন হিলারিও। ইউসোবিওর খেলা তিনি অনেকদিন থেকেই দেখছেন। তিনি বেশ ভালভাবেই বুঝেছিলেন যে, একদিন এই রোগাটে, কালো বাচ্চা ছেলেটাই ফুটবল মাঠে সকলকে মাতিয়ে দেবে। জগতজোড়া নাম হবে তার। হিলারিও

সাহেবের সঙ্গে 'লুরেংকো মারকুইস স্পোর্টিং ক্লাবে'র যোগাযোগ ছিল। তিনি ভাবলেন তাঁদের ক্লাবেই ছেলেটি খেলতে সুরু করুক। কিন্তু ইউসোবিওর ইচ্ছে ছিল 'ডেস-পোর্টিভো ক্লাবে' খেলার।

কিন্তু সেখান থেকে তো ডাক পড়ল না ইউসোবিওর। ওদিকে হিলারিও হাল ছাড়েন নি। তাঁর গোঁ ইউসোবিওকে 'লুরেংকো'-তে খেলাবেনই। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর রাজী হয়ে গেল ইউসোবিও। মোজাম্বিকের লীগের খেলায় লুরেংকো ক্লাবের হয়ে খেলতে সুরু করল সে।

অদম্য উৎসাহ আর উদ্দীপনার মধ্যে কিশোর ইউসো-বিও মোজাম্বিকের লীগের খেলায় খেলতে নামলো। প্রথম খেলা 'জুভেনটুডের' সঙ্গে। একটু ভয় ভয় করছিল তার। হাজার হলেও বড় ফুটবলের আসরে প্রথমে পদক্ষেপ তো! কিন্তু পায়ে বল পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইউসোবিওর চেহারাই বদলে গেল। মনেই থাকল না, সে কোথায় খেলছে, কার বিরুদ্ধে খেলছে। সে শুধু জানে তার পায়ে বল আর লক্ষ্য সামনেই ঐ দুটি গোল-পোস্ট আর বারে আবদ্ধ জালে জড়ান বিশেষ জায়গাটি।

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। তারপরই জড়তা কাটিয়ে উঠল সে। কি খেলাই না খেলল সে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর সে প্রথম দিনেই এঁকে দিল। তার প্রথম দিনের খেলা ভাল খেলোয়াড়দের মধ্যেও বিস্ময় সৃষ্টি করল। কি অফুরন্ত দম, কি দুর্দান্ত গতি, কি মনোরম পদচারণা! একে একে তিনটে গোল করল ইউসোবিও। প্রথমে খেলাতেই হ্যাটট্রিক। ইউসোবিওদের দল সেই খেলায় জিতল ৩—১ গোলে। সেই খেলার বিবরণ বেরুল কাগজে কাগজে। সাংবাদিকরা একবাক্যে স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, এতদিন পরে একটি খেলোয়াড় এসেছে বটে! জাত খেলোয়াড়। এই বয়সেই এই—বয়স বাড়লে না জানি এ ছেলে কোথায় পৌঁছবে। শুধু প্রশংসা আর প্রশংসা।

মনে মনে ইউসোবিও ঠিক করে রেখেছিল যে, পরের বছর সে ডেসপোর্টিভো ক্লাবে চলে যাবে। কিন্তু হল না। লুরেংকো ছাড়ল না তাকে। বাড়ীর সকলেও দল বদলের বিরোধী। কিশোর ইউসোবিওর ইচ্ছের দাম তখন আর কতটুকু। লুরেংকোতেই রয়ে গেল সে। কি পেল? টাকা কাড়ি কিছু নয়। ইউসোবিও তখন ভাবতেই পারে না যে টাকা পাবার মত খেলা খেলছে সে। তাকে দেওয়া হল একটি ফাউনটেন পেন। তাতেই সে খুশী। খেলার জন্য পেয়েছে তো পেনটা!

পড়াশোনার দিকে আর তেমন নজর নেই ইউসোবিওর। কাগজে কাগজে তার খেলার কথা পড়েন আর ফাদার হেনরিক ভাবেন, ছেলেটির সব ভাল—শুধু ঐ লেখাপড়ার দিকটা ছাড়া। পড়বেই বা কি করে। খেলাই যে ওর সব। ফুটবল ছাড়া আর কিছুই চেনে না।

সেবার লীগের প্রথম খেলা ইউসোবিওর প্রিয় দল ডেস-পোর্টিভোর বিরুদ্ধে। এই দলেই খেলতে চেয়েছিল আর আজ সে খেলছে তাদের বিরুদ্ধে। খেলা খেলাই। তাই লুরেংকোর কিশোর খেলোয়াড় ইউসোবিও সেদিন দারুণ খেলল। গোল তাকে করতেই হবে। হারাতে হবে ডেস-পোর্টিভোকে। খেলল বটে ইউসোবিও। সে একাই তছনছ করে দিল ডেসপোর্টিভোর রক্ষণব্যূহ। সর্পিল গতিতে তার আনাগোনা রোখার সাধ্য ছিল না কারো। একটির পর একটি গোল দিতে লাগল ইউসোবিও। আবার হ্যাটট্রিক করল। লুরেংকো জিতলো ৩—১ গোলে।

ইউসোবিও সে বছর পেল পঞ্চাশ এসকুডো। এসকুডো ওদের দেশের টাকা।

খবরের কাগজের খেলার পাতায় তখন শুধু একটি নামই রোজ বড় বড় হরফে ছাপা হত। সাংবাদিকরা তাঁদের চোখে দেখা সেই মন ভোলান খেলার ছবি আঁকতেন কাগজের ওপর কালি দিয়ে। পরের দিনের কাগজে ছাপা হত সেই বর্ণনা। যারা খেলা দেখে নি তারা অবাক হয়ে ভাবত ঐ তরুণ খেলোয়াড়টির কথা। একদিন তার খেলা দেখতে যেতেই হবে—মনের কোণে এই ইচ্ছে চেপে বসতো।

কাগজের কল্যাণে ইউসোবিওর নাম ততদিনে ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানী লিসবনেও। সেখানেও সকলে দেখতে চান এই তরুণ খেলোয়াড়টিকে। জানতে চান তার বিষয়ে। তাই সেখানেও জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। কোন ক্লাব টানবে ইউসোবিওকে? বেনেফিকা কি তাকে আনবে? নাকি অন্য কোন ক্লাব!

সত্যি কথা বলতে ক্লাব কর্তৃপক্ষরাও তখন চুপ করে নেই। তাঁরাও খোঁজ পেয়েছেন অসামান্য প্রতিভাবান এই ছেলেটির কথা। এমন একটি প্রতিভাকে ছোট্ট থেকে দলে টানতে পারলে এবং যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের হাতে দিতে পারলে দেশেরই তো কল্যাণ হবে। সুতরাং আর দেরী নয়। চল মোজাম্বিক। দলে টান ইউসোবিওকে।

ওদিকে ইউসোবিও তখন লুরেংকো ক্লাবের সঙ্গে মরি-শাস সফরে গেছে। দারুণ খেলছে সেখানে। ঠিক তখনই লিসবন থেকে বেনেফিকার দুই কর্তা এসে হাজির হলেন ইউসোবিওদের বাড়ীতে। বড্ড গরীব ওরা। বাড়ীতে এসে সে কথা বেশ ভালভাবেই বুঝলেন ওঁরা। কিন্তু ওঁদের প্রস্তাব শুনে ইউসোবিওর মার মন খারাপ হয়ে গেল। কোথায় মোজাম্বিক আর কোথায় সেই সুদূর লিসবন। দেশের রাজধানী। অতদূরে পাঠাবেন ছেলেকে। মার মন চায় না ছেলেকে কাছ ছাড়া করতে। কিন্তু এতে নাকি ইউসোবিওর ভাল হবে। আরো নাম করবে সে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে তার নাম। শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলেন তিনি। হ্যাঁ, এতে যদি ভাল হয় তাহলে যাক ইউসোবিও লিসবনে। আর বেনেফিকা ক্লাবের পক্ষে খেলার জন্য ইউসোবিও পাবে দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এসকুডো।

না, এতটা আশা করেন নি ইউসোবিওর মা মিসেস্ ডোনা এলিস ফেরেরা। এতদিন সে খেলার জন্য পেয়েছে একটা ফাউনটেন পেন আর পঞ্চাশ এসকুডো। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ডোনা এলিস। দুঃখ বুঝি এতদিনে ঘুচলো। গরীবদের দুঃখ, তাদের কষ্ট যে কি সাংঘাতিক তা কি সকলে বোঝে। গরীব হওয়া বুঝি বিধাতার অভিশাপ। এতদিনে সেই দুঃখ ঘুচলো।

মরিশাস থেকে ফিরে এসেই ইউসোবিও বেনেফিকার পক্ষে খেলার জন্য ছাড়পত্রে সই করল। চাপা থাকল না সে খবর। জানাজানি হয়ে গেল। ছুটে এলেন লুরেংকো ক্লাবের লোকজন। ইউসোবিওকে তাঁরা ছাড়তে পারবেন না। কিছু-তেই না। ইউসোবিওকে ছাড়া তাঁদের দল যে কানা। আজ যে

তাঁদের দলের এত বোলবোলাও তা তো ঐ একটি ছেলের জন্যই। সেই তাকেই তাঁরা ছাড়বেন কি করে। একটি ফাউনটেন পেন কিংবা পঞ্চাশ এসকুডোর কথা ভুলে গিয়ে তাঁরা এসে হাজির হলেন ইউসোবিওর মায়ের কাছে। তাঁরা জানতেন মা-ই ইউসোবিওর সব। মা যা বলবেন সে তাই করবে। তাঁরা এসে বললেন, এতদূরে এতটুকু ছেলেকে কেন পাঠাচ্ছেন? ঘরের ছেলে ঘরে থাক। তারা ইউসোবিওকে এবার এক লক্ষ দশ হাজার এসকুডো দেবেন। কিন্তু যা হবার তা তো আগেই হয়ে গেছে। ইউসোবিও আগেই বেনেফিকার ছাড়পত্রে সই করেছেন। তাই মুখ ভার করে ফিরে আসতে হল লুরেংকো ক্লাবের কর্তাদের।

ওদিকে ইউসোবিওর লিসবনে যাবার খবরে মুখ ভার হয়েছে আরও এক জনের। নাম তার ফ্লোরা।

সেই ছোটবেলা থেকে দু-জনের দারুণ ভাব। এক সঙ্গে বড় হচ্ছে দু-জনেই। সেই সঙ্গে আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছে সম্পর্কটা। একজনকে না হলে চলে না অপর জনের।

ইউসোবিও ফুটবল খেলে। বেশ নাম হয়েছে। ফ্লোরাকেও তো কিছু করতে হবে, তা নাহলে মানাবে কেন। তাই সাত-পাঁচ ভেবে ফ্লোরা শুরু করেছে জিমনাস্টিক করতে। জিম-নাস্ট হবে সে। তা নাহলে ইউসোবিওর সঙ্গে পাল্লা দেবে কি করে? কিন্তু ইউসোবিওটা যা দুষ্টু। সব সময় ওর পেছনে লাগবে। কিছুতেই বেশীক্ষণ আখড়ায় থাকতে দেবে না। বেড়াতে চল, বেড়াতে চল—বলে অস্থির করে তোলে। ফ্লোরা মনে মনে খুশী হয়। হাসে। কিন্তু মুখে বিরক্তি দেখায়। ভাব দেখায় যেন দারুণ রেগে গেছে। কিন্তু তার-পরই দেখা যাবে দু-জনে হাত ধরাধরি করে চলেছে। হাঁটতে হাঁটতে জনপদ পেরিয়ে কতদূরে যে ওরা চলে যায়। কথা যেন আর শেষ হয় না। তবু ওদের মনে হয় কিছুই বুঝি বলা হল না, আরো কত কি বলার ছিল। রোজ রোজই ওদের দেখা হওয়া চাই। না হলেই যেন পৃথিবী অন্ধকার!

ইউসোবিও ক'দিনের জন্য মরিশাসে গিয়েছিল খেলতে। ফ্লোরার দিনগুলো তখন যেন আর কাটতে চাইতো না। একা একা বিচ্ছিরী লাগত। আখড়ায় যেতে ইচ্ছেই করত না। কান্না পেত সব সময়। বুকের কাছটায় ওর যেন খালি হয়ে গেছে। সে যে কি কষ্ট তা ফ্লোরাই জানে।

ইউসোবিও ফিরে এল। কিন্তু সেই সঙ্গে এল আরো বড় দুঃসংবাদ। না, না, দুসংবাদ নয়। এর চেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে। ইউসোবিও লিসবনে যাবে, খেলবে দেশের সব চেয়ে বড় ক্লাবে। দুদিন বাদে জাতীয় দলে খেলবে সে। জগতজোড়া নাম হবে তার।

কিন্তু ফ্লোরার দুঃখ বুঝবে কে? ফ্লোরা যে বড় একা হয়ে যাবে। তার দিন কাটবে কি করে? সে থাকবে কি করে? চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে মুখ। ভাবনায় চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেছে সে। কি করবে সে? কি করা উচিৎ?

ফ্লোরা ভালভাবেই জানে যে তার এই মনোভাবের কথা ইউসোবিও যদি ঘুণাক্ষরে জানতে পারে তাহলে—তাহলে হয়তো সে লিসবনে যাবেই না। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে তার ভবিষ্যতের সব সম্ভাবনা। সুযোগ তো মানুষের জীবনে বারবার আসে না। বেনেফিকার মত ক্লাবে খেলার সুযোগ তো সহজে পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে টাকার প্রশ্নটিও আছে। ইউসোবিও লিসবনে গেলে ওদের দুঃখ ঘুচবে। ভাই-বোনগুলো মানুষ হবে। ইউসোবিওর মা সুখের মুখ দেখবেন।

না, শক্ত হতে হবে ফ্লোরাকে। সে জানে ইউসোবিও ভেঙ্গে পড়বে। তাকে ছেড়ে যেতে চাইবে না। নিজের দুঃখ, নিজের কষ্ট, নিজের কান্না, বুকজোড়া হাহাকার বুকের মধ্যে চেপে রেখে ইউসোবিওকে উৎসাহ জোগাতে হবে। সমস্ত দায়িত্ব ফ্লোরার। ইউসোবিওকে যে তাকে সামলাতে হবে। এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে চলবে না। হাসি মুখে তাকে মেনে নিতে হবে সব কিছু।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই দিন।

আজ ইউসোবিও চলে যাবে। চলে যাবে সুদূর লিসবনে। কতদূরের সেই শহর। ওদের বাড়ীর কেউ কখন সেখানে যায় নি। কতদিনের জন্য যে যাচ্ছে কে জানে!

বাড়ীতে মা কাঁদছেন। বিদায়ের মুহূর্ত যত এগিয়ে আসছে ততই ভেঙ্গে পড়ছেন তিনি। ওদিকে ফ্লোরার চোখে জল। না, ইউসোবিওর সামনে এসে কাঁদেনি। মুখে তার হাসি, ব্যবহার সহজ, স্বাভাবিক। বরঞ্চ কেঁদে ভাসাচ্ছে ইউসোবিও নিজেই। মাকে ছেড়ে, ফ্লোরাকে ছেড়ে যাচ্ছে সে। তার ওপর মনে একটা চাপা ভয়। জীবনে কোনদিন প্লেনে চড়ে নি। খেলতে যাচ্ছে বেনেফিকা ক্লাবে। সমস্ত পৃথিবীতে যার সুখ্যাতি। ভাল খেলতে পারবে তো? সব মিলিয়ে ইউসোবিওর অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। সকলকে ছেড়ে যাবার দুঃখ, ভয় আর দুশ্চিন্তায় কেমন যেন অসহায় হয়ে পড়েছে সে। চোখের জল আর বাগ মানছে না। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল।

কাঁদতে কাঁদতেই সে এগিয়ে গেল প্লেনের দিকে। ইউ-সোবিওর মা ডোনা কাঁদছিলেন। অসহ্য কষ্ট আর কান্না এতক্ষণ দলা পাকিয়ে ফ্লোরার গলার কাছে আটকে ছিল। আর সে নিজেকে সামলাতে পারল না। ইউসোবিওর মাকে জড়িয়ে ধরে হু-হু করে কেঁদে উঠল। প্লেনটা ততক্ষণে আকাশে উঠে পড়েছে। তার মধ্যে অসহায়ের মত বসে আছে একটি কিশোর। নাম ইউসোবিও।

॥ চার ॥

এ এক নতুন জগত, নতুন পরিবেশ। রাজধানীর এই ঝলমলে রূপের সঙ্গে ইউসোবিওর কোনদিনও পরিচয় ছিল না। কোনদিন সে ভাবতেও পারেনি যে, সাফল্যের সোপান বেয়ে ফুটবলই তাকে ধীরে ধীরে টেনে তুলবে। আজ সে রাজধানী লিসবনের বিলাসবহুল হোটেলে বাস করছে। যার একদিনের খরচে একসময় তাদের সারা মাস কুলিয়ে যেত। সবই তো এই দুটি পা আর একটা চামড়ার বলের জন্য। সাফল্য, অর্থ, সম্মান। সবই আসছে। না, না, এসব কি ভাবছে সে! এখনও যে কিছুই হয় নি। এই তো তার জীবনের সুরু। নিজেকে গড়ে-পিটে নিয়ে শুধু দেশের নয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নাম করতে হবে তাকে, দারুণ নাম। এক ডাকে সমস্ত পৃথিবী তাকে চিনবে। ফ্লোরাকে তো সে সেই কথায় দিয়ে এসেছে। ফ্লোরার কথা মনে হতেই মনটা অন্য-রকম হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল ফেলে আসা

দিনগুলোর স্মৃতি। এই স্মৃতিই এখন তার সম্বল। আর সম্বল ফ্লোরার চিঠি। নিয়ম করে চিঠি দেয় সে। ইউসোবিও-ও দেয়। প্রত্যেক সপ্তাহে মাকে আর ফ্লোরাকে চিঠি লেখে। ইউসোবিও ভাবে তার জীবনে দুটি জিনিসই সত্য—ফুটবল আর ফ্লোরা। ফুটবলের জন্য ফ্লোরা, ফ্লোরার জন্য ফুটবল।

ইউসোবিওর তখন খেলার অনুমতি আসেনি। এক শহর থেকে আর এক শহরে এসেছে তো। একটু সময় লাগবেই। তার ওপর আরো কয়েকটি দলের লোলুপ দৃষ্টি তখন ইউসোবিওর ওপর। ছলে-বলে-কৌশলে তারা ইউসোবিওকে চায়। তাই ইউসোবিওর বেনেফিকায় আসা নিয়ে ঝামেলা চলছিলই। পারলে তারা ইউসোবিওকে হোটেল থেকে লোপাট করে ফেলে, লুকিয়ে ফেলে। বেনেফিকা দল তখন ডেনমার্ক আর ইউরোপ সফরে যাচ্ছিলেন। ইউসোবিওকে পাঠিয়ে দেওয়া হল দলের সঙ্গে। সে খেলবে না। কিন্তু দলের সঙ্গে থাকলে অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার যে ভাল সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ইউসোবিও তাই চলে গেলেন লিসবন ছেড়ে। বহুদূরে ডেনমার্ক আর ইউরোপ সফরে।

আর ইউসোবিওকে পাওয়া নিয়ে ক্লাবে ক্লাবে ঝগড়া উঠল আদালতের কাঠগড়ায়। বেনেফিকার সঙ্গে লড়তে এল লুরেংকো। লিসবন স্পোর্টিং ক্লাবও ছিল এদের পেছনে। সে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বেনেফিকাই জিতল। ইউসোবিও খেলার অনুমতি পেলেন।

ততদিনে ওঁরা ফিরে এসেছেন লিসবনে। ইউসোবিওর মনে জ্বলন্ত উৎসাহ। এবার খেলবে সে। তার স্বপ্ন স্বার্থক হতে চলেছে। বেনেফিকার জার্সি গায় দিয়ে সে নামবে মাঠে।

সেদিন ১৯৬১ সালের ২৩শে মে, প্রদর্শনী খেলায় খেলতে নামলেন ইউসোবিও। স্টেডিয়াম ভরা দর্শক। সকলেই এসেছেন ইউসোবিওর খেলা দেখতে। ইউসোবিও জানত তাকে ভাল খেলতেই হবে। জান কবুল, সে খেলবে—হ্যাঁ, খেলার মতই খেলবে সে।

খেলা তখন সবে মিনিট দশেক গড়িয়েছে। বাঁ প্রান্ত থেকে বল ধরে মধ্যে ঢুকে পড়ল ইউসোবিও। দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলল। প্রতিপক্ষ দলের রক্ষণব্যূহকে ডিঙিয়ে চলতি বলে সট দিল। কামানের গোলার মত বলটা ছুটে বেরিয়ে গেল গোলের দিকে। অ্যাটলেটিকোর গোলরক্ষক কিছু বোঝার আগেই বলটা জড়িয়ে গেল জালে। বেনেফিকার পক্ষে খেলতে নেমেই গোল করলেন ইউসোবিও। বিরতির আগেই কিন্তু অ্যাটলেটিকো গোলটা শোধ করে দিল।

ইউসোবিওর রক্তে তখন আগুন ধরে গেছে। তার জেদ, এ খেলায় জিততেই হবে। আরো গোল দিতে হবে। দ্বিতীয়ার্ধের মিনিট তিরিশ নাগাদ বেনেফিকা পেনাল্টি পেয়ে গেল। পেনাল্টি থেকে গোল করলেন ইউসোবিওই। দু মিনিট পরে আবার গোল। এবারও ইউসোবিওর। হ্যাটট্রিক। বেনেফিকার পক্ষে জীবনের প্রথম খেলাতেই হ্যাটট্রিক করলেন ইউসোবিও। সেই খেলায় বেনেফিকা ৪—২ গোলে জিতলো। আর ইউসোবিওর সাফল্যে বেনেফিকার কর্মকর্তা আর সমর্থকরা পাগল হয়ে উঠলেন। কাগজে কাগজে ছাপা হয়ে ইউসোবিওর হ্যাটট্রিকের খবর পৌঁছলো ফ্লোরার কাছে; পৌঁছলো ইউসোবিওর মায়ের কাছে। সেই সঙ্গে প্রথম সাফল্যের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত খেলোয়াড়ের উচ্ছল-লিপি এসে গেল মা আর ফ্লোরার কাছে।

সুরু হল ইউসোবিওর খেলা। পর্তুগাল কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে বেনেফিকা। খেলবে ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে। সেই খেলায় বেনেফিকা বিচ্ছিরীভাবে হেরে গেল। শুধু তাই নয়, একটা পেনাল্টিও মিস করল ইউসোবিও। রাগে-দুঃখে ভেঙে পড়ল ইউসোবিও ভাবতে পারেনি যে সে এত খারাপ খেলবে। সারা রাত ঘুমোতে পারল না। কি রকম যেন একটা ভয় ভয় ভাব ঘিরে ধরেছে তাকে। অসহ্য অস্বস্তি। এ কি হল তার। সুরুতেই কি শেষ হয়ে যাবে? না, তা হতে পারে না। ভাল তাকে খেলতেই হবে। তার মা, সমস্ত সংসার চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। ফ্লোরা, তার ফ্লোরা আশা-আকাঙ্খা সবই যে ঐ খেলা ঘিরে। ধীরে ধীরে নিজেকে ফিরে পেতে থাকে ইউসোবিও। শান্ত হয়ে আসে ইউসোবিওর অশান্ত মন, ঘুমিয়ে পড়ে সে।

প্যারিসে গেল বেনেফিকা গ্রীষ্মকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে। স্থানীয় দলগুলো ছাড়া বাইরে থেকে তিনটি দল এই প্রতিযোগিতায় খেলবে। পেলের স্যানটোস, আন্ডারলেক্ট আর বেনেফিকা। ফুবলের যাদুকর পেলের মুখোমুখি হবে ইউসোবিও। আনন্দ আর উৎসাহে সে তখন টগবগ করছে। প্রথম খেলা আন্ডারলেক্টের সঙ্গে। বেনেফিকা জিতলো ২—১ গোলে। ইউসোবিও দিল একটা খেলা। কিন্তু আসল খেলা এখনো বাকী। সে খেলা স্যানটোসের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার ফাইনালে উঠেছে বেনেফিকা আর স্যানটোসই।

ইউসোবিওর দলে ঠাঁই হল না। জার্সি পরে সে মাঠের বাইরে বসে আছে। অবাক চোখে সে দেখছে পেলের খেলা। হ্যাঁ খেলা বটে। এই না হলে ফুটবলের যাদুকর। বেনেফিকা কিছুতেই স্যানটোসের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। একটার পর একটা গোল খাচ্ছে। পেলে দিয়ে যাচ্ছেন গোলের পর গোল। দেখতে দেখতে পাঁচ গোলে এগিয়ে গেল স্যানটোস।

প্রথমার্ধের খেলা তখন শেষ হয় হয়। সান্ডানাকে বসিয়ে ইউসোবিওকে মাঠে নামান হল। পাঁচ গোলে হারছে বেনেফিকা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা সুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে আগাস্তো বল বাড়িয়ে দিলেন ইউসোবিওকে। একজনের পর একজনকে কাটিয়ে বল নিয়ে ছুটে চলল ইউসোবিও। কোন বাধাই তখন তার সামনে বাধা নয়। মুহূর্তের মধ্যে চলে এল স্যানটোসের গোলের কাছাকাছি। তারপর সেই প্রচন্ড সট। গোলরক্ষক কিছু বোঝার আগেই গোল। একইভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তিন তিনটে গোল দিল ইউসোবিও। পেলের স্যানটোসের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক। সমস্ত মাঠ তোলপাড়। সবার মুখে তখন একটিই নাম। সকলেই জানতে চান, কে এই ইউসোবিও! পেলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলছে! কুচকুচে কালো ঝাচ্চা ছেলেটি তো পেলের চেয়ে কোন অংশেই, কোন দিক দিয়েই কম যায় না! দারুণ খেলে!

সে খেলার ফলাফল নিয়ে কেউই আর মাথা ঘামাল না।

সকলেই ধরে নিলেন, পেলের প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝি এতদিনে এসেছে। খবরের কাগজে খেলার পাতায় তখন শুধু ইউ-সোবিওর ছবি, ইউসোবিওকে নিয়ে যত লেখা। সাংবাদিকরা এক বাক্যে স্বীকার করলেন, হ্যাঁ এতদিনে একটি খেলোয়াড় এসেছে বটে।

॥ পাঁচ ॥

দিন গড়িয়ে চলে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন ছড়িয়ে পড়ে ইউসোবিওর নাম। কিন্তু ইউসোবিওর চিন্তা, তাকে আরো ভাল খেলতে হবে। খেলতেই হবে। বিশ্ব-কাপের খেলা আসছে। সে কি পাবে জাতীয় দলের প্রতি-নিধিত্ব করার সম্মান? লাক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে পর্তুগাল খেলবে। প্রথম খেলায় পর্তুগালই জিতেছিল। ফিরতি খেলা হবে লাক্সেমবার্গেই। ইউসোবিওর মন তখন আশা-নিরাশার দোলায় দুলছে। সে কি পাবে বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ?

ইউসোবিও ভাবতে পারে নি জাতীয় দলে তাঁর স্থানটি ততদিনে পাকা হয়ে গেছে। পর্তুগাল দলের সঙ্গে সে খেলতে এল লাক্সেমবার্গে। কিন্তু বিশ্বকাপের প্রথম খেলায় ইউসোবিও একটা গোল দিলেও পর্তুগাল শেষ পর্যন্ত ৪—২ গোলে হেরে গেল। অবশ্য তাতে বিশেষ কিছু এসে যায়নি। বরঞ্চ ইউসোবিওর দেওয়া গোলটি নিয়ে আলো-চনার যেন অন্ত ছিল না।

এবার পর্তুগালের খেলা ইংলন্ডের বিরুদ্ধে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে। ওয়েম্বলিতে ইউসোবিওর সেই প্রথম খেলা। মস্ত স্টেডিয়াম। লক্ষ লোকের আসন আছে। পর্তুগাল কিন্তু এবারও হেরে গেল। ইংলন্ড দু গোলে জিতলেও ইউসোবিওর খেলা ইংলন্ডের সাংবাদিকদের মনে গভীর-ভাবে রেখাপাত করল। তাঁর দুটো জোরালো সট ক্রশবার কাঁপিয়ে ফিরে এসেছিল। ভাল খেললেও ইউসোবিওর মনে কিন্তু বিন্দুমাত্রও শান্তি নেই। পরপর পরাজয়ের জ্বালায় সে অস্থির হয়ে উঠল। এইভাবে হেরে চললে তিলে তিলে গড়ে তোলা তাদের সব সুনাম যে নষ্ট হয়ে যাবে।

সুতরাং জিততেই হবে। সাফল্যই প্রতিষ্ঠা লাভের চাবিকাঠি। আর তা নির্ভর করছে জেতার ওপর। এসে গেল সে সুযোগ। ইউরোপীয় কাপের খেলা। প্রতিপক্ষ অস্ট্রিয়া। ভিয়েনার খেলায় বেনেফিকা এক গোলে হারিয়ে দিল অস্ট্রিয়াকে। ফিরতি খেলা লিসবনে। এই খেলায় বেনে-ফিকা ৫—১ গোলে হারাল অস্ট্রিয়াকে। বেনেফিকার ইউ-সোবিও, আগাস আর সান্তানা দারুণ খেললেন। পরের খেলা ন্যুরেমবার্গের বিরুদ্ধে। বেনেফিকা হেরে গেল এক গোলে। ইউসোবিও সেদিন খেলেনি। সে তাই ফিরতি ম্যাচটির জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ফিরতি খেলা লিসবনে। জার্মাণ দল জয়ের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়েই এল। এক গোলে এগিয়ে আছে তারা। ড্র করতে পারলেই তারা জিতে যাবে দু পর্বের এই খেলায়। কিন্তু সুরু হতে না হতেই জার্মাণ দলের মাথায় হাত। আগাস দিলেন প্রথম গোল। তারপরই গোল দিলেন ইউসোবিও, বিরতির আগে আরো একটি গোল হল। সেটি দিলেন কলুনা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা সুরু হতে না হতেই ইউসোবিও গোলের সংখ্যা বাড়ালেন। তারপর আরো দুটো। ছ গোলে জিতল বেনেফিকা। পরের খেলা ইংলন্ডের টটেনহাম হাটনারের বিরুদ্ধে। লিসবনের প্রথম খেলায় বেনেফিকা ৩—১ গোলে জিতে এগিয়ে রইল দু গোলে। ফিরতি খেলা ইংলন্ডেই। সেখানে হাটনারকে হারান চাট্টিখানি কথা নয়। বেনেফিকা প্রাণপণ লড়েও শেষ পর্যন্ত ২—১ গোলে হেরে গেল। অবশ্য তাতে কিছু এসে গেল না। দু পর্বের গোলের গড়পড়তায় এগিয়ে থেকে বেনেফিকাই ফাইনালে উঠল। অপর দিক থেকে ফাইনালে উঠেছে স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ। খেলা হবে আমস্টারডামে।

রিয়াল মাদ্রিদের তখন বিশ্বজোড়া নাম। পুস্কাসের দল। বেনেফিকাও দারুণ খেলছে। তাই ফাইনাল খেলাটি ঘিরে ফুটবল উৎসাহী মহলে উৎসাহের সীমা ছিল না। খেলার দিনে অনেক আগেই আমস্টারডামের ওলিম্পিক স্টেডিয়াম ভরে গেল। এত ভিড় হয়েছে যে একটা মাছি গলার উপায় নেই।

খেলা সুরু হল। বেনেফিকা দারুণ খেলছে। কিন্তু কিছুতেই গোল করতে পারছে না। হঠাৎই বল পেয়ে রিয়েল মাদ্রিদের পুস্কাস তীরের মত ছুটে গেলেন বেনেফিকার গোলের দিকে। তারপর কোমরটা এদিকে-ওদিকে দুলিয়ে প্রচন্ড জোরে গোলে মারলেন। গোল ...... গোল ...... গোল। সমস্ত স্টেডিয়াম যেন কেঁপে উঠল। মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই পুস্কাস আরো একটা গোল দিয়ে বসলেন। পঁচিশ মিনিটের মাথায় রিয়েল মাদ্রিদের গোলের মুখে ফ্রি কিক পেল বেনেফিকা। ইউসোবিও সট করলেন। সামা-ন্যর জন্য বলটা ঢুকল না। ক্রশবারে লেগে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কাছেই ছিলেন আগাস। ছুটে এসে বলটা ঠেলে দিলেন গোলে। মিনিট কয়েক পরে রিয়েল মাদ্রিদের গোলের মুখে ইউসোবিও লাফিয়ে উঠলেন হেড দিতে। প্রতিপক্ষ দলের গোলরক্ষকও লাফিয়ে উঠেছিলেন। বলটা তাঁর হাতে লেগে চলে এল ক্যাভোমের কাছে। ফাঁকা গোলে বলটা পাঠাতে তাঁর কোন অসুবিধে হল না। খেলার ফলাফল তখন সমান সমান। কিন্তু তারপরই পুস্কাস আরো একটি গোল দিলেন। বিরতির সময় রিয়েল মাদ্রিদ ৩—২ গোলে এগিয়ে থাকল। বিরতির পর খেলার সুরু হল। খেলা মিনিট সতের গড়িয়েছে। ইউসোবিও বল নিয়ে সর্পিল-গতিতে এঁকে-বেঁকে ছুটে চলল। তার সামনে তখন অসহায় গোলরক্ষক। সমস্ত স্টেডিয়াম চীৎকার করছে ‘গোল ...... গোল’ করে। ইউসোবিওর পা উঠল। ঠিক তখনই কে যেন পেছন থেকে এক ধাক্কা মারল। ছিটকে পড়ল ইউসোবিও। ছুটে এলেন রেফারী। পেনাল্টি। পেনাল্টি থেকে গোলটি দিল ইউসোবিওই। বেনেফিকা তখন ৪—৩ গোলে এগিয়ে। রিয়েল মাদ্রিদের গোলের কাছে বেনেফিকা ফ্রি কিক পেল। কলুনা বলটা গোলে না মেরে ঠেলে দিলেন ইউসোবিওকে। ইউসোবিও ওঁত পেতে ছিল। বলটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড সটে বলটা জালে জড়িয়ে দিল। বেনেফিকা ৫—৩ গোলে এগিয়ে গেল। আর তারপরই রেফারী বাজিয়ে দিলেন খেলা শেষের বাঁশী।

হাজার হাজার দর্শক মাঠে ঢুকে পড়লেন। বেনেফিকার খেলোয়াড়দের কাঁধে তুলে নিলেন। সেই ভিড়ে, সেই জড়াজড়ির মধ্যে খেলোয়াড়দের পোশাক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

সেই দৃশ্যই দেখা গেল লিসবনের বিমান বন্দরে। হাজার হাজার সমর্থকদের অভিনন্দনে বেনেফিকার খেলোয়াড়রা

বীরের সম্মান লাভ করলেন। বিরাট শোভাযাত্রা করে তাঁদের বিমান বন্দর থেকে শহরে নিয়ে যাওয়া হল। হাজার হাজার দর্শকের কাঁধে কাঁধে চলল ইউসোবিও। সেই তো তখন দেশের হিরো........।

॥ ছয় ॥

হঠাৎই ফ্লোরা এসে হাজির হল লিসবনে। জিমন্যাস্টিকে সে খুব নাম-টাম করেছে। দুষ্টু মেয়ে কিছু জানায়নি। জাতীয় জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতায় মোজাম্বিকের প্রতিনিধিত্ব করবে ফ্লোরা। ইউসোবিও যে কি করবে ভেবে পায় না। আনন্দ-হাসি-গানে মেতে উঠল ওরা দু জনে। সব কিছুই মনে হয় যেন স্বপ্ন। ক'টা দিন যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেটে যায়। যেখানে ফ্লোরা সেখানেই ইউসোবিও, যেখানে ইউসোবিও সেখানেই ফ্লোরা।

কি তাড়াতাড়িই না কেটে গেল দিনগুলো। জাতীয় জিমন্যাস্টিক প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে যাবার পর ফ্লোরা আবার ফিরে গেল নিজের শহরে। মন-মরা ইউসোবিও। দিন যেন কাটতে চায় না। ঘুরে-ফিরে শুধু ফেলে আসা দিন ক'টার কথাই মনে পড়ে। এই তো একদিন আগেও ফ্লোরা ছিল তার পাশে। কান্না পায় ইউসোবিওর। কিছু ভাল লাগে না।

ঠিক তখনই যেন ইউসোবিওকে সান্ত্বনা দিতেই ইংলন্ড থেকে এল একটা ভাল খবর। বাছাই বিশ্ব একাদশের পক্ষে খেলার জন্য মনোনীত হয়েছে ইউসোবিও। খেলবে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। খেলা হবে ফিফার শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে। সে যে বিশ্বের সেরা এগার জন খেলোয়াড়ের একজন হবে এ কথা ইউসোবিও ভাবতেও পারে নি। তাই আনন্দ তার আর ধরে না।

খেলা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে। লক্ষ লোকের সামনে। সাংবাদিকের সংখ্যাও কম নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন তাঁরা। বিরাট ব্যাপার। মস্ত আয়োজন। বিশ্ব-একাদশের খেলোয়াড়রা একে একে মাঠে নামলেন। ইয়াসিন, জমলা স্যান্ডোস, প্লাসকাল, পপলুহার ও স্কিলিজার, ল ও ম্যাসেপাস্ট, কোপা, ডি স্টিফানো, ইউসোবিও ও জেন্টো।

ইউসোবিও প্রথমার্ধের পর আর খেলে নি। যেটুকু সময় খেলেছিল সে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইংলন্ডের রক্ষণভাগকে। কিন্তু গোল করতে পারে নি। আসলে ইউসোবিও সেদিন নিজের মত খেলতে পারে নি। পারলে অন্তত দু-দুটো গোল সে দিতই। দেশ-বিদেশের অত সাংবাদিকদের দেখে ইউসোবিও সেদিন রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। তবু সাংবাদিকরা একবাক্যে তার খেলার প্রশংসা করেছিলেন।

দেশে ফিরেই ইউসোবিওকে সামরিক বাহিনীতে নাম লেখাতে হল। এখন আর বল নিয়ে ছোটা নয়, তালে তালে পা ফেলে লেফট-রাইট করা। যুদ্ধের মহড়া দেওয়া। এ জীবন কি আর ভাল লাগে তার। ভাগ্য ভাল বেশীদিন তাকে এইভাবে দিনগত পাপক্ষয় করতে হয়নি। সামরিক বাহিনীর ফুটবল দলে সে খেলতে লাগল। সেই সঙ্গে ভার দিল খেলা শেখাবার। দেখতে দেখতে নির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদও ফুরিয়ে এল। সামরিক বাহিনীর ব্যারাক থেকে ইউসোবিও আবার ফিরে গেল লিসবনে বেনেফিকা ক্লাবের আবাসে। আবার সে মুক্ত। সামরিক আইনের নাগপাশে আর সে বাঁধা নয়। এখন শুধু ফুটবল, ফুটবল আর ফুটবল.........।

দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯৬৬ সাল। সুরু হয়ে গেল বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। সোনার পরী জুলে-রিমে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে ইউসোবিওকে। ইউসোবিও শুনেছে তার ডাক। শুনেছে আরো একজন। সে আর কেউ নয়, ব্রাজিলের পেলে.........।

বিশ্বকাপে পর্তুগাল খেলছে প্রাথমিক পর্বে। প্রথম খেলা তুরস্কের বিরুদ্ধে, লিসবনেই। খেলা সুরু হতে না হতেই কলুনা গোল দিয়ে এগিয়ে দিলেন পর্তুগালকে। তারপরই গোল দিল ইউসোবিও। বিরতির একটু আগে তুরস্ক একটা গোল শোধ করে দিল। কিন্তু বিরতির পর অন্য দৃশ্য। গোলের পর গোল। প্রথমটি দিলেন জেম গ্রেসো। তারপরই তুরস্কের গোলের কাছাকাছি ফ্রি কিক পেল পর্তুগাল। কলুনা গোলে না মেরে বলটা বাড়িয়ে দিলেন ইউসোবিওকে। তুরস্কের গোলরক্ষক একটু এগিয়ে এসেছিলেন। সেই সুযোগে ইউসোবিও বলটা তাঁর পাশ দিয়ে ঠেলে দিল গোলে। সেই খেলায় পর্তুগাল ৫—১ গোলে জিতল। ইউসোবিও একাই দিল তিনটি গোল।

ফিরতি খেলা তুরস্কয়। আংকারার মেইজ স্টেডিয়ামে। নিজের দেশের দর্শকদের সামনে পর্তুগালকে হারাবার জন্য তুরস্কের খেলোয়াড়রা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সত্যি দারুণ খেলল তারা। পর্তুগাল কিছুতেই গোল করতে পারছে না। খেলা প্রায় শেষ হয়ে এল। ফলাফল তখনও গোলশূন্য। এই সময় রেফারী তুরস্কের গোলের কাছাকাছি দিলেন ফ্রি কিকের নির্দেশ। তুরস্কের খেলোয়াড়রা তর্কাতর্কি সুরু করে দিলেন। কিন্তু রেফারী তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। শেষ পর্যন্ত সেই ফ্রি কিক থেকে চোখ ধাঁধানো সটে গোল করলেন ইউসোবিও। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয়ে গেল গোলমাল। বৃষ্টির মত মাঠে পড়তে লাগল ইট-পাটকেল আর বিয়ার কোকা-কোলার বোতল। খেলোয়াড়রা মাঠ ছেড়ে পালালেন। পর্তুগাল জিতলো ইউসোবিওর দেওয়া গোলে।

পর্তুগালের পরের খেলা চেকোশ্লাভাকিয়ার বিরুদ্ধে। খেলা হবে ব্রাতিশ্লাভার শ্লোভান স্টেডিয়ামে। বিশ্ব-ফুটবলের আসরে চেক দলের একটা আলাদা স্থান আছে। সত্যিই খুব শক্তিশালী দল। ওদের হারানো চাট্টিখানি কথা নয়। তবু ইউসোবিও আশা ছাড়েন নি। কিন্তু খেলা সুরু হবার পর রেফারীর আচরণ দেখে তাঁরা থ। বুলগেরিয়ার রেফারী চেক দলকে টেনে খেলাচ্ছেন। তাই মেন্ডেসকে যখন চেক দলের ভাসকান লাথি মেরে ফেলে দিলেন তখন তিনি চেয়েও দেখলেন না। মেন্ডেস আহত হলেন।

প্রথমার্ধের খেলা প্রায় শেষ হয় হয়। প্রায় মাঝমাঠে বল পেল ইউসোবিও। মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রলয় ঘটে গেল। সর্পিল-গতিতে এঁকে-বেঁকে ইউসোবিও ছুটে চলেছে। ডিঙিয়ে যাচ্ছে একজনের পর একজন খেলোয়াড়। তারপর গোলের কাছাকাছি এসে প্রচন্ড এক সট। গোল, গোল, গোল। কিন্তু সমস্ত স্টেডিয়াম চুপ। স্টেডিয়ামের এক কোণে

জড়ো হয়ে থাকা পর্তুগালের একদল সমর্থককে শুধু দেখা গেল হাত তুলে নাচতে আর 'গোল, গোল' বলে চেঁচাতে।

রেফারী কিন্তু হাল ছাড়েন নি। তাই বিরতির ঠিক আগেই লঘু পাপে গুরু দন্ড দিয়ে দিলেন পেনাল্টির নির্দেশ। কিন্তু খ্যাসনির সেই সট ঝাঁপিয়ে পড়ে আটকে দিলেন পর্তুগালের গোলরক্ষক পেরেরা। শেষ পর্যন্ত ঐ ইউসোবিওর দেওয়া গোলেই পর্তুগাল হারিয়ে দিল চেকোশ্লোভাকিয়াকে।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই দিন। অক্টোবর মাসের আট তারিখ। গির্জায় তিল ধারণের স্থান নেই। দারুণ ভিড়। খবরটা সকলেরই জানা। কাগজে কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে। পর্তুগালের সেরা খেলোয়াড় ইউসোবিওর বিয়ে। কনে তার আবাল্য-পরিচিতা জিমনাস্ট ফ্লোরা। বন্ধু-বান্ধব, অতিথি আর সাধারণ মানুষের ভিড়ে ইউসোবিও সেদিন নতুন করে জানল যে দেশের মানুষ তাকে কত ভালোবাসে।

এর পরেই এল সেই দারুণ খবর। ইউসোবিও ইউরোপের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান লাভ করেছেন। এ যে কত বড় সম্মান তা শুধু ফুটবল-রসিকরাই জানেন। স্ট্যানলী ম্যাথুজ, ডি স্টিফানো, কোপা সিভোরি, ইয়াসিনের মত বিশ্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সঙ্গে একই আসনে ঠাঁই পেল পর্তুগালের তরুণ খেলোয়াড় ইউসোবিও।

ওদিকে বিশ্ব-কাপের খেলা এগিয়ে চলেছে। নরওয়েকে চার গোলে হারাল পর্তুগাল। চারটির মধ্যে দুটি ইউসোবিওর দেওয়া। পরের খেলাগুলোয় স্কটল্যান্ডকে এক গোলে, ডেনমার্ককে ৩—১ গোলে, উরুগুয়েকে তিন গোলে, এবং রুমানিয়াকে এক গোলে হারিয়ে পর্তুগাল মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।

মূল পর্বের খেলা জুলাই মাসে ইংলন্ডে।

ওদিকে পেলেকে ঘিরে ইংলন্ডের ক্রীড়া-রাজনীতিতে ঝড় উঠেছে। ইংলন্ডের সাংবাদিকরা ইউসোবিওকে পেলের চেয়ে বড় খেলোয়াড় বলে প্রচার করতে সুরু করেছেন। এই প্রচার চলছিল অনেক দিন আগে থেকে পরিকল্পনা মাফিকই। ইউসোবিও যে ঠিক এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি। কোথায় পেলে আর কোথায় সে! কার সঙ্গে কার তুলনা! কিন্তু মুখ খোলার সাহস হল না তার। নিজের মনেই সে ছটফট করছে।

পর্তুগালের প্রথম খেলা হাঙ্গেরীর সঙ্গে। ৩—১ গোলে জিতল পর্তুগাল। এই খেলায় ইউসোবিও কপালে আঘাত পেয়েছিলেন। পরের খেলায় বুলগেরিয়া হারল তিন গোলে। তিনটির মধ্যে ইউসোবিওর দেওয়া একটি গোল।

পর্তুগালের পরের খেলা ব্রাজিলের সঙ্গে। পেলের ব্রাজিল। খেলার সুরু থেকেই পর্তুগাল চেপে খেলতে লাগল। তখন প্রথমার্ধের মাঝামাঝি ইউসোবিও বল নিয়ে এগিয়ে এসে উঁচু করে গোলের মুখে ফেলল। সাইমোস তৈরী ছিল। মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে উঠে হেড দিল সে। গোল......। পর্তুগাল দিয়েছে। দ্বিগুণ উৎসাহে খেলতে লাগল পর্তুগালের খেলোয়াড়রা। পর্তুগাল ফ্রি কিক পেল। কলুনা ব্রাজিলের গোলের দিকে উঁচু করে মারল। গোলরক্ষকের সামনে ব্রাজিলের একজন ব্যাক। ফলে তার দৃষ্টি প্রতিহত। সেই সুযোগ বুঝে ইউসোবিও শিকারী বিড়ালের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে কপালের ছোঁয়ায় বলটাকে জড়িয়ে দিলেন ব্রাজিলের জালে। দু গোলে এগিয়ে গেল পর্তুগাল।

ওদিকে এক সংঘর্ষে আহত হয়েছেন পেলে। হাঁটুতে চোট লেগেছে। ফলে তিনি আর খেলতেই পারলেন না। তবু বিরতির পর ব্রাজিল একটা গোল শোধ করে দিল। কিন্তু তারপরই ইউসোবিও বাঁক খাওয়া কর্ণার সটে গোল করে নিজের দলের জয়ের পথ পরিষ্কার করে দিল।

হেরে গেল ব্রাজিল। সমস্ত বিশ্বে হৈ-হৈ পড়ে গেল। ইংলন্ডের কাগজগুলো লিখল—পেলের কাছ থেকে ইউসোবিও শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব ছিনিয়ে নিয়েছেন। পেলে নয়, ইউসোবিওই এখন ফুটবলের বাদশা.........।

কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে পর্তুগাল। এবার খেলতে হবে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে। পর্তুগালের জয় সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিত। কিন্তু খেলা সুরু হতে না হতেই পরপর তিনটি গোল দিয়ে বসল কোরিয়া। কিন্তু হাল ছাড়েন নি পর্তুগালের খেলোয়াড়রা। সাইমোস বল নিয়ে এগিয়ে এসে ঠেলে দিলেন ইউসোবিওকে। এ-পা, ও-পা করে মুহূর্তের মধ্যে ইউসোবিও বলটা পাঠিয়ে দিল গোলের মধ্যে। বিরতির ঠিক আগে পেনাল্টি সীমানার মধ্যে টোরেসকে ল্যাং মারায় পর্তুগাল পেনাল্টি পেল। জোরালো সটে গোল করল ইউসোবিও। পর্তুগাল তখনও এক গোলে পিছিয়ে। কিন্তু বিরতির পর কোরিয়াকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলল পর্তুগাল। সাইমোস বল বাড়িয়ে দিলেন ইউসোবিওকে। দুরন্ত গতিতে ছুটে এসে ইউসোবিও প্রচন্ড সটে তৃতীয় গোলটিও শোধ করে দিলেন। পর পর তিনটি গোল। বিশ্ব ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে হ্যাটট্রিক করল ইউসোবিও। ক'মিনিট যেতে না যেতে ইউসোবিও আবার গোল করতে উদ্যত। পেছন থেকে তাঁকে ধাক্কা মারলেন কোরিয়ার একজন খেলোয়াড়। পেনাল্টি। ইউসোবিও দিলেন সেই গোলটি। খেলা শেষ হবার আগে অগাস্তো দিলেন পঞ্চম গোলটি। ৫—৩ গোলে হারল উত্তর কোরিয়া। চারটি গোল দিল ইউসোবিও। সেমিফাইনালে উঠল পর্তুগাল।

সেমিফাইনালে খেলতে হবে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে। পর্তুগালের খেলোয়াড়দের চোখে তখন জ্বলে-রিমে জয়ের স্বপ্ন। কিন্তু দেশের মাটিতে ইংলন্ডকে হারানো অত সহজ নয়। ছলে-বলে-কৌশলে ইংলন্ড জেতার চেষ্টা করবেই। খেলা সুরু হতে না হতেই দেখা গেল সেই চেষ্টাই চলছে। রেফারী চোখ বুজে ইংলন্ডকে টানছেন। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হবার কিছু আগে চার্লটন গোল দিয়ে এগিয়ে দিলেন ইংলন্ডকে। হাজার চেষ্টা করেও পর্তুগাল গোলটা শোধ করতে পারল না। খেলা শেষ হবার মিনিট দশেক আগে চার্লটন আরো একটা গোল দিলেন।

তারপরই পর্তুগালের টেরেস আর একটু হলেই গোল দিচ্ছিলেন। কিন্তু ইংলন্ডের একজন খেলোয়াড় হাত দিয়ে বলটা থামিয়ে দিলেন। পেনাল্টির নির্দেশ দিলেন রেফারী। ইউসোবিও শোধ করে দিলেন একটি গোল। এরপর খেলল পর্তুগালই। খেলা হল ইংলন্ডের সীমানার মধ্যেই। পর্তু-

গালের একটা সুযোগ ববি মুর হাত দিয়ে আটকালেন। রেফারী দেখেও দেখলেন না। তারপরই সাইমোস এক মুহূর্ত দেরী করায় নষ্ট করলেন ইংলন্ডের ফাঁকা গোলে বল ঠেলে দেবার সুযোগ।

হেরে গেল পর্তুগাল। বিজয়ী দলের মত খেলেই ইংলন্ডের কাছে ২—১ গোলে হার স্বীকার করল। কিন্তু সেই সঙ্গে রেখে গেল ফুটবলের ইতিহাসের স্মরণীয় কয়েকটি মুহূর্তের স্মৃতি। পর্তুগাল খেলেছে খেলার মত খেলা। শুধু খেলার মাঠেই খেলে নি তারা। তারা লড়েছে ইংলন্ডের নির্লজ্জ ক্রীড়া-রাজনীতির বিরুদ্ধেও।

দেশে ফিরে যাচ্ছে পর্তুগালের খেলোয়াড়রা। বিমান বন্দরের ভিড়ের মধ্যে একজন সাংবাদিক একপাশে টেনে আনলেন ইউসোবিওকে। বললেন, "আপনি পেলের চেয়েও বড়.........।"

অবাক চোখে চেয়ে থাকে ইউসোবিও। নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে চায় না। কাগজে কাগজে এই রকম সব মন্তব্য পড়েছে সে। কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন কিছু বলেন নি। এবার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বললেন, "কার সঙ্গে কার তুলনা! পেলে যদি ফুটবলের বাদশা হন, আমি তাঁর গোলাম মাত্র.........।"

কানহাই

॥ এক ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে আমেরিকা মহাদেশের তলায় ছোট-বড় কয়েকটি দ্বীপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গা লাগিয়ে। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে বালুকাবেলায়। সেখান থেকে সুরু হয়েছে নারকেল গাছের সার। দ্বীপগুলো ছেয়ে আছে নারকেল গাছে। সেই গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়বে সবুজ প্রান্তর, ছোট ছোট পাহাড়, ঘর-বাড়ী। আর চোখে পড়বে কালো কালো মানুষের মূর্তি। ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ মাঠে মাঠে খেলে বেড়াচ্ছে। কারো হাতে ব্যাট, কারো হাতে বল। ক্যালিপসোর সুর ভেসে বেড়ায় এখানে-সেখানে। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবন ও যৌবনের নেশায় মত্ত নারী ও পুরুষদের গলা ছাড়া হাসি কাঁপিয়ে দেয় আকাশ-বাতাস। ঐ দ্বীপগুলোতে কালো পাথরে কোঁদা মানুষগুলোর সঙ্গে বাস করে কিছু ভারতীয়, চীনা আর সাদা চামড়ার সাহেব। ঐ দ্বীপগুলোর আলাদা আলাদা নাম আছে। কোনটার নাম বার্বাডোজ, কোনটা ত্রিনিদাদ, কোনটা বা বৃটিশ গিয়ানা। একত্রে বলা হয় পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। যার ইংরেজী নাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

বৃটিশ গিয়ানার ছোট্ট একটি শহর পোর্ট মাউরেন্ট। ক'টা চিনির কারখানা আছে বলেই শহরটার যা একটু নামডাক। তা ঐ অঞ্চলের সব জায়গাতেই চিনির কল আছে। আর আছে খেত ভরা আখ। পোর্ট মাউরেন্টের অধিকাংশ লোকই চিনির কলগুলোতে কাজ করেন। সামান্য কাজ। তাই অভাব-অনটনের মধ্যেই দিন কাটে। অবস্থা প্রায় সকলেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয় গোছের।

এই শহরেরই এঁদো একটি গলিতে থাকত একটি ছাত্রতীয় পরিবার। নামেই ভারতীয়। ছোটরা জানেও না কবে তাদের বাবা ঠাকুরদারা ভারত থেকে এসে বাসা বেঁধেছিলেন এই দ্বীপে। ওরা এখন পুরোপুরি ঐ দ্বীপেরই মানুষ। কথা-বার্তা, হাব-ভাব কোন বিষয়েই বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। যেটুকু আছে তা ঐ চেহারায়। কালো রং ঠিকই। কিন্তু ওদের মত কুচকুচে নয়। মাথা ভর্তি গোছা মোটা কোঁকড়ান ছোট ছোট চুলও নেই। চেহারায় ওরা এখনও খাঁটি ভারতীয়।

এই রকমই একটি ভারতীয় পরিবারে ১৯৩৫ সালে ২৬শে ডিসেম্বর জন্ম হল একটি ছেলের। পাঁচ বোন, দুভাইয়ের সংসার। হৈ-হৈ লেগেই আছে। ভাই-বোনদের মধ্যে খুঁটি-নাটি লেগে থাকতই। মার খেত ছোটটাই। মা রান্না-টান্না নিয়ে ব্যস্ত। অত বড় সংসার, কাজ তো আর কম নয়। বাবা কাজ করেন এক চিনির কলে। সকাল বেলায় সাইকেলে চেপে সেই যে বেরুলেন—ফিরতে সন্ধ্যে পেরিয়ে যায়। ফলে ছেলে-মেয়েরা স্বাধীন। যার যা ইচ্ছে করছে। দেখার কেউ নেই।

ছোট ছেলেটার নাম কানহাই। একটু বড় হতেই গলিতে নেমে পড়ল। ওর বয়সের আরো তিনটে বাচ্চা তখন ঐ এঁদো গলিতে ঘোরাঘুরি করতো। তাই চারজনে দারুণ ভাব হয়ে গেল। প্রায়ই দেখা যেত চারটি ছেলে এক সঙ্গে বসে। ওদের নাম বেসিল বুচার, জো সলোমন, আইভ্যান ম্যাডরে আর রোহান কানহাই। কানহাইদের পাশের বাড়ীতে থাকতেন জন খুড়ো। ভাল নাম জন ট্রিম। দারুণ ক্রিকেট খেলতেন এক সময়। অনেকগুলো টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। বাচ্চা চারটির ওপর ছিল তাঁর নজর। ভালবাসতেন ওদের। ক্রিকেট খেলার দিকে ওদেরও যে খুব ঝোঁক এ কথাটা জানতেন বলেই বোধহয় আরো বেশী ভালবাসতেন। ভালবাসার আর একটা কারণ হল ছেলেগুলোর পারিবারিক অবস্থা। ভাল করে খেতেও যে পায় না ছেলেগুলো। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভাল মানুষদের বড়ই দুর্গতি। বড্ড গরিব ওরা। জন ট্রিমও ওদেরই একজন। এই এঁদো গলিতেই তিনি জন্মেছেন, মানুষ হয়েছেন। তারপর একদিন বড় খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীতে। তাই ঐ চারটি ছেলেকে দেখলে তাঁর মনে পড়ে যায় নিজের ছোটবেলার কথা। তাঁর মত ওদেরও ব্যাট নেই, বল নেই। নারকেল গাছের পাতা ছাড়িয়ে কেটেকুটে নিয়ে ওরা ব্যাট বানায়। কাগজের গোল্লা বানিয়ে তার ওপর ন্যাকড়া জড়িয়ে ওরা বল তৈরী করে। তারপর গলিতে খেলে নিজেদের মনে। কেউ খেলা শেখাবার নেই, কেউ দেখিয়ে দেবার নেই। জন খুড়ো তাই চুপ করে থাকতে পারতেন না। ছুটে ছুটে আসতেন ওদের কাছে। উপদেশ দিতেন, খেলা শিখতেন। কখন কখন ব্যাট বল কিনে দিতেন।

দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠল ওরা। বয়সে জো সলোমন ছিল ওদের চেয়ে একটু বড়। সে আগেই রোয়ান ক্যাথলিক স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কানহাই আর আইভান ভর্তি হল ঐ স্কুলেই। কিন্তু বেসিলকে ওর বাবা অ্যাঙ্গলিকান স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ওরা চারজনেই খেলতে লাগল স্কুল দলে।

স্কুলের খেলা দুপুর বেলায়। বেশীক্ষণ হয় না। ছেলে-

টেজ ঘন্টা দুই-আড়াই। তাই ব্যাট করতে নেমে কানহাইরা পিটোতে সুরু করত। জোরে বল কিম্বা আস্তে বলের পরোয়া তারা করত না। তাড়াতাড়ি রান করতেই হবে। রান করতে না পারলেই দল থেকে বাদ। তাই সকলেই মেরে খেলতে চাইত। স্কুলের পরেই গলিতে কিম্বা পাড়ায় খেলা। কোন রকমে একটা ব্যাট আর একটা বল হয়তো জোগাড় করা সম্ভব হত। প্যাড, গ্লাভ্‌স কিছু নেই। তাতে কি হয়েছে, পায়ে বল লাগছে—লাগুক; হাত কেটে যাচ্ছে—কাটুক। ওসব ভয়-টয় করতে হলে আর যাই হোক ক্রিকেট খেলা চলে না। ছোটবেলা থেকেই ওদের মন থেকে ভয়-টয় সব উবে যেত। আর সমস্ত শরীর বিশেষ করে হাত আর পা দুটো সব সময়ই কাটাকুটিতে ভরা থাকত। একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যেত হাত-পায়ের এখানে-ওখানে ক্ষত আছে। অবশ্য তাতে কিছু এসে-যেত না। খেলা চলত পুরো দমেই। লেগেছে বলে যে খেলবে না, এ কথা কেউ ভাবতেই পারত না।

কানহাইয়ের খেলা দেখে ওর বাবা মোটেই খুশী হতেন না। তাঁর ধারণা হয়েছিল, কানহাই অযথাই সময় নষ্ট করছে। ব্যাট করতে নেমে চটপট চল্লিশ-পঞ্চাশ রান করে ও আউট হয়ে যেত। ওর বাবা কিছুতেই বুঝতে চাইতেন না যে স্কুলের খেলায় তাড়াতাড়ি রান না করলে কিছুতেই চলে না। তবে অন্য সকলেই ওর ওপর খুশী ছিলেন। তাই অল্প বয়েসেই কানহাই হয়ে গেল স্কুল দলের অধিনায়ক।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কানহাইয়ের রোখ চেপে গিয়েছিল, তাকে ভাল খেলতেই হবে। দলে চান্স পেতেই হবে। নিজের ব্যাটিংয়ের ওপর খুব একটা আস্থা ছিল না কানহাইয়ের। তাই দলে তার স্থানটি পাকা করার জন্য সে উইকেট কিপিংও সুরু করল। ফলে স্কুল দলের সে ছিল উইকেট-রক্ষক-ব্যাটসম্যান।

স্কুলের গন্ডী পেরুতেই ওরা চারজনে পোর্ট মাউরেন্ট ক্রিকেট ক্লাবে খেলতে সুরু করল। ওরা চারজনে বেশ ভালই খেলত। কানহাই দলের ইনিংসের গোড়াপত্তনের সঙ্গে উইকেট কিপিংও করত। ভাল খেলে বলে ওদের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল। জো সলোমন, বেসিল বুচার আর রোহান কানহাইয়ের নাম তখন সকলেরই জানা।

বড় ক্রিকেটের আসরে আত্মপ্রকাশের সুযোগ কানহাই হঠাৎ পেয়ে গেল। ১৯৫৪ সালের কথা। তখন তার বয়েস সবে আঠারো।

ঠিক হল জর্জটাউনে একটি প্রদর্শনী খেলা হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নামকরা প্রায় সব খেলোয়াড়রাই সেই খেলায় খেলবেন। তবে সেই খেলায় একটি দলে আরো তিন জনের দরকার ছিল। পোর্ট মাউরেন্ট ক্লাবকে বলা হল তাদের তিন জন ভাল খেলোয়াড়কে পাঠাতে। এই তিন জনের মধ্যে ন্যাটা স্পিনার কোবরা রামডাটের মনোনয়নের বিষয়ে কারো কোন সন্দেহই ছিল না। বাকী দুজনকে বেছে নেওয়া হবে কানহাই, সলোমন ও বুচারের মধ্যে থেকে। ক্লাবের কর্মকর্তারা পড়লেন মহা চিন্তায়। কাকে ছেড়ে কাকে পাঠাবেন। তিন জনেই যে ভাল খেলে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল লটারী করে দুজনকে বেছে নেওয়া হবে। লটারীতে নাম উঠল বুচার আর সলোমনের। কানহাই হেরে গেল। তার বরাতে জুটল না বড় খেলায় অংশ নেবার সুযোগ। কানহাই সেদিন কেঁদে ফেলেছিল। আঠারো বছরের একটি ছেলের কাছে এ যে কত বড় দুঃখ তা বোধহয় সকলে ভাবতেও পারবেন না। কানহাইয়ের মনে হল সে যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আর সে কোনদিনই বড় খেলোয়াড় হতে পারবে না! সারা রাত ঘুমোতে পারল না। ছটফট করল। তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটাই মুছে গেছে।

কিন্তু পরদিন সকালে ব্যাপারটা অন্য রকম হয়ে গেল। সলোমনের পা মুচকে গেল। ফলে কানহাই পেয়ে গেল তার জীবনের প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে খেলার সুযোগ। ব্যাটে কানহাই মোটেই সুবিধে করতে পারল না। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে সে উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে পর পর পাঁচজনকে আউট করে দিল ক্যাচ লুফে। আর সেই পাঁচটি ক্যাচই তাকে এনে দিল বৃটিশ গিয়ানার পক্ষে নির্বাচনী ম্যাচে খেলার সুযোগ। সেই খেলায় ভালভাবে উইকেট কিপিং করার সঙ্গে সে ৬২ রান করল। ফলে গায়না দলে তার স্থান মোটামুটি পাকা হয়ে গেল। এবং গায়না দলের সঙ্গে সে বার্বাডোজে খেলতে গেল। সেই দলে ছিলেন বি. গেয়ারাড়ুঁয়া (অধিনায়ক), ওয়ালকট, গ্লেনডন গিবস, ল্যান্স গিবস, ম্যাকওয়াট, সনি ইডেন, বেসিল বুচার, রোহান কানহাই প্রভৃতি। বার্বাডোজে গিয়ে কিন্তু সে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না।

ওদিকে অস্ট্রেলিয়া এসে গেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। গিয়ানা দলের হয়ে উনিশ বছরের কানহাই খেলতে নামল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। কানহাই যখন ব্যাট করতে নামল তখন বল করছিলেন কিথ মিলার। মিলারকে বিন্দুমাত্রও পরোয়া করল না কানহাই। নির্মমভাবে পেটাতে সুরু করল। তাঁর আউট সুইঙ্গারগুলো সে বিনা দ্বিধায় স্কোয়ার লেগ বাউন্ডারীতে পাঠাচ্ছিল। কানহাই কোনদিন কেতাবী খেলা শেখেনি। কেউ তাকে বলে দেয়নি যে, ঐ ভাবে মারা উচিৎ নয়। ক্রস ব্যাটে ঐ ভাবে মারতে সে খুব ভালবাসে। অনেক রানও করে। আর সেদিনও সে তাই করতে লাগল।

ওদিকে কানহাইয়ের খেলার ধরন দেখে মিলার থ। তাঁর ধারণাই ছিল না যে ঐ ভাবে কেউ খেলতে পারে। ফলে রেগে-মেগে তিনি আরো জোরে বল করতে লাগলেন। কানহাইও সেগুলো পুল করে বাউন্ডারীতে পাঠাতে লাগল। মিলার আরো রেগে গেলেন। ওদিকে কিন্তু ওয়ালকট আর কানহাই খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। কানহাই শেষ পর্যন্ত হাফ সেঞ্চুরী করার পর আউট হয়ে গেল। খেলার শেষে এক পার্টিতে কানহাইকে দেখেই মিলার এগিয়ে এলেন। তারপর বললেন, "দেখ খোকা, এরপর যদি তুমি এইভাবে মারতে যাও তাহলে বিপদে পড়বে।"

কানহাইয়ের নাম ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ খেলছে ছেলেটা। ভাল ব্যাট করে। উইকেট কিপিংয়েও মন্দ নয়। তবে কোনদিন যে টেস্ট খেলবে এ কথা তখন কানহাই ভাবতেও পারত না। ১৯৫৭ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংলন্ড সফরে যাবে। ইংলন্ডগামী দলে ঠাঁই পাবার জন্যে সকলেই তখন খুব চেষ্টা করছে। ওদিকে সুরু হয়ে গেছে জর্জটাউনের চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতা। জামাইকার বিরুদ্ধে কানহাই ১২৯ রান করল। বার্বাডোজের সঙ্গে কানহাই দারুণ খেলছিল। মার মেরে খেলে তাড়াতাড়ি সেঞ্চুরী করে ফেলল। লাঞ্চের সময় ওয়ালকট কানহাইকে ডেকে বললেন, "বেশ খেলছ

তুমি। ইংলন্ডগামী দলে আমি তোমাকে দেখতে চাই।" তারপর একটু থেমে বললেন, "একটা ডাবল সেঞ্চুরী করো—তাহলে আমি তোমায় আমার একটা ব্যাট দেব।"

সেই খেলায় কানহাই সত্যিই ভাল খেলল। কিন্তু পাঁচ রানের জন্য পেল না ব্যাটটা। ১৯৫ রান করে আউট হয়ে গেল কানহাই। এরপর টেস্ট দল গড়ার ট্রায়ালে ডাক পড়ল কানহাইয়ের। সেখানেও দারুণ খেলল কানহাই। কানহাইয়ের ব্যাটিং শক্তির ওপর আর কারো সন্দেহই রইল না। কানহাইয়ের মন জুড়ে তখন মস্ত এক আশা। সে স্বপ্ন টেস্ট খেলার, টেস্ট খেলোয়াড় হওয়ার......।

॥ দুই ॥

ইংলন্ড সফরকামী দলে কানহাই চান্স পেয়ে গেল। অথচ কিছুদিন আগে খেলার সময় এক সংঘর্ষে সে সাংঘাতিক রকম আঘাত পেয়েছিল পায়ে। শুয়ে ছিল অনেকদিন। ইংলন্ডে যাবার জন্য জাহাজে যখন সে উঠল, তখনও খুঁড়োচ্ছে। পায়ের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। অন্য কোন দেশ হলে ঐ রকম আঘাত নিয়ে কোন নবাগত খেলোয়াড়কে বিদেশে পাঠাবার কথা নির্বাচকরা ভাবতেও পারতেন না। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের সব কিছুই আলাদা। তাই তাঁরা কানহাইয়ের দাবী উপেক্ষা করেন নি। জাহাজেই চলতে লাগল কানহাইয়ের চিকিৎসা।

সেবারের ইংলন্ড সফরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খুব একটা সুবিধে করতে পারল না। কানহাইয়ের অবস্থা আরো শোচনীয়। প্রথম দিকে তো খেলতেই পারছিল না। সে হাড়ে হাড়ে টের পেল ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোদে ঝলমল মাঠে খেলা এক, আর ইংলন্ডের বৃষ্টি-ভেজা স্যাঁতসেঁতে উইকেটে খেলা আর এক ব্যাপার। প্রথম পাঁচটি ইনিংসে কানহাই মাত্র ছ'রান করল—০, ০, ০, ৪, ২. রান। অথচ সফরে আসার আগের পাঁচটা ইনিংসে সে করেছিল ২৯, ৯৫, **৬২, ৯০** ও ১১৭। তবে শেষ পর্যন্ত কানহাই কিছুটা সামলে নিয়েছিল। দেখেছিল রানের মুখ। প্রথম টেস্টে ৪২, তৃতীয় টেস্টে ৪৭ রান। উল্লেখ করার মত এই-ই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেবার গো-হারা হেরে দেশে ফিরে গেল। জীবনের প্রথম সফরে এমন বিশ্রীভাবে হেরে যাবার কথা কানহাই সহজে ভুলতে পারেন নি।

১৯৫৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারত সফরে এল। তার আগে পাকিস্থানে গিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। আলেকজান্ডারের ওপর পড়ল নেতৃত্বের ভার। আলেকজান্ডার উইকেট-রক্ষক। তাই কানহাইকে জলাঞ্জলী দিতে হল উইকেট-রক্ষক হিসেবে দলে ঠাঁই পাবার আশা। ব্যাটিংয়ের ওপরই জোর দিল সে। এবং দলের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসমান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল।

সেবার পাকিস্থানের বিরুদ্ধেই গ্যারী সোবার্স ৩৬৫ রান করে ভেঙে দিয়েছিল স্যার লেন হাটনের সব থেকে বেশী রান করার রেকর্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খুব সহজেই রাবার পেয়ে গেল। কানহাইও মোটামুটি ভালই খেলেছিলেন।

ভারত সফরে এসে ভারতীয়দের মেরুদন্ড ভেঙে দিলেন গিলক্রিস্ট আর হল্। বিশেষ কোন ব্যাটসম্যান বিক্ষিপ্ত-লগ্নে ছাড়া কোন সময়ই ওঁদের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারেন নি। দল গড়া নিয়েও সেবার সমস্যার অন্ত ছিল না। পাঁচটি টেস্টে চারজনের ওপর পড়েছিল দল পরিচালনার ভার। এই চারজন হলেন—উমরিগড়, গোলাম আমেদ, ভিনু মানকাদ ও হেমু অধিকারী।

কানহাই সেবার সুভাষ গুপ্তের বিরুদ্ধে মোটে খেলতেই পারছিল না। বারবার আউট হয়ে যাচ্ছিল। প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ রান করার পর সে গুপ্তের বলে ধরা পড়ল পংকজ রায়ের হাতে। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টেও কোন রান করার আগে সে আউট হল গুপ্তের বলে। বারবার গুপ্তের বলে আউট হয়ে যাওয়ায় গুপ্তে কানহাইকে খরগোসের মত ভীরু বলে ধরে নিয়েছিলেন। কানপুর টেস্টে যে দিন কানহাইকে গুপ্তে আবার হার মানালেন, সেইদিনই চা-পানের সময় ঘটল একটা ঘটনা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর ভারতের খেলোয়াড়রা এক সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলেন। গল্প-টল্পও চলছিল তখন। গুপ্তে সেখানে ছিলেন না। হঠাৎ এসে ঢুকলেন। তারপর কানহাইয়ের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, "এই যে খরগোশ মশাই।" গুপ্তের বলার ধরনে সকলে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। আর রাগে-দুঃখে-লজ্জায় জ্বলে উঠল কানহাই। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে সে বললে, "আচ্ছা, এবার তোমায় দেখে নেব।"

কানহাই তার কথা রেখেছিল। কলকাতার তৃতীয় টেস্টে তার খেলার কথা এখনও তাই সকলের মুখে মুখে ঘোরে। সুভাষ গুপ্তেকে সে মোটে পরোয়াই করেনি। মেরে ছাতু করে দিয়েছিল। তার মারের দাপটে সেদিন থরথর করে কেঁপেছিল ইডেনের সবুজ চত্বর। আর সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলির সাক্ষী ছিলেন ইডেনের ষাট-সত্তর হাজার দর্শক। খরগোস বলার প্রতিশোধ কানহাই সেদিন ভালভাবেই নিল। গ্যারী সোবার্সের পেটের অসুখ হওয়ায় কানহাই ব্যাট করতে নামল তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে। আর দিনের শেষে সে ২০৩ রান করে অপরাজিত রয়ে গেল। পাঁচ ঘন্টা উইকেটে থেকে সে হাঁকিয়েছিল চৌত্রিশটি বাউন্ডারী। সেঞ্চুরী করতে কানহাই সেদিন সময় নিয়েছিল মাত্র ১৩২ মিনিট। আর অপরাজিত চতুর্থ উইকেট জুটিতে বুচার ও কানহাই ১৪৪ মিনিটে যোগ করল ১৭৯ রান। পরের দিন ২৫৬ রান করে তবেই কানহাই হার স্বীকার করেছিল। ভারত সফরে এসেই বেসিল বুচার ও জো সলোমন প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিল।

রানের পর রান। সাফল্যের পর সাফল্য। অল্প সময়ের মধ্যেই কানহাই নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলল। রোহান কানহাইয়ের নাম তখন ক্রিকেট-রসিকদের মুখে মুখে। বছর গড়িয়ে চলল। দেখতে দেখতে এসে গেল ১৯৬০ সাল। এই বছরের শেষের দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ গেল অস্ট্রেলিয়া সফরে। এই সফরটির কথা ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। পৃথিবীর একমাত্র 'টাই টেস্ট'টির কথা কে-ই বা ভুলতে পারেন!

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল আর অস্ট্রে-

লিয়ার রিচি বেনো। ওরেলই টসে জিতলেন। কিন্তু সুরুতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হল। মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই হান্ট, কোলি স্মিথ আর কানহাই আউট হয়ে গেলেন। তবে সোবার্স তখনও উইকেটে। এবং তিনি একাই লড়ে গেলেন। সোবার্স আউট হলেন ১৩২ রান করে। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ করল ৪৫৩ রান। অস্ট্রেলিয়াও কম গেল না। ও'নীল ১৮১ আর ববি সিম্পসন ৯২ করায় অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্কোর ডিঙিয়ে গিয়ে ৫২ রানে এগিয়ে রইল। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তেমন সুবিধে করতে পারল না। ২৮৪ রানেই তাদের ইনিংস শেষ। অস্ট্রেলিয়ার সামনে তখন জেতার সম্ভাবনা। জেতার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে ৩১২ মিনিটে করতে হবে মাত্র ২৩৩ রান। অর্থাৎ ঘন্টায় ৪৫ রানের হিসেবে করলেই চলবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দু ইনিংস মিলিয়ে করেছে ৭৩৭ রান। আর অস্ট্রেলিয়ার শুধু প্রথম ইনিংসেই ৫০৫ রান।

অস্ট্রেলিয়া সুরু করলে তাদের দ্বিতীয় ইনিংস। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল যে আর যাহোক ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা চট করে হার স্বীকার করবেন না। স্পষ্ট বোঝা গেল হারতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের লজ্জা নেই। কিন্তু তারা খেলে হারতে চায়। তাই প্রথম থেকেই সুরু হল সংগ্রাম। এক দলের রান করার, অপর দলের রান করতে না দেবার প্রচন্ড সংকল্প।

হলের দ্বিতীয় ওভারে সিম্পসন আউট হয়ে গেলেন। বল তাঁর ব্যাটের কানায় লেগে স্কোয়ার লেগের দিকে চলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ে অতিরিক্ত খেলোয়াড় গিবস সেই ক্যাচ লুফলেন। তারপর নীল হার্ভের অসম্ভব ক্যাচ ধরলেন সোবার্স। ক্যাচটি লুফতে গিয়ে তাঁর একটা আঙুল ভেঙে গেল। ম্যাকডোনাল্ড উইকেটে টিঁকে রইলেন কোন রকমে। অন্য দিকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন ও'নীল। রানের মুখ দেখতেই পারছেন না। মধ্যাহ্ন ভোজের আগে ৭৮ মিনিট খেলে অস্ট্রেলিয়া করল মাত্র ২৮ রান। তাও দুটি উইকেট হারিয়ে।

লাঞ্চের পর হাত খুললেন ও'নীল। ম্যাকডোনাল্ডও। কিন্তু কেউই বেশীক্ষণ টিঁকতে পারলেন না। হলের বলে পরপর দুবার লেট কাট করে বাউন্ডারী করার পর ও'নীল আর লোভ সামলাতে পারলেন না। আবার গেলেন বল কাটতে। কিন্তু এবার কাটা পড়লেন আলেকজান্ডারের হাতে। তারপর ওরেলের বলে বোল্ড হলেন ম্যাকডোনাল্ড। ফ্যাভেল এসে খাবি খাচ্ছিলেন। বার কয়েক আউট হতে হতে বেঁচে যাবার পর হলের বল স্কোয়ার করতে গিয়ে তুলে দিলেন সলোমনের হাতে। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা ঘুরছে। বেলা তখন দুটো বেজে কুড়ি মিনিট। অস্ট্রেলিয়ার পাঁচ উইকেটে ৫৭। জেতার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে ২০০ মিনিটে ১৭৬ রান করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার ৮০ রানের মাথায় রামাধীনের বলে ম্যাকের স্লিপে তোলা ক্যাচ ফেলে দিলেন গিবস। জীবন ফিরে পেয়ে ৬০ মিনিটে ম্যাকে আর ডেভিডসন ৩৫ রান যোগ করলেন। তারপরেই রামাধীন ম্যাককে ফিরিয়ে দিলেন প্যাভেলিয়নে। ব্যাট হাতে মাঠে নামলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বেনো। চা পানের সময় ডেভিডসন ১৬ রান আর বেনো ৬ রানে অপরাজিত। জেতার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে তখন ১২৩ মিনিটে ১২০ রান করতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ১১০। বাকী চারটি উইকেট দখল করার জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা তখন মরিয়া, কিন্তু বেনো আর ডেভিডসন প্রাণপণে লড়তে লাগলেন! আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল খেলার মোড়। অস্ট্রেলিয়ার শিবিরে তখন আবার জ্বলেছে আশার আলো।

খেলা শেষ হতে আর ৩০ মিনিট বাকী। অস্ট্রেলিয়ার চাই ২৭ রান। খেলছেন বেনো আর ডেভিডসন। তখন মনে হল ওয়েস্ট ইন্ডিজের আক্রমণের মেরুদন্ড বুঝি ভেঙে গেছে। ওরেল সরিয়ে নিয়েছেন হলকে। নিজে খেয়েছেন বদম মার। রামাধীনকে তুলো ধুনে ছেড়েছেন বেনো আর ডেভিডসন। মার খেয়েছেন সোবার্সও। ৯৫ মিনিটে ওঁরা দুজনে করলেন ১০০ রান। এর মধ্যে ডেভিডসন ৬০ আর বেনো ৪১। অস্ট্রেলিয়া বুঝি জিততে চলেছে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে ওরেল নিলেন নতুন বল। তুলে দিলেন হলের হাতে। হলের বলটা মাটিতে পড়ে লাফিয়ে উঠল। ডেভিডসন সরে এসে হুক করলেন। মুহূর্তের মধ্যে বলটা পৌঁছে গেল সীমানার বাইরে। সময় বয়ে চলল। রানও উঠছে। স্কোর বোর্ডের ঘড়িতে তখন ছটা বাজতে দশ। খেলার আর দশ মিনিট বাকী। অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে ৯ রান। অন্য দিক থেকে বল করতে এলেন সোবার্স। দুটো রান হয়ে গেল। সোবার্সের পরের বলটা স্কোয়ার লেগে সলোমনের পাশ দিয়ে ঠেলে বেনো রান নিতে গেলেন। জো ছুটে গিয়ে চিলের মত ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বলটা ছুড়ে মারলেন উইকেটে। মুহূর্তের মধ্যে উইকেট ভেঙে গেল। ডেভিডসন তখনও বেশ খানিকটা দূরে। ১৯৪ মিনিটে ৮০ রান করে আউট হলেন ডেভিডসন। ডেভিডসন প্যাভেলিয়নে পৌঁছোবার অনেক আগেই উইকেটে এসে গার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছেন গ্রাউট। সোবার্সের সপ্তম বলে (আট বলে ওভার) একটা রান নিলেন গ্রাউট। মস্ত বড় ভুল করলেন গ্রাউট। পরের বলে বেনো রান নিতে না পারলে তাঁকে হলের মুখোমুখি হতে হবে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা ছেঁকে ধরলেন তাঁকে। বেনোর রান নেওয়া হল না। হল চললেন বল করতে। এই টেস্টে তাঁর শেষ ওভার। জেতার জন্য তখনও ছ রান দরকার অস্ট্রেলিয়ার। হাতে তিনটে উইকেট।

গ্রাউট কোন রকমে হলের বলটা ঠেকালেন। হঠাৎ দেখা গেল বেনো ছুটে আসছেন ক্রীজের মাঝামাঝি পৌঁছেও গেছেন। পড়িমরি করে ছুটলেন গ্রাউট। পৌঁছেও গেলেন। রাগে জ্বলে উঠলেন হল। ছুটে এসে দিলেন বাউন্সার। বেনো পারলেন না লোভ সামলাতে। গেলেন হুক করতে। বলটা তাঁর গ্লাভসে লেগে চলে গেল উল্লসিত আলেকজান্ডারের মুঠোর মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ১৩৬ মিনিটে ৫২ রান করে আউট হয়ে গেলেন। মেকিফ বলটা ঠেকালেন। দ্বিতীয় বলটা পারলেন না। উইকেটের অনেক পেছনে দাঁড়িয়ে আলেকজান্ডার বলটা ধরেছেন। সেই ফাঁকে গ্রাউট ছুটে এলেন তীর বেগে। তাই দেখে মেকিফ ছুটলেন অন্ধের মত। পৌঁছেও গেলেন। একটা বাই রান হয়ে গেল। জেতার জন্য তখনও দরকার চারটি রান। বলও বাকী চারটি। মাঠে তখন তুমুল উত্তেজনা। প্রতি মুহূর্তে কি হয়, কি হয় ভাব। হলের পরের বল। গ্রাউট ভাবলেন বাউন্সার। গেলেন হুক করতে। কিন্তু সুন্দর লেংথে পড়ে উইকেটের

দিকে যেতেই গ্রাউট ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে কানহাই-য়ের দিকে বলটা তুলে দিলেন। সহজ ক্যাচ। খুবই সহজ, কানহাই ধরার জন্য প্রস্তুত। ওদিকে ফলো থ্রুর পর ওয়েন তার দিক বদলে ছুটে এল বলের দিকে। সেই মুহূর্তে সে যেন কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। যে মুহূর্তে কানহাই গেল ক্যাচটা ধরতে, হল ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। ছিটকে পড়ল কানহাই। আর হলের হাত গলে বলটা পড়ল মাটিতে। কি করুণ সেই দৃশ্য। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হল। ঘামছে গল গল করে। মাথা নীচু। চোখ বলের ওপর। ইতিমধ্যে গ্রাউট আর মেকিফ একটা রান নিয়ে নিয়েছে। আর তিন রান দরকার। বলও বাকী তিনটি। হলের পরের বলটা মেকিফ গল্ফ খেলোয়াড়ের মত করে ঘুরিয়ে মারলেন দারুণ জোরে। বাউন্ডারীর দিকে ছুটে চলল বলটা। নির্ঘাৎ চার এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের হার। হান্ট ছুটছিলেন বলের পেছনে। হান্টের ছোটা দেখে মনে হচ্ছিল তাঁর জীবন-মরণ প্রশ্নটি বুঝি নির্ভর করছে ঐ বলটা ধরার ওপরেই। সত্যি সত্যিই বলটা ধরে ফেললেন হান্ট। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ছুড়ে দিলেন আলেক-জান্ডারের দিকে। গ্রাউট আর মেকিফ দুটি রান নেবার পর তখন তৃতীয়টি নিচ্ছেন। এটি হলেই অস্ট্রেলিয়া জিতে যাবে। কিন্তু ৯০ গজ দূরে থেকে মুহূর্তের মধ্যে বলটা উড়ে এল এবং আলেকজান্ডার ভেঙ্গে দিলেন উইকেট। গ্রাউট তখন অলিম্পিক দৌড়ের শেষ সীমায় পেঁছুবার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ক্রীজের ওপর। সারা মাঠে তখন আর্তনাদ। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালেন গ্রাউট। না, এবার আর তিনি পারেন নি। আউট হয়ে গেছেন। রান আউট। দু-দলের রান তখন সমান-সমান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৭৩৭। অস্ট্রেলিয়ারও তাই।

আর দুটি বল বাকী। হল তখন দারুণ ক্লান্ত। আর যেন পারছেন না। সপ্তম বলটা ফেললেন লেগ স্টাম্পের ওপর। ক্লাইন বলটা ঠেলেই দৌড়তে সুরু করলেন। দর্শকরা লাফিয়ে উঠলেন। ঐ রানটা হলেই অস্ট্রেলিয়া জিতবে। ফরোয়ার্ড স্কোয়ার লেগে ছিলেন সলোমন। বলটা চামচের মত তুলে নিয়ে বারো গজ দূরে স্টাম্পে ছুড়ে মারলেন উইকেটে। ভেঙ্গে গেল স্টাম্প। আম্পায়ার হোয়ের আঙুল উঠল ওপরে। আউট হয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার শেষ ব্যাটস-ম্যান। দু-দলের রান তখন সমান-সমান। এ কি অসম্ভব কান্ড। এর চেয়ে অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ঘটনা ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নি।

দর্শকরা ততক্ষণে নেমে পড়েছেন মাঠে। দু-দলের খেলোয়াড়রা পাগলের মত নাচছেন। বেনো প্যাভেলিয়ন থেকে বেরিয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন ওরেলকে। তার-পর বিশ্ব ক্রিকেটের দুই ঐতিহাসিক নায়ক ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন মাঠ ছেড়ে।

॥ তিন ॥

অস্ট্রেলিয়ায় বাকী ক'টি টেস্টে কানহাই খুবই ভাল খেলল। দ্বিতীয় টেস্টে ৮৪। আর তার পরের টেস্টেই কান-হাই খেলল তার জীবনের স্মরণীয় খেলা। দু ইনিংসেই সেঞ্চুরী করল। অস্টেলিয়া সফরে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের আর কোন ব্যাটসম্যানই ঐ কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে নি। মাত্র ১২০ মিনিটের মত সময় নিয়ে কানহাই প্রথম ইনিংসে ১১৭ রান, আর দ্বিতীয় ইনিংসে করল ১১৫। সেই টেস্টে ল্যান্স গিবস হ্যাটট্রিক করেছিলেন। ম্যাকাইকে আউট কর-লেন এল. বি. ডব্লিউ. করে, গ্রাউট ধরা পড়লেন লেগ স্লিপে আর তৃতীয় বলে গিবস মিশনকে সরাসরি বোল্ড করে দিলেন। বাজে আম্পায়ারিংয়ের জন্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ সেবার রাবার জিততে পারে নি। তবে সেবারের খেলা-গুলো দারুণ হয়েছিল। আর ঐ সফরটির কথা ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

১৯৬২ সালে ভারত গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। ভার-তের খেলোয়াড়রা ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ঠিকভাবে খেলতে পারেন না। তাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে তিনজন ফাস্ট বোলারকে নেওয়া হয়েছিল। হল, চেস্টার ওয়াটসন আর চার্লি স্টেয়ার্স ভারতের ইনিংস ছত্রখান করে দিলেন। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে ৮৬ রানে পিছিয়ে থেকে ভারত ব্যাট করতে নামল এবং মাত্র ৯৮ রানেই শেষ করল তাদের ইনিংস। এবং হারল বিশ্রীভাবে। কিংসটনের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতল এক ইনিংস ও ১৮ রানে। ভারত প্রথম ব্যাট করে করল ৩৯৫। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান গিয়ে পেঁছুল ৬৩১-এ। সোবার্স ১৫৩, কানহাই ১৩৮, ম্যাকমরিস ১২৫, মেনডোনকা ৭৮ ও ওরেল ৫৮ রান করলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারত মোটেই সুবিধে করতে পারল না।

জামাইকা টেস্টের পর বার্বাডোজে ঘটল সেই বিশ্রী ঘটনাটা। ভারতের অধিনায়ক নরী কনট্রাক্টরের খেলোয়াড় জীবনের ওপর ইতির দাঁড়ি টেনে দিল ঐ খেলাটিই। চার্লি গ্রিফিথ বল করছিলেন। খুব জোর তাঁর বলে। বাম্পার বিমার দেওয়াতেও সিদ্ধহস্ত। কিন্তু সেই বলটা বাম্পার বা বিমার কিছুই ছিল না। স্টাম্পের চেয়ে উঁচুতেও লাফিয়ে ওঠে নি। কনট্রাক্টর মাথা নীচু করেছিলেন। ভেবে-ছিলেন বলটা তাঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তা হল না। বলটা সরাসরি লাগল তাঁর ডান কানের ঠিক ওপরে। সাংঘাতিক আঘাত। জীবন-মরণের প্রশ্ন। দু-দুবার অপারেশন করতে হল। ফ্রাঙ্ক ওরেল থেকে আরম্ভ করে সব খেলোয়াড়রা এগিয়ে এলেন নিজেদের রক্ত দিয়ে কনট্রাক্টরের জীবন বাঁচাতে। ভারত থেকে ছুটে গেলেন কনট্রাক্টরের স্ত্রী ডলি কনট্রাক্টর। সমস্ত বিশ্বে উঠল প্রতিবাদের ঝড়। গ্রিফিথ খুনে বোলার হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেলেন। সকলে এক বাক্যে বলতে লাগলেন গ্রিফিথ নাকি বল ছোড়েন। আম্পায়াররা তার ওপর খড়্গ-হস্ত। গ্রিফিথ বল করলেই 'নো' ডাকতে সুরু করলেন। পরের তিনটি টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল থেকে বাদ পড়লেন বিতর্কিত ফাস্ট বোলার চার্লি গ্রিফিথ।

একুশ বছরের পাতৌদি নিলেন ভারতীয় দল পরি-চালনার ভার। আগের দুটি টেস্টে খেললেন। অভিজ্ঞতা বলতে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট আর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্ব করার। ফলে পরের তিনটি টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সহজেই জিতে গেল। কানহাই ভাল খেল-লেন। রানের পর রান, সেঞ্চুরীর পর সেঞ্চুরী হাঁকালেন।

পরের বছর ইংলন্ড সফরে গিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে রাবার জিতে এল। প্রথম টেস্টে

৯০ রান করার পর কানহাই রান আউট হয়ে গেল। প্রত্যেকটা টেস্টেই জিতল। তিন তিনটে টেস্টে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইংলন্ড একটিতে।

ইংলন্ডেই কানহাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মিস ব্রেনদা হগের। অল্প দিনের মধ্যেই দুজনে ঘনিষ্ট হয়ে উঠল। কেউ জানতেও পারেনি ব্যাপারটা। ওদিকে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ। চুপি চুপি বিয়েটাও হয়ে গেল। সেন্ট প্যানসার্স রেজিস্ট্রী অফিসে বিয়ে হল রোহান কানহাইয়ের সঙ্গে ব্রেনদা হগের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র কেরু ছাড়া এই গোপন ব্যাপারটা আর কেউই জানতেন না। কিন্তু ক'দিন পরে বিদায় ভোজ সভায় কানহাই যখন নতুন বউ নিয়ে হাজির হলেন তখন সকলের মধ্যে হৈ-হৈ পড়ে গেল।

সোবার্সের নেতৃত্বে একটা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে স্বীকৃত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ধীরে ধীরে হারাচ্ছিল তার মান-সম্মান। পরাজয়ের পর পরাজয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলোয়াড়রা যেন হতাশায় ভুগছিলেন। পরিবর্তন চাই। একটা কিছু করতেই হবে। খেলোয়াড়দের হারান মনোবল আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। নির্বাচকরা তাই সোবার্সের বদলে কানহাইকে মনোনিত করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের নতুন অধিনায়ক হিসেবে। কানহাইয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আবার হারান সম্মান ধীরে ধীরে ফিরে পাচ্ছিল। তারপর একদিন লয়েডকে নিজের স্থানটি দিয়ে সরে দাঁড়ালেন রোহান কানহাই।

কিন্তু খেলা ছাড়লেন না। এক মাথা পাকা চুল। দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় বয়েস খুব একটা বেশী হয় নি। চল্লিশের কোঠায় চলেছে। কিন্তু ব্যাট হাতে উইকেটের সামনে দাঁড়ালে এখনও তাঁর মূর্তি ভয়ঙ্কর। এখনও তাঁর হাতের ব্যাট ঘোরে এরোপ্লেনের প্রপেলারের মত বন বন করে। তার মারের দাপটে থরথর করে কাঁপে মাঠ। আবার দরকার পড়লে উইকেট আগলে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পারেন। পারেন নিজের দলকে জয়ের পথে টেনে নিয়ে যেতে। তার পরিচয় এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালে পেয়েছে ইংলন্ড, লর্ডস মাঠের সেই খেলার শর্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক লয়েড বলেছেন, "কানহাই না থাকলে আমরা জিততে পারতাম না। কানহাই-ই তাঁর গভীর আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে পরম ধৈর্যের সঙ্গে খেলে আমাদের জয়ের পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন..."

পোর্ট মাউরেন্ট শহরের এঁদো গলির সেই ছোট্ট ছেলেটি —যে দাদা, দিদির কাছে শুধু মার খেত আর নারকেল গাছের পাতা ছিড়ে কেটে-কুটে ব্যাট বানিয়ে কর্কের বলে খেলত—সেই রোহান কানহাই আজ বিশ্ব ক্রিকেটের একটি স্মরনীয় নাম। সম্মানিত পুরুষ। বিশ্বের সমস্ত বাচ্চা, কিশোর ও তরুণদের আদর্শ......।

একটু হাসো !

শাশ্বত সেন

ব্যবসায়ীদের সম্মেলন বসেছে। সকলেই নিজ নিজ কৃতিত্বের কথা বলছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন,—আমি একেবারে নীচের তলা থেকে একেবারে ওপরে এসে খেকেছি।

সত্যি ?—সবার প্রশ্ন।

—হ্যাঁ। আমার ব্যবসায় জীবন শুরু হয় জুতোর দোকানে আর এখন আমি ছাতার দোকানের মালিক।

ডালডর্ফের বিখ্যাত পাগলা-গারদের দরজার ঘন্টি সহসা মাঝরাতে ভীষণ জোরে বেজে উঠল। ওয়ার্ডার দৌড়ে এসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাঁক পাড়ল, "কে ওখানে ?"

"শিগগির দরজা খুলুন"—নীচ থেকে বিপন্ন কণ্ঠের উত্তর এলো, "আমি হঠাৎ পাগল হয়ে গেছি।"

—"কি ! মাঝরাত্রিরে ! আচ্ছাই পাগল তো হে তুমি।"

এক মাসের ওপর বিশ্রামে আছেন শশধর। ডাক্তার বিছানা থেকে উঠতে বারণ করেছেন। সে বারণে দেহের বিশ্রাম ঠিকই হচ্ছে। কিন্তু মনের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে প্রচন্ড ঘূর্ণি-ঝড়। সে ঝড়ে যখন তখন ভরা-ডুবি হতে পারে। তা হোক, তাতে কোন খেদ নেই। মৃত্যু জীবনের অনিবার্য পরিণতি। আবার সে পরিণতি কোন অংক কষে ঘটে না। হ্যাঁ, জীবনের অংক মেলাতে গিয়েই শশধর সারা দুপুর দু-চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। অথচ পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ অনুকূল। দোতলার ছাদের ওপর একক এক-খানি ছোট ঘর। আলো বাতাসের অভাব নেই। পুরানো বাড়ি হলেও বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। নীচের আর তিন খানি বড় বড় ঘর নিয়ে শশধরের সংসার। জল-কল সম্পূর্ণ পৃথক। অন্য কোন ভাড়াটের সঙ্গে তা নিয়েও কোন অ-শান্তি নেই। ছেলে-মেয়েরাও সকলে বড় হয়েছে। তারাও কেউ অকারণ ছাদে উঠে পিতার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটায় না। মমতাময়ী চিরদিনই পতিপ্রাণা। শুধু রুগ্ন অবস্থায় কেন স্বাভাবিক জীবনেও স্বামীর সেবা-যত্নে সতত সচেষ্ট।

ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন, তবু দু-চোখে ঘুম নেই শশধরের। না দিনে, না রাত্রে। অথচ অসুখে পড়বার আগে এক ঘুমে রাত ভোর হয়ে যেতো। একটানা শুয়ে-বসে থেকেই হয়তো দেহের এ অবস্থা। নয়তো যে ভাবনা আজ মনকে চঞ্চল করছে সে ভাবনা চিরদিনের। এই এক মাসে নতুন আর এমন কিছু ঘটেনি।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। শশধর একটা বালিশে ঠেস দিয়ে বিছানার ওপর বসে ভাবছিলেন। দৃষ্টি তার খোলা জানালা ডিঙিয়ে উন্মুক্ত আকাশের দিকে। জলভরা মেঘের মতোই উড়ে চলেছেন তিনি। এ চলার যেন শেষ নেই।

রোগীর বৈকালিক পথ্যের সময় সমাগত। মমতাময়ী নীচ থেকে উপরে আসেন। রাত্রে রোগীকে একা না রাখলে দিনে তাকে সংসারের মধ্যেই ডুবে থাকতে হয়।

—এ কি, উঠে বসেছ কেন? ডাক্তার দাস যে তোমাকে শুয়ে থাকতে বলেছেন!

মমতাময়ীর আকস্মিক আবির্ভাবে ভাবনায় ছেদ পড়ে শশধরের। জানালা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে উদাসভাবেই উত্তর দেন, কাল থেকে আমি কাজে বেরুবো বড়বৌ।

স্মিত-মুখে মমতাময়ী সান্ত্বনা দেন—বেশ তো, ডাক্তার দাস তো কাল সকালেই তোমাকে দেখতে আসছেন। যদি অনুমতি দেন, বেরুবে।

—না, না, তুমি ওঁকে খবর পাঠাও, আমার আর চিকিৎ-সার দরকার নেই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। কাল থেকেই কাজে বেরুবো।

আচ্ছা, সে হবে ক্ষণ। এখন চোখ-মুখে একটু জল দিয়ে নাও তো। আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি।—বলতে বলতে একহাতে একটা পিকদানি মুখের কাছে এগিয়ে ধরে আর একহাতে ঘটি থেকে জল ঢালতে উদ্যত হন মমতাময়ী।

শশধর বাধা দেন,—আমি নালার মুখে গিয়েই মুখ ধুতে পারবো।

—তুমি দেখছি আবার একটা কান্ড বাধাবে।! বলছি নে ডাক্তার তোমাকে উঠতে বারণ করেছেন।

—ওঁরা ও রকম বলেই থাকেন। কেন, কি হয়েছে আমার? একদিন কাজ করতে করতে পড়ে গিয়েছিলাম বলে চিরকাল শুয়ে থাকতে হবে?

—চিরকাল কেন থাকবে? যে কটা দিন সুস্থ না হচ্ছ, শুধু সে কটা দিন। দোহাই তোমার, এখানেই মুখটা ধুয়ে নাও।

শশধর আর কথা বাড়ান না। ইচ্ছে না থাকলেও পিকদানির মধ্যেই চোখে-মুখে জল দিয়ে নেন। তারপর মমতাময়ী বেরিয়ে গেলে মনে মনেই গজরাতে থাকেন—ডাক্তার না ছাই! ওঁদের কারবার শুধু স্থূল দেহকে কেন্দ্র করে। মানুষের মনের খবর ওঁরা কিছুই জানেন না।

সেই মুহূর্তেই মমতাময়ী খাবার নিয়ে ফিরে আসেন। বড় একটা ডিসের মধ্যে থরে থরে সাজানো রয়েছে আপেল, খেজুর, বড় দুটো সন্দেশ, সেইসঙ্গে এক গ্লাস গরম দুধ।

শশধর এবার ডাক্তারকে ছেড়ে মমতাময়ীর ওপর ফেটে পড়েন—আবার এইসব ছাই-ভস্ম এনেছ!

দুর্বল হয়ে পড়েছ। এটুকু না খেলে কাজ করবার শক্তি পাবে কোত্থেকে?—ডিশটা এগিয়ে ধরেন মমতাময়ী।

শশধর আবার ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন—বলছি নে নিয়ে যাও ঐ সব বাজে জিনিস। আমি গাঁয়ের মানুষ। আমার বেশ মনে আছে, বাবার শিয়রে বসে যাঁকে তুমি ধন্বন্তরী বলতে পারো সেই গুরুচরণ কবরেজ বলেছিলেন, 'অসুখী মানুষের পক্ষে দুধ-সাগুর চেয়ে পুষ্টিকর খাদ্য দ্বিতীয় নেই।

মমতাময়ী শশধরকে এর আগে এতটা ক্ষিপ্ত হতে খুব, কমই দেখেছেন। তাই অনর্থের আশংকায় ডিশ হাতে বোবার মতোই দাঁড়িয়ে থাকেন।

কিন্তু শশধর দমেন না। গলা পঞ্চমে চড়িয়েই চেঁচাতে থাকেন—তোমরা কি আমাকে পাগল ভেবেছ? বলি কোত্থেকে আসছে এ সব রাজাই খাবার? নিজেদের দু-মুঠো নুন-ভাত জুটেছে?

—বিশ্বাস করো, আমরা আজ মাছ ভাত খেয়েছি। মস্ত বড় একটা ইলিশ মাছ এনেছিল শ্যামল। তোমার মাগুর মাছও সে-ই এনেছে।

—বটে! শ্যামল তাহলে হাতে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছে বলতে হবে!

—দোহাই তোমার ওসব ভেবে মাথা গরম করো না। ওরা আজকালকার ছেলে। ওদের রুজি-রোজগারের পথ আলাদা। তাছাড়া শাস্ত্রেই তো আছে—

—কি আছে শুনি?

—ছেলে বড় হলে বৃদ্ধ মা-বাবাকে যেভাবে হোক ভরণ-পোষণ করবে।.........

—কি বললে?

—আমি কিছু বলছি নে, শুধু পবিত্র রামায়ণের কাহিনী তোমাকে স্মরণ করতে বলছি। মহর্ষি বাল্মীকি তখনো মহর্ষি হননি—দস্যু রত্নাকর পথিকের সর্বস্ব লুন্ঠন করাই ছিল তাঁর পেশা। কিন্তু তাঁর অর্জিত অর্থেই সংসার চলতো। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

—আমাকেও ঘামাতে নিষেধ করছো, এই তো?

—হ্যাঁ, তাই করছি। সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করেছ। এখন সংসারের ভার ছেলেদের হাতে দিয়ে একটু বিশ্রাম করো।

শশধর এ কথার সহসা যেন জবাব খুঁজে পান না। হয়তো বা সম্বিত হারিয়ে ফেলেন। চোখে-মুখে ফুটে ওঠে এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

মমতাময়ী সেদিকে লক্ষ্য করে আঁতকে ওঠেন। তাড়াতাড়ি একটা হাত-পাখা টেনে নিয়ে শশধরের মাথায় জোরে জোরে বাতাস করতে থাকেন। ভীত কন্ঠেই সান্ত্বনা দেন, দেখলে তো—কি রকম দুর্বল হয়ে পড়েছ! এই জন্যেই তো বলছি, এতকাল অনেক ভেবেছ, অযথা আর ভেবে শরীর নষ্ট করো না।

শশধর থিতিয়ে থিতিয়েই জবাব দেন,—ভাবনা কি তোমার ক্রীতদাস যে চাবুক কষে তাকে নিরস্ত করবে! যদ্দিন জীবন, তদ্দিনই ভাবনা। তুমি তো জান, তোমার ছেলেদের অনেক আগে স্বয়ং শেঠজী আমার ভাবনা লাঘব হবার মতো বহুবার সুযোগ দিয়েছেন। আমার সহকর্মী পদমর্যাদায় আমার চেয়ে অনেক ছোট হয়েও আখের গুছিয়ে নিয়েছে। মায় সুরম্য একটি অট্টালিকারও সে অধীশ্বর। কিন্তু আমার কিছুই নেই। কেন নেই, তা তোমার অজানা নয়।

—দোহাই তোমার, চুপ করো। অসুস্থ শরীরে এক কথা বলতে নেই।

—চুপ আমি একেবারেই করতে চাই বড়বৌ। কিন্তু—

উঃ মাগো।—কান্নায় ভেঙে পড়েন মমতাময়ী। ভেজা গলায় বলতে থাকেন, আমার ঘাট হয়েছে। আমি কক্ষনো আর তোমাকে কিছু বলবো না। দয়া করে তুমি চুপ কর।

শশধর এবার সত্যি চুপ করেন। মমতাময়ীর জন্য হয়তো বা কিছুটা অনুকম্পাই জাগে। সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চলেছে বেচারা। সখ—আহ্লাদ কিছুই মেটেনি।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন মমতাময়ী। শশধর শান্তভাবেই আবার শুরু করেন—এভাবে শুয়ে থাকলে সত্যি হয়তো আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে বড়বৌ। যাও, আমার খাবার নিয়ে এস বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

মমতাময়ী আঁচলে চোখ মুছে আবার খাবারের ডিশটা এগিয়ে ধরেন।

শশধর বাধা দেন—না, না, ওসব আমার গলা দিয়ে নামবে না। এগুলো ছেলে-মেয়েদের দাও গে। দুধ-সাগু নিয়ে এস। ওতেই আমি সুস্থ থাকবো।

অগত্যা তাই যান মমতাময়ী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসেন দুধ-সাগুর বাটি নিয়ে।

শশধর খানিকটা চুমুক দিয়ে আবার শুরু করেন,—রামায়ণ তুমি ঠিকই পড়েছ বড়বৌ। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুধাবন করতে পারোনি। ব্রহ্মা রত্নাকরের বোধোদয় ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু সে যুগটা ছিল আলাদা। এ যুগে ব্রহ্মার কাজ তোমাকে আমাকেই করতে হবে। রামায়ণকার পরোক্ষে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। পার তো শ্যামলকে সংযত করো। আমার ভাবনা তো ওদের নিয়েই।

মমতাময়ী হয়তো লজ্জাই পান। কোন জবাব দিতে

পারেন না। এ'টো বাটি আর গ্লাস নিয়ে নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হন।

শশধর পিছু ডাকেন—শোন, তোমার খুব তাড়া রয়েছে তা জানি। তবু কথাটা যখন উঠেছে তখন খোলাখুলি বলাই ভাল। তুমি তো জান আদর্শ শিক্ষকের পুত্র আমি। কোন-ক্রমেই তাঁর মুখে চুন-কালি দিতে পারবো না। আমি চাই আমার ছেলে-মেয়েও কেউ যেন সাময়িক সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য পথ ভ্রষ্ট না হয়। বড়বৌ, ভাল খেয়ে ভাল পরেও মানুষ মরবে। তবে আর ভাল খাওয়া পরার জন্য বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করবো কেন? ন্যায় পথে যা পাওয়া যায় তাতেই তৃপ্তি—তাতেই সুখ। অন্য কোথাও সুখ নেই।

শশধরের উক্তি শুনতে শুনতে মমতাময়ীর হে'ট মাথা আরো হে'ট হয়ে যায়।

সেদিকে লক্ষ্য করে আবার শুরু করেন শশধর—না, না, লজ্জা পাবার মতো কোন অপরাধ তুমি করোনি। বরাবর আমার পাশে থেকে আমাকে শক্তি যুগিয়েছ। তুমি কেন লজ্জা পাবে? অন্ধ মাতৃ স্নেহে তোমাকে যদি মোহগ্রস্থ দেখি আমার উচিৎ তোমাকে সাবধান করা। বড়বৌ মহাভারতের কাহিনী নিশ্চয় তোমার মনে আছে। স্বয়ং কৃপাচার্য যিনি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন—দারিদ্র্য বশতঃ দুধের বদলে পিটুলি খাইয়ে স্বীয় পুত্রের প্রাণ রক্ষা করে-ছেন—তবু আদর্শভ্রষ্ট হননি। এবং তা হননি বলেই কৃপা-চার্য—আচার্য—অমর। অন্য ধারে রাজপুত্র সোনার ঝিনুক বাটিতে দুধ খেয়েও আজ প্রকৃত মৃত। যাও তোমাকে অনেকটা দেরী করিয়ে দিলাম।

মমতাময়ী মাথা হে'ট করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

শশধর আস্তে আস্তে উঠে বারান্দার ইজিচেয়ারের এসে বসেন। সূর্য তখন অস্তমিত। আকাশে রাত্রির সংকেত। সংকেত অন্ধকারের।

অন্ধকারে হয়তো বা তলিয়েই যাবেন শশধর। দুর্মূল্যের বাজার। হিসেব মতো যা পান তা দিয়ে দিন চলাই ভার। এর ওপর চলেছে দীর্ঘ রোগ ভোগের খরচা। ছেলে-মেয়ে-দেরই বা দোষ কি। চারদিকের হাওয়া গায়ে লাগবে বৈকি। ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ বলতে হবে। শেঠজী কালো টাকার কারবারি হয়েও তার সঙ্গে সাদা কারবারই করে চলেছেন। দীর্ঘ অনুপস্থিতিতেও বেতনের টাকা নিয়মিত পাঠিয়ে দিচ্ছেন। মাঝে মধ্যে নিজে এসেও খোঁজ খবর নিচ্ছেন এবং ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু কতদিন চলবে এভাবে? বাজার তো লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মতোই লাফিয়ে চলেছে... ভাবতে ভাবতে অন্ধকার আকাশের মাঝে ডুবে যান শশধর। দূরের নক্ষত্র যেন আরো দূরে সরে যাচ্ছে।......

মমতাময়ী কিছুক্ষণ পর আবার ফিরে এসে সান্ধ্য-দীপ জ্বালেন। ধূপ-দীপ দেখান দেওয়ালের দেব-দেবীর পটে। তারপর প্রণাম সেরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হন।

শশধর এবারও পিছু ডাকেন—শোন।

ঘুরে দাঁড়ান মমতাময়ী।

শান্ত গলায় শুধোন শশধর—শ্যামল বাড়ি আছে?

—না, এক্ষুনি ফিরবে হয়তো।

—বেশ, ফিরলে ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানান মমতাময়ী। তারপর ধীর পায়ে বেরিয়ে যান। যেতে যেতে ভাবেন, বলে তো এলাম এক্ষুনি ফিরবে—যদি না ফেরে? রোগা মানুষটা হয়তো সারারাত ঘুমুবেই না। ঠাকুর তুমি আমার মুখ রক্ষা করো।.........

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। অন্যদিন দশটা এগারোটার মধ্যে ফিরলেও আজ ছেলের পাত্তা নেই। বাজা-রের টাওয়ার ঘড়িতে একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। কোন দুর্ঘটনায় পড়লো না তো শ্যামল! মায়ের প্রাণ আশংকায় দুরদুর করে। পাড়া-পড়শী কারো কোন সাড়া শব্দ নেই। সমগ্র অঞ্চল ঘুমে নিমগ্ন। মাঝে মাঝে শুধু একটা লরির শব্দ ভেসে আসছে। হয়তো দূরের পণ্য নিয়ে তীব্রবেগে ছুটছে ফাঁকা রাস্তা পেয়ে। আবার পুলিশের গাড়িও হতে পারে।.........

ঘর বার করে করে হাঁপিয়ে ওঠেন মমতাময়ী। সারাদিন খাটুনী গেছে। আলস্যে দু-চোখ জড়িয়ে আসে। কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারছেন না। শ্যামলের চিন্তায় কান মাথা ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠছে। কি করবেন ভেবে পান না। ওপরে গিয়ে ওর বাবাকে খবর দিলে হিতে বিপরীতই হবে। হয়তো উত্তেজনায় হার্টফেল করবে।

আর কিছুটা দেরী হলে হয়তো নিজেই হার্টফেল করে মারা যেতেন মমতাময়ী। সদরে মৃদু কড়া নাড়া পড়ে। ছুটে গিয়ে দোর খুলে দেন। দিয়ে আঁতকে ওঠেন। এ কি! কি হলো ছেলের! ডান হাতটা যে সম্পূর্ণ ব্যান্ডেজ বাঁধা। জামা-কাপড়েও রয়েছে তাজা রক্তের চিহ্ন। ছেলের দুর্দশা দেখে ডাক ছেড়ে কাঁদতে যান মমতাময়ী।

শ্যামল টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে হাতের ইশারায় নিরস্ত করে। এবং টলতে টলতেই নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

মমতাময়ী ওর টাল সামলান। ওর মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর চেপে ধরে পা টিপে টিপে ঘরে পেণছে বিছা-নায় শুইয়ে দেন।

কোন প্রশ্ন করার আগে শ্যামল নিজেই কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলতে থাকে—মোটরের ধাক্কা খেয়েছি। আর একটু হলে চাকার নিচে পড়তাম!

—কি সর্বনাশ! ওদের ডাকি, হাসপাতালে নিয়ে যাক।

—না, না, দোহাই তোমার। কারো ঘুম ভাঙিও না। হাস-পাতাল থেকেই ফিরছি। ভয়ের কিছু নেই। তবে বড্ডো যন্ত্রণা হচ্ছে। একটু জল আন। ওষুধটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

—কিছু খাবিনে?

—না, না, আজ রাত্রে ডাক্তার কিছু খেতে বারণ করেছেন। তোমার খাওয়া হয়েছে?

—আমারও খিদে নেই। এত রাত্রে আর কিছু খাবো না। তুই শুয়ে পড়। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

মার প্রস্তাবে শ্যামল খুশী হয়। ওষুধটা খেয়ে তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে—এক সময় ঘুমিয়েও পড়ে।

মমতাময়ী আস্তে আস্তে ওর মাথাটা বালিশের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ান। কিছুটা ইতস্তত করেন। তারপর ভেবে স্থির করেন, ওষুধ খেয়ে যখন ঘুমিয়েছে তখন কিছুতেই আর রাত্রে জাগবে না। কিন্তু ওর বাবা ঘুমিয়েছেন তো? রোগা মানুষটাকে কিছুতেই একা রাখা ঠিক নয়। সারা দিনটাই আজ নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছেন। না

খেয়েছেন নিয়মিত ওষুধ না পথ্য।........

ঘড়িতে তিনটে বাজে ঘুম জড়ানো চোখে ওপরে উঠে আসেন মমতাময়ী। মেঝেয় বিছানা পাততে হবে। সুইচ টিপে ডিম লাইটা জ্বালেন। জেগে ঘাবড়ে যান। শশধর বড় বড় চোখ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন সারা মুখখানায় উৎকন্ঠার অভিব্যক্তি।........ কোন কথা বলতে সাহস পান না মমতাময়ী।

—কিন্তু শশধর ছাড়েন না। শ্লেষের সঙ্গে শুধোন--তোমার আদুরে গোপাল ফিরলো?

—ফিরেছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ মনে করে ওকে আর ওপরে আসতে বলিনি।

—ও আর কোনদিন ওপরে উঠতে পারবে না। নীচেই নেমে গেছে—আরো যাবে।

—কি যাতা বলছো! বেচারা মোটর দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ফিরেছে। হাসপাতালে যেতে হয়েছিল বলেই এতটা দেরী হয়েছে।

—বল কি! আমাকে একবার খবর দিলে না!

—না, ভয়ের কোন কারণ নেই। ডান হাতে আঘাত পেয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরেই ছেড়ে দিয়েছে।

শশধর তবু যেন স্থির হতে পারেন না। নিজের আচরণের জন্য কিছুটা লজ্জাই পান। ধরা গলায় বলেন—তুমি আজ ওর কাছে থাকলেই তো পারতে।

মমতাময়ীর ততক্ষণে বিছানা পাতা হয়ে গেছে। শশধরের অবস্থা বুঝে সান্ত্বনা দেন, মিছে ভেবে শরীর খারাপ করো না। ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেই এসেছি। তোমার কিছু চাই কি?

—না না, আমার কিছুই চাই না। তুমি আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়।

মমতাময়ী তাই করেন।

কিন্তু শশধরের চোখে তবু ঘুম নেই। সারা রাত ছটফট করে করে হয়তো ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাই প্রত্যহ প্রত্যুষে ঘুম ভাঙলেও আজ জাগেন অনেকটা দেরীতে। জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানার ওপর পড়েছে। নির্দিষ্ট স্থানে হাত মুখ ধোবার জল গামছা রয়েছে। ক্লান্ত মনে করে কেউ হয়তো ডাকেনি তাকে। প্রত্যহ ঘড়ি ধরে ওষুধ পথ্য দিয়ে থাকে বড়বৌ, আজও নিশ্চয় তার ব্যতিক্রম হয়নি। হয়নি তার প্রমাণ রোজের মতোই মাথার কাছেই রয়েছে খবরের কাগজটা।........

ধারে কাছে কাউকে না দেখে বিছানার ওপরে বসেই কাগজের ওপর চোখ বুলাতে থাকেন শশধর। কিন্তু প্রথম দৃষ্টিতেই ধাক্কা খান। বড় বড় অক্ষরে শিরোনামায় খবর রয়েছে, 'ওয়াগান ব্রেকারদের সঙ্গে পুলিশের গুলী বিনিময়। তিনজন ঘটনাস্থলেই নিহত। অন্যদের আহত অবস্থায় পলায়ন।'.........

বসে ছিলেন শশধর উঠে দাঁড়ান। দু'পা থরথর করে কাঁপতে থাকে। তবু সিঁড়ির হাতল ধরে নীচে নেমে আসেন। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। কোথাও কারো সাড়া শব্দ নেই। কি হলো শ্যামলের! তবে কি ওকে নিয়ে সকলে হাসপাতালে গিয়েছে? পা চলে না। তবু কোন রকমে টলে টলে শ্যামলের ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। দোর জানালা প্রায় সবই বন্ধ। ঈষৎ খোলা রয়েছে শুধু দক্ষিণের জানালাটা—যেটা ভেতর মুখো। সেই জানালায় চোখ রেখেই ঘরের দিকে তাকান শশধর। তাকিয়ে মাথা টলে পড়ে যান। আর সেই পড়ার শব্দে দ্রুত দোর খুলে বেরিয়ে আসেন মমতাময়ী। সঙ্গে বড় ছেলে সুবল। যে ডাক্তার গোপনে অস্ত্রোপচার করে শ্যামলের হাত থেকে অবশিষ্ট গুলীটা বার করছিলেন তিনিও আসেন। আর আসেন পাড়ার মস্তান বঙ্কু ঘোষ। শ্যামলকে ছেড়ে শশধরের চিকিৎসায়ই মন দেন ডাক্তার। কিন্তু শশধর তখন সব চিকিৎসার বাইরে। মমতাময়ী মৃত স্বামীর পায়ের ওপর পড়ে কাঁদতে থাকেন—বোবা কান্না।

একটু হাসো !

শাশ্বত সেন

আধুনিক মুদীর দোকান। বড় বড় হরফে নোটিশ লেখা : দয়া করে লাইনে দাঁড়ান।

লম্বা লাইন শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

একটি ছোট ছেলে ছুটে এসে একেবারে সকলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "মুদীমশাই"

তাকে থামিয়ে মুদী বলেন, "এখানে নয়, লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াও।"

"কিন্তু"—আবার বলবার চেষ্টা করে ছেলেটি।

—"না না, কোন অজুহাত নয়, একেবারে লাইনের শেষে।"

অগত্যা ছেলেটি লাইনের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে লাইন এগোতে লাগল।

অবশেষে ঘন্টাখানেক পর সে এসে পৌঁছল মুদীর সামনে।

"এই তো লক্ষ্মীছেলে। এবার বল তোমার কী চাই?"—মুদী শুধান।

—"আজ্ঞে বলতে এসেছিলাম যে, আপনার গুদোমঘরে আগুন লেগেছে।"

দাদুর চাদর

দুর্গাদাস সরকার

বাবলু অন্ধকার রাতে ছাদে এসে একা দাঁড়ায়। ভীষণ ভালো লাগে তার আকাশের চাঁদ, অসংখ্য তারা, একেকটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিরাট মহাকাশমণ্ডলী। ওরা কেমন পাশাপাশি বাস করে। ঠোকাঠুকি যে একেবারেই হয় না, তা নয়—তবে যখন-তখন ঠোকাঠুকি লেগে নেই। আর ঠোকাঠুকি একবার শুরু হলে আর নেই নিস্তার।

অন্ধকার ছাদের এক কোণে দাঁড়িয়ে বাবলু ভাবে, এই পৃথিবীতেই যতো বাদ-বিবাদের পালা। প্রকৃতি একবার ক্ষেপে উঠলেই আর রক্ষে নেই। কিন্তু তার সবই তো খারাপ নয়।

বাবলু ভাবছিল: তাদের এই ছোট্ট সংসারে এমন কাণ্ড হয় কেন? সংসারে তো মাত্র চারটি প্রাণী—দাদু, বাবা, মা আর সে নিজে। দাদু বাড়িতে থেকেও যেন এ বাড়ির দয়ায় আশ্রিত। বড় অসহায় তিনি। বাবা চাকরি করেন। অনেক টাকা মাইনে পান। তবু মা-বাবা কেন যে দাদুকে অমন চোখে দেখেন।

দাদুর কাছে শোনা কথাই মনে পড়ছিল বাবলুর। দাদু ছিলেন এম. ঈ. স্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিত। দাদুর মতো ইংরেজি, অঙ্ক তখনকার দিনে আশে-পাশের পাঁচটা গাঁয়ের লোকও জানত না। দিদা মারা গেলেও দাদু কী কষ্টেই না বাবাকে মানুষ করেছেন। সাহেবী স্কুলে না পড়িয়েও দাদু বাবাকে এমন ইংরেজি শিখিয়েছিলেন, যার জোরে বাবা পেয়েছেন বড় চাকরি, শহরে তুলেছেন এমন পাকা বাড়ি।

বাবা থাকতে দাদুর অভাব কি? তবু···

ভীষণ মন খারাপ হয় বাবলুর। আস্তে আস্তে সে নেমে আসে দাদুর ছোট্ট ঘরটিতে।

'ওঠো না দাদু তোমার বিছানার চাদরটা একটু ঝেড়ে দিই।' বাবলু বলে, 'ইঃ কী ময়লাই না হয়েছে। আমি এটা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করব। দাদু ম্লান হাসেন—না ভাই, তুমি আমার বিছানার চাদর কাচবে কেন? মা-বাবা রাগ করবেন। ও আমি নিজেই একদিন কেচে নেব।

বাবলু বলে,—হ্যাঁ তারপর সর্দি লেগে জ্বর হোক আর কি?

দাদু বলেন,—তা হলে তো বেঁচে যাই ভাই। আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না।

বাবলু বলে—বুঝেছি, বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

বলতে বলতে বাবলুর কথাগুলো ভারী হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। দাদুকে ত্রিসংসারের মধ্যে বাবলুই যে ভালোবাসে। দাদু না থাকলে তার সময় কাটবে কিভাবে! অথচ দাদুর কাছে একটু এসে বসলেই মা হাঁক পাড়েন—বাবলু পড়া ফেলে কোথায় পালালে। আবার দাদুর কাছে রাজ্যের কথার গজর গজর শুরু হয়েছে।

দাদুর সঙ্গে কথা বলার কে-ই বা আছে। পার্কে গিয়ে বুড়োদের আড্ডায় গিয়ে দাদু বসতেন। অন্যরা বলতেন কি হে, তোমার ছেলে অতবড় চাকরি করে, তার গর্বে মাটিতে তোমার পা পড়ে না, আর তুমি কিনা ছেঁড়া ধুতি, ময়লা জামা আর পটিমারা চটি পড়ে স্কুল মাস্টার-ই থেকে গেলে। এ সব কথার কোনো উত্তর দেন না দাদু।

একদিন বাবলুর বাবা আপিসে যাচ্ছিলেন এমন সময় বুড়োদের আড্ডার এক বৃদ্ধের মুখোমুখি হন বাবলুর বাবা। তিনি কথায় কথায় বলেন,—কি হে, তোমার পিতৃদেবের ধুতি জামাটা আর পাল্টানো যায় না?

আর যায় কোথা। সেদিন বাবলুর বাবার আর আপিসে যাওয়াই হোল না। তিনি এসে বাবলুর মাকে বললেন,—পার্কে বসা এক বুড়ো আমাকে কী লজ্জাই না দিল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘৃতাহুতি হোল আগুনে। বাবলুর মা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি বললেন,—তোমার বাবা যতো বুড়ো হচ্ছে, ততো তার ভীমরতি হচ্ছে। পার্কে গিয়ে তোমার বাবা নিশ্চয় ঐ বুড়োদের কাছে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করেছে। এতোই যদি দরদ, দিক না ওরা জামা-কাপড় কিনে।

এই ঘটনার পর দাদু আর কোন দিন পার্কে যান নি। তিনি ভেবেছিলেন বৌমাকে বলবেন যে ঘুনাক্ষরেও জামা কাপড় নিয়ে একটি কথাও কাউকে বলেন নি। কিন্তু তাঁর কথার মূল্য কতটুকু। বাবলু ছাড়া আর কেউ তো তাঁকে বিশ্বাস করে না। অথচ এই বিশ্বাসকে মূলধন করেই তিনি আমৃত্যু দিন কাটিয়ে দেবেন।

একদিন বাবলু এসে তার দাদুর কাছে বসেছে। সে চুপি-চুপি দাদুকে বলে,—দাদু, তোমার ধুতিটায় আমি সাবান দিয়ে দেব আজ। মা-বাবা আজ যখন সিনেমায় যাবেন, তখন আমি কেচে দিলে ওঁরা জানতেই পারবে না। তুমি এতো বুড়ো হয়েছ—তুমি কি এখন কাচতে পারো? এ কি অন্যায়! তোমার খাবার জলের গ্লাস—তাও তোমাকে ভরে নিতে হয়।

দাদু জিজ্ঞেস করেন—মা-বাবা কখন সিনেমায় যাবে?

বাবলু উত্তর দেয়,—এই একটু পরে। তারপর আমি সাবান নিয়ে আচ্ছা করে তোমার জামা ধুতিতে সাবান দিয়ে কেচে রাখব।

দাদু বলেন,—ছিঃ আমার দাদু ভাইকে দিয়ে কি এসব নোংরা জামা ধুতি কাচিয়ে নিতে পারি? এ আমি নিজেই কেচে নেব। আমার তো অভ্যাস হয়ে গেছে ভাই।

তবু বাবলু দাদুর কথা শুনতে চায় না। দাদুর কোনো ওজর আপত্তি সে কানে নেবে না। তখন দাদুই বলেন, মা-বাবাকে লুকিয়ে তোমাকে দিয়ে কাচিয়ে নেওয়া ঠিক হবে না দাদুভাই। তাহলে আমি যে তোমার মা বাবার বিশ্বাস ভঙ্গ করছি।

বাবলু বলে,—তোমার সেই এক কথা! বিশ্বাস ভঙ্গ, বিশ্বাস ভঙ্গ। তোমার এই অবস্থায় তোমার নিজের বিশ্বাস কি কারো ওপর আছে?

দাদু বলেন,—তুমিও দেখছি আমার ওপর মাস্টারি শুরু করেছ।

বাবলু বলে,—করেছি তো বেশ করেছি। তুমি বিশ্বাস ভঙ্গের কথা বলো। আমি বলি ন্যায়ের কথা।

দাদু অবাক হন। ক্লাস সিক্সে পড়া এইটুকু ছেলের কী তীক্ষ্ণ ন্যায়বোধ। তবে এ তার বই পড়ে শেখা নয়, চোখে দেখে শেখা। কিন্তু এসব কথা ভাবতেও তিনি ভয় পান। বৌমা যদি একবার জানতে পারেন, আর

রক্ষে থাকবে না। ছেলে দীপু ও বৌমার রায়েই রায় দেবে বৈকি।

'বাবলু', 'বাবলু'—ডাক ছাড়েন মা।

বাবলু তারস্বরে বলে,—এই তো রয়েছি।

মা বলেন,—আবার আজে বাজে কথার গজর গজর শুরু হয়েছে। বিরক্তও তো ধরে না বাপু বুড়ো মানুষের সঙ্গে একই কথার প্যানপ্যানানিতে।

বাবলু মায়ের কাছে যায়। সে বলে,—কী বলবে বল।

মা বলেন,—আমরা বেরোচ্ছি। সাবধানে থেকো। যা পড়া আছে, তা তৈরি করে রেখো। এসে যেন না দেখি যে ঐ ঘরে বসে গজর গজর করছ।

মা বাবা বেরিয়ে যেতেই বাবলু যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। কী ভালোই না তার লাগছে! আজ দাদুর কাছে বসে মুখে মুখেই সে পড়া তৈরী করে নেবে। বাবলু সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে আবার দাদুর ঘরে গিয়ে বসল।

বাবলু দাদুকে বলল,—দাদু একটা গল্প বল না।

দাদু বললেন,—না ভাই গল্প নয়। মা তোমাকে বলে গেছেন পড়া তৈরি করে রাখতে।

বাবলু বলল,—আজ পড়া তো তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। তার আগে তুমি আমাকে একটা গল্প বলো।

দাদু বললেন,—কিসের গল্প বলব?

বাবলু বলল,—রাজা আর মন্ত্রীর গল্প।

দাদু বললেন,—বড় হচ্ছ এখনও রাজা আর মন্ত্রীর গল্প শোনা চাই। হ্যাঁ, রাজা-মন্ত্রীর গল্প বলছি, তবে এগল্প সেকেলে নয় একালের হিসেবী রাজবুদ্ধি।

দাদু গল্প বলা শুরু করলেন,—এক রাজা ছিলেন, তার ছিল এক মন্ত্রী। কিন্তু দু জন লোক রাজার ছিল বেশ প্রিয়। একদিন রাজার কাছে তারা মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অভিযোগ করল, তারাই বা কেন মন্ত্রী হবার উপযুক্ত নয়। রাজা তাদের কথা শুনে বললেন,—বেশ তো, মন্ত্রী হতে চাও সে তো খুব ভালো কথা। এখুনি আমি ব্যবস্থা করছি।

রাজা মশাই বসে বসে কী কথা যেন ভাবছিলেন। এমন সময় রাজার কাছে রাজবাড়ির একজন লোক খবর নিয়ে এলো, রাজা মশায়ের প্রিয় কুকুরীটির বাচ্চা হয়েছে। রাজা মশায় ভারি চিন্তিত ছিলেন। খবর শুনে খুশি হলেন। যে লোকটি খবর নিয়ে এসেছিল তাকে তিনি তার আঙুলের অঙ্গুরীয়টি দান করে বললেন,—তুমি এদের নিয়ে যাও বাচ্চাগুলির কাছে। বাচ্চাগুলির যাবতীয় খবর এরাই আমাকে দেবে।

বরদাতার সঙ্গে রাজার প্রিয় লোক দুটি বাচ্চাগুলি দেখতে গেল। কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে এলো।

রাজা মশায় তাদের জিজ্ঞেস করলেন,—কটি বাচ্চা?

তারা একসঙ্গে উত্তর দিল—দুটি বাচ্চা।

রাজা মশায় বললেন,—দুটিই মদ্দা, না মাদী।

তারা দুজনেই একথার উত্তর দিতে পারল না। তবুও বাচ্চা দুটির গায়ের রঙ জিজ্ঞেস করা হলে তারা তার উত্তর দিল। কিন্তু আর কোনো উত্তরই তারা দিতে পারল না। রাজা মশায় বললেন,—বেশ, বেশ, এতো খবর কজনই বা নেয়, কিই বা দরকার।

রাজা মশায়ের কথা শেষ হতেই কী একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে মন্ত্রী মশায় প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে মন্ত্রী-হতে-ইচ্ছুক লোক দুটি কিছুটা ঘাবড়ে গেল। আবার ঘাবড়ালেই তো চলে না। রাজা মশায় যখন 'না' বলেন নি, তখন আশা ছাড়াও যায় না।

কিন্তু, মন্ত্রী মশায় আসতেই রাজা মশায় আরো জরুরী কাজ চাপালেন মন্ত্রীমশায়ের ওপর। তিনি মন্ত্রী মশায়কে বললেন—আমার প্রিয় কুকুরীর বাচ্চা হয়েছে—খবর পেলাম আপনি গিয়ে দেখে আসুন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্ত্রী মশায় ফিরে এসে বললেন, কুশল সংবাদ। দুটি বাচ্চা। একটি মদ্দা, আরেকটি মাদী, মদ্দাটির গায়ের রঙ সাদা-কালো মেশানো আর মাদীর গায়ের রঙ আগাগোড়া খয়েরী।

এরপর তিনি বাচ্চা দুটির গায়ের ওজন থেকে শুরু করে যাবতীয় খবর দিলেন।

রাজা মশায় মন্ত্রী মশায়ের সমস্ত বিবরণ শোনার পর মন্ত্রী-হতে-ইচ্ছুক তাঁর প্রিয় লোক দুটিকে বললেন,—তোমরা আমার প্রিয়, আর মন্ত্রী মশায় কখনো-সখনো আমার

মনের মতো প্রিয় কাজ করতে অক্ষম হলেও তিনি কেন মন্ত্রী হয়েছেন—নিশ্চয়ই সে শিক্ষা তোমরা পেয়েছ? এই জন্যই বলি হে, সবাই রাজা হতে পারে, মন্ত্রী হতে সবাই পারে না।

গল্প শেষ করে দাদু বললেন,—দাদুভাই যাও এইবার তোমার বই নিয়ে এসো।

বাবলুর পড়া দাদুর মুখ থেকে শুনে কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে গেল। বাবলু বলল—একটু পরেই মা বাবা এসে পড়বেন। আচ্ছা দাদু আমি কাল তোমার বিছানার চাদরটায় সাবান দিয়ে দেব—ভীষণ ময়লা হয়েছে ওটা।

দাদু বলেন,—না ভাই এ চাদর আর কাচা চলবে না। একবার জলে ডুবালেই ছিঁড়ে যাবে। তখন আর রক্ষে থাকবে না।

বাবলু বলল,—দাদু, কি আশ্চর্য, তোমার ত্যাগেই আমাদের আজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য। আর তোমার কিনা এই দুরবস্থা, এ সহ্য হয় না।

মা-বাবার অনুপস্থিতিতে বাবলু আজ যেন হঠাৎ বিদ্রোহী হয় ওঠে। সে দাদুর এই দুরবস্থার প্রতিবিধান করতে চায়, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

দাদু বাবলুর সব কথা শুনে বললেন,—বেশ আছি ভাই, বেশ আছি; আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই। শেষকালে আমাকে ঘর থেকে টেনে বের করে দেবে—তাও তোমাকে দেখতে হবে।

বাবলু বলে,—আমি তোমাকে বলছি, সাবান দিতে গিয়ে চাদর যদি আপনা-আপনি না ছিঁড়ে তাহলে তুমি ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে আনবে। মা বাবা তোমাকে বকবেন ঠিকই, তারো বেশি তোমাকে বকব আমিই। কিন্তু তখন তুমি আমাকে ভুল বুঝ না।

দাদু বাবলুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন,—বেশ তাই হবে ভাই।

এমন সময় শোনা গেল মায়ের গলা। বাবলু দোর খোলো।

মা বাবা ঘরে এসে ঢুকতে না ঢুকতেই মা বাবলুকে বললেন,—পড়া তৈরী করেছ, না গজর-গজর হচ্ছিল। বাবলু হ্যাঁ বা না কী বলল, বোঝাই গেল না।

পরের দিন। দাদু চাদর কেচে এনে ছাদে মেলতে যাবেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাবলুর মায়ের চোখ পড়ল চাদরের ওপর। তিনি বললেন,—চাদরটা দেখি। মনে হচ্ছে ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে গেছে।

দাদু বললেন,—দু টুকরো নয় মা, একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

বলেই তিনি ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। বাবলুর বাবা কাছে এসে বললেন,—তোমার যখন ক্ষমতা নেই তখন পরিষ্কার চাদরের কি দরকার।

বাবলু পড়তে বসেছিল। সেও আর কথা না বলে থাকতে পারল না। তার মা বাবা জানেন যে, বাবলু তার দাদুকে ভালোবাসে। তবু বাবলুও আজ রেগে আগুন। বাবলু তার দাদুর চাদরটা নিয়ে বলল,—দাদু তুমি এটা ছিঁড়লে কেন? এর ক্ষতি পূরণ করবে কে? তুমি এক্ষুণি বের হয়ে যাও এই বাড়ি থেকে।

বাবলুর এই ধরনের কথা শুনে যেন আরো ভয়ে চমকে ওঠেন তিনি।

বাবলু বলে,—একেবারে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে এনেছ। এই চাদরটার কথা কতোবার আমি ভেবেছি।

মা বললেন,—আমিও ভেবেছি, পাছে ঐ বুড়ো হাতে এটা ছিঁড়ে খান খান হয়ে যায়। তাই 'হোল' যা ভেবেছি তাই।

বাবলু বলে—আমি কোন কথাই শুনছি না। দাদুকে বাড়ি থেকে বিদেয় দিয়ে এই চাদর সেলাই করে রেখে দেব।

মা রাগের মধ্যেও ছেলের মতিগতির পরিবর্তন দেখে খুশি হয়ে বলেন,—এটা বুঝি যাদুঘরে পাঠিয়ে দিবি?

বাবলু বলে,—না মা না। এটা আমি আমার সুটকেশে রেখে দেব। তারপর আমি বড় হলে আমার বাবাকে এই চাদরে শুতে দেব। বাবাকে ছেলে কিভাবে রাখে আমি আমার মা-বাবার কাছে শিখেছি। তোমরা ভাবছ, আমি কিছুই শিখি না। মা-বাবার চেয়ে কি বড় শিক্ষক আছে—একথা তো তোমরা হামেশাই আমাকে বলো।

বাবলুর এই সব কথা শুনে তার মা বলেন,—বাবলু, বড়দের কথায় তুমি মাথা গলাবে না। তুমি এখান থেকে যাও।

বাবলুর বাবা এতদিনে চৈতন্য ফিরে পেয়েছেন আজ বাবলুর কথায়। তিনি ভাবলেন সত্যিই তো, বাবার প্রতি কী দারুণ অবিচার তারা করে এসেছেন। তিনি বাবলুর মাকে বললেন,—বাবলু যা দেখছে, তাই শিখছে। বাবলুর কোনো অন্যায় নয়, অন্যায় আমাদেরি। বাবলু আজ আমাদের যা শিখিয়েছে তা কোনোদিন ভুলব না। এই কথা বলে সিঁড়ি থেকে তিনি ধীরে ধীরে ধরে তার বাবাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর ঘরে বসিয়ে বললেন, আজ থেকে এ-ঘরেই তুমি থেকো বাবা আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে বাবা। আমাকে ক্ষমা করো।

খবরটা আদ্ধেক পড়তে না পড়তেই তড়পাতে থাকে নণ্টে —'যত্তো সব! "পুলিস দিয়া নকল বন্ধ করিব।" মুণ্ডু করিব। ওসব পুলিস-টুলিসের কম্মো নয় চাঁদ। ঢের ঢের দেখেছি। পুলিসের ভয় দেখাচ্ছে।'

বলে খবরের কাগজটা দলা পাকিয়ে কল্পিত কোন পুলিসের মুখেই ছুঁড়ে দিল বুঝি।

একমনেই লিখছিলাম। ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠা হাসিটা অজান্তেই ধারাল হয়ে ওঠে। বলি, 'এবার তাহলে বই-পত্তর একটু খুলতেই হয়, কি বলো! বলা তো যায় না—যদি শেষ পর্যন্ত পুলিস-টুলিস দিয়েই গার্ড দেওয়ায়!'

'তুমিও যেমন! হ্যা! পুলিস না কচু! দু-একটা পেটো ছুঁড়লেই—ব্যস্‌ দেখতে হবে না—বিলকুল সাফ! কার কত মুরোদ, জানতে তো আর বাকী নেই শর্মার। কেন যে গাদা গাদা টাকার শ্রাদ্ধ করে এদের পোষে, তাই ভাবি।

'বটেই তো! এই যুগান্তকারী ভাবনাটা হোম মিনিস্টারকে একটু জানিয়ে দেবার ওয়াস্তা কেবল! তাহলেই কেল্লা ফতে!'

চোখ পাকিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে একটা রাম হুঙ্কার ছাড়ল নণ্টে—'ইয়ার্কি রাখ্‌ এখন। জেলের ভয় দেখাচ্ছে আমাকে! দাঁড়াও না, মন্ত্রীই হব একদিন। এমন কিছু কঠিন না মন্ত্রী হওয়া। আর যেদিন গদিতে বসব—'

'কলমের এক খোঁচায় পুলিস বাহিনী নট।'

'আলবাৎ! নট, নট, নট। দেখিয়ে দেব তোদের, পুলিস ছাড়া রাজ্য চালান যায় কিনা, শান্তিপূর্ণ ভাবে পরীক্ষা হয় কিনা।'

'অবাধে টুকলি চলে কিনা'—বলেই চেয়ারটা একটু দূরত্বে সরিয়ে নিই।

'অতো গোলমাল কিসের রে?'

পান চিবুতে চিবুতে পর্দা সরিয়ে ছোট্‌কার প্রবেশ। নণ্টে একটু নড়েচড়ে বসে। আমিও। বাড়ীর সবাই বেশ একটু 'ইয়ে' করে ছোট্‌কাকে। থাকেন দিল্লীতে। ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসেন। লম্বা, পাতলা চেহারা। গোলাপ-কুঁড়ির মত ঠোঁট দুটিতে হাসি লেগেই আছে। ওখানকার এক কলেজে পড়ান। পান, চা আর কথা পেলে কিচ্ছুটি চান না। মাথা চুলকে তা-না-না করে কথাটা চাপা দেবার তালে ছিল নণ্টে। ফস করে বলে ফেলি, 'নণ্টে বলছিল, ও যদি মন্ত্রী হয় কোনদিন, পুলিস-টুলিস সব নট করে দেবে—মানে ও ঝামেলা তুলেই দেবে।'

'বাঃ। ভারী মজার তো! একেবারে তুলেই দিবি! একটাও রাখবি নে!'

'রাখাটা ওর পক্ষে এখন একটু মুশকিলই ছোট্‌কা। পরীক্ষা যতোই এগোবে, ও ততোই অ্যান্টি-পুলিস হয়ে উঠবে। এখন তো সবে শুরু!'

'কিন্তু পরীক্ষার সঙ্গে পুলিসের…'

'ওর কথা বাদ দাও তো ছোট্‌কা। পাগলে কি না বলে আর…যাক্‌ গে!'—চেয়ারটা ছোট্‌কার দিকে একটু এগিয়ে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে নণ্টে। ছোট্‌কাও
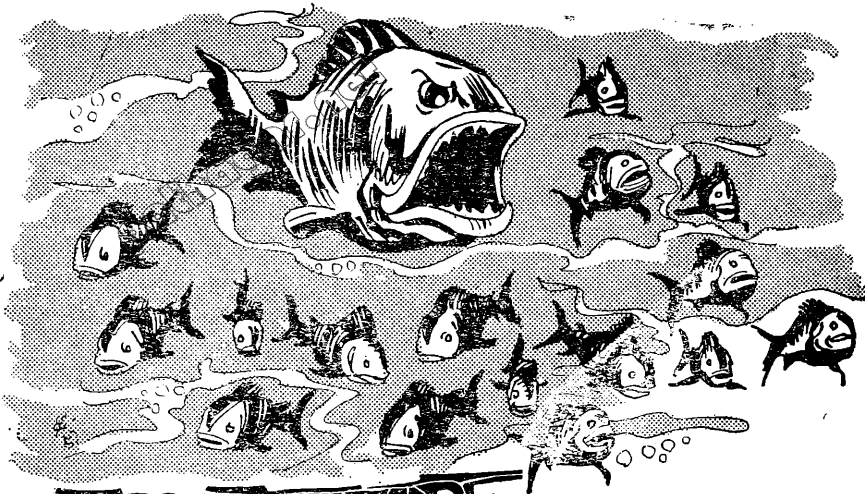
ততক্ষণে বসে পড়েছেন বাবার ইজিচেয়ারটায়। সামনের টুলটায় পা দুটো মেলে দিয়ে বেশ আয়েস করেই বসা হল। মুখে একটা সিগারেট উঠেছে তাঁর ততক্ষণে। চোখে কৌতুক, মুখে হাসি। পা দুটি দোলাচ্ছেন মাঝে মাঝে।

'আচ্ছা ছোট্‌কা'—নন্টে আবার সরব হল—'আজকের সভ্য দুনিয়ায় এসব পুলিস-টুলিসের কোন দরকার আছে বলে তুমি মনে কর? ওদের কাজ তো ফর্ নাথিং লোকের পেছনে লাগা, দাঁড়িয়ে-বসে ঝিমুনো আর খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি বাগানো। নয়?'

'আর একটা ইম্‌পরট্যান্ট্ কাজ অবশ্য বাদ গেল'—কুট করে চিমটি কাটার ভঙ্গিতে বলি, 'পরীক্ষার হলে ছেলেদের ফর্‌নাথিং বিরক্ত করার দুর্বুদ্ধি···' ওর আগুন-ঝরা দৃষ্টি দেখে কুঁকড়ে যাই, থেমে যাই মাঝপথে।

ছোট্‌কা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে নন্টের দিকে তাকান। বলেন, 'সভ্য দুনিয়ার কথা বলছিলি তো? বলি, শোন। তোর ঐসব পুলিস-টুলিস ছাড়া এই সভ্য দুনিয়ার একদিনও চলবে না। একদিন কেন, এক ঘন্টার জন্যে পুলিস তুলে নে না, ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে যাবে, দেখবি। এখন যারা সব সভ্য-ভব্য হয়ে চলছে, দেখবি তাদেরই দাপট। সবল দুর্বলকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে না! বর্তমান সমাজের এই মানুষগুলো সম্পর্কে তোর কোন ধারণাই নেই, দেখছি।'

নন্টের মুখটা একটু ঝুলে পড়ে। ডুবে যাবার আগে শেষ চেষ্টার কসুর করে না তবু। বলে, 'তাহলে তুমি বলছো, পুলিস ছাড়া আমাদের চলবে না! ওদের দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি! ওরা না থাকলে, সমাজ, সংসার সব গোল্লায় যেতো!'

'ঠিক তা নয় রে, পুলিসই সব কিছু নয়। সে তো যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রীটি হলেন শাসক বা সরকার, যিনি পুলিসকে শান্তিরক্ষার কাজে লাগান। কোথাও একজন বা দুজন, কোথাও কয়েকজন, কোথাও বা বহুজন শাসনের কাজ চালান। তাঁরাই শাসক বা সরকার, রাজাও বলতে পারিস। এই শাসক বা রাজা না থাকলেই রাজ্যে দেখা দেয় অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, অনাচার, অসহ্য উৎপীড়ন। বনের পশুদের মত আদিম মানুষের মধ্যেও 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি চালু ছিল। দুর্বলের পক্ষে নিজের আহার যোগানোই ভার, সঞ্চয় করা তো দূরের কথা। তার নিজস্ব বলতে কিছুই থাকতো না, জোয়ান লোকেরা সব কেড়ে-কুড়ে নিত। কেন, এই বিংশ শতাব্দীতে কলকাতার বুকে দাঙ্গার সময় কী হয়, কিরকম লুঠতরাজ চলে দেখিসনি?

'দেখিনি আবার!'—আমি সোৎসাহে ঘাড় নাড়ি—'মানুষগুলো কেমন যেন সব পশু হয়ে যায় তখন!'

'ঠিক তাই, বেড়ালের মুখে ইঁদুর, সাপের মুখে ব্যাঙের যে অবস্থা আর কি! মানুষ এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যেই নাকি রাজা ঠিক করেছিল একজনকে। তাঁর গায়ে নিশ্চয়ই জোর ছিল খুব বেশী, হয়ত বুদ্ধিও। সে কথা দিল: আজ থেকে তোমাদের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমার। বিপন্ন মানুষ বলে উঠল: জয় হোক আপনার। আজ থেকে আমরা আপনার প্রজা। আপনার কথা শুনব, জমির ফসলের ছয় ভাগের একভাগ দেব আর দেব হাটে-বাজারে বেচতে নিয়ে যাওয়া জিনিসপত্রের এক-দশমাংশ ও কিছু নগদ টাকা। উভয় পক্ষই খুশী—রাজা আর প্রজা। লোকে বিয়ে-থা করল, বাড়ী-ঘর তুলল। গড়ে উঠল সমাজ এবং রাষ্ট্র। রাজ্যে শান্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত হল বহু কর্মচারী। তাদেরই একদলের নাম পুলিস।'

লম্বা বক্তৃতা দিয়ে বোধ হয় একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন ছোট্‌কা। মাথাটা এলিয়ে দিলেন চেয়ারে। সিগারেটটা ততক্ষণে পুড়ে ছাই। মিনিটা কখন এসে ছোট্‌কার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালই করিনি। ছোট্‌কার ঝুলে পড়া হাতের শিথিল মুঠিতে আলতো করে একটা পান গলিয়ে দিল দুষ্টুটা। নির্বিকারভাবে ওটা মুখে ফেলে চিবুতে থাকেন তিনি।

'পুলিসের তাহলে অ্যাত্তো ইতিহাস! ভারী ইন্টারেস্টিং তো! এই পুলিস তুলে দিলে তো একটা কেলেঙ্কারীই হয়ে যেতো, দেখছি। ভাগ্যিস্ তুমি এত কথা বললে ছোট্‌কা, নইলে,—'

'নইলে ও মন্ত্রী হতোই এবং পুলিস,—এক কথায় ফট্ বা নট।' বলেই নন্টের দিকে আড়চোখে তাকাই। ওর মুখের যা একখানা চেহারা দেখলাম না, সে আর বলার নয়।

'আচ্ছা ধর ছোট্‌কা'—নন্টে আবার মুখ খুলল—'ধর কোন গভ্‌মেন্ট একদিন পুলিসী ব্যবস্থা তুলেই দিল, বা আরও একটু এগিয়েই বলি, রাজা না শাসক—কী যে সব বললে না, সেগুলোরও যদি হঠাৎ একদিন বারোটা বাজে, তাহলে কাণ্ডটা খুব টেরিফিক হবে, বলো! খুব চাক্কু চালাচালি, পেটো ছোঁড়াছুঁড়ি, আগুন-ফাগুন, লুঠ-ফুট—একেবারে রে রে ব্যাপার, নয়? আমি কিন্তু আগেভাগেই বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, মোড়ের ওই 'স্পোর্টস হাউজ'টা আমার ভাগের। ওখানে কেউ ট্যাঁ-ফোঁ করতে এলে লাশ পড়ে যাবে বলে দিলাম, তা সে ভাই-বেরাদর যেই হোক না কেন।'

টার্গেটটা যে আমিই সেটা চাউনিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি কিছু বলার আগেই ছোট্‌কা সশব্দে হেসে ওঠেন। নন্টের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলেন,

'বাবারও তো বাবা আছে রে! কে কার লাশ ফেলে! তুই-ই কি তখন বেঁচে থাকবি! ওর কথা না হয় বাদই দিলাম। রাস্তাটাস্তা সব ভরে যাবে না লাশে! রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে না। আছিস কোথায়!'

'তাহলে তো খুব মুশকিল।'—গালে আঙুল ঠেকিয়ে বিমনা হয় মিনি—'এত লাশ জমে গেলে তুমি ইস্টিশনে যাবে কি করে ছোট্কা? ছুটি তো আর জীবন ভোর থাকবে না!'

ওর থুতনিটা নেড়ে দিয়ে ছোট্কা বলেন, 'তা আর বলতে! চাকরীটা রাখাই দায় হবে দেখছি!'

নিজের লাশ হবার সম্ভাবনাটা নণ্টে অবশ্য ভেবে দেখেনি। ব্যাপারটা বোধগম্য হবার পরেই ও যেন কেমন একটু মিইয়ে গেছে। একটু পরে বলে, 'এর চাইতে পুলিস-টুলিসই ভালো বাবা। এত বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড, কে জানতো?'

'একেই বলে মাৎস্যন্যায়।'—ছোট্কা চোখ বুঁজলেন।

'সে আবার কী?'—একটু বাদে প্রশ্ন করি নণ্টে আর আমি—'সে আবার কোন্ চীজ!'

'মৎস্যন্যায়ও বলতে পারিস।'

'মানে?'

'মানে? কেন, ডিক্‌শনারীটা দেখতে পারো না তোমরা? হাতের কাছেই তো আছে। কী আলসে রে বাপু!'

ডেঁপো মেয়েটাকে বাজখাঁই একটা ধমক দিতে গিয়েও থেমে যাই। বলেছে অবশ্য মন্দ না। দেখাই যাক্ না। ছোট্কার বিশদ হবার কোন চেষ্টাই তো দেখছি না। 'চলন্তিকা'টা খুলে 'মাৎস্যন্যায়' বার করে গলা তুলে পড়ি: 'মৎস্যের তুল্য পরস্পর হনন, অরাজকতা ও নরহত্যা।'

'মৎস্যেরা পরস্পর হনন করে নাকি? যত্তোসব আজগুবি!'—নণ্টে মুখ বেঁকায়।

'হনন করে না তো কি আদর করে? মেছোআইন বড়ো সাঙ্ঘাতিক। জলের মাছেদের নিয়ম বা রীতি হল, ছোট মাছ দেখলেই বড় মাছ টপ করে গিলে ফেলবে। এর জন্যে কোন সালিশী বা মকদ্দমা চলবে না। চোখের জল ফেলাও বারণ।' —ছোট্কার আলোক-সম্পাত।

'এর জন্যেই বোধ হয় বলে "মাছের মায়ের আবার পুত্রশোক!" পুত্র জন্মালেই তো মরবে। এ তো জানা কথাই। তাই মেছো মায়েরা কখনও শোক-টোকের ধার দিয়েও যায় না, তাই না ছোট্কা?'—বলে গম্ভীরভাবে নণ্টের দিকে তাকাই। নণ্টে তখনও 'মাৎস্যন্যায়'ই দাঁতে ভাঙার চেষ্টা করছে। ছোট্কার দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটু খোলসা করে বল না ছোট্কা।'

নড়ে চড়ে বসে ছোট্কা আর একটা সিগারেট ধরান। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেন, 'এতে অখোলসাটা কোথায় দেখলি? যখন দেশে রাজা থাকে না, শাসন থাকে না তখনই দেখা দেয় দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার, লুঠপাট, খুন-জখম। বড় মাছের মতই সবল দুর্বলকে গিলে খেতে চায়। তাই এই অরাজকতার, নৈরাজ্যের, ঘোরতর বিশৃঙ্খলার নাম মাৎস্যন্যায়—মন্বন্তরও বলতে পারিস। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে রাজাকে মনু বলা হতো কিনা।'

'আমাকেও তো মা মনু বলে ছোট্কা!'—খুশীতে ডগমগ হয় মিনি। নণ্টের কড়া চাউনি দেখেই অবশ্য সে দপ করে নিভে যায় তক্ষুণি।

'তা যা বলছিলাম। এক মনু মারা গেলে অন্য আর এক মনু সিংহাসনে বসার আগে যে সময়টা ফাঁকা থাকে, তাকে বলা হত মন্বন্তর। এ সময়টায় কোন রাজা না থাকায় প্রায়ই ভারী গোলমাল হত। তাই মন্বন্তর বলতে আগে অনেক সময় নিদারুণ বিশৃঙ্খলাই বোঝাত, এখনকার মত দুর্ভিক্ষ নয়। অবশ্য মন্বন্তরে দুর্ভিক্ষও যে হত না, তা নয়।

'আচ্ছা ছোট্কা, আমাদের দেশে এ ধরনের মন্বন্তর বা মাৎস্যন্যায় হয়নি কোন দিন?'—নণ্টের জিজ্ঞাসা।

'হয়নি আবার! আমি এক্ষুনি তিন-তিনটে মাৎস্যন্যায়ের কথা বলতে পারি তোদের, অবশ্য যদি শোনার ধৈর্য থাকে শেষ পর্যন্ত।'

'থাকবে, থাকবে!'—মিনি আর নণ্টে আর একটু ঘনিষ্ঠ হয় ছোট্কার।

'কিন্তু পান না হলে তো হচ্ছে না, মিনি। সেই কখন্ একখিলি দিয়েছ, মুখ শুকিয়ে গেল যে!'

'ও মা, তাইতো! এক্কেবারে ভুলে গেছি, জান! এক্ষুণি নিয়ে আসছি ছোট্কা। খবরদার, আগে বলো না কিন্তু।'—বলেই একদৌড়ে উধাও হয়ে যায় মিনি।

হাঁপাতে হাঁপাতে খিলিটা ছোট্কার মুখে পুরে দিয়ে প্রায় তার কোল ঘেঁষে বসে পরে দুষ্টুটা। ছোট্কার মুখটা দুহাতে ধরে ওর দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'এবার বলো।'

'প্রথম যে মাৎস্যন্যায়ের কথা বলব, সেটি ঘটেছিল আমাদের এই বাংলাদেশেই—প্রাচান যুগে। অবশ্য অন্য দুটিও বাংলা দেশেই ঘটে।'

'কদিন আগে ছোট্কা?'—নণ্টের প্রশ্ন।

'তা প্রায় আজ থেকে তেরশ বছর আগে। তোরা তো আজকাল বাংলার ইতিহাস পরিস। শশাঙ্কের কথা শুনেছিস তো?'

'শুনিনি আবার! সেই হর্ষবর্ধনের সঙ্গে যার যুদ্ধ-টুদ্ধ হয়েছিল, সে-ই তো ?'—নন্টে বলে।

'তুমিও যেমন ছোট্‌কা! কবে শশাঙ্ক নিয়ে চিরকুট লেখা হয়ে গেছে! এবার নাকি ওটা আসবেই। আর এলে নন্টেকে পায় কে!'—আমি সত্য প্রকাশ করি।

'শশাঙ্ককে নিয়ে চিরকুট? মানে?'—ছোটকা অবাক।

নন্টে হাতটা পোকা তাড়াবার মত করে দুলিয়ে দিল একবার। বলল, 'বাদ দাও, বাদ দাও, হিংসের জ্বালায় বলছে এসব। নিজের মুরোদ তো নেই, তাই এত টিকটিকানি। যা বলছিলে বলো ছোট্‌কা।'

খাঁকারি দিয়ে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে ছোট্‌কা শুরু করলেন: 'শশাঙ্ক খুব বড় রাজা ছিলেন, জানিসই তো। গোটা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা জুড়ে তাঁর রাজ্য। কনৌজও তিনি কিছুকাল নিজের শাসনে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। পূব দিক থেকে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মা এবং পশ্চিম দিক থেকে থানেশ্বররাজ হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বাংলা আবার স্বাধীন হল, তবে কোন একজন রাজার অধীনে সে আর রইল না। বাঙলা টুকরো টুকরো হয়ে গেল—একটা দেশ ভেঙে পাঁচ-পাঁচটা স্বাধীন দেশ। বাঙালীদের অবস্থা আর বলার নয়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। একে অন্যকে সদাই খতম করতে উদ্যত। শুধু হিংসা আর হিংসা। কোন রাজাই বেশীদিন রাজত্ব করতে পারছে না। কেউ এক সপ্তাহ, কেউ বা এক মাস। অথচ তোরা জানিস্, বাংলা চিরকালই সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। ধনরত্নের কোন অভাবই নেই এখানে। অথচ এদেশকে রক্ষা করার মত শক্তিশালী শাসকের একান্ত অভাব। এ অবস্থায় যা হয়, তা-ই হল। পঙ্গপালের মত ভারতের নানা অঞ্চলের এমন কি ভারতের বাইরেরও কোন কোন দেশের লোক বাংলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কাতারে কাতারে, শুরু হল খুন, জখম, লুঠতরাজ, অগ্নিদাহ এবং অকথ্য শোষণ এবং অকল্পনীয় অত্যাচার। সে অত্যাচার ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, চিন্তাও করা যায় না বোধ হয়। কনৌজ, কামরূপ, কাশ্মীর, তিব্বত—বাদ গেল না কেউ। যে যা পারল লুটে নিল। যেটুকু তলানি পড়ে রইল, বলবান, জমিদার, সামন্ত, চোর-ডাকাত, পাজী-বদমাসরা তাও চেটে পুটে এক নিমেষে সাবাড় করে দিল। দুর্বলের, নিরাশ্রয়ের এবং আহতের চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠল। দিকে দিকে রব উঠল: "বাঁচাও, বাঁচাও, ! রক্ষা কর, রক্ষা কর!" কিন্তু কে বাঁচায়, কে করে রক্ষা! শুধু একটানা মার-মার কাট-কাট শব্দ—"উচ্ছৃঙ্খল বিচ্ছৃঙ্খল শক্তির উন্মত্ততা!" শাসন গেল, শান্তি গেল, ব্যবসা-বাণিজ্য শিকেয় উঠল, সোনা-রূপার টাকাও উধাও হল। চাষবাস ছাড় বেঁচে থাকবার আর কোন উপায়ই রইল না। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ৬৫০ থেকে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই একশ বছর ধরে বাংলায় একটানা মাৎস্যন্যায় চলে। পূর্ববঙ্গে (আধুনিক বাংলাদেশ) এই বিশৃঙ্খলা চরমে উঠেছিল।

'সপ্তদশ শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথ বাংলার মাৎস্যন্যায়ের এক লোমহর্ষক কাহিনী আমাদের জন্য রেখে গেছেন।'

'থামলে কেন? বলো বলো।'—একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি আমরা।'

'শোন্, বলি। তারনাথ বলেছেন, বঙ্গ বা পূর্ব বাংলার শেষ রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর সেখানে নেমে আসে ঘোর নৈরাজ্য। দেশে কোন রাজা নেই। প্রতিটি ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ এবং বণিক নিজের নিজের এলাকায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। দীর্ঘকাল রাজা-বিহীন অবস্থায় নিদারুণ অরাজকতার মধ্যে বাঙালীরা দিন কাটাতে থাকে তাদের দুর্দশা অবর্ণনীয়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে দেশের নেতৃস্থানীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা একসঙ্গে মিলে একজন রাজা ঠিক করল। তাদের আশা, ইনি দেশে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের। সেই রাত্রেই নূতন রাজা নিহত হলেন। প্রাক্তন রাজা ললিতচন্দ্রের রাণীর রূপ ধরে এক সবলা কুৎসিতদর্শন নাগরমণী নূতন রাজাকে হত্যা করল। বাঙালীরা আবার আর একজনকে রাজা করল। এবারেও সেই রমণী মেরে ফেলল তাঁকে। এদিকে রাজা না হলে লোকের চলে না, তাই তারা প্রতিদিন সকালে একজন করে রাজা ঠিক করে। কিন্তু প্রতি রাতেই রাণী-বেশিনী সেই নারী তাঁদের হত্যা করতে থাকে। সকাল হলেই রাজার শবদেহ বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হত নিয়মিত-ভাবে। শেষ পর্যন্ত রাজা করার মত আর লোকই পাওয়া যায় না। সবাই মিলে তখন ঠিক করল, পালা করে প্রতি বাড়ী থেকে একজন লোককে এক দিনের জন্য রাজা হতে হবে। একদিন বিশেষ একটা বাড়ীর পালা। সেখানে তো কান্নার রোল উঠেছে—যেতে হবে একজনকে নিশ্চিত মৃত্যুর গহ্বরে। এমন সময় সে বাড়ীতে এল বৌদ্ধ দেবী চুন্দার ভক্ত এক ব্যক্তি। তাঁর বাড়ী উত্তরবঙ্গে। রাজা হবার ইচ্ছে নিয়ে সে পূর্ববঙ্গে এসেছে। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতেই তাকে সব খুলে বলা হল। দুঃসাহসী সেই লোকটি কিছু টাকা পেলে ও বাড়ীর ছেলে সেজে একদিনের জন্য রাজা হতে রাজী হয়ে গেল। বাড়ীর লোকেরা হাতে চাঁদ পেল যেন, তক্ষুনি

টাকাকড়ি দিয়ে তারা তাকে পাঠিয়ে দিল রাজ-দরবারে। যথারীতি লোকটি রাজা হয়ে গেল। দুপুর রাতে সেই রাণী এক রাক্ষসীর মূর্তি ধরে তার দিকে এগিয়ে যেতেই সে দেবীর আশীর্বাদপূত সঙ্গের লাঠিটির এক মোক্ষম ঘা বসিয়ে দিল তার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল সেই রাক্ষসী। পরের দিন ভোরে তাকে জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে লোকের যে কী আনন্দ হলো, ভেবে দেখ্। লোকটি পর পর সাতদিন অন্যদের হয়ে রাজা হল। কিন্তু তার কোন ক্ষতিই হল না। তার অসাধারণ সাহস ও গুণে মুগ্ধ হয়ে বাঙালীরা তাকেই তাদের স্থায়ী রাজা বলে ঘোষণা করল। তারা তাদের নূতন রাজার নাম দিল গোপাল।'

মিনি আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। বলল, 'বাঃ বাঃ' এ যে একেবারে ঠাক্‌মার গপ্পের মত। গপ্পে আছে, রাজকন্যার নাক থেকে বেরিয়ে একটা সাপ হাজার ফণা ধরে রাজাদের নিশিরাত্তিরে খেয়ে ফেলত। তুমি বললে, রাক্কুসী খেত। ঠাক্‌মা বলেছে, শেষ রাজা তরোয়াল দিয়ে সাপটাকে কুচি কুচি করে কেটেছিল। তুমি বললে, লাঠি দিয়ে মেরেছে। তুমি বাপু ঠিক জানো না, মনে হচ্ছে।'

ছোট্‌কা হাসতে থাকেন। নন্টে বলল, 'নাগরমণী আর সাপ—ও একই কথা।'

'আসলে রাণীর হিংসেটাই সাপ হয়ে দংশন করত। গোপাল সাবধানী ছিল বলেই বেঁচে গেল।'—ফোড়ন কাটি আমি।

'কথাটা মন্দ বলিসনি।'—ছোটকা আমার দিকে তাকিয়ে হাসেন।—'মায়ের গল্পে ইতিহাসের ক্ষয়ে যাওয়া কঙ্কালটাই চোখে পড়ছে। সাধারণতঃ রূপকথার গল্পগুলি এভাবেই গড়ে ওঠে।' একটু থেমে ছোট্‌কা বলেন 'গোপালের বংশধর সম্রাট ধর্মপাল ও নারায়ণ পাল এই মাৎস্যন্যায়ের কথা এবং প্রজাগণ কর্তৃক গোপালের রাজপদে নির্বাচন ও তাঁর হাতে অরাজকতা দূরের বিবরণ তাঁদের লেখ্-এ দিয়ে গেছেন। গোপাল শক্ত হাতে অরাজকতা দূর করেন, অত্যাচারীদের শায়েস্তা করেন এবং সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন শান্তি ও শৃঙ্খলা। দীর্ঘ একশ বছর ধরে যে মাৎস্যন্যায় চলেছিল তার অবসান ঘটান গোপাল।'

'বাব্বাঃ, মাৎস্যন্যায় কথাটার মধ্যে অ্যাত্তো সব লুকিয়ে ছিল!'—নন্টে হাঁপ ছাড়ে।

'একটা কথা বলা হয়নি কিন্তু।'—ছোট্‌কা বলেন—'মাৎস্যন্যায় ঘোর অরাজকতা বোঝালেও এই অরাজকতার মধ্যেই আলোর ফুলকির মত ফুটে উঠেছিল হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষার অপূর্ব উন্নতি। হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মকেও কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল এই সময়। বৌদ্ধ মঠ-মন্দির ভেঙে পড়তে থাকে। এগুলির ধ্বংসস্তূপের ওপর বাড়ীঘর বানাতে থাকে লোকেরা। গোপাল এবং তাঁর বংশধরেরা বাংলায় আবার বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার ঘটিয়েছিলেন। তারনাথের গল্পে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের এই নব প্রতিষ্ঠার কথাই হয়ত বলা হয়েছে।'

'বাকী দুটো মাৎস্যন্যায়ের কথা বলো এবার।'—নন্টে দাবি জানায়।

ওরে বাবা! আজ রেহাই দে বাবা। সে দুটো অন্য একদিন বলবো 'খন।'

'না, না, না। এখুনি বলতে হবে!'—সোচ্চার দাবি আমাদের।

অগত্যা নড়ে চড়ে বসেন ছোট্‌কা। বলেন, 'বেশ, শোন্। দ্বিতীয় মাৎস্যন্যায়টা এই বাংলাতেই ঘটেছিল পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ কিনা মধ্যযুগে।'

'পঞ্চদশ-টশ বুঝি না। এখন থেকে কদ্দিন আগে, তা-ই বলো।'—নন্টে স্পষ্ট কথার মানুষ।

'বেশ তো। তা-ই বল্‌ছি। আজ থেকে চারশো অষ্টআশী বছর (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) আগের কথা। বাংলার সিংহাসনে তখন হাব্‌সী ক্রীতদাসরা সুলতান হয়ে বসছে। আগে বাংলার সুলতানরা আফ্রিকা থেকে এই দাসদের যোগাড় করতেন। এরা অধিকাংশই ছিল খোজা। প্রভুর বিশ্বাস অর্জন করে শেষ পর্যন্ত প্রভুকেই হত্যা করে তারা সিংহাসনে বসত। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন হাব্‌সী ক্রীতদাস সেই হাব্‌সী সুলতানকে হত্যা করে নিজেই মুকুট পরত মাথায়। এইভাবেই চলতে থাকে। যে কদিন তারা বেঁচে থাকত, অত্যাচারের ঢেউ বইয়ে দিত বাংলার বুকে। হিন্দু-মুসলমান—কেউই বাদ যেত না তাদের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে। অতিষ্ঠ হয়ে অনেকে দূরে পালিয়ে যেত। বিনা অপরাধে প্রাণ দিত হাজার হাজার লোক। বাংলার প্রধানগণ একবার এক সুযোগ্য হাব্‌সীকে একমত হয়ে সিংহাসনে বসিয়েছিল। এর নাম মালিক আন্দিল। সম্ভবতঃ মালিক আন্দিলের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হয়েছিল। তাঁর পর আরও কয়েকজন হাব্‌সী পর পর সিংহাসন দখল করে। কিন্তু কোন সুলতানের শাসনই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাংলায় হাব্‌সী শাসন মাত্র ছবছর টেঁকে। কিন্তু এই ছ'বছর বাঙালীদের কাছে এক চরম দুঃস্বপ্ন—শুধু ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, হত্যা আর শোষণের কাল। জনসাধারণ শুধু নীরব দর্শক—ভয়ে তাদের মুখে একটা কথাও ফুটত না। অবশেষে আলাউদ্দীন হুসেন শাহ শেষ হাব্‌সী সুলতান মুজাফর শাহকে হত্যা করে বাংলায় সুশাসন ফিরিয়ে আনেন। মহাভারতের

অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর হুসেন শাহ-র সম্বন্ধে কী বলেছেন, শোন্ :

নৃপতি হুসেন শাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥
অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার ॥"

'বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফেরিস্তা হাব্‌সী যুগ সম্পর্কে ঠাট্টা করে বলেছেন, "প্রভুকে হত্যা না করলে বাংলার প্রভু হওয়া যায় না।"

ছোট্‌কা থামতেই মিনি আর এক খিলি পান তাঁর মুখে গুঁজে দিল। একটু হেসে ছোট্‌কা আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা ঘাড় নেড়ে তিন নম্বরটি আরম্ভ করার ইঙ্গিত দিই। ছোট্‌কা শুরু করেন :

'এবার চলে এসো আধুনিক যুগের বাংলায়। পলাশীতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা হেরে গেছেন ইংরেজদের কাছে। ইংরেজরাই বাংলার আসল নবাব। তারা দুহাতে শুষে নিচ্ছে বাংলার ধন-দৌলত, কাপড়-চোপড়, কাঁচামাল, আরও কত কী! ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এদেশের রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্থাৎ দেওয়ানীও তারা আদায় করল দুর্বল মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে। কিন্তু শাসনের বা বিচারের কোন দায়িত্বই তারা নিল না। এদিকে নবাব নামেই শাসক, লোকবল বা অর্থবল কিছুই নেই তাঁর। এ এক অদ্ভুত অরাজক অবস্থা। রাজা থেকেও নেই। নবাবের দায়িত্ব আছে, ক্ষমতা নেই। ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা, কিন্তু কোন দায়িত্ব নিতে তারা নারাজ। ফলে ইংরেজদের এ-দেশীয় কর্মচারীরা নিষ্ঠুর-ভাবে লুটতে থাকে দেশটা। বেশীর ভাগ যায় ইংরেজের পকেটে, বাকীটা লাগে নিজেদের ভোগে। করভারে আর্তনাদ করে চাষী, জোলা আর তাঁতী। চরকা ও তাঁত বন্ধ হয়ে যেতে থাকে ইংরেজদের কৌশলে। বাংলা ১১৭৬ সনে বা ১৭৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় দেখা দিল এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ। পেটের জ্বালায় মা ছেলের মুখের মাংস তুলে খেল, শহরের রাস্তাঘাট মড়ায় ভরে উঠল। দেখা দিল মহামারী। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়, "পথ অতি দুর্গম। পায়ে পায়ে ডাকাত-লুঠেরা ফিরিতেছে......কোন্ দেশের এমন দুর্দশা, কোন্ দেশে মানুষ খাইতে না পাইয়া ঘাস খায়, কাঁটা খায়, উই-মাটী খায়, বনের লতা খায়? কোন্ দেশে মানুষ শিয়াল-কুকুর খায়, মড়া খায়? কোন্ দেশের মানুষের সিন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি-বৌ রাখিয়া সোয়াস্তি নাই   সকল দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ। আমাদের...রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, এখন ত প্রাণ পর্যন্তও যায়!" এ হল তখনকার অবস্থা।'

'এ যে আনন্দমঠের কথা।'—নণ্টে লাফিয়ে ওঠে—'এ আমি পড়েছি ক্লাসে বসে বসে।'

'ঠিকই বলেছিস। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ বাংলার এই তৃতীয় মাৎস্যন্যায়ের জীবন্ত বর্ণনা আছে। পড়তে পড়তে গা শিউরে ওঠে।'—ছোট্‌কা একটা হাই তুলে আর একটা সিগারেট ধরান। তারপর বলতে থাকেন, 'বিখ্যাত মুসলমান ঐতিহাসিক ঘুলাম হোসেন এই অত্যাচার, অনাচার স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি আর সইতে না পেরে আকুল হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "হে ঈশ্বর, তোমার হতভাগ্য সন্তানদের দিকে তাকিয়ে একবার স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে এসো। দুঃসহ অত্যাচারের হাত থেকে এদের রক্ষা করো।"

'একটা কথা কিন্তু ভুলো না ছোট্‌কা।'—আমি বলে উঠি, 'তিন-তিনটে মাৎস্যন্যায় পার করেও আমরা বেঁচে আছি এবং বহাল তবিয়তেই। ঠিক কিনা বলো।'

'মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি···।'—মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে আবৃত্তি করতে থাকে মিনি আর নণ্টে। কখন্ যে নিজেই ওদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে শুরু করেছি, মনে নেই।

ভিয়েৎনাম ! ভিয়েৎনাম ! সবার মুখেই ভিয়েৎনাম।

ভিয়েৎনামের সমুদ্রতীরে একদল ক্ষুদে কাঁকড়া ভিজে বালির গুলি পাকিয়ে চলেছে সকাল থেকে সন্ধ্যে। দিনের পর দিন—প্রতিদিন ওই কাজ ওদের। জোয়ারের জলে সেইসব বালির গুলি প্রতিদিন ভেসে যায়। কিন্তু সেই সব ক্ষুদে কাঁকড়াদের ভ্রূক্ষেপ নেই। গুলি গেল কি থাকলো, এ নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না।

ব্যাপার দেখে ভিয়েৎনামের লোকেরা একটি প্রবাদই বানিয়ে ফেলেছে—'দা ত্রাং-এর পণ্ডশ্রম,'—অর্থাৎ ফলাফল চিন্তা না করে শুধু দিনরাত খেটে মরা। যেন শ্রমের জন্যই শ্রম। ঐ ক্ষুদে কাঁকড়াগুলোকে ওরা বলে দা ত্রাং।

কথায় বলে সাতরাজার ধন !

এত সব প্রশ্ন করলে, সব কথা খুলেই বলতে হয়। ভিয়েৎনামের সবাই অবশ্য ব্যাপারটা জানে। তাই ঐ ক্ষুদে দা ত্রাং নামক কাঁকড়াদের উপর ওদের কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। ব্যাপারটা অবশ্য আদ্যিকালের ব্যাপার।

আদ্যিকালে দা ত্রাং নামে একজন লোক বাস করতো ভিয়েৎনামের এক গ্রামে। ভারী সুন্দর গ্রাম। সমুদ্দুরের কাছেই নারকেল বন আর সবুজ গাছপালা। তারই ফাঁকে ফাঁকে ধানের ক্ষেত, কুঁড়েঘর। দা ত্রাং বেশ জোয়ান ছেলে। গায়ের রঙ যেন কাঁচা সোনা। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। ওর নেশা ছিল শিকারের।

মণিহারা

• সুধীরকুমার করণ •

কেউ যদি বলে—'আচ্ছা বোকা তো কাঁকড়াগুলো ! শুধু শুধু খেটে মরছে !' ভিয়েৎনামীরা মুচকি হেসে বলবে—'শুধু শুধু মনে হচ্ছে বটে, তবে বেচারা দা ত্রাং-এর আর কী-ই বা করার আছে ! সেই যে কবে মণি হারিয়েছে, সেই দিন থেকে বালি খুঁড়ে ওলোট পালোট করে মণি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে, যদি পেয়ে যায়। কিন্তু হায়, যা হারিয়েছে তা কি আর পাওয়া যায় !'

বলেই হয়তো দা ত্রাং-এর জন্য দীর্ঘশ্বাস ছাড়বে তারা।

ব্যাপারটা খুলেই বল। কিছু বুঝতে পারছি না। দা ত্রাং তো ওই কাঁকড়াগুলো ? অন্য দা ত্রাং কেউ আবার ছিল নাকি ! কোথায়, কখন্ সে তার মণি হারিয়েছিল ? আর মণি তো যে সে জিনিস নয়।

প্রতিদিন ভোরবেলায় উঠে বেরিয়ে পড়তো তীর-ধনুক নিয়ে। ফিরতো দিনের শেষে। যাবার সময় বেশ বড় একটা মাঠের পাশ দিয়ে যেতো। মাঠ পেরিয়ে আরো কিছুদূর গেলে বন। বনের ধারেই নীল সমুদ্দুর-এর গুম্‌গুম্ আওয়াজ।

মাঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রায়ই সে দেখতে পেতো, একজোড়া সাপ এক ঝোপের ধারে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। দেখতে ভারী সুন্দর। তাদের গোটা দেহে নানা রঙের ছবি আঁকা। গোড়ার দিকে ভয়-ভয় করতো। কিন্তু সাপ দুটো কোন দিন ওকে দেখেও তেড়ে আসেনি বলে ওর ভয় গেল ভেঙে। দা ত্রাং বুঝতে পারলো যে, সাপ দুটি যে সে সাপ নয়—বেশ ধার্মিক। তারপর থেকে

দা ত্রাং কিছু না কিছু খাবার দিয়ে যেতো ওদের কাছে।

একদিন হঠাৎ দেখলো সেই সাপ দুটিকে জাপটে ধরে আছে বেশ মোটা আর বিচ্ছিরি একটা হলদে রঙের সাপ। সাপ দুটো ওর কবল থেকে পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু গায়ের জোরে পারছে না। দা ত্রাং এক মুহূর্তও দেরি না করে হলদে সাপের মাথা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো। তীরটা লাগলো তার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বিচ্ছিরি সাপটা অন্য সাপ দুটোকে ছেড়ে ছুটে পালিয়ে গেল। তার পেছনে পেছনে ছুটলো সেই জোড়া সাপের একটি। আর একটি তৎক্ষণে মরে গেছে। দা ত্রাং-এর মনে খুব কষ্ট হল। মরা সাপটিকে নিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পুঁতে দিল সে। তারপর চলে গেল নিজের কাজে।

রাত্রে স্বপ্ন দেখলো সে। কে একজন মানুষের মত বেশ ধরে এসেছে বলছে—'তুমি আমাকে শত্তুরের হাত থেকে বাঁচিয়েছো, আমার স্ত্রীকে সমাধি দিয়েছো। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এই নাও একটি মণি। এটি মুখের মধ্যে পুরে রাখলে সব জীবজন্তুর কথা তুমি বুঝতে পারবে।'—এই বলে সেই লোকটি সাপ হয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দা ত্রাং ধড়মড় করে উঠে বসলো। কী দারুণ স্বপ্ন! কিন্তু ঘরের কোণে ওটা কী জ্বলজ্বল করছে? ঘর আলো হয়ে গেছে একেবারে!

প্রথমে তো দারুণ ভয় পেয়ে গেল সে। তার বুক শুকিয়ে এল। তারপর ধাতস্থ হয়ে বিছানা থেকে নেমে মণিটাকে হাতের মধ্যে তুলে নিল সে। ব্যাপারটা তা হলে সত্যি—স্বপ্ন নয়।

পরের দিন ভোরে মণিটিকে মুখের মধ্যে পুরে নিয়ে যথারীতি শিকারে বেরিয়ে পড়লো দা ত্রাং।

বনের মধ্যে পৌঁছুতেই গাছের ডাল থেকে একটা কাক কা কা করে ডেকে উঠলো। দা ত্রাং কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেলো—

'ডান দিকে দুশো পা
দেখতে পাবে হরিণটা।'

দা ত্রাং অবাক। এমন কাণ্ডও ঘটে!

তারপর দুশো পা গিয়ে সত্যি সত্যি পেয়ে গেল একটা হরিণ। সঙ্গে সঙ্গে তীর মেরে হরিণটাকে সে মেরে ফেললো।

সেই কাকটা উড়তে উড়তে এসে আবার বললো—

'এবার আমার পুরস্কার।'

দা ত্রাং বললো—'কী চাও তুমি?'

কাক বললো—'নাড়িভুঁড়ি। নাড়িভুঁড়ি।
তাই পেলেই তুষ্ট আমি।'

দা ত্রাং হরিণ কেটে সব নাড়িভুঁড়ি ওকে দিয়ে দিল।

এর পর প্রতিদিন কাকের জন্য শিকারের নাড়িভুঁড়ি কিছু কিছু রেখে যেতো সে। কাক না থাকলেও ও রেখে যেতো। কাক এসে তার ভাগ পেয়ে যেতো।

একদিন দা ত্রাং কোন একটি প্রাণীর নাড়িভুঁড়ি রেখে গিয়েছে, কিন্তু কাক আসবার আগে অন্য কেউ এসে সে সব চেটেপুটে খেয়ে গেছে। কাক এসে দেখলো, তার ভাগ নেই। ভাবলো—দা ত্রাং আর গ্রাহ্য করছে না ওকে। ভারী বাড় বেড়েছে ওর জীবজন্তুর কথা বুঝতে পেরে। দেখাচ্ছি মজা! কাক সটান উড়ে গেল দা ত্রাং-এর বাড়ির দিকে। বাড়ী পৌঁছে কাকের ভাষায় ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিলে।

দা ত্রাং যত বলে যে, সে কাকের ভাগ প্রতিদিনই দিয়ে আসে, কাক তত বলে, না।

শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে, রেগে সে তীর ছুঁড়ে মারলো কাকের দিকে। কাক তো আর কম চালাক নয়! দিব্যি পাশ কাটিয়ে তীরটা মুখে তুলে উড়ে পালালো সে। গেল তো গেল!

কিন্তু দিনকয়েক পরেই রাজার সেপাইরা এসে দা ত্রাং-কে ধমক-ধামক দিতে শুরু করলো। বললে,—'একটা লোককে মেরে তুমি ফেলে দিয়েছ জলে। তার বুকে তোমার নাম লেখা এই তীরের ফলা।'

দা ত্রাং বলে,—'সে কি কথা! আমি কেন মারতে যাবো কাউকে! তীরটা নিয়ে এক বদমায়েশ কাক উড়ে পালিয়েছিল।'

সেপাইরা ওর কথা শুনতেই চাইলো না। বেঁধে নিয়ে গেল জেলখানায়।

দা ত্রাং-এর মুখের মধ্যে সেই মণিটি কিন্তু আছে।

জেলখানার মধ্যেই হঠাৎ দারুণ হাসি পেলো তার। বললো—'ওঃ কী দারুণ মিষ্টি! মানুষের রক্তই সবচেয়ে মিষ্টি!' বলেই আবার হো হো করে হাসি।

জেলদারোগা ওর হাসির বহর দেখে ছুটে এলো জেলখানায়। বললে,—'কী ব্যাপার হে! এত হাসি কিসের অ্যাঁ?

দা ত্রাং বলে, 'না না, এমনি—

জেলদারোগা নাছোড়বান্দা। বললো—'বলতেই হবে তোমাকে! কী বকছিলে পাগলের মত! মানুষের রক্ত মিষ্টি!'

দা ত্রাং শেষ পর্যন্ত বললে,—'আজ্ঞে ও কিছু না। এখানে অনেক ছারপোকার বাসা। তার উপর মশাও অনেক। ওরাই বলাবলি করছিল—'

জেলদারোগা রেগে লাল। বললো, 'রসিকতা হচ্ছে আমার সঙ্গে! মশা আর ছারপোকা বলাবলি করছিল!'

দা ত্রাং বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলছি—ওরাই বলছিল যে, মানুষের রক্ত দারুণ মিষ্টি।

জেলদারোগা ধরেই নিলেন, লোকটা পাগল—বদ্ধ পাগল।

একদিন দা ত্রাং শুনতে পেলো,—একদল চড়ুই পাখি খুশী মনে লাফঝাঁপ করছে। বলছে—'সব দানা শেষ। রাজার মরাইতে একটি দানাও আর নেই। না গম, না চাল। পাহারাওয়ালারা পাহারাই দেয় না—সব ফাঁকিবাজ! তাই মজা করেই আমরা ভাঁড়ার খালি করে দিয়েছি।' দা ত্রাং তখুনি জেলের বড় কর্তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলো। বললো—'জরুরী কথা আছে।'

দেখা হতে বললো—'চড়ুই পাখিদের কথা যেন রাজাকে জানিয়ে দেওয়া হয়।'

বড়কর্তা তো অবাক্। পরে সত্যি সত্যি দেখা গেল ভাঁড়ার খালি।

কিছুদিন পরে দা ত্রাং শুনতে পেলো কয়েকটা পিঁপড়ে কথাবার্তা বলছে।

কী কথা? না, দারুণ বন্যা হবে এবার।

দা ত্রাং আবার দেখা করতে চাইলো জেলের বড়কর্তার সঙ্গে। দেখা করে বললো, রাজাকে খবরটা জানাতে।

বন্যা রোধ করার জন্য সব রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হ'ল।

তারপর বন্যা যখন এল, তখন সে বন্যা আর দেশের কিছু ক্ষতি করতে পারলো না।

রাজা এর পর দা ত্রাং-কে ডেকে পাঠালেন।

দা ত্রাং এসে যখন মাথা নীচু করে দাঁড়ালো, রাজা তখন তাকে অভয়বাণী দিয়ে বললেন, 'তোমাকে মুক্তি দেব আমি। তুমি কী করে ভবিষ্যৎবাণী করছো বল।'

দা ত্রাং তখন সব কথা খুলে বললো। রাজা শুনে তো অবাক। তিনি দা ত্রাং-কে মুক্তি দিয়ে ওকে নিজের পার্শ্বচর করে রেখে দিলেন রাজপুরীতে। রাজা প্রায়ই ওকে জিজ্ঞাসা করতেন, কোন্ প্রাণী কখন কী কথা বললো। দা ত্রাং সব কথাই বলতো। শুনে শুনে রাজার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল যে, অনেক-অনেক ব্যাপারে মানুষের চেয়ে ঢের বেশী সভ্য ঐ সব জীবজন্তু। মানুষ যেমন নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য কিংবা অকারণেই মানুষ খুন করতে পারে, পশুরা তেমন পারে না।

একবার রাজা গেলেন নৌকা ভ্রমণে। দা ত্রাং-ও সঙ্গী হ'ল। নীল সমুদ্রের বুকে নৌকা চললো ভেসে। নৌকার চারপাশে মাছের মেলা। ওরা মেছো ভাষায় কত কী বলছে। দা ত্রাং কান পেতে শুনছে সব কিছু। হঠাৎ একটি শুশুক গান গাইতে গাইতে নৌকোর পাশ দিয়ে চলে গেল—

> 'সাদা মেঘ সাদা মেঘ
> ভেসে বেড়াও ধীরে
> আকাশের ঐ নীল
> সমুদ্দুরে।'

দা ত্রাং একেবারে হো হো করে হেসে উঠলো। ভুলে গেল যে, তার মুখের মধ্যে মণি আছে। ওর হাসির চোটে মণিটা হঠাৎ মুখ থেকে ফস্কে জলে পড়ে গেল।

দা ত্রাং কান্নায় ভেঙে পড়লো। রাজাও বেশ দুঃখিত। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডুবুরীদের ডেকে পাঠালেন। সাতদিন সাতরাত ধরে সমুদ্দুরের তলায় আঁতিপাঁতি করে ডুবুরীর দল মণি খুঁজে বেড়ালো। কিন্তু পাওয়া গেল না সেই মণি। শেষ পর্যন্ত সমুদ্দুরের জল শুকিয়ে ফেলা হল, গাড়ী-গাড়ী বালি তোলা হল ডাঙায়, কিন্তু হারানো মণির কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

দা ত্রাং অনাহারে অনিদ্রায় শেষ পর্যন্ত মরেই গেল। মরে যাওয়ার পর তার আত্মা গিয়ে ঢুকলো ক্ষুদে কাঁকড়াদের মধ্যে। আর সেই দিন থেকেই ক্ষুদে কাঁকড়াদের নাম হয়ে গেল দা ত্রাং। ওরা এখনও বালি সরিয়ে সেই হারানো মণি খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু পাচ্ছে না, কিছুতেই পাচ্ছে না!*

---

* ভিয়েৎনামী উপকথা

রাজা হবুচন্দ্রের জুতো চুরি
চিত্রকাহিনী-সুফি

গভীর রাত্রি। রাজা হবুচন্দ্র নিদ্রামগ্ন।

এমন সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।
চিঁক্ চিঁক্
একি! আমার আর এক পাটি জুতো কোথায়!

প্রহরী! শীগ্গির মন্ত্রী গবুচন্দ্রকে খবর দাও!

গবুচন্দ্র তখন এক বাটি সিদ্ধি খেয়ে ঝিমুচ্ছিলেন।
মন্ত্রীমশাই মন্ত্রীমশাই

খবর শুনে, গবুচন্দ্র ছুটলেন রাজবাড়ীতে

সর্বনাশ হয়েছে গবু। আমার এক পাটি জুতো চুরি গেছে!

এক সপ্তাহের মধ্যে জুতো চোরকে ধরা চাই। নইলে তোমার গর্দান যাবে!

চোরের সন্ধানে ঢেঁড়া পড়লো সারা রাজ্যে।
চোর ধরে দিলে লক্ষ টাকা ইনাম, নইলে গর্দান...

চিন্তা করবেন না মহারাজ, আমাদের পাশের বঙ্গভাষী রাজ্য থেকে এক গোয়েন্দা আসছেন...

মহারাজের জয় হোক...

আরে এসো, এসো; ক্ষুদে গোয়েন্দা! স্বাগতম! তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ

ক্ষুদে গোয়েন্দা জুতো চুরির সব ঘটনা শুনলো।
ঘাবড়াবেন না মহারাজ। আপনার হারানো জুতো আবার আপনার পায়েই শোভা পাবে

এটা চুরি না যাওয়া আর এক পাটি জুতো। মহারাজ ফেলতেও পারছেন না, পরতেও পারছেন না
মণি মুক্তা খচিত অতি মুল্যবান জুতো!

তদন্ত শুরু হলো। ক্ষুদে গোয়েন্দার আতস কাচে অদ্ভুত পায়ের ছাপ ধরা পড়লো।
মানুষ, না ভূতের পা!

হুম, পায়ের ছাপ প্রাসাদের বাইরে চলে গেছে!

মহারাজ, আমার গোপন পরিকল্পনা শুনুন। চোর মনে হয় আর এক পাটি জুতোর লোভে আবার আসবে।
তার আগে আপনার সভাসদদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

ইনি হলেন সেনাপতি, নগর

-পাল, ... সবার শেষে পশুতত্ত্ববিদ পুন্ডরীকাক্ষ

রাত নিঝুম। রাজার শয়ন কক্ষে চোরের প্রতীক্ষায় ক্ষুদে গোয়েন্দা আর বাঘা এসিস্ট্যান্ট।
চুপ বাঘা, কেউ আসছে

চিঁক, চিঁক

ক্ষুদে গোয়েন্দা যা দেখলো।

পিছু নে বাঘা, ইঁদুরের গর্তে যাব!

রাজার জুতো চুরি করে পালায় এ তো আশ্চর্য ইঁদুর!
ইঁদুরটা ঐ বাড়ীতে ঢুকে গেল!
আমাকেও ঢুকতে হবে!

আয় রে আমার চিঁক চিঁক! বাহবা, রাজার জুতো এনেছিস!

অপূর্ব কারুকার্য! প্রাচীন হস্তশিল্পের নিদর্শন।

এবার জুতো জোড়া বিদেশে পাচার করে দেবো। লক্ষ লক্ষ টাকা পাবো!

শব্দ করিসনি বাঘা!

ঐ যাঃ, দিলি তো ফেলে!

কে রে জানালার পাশে..

তবে রে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

এদিকে বাঘা তখন রাজবাড়ীর দিকে ছুটেছে!

!
কীরে বাঘা, ক্ষুদে গোয়েন্দা কোথায়!

আরে ছাড়, ছাড় বাঘা! মহারাজ, ও যেন কিছু বলতে চাইছে!

আসুন, আমরা ওকে অনুসরণ করি।

খবরদার, এক পা এগোলেই একে খতম করবো!
হুম, চেনা চেনা মনে হচ্ছে!

আমার নিজের উদ্ধারের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

ক্ষুদে গোয়েন্দা চকিতে জুডো প্রয়োগ করলো।
গেছি!

ছি: ছি:, পুন্ডরীকাক্ষ তোমার এই তস্করবৃত্তি!
মুখোশ এঁটে বোম্বেটেগিরি

অপরাধী ধরা পড়েছে। পশুতত্ত্ববিদ পুন্ডরীকাক্ষ তার পোষা ইঁদুর দিয়ে এই চুরি করেছিল।
আমার কাজ শেষ। এবার বিদায় দিন মহারাজ।

ক্ষুদে গোয়েন্দার গল্প শেষ হলো।
রাজা হবুচন্দ্রের রাজ্যটা কোথায়রে দাদা?
!
(শেষ)

নীরদ হাজরার সম্পূর্ণ উপন্যাস
অচিন যুগের ভোরে

|| এক ||

অনেক অনেক কাল আগেকার কথা।

পৃথিবীর জন্মের পর কোটি কোটি বছর কেটে গেলেও তখনও মানুষের জন্ম হয়নি। এ পৃথিবী জুড়ে তখন পাহাড় অরণ্য নদ-নদী সমুদ্র। পাহাড় অরণ্যে বাস করত শত শত পশু-পাখী আর জলে যত জলচর প্রাণী। কিছু উভচর প্রাণী জলের রাজ্যে স্থলের রাজ্যে ঘুরে ঘুরে যেন পছন্দ করে ফিরত, ঠিক কোন জায়গায় গড়বে তার বাসা-গৃহ।

তখন পশু-পাখীরাও এতটা সভ্য হয়ে ওঠেনি। ওরা কেউ-ই তখনও বাসা বানাতে জানত না। ওরা বাস করত গাছের কোটরে, পাহাড়ের ফাটলে, মাটির গর্তে বা ঐ রকম কোন স্বাভাবিক আশ্রয়ে। কিন্তু এমন স্বাভাবিক আশ্রয়ের তো সীমা সংখ্যা আছে। তাই কিছুকাল বাস করতে করতে পাখীর সংখ্যা এত বেড়ে উঠল যে ঐ সব বাসায় তাদের আর কুলালো না। তখন শুরু হল মারামারি। বাসা দখলের পালা। যার শক্তি বেশি, সে গিয়ে দুর্বলের বাসা দখল করে নিতে লাগল। যারা দুর্বল তারা গৃহ-হারা হতে থাকল। দুর্বলের হাহাকারে অরণ্য পর্বতের আকাশ-বাতাস ভরে উঠল।

এমনিভাবেই বাসা হারিয়ে বনে বনে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এক বাবুই আর বাবুইনী।

একদিন, সেদিন বেশ গরম পড়েছে। দুপুর রোদে বাবুই বাবুইনী আর বাসার বাইরে যায় নি। বসেছিল পাহাড়ের গায়ে তাদের ছোট্ট বাসার কোটরটির ঝুল-বারান্দায়। এ বাসাটার ঠিক সামনে ঝুলে ছিল কতকগুলি পাহাড়ী গাছের শিকড়। বড়লোকের বাড়ির চিকের মত এই শিকড়গুলো এমন ভাবে বাসাটাকে ঢেকে রেখেছিল, যে বাইরে থেকে বাসাটাকে চট্ করে নজরেই পড়ত না; অথচ হাওয়া-বাতাস খেলত যথা পরিমাণে। বাসাটায় বাবুই বাবুইনী সুখেই বাস করত। সেখানে ওরা নিরাপদেই ছিল।

সেদিন দুপুরের মৃদু বাতাস ওদের ক্লান্তি দূর করে দিচ্ছিল। বাবুইনীর ডিম পাড়বার সময় হয়েছে। ডিম পাড়লে, বাচ্চা হলে, বাচ্চাদের কেমন করে লালন পালন করা হবে, কেমন কি নাম রাখা হবে এই সব ভবিষ্যতের আলোচনা করছিল দুজনে। এমন সময় বাবুইনী বলল বড্ড গরম লাগছে। শিকড়গুলো সরিয়ে দাও। আরও হাওয়া আসুক।

বাবুই হেসে বলল, শিকড়ে তো হাওয়া আটকায় না। ও তোর মনের গরম।

কিসের জন্য মনের গরম?

কেন? ডিম পাড়বি তার! মা হবি তার!

বাবুইনী চটে উঠল। বলল, মরণ আর কি! পাখী মাত্রেই ডিম পাড়ে। পাখী মাত্রেই মা হয়। তার আর গর্ব কি? তার আর গরম কি? সরাও শিকড়গুলো।

বাবুই আর কি করে। ডানা দিয়ে শিকড়গুলো টেনে এনে একটা পাথরের খাঁচে আটকে দিল। আর তাতেই হল বিপদ। এক জোড়া হলদে-সবুজ লাল ঝুঁটি পাখী যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। তারপর পুরুষ পাখীটা হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এই তো একটা বাসা।

মেয়ে পাখীটা বলল, এটা আমরা দখল করব।

বলে, বিন্দুমাত্র দেরী না করে পাখী দুটো ঢুকে পড়ল ওদের বাসায়। ঠেলে বের করে দিতে লাগল ওদের জিনিষ-পত্র, দূর করে দিতে লাগল ওদের ঘর-গৃহস্থালির টুকি-টাকি।

এসব জিনিষ বাবুইনীর বড় সাধের। বাবুইনী তাই চেঁচিয়ে উঠল, এসব হচ্ছে কি তোমাদের? এসব কি ধরনের অসভ্যতা?

বাবুইনীর কথায় তেড়ে এলো পুরুষ পাখীটা। এসে এক ঠোকোর বসিয়ে দিল তার মাথায়। ঠেলে ফেলে দিল তাকে।

বাবুই এবার আর সহ্য করতে পারল না। গর্জে উঠল, কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! একে বাসার ভিতর বে-আইনী প্রবেশ, তার ওপরে ভদ্রমহিলার গায়ে হাত? রাগে পালকগুলো ফুলিয়ে নিজেকে এত্তোবড় করে তুলে চোখ-মুখ পাকিয়ে রুখে দাঁড়াল বাবুই।

পাখী দুটো ভয় পেল কিনা কে জানে। তার আগেই বাবুইনী চেপে ধরল ওর ডানা। দিল এক টান। বলল, ওরে বাবুই। চলে আয়। ওরা পাখী নয়রে!. রাক্কস। এক ঠোক্করে আমার মাথাটা এক্কেবারে ফুটো করে দিয়েছে রে! আবার তোর মাথাটাও যদি ফুটো করে দেয়!

বাবুইনীর কথায় মনটা দুমড়ে গেল বাবুই-এর। ভারী দুশ্চিন্তা হ'ল। সত্যি! তার মাথাও যদি ফুটো করে দেয়! একটা বৈ দুটো মাথা তো কারো নেই। প্রাণে বাঁচলে এবং মাথা বাঁচলে বাসা অনেক পাওয়া যাবে। অতএব বাবুইনীর টানে ডানা মেলে দিল বাবুই। আর সেই থেকে গৃহহারা বাবুই বাবুইনী খুঁজেই চলেছে বাসা। খুঁজেই চলেছে। কিন্তু কোথায় বাসা? বাসা তাদের মিলছে না।

আজ, দুপুরের তীব্র রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে ক্লান্ত বাবুইনী এসে বসল মস্ত এক জারুল গাছের ছোট্ট এক ডালে। বাবুই এসে পাশের ডালে বসতেই দুই ডালে দোল খেয়ে গেল। সেই দোলায় বাবুইনীর চোখ গড়িয়ে নিটোল মুক্তার মত দু ফোঁটা জল পড়ল নীচের আয়নার মত ঝকঝকে হ্রদের জলে। তা দেখে বাবুই-এর বুকের ভিতরটা হুহু করে উঠল। বিধাতার কি অভিশাপ! কোথায় এখন তারা ঠান্ডা হাওয়ায় নিজের ঘরে বসে বিশ্রাম করবে, তা নয়, উদ্বাস্তু হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে বনে। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছে বাবুইনী। চোখ ঢুকে গেছে গর্তে। মুখের হাড় উঠেছে জেগে।

বাবুইনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ডিম পাড়বার ব্যবস্থা কি হবে?

বাবুই বলল, ব্যবস্থা একটা হবেই। আর ভেবো না। এই বলে একটা আঙুর ছিড়ে বাবুইনীর মুখে তুলে দিয়ে বাবুই বলল, খাও, খাও! একটু বিশ্রাম কর। উপায় একটা হবেই।

এমন সময় একটা প্রচন্ড ঠাঁই-ঠকা ঠক্ শব্দে চমকে উঠলেন বাবুই, বাবুইনী। বাবুইনী তো আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিল। ভাগ্যে বাবুই চেপে ধরেছিল তাকে ভয়ে,

নইলে দুজনেই পড়ে গিয়েছিল আর কি।

ভয় যখন কমল, বুকের কাঁপন যখন থামল, তখন তারা দেখল, সেই হলদে-সবুজ লাল ঝুঁটি পাখী দুটো একটা গাছের বাঁকল পায়ের নখে চেপে ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে হা-হা করে হাসছে আর মাঝে মাঝেই ঠাই ঠকা ঠক্ মাথা ঠুকছে গাছের বুকে।

বাবুইনী সে দিকে তাকিয়ে ভয় পেল। বাবুই-এর কানে কানে বলল, দেখো, সেই শত্তুর জোড়া! ঘুরে ফিরে আবার এখানে এসেছে আমাদের কাছে। কি চায় ওরা! অমন হাসছেই বা কেন? আর গাছের গায়ে মাথাই বা ঠুকছে কেন? ওরা কি পাগল হয়ে গেছে?

বাবুই নিজেও সেই কথাই ভাবছিল। তার ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞেস করতে যে তারা অমনভাবে মাথা ঠুকছে কেন? কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করলে যদি চটে যায়? যদি আবার তেমনভাবে ঠুকরে দেয় মাথা! দেখতে সুন্দর হলে কি হবে? পাখী দুটো মোটেই সুন্দর নয়—বেহায়া আর বিচ্ছিরি। আর তার চাইতেও বিচ্ছিরি শক্ত ওদের ঠোঁট দুটো।

বাবুইনী তার কথার কোন জবাব না পেয়ে চটে গেল। ডানা দিয়ে এক ঠেলা দিয়ে বলল, কি গো! জবাব দিচ্ছ না যে? কেমন পুরুষ তুমি?

বাবুইনী দিল তার পৌরুষে ঘা! বাবুই গেল চটে। বলল, আমরা বাবুই পাখী! আমরা ভয় কারে কয় জানি নে। সেই আমরা ভয় পাব একটা সামান্য হলদে সবুজ পাখীকে? ফুঃ! এই না বলে রীতিমত বুক ফুলিয়ে বাবুই চেঁচিয়ে উঠল, ওরে হলদে-সবুজ পাখীর জোড়া! বলি, এখানে এতো হাসির কারণটা কি ঘটল জানতে পারি কি? আর এত মাথা ঠোকাই বা কেন?

সেই কথা শুনে পাখী দুটো আরও জোরে হেসে উঠল। তারপর, তাদের ভেতর মেয়ে পাখীটা ঘাড় দুলিয়ে, লেজ ঝুলিয়ে ডানা খেলিয়ে ফিক্ করে হেসে বলল, হাসছি তোমাদের ভয় পাওয়া দেখে। আর হাসছি তোমাদের জড়াজড়ি করে পড়া দেখে।

বাবুই-বাবুইনী সে কথা শুনে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, আমরা মোটেই ভয় পাইনি। বাবুইরা মোটেই ভয় পায় না।

তাদের সে কথা শুনবার আগেই পুরুষ পাখীটা বিকট গলায় ধমকে উঠল, আচ্ছা বুদ্ধু তো তোমরা! তোমাদের কি চোখ নেই?

বাবুইনী বলল, কেন?

দেখত পাওনা? বলল পুরুষ পাখীটা। দেখছ আমরা ঠোঁট দিয়ে গাছ ঠোকরাচ্ছি। তবু চেঁচাচ্ছো মাথা ঠুকছি। আমাদের কি ডিম ভেঙেছে যে, মাথা ঠুকব!

মেয়ে পাখীটা সেই কথা শুনে মাথা ঝামটা দিয়ে, নাকের নথ দুলিয়ে বলল, আচ্ছা অলক্ষুণে কথাবার্তা তো তোমাদের। দেখছ আমরা কাঠ ঠুকরে বাসা তৈরী করছি।

মেয়ে পাখীটার কথা শুনে বাবুইনীর মনে যেন আলো খেলে গেল। তারাও তো বাসার জন্য ভেবে মরছে। তবে তারাও তো ওদের মত নিজেরাই বাসা তৈরী করে নিতে পারে। এতদিন তারা তৈরী বাসা খুঁজেছে দেখেই তো পায়নি। বাসা তৈরী! ভাবতেই দেহ মনে আনচান করে উঠল বাবুইনীর। কি আনন্দ! তাদের বাসা তারা নিজেরাই তৈরী করবে।

বাবুইনী যখন এইসব কথা ভাবছে, বাবুই ততক্ষণে কাঠ-ঠোকরা পাখী দুটোকে সন্দেহের চোখে লক্ষ্য করছে। পাখী দুটোর বাসা তৈরীর ব্যাপারটা তার কাছে ফাঁকি বলে বোধ হল। ওদের তো বাসা আছেই। তাদের তাড়িয়েই তো ওরা বাসা দখল করেছে। তবে? বাবুই আর থাকতে পারল না। বলল, মিথ্যে বলছ কেন? তোমাদের তো বাসা আছেই। আমাদের তাড়িয়েই তো বাসা দখল করেছ তোমরা।

বাবুই-এর কথা শুনে কাজ থামিয়ে পুরুষ পাখীটা তাকাল ওর দিকে। বলল, বটেই তো! তোমাদের বাসা দখল তো করেছিলামই। বাসাটাতে সুখেই ছিলাম। কিন্তু যতই সুখ হতে থাকল ততই তোমাদের জন্য দুঃখ হতে লাগল। আর ততই ভয় হতে থাকল যে আবার অন্য পাখী এসে যদি আমাদের তাড়িয়ে দেয়!

বাবুইনী বলে উঠল, দেবেই তো। দেওয়া উচিত। যেদিন তাড়িয়ে দেবে সেদিন আমরা খুশী হব।

পুরুষ পাখীটা বাবুইনীর কথায় চটল না। বরং একটু হাসল। বলল, তুমি খুশী হয়ো, তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হবে না। এক পাখী অন্য পাখীকে তাড়িয়ে বাসা দখল করলে সমস্যা বেড়েই যাবে। তাই আমরা স্থির করলাম, আমরা নিজেরাই নিজেদের বাসা তৈরী করব বুঝেছ?

মেয়ে পাখীটা বলল, তারপর শিখিয়ে দেব সব কাঠ-ঠোকরাদের। আমাদের আর বাসার অভাব থাকবে না। এই বলে মেয়ে পাখীটা ঠকাঠক কাঠ ঠোকরাতে লেগে গেল। পুরুষ পাখীটাও তার সাথে কাজে লেগে গেল।

বাবুই বাবুইনী ওদের কথায় এত অবাক হয়ে গেল যে ওদের মুখ দিয়ে কথা সরল না। ওরা দুচোখ বিস্ফারিত করে তাকিয়ে দেখতে লাগল ওদের কাজ। ওরা দেখল একটু একটু করে গাছের বুকে গর্ত তৈরী হল। পাখী দুটো তার ভেতরে গলা ঢুকিয়ে গড়ে তুলল গোপন কুঠুরী। তারপর দুজনে আনন্দে গাইতে গাইতে হাত ধরাধরি করে ঢুকল সেই বাড়িতে। বাবুই বাবুইনীর চোখের সামনে ওদের নূতন বাসার গৃহ প্রবেশ হল।

দেখে শুনে বাবুইনী বলল, বাবুইরে!

বাবুই বলল, কি-রে বাবুইনী!

আমরাও ঐ রকম বাসা করব!

ঠিক বলেছিস। আমরাও ঐ রকম বাসা তৈরী করব। তারপর শুধু বাবুইদের নয়, সমস্ত রকম পাখীদের শিখিয়ে দেব বাসা তৈরী করতে। পাখীদের আর বাসার সমস্যা থাকবে না।

বাবুইনি বলল, বড় সুন্দর কথা বলেছিস বাবুই। তাহলে কোন পাখীরই আর দুঃখ থাকবে না। আর কেউ বাসা হারাবার দুঃখ পেয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে নারে!

বাবুই-বাবুইনীর মন আনন্দে দুলে উঠল। বাবুই প্রাণের আবেগ আর চেপে রাখতে পারল না। ছুটে গিয়ে গাছের গায়ে বসিয়ে দিল এক ঠোক্কর। আর সাথে সাথে, ওরে বাবারে, গেছিরে বলে চেঁচিয়ে লাফিয়ে একসা করে দিল। ওর ঐ নরম ঠোঁটে গাছে ঠোক্কর সইবে কেন? ঠোঁট বুঝি ভেঙেই গেল।

বাবুইনীরও সেই সন্দেহ হয়েছিল। তাই সে তাড়াতাড়ি একটা ডানা নেড়ে হাওয়া দিতে থাকল আর অন্য ডানা দিয়ে আহা-হা ষাট, ষাট বলে আদর করতে থাকল। সেই আদরের চোটে বাবুই কেঁদেই ফেলল। বলল বাবুইনী-রে! আমার ঠোঁট দুটো বুঝি গেছে-রে! ঠোট ছাড়া আমি কি করে বাঁচব রে! লোকে যে আমাকে ঠোঁট কাটা বলবে রে! হায়, হায়! কেন যে তার বুদ্ধি শুনতে গেলাম রে!

বুদ্ধির দোষ ধরায় বাবুইনী গেল চটে। বলল বোকামী করলে নিজে, আর হল আমার বুদ্ধির দোষ। বেশ! তবে থাক তোমার বুদ্ধি নিয়ে। বলে, বাবুইনী উড়ে গিয়ে বসল আর এক ডালে। রাগে দুঃখে তার দুচোখে নামল জলের ধারা। আর তা টপ টপ করে নীচের দীঘির জলে পড়তে লাগল।

বাবুইনী চলে যেতেই বাবুই-এর চমক ভাঙল। সে বুঝল, ভারী অন্যায় কথা বলে ফেলেছে। অনুশোচনায় তার নিজের ব্যথা ভুলে গেল সে। তাড়াতাড়ি গিয়ে বসল বাবুইনীর পাশে। এমন সময় তার নজর পড়ল নীচের জলে। দেখল, তার ঠোঁট ঠিক আছে। আনন্দে চিৎকার করে উঠল বাবুই, বাবুইনীরে! এই দেখ আমার ঠোঁট ঠিক আছে।

ঠোঁট ঠিক আছে কথাটা কানে যেতেই বাবুইনীও কান্না ভুলে তাকাল। তাকিয়ে দেখে বলল, তাই তো! ঠোঁট ঠিক থাকার আনন্দে দুজনে হাসতে থাকল। সেই হাসিতে দুঃখ-অভিমানের মেঘ কোথায় উড়ে গেল। দুজনে আবার বাসার কথা ভাবতে বসল।

অনেকক্ষণ পর গালে ডানা ঠেকিয়ে ভাবতে ভাবতে বাবুইনী বলল, বাবুই! তোর ঠোঁটে লেগেছে কেন জানিস?

বাবুই বলল, জানি! কাঠের চেয়ে ঠোঁটটা নরম বলে। কাঠঠোকরা পাখী দুটোর লাগেনি। কারণ ওদের ঠোঁট গাছের চেয়ে শক্ত।

বাবুইনী বলল, ঠিক বলেছিস। তা হলে বাসা তৈরীর নিয়মটা কি হল বলতো!

বাবুই বলল, আ-রে! তাই-তো! এতক্ষণ তো আমার মাথাতে আসেই নি। এবার বুঝেছি ওরা কেন পাথরে বাসা না খুঁড়ে গাছে খুঁড়ল। আমরাও তবে গাছের চেয়ে নরম জায়গায় বাসা খুঁড়ব।

এই না ভেবে বাবুই বাবুইনী মেলে দিল ডানা। উড়তে উড়তে একেবারে বনের প্রান্তে কেয়া ঝোপের পাশে এসে বসল। একটা কাল কাসুন্দি গাছের ছায়ায় ছিল একটা ঢিপি। সেটাকে খুব পছন্দ হল বাবুইনীর। বলল দেখ, বাবুই! কি সুন্দর জায়গাটা।

বাবুই দেখল, সত্যিই ভারী সুন্দর জায়গাটা। কি মিষ্টি কেয়া ফুলের বাস ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। অদূরে দেখা যাচ্ছে একটা দীঘি। বাসা তৈরী করলে জলের অভাব হবে না।

বাবুই বলল, বাসা তৈরীর উপযুক্ত জায়গা, জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে!

বাবুইনী বলল, আমারও।

বাবুই বলল, আয়! তবে এখানেই বাসা খুঁড়ি।

বাবুইনী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর দুজনেই লেগে গেল বাসা খুঁড়তে।

খুঁড়তে খুঁড়তে বিকেল হয়ে গেল। ডাইনের সূর্য ঢলে পড়ল বাঁয়ে। দীঘির জল লাল হয়ে উঠল। কেয়া ঝোপের চারদিকে কে যেন ছড়িয়ে দিল লাল আবির। আধখানা থালার মত সূর্যদেব ভাসতে থাকলেন দীঘির জলে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাবুই তার বাসা খোঁড়া শেষ করল। বাবুইনী উড়িয়ে দিল বট পাতার পেল্লায় নিশান। আর দিল উলু। ঠিক সেই সময়েই সূর্য্যিদেব ডুব দিলেন দীঘির জলে। চারদিক অন্ধকারে ডুবে গেল। বাবুই বাবুইনী গিয়ে ঢুকল তাদের নূতন তৈরী বাসাতে।

।। দুই ।।

সেই কেয়া ঝোপের তলাতেই থাকত এক মহানাগ। তার মাথায় ছিল সাত রাজার ধন এক মানিক। সে তো মানিক নয়—সে যেন এক খন্ড চাঁদের কণা। একেবারে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। মহানাগ যখন সেই মণি খন্ড মাথায় করে দাঁড়াত, তখন মনে হত পৃথিবীতে যেন একটা নূতন সূর্য ছিটকে এসে পড়েছে। পশু-পাখী জীবজন্তু সবাই তা অবাক হয়ে দেখত। আকাশ পথে যেতে যেতে দেবতা—গন্ধর্বরাও থমকে থাকত কিছুকাল। তাদেরও পা নড়ত না।

কতজন লোভে পড়ে চুরি করতে এসেছে সেই ম্যানিক, কিন্তু মহানাগের বিষ নিশ্বাসে কাছে আসতে না আসতেই তারা শেষ হয়ে গেল। অবশেষে কোথা থেকে এলো এক গন্ধর্ব। দেবরাজ ইন্দ্র তাকে কোন কারণে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বর্গ থেকে। বেচারা মনের দুঃখে বনে ঘুরতে ঘুরতে ভাবছিল, কি করে সুখী করা যায় ইন্দ্রকে। কেমন করে তাঁর কাছ থেকে আবার স্বর্গে ফেরার অনুমতি লাভ করা যায়। এমন সময় তার নজর পড়ল মহানাগের মণির উপর। এমন মণি সে যদি দেবরাজকে উপহার দিতে পারে, তবে তার ওপর খুশী না হয়ে পারবেন না দেবরাজ। অতএব মণি-হরণের সুযোগের অপেক্ষায় রইল গন্ধর্বটি।

অবশেষে একদিন মহানাগকে দেখেই এক-তাল গোবর ছুঁড়ে দিল সেই গন্ধর্ব। মহানাগের চোখ গেল অন্ধ হয়ে। বেচারা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মাথা থেকে মণি নামিয়ে যেই গিয়ে নামল দীঘির জলে, অমনি মণি-খন্ড নিয়ে গন্ধর্বটি দিল ছুট্। জলে চোখ ধুয়ে ডাঙায় এসে আর মণি খুঁজে পেল না মহানাগ। সেই থেকে মণি হারাবার শোকে না খেয়েদেয়ে দিন কাটে মহানাগের।

আজ সকাল থেকেই নাকের কাছে একটা মিষ্টি গন্ধ পাগল করে তুলছিল মহানাগকে। কত দিনের না খাওয়ার ক্ষিধে পেটের নাড়িভুঁড়িগুলোকে পাকিয়ে অস্থির করে তুলছিল। উপবাসী জিভটা চেটে-বেটেও সে জিভের জল সামলাতে পারছিল না। আর তাই সূর্য ডুবতে না ডুবতে সেই মহানাগ গন্ধে গন্ধে এসে উপস্থিত হল বাবুই বাবুইনীর তৈরী নূতন বাসার ধারে। ওদের বাসার চারদিকে এক অশুভ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

সারাদিনের পরিশ্রমে বাবুই-এর চোখ দুটো তখন সবে বুজে এসেছে। সে ডানাটা এলিয়ে দিয়ে নাক ডাকিয়েছে

কি ডাকায় নি এমন সময় বাবুইনীর ঠেলায় তার ঘুম গেল পালিয়ে। বাবুইনী বলল, আমার কেমন বোধ হচ্ছে, এখুনি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে।

বাবুই দুবার জোর জোর নিশ্বাস নিল। বলল, ঠিক বলেছিস বাবুইনী। আমারও তাই বোধ হচ্ছে। কেমন একটা আঁসটে বোটকা গন্ধ।

বাবুইনী বলল, চল তবে পালাই।

বাবুই বলল, চল।

এই বলে যেই তারা গর্ত্ত থেকে বেরিয়েছে, এমনি মহানাগের ফণা আছড়ে পড়ল কাল-কাসন্দি গাছের ওপর। অন্ধ মহানাগ গাছের বাড়ি খেয়ে চিৎকার করে উঠল। তারই আতঙ্কে বাবুই বাবুইনী আরও জোরে চালিয়ে দিল তাদের পাখা। আর চিৎকার করতে লাগল, পালাও, পালাও। মহানাগ জেগেছে। পালাও! পালাও!!

সেই শব্দ কানে যেতেই খরগোস-হরিণ, শিয়াল-সজারু জাতের যত ছোট ছোট জন্তু ছিল আসেপাশে তারা দৌড়াতে লাগল। তারাও চিৎকার করতে লাগল, পালাও পালাও, মহানাগ জেগেছে।

সেই চিৎকারে জেগে উঠল হাতী-ঘোড়া, বাঘ-সিংহ, গন্ডার-জিরাফ জাতের প্রাণীরা। ব্যাপারটা বুঝবার আগেই তারা ছুটতে লাগল। ছুট—ছুট—ছুট। সমস্ত বন জুড়ে যেন এক দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। কেউ পড়ল। কেউ মরল। কারো হাত ভাঙল। কারো ভাঙল মাথা। সেই ভাঙ্গা-হাত, ফাটা-মাথা নিয়েই দৌড়াতে লাগল তারা। ওদের সকলের পালানর শব্দে যে মহাশব্দ তৈরী হল তাতে মহানাগ নিজেও ভয় পেয়ে গেল। সেও কিলবিল করে ছুটল কোন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। ভোর না হতেই সেই বন একেবারে ফাঁকা হয়ে গেল।

কেউ কোথাও রইল না।

।। তিন ।।

সেই বন থেকে অনেক অনেক দূরে পূব কোণে ছিল এক মস্ত পাহাড়। যেমন বিশাল তার বপু, তেমন গাঢ় ছিল তার রং।

সেই গোটা পাহাড় জুড়ে ছিল কাকেদের রাজ্য। সেখানে বাস করত শুধু কাকেরা। দাঁড় কাক, পাতি কাক, ছাই কাক, হাঁড়ি কাক—সে যে কত জাতের কাক, সে আর বলে শেষ করা যায় না।

থাকলে কি হবে! তাদের নিজেদের মধ্যে দলে দলে ছিল ভীষণ ঝগড়া। দাঁড় কাকেরা পাতি কাকের নিন্দে করত। পাতি কাক নিন্দে করত দাঁড় কাকের। ছাই কাক দেখতে পেলে ঠুকরে দিত হাঁড়ি কাকের মাথা। আবার হাঁড়ি কাক সুযোগ পেলেই ভেঙ্গে দিয়ে আসত ছাই কাকের ডিম। ফলে এক জায়গায় বাস করলেও তাদের মধ্যে মিল ছিল না মোটেই। একের দুঃখে অন্যে খুশী হত। একের সুখে অন্যের জাগত ঈর্ষা।

ওদের মধ্যে জন্মাল এক অদ্ভুত কাক। ছেলেবেলা থেকেই সে কেমন একটু উদাসী। সে আর আর কাক-শিশুর মত দিনরাত লাফিয়ে বেড়াত না। বা কিছু নিয়ে ঝগড়া করত না নিজেদের মধ্যে। যখন তখন ডানা মেলে দিত না আকাশে। বরং যখন পলাশ গাছে হাওয়া বইত, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। যখন হাল্কা হাওয়ায় কাঁপন জাগত দীঘির জলে, চেয়ে চেয়ে তার চোখে পলক পড়ত না। কি যে ভাবত সে আর কি যে করত, তার হদিস পেত না কেউ।

ওর বাবা ছিলেন দাঁড় কাকেদের মোড়ল। অন্য কাকেরা তার বাবাকে বলত, মোড়ল! ছেলেটা যে তোমার বিবাগী সন্যেসী হয়ে গেল! ছেলেটাকে সংসারী করতে চেষ্টা কর।

মোড়ল-গিন্নী তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতেন। বলতেন আ-হা-হা! বাছা আমার শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব। কপাল গুণে আমার কোলে এসেছে। তোমরা বল, ও বেঁচে থাক।

অন্য দাঁড় কাকেরা বলত, তা তো বটেই মোড়ল গিন্নী। আহা-হা বেঁচে থাক। তোমার কোল জুড়ে বেঁচে থাক।

এ কথা তারা মোড়ল-গিন্নীর মন রাখতে বলত না। এ কথা বলে তারা গর্ব বোধ করত। তারা অন্য কাকেদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, আছে তোদের মধ্যে এমন কেউ? দেবতার আশীর্বাদ না থাকলে অমন ছেলে জন্মায় না।

অন্য কাকেরা কিন্তু ঠাট্টা করত। দল বেঁধে লাফাতে লাফাতে যেতে যেতে হয়ত তারা দেখতে পেত, সে ঝরণার পাশে কোন ঢিপির ওপর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, অমনি শাণিয়ে উঠত ওদের জিভ। একজন হয়ত চিৎকার করে উঠত, দাঁড়ানন্দ মহারাজ কি—জয়! অন্যেরা সাথে সাথে তাকে ব্যস্ত হয়ে থামাত। এই, চুপ চুপ। ওঁর ধ্যান ভেঙ্গে যাবে। উনি দাঁড় কাকের বংশ উদ্ধারের তপস্যায় বসেছেন। চুপ!

দাঁড়ানন্দ সে সব কথা কখনও শুনতে পেত। কখনও শুনতে পেত না। শুনতে পেলে, হয়ত একটু দুঃখ পেত। শুনতে না পেলে তন্ময় হয়ে ভাবত, কাকেদের রাজ্যে এত বিভেদ কেন? কেন এত দল উপদল! কেন এত ঈর্ষা, ঘৃণা! কেন এত বিদ্বেষ! মনে মনে সে কাকেদের দেবতার কাছে প্রার্থনা করত, ঠাকুর! আমায় শক্তি দাও! বুদ্ধি দাও। আমি যেন এদের সব বিভেদ ভুলিয়ে দিতে পারি। সে উদ্দীপ্ত মনে প্রতিজ্ঞা করত, এক ধর্ম-রাজ্য পাশে সমস্ত বায়স বেঁধে দেব আমি।

এই প্রতিজ্ঞা করলেও দাঁড়ানন্দ ভেবে পেত না তার প্রতিজ্ঞা পূরণের উপায়। উপায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তার সব চিন্তা ভাবনা এলোমেলো হয়ে যেত। কেমন হতাশায় পেয়ে বসত তাকে। সে বুঝত বৃথাই প্রতিজ্ঞা করেছে সে। বৃথাই। পূরণ করতে পারবে কি সে! নিজের শক্তির ওপরেই সন্দেহ জাগত তার।

একবার সে সব কাকেদের মোড়লদের একত্রে ডেকে এক-সাথে আলোচনায় বসতে চেয়েছিল। তার বাবা তার অন্য সব প্রস্তাবে যেমন সমর্থন জানান, এ প্রস্তাবেও তেমন সমর্থন জানালেন। সে নিজে প্রত্যেক মোড়লের কাছে গিয়ে সকলকে একত্রে আলোচনায় বসতে অনুরোধ করেছে। কিন্ত কোন মোড়লই তাতে রাজী হননি। তারা বলছেন তোমার ইচ্ছেটাই ভাল। শুনে সুখীও হলাম। কিন্তু ও মিল হবার নয়। হলে বাপ-ঠাকুর্দার আমলেই হত।

কেউ বা আরও একটু এগিয়ে এসে বলতেন, বাপু-হে!

আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি বোকা ছিলেন? তারা যখন জাতিভেদ করে গেছেন, তখন তা ভালই। তুমি কি ভাব, এক জায়গায় বসে খানিক কথাকাটাকাটি করলেই দাঁড় কাক আর হাঁড়ি কাকে এক হয়ে যাবে? তাই কখনও হয়? তাই কখনও হয়েছে!

এ সব কথা শোনার পর দাঁড়ানন্দের মনটা ভেঙ্গে যেত। সে বুঝত এত সহজে সে মিলন হবার নয়। সে কঠিনের জন্য প্রস্তুত হত। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করত। সে গিয়ে বসত সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ে। তাকিয়ে দেখত, পর্বতময় কত ছোট বড় গর্ত। তার কোটরে কোটরে অসংখ্য কাক। কালো, কটা, পাংশুটে, ছাই—কালো রং-এর কত বৈচিত্র্য।

সেদিন ভোর হতে তখনও কিছু বাকী। পূব আকাশ সবে একটু ফিকে হয়েছে। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে কাক পাহাড়ের বুক জুড়ে। দু-একটা পাড়া জুড়ানো কাক শিশু জেগে উঠে সবে কা-কা করে চিৎকার করা শুরু করেছে। দাঁড়ানন্দ তাদের গর্তের সামনে দাঁড়িয়ে পূব দিকে তাকিয়ে ছিল সূর্য ওঠা দেখবে বলে।

তার চোখের সামনে ছড়ান কাক পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, থাক হাজার বিভেদ. কিন্ত শান্তির অভাব নেই এখানে। কত যুগ ধরে এত এত ঈর্ষা নিয়ে, ঘৃণা নিয়ে বাস করেছে কাকেরা। তবু এখানে কি শান্তি।

হঠাৎ লাল আলো ছড়িয়ে পড়ল কাক-পাহাড়ের গায়। সূর্য উঠলেন। দাঁড়ানন্দের কেন যেন মনে হল রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে কাক রাজ্য। শিউরে উঠল দাঁড়ানন্দ। হুহু করে কেঁদে উঠল দাঁড়ানন্দের মন। সত্যিই যদি তেমন হয়। সত্যিই যদি কেউ আক্রমণ করে কাক রাজ্য? তবে? তবে কি পারবে তারা বাধা দিতে?

মন যখন এমনিভাবে উদ্ভ্রান্ত, ঠিক সেই সময় তার কানে ভেসে এলো এক অদ্ভুত আওয়াজ। এ আওয়াজের কোন তুলনা খুঁজে পেল না সে। ক্রমেই বেড়ে উঠল আওয়াজ। চোখ কুঁচকে দূরে দিগন্তের দিকে তাকাল দাঁড়ানন্দ। হঠাৎ তার চোখে ভেসে উঠল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সে দেখল, হাজার হাজার জন্তু-জানোয়ার ছুটে আসছে কাক-পাহাড়ের দিকে। কি তাদের বেগ, যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে। কি তাদের উল্লাস। যেন সমস্ত অরণ্য পর্বত তাদের সাথে নাচছে। ওরা এসে পড়লে কাক-রাজ্যের কেউ কি বাঁচবে? কি করা যায়? কিভাবে বাঁচানো যায় কাক রাজ্য।

মন স্থির করে নিল দাঁড়ানন্দ। তারপর রাম ঘন্টায় দিল ঘা। চিৎকার করে উঠল, কাক-পাহাড়ের কাকেরা ওঠো। জাগো। মেলে দাও ডানা। হাজার হাজার জন্তু-জানোয়ার আক্রমণ করতে আসছে আমাদের দেশ! জাগো! ওঠো!!

তার চিৎকারে দিকে দিকে জেগে উঠল কাকেরা। দাঁড়-কাক, পাতিকাক, ছাইকাক, হাঁড়িকাক মায় ভূষুন্ডির কাক পর্যন্ত যে যেখানে ছিল জেগে উঠে চিৎকার শুরু করে দিল কা-কা। তারাও শুনতে পেল জানোয়ারদের চিৎকার আর দেখল ছুটে আসার দৃশ্য। আতঙ্কে তাদের ভাবনা লোপ পেল। ভুলে গেল জাতিভেদ, ভুলে গেল ঈর্ষা। যে দাঁড়ানন্দের অনুরোধ তারা মানেনি, আজ এই মুহূর্তে তারই নির্দেশ মনে হল দৈব-বাণীর মত। সমস্ত আকাশ জুড়ে এক খন্ড কালো মেঘের মত, নূতন জেগে ওঠা সূর্যের মুখের ওপর এক মস্ত কালো ছায়া ফেলে দাঁড়ানন্দের পিছন পিছন উড়ে চলল তারা। তলায় ছবির মত পড়ে রইল কাক পাহাড়।

সে দিকে তাকিয়ে কাকেদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তবু কাকিনীরা তাদের বাচ্চাদের কোলে নিয়ে উড়তে উড়তে মনে মনে আশীর্বাদ করতে লাগল দাঁড়ানন্দকে। সে দেখে সময়মত জানিয়েছিল বলেই তো রক্ষা পেল সবাই।

অনেক ঘুরে অনেক উড়ে চলল তারা। ভোরের রোদ চড়া হয়ে যেন পুড়িয়ে দিতে লাগল তাদের মাথা। গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠল তাদের। আশ্রয় চাই। আশ্রয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠল তারা।

উড়তে উড়তেই তারা এসে জড় হল দাঁড়ানন্দের পাশে। বলল, তুমিই বাঁচিয়েছ কাকেদের। এবার পরামর্শ দাও কোথায় থামা যায়, কোথায় থাকা যায়।

দাড়ানন্দ বলল, আমিও সেই কথাই ভাবছি। সূর্য উঠল মাথার ওপর। এবার না থামলে উপায় নেই। তবে একটা কথা আমি বেশ বুঝেছি। আমরা ডানাওয়ালা আর জন্তুরা পা-ওয়ালা। পায়ের শক্তিতে ওরা বড়। তাই স্থল-রাজ্য ওদের। ডানার শক্তিতে আমাদের পাল্লাদার নেই। তাই শূন্য-রাজ্য আমাদের। যতবার আমরা স্থল রাজ্যে বাসা বাঁধব, ততবার ওরা আমাদের আক্রমণ করবে।

একদল দাঁড়ানন্দের কথা সমর্থন করে বলল, ঠিক, ঠিক, ঠিক!

আর একদল টিটকিরি দিয়ে উঠল, বলিহারি। এবার তবে আমরা মেঘের ওপর প্রাসাদ তৈরী করব।

আর একজন তাদের সাথেই পাল্লা দিয়ে বলল, হ্যাঁ। এবার থেকে আমরা আকাশ-কুসুম চয়ন করব।

আর একজন বলে উঠল, ভাই সব এবার থেকে আমরা হিরের ফল খাব, মণিমুক্তার জল খাব। আর চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়ে জামা তৈরী করব।

ছোকরা কাকের দল হো হো করে হেসে উঠল। সব বিদ্রূপের খোঁচা নীরবে হজম করে উড়ে চলল দাঁড়ানন্দ।

উড়তে উড়তে, ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পড়ল সেই বনের ওপর—যে বন ছেড়ে পালিয়েছিল বাবুই বাবুইনী, পালিয়েছিল খরগোস-হরিণ, শিয়াল-সজারু, পালিয়েছিল হাতী-ঘোড়া, বাঘ-সিংহ, গন্ডার-জিরাফ এবং সব শেষে পালিয়েছিল মহানাগ।

বনটার চারদিকে ভাঙ্গা গাছপালা দেখে কেমন সন্দেহ হল দাঁড়ানন্দের। তারপর হিসেব কষল। অবশেষে নিশ্চিন্ত হল যে তারা ঐ জন্তুদের ফেলে যাওয়া বনেই এসে উপস্থিত হয়েছে। সে মনে মনে ভাবল, ভালই হয়েছে। ওরা দখল করেছে আমাদের রাজ্য। বিধাতা পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে এসেছেন ওদের রাজ্যে।

দাঁড়ানন্দ বলল, ভাইসব! এবার থামাও ডানা। নামব এখানে। আমরা এখানেই বাসা করব। এই বনই হবে আমাদের নূতন বাসভূমি। নূতন কাকরাজ্য।

দাঁড়ানন্দের কথায় ওড়ার গতি একটু থামিয়ে মাটির দিকে নজর দিতেই শত শত কোটর গুহা এই সব স্বাভাবিক বাসস্থান নজরে পড়ল কাকেদের। তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কত বাসা! তৈরী বাসা। হুররে!

দাঁড়ানন্দ সে চিৎকার থামিয়ে দিল। বলল, বাসা দেখে আনন্দ কোরে না। ও বাসা আমরা ব্যবহার করব না। এখন থেকে মাটিতে নামব না আমরা। থাকব ডালে ডালে। ঐ ডালই হবে আমাদের শূন্যের প্রাসাদ। তা হলে পা-ওয়ালারা হঠাৎ আক্রমণ করে আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

বৃদ্ধ কাকেরা দাঁড়ানন্দের কথায় ভারী খুশী হল। তারা দাঁড়ানন্দের প্রশংসা করতে থাকল। খানিক আগে যারা টিটকারি দিয়েছিল, তারা দাঁড়ানন্দের পাশে এসে বলল, ভাই আমাদের ক্ষমা করো। আমাদের আগেকার কথাগুলো আর মনে রেখো না।

।। চার ।।

কাকেরা এখন সেই রাজ্যেরই স্থায়ী বাসিন্দা। গাছের ডালে ডালে রাত কাটায় তারা। আয়েসী কাকেরা হেলান দেবার মত ডাল খুঁজে রাতে গা এলিয়ে দেয়। কেউ বা তিন মাথা ডালের খাঁজে গা ছেড়ে ঘুমায় আয়াসে। রাতের হাল্কা হাওয়ায় গাছের ডালগুলো মৃদু মৃদু দুলতে থাকে। কাকদের মনে হয় মায়ের কোলে শুয়ে দুলছে।

জায়গা পছন্দ হয়েছে কাকেদের। সুন্দর সতেজ অরণ্য। অরণ্যের ঠিক মাঝখানে একটা দীঘি। কি গভীর আর কি নিথর কালো তার জল। সেই কালো রং তাদের মনে পড়িয়ে দেয় কাক-পাহাড়ের কথা। কিন্তু সে কথা ভেবে মন খারাপ হবার আগেই ভারী মাছের লেজের ঝাপটায় দীঘির জল ছিটকে ওঠে আকাশের বুকে। রোদের কিরণে ঝিকমিক করে ছড়িয়ে পড়ে কতকগুলো সোনালী কুচি। একটা রামধনু রং-এর আবেশ খেলে যায়। মনে হয় মাছেদের রাজপুত দেওয়ালী উৎসবে উড়িয়ে দিয়েছেন হাউই বাজীর লেজের ছটা। সেসব দেখতে দেখতে এই কাকেরা ভুলে যায় কাক-পাহাড়ের কথা। এ বনটা যে তাদের এই সুখে তাদের মন গর্বিত হয়ে ওঠে। একমাত্র দাঁড়ানন্দ তখন ভাবতে থাকে একটা কৌশলে মাছ রাজপুত্রের সাথে ভাব জমাতে হবে।

এই দীঘিটার চারদিকেই কাকেদের ঘন বসতি। দীঘির পোকা-মাকড় আর ছোট ছোট মাছেরা ওদের পরম স্বাদের বস্তু। অবশ্য বনের পাশে ধান ভুট্টা মকাই জোয়ারের ক্ষেতের প্রতিও তাদের লোভ কম নয়। তবে জলের পোকা মাকড় বা মাছের কাছে ওগুলো নেহাৎ রোগীর খাবার।

এই বনের আর এক রকম আকর্ষণ হরেক রকম ফলের গাছ। আর ফলই বা কতো। স্বাদই বা কতো বিচিত্র ধরনের। কাকেরা খুশী। খুব খুশী।

বনের উত্তর কোণ জুড়ে কি এক রকম ফলের গাছের সার। কাকেরা সে ফলের নাম জানে না। সে সব গাছে পাতার চাইতে ফল ধরে বেশী। যখন সবুজ ফলে পাকা হলুদের ছাপ ধরে, বনের বাতাস আকুল হয়ে ওঠে তার গন্ধে। কাকেরা মাতালের মত ছুটে যায়। লক্ষ লক্ষ কাঁটা উচিয়ে গাছগুলো যেন বাধা দিতে চায়। কিন্তু সাধ্য কি সামান্য কাঁটার? কাকেরা কাঁটার বাধা এড়িয়ে গিয়ে আঘাত করে ফলে। সে আঘাতে ঠোঁটগুলো শিরশির করে কাঁপতে থাকে। কিন্তু ফলগুলো থাকে নির্বিকার। সে ফল কাকেদের ভোগে লাগে না।

ঐ ফলের সাথে যুদ্ধ করে প্রথম বছরে কাকেদের ঠোঁট গেল নড়ে। যন্ত্রণায় দল বেঁধে কাকেরা ছটফট করতে লাগল। রাজ্য জুড়ে ঠোঁট ব্যথার এপিডেমিক পড়ে গেল। দাঁড়ানন্দ বের হলেন বদ্দির খোঁজে। দক্ষিণ দেশে বদ্দি মিলল। তার ওষুধে সারল বটে ঠোঁটের ব্যথা কিন্তু ফল রইল অটল। যাবার সময় বদ্দি বলে গেলেন ও ফলের নাম বেল। কাক রাজ্যের স্মৃতিকারেরা তাড়াতাড়ি তাদের গ্রন্থে লিখলেন, বেল অতি নিকৃষ্ট ফল। উহা ভক্ষণ কাকেদের পক্ষে নিষিদ্ধ। আর তারই সাথে দাড়ানন্দ ঘোষণা করে দিলেন, বনের উত্তর প্রান্ত নিষিদ্ধ এলাকা। যে যাবে তার শাস্তি হবে পঞ্চাশ পাতা ধারাপাত লেখা অথবা সাড়ে সাত শত সিঁড়ি-ভাঙ্গা অঙ্ক। এই শাস্তির ভয়ে উত্তর বন জনশূন্য হয়ে পড়ে রইল।

এই সুন্দর রাজ্যে এসে কাকেদের মধ্যে আর বিরোধ নেই। এখন আর দাঁড়কাক ছুতো পেলেই নিন্দে করে না পাতিকাকেরা। পাতিকাকও নিন্দে করে না দাঁড়কাকের। ছাইকাক ঠুকরে দেয়না হাড়িকাকের মাথা, হাঁড়িকাকও সুযোগ পেলেই ভেঙ্গে দেয় না ছাইকাকের ডিম। ওরা সবাই একত্রে দাঁড়ানন্দের বশ্যতা মেনে নিয়েছে। তাকে বানিয়েছে রাজা।

এখন দাঁড়ানন্দের কেটে গেছে সেই উদাসী ভাব। পাতিকাকেদের বড় মোড়লের বড় মেয়ে রূপসী কাকিনীকে বিয়ে করে সে এখন ঘোর সংসারী। এখন কেউ আর তাকে দাঁড়ানন্দ বলে বিদ্রূপ করে না। এখন তার নাম মহারাজাধিরাজ বিশ্ব-বিজয় বায়সপতি। ছাইকাকেদের প্রধান মোড়ল দীর্ঘ-চঞ্চু জং-বাহাদুর ছাই এখন এ রাজ্যের প্রধান অমাত্য। আর হাঁড়িকাকেদের মধ্যে থেকে উচ্চ পুচ্ছ মহা-বিক্রম হাঁড়ি হয়েছেন প্রধান সেনাপতি। এদের সমবেত চেষ্টায় কাক রাজ্যে কোথাও কোন অভাব নেই—অশান্তি নেই।

এই রাজ্যে গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, আসে শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রূপের হয় নিত্য নূতন বিবর্তন। গাছের ডালে বাস করে কাকেদের সইতে হয় দুর্ভোগ। গ্রীষ্মের হাওয়া বয়—দর দর করে ঘাম ঝরতে থাকে কাকেদের। খরতাপে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। শীত এসে হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে যায় তাদের, বুড়ো কাকেরা টপাটপ মরে পড়ে। বর্ষার জল তাদের সব সুখ নির্মূল করে দেয়।

গাছের ডালে বাস করতে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হয় ডিম পাড়বার সময়। ডালে কোথায় পাড়বে ডিম! অতএব ঐ সময় কাকিনীদের নামতেই হয় মাটিতে। কোন কোটরে বা মস্ত গুহায় সব কাকিনীরা ডিম পাড়ে। মহা-বিক্রম তাঁর পাইক বরকন্দাজ পাঠান সেই ডিম গুহায়। তারা নাওয়া খাওয়া ভুলে পাহারা দেয়। বাচ্চাগুলো বড় হয়ে উড়তে শিখলে তবে তাদের ছুটি।

এই একটি বিষয়ে বায়সপতির মনের অশান্তি যায় না। তিনি অমাত্যকে ডেকে বলেন, উপায় কর।

অমাত্য ডেকে পাঠান রাজ্যের পন্ডিতদের। বিদেশ

থেকেও পন্ডিতরা এসে উপস্থিত হন। দীঘির পাড়ে বট গাছের ডালে ডালে বসে তাঁদের বৈঠক। পন্ডিতেরা নস্যি নেন, টিকি নাড়েন এবং ভাবেন কিভাবে আটকানো যায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষাকে।

কেউ বলেন, আকাশটাকে ঢেকে দেওয়া হোক।

কেউ বলেন, তৈরী করা হোক মস্ত খাঁচা আর আমরা গিয়ে ঢুকি তাতে।

কেউ ওসব চিন্তায় বাধা দিয়ে বলেন, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা আটকান অনুচিত। শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

কেউ বলেন, ওতে স্বাস্থ্য খারাপ হবে। ও চিন্তা বর্জন করা উচিত।

প্রধান অমাত্য এসব সংবাদ পৌঁছে দেন বায়সপতির কাছে। সব শুনে বায়সপতি বলেন, যতো সব অপদার্থ। জানে না কিছু। শুধু মাইনে চায়। দাও ওদের টিকি কেটে।

প্রধান সেনাপতি উচ্চ-পুচ্ছ মহা-বিক্রম হাড়ি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কেটে দিলেন সকলের টিকি। লজ্জায় মাথা হেঁট করে ফিরে গেলেন কাক-পন্ডিতেরা।

সেদিন, এক গ্রীষ্মের সকালে, বায়সপতি তাঁর অন্দর মহলের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। সারা রাত তাঁর ঘুম হয়নি। মহারাণী রূপসীর সখিরা তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। আরামে বায়সপতির তন্দ্রার আমেজ আসছিল। তিনি এই ভোরে আর একবার শুতে যাবেন কিনা তাই ভাবছিলেন। এমন সময় একটা হেই হেইও, হেই হেইও আওয়াজে সে আমেজ গেল নষ্ট হয়ে। বায়সপতি চিৎকার করে উঠলেন, কে-রে বেয়াদপ! দিলি আমার ঘুম ভাঙিয়ে।

এই বলে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, সামনের আম ডালে এক সার পিঁপড়ে কি সব জিনিষ সামনের দুই পায়ে চেপে ধরে পিছনের চার পায়ে ঠেলে নিয়ে চলেছে। সেই ঠেলার তালে তালে তারা চিৎকার করছে হেই হেইও। হেই হেইও।

একটু ভাল করে দেখতেই বায়সপতির নজরে পড়ল, তাদের ভেতরে একজনের কোমরে ইয়া বড় এক তলোয়ার। মাথায় তার উষ্ণীষ। সে কিন্তু কাজ করছিল না। সে কাজের তালের সাথে তাল রেখে মাঝে মাঝেই বলে উঠছিল, মারো ঠেলা। আর অন্যেরা সাথে সাথে ঠেলা মারছিল আর বলছিল, হেই, হেইও। হেই, হেইও।

তলোয়ার বাঁধা পিঁপড়েটিকে দেখে বায়সপতি বুঝলেন সে কোন রাজপুরুষ। না দেখেশুনে বেয়াদপ বলে চেঁচিয়ে ওঠার জন্য এবার লজ্জা হল বায়সপতির। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি বুঝলেন, তাঁর কথা পিঁপড়েদের কানে যায়নি। তারা নিজেদের কাজে মশগুল হয়ে আছে। বায়সপতি স্বস্তি পেলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই সম্ভ্রান্ত পিঁপড়ের সামনে এসে বললেন, হে বীরপুরুষ! আপনাদের পরিচয় কি? এসব কি কাজই বা করছেন আপনারা?

বায়সপতির কথায় বড় খুশী হল রাজপুরুষ পিঁপড়েটি। সে দুপা এগিয়ে এসে অভিবাদন করল। তারপর বলল, আমরা পিঁপড়ে-রাজ বিষমূল শর্মার কর্মীদল, আমি তাঁর কর্মাধ্যক্ষ। গ্রীষ্ম এসেছে। সামনে বর্ষা। আমরা তাই রাজধানী বদল করছি। নূতন রাজধানীতে বর্ষার জল আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

বায়সপতি বিস্মিত হলেন। বললেন, বলেন কি! বর্ষার জল আপনাদের ক্ষতি করতে পারে না?

কর্মাধ্যক্ষ বললেন, না। বিশ সহস্র বৎসরেরও বেশি কাল সুসভ্য আমরা। আমরা এমনভাবে গৃহ-নির্মাণ করতে জানি যে কোন ঋতুই আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

কর্মাধ্যক্ষের কথা শুনতে শুনতে বায়সপতির মনে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পিঁপড়েরা তা হলে গৃহ 'নির্মাণ' করে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার হাত থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে জানে! তাহলে কৌশল জানলে শীত-গ্রীষ্মের হাত থেকে বাঁচা যায়! বায়সপতির মন দুলে উঠল। তিনি আত্মমর্যাদা ভুলে ভিক্ষুকের মত বলে উঠলেন, হে কর্মাধ্যক্ষ! আপনি এই গুপ্ত বিদ্যা আমাদের দান করুন। কাক-কুল আপনার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে।

কর্মাধ্যক্ষ বললেন, শেখান না-শেখান সব কিছু রাণী-মার ইচ্ছা। তিনি আদেশ করলে আমরা আপনাকে নিশ্চয় শিখিয়ে দেব। আপনি রাণীমার কাছে দূত প্রেরণ করুন।

বায়সপতি বললেন, দূত নয়। আমি বায়সপতি, স্বয়ং যাব আপনাদের রাণীমার কাছে। এই বলে সেই অবস্থাতেই কর্মাধ্যক্ষের সাথে বায়সপতি এসে উপস্থিত হলেন পিঁপড়ে রাজ্যের সিংহদ্বারে।

তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে কর্মাধ্যক্ষ গেলেন রাণীমার মত জানতে। রাণীমা সব শুনে ঘাড় নেড়ে বললেন, না এ বিদ্যা তিনি আর যাকেই দেন না কেন, কাকেদের দেবেন না। কাকরা অন্ত্যজ। তারা দু-পেয়ে।

কর্মাধ্যক্ষ মুখ ম্লান করে ফিরে এলো। বায়সপতিকে জানালো রাণীমার কথা। সে কথা শুনে কালো মুখও অপমানে রাঙা হয়ে উঠল বায়সপতির। তিনি বললেন, বিদ্যা দাও না-দাও সে তোমাদের ইচ্ছা। তাই বলে অন্ত্যজ বলো না। সাবধান।

রাণীর সখি এসেছিল কর্মাধ্যক্ষের পিছন পিছন। বায়সপতির কথায় কোমরে আঁচল জড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বলব না মানে! আলবৎ বলব। একশবার বলব। দু-পেয়োকে অন্ত্যজ বলব না কি কুলীন বলব। এই তো বলছি অন্ত্যজ, অন্ত্যজ, অন্ত্যজ.........

রাণীর সখির কথা শুনে সরোষে গর্জে উঠলেন বায়সপতি। তিনি উচ্চ-পুচ্ছকে ডাকলেন। বললেন, এই মুহূর্তে আক্রমণ কর পিঁপড়ে রাজ্য।

উচ্চ-পুচ্ছ সংকেত জানিয়ে দিলেন। মুহূর্তে কাকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিমমুখে সারিবদ্ধ পিঁপড়েদের ওপর। শত শত পিঁপড়ে এক লহমায় কাকেদের পেটে চলে গেল। রাণীর সখি হায় হায় করতে করতে ছুটছিল রাণীকে সংবাদ দিতে, উচ্চ-পুচ্ছের ঠোঁটের চাপে তার সে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হল না।

।। পাঁচ ।।

বায়সপতির মনে সুখ নেই।

সেই উদ্ধত পিঁপড়ে রাণীর কথা শোনার পর থেকেই বায়সপতির মনের সুখ চলে গেছে। সামান্য পিঁপড়েরা

শীত-গ্রীষ্ম বর্ষাকে শাসন করতে শিখেছে, আর তাঁরা? এক হিসাবে তাঁরা তো অন্ত্যজই থেকে গেছেন। সভ্যতায় অন্ত্যজ। যেমন করেই হোক গৃহ-নির্মাণ কৌশল শিখতে হবে। কাক সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বায়সপতির মনে এক চিন্তা। এক তন্ময়তা।

এই বায়সপতির দিকে তাকিয়ে বুক কাঁপে রাণী রূপসীর। রাজমাতা গোপনে চোখ মোছেন। আবার কি আগের মতো বিবাগী হয়ে যাবে ছেলে? রাণী-রাজমাতায় গোপন পরামর্শ হয়। রূপসী নানাভাবে মন ফেরাতে চেষ্টা করে বায়সপতির। কিন্তু সে মুখে হাসি ফোটে না। সখিদের কল-কণ্ঠের সংগীত তাঁর কানে ঢোকে কিনা সন্দেহ। বায়সপতি দিনরাত বিভোর হয়ে থাকেন।

বর্ষাকাল। গোটা বর্ষায় বড়ই বিব্রত হয়েছে কাকেরা। গত সাতদিন একটানা বৃষ্টি হয়েছে। আজ সবে বৃষ্টি ধরেছে। রোদ ঝিকিমিকি করে উঠেছে। সেই রোদে চুল শুকোচ্ছিলেন মহারাণী রূপসী। পাশে বসেছিলেন বায়সপতি। নাক মুখ কুঁচকে ভীষণ বিরক্তির সাথে রূপসী বললেন, বাব্বা, বাব্বা! কবে যে এই প্যাঁচপেচে বর্ষাকালটা যাবে!

রূপসীর কথা কানে যেতেই বায়সপতির মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। তিনি যদি জানতেন পিঁপড়েদের মত গৃহ-নির্মাণ কৌশল! তাহলে রূপসী রাণীর এ ক্ষোভ থাকত না। বর্ষা তাহলে বিরক্তির না হয়ে হত উপভোগের। বায়সপতি দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাজসভায় গিয়ে বসলেন।

রাজসভাতেও মন ভাল হল না তাঁর। তিনি সারাক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর হয়ে যা কিছু কাজ করবার করলেন অমাত্য দীর্ঘচঞ্চু জং বাহাদুর ছাই। কাজ যখন শেষ হল, অর্থী-প্রার্থী যখন আর রইল না, তখন বায়সপতি বললেন, মন্ত্রীবর! আমি তপস্যায় যাব। আপনি ব্যবস্থা করুন।

মহারাজের কথা শুনে সভাসদেরা হাহাকার করে উঠল। তারা প্রায় কেঁদে ফেলল। বলল, সে কি কথা মহারাজ! কিই বা বয়স আপনার। এই কি তপস্যা করবার সময়! আর কিসের জন্যই বা তপস্যা!

তাদের কোলাহল থামিয়ে দীর্ঘচঞ্চু বললেন, মহারাজ! আপনার তপস্যায় বসবার কারণ কি মহারাজ? কি তার উদ্দেশ্য?

বায়সপতি বললেন, আমার মনে সুখ নেই। আমার আত্মীয়-বন্ধুরা, আমার প্রজারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় কষ্ট পায়। তারা গৃহ-নির্মাণ করতে পারে না। আমি গৃহ-নির্মাণ কৌশল জানবার সাধনায় গৃহত্যাগ করব।

বায়সপতির কথায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। প্রজার মঙ্গলের জন্য রাজা নিজে তপস্যায় গেছেন, এত বড় আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। বায়সপতি তা পারেন। তিনি সিংহাসনে বসেও প্রায় বিবাগীর মত জীবন কাটান। সকলে বায়সপতির জয়ধ্বনি দিল।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ! আপনি গৃহ-নির্মাণ কৌশল জানতে চান, এ তো অতি উত্তম কথা। এর জন্য তপস্যার কি প্রয়োজন?

বায়সপতি বললেন, তবে?

অমাত্য বললেন, এর জন্য দেশ ভ্রমণে চলুন মহারাজ। তা হলেই দেখা যাবে, কোন কোন পাখি গৃহ-নির্মাণ জানে কিনা, কিংবা অন্য কোন পক্ষীকুল এমন কথা চিন্তা করছে কি না। মহারাজ! সত্যই যদি কোন পক্ষীকুল এমন উপায় জানে তবে তাদের কাছ থেকে এই গুপ্ত বিদ্যা নিশ্চয় উদ্ধার করা যাবে। এতেও যদি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে না হয় তপস্যায় বসবেন মহারাজ!

সভাসুদ্ধ চিৎকার করে উঠল, অতি উত্তম কথা। সাধু, সাধু, সাধু।

রাজা বললেন, বেশ তবে তাই হোক। তপস্যা নয়—দেশভ্রমণ।

রাজ্য জুড়ে সাজসাজ রব পড়ে গেল। রাজা চলেছেন দেশ ভ্রমণে। যে সে দেশ ভ্রমণে নয়—প্রজাদের মঙ্গল চিন্তায় দেশ ভ্রমণ। রাণীমা এমন কি রাজমাতাও ভ্রমণের উদ্দেশ্যের কথা শুনে আনন্দের সাথে সম্মতি দিয়েছেন। সকলে শুভেচ্ছা এবং মঙ্গল কামনার মধ্যে বায়সপতি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলেন।

এদিকে রাণীমা এবং রাজমাতা মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গল কামনা করে পুজা দিতে লাগলেন। পুরোহিতেরা বেশী বেশি করে কং কাং কঃ কঃ বলে মন্ত্র পাঠ শুরু করলেন। অবশেষে শুভক্ষণে, শুভদিনে লোক লস্কর সেপাই বরকন্দাজ মন্ত্রী সেনাপতি সংগে নিয়ে রাজা দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন।

।। ছয় ।।

বিশ্ববিজয় বায়সপতি চলেছেন দেশ ভ্রমণে। সংগে চলেছেন মন্ত্রী-সেনাপতি লোক-লস্কর সেপাই-বরকন্দাজ। সামনে রাজ বাদ্যকরেরা বাজিয়ে চলেছে কাঁসর-ঘন্টা, ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া, তুরী-ভেরী দামামা, কাঁসি-বাঁশি, খোল করতাল মৃদংগ জগঝম্প। সেই শব্দে চারিদিক সচকিত হয়ে উঠছে।

দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল কত রাজ্য, কত নদ-নদী, কত পর্বত-উপত্যকা বন-উপবন। বায়সপতি আর তার অনুচরেরা উড়েই চলেছেন, উড়েই চলেছেন। কিন্তু কোথাও তাঁর নজরে পড়ছে না সেই গৃহ-নির্মাণ কৌশল।

গৃহ জিনিসটা যে ঠিক কি, তাও জানেন না বিশ্ববিজয়। পিঁপড়েরা মাটির তলায় কিভাবে কি করে, তাও বোঝেন নি তিনি। তবে এ কথা নিশ্চিত যে সে গৃহে তারা নিশ্চিন্তে বাস করে, নিরাপদে জীবন কাটায়। সে গৃহে পিঁপড়েরা ডিম ও খাদ্যের সঞ্চয় নিয়ে গ্রীষ্ম বর্ষায় আত্মরক্ষা করতে পারে। সন্তান প্রতিপালন করতে পারে। এসব স্বাচ্ছন্দ্য কে না চায়! তাঁরাও চান কিন্তু কিভাবে সম্ভব? আর সে জিনিসটাই বা কেমন? সত্যিই যদি তেমন কিছু নজরের সামনে এসেও যায়, তবু কি চিনতে পারবেন তিনি?

অনুচরেরা থাকায় অস্বস্তিবোধ করেন বিশ্ববিজয়। ওরা সংগে না থাকলে সব লজ্জা সংকোচ ঝেড়ে ফেলে সকলকে জিজ্ঞাসা করা যেত। এখন আর সে উপায়ও নেই। নিশ্চিত গৃহের সন্ধান না পেলে তিনি নামতেও পারছেন না। তাই মনে তাঁর দুশ্চিন্তা।

এদিকে বৎসর ঘুরে এল প্রায়। অনেক অনেক দিন রাজ্য অরক্ষিত হয়ে পড়ে আছে। মহারাণী রূপসী কতদিন ভোর-বেলা স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন। স্বপ্নে দেখেছেন রাজা ফিরে আসছেন। সারাদিন বসে মালা গেঁথেছেন। সে মালা শুকিয়ে গেছে মাঝ আকাশে চাঁদ উঠবার আগেই। পরদিন ভোর না হতে শিশিরের সাথে চোখের জল মিশিয়ে রূপসী রাণী সে মালা ফেলে দিয়েছেন পথের আবর্জনায়।

সেদিন মহামাত্য দীর্ঘ-চঞ্চু ছাই বললেন, মহারাজ! অনেক দেশ তো ঘোরা হল। কোথাও তো দেখলাম না গৃহ। কোথাও পাখীদের শুনলাম না তেমন আলোচনা করতে। এবার তবে ফেরার কথা চিন্তা করা যাক।

বিশ্ববিজয় তাকালেন মন্ত্রীর মুখের দিকে। তারপর বল-লেন, আরও কিছু দিন দেখা যাক মন্ত্রীবর।

সেই দিন রাত্রেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

একটা বিরাট বনস্পতি দেখে তারই ওপর সেদিনকার মত রাত্রি বাসের জন্য থামবার হুকুম দিয়েছিলেন বিশ্ব-বিজয়। মগ্‌-ডালের একটা খাঁজে রাজার এবং তার চার-দিকে মন্ত্রী সেনাপতি ইত্যাদি প্রধানদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে অন্যেরা চারদিকে ছড়িয়ে রাতের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমও আস-ছিল মন্দ না। এমন সময় এক ভুতুড়ে কথাবার্তা শোনা গেল।

যেন একজন বলল, বুন্ধুরে, বুন্ধু!!

দ্বিতীয় জন বলল, ভুতুমরে ভুতুম!

এরপরে দুই কন্ঠ একত্রে বলে উঠল, বুন্ধু ভুতুম! বুন্ধু ভুতুম!! বুন্ধু ভুতুম।

এই বিচিত্র শব্দ শুনে কাকেরা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। জীবনে তারা এমন শব্দ শোনে নি। তারা আতঙ্কে নিশ্বাস বন্ধ করে রাখল। শুধু মহামাত্য দীর্ঘচঞ্চু ছাই ফিসফিস করে বিশ্ববিজয়ের কানে কানে বললেন, মহারাজ! এ কিসের শব্দ!

বিশ্ববিজয় বললেন, চুপ করে শোন। ক্রমে নিশ্চয় বোঝা যাবে।

বিশ্ববিজয়ের কথা শেষ হতে না হতে সেই ভুতুড়ে কন্ঠ দুটির প্রথমটি বলে উঠল, তুই থুলি না মুই থুলি?

দ্বিতীয় কন্ঠ বলল, আয় তবে তার হিসেব থুলি।

প্রথম কন্ঠ তার উত্তরে ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল,

তার থেকে চল মাঠের পানে
ইঁদুর ধরি ক্ষিদের টানে।

দ্বিতীয় কন্ঠ সাথে সাথে বলে উঠল,

সেই ভাল-রে সেই ভাল।
রাত তো এখন নিকষ কালো॥
হাতে আছে অনেক সময়
বুদ্ধিটা তোর মন্দ নয়।

এরপরেই ডানা ঝটপটানির আওয়াজ পাওয়া গেল।

বিশ্ববিজয় নিঃসন্দেহ হলেন কন্ঠ দুটি কোন পাখীর। তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, দাঁড়াও! যেও না। কে তোমরা! তোমরা পাখী, তা বুঝেছি। কিন্তু তোমরা শত্রু না মিত্র! তোমরা রাতে ডানা মেলছ কেন?

বিশ্ববিজয়ের কথা কানে যেতেই পাখী দুটি যে ওড়া বন্ধ করল এবং সেই গাছেরই কোন অংশে বসল, তা স্পষ্ট বুঝল বিশ্ববিজয়। পাখী দুটি বলল, তোমরা ভূচর খেচর জলচর যেমন পাখীই হও, তোমাদের কারো সাথে আমাদের বিবাদ নেই। আমরা পৃথিবীর সকলের বন্ধু। আমাদের একমাত্র বিবাদ সূর্যের সাথে। তাই আমরা দিনে চোখ বুঁজে থাকি। আমরা চলি-ফিরি রাত্রে।

বিশ্ববিজয় বললেন, বন্ধু! তোমরা কারা? তোমাদের বিশদ পরিচয় দাও।

পাখী দুটি বললে, আমরা বুন্ধু আর ভূতুম। আমরা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর বাহন। তাঁকে বয়ে বেড়ায় যে পেঁচার দল আমরা দুজন তাদের সর্দার। এখন দিন কয় ছুটি ভোগ করতে এসেছি এই বনে। কিন্তু তোমরা কারা? তোমরা এ বনে কেন? এখানে তো আগে কখনও তোমাদের দেখি নি।

বিশ্ববিজয় বললেন, আমি হচ্ছি কাকেদের রাজা— বিশ্ববিজয় বায়সপতি। বেরিয়েছি দেশ ভ্রমণে। উদ্দেশ্য বাসা তৈরী শিখব। তা, তোমরা বাসা তৈরী জান?

বিশ্ববিজয়ের কথা শুনে ওরা হো-হো করে হেসে উঠল। খানিক পর হাসি থামিয়ে বলল, বাসা তৈরী! কি যে বল বায়সপতি! আমরা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর বেয়ারা দলের সর্দার। বাস করি বৈকুন্ঠে। লক্ষ্মীদেবীর খাসা দালানে। প্যাঁচানী তাঁর ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেখানেই বাস করে। আমরা বাসা তৈরী শিখতে যাব কোন দুঃখে?

ভূতুম বলল, আর বছর শেষে কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে সারা রাত বেয়ারাদের দিয়ে পাল্কী বইয়ে আমরা দু ভাই দু মাস ছুটি পাই। এই ছুটির দু মাস কাটাতে আমরা আসি মর্তের বনে। লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় আমাদের কোটরের অভাব হয় না। আমরা বাসা তৈরী করতে যাব কোন দুঃখে?

বিশ্ববিজয় বললেন, লক্ষ্মীদেবীকে বয়ে তোমরা তো সারা বিশ্বে ঘুরে বেড়াও। কোথাও কি দেখেছ যে পাখীরা বাসা তৈরী করে?

বুন্ধু বলল, দাঁড়াও চিন্তা করি। এই বলে দুজনে গালে ডানা ঠেকিয়ে বসে পড়ল। তারপর একবার শোয়, একবার বসে, এমনি করে নানাভাবে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ বুন্ধু বলে উঠল, ভূতুমরে!

ভূতুম বলল, দাদা-রে!

বুন্ধু বলল, খাতাখানা দেখতোরে। এই বছরেই কোজা-গরীর আগে সেই যে এক বনে রাত কাটালাম দুজনে—

ভূতুম বলল, তাইতো-রে দাদা! দুটো পাখী বলেছিল সেইখানে—

বিশ্ববিজয় সাগ্রহে চেঁচিয়ে উঠলেন, কি, কি বলেছিল?

বুন্ধু ভূতুম একসাথে বলে উঠল, বলেছিল, তারা বাসা তৈরী করছে।

বিশ্ববিজয় বললেন, বটে! তবে সেই ঠিকানা দাও।

বুন্ধু বলল, ঠিকানা তো জানি না।

ভূতুম বলল, তবে এইটুকু জানি, তোমরা যদি এখান থেকে ক্রমাগত পশ্চিম মুখো চলতে থাক, তবে বানের রাজ্য পার হয়ে পাবে গানের রাজ্য। গানের রাজ্য পার হলে পাবে এক মহাবন। সেই মহাবনের এক প্রান্তে সেই পাখীদের বাসা।

বুদ্ধু বলল, এর বেশী আর কিছু আমাদের মনে নেই।

বিশ্ববিজয় বললেন, নাই থাক। যেটুকু সংবাদ তোমরা দিয়েছ, তাতেই আমরা ধন্য। কি বলে যে তোমাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব! অন্ধকারে তোমাদের ভাল করে দেখতে পর্যন্ত পেলাম না। সূর্য উঠলে—

বিশ্ববিজয়ের কথা শেষ করতে না দিয়েই পাখী দুটো চেঁচিয়ে উঠল, বেয়াদপ! বেয়াদপ!! আমাদের সামনে কিনা শত্রুর নাম।

সেনাপতি মহাবিক্রম জংবাহাদুর হাঁড়ি মুহূর্তে তলোয়ার বের করে বললে, হুকুম দিন মহারাজ। আপনাকে বেয়াদপ বলবার স্পর্দ্ধা পাখীদুটোর এখুনি ঘুচিয়ে দি।

বিশ্ববিজয় ফিসফিসিয়ে বললেন, সুন্দর বলেছ সেনাপতি। কিন্তু আর বাড়াবাড়ি করো না। রাতে আমরা অন্ধ। হুকুম দিলেই কি ওদের বধ করতে পারবে?

রাজার কথা শুনে সেনাপতি ভারী অপ্রস্তুত হলেন। রাজা তখন গম্ভীর মেজাজে বললেন, বুদ্ধু ভূতম! একে তোমরা লক্ষ্মীদেবীর বেয়ারা দলের সর্দার তাই সদ্যমাদ্য আমাদের উপকার করেছ। তাই তোমাদের এখন ছেড়ে দিলাম। নইলে আমার বরকন্দাজেরাই তোমাকে ঠুকরে মেরে দিত। সে যাই হোক! সূর্যের কথায় তোমরা এত চট কেন বল তো?

বুদ্ধু বলল, চটব না! লক্ষ্মীদেবী নিজেও সূর্যকে পছন্দ করেন না। লক্ষ্মীদেবী যার বাড়ি যান—যান রাত্রে। আমরাও তাই সূর্যের মুখ দেখি না।

ভূতম বলল, তাই রাত কাটবার আগেই আমাদের খাবার খুঁজে নিত হবে।

বুদ্ধু বলল, তাই তো! আর তো দেরী করা চলে না!

বলেই ওরা ডানা মেলে দিল। পূব আকাশে সূর্য তখন উঠি উঠি করছে। মহাবিক্রম তাড়াতাড়ি বললেন, যাব নাকি মহারাজ ওদের তেড়ে! এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি।

বিশ্ববিজয় বললেন, এখন থাক। ভবিষ্যতে দিনের বেলা প্যাঁচাদের পেলে শোধ নিও। এখন যাত্রা শুরু কর। আমাদের বানের রাজ্য, গানের রাজ্য পার হয়ে যেতে হবে সেই মহার্ণবে।

বায়সপতির আদেশে কাকেরা তখনকার মত থেমে গেল বটে, কিন্তু তারপর থেকে তার নির্দেশে আজও দিনের বেলায় প্যাঁচাদের দেখা পেলে সেই বেয়াদপ বলার অপরাধে ঠুকরে দেয়।

প্যাঁচারাও কম যায় না। ঠোকর খায় তবু বলে বেয়াদপ। বেয়াদপ!

।। সাত ।।

পশ্চিম দিকে বানের রাজ্য।

জল আর জল। শুধুই জল। চলার ঝোঁকে প্রথমটায় বোঝেনি কেউ। সবাই ভেবেছে আর একটু এগুলোই পাওয়া যাবে ডাঙ্গা। কিন্তু বিকেল হয়ে এলো। কোথায় ডাঙ্গা! বিপদ গণল বিশ্ববিজয়। মন্ত্রী দীর্ঘচঞ্চুর মুখ শুকিয়ে গেল। কোতোয়াল দিকপাল সেনাপতি পন্ডিত সকলের মুখ গেল পাংশু হয়ে।

সকাল থেকে তাদের আকাশ পথের তলায় তলায় জলের ভিতরে দেখা যাচ্ছিল নানা রকম মাছ। কত রকম তাদের গড়ন। কত বিচিত্র তাদের গতি আর কি বিচিত্র তাদের বর্ণ! দুপুর হতে না হতে মাছেরা গেল হারিয়ে। হঠাৎ এক সময় মন্ত্রী দীর্ঘচঞ্চু আঙ্গুল তুলে দেখালেন বিশ্ববিজয়কে, দেখুন মহারাজ। জলের দিকে তাকিয়ে দেখুন! হাঙ্গর।

বিশ্ববিজয় হাসলেন। বললেন, হাঙ্গর জলেই থাকে মন্ত্রী। ভয় নেই। হাঙ্গরের ডানা নেই। ওরা উড়তে জানে না।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ! ওরা আমাদের ছায়ার সাথে এগুচ্ছে।

রাজা বললেন, এগুতে দাও। শুধু এগুনো কেন, ওরা ছায়া ধরে টানলেও আমাদের ধরতে পারবে না। তোমার কোন ভয় নেই।

মন্ত্রী বললেন, কি জানি। আমার কেন জানি না ভাল লাগছে না। ওদের মধ্যে যেন কিসের অশুভ ছায়া।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা আর তার পরিষদেরা বেশ জোরেই হেসে উঠলেন।

কিন্তু যতই বিকেল হতে থাকল ততই তলায় হাঙ্গরের সংখ্যা বাড়তে লাগল আর ততই এদের মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে থাকল। ততই ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকল হাঙ্গরগুলোর ফন্দি। ততই ওরা মনে মনে শিউরে উঠতে থাকল। শুধু মন্ত্রী নয় এবার সকলের মনেই এক অশুভ ছায়া দেখা দিল।

সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কোথাও ডাঙ্গা নেই— আশ্রয় নেই। এদিকে সকাল থেকে উড়ে উড়ে সকলের ডানাই শ্রান্ত। শ্রান্তিতে ডানা বন্ধ হলেই ওরা পড়বে জলে আর তখনই হাঙ্গরদের উৎসব শুরু হয়ে যাবে। আশ্চর্য। সেই দুপুর থেকে হাঙ্গরগুলো কি এই নিশ্চিত ভবিষ্যতের স্বপ্নে ওদের পিছন পিছন আসছে! তবে কি মৃত্যু ওদের অবধারিত!

কথাটা ভাবতেই শিউরে উঠল সকলে। তারা চিৎকার করে উঠল, মহারাজ বাঁচাও! পথ দেখাও।

বায়সপতি মনে মনে বললেন, রক্ষা কর মা বায়সেশ্বরী। রক্ষা কর।

ওর প্রার্থনা শেষ হতে না হতেই জলের ভেতর থেকে যেন এক বিরাট মাছ ভেসে উঠল। আগুনের গোলার মতো তার চোখ। মুনি ঋষির মত তার দাড়ি-গোঁফ। তার দেহের বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে ঢাকা পড়ে গেল হাঙ্গরেরা। সে বললে, ভয় পেওনা। এগিয়ে যাও। তবেই মুক্তি। তবেই আনন্দ। বলেই সেই মহামৎস দিল ডুব। সেই জ্যোতিও সাথে সাথে মিলিয়ে গেল। আবার দেখা দিল হাঙ্গরেরা।

বিশ্ববিজয় চেঁচিয়ে উঠল, উড়ে চল। থামিও না ডানা। মরবার আগে পর্যন্ত আমরা উড়ে চলব, এই আমাদের পণ।

উড়ে চলল ওরা। সূর্যদেব ঢলে পড়লেন। ওদের পাখাগুলো সূর্যের লাল আলো কেটে কেটে যেন রক্তের নদীতে সাঁতরে চলল। অবশেষে সেই আলোও গেল মিলিয়ে অন্ধকারে ডুব দিল দিগ্‌দিগন্ত। এমন কি সেই হাঙ্গরগুলোও আর দেখা গেল না।

ক্রমে অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল ধ্রুবতারা। গাঢ় নীল তার আলো। সেই নীল আলোয় দূরে বহু-

দূরে যেন কি একটা দেখতে পেল কাকেরা। আর তারই আশায় ভরে উঠল ওদের বুক। ওরা আরও জোরে ছুটতে লাগল।

দুঃখের রাত্রি ভোর হতেই মৃদু বাতাস বয়ে আনল ডাঙগার সোঁদা সোঁদা গন্ধ। তারই সাথে ভেসে এলো কি গম্ভীর এক মিষ্টি গান। বায়সপতি বুঝলেন তারা বানের রাজ্য পার হয়ে এবার তবে গানের রাজ্যে এসে পৌঁছেছেন। বায়সপতি বললেন, আর ভয় নেই। সামনেই গানের রাজ্য।

অন্য কাকেরা চিৎকার করে উঠল, জয়। বায়সেশ্বরীর জয়।

দেখতে দেখতে আলো ফুটে উঠল পুব আকাশে। সেই আলোর তলায় অসীম জল ঝিকমিক করে উঠল। তারই মধ্যে মরকং মণির মত জ্বলতে থাকল এক বনভূমি। কি সবুজ আর কি সতেজ তার পাতা। কি তার দীপ্তি।

প্রাণের আনন্দে শ্রান্তি ভুলে গেল কাকেরা। তাদের ডানায় কোথা থেকে ফিরে এলো প্রচন্ড জোর। ওরা আরও জোরে এগুতে থাকল গুহার দিকে। এত আনন্দের মধ্যেও উৎকটভাবে মোচড় দিতে থাকল পেটের ভিতর। পুরো এক দিনের উপবাস যেন জন্ম-জন্মান্তরের ক্ষিধে নিয়ে পাক খেতে থাকল পেটে। তবুও তারা যখন সেই সবুজ বনের সান্নিধ্যে, চারদিকে মুখরিত গানের আকুল স্বরের মধ্যে এসে নামল, ওদের মনে হল ওরা এক স্বপ্নের রাজ্যে এসে পদার্পণ করেছে।

।। আট ।।

কাকেরা গানের রাজ্যে পদার্পণ করা মাত্র এগিয়ে এলো একদল কালো রং-এর পাখী। এরা যেন কাকেদেরই দোসর। কিন্তু দীর্ঘ ছিপছিপে তাদের গড়ন। সুদীর্ঘ তাদের পুচ্ছ। কি মাজা রং। মনে হয় কালো রং-এর এক খণ্ড মণি। একটা আয়না।

এই পাখীদের ভেতর থেকে একটা বড়সড় বয়স্ক পাখী এগিয়ে এলো বিশ্ববিজয়ের দিকে। ঘাড়টি নত করে, লেজ দুলিয়ে বললে, আসুন অতিথি বৃন্দ! বানের রাজ্য পার হয়ে গানের রাজ্যে যদি এসেছেন, তবে এখানে বিশ্রাম করুন। এখানে লতায়-লতায় গাছে-গাছে নানা ফুল-ফলের সমারোহ। এর সরোবরে সরোবরে সুশীতল জল। আর এর অধিবাসী এই কোকিলদের কণ্ঠে সরস্বতীর আশীর্বাদ। আশা করি বিশ্রামের কাল সুখেই কাটবে।

এই বনে কোকিলদের দলপতি সেই বয়স্ক কোকিলটি আপ্যায়ন করল কাকেদের। তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সরোবরে। সরোবরের সুশীতল জলে স্নান করে কাকেদের ক্লান্তি গেল মিলিয়ে। এবার কোকিলেরা নিয়ে গেল তাদের বাছা বাছা ফলের বাগানে। কাকেরা খুশী মত ফল খেল সেখানে। তারপর একটানা ঘুম দিল একদিন একরাত। পরদিন প্রভাতে যখন জেগে উঠল কাকেরা তখন যেন তারা নূতন প্রাণ পেয়েছে।

শুধু সুখে নয়, বিশ্রামের কাল একান্ত আনন্দে কেটে গেল। গাছের ফল খেয়ে, সরোবরে স্নান করে, ঝরণার জল পান করে আর দিবারাত্র কোকিলদের গান শুনে কাকেরা ভুলেই গেল দেশের কথা, ভুলেই গেল তাদের দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য।

হঠাৎ একদিন রাত্রে রূপসীকে স্বপ্নে দেখলেন বিশ্ববিজয়। দেখলেন কি শীর্ণ হয়ে গেছে তার দেহ। রুক্ষ্ম তার চুলের ডালি। চোখের কোল গেছে বসে। আহারে তার রুচি নেই। বিহারে নেই আনন্দ। দিনরাত কেমন মন-মরা হয়ে আছে রূপসী। স্বপ্নে দেখে শিউরে উঠলেন বিশ্ববিজয়।

পরদিন কোকিলদের দলপতি আদি কোকিল তানপুরা বাগিয়ে গাইছিলেন গান। আহ্লাদে তাল দিচ্ছিলেন কাক রাজ্যের মন্ত্রী সেনাপতি। আবেশে তাদের চোখ ঢুলু-ঢুলু, দেহ বিবশ। এমন সময় কু-উহুঃ-হুঃ গানটা একটা সমে এসে থামতেই বায়সপতি বিশ্ববিজয় সভা-মণ্ডে প্রবেশ করলেন। গান থেমে গেল। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে তাকে সম্মান জানাল।

আদি কোকিল হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, মহারাজ! আপনার মেজাজ সরিফ তো!

বায়সপতি বললেন, না হে গায়ক! মন আমার খারাপ। দেশের কথা মনে পড়ছে। রাণীকে কাল স্বপ্নে দেখেছি। আমরা বহুকাল দেশ ছাড়া। অথচ উদ্দেশ্য এখনও পূর্ণ হল না। জানতে পারলাম না গৃহ-নির্মাণ কৌশল।

উত্তরে আদি কোকিল গেয়ে উঠল,

এই তো আছি বেশ।
জানতে গেলে জানার নাহি শেষ॥

দীর্ঘচঞ্চু বললেন, জানতে যদি নাও চাই, দেশে তো ফিরতে হবে ?

আদি কোকিল আবার গেয়ে উঠল,

কোথায় আমার দেশ, কোথায় আমার ঘর
কেই বা আমার আপন, কেই বা আমার পর—
নাইকো আমার জানা
তাই মেলে দিলাম ডানা
প্রাণের খুশী ছড়িয়ে চলি দেশে দেশান্তর
সবুজ বনের হিমেল ছায়ায় খাসা আমার ঘর।

আদি কোকিল থামল। তার গান তখনও যেন গুমরে ফিরছিল বনে বনে গাছে গাছে পাতায় পাতায়। সেই গান যেন কাকেদের মনে চিন্তা তুলছিল, সত্যিই তো! কোথায় আমার দেশ, কোথায় আমার ঘর ? জন্মের আগে কোথায় ছিলাম, মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাব! কিছুই যখন স্থির নেই তখন দেশই বা কি, আর ঘরই বা কি ? বেশ আছি এখানে। এই অরণ্যের শান্তি, এখানকার মিষ্ট ফল, সুশীতল জল আর এই সাথীদের মিষ্টি গান—জীবনে আর কি চাই! ওদের চোখ আবেশে বুঁজে আসছিল। আদি কোকিলের গান যেন এক মিষ্টি মায়ায় ওদের মন-দেহ-চিন্তাকে এই দেশ মাটি কালের সাথে বেঁধে দিচ্ছিল। তাকে কাটাবার ক্ষমতা ওদের নেই।

বায়সপতির মনেও যেন সেই মায়া ক্রিয়া শুরু করছিল। কিন্তু বায়সপতি জোর করে সেই মোহ কাটিয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই কি তোমাদের কোন দেশ নেই কোকিল ? তোমরা কোথাও বাসা বাঁধ না ?

আদি কোকিল আবার গাইল,

বাঁধন আমার ভয়
মুক্ত ডানা হে মুক্ত ডানা
তোমারই হোক জয়!

গান থামিয়ে একটু হেসে কোকিল বললে, মহারাজ! আমরা গান গেয়ে খুশী করেছিলাম দেবী সরস্বতীকে। তাঁর আশীর্বাদে আমাদের কোথাও কোন অভাব নেই। আমরা যেখানে যাই, সেখানে বসন্ত এসে উপস্থিত হয়। আমরা বসন্তরাজের ঠিকে গায়ক। যাবৎ জীবন তাঁর সাথেই ঘুরি।

তোমাদের শীত গ্রীষ্মের কোন ভয় নেই বুঝলাম। কিন্তু কোকিলারা ডিম পাড়ে কোথায়? কোথায়ই বা সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়? আর সে বাচ্চা বড়ই বা হয় কোথায়?

অদ্ভুতভাবে হাসল আদি কোকিল। বলল, মহারাজ! বসন্তরাজের আশীর্বাদে আমাদের সে ভাবনাও নেই। আমাদের গৃহিনীরা ডিম পাড়ে। কিন্তু সে ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা তোলার দায় আমাদের নয়।

বায়সপতি মুখ গম্ভীর করে তুললেন। বললেন তবে তো রীতিতে নীতিতে তোমাদের সাথে আমাদের কিছুতেই মিল হতে পারে না।

আদি কোকিল বলল, মেলা সম্ভব নয় মহারাজ! আমরা যে সবই ত্যাগ করেছি।

বায়সপতি বললেন, কিন্তু আমরা যে সবই ধরে রাখতে চাই। একটু থামলেন বায়সপতি। বললেন, তোমাদের দেশে সুখেই ছিলাম। কিন্তু আর নয়। নিমন্ত্রণ রইল। আমার রাজ্যে বসন্ত এলে যেন তোমাদের দেখা পাই।

আদি কোকিল মাথা নুইয়ে, তানপুরায় একটা ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, নিশ্চয় মহারাজ! বলে সে বিদায় বেলার গান ধরল—

বিদায় বেলায় শেষ কথাটি কই
আমি যেন মনে তোমার রই
হে অতিথি! আমি যেন তোমার মনের
স্মৃতিটুকু হই।

|| নয় ||

আদি কোকিলের গান শেষ হতেই বিশ্ববিজয় যাত্রার আদেশ দিলেন। কিন্তু আদি কোকিলের গান তখনও মায়ায় ভরিয়ে রেখেছে কাকেদের মন। জড়িয়ে রেখেছে তাদের ডানা। তাদের প্রিয় রাজার আদেশ তাদের কানে বাজছিল কিন্তু মনে বাজছিল না। বিশ্ববিজয় অবস্থাটা বুঝলেন। বললেন, বেশ! তবে থাক তোমরা সুখের মায়ায় বন্ধ হয়ে। আমি একাই যাত্রা করলাম।

কাকেরা যখন দেখল, তাদের ফেলে তাদের রাজা একাই উড়ে চলেছেন, তখন ব্যাপারটা তাদের আচ্ছন্ন চেতনায় ঘা দিল। চিরকাল বিশ্ববিজয়ের পিছনে উড়ে এসেছে ওরা। ভাবনা চিন্তাহীনভাবে বিশ্ববিজয়কে অনুসরণ করাই তার অভ্যাস। সেই অভ্যাসের তাড়নাতেই ডানা আপনা থেকে খুলে গেল। এক সময় ওরা দেখল বিশ্ববিজয়ের অনেক পিছনে পিছনে ওরাও উড়ে চলেছে। ওরা চেঁচিয়ে বলল, ধীরে চল রাজা! আমরাও আসছি।

বিশ্ববিজয় বললেন, যদি সাথে আসবারই ইচ্ছে, তবে জোরে ছোট। এগিয়ে এসে ধর। আমি থামব না। আর আমার গতি কমাব-ও না। বিশ্ববিজয় গতি কমাবার পরিবর্তে বাড়িয়ে দিলেন।

কাকেরা মরিয়া হয়ে ছুটল বিশ্ববিজয়ের পিছনে। বিশ্ব-বিজয় মাঝেমাঝে পিছন ফিরে দেখতে থাকলেন আর চলতে থাকলেন। রাজার এই দূরে দূরে থাকার ইচ্ছা তাদের উত্তেজিত করে তুলল। ওদের জেদ চেপে গেল, দেখা যাক রাজা কত জোরে উড়তে পারে! আর কতক্ষণ দূরে থাকতে পারে! ওরা থেকে থেকেই চেঁচিয়ে উঠতে লাগল, জোর! আরও জোর! রাজাকে ধরতে হবে—রাজাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

বিশ্ববিজয় কাকেদের মানসিকতা বুঝলেন। তিনি গানের রাজ্যে এতদিন অকারণ সময় অপচয়ের খেশারৎ আদায় করে নিতে চাইলেন। তাই তিনি থামলেন না। ক্রমাগত উড়েই চললেন। আর ঘুড়ির পিছনে লেজের মত কাকেরা বিশ্ববিজয়ের পিছনে লেগেই রইল। এই কৌশলে বিশ্ব-বিজয় তিন দিনের পথ মাত্র একদিন একরাতে অতিক্রম করিয়ে আনলেন। অবশেষে কাকেরা ধরে ফেলল বিশ্ব-বিজয়কে। তারা উল্লাসে প্রাণের শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল। তখন ভোরের আলোয় আকাশ ভরে গেছে।

তাদের উল্লাস কমতেই একটা অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি কানে এসে পেঁছাল তাদের। আরও কিছু এগুতেই সেই গুঞ্জন একটা বিদঘুটে ঠক-ঠকা ঠক শব্দে পরিণত হল। তারা যতই এগতে থাকল, ততই বাড়তে থাকল সেই শব্দের জোর। যেন সমস্ত অরণ্যের বৃষলতা তাদের দারুময় হাত বাড়িয়ে তালে তালে হাততালি দিয়ে নূপুর পায়ে নেচে চলেছে উদ্দাম নৃত্য। সেই শব্দ শুনতে শুনতে অশুভ আতঙ্কে শিউরে উঠল কাকেরা। তারা যেন দেখতে পেল, সামনের মহারণ্যে হাত বাড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে শত শত কঙ্কাল। আর একত্রে এতগুলি প্রাণীকে তাদের আওতায় আসতে দেখে আনন্দে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ছে। তারই ফলে তাদের দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ উঠছে ঠক ঠকা ঠক। তাদের সমস্ত শরীর ঐ হাসিতে দুলে দুলে উঠছে। তার ফলেই শব্দ জাগছে ঠক ঠকা ঠক।

কাকেরা আতঙ্কিত হল।

দ্রুত দৌড়ে এলো মহামাত্য দীর্ঘচঞ্চু। বলল কিসের শব্দ মহারাজ?

বিশ্ববিজয় বললেন, গেলেই বোঝা যাবে মন্ত্রীবর।

দীর্ঘচঞ্চু বললেন, মহারাজ কাকেরা ভীত হয়ে পড়েছে।

নির্বিকারভাবে বিশ্ববিজয় বললেন, যারা ভীত, তাদের থেমে যেতে বল। ভীত সংগীদের নিয়ে অজানা রাজ্যে যাওয়া ঠিক নয়। তাতে বিপদ বাড়ে।

বিশ্ববিজয়ের এই নির্বিকারভাব আহত করল কাকেদের। তাদের মনে অভিমান জমল। তবু ঐ বিভীষিকাময় শব্দের দিকে রাজাকে এগিয়ে যেতে দিতে বুকে বাজল ওদের। ওরা সমবেত হল সেনাপতির চারদিকে। বলল, সেনাপতি! উপায় করুন। ঐ মহাবন থেকে যে শব্দ উঠছে তার কারণ না জেনে আমরা কিছুতেই মহারাজকে ওখানে যেতে দিতে পারি না। রাজাকে থামান।

ওরা যখন এমনিভাবে আলোচনায় মেতে আছে, ঠিক সেই সময় বিশ্ববিজয় সোজা এসে দাঁড়ালেন ওদের মাঝে। বললেন, ভাই সব! মিথ্যে ভয় পাচ্ছ তোমরা। যা অজানা তাকেই ভয়। কাছে গেলেই দেখা যাবে ভয় মিলিয়ে গেছে। পৃথিবীতে ভয়ের কিছু নেই।

সেনাপতি উচ্চ-পুচ্ছ বললেন, মহারাজ! তাই যদি হয়,

তবে আমরা সকলে অপেক্ষা করি এখানে। কয়েকজন এগিয়ে গিয়ে দেখে আসুক, কি হচ্ছে ওখানে। কিসের এত শব্দ।

বিশ্ববিজয় হেসে বললেন, আমিও তো সেই কথাই বলছি সেনাপতি। সকলে এখানে অপেক্ষা কর। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি। আমি নিরাপদে থেকে অন্যেকে বিপদের মাঝে ঠেলে দিতে পারব না।

বিশ্ববিজয়ের কথায় লজ্জা পেলেন সেনাপতি। বললেন, মহারাজ! আপনাকে আমরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। আপনাকে কোথাও একা যেতে দিতে পারি না। আমরাও তা হলে যাব।

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিশ্ববিজয়ের মুখ। প্রচণ্ড আবেগে বলে উঠলেন তিনি, বিশ্বাস রাখ ভাই সব। আমিও প্রাণ থাকতে তোমাদের কোন বিপদের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে পারি না। আমার প্রতি বিশ্বাস রেখে আমাকে অনুসরণ কর।

বিশ্ববিজয়ের কথাগুলো কাকেদের বুকের ভিতরটা যেন দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে কাঁদিয়ে তুলল। এই তাদের রাজা। একেই সন্দেহ করেছিল তারা! অবিশ্বাস করেছিল! তাদের মন বিশ্ববিজয়ের প্রতি আস্থায় ভরে উঠল। তারা সমস্বরে চিৎকার করে উঠল, মহারাজ বিশ্ববিজয় বায়সপতির জয় হোক!

ওরা বায়সপতির পিছনে পিছনে সেই শব্দময় বনভূমির দিকে এগুতে থাকল।

ওরা যতই এগুতে থাকল ততই বাড়তে থাকল সেই শব্দের জোর। ততই সেই অর্থহীন ধ্বনি তরঙ্গ যেন এক ছন্দময় অর্থময় সঙ্গীতে পরিণত হল। ওরা অনুভব করল কারা যেন বনের মধ্যে সমবেতভাবে কোন কাজ করছে আর গান গাইছে—

ঠক ঠকা ঠক ঠকা ঠকাস ঠকা ঠক
কাজ নয় রে ভূতের বোঝা কাজ নয় রে শখ॥
কাজের মাঝে জীবন সফল কাজেই সুখের আশ—
ঠক ঠকা ঠক ঠকা ঠক ঠকা ঠক ঠকাস।

গানটা কাকেদের মনে কৌতূহল জাগিয়ে তুলল। কিসের কাজ চলেছে ওখানে? কোন সুখের আশায় ওরা মত্ত! কাজটা ভূতের বোঝাও নয়, শখও নয়—জীবন সফল করার পাথেয়! কি সেই সাফল্যের ছবি?

সেনাপতি এগিয়ে এলেন বিশ্ববিজয়ের পাশে। বললেন, মহারাজ! ওখানে কি তবে গৃহ-নির্মাণের ব্যস্ততা! ওরা কি বাসা তৈরী করছে? এ শব্দ কি গৃহ-নির্মাণের?

বিশ্ববিজয় বললেন, অসম্ভব নয় সেনাপতি। বন্ধু ভূতুমের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা এই বনেই গৃহ-নির্মাণ করা দেখতে পাব।

এ কথা শুনে কাকেরা আরও উৎসাহী হয়ে উঠল।

।। দশ ।।

সেই শব্দময় অরণ্যে প্রবেশ করে কাকেরা অবাক হয়ে দেখল লাল-নীল সবুজ-হলদে অপরূপ সাজে সেজে এক-দল পাখী জোড়ায় জোড়ায় গাছের গায়ে বসে ঠোঁট দিয়ে ক্রমাগত গাছের গায়ে ঠোক্কোর মারছে আর তারই তালে তালে ফাঁকে ফাঁকে গাইছে গান। ঠোক্করের শব্দে আর গানের সুরে যেন সমগ্র বনভূমি ভরে আছে। পাখীরা আপন কাজে এত তন্ময় যে এতগুলি কাক কখন যে প্রবেশ করেছে, কতক্ষণ ধরে যে দেখছে তাদের, সে সব খেয়ালই করল না তারা। বিশ্ববিজয় ইঙ্গিতে কাকেদের নীরব থাকতে নির্দেশ দিলেন।

পাখীগুলির কাজ এক সময়ে শেষ হল। গাছের গায়ে তৈরী হল বড় সড় একটা করে কোটর। পাখীরা জোড়ায় জোড়ায় প্রবেশ করল তার ভেতর। এবার বাইরে তাকিয়ে তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। তারা দেখল বাইরে কাতারে কাতারে কাক দাঁড়িয়ে আছে।

পাখীগুলি নীরবে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল তাদের দিকে। তারপর তাদের দল থেকে এগিয়ে এলো এক-জোড়া পাখী। ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা কারা? কি জন্য এসেছ আমাদের দেশে?

বিশ্ববিজয় অভিবাদন করে বললেন, হে রং-বেরঙা পাখীরা। আমরা জানি না তোমাদের পরিচয়। চিনি না তোমাদের দেশ। আমরা বহুদূর দেশ থেকে, বহু কষ্ট সহ্য করে বহু বিপদ এড়িয়ে এসেছি তোমাদের দেশে। তোমরা কি অভ্যর্থনা করবে না আমাদের? আমরা কাকেরা কি তোমাদের দেশের দুয়ার থেকে ফিরে যাব?

রং-বেরঙা পাখীর জোড়া থেকে পুরুষ পাখীটি বললে, হে কাক দলপতি! তোমরা এসেছ আমাদের দেশে, আমরা খুব খুশী হয়েছি। আরও খুশী হয়েছি এই জন্য যে তোমরা এসেও আমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাওনি। দেখ! আমরা বড় ব্যস্ত পাখী। আমাদের অত আদর আপ্যায়নের সময় নেই। এসেছ এদেশে, ঘোরো ফেরো। খাও গাছের ফল, আর ঝরণার জল। কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু সাবধান! আমাদের কাজে বাধা দিওনা। তাহলে যে শক্ত ঠোঁট দিয়ে কাঠ ফুটো করে আমরা বাসা তৈরী করছি, তা দিয়ে তোমাদের মাথা ঠুকরে দেব! আমরা কাঠঠোকরা! আমরা বড্ড বদরাগী। এ কথা বলে কাঠঠোকরাটি ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে সত্যিই রাগ রাগ ভঙ্গি করে দাঁড়াল।

কাঠঠোকরাটির এত রাগত ভঙ্গী, এত ভয় দেখানো মাঠেই মারা গেল। ওর এ সব কথা বুঝি কাকেদের কানেই গেল না। ওরা বাসা তৈরীর কথা শুনেই আনন্দে চেঁচাতে থাকল। তারপরেই শুরু হয়ে গেল তাদের উদ্দাম নৃত্য। তারা কেউ উড়তে থাকল, কেউ গড়াতে থাকল, কেউ বা গড়াতে লাগল মাটিতে। একদল তো গাইতেই শুরু করল,

হুররে! পেয়েছি বাসা।
তৈরী শিখব ফিরব দেশে
গড়ব খাসা।
হুররে! পেয়েছি বাসা।

ওদের উল্লাস কাঠঠোকরাদের ভাল লাগল না। কাঠ-ঠোকরা দলপতি চেঁচিয়ে উঠল, থামাও তোমাদের ভূতের নৃত্য। আমাদের শান্তি ভঙ্গ করো না।

কে কার কথা শোনে। তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার যেন চরম প্রাপ্তি ঘটেছে। কাকেরা যেন তাদের এত দিনের শ্রম ক্লান্তি উৎকন্ঠার অবসানে বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মত হয়ে উঠেছে। ওদের নাচ তো থামলই না। বরং বেড়ে চলল।

বিশ্ববিজয় এগিয়ে গেল কাঠঠোকরা দলপতির কাছে। বলল, হে দলপতি। আমার সঙ্গীরা হয় তো সত্যিই আপনাদের শান্তি ভঙ্গ করছে। কিন্তু আজ যে আমাদের কি আনন্দের দিন তা আপনাদের কেমন করে বোঝাব! সারা

বিশ্ব অন্বেষণ করে আমরা আপনাদের রাজ্যে এসে পেয়েছি আমাদের প্রত্যাশার বস্তু। তাই ওদের এই উৎকট উল্লাস।

কাঠঠোকরা দলপতি বললেন, কারণ যাই হোক, আমাদের রাজ্যে এ বেয়াদপি চলবে না। থামতে বলুন ওদের।

বিশ্ববিজয় হাসলেন মৃদু হাসি। বললেন, অসম্ভব। এখন কোন নির্দেশই ওদের কানে পৌঁছাবে না। অপেক্ষা করুন দলপতি। ওরা আপনা থেকেই থামবে।

কেমন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন কাঠঠোকরা দলপতি। বললেন, আপনি না থামালে, আমিই থামাবার ব্যবস্থা করব।

বিশ্ববিজয় বললেন, পারলে থামান! মনে মনে একটা চ্যালেঞ্জ দিলেন যেন বিশ্ববিজয়।

বিশ্ববিজয়ের কথা শেষ হতে না হতে এক ইঙ্গিত দিলেন কাঠঠোকরা দলপতি। মুহূর্তে কাঠঠোকরারা উড়ে গিয়ে দাঁড়াল কাকেদের পিছনে। তারপরেই এক একজন কাঠঠোকরা এক একটি কাকের মাথায় বসিয়ে দিল তাদের শক্ত ঠোটের একটি করে ঠোক্কর। মুহূর্তে আনন্দ উল্লাস যন্ত্রণার কান্নায় পরিণত হল। ওরা, ওরে বাবারে। গেছিরে বলে কাঁদতে থাকল আর গড়াতে থাকল মাটিতে।

কাঠঠোকরা দলপতি আবার চেঁচিয়ে উঠলেন, থামাও তোমাদের চিৎকার আর কচি খোকার মত কান্না। নইলে আবার ঠোক্কর দিতে বলব।

সাথে সাথে থেমে গেল চিৎকার। বন্ধ হয়ে গেল কান্না। কাকেরা এত শান্ত হয়ে গেল যে মনে হল ওখানে যেন খানিকটা কালো রং গড়িয়ে পড়েছে মাত্র।

কাঠঠোকরা দলপতি এবার বিশ্ববিজয়ের দিকে ফিরে বললেন, হে বিদেশী অতিথি! প্রথমেই তোমাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য করলে তোমরা। যাই হোক, এ দুর্ব্যবহারের জন্য আমরা প্রথমেই ক্ষমা চাইছি। মনে রেখো, আমরা অসভ্যতা পছন্দ করি না। যদি অসভ্যতা কর, তবে জেনে রেখো, আমরা ঠুকরে এরাজ্য থেকে বের করে দেব।

কাকেদের এভাবে থামিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি বিশ্ববিজয়। উপায়টি রূঢ়। তার চাইতে রূঢ় হচ্ছে কাঠঠোকরা দলপতির ভাষণ। রীতিমতো অপমান বোধ করলেন বিশ্ববিজয়। তার মুখ গম্ভীর হল। তিনি বললেন, হে কাঠঠোকরা দলপতি! তোমার এই রূঢ় ব্যবহারের প্রত্যুত্তর আমরা দিতে পারি। কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে ঝগড়া চাই না। চাই বন্ধুত্ব। আমরা তোমাদের কাছ থেকে বাসা তৈরীর কৌশল শিখে নিতে চাই।

বিশ্ববিজয়ের কথায় হো হো হেসে উঠলেন কাঠঠোকরা দলপতি। অন্য কাঠঠোকরারাও কম হাসতে থাকল না। সে হাসিতে বিশ্ববিজয় তার সব সংযম হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, হাসছ কেন ? এমন উৎকটভাবে হাসবার কি কারণ ঘটল ? আমরা কি তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করার যোগ্য নই ?

কাঠঠোকরা দলপতি সাথে সাথে হাসি থামালেন। অন্যেরাও হাসি বন্ধ করল। দলপতি বললেন, দুঃখ পেও না বন্ধু। আমাদের হাসির জন্য রাগ করো না। আমরা তোমাদের আগেই বন্ধু করে নিয়েছি। আমরা হেসেছি তোমাদের ঐ ঠোঁটগুলোর দিকে তাকিয়ে।

সেনাপতি মহাবিক্রম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেন ? আমাদের ঠোঁটগুলো কি কদাকার?

কাঠঠোকরা দলপতি বললেন, না কদাকার নয়। দুর্বল। দেখো। তোমরা আমাদের কাছ থেকে বাসা তৈরীর কৌশল শিখে নিতে চেয়েছ। আমরা শিখিয়ে দিলেও কি পারবে তোমরা বাসা তৈরী করতে? তোমাদের ঐ দুর্বল ঠোঁট দিয়ে পারবে গাছের শক্ত কাঠ ফুটো করে গর্ত করতে? প্রথম ঠোক্করেই ঠোঁট যাবে ভেঙে।

কাঠঠোকরাণী আবার ফিক ফিক করে হাসলেন। বললেন, তোমাদের সেই ঠোঁট কাটা মূর্ত্তির কথা ভেবেই আমরা হেসেছিলাম।

কাঠঠোকরাণীর কথায় অন্য কাঠঠোকরাদের মধ্যেও একটা হাসির দমকা হাওয়া বয়ে গেল। কিন্তু এসব কথায় হাসবার মত মনের অবস্থা কাকেদের ছিল না। ওদের ঠোঁট যে দুর্বল, সে ঠোঁটে যে কিছুতেই কাঠ গর্ত করা সম্ভব নয়, একথা অনুভব করে ওরা মুসড়ে পড়ল। বাসা তৈরীর ব্যাপারটার কাছাকাছি এসেও তা আয়ত্ত করা যাবে না জেনে বিশ্ববিজয় যেন আর্তনাদ করে উঠল, তাহলে আমাদের দ্বারা কিছুতেই বাসা তৈরী সম্ভব হবে না?

কাঠঠোকরা দলপতি বললেন, কিছুতেই না।

সে কথায় কাকেরা হাহাকার করে উঠল।

কাকেদের হাহাকারে দুলে উঠল কাঠঠোকরাণীর বুক। তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, এত হতাশ হয়ো না কাক রাজা। বাসা তৈরী করতে হয় পাখীর প্রয়োজন এবং সামর্থের ওপর নির্ভর করে। আমরা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী সহজেই গাছের গায়ে কোটর তৈরী করে নিতে পারি। এ সামর্থ তো তোমাদের নেই। কিন্তু তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী বাসাও তৈরী করা যেতে পারে। আর তা জানে এমন জনও আছে!

বায়সপতি সাগ্রহে বললেন, আছে ? কে? কোথায়

কাঠঠোকরানীর কথায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল দলপতির মুখ। তিনি বললেন, ঠিক, ঠিক! তুমি তো ঠিকই বলেছ কাঠঠোকরাণী। আমার মনেই ছিল না বাবুই গুরুর কথা!

এই বলে কাঠঠোকরাণীকে তারিফ করে বায়সপতির দিকে ঘুরলেন দলপতি। বললেন, হে কাক রাজা। তোমরা এগিয়ে যাও আরও পশ্চিমে। আমাদের রাজ্যের পর এক রুক্ষ ধূসর অনুর্বর রাজ্য পার হয়ে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে পাবে বাবুই পাখীর রাজ্য। বাবুইরা বাসা তৈরীর কারিগর। তাদের যিনি গুরুদেব, তিনি জানেন নানা রকম বাসা তৈরী করতে। যে পাখীর যেমন বাসা প্রয়োজন, যেমন তাদের পায়ের জোর, ঠোঁটের শক্তি এবং মাথার বুদ্ধি— তিনি পারেন তেমন কৌশল শেখাতে। যাও তাঁর কাছে। তুষ্ট কর তাকে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

বায়সপতি ভুলে গেল আগের আপমান, ভুলে গেল সব বেদনা। আনন্দে আবেগে জড়িয়ে ধরলেন কাঠঠোকরা দলপতিকে। বললেন, বন্ধু! তুমি আমাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিলে। তোমার ঋণ অপরিশোধ্য। এবার আমাদের বিদায় দাও। আমরা যাত্রা করি আমাদের লক্ষ্য পথে।

কাকেরা কাঠঠোকরাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাবুই রাজ্যের দিকে যাত্রা করল।

।। এগারো ।।

কিছু দূর আসতেই কাঠঠোকরাদের মহাবন শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল সবুজের সমারোহ। দেখা দিল রুক্ষ লাল মাটি আর তার মাঝে এখানে ওখানে দু-একটা সাথীহারা গাছ। আরও কিছু দূরে এগুতে রুক্ষ লাল মাটি পরিণত হল বালিতে। বালি আর বালিয়াড়ী। এর মাঝে দেখা যেতে থাকল নারকেল গাছের সার। দূর থেকে ভিজে বাতাস আর তরঙ্গ গর্জনের শব্দ এসে জানিয়ে দিতে লাগল যে সমুদ্র আর দূরে নেই।

এতক্ষণে সূর্যদেব পশ্চিম আকাশ রাঙিয়ে তুলেছেন। নারকেল গাছের ঝিরঝিরে পাতার ভিতর দিয়ে চকচকে সূর্যের কিরণ এসে কাকেদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগল। গাছগুলোকে দেখা যেতে থাকল কালো কালিতে আঁকা ছবির মত। সহসা তার পিছনে অনন্ত প্রসারিত সমুদ্রের দেখা পেল কাকেরা। তারা মুগ্ধ হয়ে গেল।

সেই মুগ্ধতার মধ্যেই কাকেরা আবিষ্কার করল, গাছে গাছে তাদের অজানা কিসব ঝুলছে। সেই অজানা জিনিস গুলোর ভেতর থেকে বের হচ্ছে আর ঢুকছে একদল ছোট্ট ছোট্ট চঞ্চল পাখী। আনন্দে কাকেরা বিশ্ববিজয়ের চারদিকে ঘন হয়ে এলো। বলল, মহারাজ! আমাদের সামনে, এই বোধ হয় বাবুই রাজ্য।

বিশ্ববিজয় বললেন, দেখছ! গাছে গাছে কিসব ঝুলছে! আর তার ভেতর থেকে একদল ছোট্ট পাখী বের হচ্ছে! ওরাই বোধ হয় বাবুই—বাসা তৈরীর কারিগর।

দীর্ঘচঞ্চু বললেন, আর যেগুলি ঝুলছে, ওগুলি নিশ্চয় ওদের বাসা।

মহাবিক্রম বললেন, মহারাজ! আশ্চর্য আপনার দূর-দর্শিতা। দেখেছেন, ওরা শূন্যেই বাসা বেঁধেছে। মাটিতে নয়।

বিশ্ববিজয় মৃদু হাসলেন। বললেন, তাহলে আমরা এত-দিনে আমাদের আকাঙ্খার দেশে এসে পৌঁছালাম।

সেনাপতি মহাবিক্রম বললেন, এখন বাবুই রাজা আমা-দের প্রস্তাবে রাজী হলেই আমরা বাঁচি।

বিশ্ববিজয় বললেন, সেনাপতি! সমস্ত বিশ্ব পরি-ক্রমণ করে ওঁদের সন্ধান যখন পেয়েছি, তখন এ গুপ্তবিদ্যা আমি আয়ত্ত না করে ফিরব না। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

কাকেরা যখন এই সব আলোচনা করছে, ততক্ষণে বাবুই রাজ্যের প্রহরী এক উঁচু গাছের ওপর থেকে দেখে ফেলেছে তাদের। সে রীতি অনুযায়ী চেঁচিয়ে জানিয়ে দিয়েছে বাবুই রাজাকে, মহারাজ! একদল পাখী ঝাঁক বেঁধে উড়ে আসছে আমাদের রাজ্যের দিকে।

মহারাজের নকীব জিজ্ঞাসা করল, তাদের বর্ণ?

প্রহরী বলল, কালো।

তাদের সংখ্যা?

গোনা যাচ্ছে না।

তারা সুশৃঙ্খল না বিশৃঙ্খল?

না! শৃঙ্খলার বিন্দু মাত্র নেই। কেউ এগুচ্ছে, কেউ পিছাচ্ছে। ওরা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হয়ে আসছে।

মহারাজ শুনে বললেন, প্রহরীকে বল। ভীত হবার দর-কার নেই। যারা বিশৃঙ্খল হয়ে আসে তারা আক্রমণ করতে আসে না। ওদের বর্ণ যখন কালো তখন ওরা হয় কাক, নয় কোকিল। বসন্ত এখনও আসেনি। অতএব ওরা কোকিল নয়। ওরা কাক। কাকেদের সাথে বাবুইদের কোন কালে শত্রুতা নেই। তাই একদল বাবুইকে এখুনি পাঠিয়ে দাও। তারা কাকেদের বাবুই রাজ্যের সিংহদ্বারেই অভ্য-র্থনা করুক।

রাজাদেশ প্রচারিত হবার সাথে সাথে একদল বাবুই-বাবুইনী এগিয়ে গেলো কাকেদের অভ্যর্থনা করতে। কাকেরা সেখানে আসতেই তারা শঙ্খে দিল ফুঁ। ছিটিয়ে দিল ফুল আর খৈ। গেয়ে ওঠে গান। কাকেরা অবাক হয়ে থামতেই তাদের গলায় গলায় দুলিয়ে দিল নারকেল ফুলে গাঁথা মালা। মালা গলায় পরে কাকেদের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

বাবুই দলের সর্দার বললেন, হে কাক অতিথিরা! তোমাদের মঙ্গল হোক! বল কি অভিলাষে তোমাদের আগমন?

বিশ্ববিজয় এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালেন। বললেন, বন্ধু! আমরা বাবুই-গুরুর সাথে দেখা করতে চাই। তাঁর কাছ থেকে জানতে চাই গৃহ-নির্মাণ কৌশল।

বাবুই সর্দার বিশ্ববিজয়ের অভিলাষ জেনে নিয়ে উড়ে চললেন বাবুই রাজার কাছে। বাবুই রাজা সব শুনে বললেন, আজ সন্ধ্যা সমাগত। আজ কাকেদের বিশ্রাম করতে বল। কাল প্রভাতে কাক রাজাকে আমি স্বয়ং নিয়ে যাব গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব খুশী হলে পূর্ণ হবে ওদের অভিলাষ।

পরদিন ভোরবেলা বাবুই রাজা এলেন বিশ্ববিজয়ের কাছে। বললেন, শুভক্ষণ সমাগত। যাত্রা শুরু করুন মহা-রাজ।

বাবুই রাজার পিছনে উড়ে চললো বিশ্ববিজয়। তার পিছনে বিরাট কাক-বাহিনী। কিছুদূর এসে বাবুই রাজা থামিয়ে দিলেন কাকেদের। বললেন, এই মস্ত বাহিনীকে এখানে রেখে আপনাকে একা একা যেতে হবে মহারাজ। গুরুদেবের আশ্রমের শান্তি আমরা নষ্ট হতে দেব না। বিশ্ব-বিজয় শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিলেন সে নির্দেশ। কাক-বাহিনী সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকল। তিনি একা বাবুই রাজার সাথে এগুতে থাকলেন।

বাবুই রাজ্যের একেবারে প্রান্তে সমুদ্রের ধারে এক নির্জন পরিমন্ডলে বাবুই গুরুর বাস। সেখানে প্রবেশ করতেই বিশ্ববিজয়ের মন প্রশান্তিতে ভরে উঠল। সেখানে একটি বিশেষ গাছের কাছে এসে প্রণাম করলো বাবুই রাজা। বললেন, এই গাছেই গুরুদেবের বাসা।

বিশ্ববিজয় সাথে সাথে প্রণাম করলেন।

বাবুই রাজা ডাকলেন গুরুদেব!

ঘরের ভিতর থেকে গুরুদেব বললেন, সংবাদ আছে রাজা?

বাবুই রাজা বললেন, হ্যাঁ মহারাজ। কাক রাজা বিশ্ব-বিজয় বায়সপতি এসেছেন আপনার কাছে। তিনি গৃহ-নির্মাণ কৌশল শিখতে চান।

গুরুদেব বললেন, কোন পথে কিভাবে এসেছেন তিনি?

বিশ্ববিজয় বললেন, গুরুদেব! আমরা বানের রাজ্যে মৃত্যুর বিভীষিকাকে জয় করে এসেছি। গানের রাজ্যে আমরা জয় করেছি সুখের প্রলোভন। অজানার আতঙ্ককে জয়

করেছি কাঠঠোকরাদের মহাবনে। তারপর ভক্তি আর শ্রদ্ধায় মনকে কোমল করে আপনার কাছে এসেছি। এসেছি সব অহঙ্কারকে দূর করে।

গুরুদেব বললেন, গুপ্তবিদ্যা শেখালে কি গুরু-দক্ষিণা দিতে তুমি প্রস্তুত?

বিশ্ববিজয় বললেন, আপনি যা চাইবেন গুরুদেব। যদি চান আমি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি।

গুরুদেব বললেন, এখুনি দিতে পার!

বিশ্ববিজয় বললেন, এখুনি পারি গুরুদেব। শুধু তার আগে আপনাকে কথা দিতে হবে যে আমার প্রাণদানের পর আপনি সব কাকেদের গৃহ নির্মাণ কৌশল শিখিয়ে দেবেন। ওদের আশ্রয় তৈরী করতে শেখাব—এই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য গুরুদেব।

বিশ্ববিজয়ের কথা শেষ হতে না হতে গুরুদেবের নির্জন বাসের দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে একটি শীর্ণ বৃদ্ধ বাবুই বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বিশ্ববিজয়ের সামনে। বিশ্ববিজয় দেখল যেন তার সারা দেহ থেকে এক দিব্য জ্যোতি বেরিয়ে সারা অঞ্চলটা বিভায় ভরিয়ে তুলেছে। বিশ্ববিজয় তার পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দিয়ে বললেন, আমায় আপনার গৃহ-নির্মাণের গুপ্তবিদ্যা দান করবেন মহাদেব?

গুরুদেব স্মিত হাসলেন। বললেন, আমার এই গুপ্তবিদ্যা শুধু তোমাকে নয়। জগতের সমস্ত পাখীদের দান করব—এইতো আমার জীবনের সাধনা।

এ কথা বলতে বলতে গুরুদেবের কন্ঠ যেন কেমন হয়ে গেল। তিনি অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, জান। একদিন সবল পাখীর আক্রমণে আমি আর বাবুইনী দুজনে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বনে বনে। একটা জায়গা পাইনি যেখানে বাসা করা যায়—ডিম পাড়া যায়। এমন সময় দেখা হয় কাঠঠোকরাদের সাথে। তাদের কোটর তৈরী করা দেখেই বাসা তৈরী করার কল্পনা জাগে আমাদের। তারপর থেকে আমি আর বাবুইনী কত রকমেই যে বাসা তৈরীর চেষ্টা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে বাসা যেদিন তৈরী হল—তার আগেই বাবুইনী পরপারে চলে গেলেন। নিজের তৈরী বাসায় বাবুইনীকে নিয়ে ঢোকা আর হল না।

গুরুদেবের কন্ঠ বেদনায় ভারী হয়ে এল। গুরুদেব থেমে গেলেন। খানিক উদাসভাবে তাকিয়ে রইলেন আকাশের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জান, নিজের ঘর বাঁধতে না পারার দুঃখে আমি সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছি, সব পাখীদের উপযোগী বাসা তৈরী করব। তারপর শিখিয়ে দেব পাখীদের। পাখীর রাজ্যে আর ঘরের সমস্যা থাকবে না।

এরপর গুরুদেব বিশ্ববিজয়কে নিয়ে গেলেন কয়েকটি গাছে। সেখানে ছোট বড় নানা আকারের বাসা। গুরুদেব ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে থাকলেন, কোন বাসার কি সুবিধা, কোনটায় কি অসুবিধা। কোন পাখীর কেমন স্বভাব, সেই স্বভাবের সাথে বাসার কেমন করে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতে বিস্মিত হয়ে গেলেন বিশ্ববিজয়—বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। কত গভীরভাবে চিন্তা করেছেন আর তাকে কি নিপুণভাবে প্রয়োগ করতে কি নিষ্ঠার সাথেই সাধনা করেছেন গুরুদেব! ভাবতে ভাবতে শ্রদ্ধায় আবেগে উত্তাল হয়ে উঠল বিশ্ববিজয়ের মন। বিশ্ববিজয় বলে উঠলেন, আপনি আমার সাথে চলুন গুরুদেব। আমি সমস্ত পাখীদের আহ্বান করে আনব আমার রাজ্যে। আপনি তাদের সকলকে শিখিয়ে দেবেন তাদের জাতির উপযোগী বাসা তৈরী করতে। আপনি যাবেন গুরুদেব?

গুরুদেব বললেন, আমি যাব বলেই তো এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তোমার মতো একজনের অপেক্ষাতেই বসে আছি! আমি সৃষ্টি করেছি। তুমি প্রচার কর বিশ্ববিজয়।

বিশ্ববিজয় বললেন, আমি আমার সব ক্ষতি দিয়ে আপনার আকাঙ্খা পূরণ করতে চেষ্টা করব গুরুদেব।

গুরুদেব প্রসন্ন মনে চোখ বুজলেন।

।। বারো ।।

বিশ্ববিজয় তার বাবুই গুরুকে নিয়ে যেদিন কাক রাজ্যে ফিরে এলেন, সেদিন সমস্ত কাক রাজ্য জুড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেল। দীর্ঘ প্রবাসের পর ফিরে এলো যেসব কাকেরা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দের তো সীমা রইলই না। তার ওপরে যখন সকলে জানলো যে বিশ্ববিজয় সত্য সত্যই বাসা তৈরীর কৌশল শিখবার ব্যবস্থা করে এসেছেন এবং তিনি সঙ্গে করে যে বাবুই গুরুকে এনেছেন তিনি শুধু কাকদের নয়, সমস্ত পক্ষীকুলকেই শেখাবেন বাসা তৈরীর কৌশল আর এজন্য অচিরেই সমস্ত পাখীদের আহ্বান করা হবে এরাজ্যে তখন তাদের আনন্দের উন্মাদনা যেন সব নিয়ম শৃঙ্খলাকেও ভাসিয়ে নিয়ে চলল। সমস্ত কাক রাজ্য প্রাণভরা খুশীতে উছ্‌লে উঠল।

বাবুই গুরু কিন্তু একদিনও সময় নষ্ট করতে চাইলেন না। তিনি বললেন, বিশ্ববিজয়! আমি বুড়ো হয়েছি। মৃত্যু সমাগত। যদি মরি, তবে আমার সব বিদ্যা আমার সাথেই শেষ হয়ে যাবে। পৃথিবীর কোন কাজেই লাগবে না। অতএব আমি আগে কাজ শেষ করতে চাই। কাজ শেষের পরেও যদি বাঁচি, তখন হবে আনন্দ। তখন হবে উৎসব।

গুরুর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন বিশ্ববিজয়। তারা যেদিন এসে পৌঁছালেন কাক রাজ্যে তার পরদিন থেকে বাবুই-গুরু কাকেদের বাসা তৈরীর কৌশল শেখাতে লেগে গেলেন। তিনি নিজে বেঁধে দিলেন কাক রাজার রাজবাড়ি। বাড়ির চারদিকে এঁটে দিলেন নানা রকম প্রাচীর। তার গায়ে নানা রকম কারুকাজ। কাকেরা সেদিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। তারা গুরুর শেখান বিদ্যায় নিজ নিজ গৃহও তৈরী করে ফেলল। নিজ হাতে তৈরী নিজের বাসায় প্রবেশ করে কাকেদের স্ফূর্তি আরও বেড়ে গেল।

এদিকে বিশ্ববিজয় গুরুদেবের সাধনা এবং আকাঙ্খার কথা জানিয়ে এক পত্র রচনা করলেন। তারপর উপযুক্ত দূতের হাতে হাতে তা পাঠিয়ে দিলেন বিভিন্ন জাতের পাখীদের রাজাদের কাছে। সেই পত্রের শেষে কাক রাজ্যে এসে বাবুই গুরুর কাছ থেকে বাসা তৈরীর কৌশল শিখে যাবার আমন্ত্রণ রইল।

বিভিন্ন জাতের পাখীর রাজারা বিশ্ববিজয়ের এই আমন্ত্রণ আনন্দের সাথেই গ্রহণ করলেন। তাঁরা কেউ কেউ নিজেই এলেন সদলে, কেউ বা পাঠালেন তাদের প্রতিনিধি। তাদের আপ্যায়ন করা, গুরুদেবের সাথে পরামর্শ করে তাদের শিখবার সময় স্থির করা, তাদের আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করা—কাক রাজ্যে ব্যস্ততার অন্ত রইল না। কাক রাজ্যে মহা কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকার ছাড়া কাকেদের বিশ্রামের অবসর রইল না।

বাবুই-গুরু অক্লান্ত পরিশ্রমে মাত্র এক বৎসরের মধ্যেই সব রকম পাখীদের বাসা তৈরীর কৌশল শিখিয়ে ফেললেন। বাসা তৈরীর কৌশল শিখে পাখীদের শেষ দলটি যেদিন নিজের দেশে ফিরে গেল, সেদিন একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবুই-গুরু বললেন, বিশ্ববিজয় আজ আমার কাজ শেষ। আমার জীবনের ব্রত পূর্ণ। আজ আমি আনন্দিত।

বিশ্ববিজয় বললেন, গুরুদেব! আজ আপনি ভীষণ ক্লান্ত। আপনি বিশ্রাম গ্রহণ করুন গুরুদেব। কাকিনীরা আজ থেকে আপনার পরিচর্যা করবে।

কাকিনীদের পরিচর্যায় দু-একটা বিশ্রামের দিন কাটাতে না কাটাতে বাবুই-গুরু ডেকে পাঠালেন বিশ্ববিজয়কে। বললেন, বিশ্ববিজয়, এখানে আর আমার ভাল লাগছে না। এবার আমাকে বিদায় দাও।

বিশ্ববিজয় একথা শুনে অ্যাঁৎকে উঠলেন। বললেন, সে কি কথা গুরুদেব! এখানে আপনার কেন ভাল লাগছে না? কাকিনীরা কি ঠিকমত পরিচর্যা করছে না?

গুরুদেব বললেন, তাদের পরিচর্যার কোন ত্রুটি নেই। মা নিজের ছেলেকেও এত পরিচর্যা করে না।

তবে কি আপনার কোন কিছুতে অভাব আছে গুরুদেব? জানতে চাইলেন বিশ্ববিজয়। থাকলে সংকোচ না করে বলুন। আমি নিশ্চয় পূরণ করব।

গুরুদেব স্মিত হাসলেন। বললেন, আমার দিকে চেয়ে দেখ দেখি বিশ্ববিজয়। আমার মত সুবৃদ্ধ কাউকে কি কোন অভাব পীড়িত করতে পারে? তার চাইতেও বড় কথা, আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখ, তোমার লোকেরা না চাইতে আমার ঘর কত রকম জিনিসে বোঝাই করে দিয়েছে।

বিশ্ববিজয় অবুঝের মত বললেন, তবে আপনি যেতে চাইছেন কেন গুরুদেব? আপনাকে আমাদের মন কিছুতেই ছেড়ে দিতে চায় না।

গুরুদেব বললেন, সে আমি জানি বিশ্ববিজয়। তুমি শুধু আমাকে সম্মান দাওনি, শুধু আমার জীবন ব্রতকে সফল করবার উপায় তৈরী করে দাওনি—তুমি আমায় আত্মীয়ের মত ভালবেসেছ। আমায় বিদায় দিতে তোমার বুক ভেঙ্গে যাবে।

বিশ্ববিজয় বললেন, তবে আপনি বিদায় চাইছেন কেন গুরুদেব! আপনি আমার কাছে থাকুন। আমি আপনার পাদবন্দনা না করে কোন দিন জল গ্রহণ করব না। আপনার সর্ব-সুখ বিধান করে তবে বিশ্রামের কথা চিন্তা করব।

গুরু আবেগে বললেন, আর আমাকে লোভ দেখিও না বিশ্ববিজয়। আনন্দে আমার বুক ফেটে যাবে। আমার এত সুখ, এত ঐশ্বর্য দুঃখিনী বাবুইনীটা দেখে যেতে পারল না। এসব দেখলে সেই সবচেয়ে আনন্দিত হত। বলতে বলতে অঝোরে কেঁদে ফেললেন গুরুদেব। খানিক কেঁদে শান্ত হয়ে বিশ্ববিজয়ের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, বাবা বিশ্ববিজয়, আমি বুড়ো হয়েছি। বড়ই বুড়ো। আমি দেশে ফিরে আমার নিজের বাড়িতে, স্বজনদের মধ্যে থেকে মরতে চাই। আমার এই শেষ অভিলাষে তুমি বাধা দিও না।

বিশ্ববিজয় এরপর ওঁকে বাধা দেবার আর কোন যুক্তি খুঁজে পেল না। সমস্ত দুঃখটাকে নিজের বুকে চেপে বলল, বেশ তবে তাই হোক গুরুদেব। আপনার অভিলাষই পূরণ হোক। তবে আপনাকে বিদায় দেবার আগে আপনাকে ঘিরে আমাদের এক বিদায় অভিনন্দন উৎসবের আয়োজন করতে অনুমতি দিন।

গুরুদেব হাসলেন। বললেন, বেশ। কর আয়োজন।

উৎসব ঘোষণার শুরু হতে না হতেই কোকিল দলপতি আদি কোকিল এসে উপস্থিত হলেন দলবল নিয়ে। বিশ্ববিজয়ের নিমন্ত্রণে যেসব পাখী গুরুর কাছে বাসা তৈরীর কৌশল শিখে গিয়েছিল তারাও এসে উপস্থিত হল। দেখতে দেখতে জমে উঠল উৎসব।

জমা উৎসবের মধ্যে তালভঙ্গ করল কাকিনীর দল। তাদের ডিম পাড়বার সময় হয়েছে। গুরুদেবের আশীর্বাদে এবার তারা নিজের নিজের বাসায় ডিম পাড়বে। কিন্তু যতদিন সে ডিম না ফুটছে ততদিন কাকিনীদের অবসর কোথায়? তবে কি বাবুই-গুরু তাঁর বিদায় অভিনন্দন উৎসবে কাকিনীর উপস্থিতি চান না?

কাক রাণী রূপসী স্বয়ং অন্য কাকিনীদের সাথে করে এই অভিযোগ নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন গুরুদেবের সামনে।

রূপসীর ছলছল চোখের দিকে তাকিয়ে গুরুদেব বললেন, তোমাদের অখুশী রেখে আমি যেতে পারব না। অতএব উৎসব চলছে চলুক। ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা বড় করে তোমরা যেদিন অবসর নিয়ে এসে আমায় বিদায় দেবে আমি সেই দিনই যাব। তার আগে নয়।

চোখ মুছে রূপসী প্রণাম করলেন গুরুদেবকে। অন্য কাকিনীরা গুরুদেবের জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। ওদের হাসি ঝকঝকে মুখের দিকে তাকিয়ে গুরুর মনটাও খুশী হয়ে উঠল। কাকিনীরা মনের খুশীতে বাসায় ফিরে বসল ডিম পাড়তে, ডিমে তা দিতে, বাচ্চা ফুটিয়ে তাকে বড় করে তুলতে।

কাকেদের ডিম ফুটল। বাচ্চা একটু একটু করে বড় হতে থাকল আর সারা বসন্তকাল ধরে চলল উৎসব। গাছ ভর্তি ফল, বাতাসে অবিরত ফুলের বাস, ঝরণার জলে মিষ্টি আস্বাদ—আর তার সাথে কোকিলদের গান। সকলে খুশীর নেশায় যেন চুর হয়ে রইলেন। স্বয়ং গুরুদেব পর্যন্ত বারংবার তালে তালে দুলে উঠতে লাগলেন।

ক্রমে বসন্ত শেষ হয়ে এলো। একটু একটু করে গরম বাতাস বইতে শুরু করল। বাবুই-গুরু বললেন, বিশ্ববিজয়। এবার কাকিনীদের ডাক। এবার তারা উৎসবে যোগ দিক।

গুরুদেবকে কথার ফাঁকে ফেলে যতদিন ধরে রাখা যায়, এই ছিল রাণীর গোপন ইচ্ছা। তাই যাওয়ার মত অবসর

বহুদিন মিললেও রাণী বা কোন কাকিনী এতদিন উৎসবে যোগ দেয়নি। কিন্তু আর তো বসে থাকা যায় না। গুরুদেব স্বয়ং যখন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্তব্য। তাই দুঃখে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাকিনীদের নিয়ে রাণী এসে উপস্থিত হলেন গুরুদেবের বিদায় সভায়।

কাকিনীরা দল বেঁধে মালা গেঁথে, মালায় মালায় ভরিয়ে দিল গুরুদেবের কণ্ঠ। তারা ছোট্ট গেরুয়া উত্তরীয়খানিতে গেঁথে দিল কাক পুরাণের নানা কাহিনী। নানা মাঙ্গলিক আবরণে কামনা করল গুরুদেবের দীর্ঘ জীবন। তারপর বিদায়ের কথা বলতে গিয়ে চোখের জলে ভিজিয়ে দিল গুরুদেবের পা দুখানি। আঁচল দিয়ে সে জল মুছিয়ে দিয়ে কাকিনীরা সার দিয়ে দাঁড়াল যাত্রা পথের দুই ধারে।

এবার বিশ্ববিজয় আদি কোকিলকে বললেন, হে গায়ক-রাজ! তুমি বিদায়ের এই চরম মুহূর্তে তোমার পরম আনন্দের গানখানি গেয়ে আমাদের মন ভরিয়ে দাও।

আদি কোকিল গাইল—

আনন্দে তো প্রাণ ভরে না
জাগে করুণ রেশ
সুখের কথা কইতে গিয়ে
দুঃখেই হল শেষ॥

বিশ্ববিজয় বললেন, হে আদি কোকিল! তুমি বসন্ত রাজের অনুচর। চিরকাল তুমি আনন্দে বিভোর হয়ে আছ। তোমার কণ্ঠে এ বেদনার সুর কেন? এতো তোমায় শোভা পায়না!

আদি কোকিল বললেন, সারা জীবন ধরে এই সত্যই যে দেখলাম মহারাজ। বসন্ত রাজের সাথে ঘুরে ঘুরেও দেখ-লাম, আনন্দেই সব শেষ নয়। এই যে ফুল ফোটে, তা কি থাকে মহারাজ! শুকিয়ে যায়। এই যে বসন্ত এসে-ছিল, তাও কি শুধুমাত্র দুঃখের স্মৃতি রেখে মিলিয়ে যাবে না মহারাজ? এই যে সারা বিশ্ব খুঁজে এক নির্জন আবাস থেকে বাবুই-গুরুকে এনে বাসা তৈরীর কৌশল শিখলেন, আপনার একটা কত বড় আকাঙ্খা পূরণ হল, তবু কি আপনি সুখী মহারাজ?

বিশ্ববিজয় বললেন, কেন সুখী নই আদি কোকিল? এখন আমরা নিজের তৈরী বাসায় বাস করছি. সেই বাসাতে ডিম পেড়েছে কাকিনীরা। সেখানেই ডিমে তা দিয়েছে. বাচ্চা ফুটেছে, বাচ্চা বড় হচ্ছে। আর কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের কল-কাকলিতে ভরে উঠবে আমাদের গৃহ. আমাদের নিকুঞ্জ, ভরে উঠবে সমগ্র অরণ্য। আমরা সুখী না হব কেন আদি কোকিল? আমরা সুখী। ভীষণ সুখী!

বিশ্ববিজয় সমস্ত কাকেদের দিকে তাকালেন। বললেন, সুখী নও তোমরা? কি তোমাদের অভিমত?

চারিদিক থেকে শত শত কাক কাকিনী মহারাজের প্রতি-ধ্বনির মত চেঁচিয়ে উঠল, আমরা সুখী। ভীষণ সুখী।

সেই উত্তর শুনে আদি কোকিল ম্লান হাসল। বলল আপনার সুখ চিরস্থায়ী হোক মহারাজ।

সভা মণ্ডপের একপাশে একদল পাইক বরকন্দাজ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মহামাত্য দীর্ঘচঞ্চু জংবাহাদুর ছাই। তিনি এদের সঙ্গে নিয়ে গুরুদেবকে পেঁছে দেবেন তাঁর দেশে। বরকন্দাজেরা বয়ে নিয়ে যাবে গুরু-দেবের জন্য শত শত উপহার। যত শীঘ্র যাত্রা শুরু করা যায় ততই মঙ্গল। মহামাত্য তাই এই সব অর্থশূন্য কথা-বার্তায় সময় নষ্ট করায় অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, মহারাজ! যাত্রার শুভক্ষণ সমাগত. আপনি আদেশ দিন। আমরা যাত্রা শুরু করি।

বিদায়ের চরম মুহূর্ত এগিয়ে এলো। মহারাজ তাঁর আসন থেকে নেমে থমথমে মুখে গিয়ে প্রণাম করলেন গুরু-দেবকে। গুরুদেব হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু তার কন্ঠ দিয়ে কোন আশীর্বচন বের হল না। গুরুদেব সহসা বুঝলেন তাঁর চোখের দৃষ্টি অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে গেছে। গুরুদেব সজোরে বিশ্ববিজয়কে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। গুরু-শিষ্য দুজনেই হু হু করে কেঁদে উঠলেন। সমস্ত সভায় কারো চোখ আর শুকনো রইল না।

জংবাহাদুর বুঝলেন, এভাবে চললে সারা দিনেও বিদায় পর্ব শেষ হবে না। তাই তিনি বাদ্যকরদের ইঙ্গিত দিলেন। তারা সমবেতভাবে বাজিয়ে দিল যাত্রারম্ভের ঐক্যতান। ওরা সবাই কুচকাওয়াজ করে এগুতে থাকল। তখন জংবাহা-দুর গিয়ে গুরু-শিষ্যকে বিচ্ছিন্ন করে গুরুকে নিয়ে চলল শোভাযাত্রার সাথে। এক সময় তাঁকে মাঝখানে রেখে ওরা সবাই ডানা মেলে দিল। স্তব্ধ সভাস্থল বেদনাভরা চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

দেখতে দেখতে জংবাহাদুরের দল একটা সোনালী মেঘের আড়ালে চলে গেল। যে ক্ষীণ বাদ্যধ্বনি কানে আসছিল তাও বন্ধ হয়ে গেল। দেখা গেল সমস্ত সভাস্থল যেন পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে। গাছের পাতাগুলোও কাঁপছে না। আদি কোকিল তাকিয়ে দেখল সেই নীরব নিশ্চলতার মধ্যে একমাত্র বিশ্ববিজয়ের চোখ থেকে গাল বেয়ে নামছে দুটি সচল জলের ধারা। আদি কোকিল ধীর পায়ে বিশ্ববিজয়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, মহারাজ!

বিশ্ববিজয় সে ডাকে যেন সম্বিত ফিরে পেলেন। তিনি চোখ মুছে নিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামলে নিলেন নিজেকে। তারপর তাকালেন আদি কোকিলের দিকে। বললেন, কিছু বলবে আদি কোকিল?

আদি কোকিল বলল, গ্রীষ্ম যে এসে গেল মহারাজ!

বিশ্ববিজয় ম্লান হাসলেন। বললেন, ঠিকই তো আদি কোকিল। এখন যে বসন্তেরও যাবার পালা। তোমাদেরই বা আটকে রাখি কি বলে! দুঃখের স্মৃতির ভার রেখে তোমরাও চলে যাও আদি কোকিল।

আদি কোকিল বলল, দুঃখের স্মৃতি হবে কেন মহারাজ। বলুন নিবিড় আত্মীয়তার প্রণয়-চিহ্ন। বসন্ত এলে আবার আসব মহারাজ।

বিশ্ববিজয় বললেন, এসো।

আদি কোকিল তার দলবল নিয়ে উড়ে চলল।

আদি কোকিলের দল নিঃশব্দে উড়ে গেল বহুদূর। তারপর তারা এক আশ্চর্য সুরে গান গেয়ে উঠল। সে সুর কাকেদের কানের ভিতর দিয়ে যতই মরমে প্রবেশ করতে থাকল ততই তারা এক হিমেল আতঙ্কে অবশ হয়ে যেতে

থাকল। ওরা একটা দুর্বোধ্য স্থির যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকল।

ওদের সেই অবশ যন্ত্রণার মধ্যে কাকেদের বাসায় বাসায় জেগে উঠে কলবর শুরু করে দিল বাচ্চারা। সহসাই তাদের ভেতর থেকে একদল গেয়ে উঠল কোকিলের সুরে। তারপর তারা কাকেদের বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে উড়ে যেতে থাকল কোকিলদের দলের দিকে। আর বাসায় বাসায় পড়ে থাকা কাক-শিশুরা এই অভূতপূর্ব ঘটনার আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

কাক-শিশুদের আতঙ্কিত চিৎকার কানে যেতেই কোকিল-দের গানের জাদু যেন কেটে গেল। জেগে উঠল কাকেরা। মহারাণী রূপসী চিৎকার করে এসে লুটিয়ে পড়লেন মহা-রাজের পায়ে। বললেন, একি হল মহারাজ! কাক-শিশুরা হঠাৎ কোকিল হয়ে উড়ে গেল কেন?

বিশ্ববিজয় বুক ভাঙ্গা কান্নায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠকি-য়েছে। আমাদের একেবারেই ঠকিয়েছে।

সেনাপতি মহাবিক্রম বললেন, কে মহারাজ? কে?

বিশ্ববিজয় বললেন, এই কোকিলেরা। আমাদের গানে ব্যস্ত রেখে আমাদের বাসায়, আমাদের ডিমের বদলে ওদের ডিম রেখে এসেছে।

রূপসী বললেন, তাহলে আমরাই ওদের ডিমে তা দিয়েছি। বাচ্চা ফুটিয়েছি। ওদের বাচ্চাকে আদর করে, খাবার খাইয়ে বড় করেছি!

কাকেরা চিৎকার করে উঠল, মহারাজ! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি দিন।

ক্রোধে বিশ্ববিজয়ের চোখ লাল হয়ে উঠল। তার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হল। চোয়ালের হাড় দুটো কঠিন হয়ে উঠে বুঝিয়ে দিল, তিনি মনে মনে কঠিন সংকল্প গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিজয় আদেশ দিলেন, সেনাপতি। তুমি এখুনি আক্র-মণ কর কোকিলদের। একটি কোকিল ছানাও যেন ওদের সাথে ফিরে না যায়। কোকিল ছানার রক্তে লাল করে দাও আমাদের বনভূমি।

সাথে সাথে সেনাপতি রণ শিঙ্গায় ফুঁ দিলেন। দিকে দিকে বেজে উঠল রণবাদ্য। কাক সৈনিকেরা তাদের তীক্ষ্ম-তম অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। রাজার সামনে মাথা নুইয়ে সেনাপতি মহাবিক্রম রাজার শেষ আশীর্বাদ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন যাত্রা শুরু করবার জন্য।

কিন্তু তিনি এক পা না যেতেই মহারাণী রূপসী চেঁচিয়ে উঠলেন, দাঁড়ান সেনাপতি। বলেই মহারাণী ঘুরে দাঁড়ালেন মহারাজের দিকে। বললেন, সেনাপতিকে যুদ্ধ যাত্রা স্থগিদ রাখতে বলুন মহারাজ!

রাজা ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন মহারাণীর দিকে। তিনি যেন জানতে চাইলেন রাণীর এমন অনুরোধের কারণ।

রাণী বললেন, মহারাজ! কোকিলেরা আমাদের ঠকি-য়েছে। কোকিল ছানাদের কি অপরাধ মহারাজ! কোকিল-ছানা হলেও আমাদেরই তাপে ওরা প্রাণ পেয়েছে। আমা-দেরই স্নেহে বড় হয়েছে ওরা। ওরা বেঁচে থাক মহারাজ। ওরা সুখে থাক।

রাজা বিহ্বলভাবে তাকালেন অন্য কাকিনীদের দিকে। তারাও চোখ মুছতে মুছতে বললে, সেই আদেশই দিন মহারাজ! ওরা বেঁচে থাক। কোকিল হলেও ওরা যে আমাদেরই শিশু মহারাজ।

রাজা নূতন দৃষ্টিতে তাকালেন কাকিনীদের দিকে। তাঁর মনে হল মিথ্যে কোকিলদের কথা। মিথ্যে কোকিলদের সুর। তার চাইতেও বড় সত্য প্রতিষ্ঠা করেছেন কাকি-নীরা। আনন্দের মধ্যেও দুঃখ নয়—গড়তে জানলে দুঃখের মধ্যেও আনন্দ জাগিয়ে তোলা যায়। কাকিনীরা তাই করেছেন।

বিশ্ববিজয় মনে মনে কাক জননীদের পায়ে প্রণাম কর-লেন। রাজার মনে আনন্দের সুর রণ-রণিয়ে উঠল।

জানো কি?

—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই দেখে থাকবে। সকালবেলা নবোদিত সূর্যের সোনালী আলোয় তুষারমণ্ডিত ঐ শৈলশিখর যখন ঝলমল করতে থাকে, তখন মনে হয়, ওর কাঞ্চনজঙ্ঘা নামটি সার্থক। কিন্তু শরীরের এত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকতে হঠাৎ জঙ্ঘার সঙ্গে তুলনার কথা আমাদের পূর্বপুরুষদের মাথায় এল কেন? আসলে ওটা তিব্বতী ভাষায় 'কাঙ্-ছেন্-জা-ঙ্গা' অর্থাৎ 'মহাতুষারময় পঞ্চরত্নপেটিকা'। আমরা ঐ বিদ্ঘুটে শব্দটাকে সংস্কৃতের সাজ পরিয়ে জাতে তুলেছি বটে, তবে অর্থটা আগেও মন্দ ছিল না। আমাদের পুরাণকারেরা গ্রীক 'দেমেত্রিউস'কে 'দত্তমিত্র' করেছেন, পিতামহেরা অনার্য 'দাম্-উ-দা'কে 'দামোদর' করেছেন, সুতরাং এত কাছাকাছি সংস্কৃত শব্দ থাকতে 'কাঙ-ছেন্-জা-ঙ্গা'কে ছাড়বেন কেন?

সকাল থেকে অনেক রাত অবধি এ রাস্তায় বাস চলাচল করে। কলকাতার মহানগরীর গা থেকে বেরিয়ে এসেছে এই সুদীর্ঘ ট্রাংক রোড। পথের দু'ধারে পর পর সাজানো বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট, কল-কারখানা। এই পথে যানবাহনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও চলার বিরাম নেই। সবাই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে। বাসগুলো প্রায় সব সময়ই যাত্রী-বোঝাই। কোনোটা কলকাতা থেকে আসছে, কোনোটা বা যাচ্ছে কলকাতার দিকে।

—পাটকল; পাটকল। একদম রোক্‌কে। জেনানা হায়!

অভ্যাস কিম্বা নিয়মানুযায়ী কন্‌ডাক্‌টরগুলো চেঁচায়। পাটকলের সামনের স্টপেজে বাস থামে। যাত্রীরা ওঠানামা করে। তারপর আবার চলতে শুরু করে। শ্যামবাজার থেকে এই জায়গায় পৌঁছতে বাসে মিনিট পনেরো সময় লাগে। বাস এখানে টাইম নেয়। তাই কিছুক্ষণ দাঁড়ায়।

কলকাতা থেকে আসা বাসগুলো যখন পাটকল স্টপেজে এসে থামে, তখন প্রতিটি বাসের কাছে একটি লোক এসে হাজির হয়। এক বুড়ো ভিখিরী। তার মাথায় সাদা ধপ-ধপে এলোমেলো ঘন পাকা চুল। মুখ ভর্তি সাদা দাড়ি-গোঁফ। গায়ে ছেড়া মলিন গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। স্বাস্থ্য ভালই। তবে ডান পা-টি খোঁড়া। লাঠির ওপর ভর দিয়ে পা টেনে টেনে আস্তে আস্তে চলে। চোখ দুটি তার বড় করুণ। বাসের জানলার পাশে এসে ভিক্ষাপাত্র টিনের কৌটোখানি বাড়িয়ে ধরে। মৃদু এবং কাতর স্বরে শুধু বলে—হরি, হরি। মঙ্গল হোক।

অজেয় রায়ের উপন্যাসোপম বড় গল্প

ছ দ্ম বে শী

বাসের সব জানলার ধারে ধারে সে ঘুরে যায় একই কথা বলতে বলতে। ভিখিরীর কাতর স্বর, অসহায় দৃষ্টি অনেক যাত্রীর মনেই করুণা জাগায়। টুং-টাং পয়সাও পড়ে কৌটোয়।

সকাল থেকে রাত অবধি বুড়ো পাটকল স্টপেজে ভিক্ষে করে। দুপুরে এক হোটেল থেকে ভাত বা কয়েকখানা রুটি আর একটু তরকারী কিনে খায়। কখনও খিদে পেলে মুড়ি চিবোয়, সঙ্গে ভাঁড়ের চা।

বেশ রাত হয়েছে।

কলকাতা থেকে লাস্ট বাস চলে গেল। বৃদ্ধ ভিক্ষুক এক দোকানের রকে গিয়ে বসল। ভিক্ষে-করা আজকের মত শেষ। এবার বাড়ি ফেরার পালা।

একটু পরেই একটা লরি সগর্জনে বড় রাস্তার ওপরে পাটকলের বাস স্টপেজে এসে থামলো। ড্রাইভার শিউপ্রসাদ হাঁক দিল—এও বুড্ঢা, আ যাও জলদি।

বুড়ো ভিখিরী তাড়াতাড়ি পা হেঁচড়ে হেঁচড়ে লরির কাছে এগিয়ে গেল। শিউপ্রসাদ দরজা খুলে দিল। ভিখিরীটি তার পাশের সিটে উঠে বসল। শিউপ্রসাদের গাড়ি গ্যারেজে ফিরছে। যাবার সময় সে প্রায়ই বুড়োকে তুলে নেয়। লেংড়া আদমী, হেঁটে হেঁটে এত রাতে শ্যামবাজারে ফেরে। তাই শিউপ্রসাদ দয়া করে তাকে লিফ্‌ট দেয়। একটা কারণ আছে অবশ্য। একদিন শিউপ্রসাদ পাটকল স্টপেজে

গাড়ি থামিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খানিক আড্ডা মেরে চলে গিয়েছিল। বাড়ি ফিরে সে আবিষ্কার করে, তার মানিব্যাগ নেই। গোটা দশেক টাকা ছিল। তা থাক্‌গে। কিন্তু ব্যাগে ছিল তার গাড়ি চালাবার লাইসেন্স এবং আরো কিছু দরকারী কাগজ। পরদিন খুঁজতে যেতে ওই বুড়ো ভিখিরী তাকে পুরো টাকা ও কাগজ সহ ব্যাগ ফেরত দিল। সে পথে কুড়িয়ে পেয়েছিল। চিনতে পেরেছিল, এটা ড্রাইভার শিউ-প্রসাদের পয়সার ব্যাগ। একটি পয়সাও সে খরচ করেনি ঐ ব্যাগ থেকে। সেই উপকারের প্রতিদানে শিউপ্রসাদ ভিখিরীকে তার লরিতে করে পেঁৗছে দেয় শ্যামবাজার পর্যন্ত। তবে কোনো কোনো দিন শিউপ্রসাদ আসতে পারে না। সেদিন ঐ বুড়ো ভিখিরীকে পায়ে হেঁটেই ফিরতে হয়।

নির্জন পথে হু-হু করে লরি ছুটছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লরি শ্যামবাজার পেঁৗছে গেল। এক বস্তির কাছে বুড়ো লরি থেকে নেমে পড়ল। শিউপ্রসাদ আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল। এবার তাকে গ্যারেজে যেতে হবে।

বুড়ো ভিখিরী ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে বস্তির ভিতরে ঢোকে।

বিরাট বস্তি। অজস্র তার অলি-গলি। ছোট ছোট বাড়ি। নোংরা সরু রাস্তা, অন্ধকারাচ্ছন্ন। কাঁচা নর্দমার বিকট গন্ধ। খুপরি খুপরি ঘরগুলোর অধিকাংশেই কোনো আলোর চিহ্ন নেই। কদাচিৎ কোথাও মিটমিট করে কেরো-সিনের কুপি বা লণ্ঠন জ্বলছে। কোনো ঘর থেকে কথা-বার্তা শোনা যাচ্ছে, আবার কোনো ঘর থেকে ভেসে আসছে মত্ত কণ্ঠের হুল্লোড়-হাসি অথবা ঝগড়ার আওয়াজ। ভিখিরী এগিয়ে চলল আপনমনে।

একটা ঘরের সামনে এসে থামল। মাটির দেওয়াল, খোলার ছাউনি দেওয়া ঘরখানা। দরজায় ঝুলছে চটের পর্দা। পর্দা সরিয়ে সে ভিতরে ঢুকল।

ঘরের ভিতরের দৃশ্য বিচিত্র। এটা যেন ভিখিরীদের এক আড্ডাখানা। নানা ধরনের ভিখিরীতে ঘর ভর্তি। আসর জম-জমাট। এক কোণে একটি লণ্ঠন জ্বলছে। অদ্ভুত-দর্শন কত ভিখিরী। কেউ খোঁড়া, কেউ অন্ধ, কারো বা গায়ে দগদগে বীভৎস ঘা। নানা বয়সী লোকগুলো, কেউ শুয়ে, কেউ বসে। কেউ চুপচাপ। কয়েকজন গল্পও করছে। বিড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে নাকে আসছে গঁাজার কটু গন্ধ। তার সাথে সাথে চলেছে আরো কিছু নেশার সমারোহ।

বুড়ো ঘরের লোকদের পাশ কাটিয়ে ওধারের একটা দরজা দিয়ে চলে গেল। এই আড্ডাখানার লাগোয়া আর একটি ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের কেউই প্রায় খেয়াল করলো না তাকে। দু'একজন ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মাত্র।

এই আড্ডাখানার একটা স্থানীয় নাম আছে। বস্তির লোকে বলে—"লাটু মাস্টারের স্টুডিও"। এই নামেই আড্ডাখানাটি বস্তিবাসীদের কাছে পরিচিত।

মিনিট পনেরো পরে।

"লাটু মাস্টারের স্টুডিও" থেকে বেরিয়ে গলিতে নামল একটি বছর কুড়ি-বাইশের যুবক। তার পরনে ময়লা শার্ট ও ফুল প্যান্ট। আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে সে এগিয়ে চলল। বস্তির শেষ প্রান্তে একটি বাড়ির সামনে এসে সে দাঁড়াল। বস্তির এই প্রান্তে কিছু দুঃস্থ, ভদ্র পরিবারের বাস। বাড়িগুলি ইটের। টিনের চাল। যুবকটি একটা দরজায় টোকা মারল—খট্ খট্।

কপাট খুলে গেল। এক প্রৌঢ়া মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে। বললেন,—কে, রতন এলি? উঃ কত রাত হল। কি যে ভাবনা হয়।

অত ভাবনার কি আছে মা? কলকাতা শহরে এ আর এমন কি রাত!—বলতে বলতে যুবক, মানে রতন ঘরে ঢোকে।

ঘরের মেঝেয় শতরঞ্চীর ওপর একটি দশ-বারো বছরের ছেলে ঘুমিয়ে আছে। ঘরের কোণে কয়েকটি বাক্স। দেও-য়ালের গায়ে পেরেক লাগানো দড়িতে ঝুলছে কিছু জামা-কাপড়। আর এক কোণে জ্বলছে একটি হ্যারিকেন, যার চিমনিটার অর্ধেক কালিতে ঢাকা। সেই আলোতে ঘরের মানুষগুলির চেহারাও দেখায় কিম্ভূতকিমাকার। দেখলেই বোঝা যায়, অতি দীন-দরিদ্র পরিবার। রতন চটপট হাত-পা মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসল পাশের ঘরে।

এই ছোট্ট ঘরখানিতে রান্না ও ভাঁড়ারের ব্যবস্থা। খাবার হল, পাঁচ-ছ'খানা রুটি ও অল্প তরকারী। রতন চুপচাপ খায়। মা সামনে বসে। রতনের মা বললেন—বড় খাটছিস তুই, রতন। এমন করলে কিন্তু শরীর টিকবে না। কোন সকালে বেরোস। দুপুরে খাস তো ঠিক মত?

—হুঁ, খাই।

—কোথায়? হোটেলে বুঝি?

—হুঁ।

—তা বাড়ি এসে দুটো খেয়ে যেতে পারিস না?

—না, না। অনেক দূর যে, আসা-যাওয়া করতে ভীষণ অসুবিধে হয়। পারলে কি আসতাম না মা!

রতন মাথা নিচু করে খেয়ে যায়। যথাসম্ভব কম কথা বলে। কি জানি, আরও কি প্রশ্ন করবে মা। মা প্রায়ই জানতে চায়।—রতন কি কাজ করে? কত মাইনে? দু'একজন প্রতিবেশীও ও বিষয়ে কৌতূহল দেখায়। রতন কোনো রকমে এড়িয়ে যায়। ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। যদি মা জেনে ফেলে। যদি ছোট ভাই মনি জানতে পারে, তার দাদার টাকা রোজগারের আসল পন্থা। ভিখিরীর ছদ্মবেশে রতন ভিক্ষে করে। এ কথা জানলে ঘৃণায়, লজ্জায় তারা যে শিউরে উঠবে। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও যেটুকু মান-ইজ্জত আছে, তাও ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি তার? আয় না থাকলেও দায় তো আছে। নিজে বাঁচার, মা-ভাইকে বাঁচানোর দায়।

জাল ভিখিরী সেজে এই রোজগারের সন্ধান তাকে দিয়েছিল বিশু। রতনদের পাশের বাড়িতেই থাকে বিশু।

বাবা হঠাৎ মারা যেতে চোখে অন্ধকার দেখেছিল রতনরা। তখন রতন কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। হাতে সামান্য পুঁজি। প্রাণপণে সে একটা চাকরির খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু এ বিষয়ে সাহায্য করার মত তেমন চেনা-জানা বা আত্মীয়-স্বজন ছিল না তাদের। তাই অনেক

ঘোরাঘুরি করেও কোনো কাজ জোটাতে পারল না। কলকাতা শহরে চাকরি পাওয়া যে মরুভূমিতে জল পাওয়ার মতই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার তা রতন বেশ ভাল করেই বুঝলো।

দিনে দিনে অবস্থা চরম আকার ধারণ করলো। দোকানে ধার জমল। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়ল। শেষে খরচ কমাতে নিরুপায় হয়ে তারা এই বস্তিতে এসে আশ্রয় নিল।

টুকিটাকি জিনিস নিয়ে রাস্তায় ফিরি শুরু করলো রতন। কিন্তু সে আনাড়ী ও লাজুক। এ লাইনে জোর কম্পিটিশন্। বিক্রি জমে না। আয় নেই, তাই দিনও চলে না। মরিয়া হয়ে স্টেশনে কুলিগিরির চেষ্টা করেছিল। হায়! সেখানেও সুবিধে হল না। কুলি সর্দার মোটা সেলামী হাঁকল। অত টাকা দেবার সামর্থ কোথায়? বাধ্য হয়ে আবার সে হকারি ধরল।

বিশু যেমন আলাপ করেছিল তার সঙ্গে। ভারি পরোপকারী ছেলে। রতনেরই বয়সী সে। তাদের অবস্থার কথা শুনে বারবার বলেছিল—কিছু দরকার পড়লে আমায় জানিও। লজ্জা কোর না।

বিশু এক মোটর গ্যারেজে কাজ করে। রতনকে আশ্বাস দিয়েছিল—দাঁড়াও না ভাই, মালিককে বলে-করে আমাদের কারখানায় তোমাকে ঠিক ঢুকিয়ে দেব। প্রথমে হেল্পার তারপর কাজ শিখলে হবে মেকানিক।

আশায় বুক বাঁধে রতন। দিন যায়, দিন আসে। কিন্তু বিশুর গ্যারেজে নতুন লোক আর নেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে রতন হতাশায় ভেঙে পড়ে।

একদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেছে রতন।

সামান্য বিক্রি যা হয়েছিল তা গেছে পুলিশের পেটে। ঘুষ। বিনা লাইসেন্সে ফিরি করছে, তার মাশুল। নইলে সব মাল কেড়ে নিত। ঘরে এক কণা চাল নেই। বারান্দায় মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল। বিশু সামনে দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল। কাছে এসে বলল—কি ব্যাপার? শরীর খারাপ নাকি?

—না।

—তবে? হুঁ, বুঝেছি। বিক্রি-টিক্রি হয়নি। ঘরে কিছু নেই বুঝি?

রতন মাথা নাড়ে।

তা আমাকে বলতে কি দোষ ছিল? এই নাও।—বিশু দুটো টাকা বাড়িয়ে দেয়।

রতন কাতর কণ্ঠে বলল—আর পারছি না বিশু। দাও না কিছু জুটিয়ে। যে কোনো কাজ। যদ্দিন তোমাদের কারখানায় কাজ না পাই। অন্ততঃ দু'বেলা খেতে পাবার ব্যবস্থাটুকু হোক।

বিশু একটু হাসল। বলল—যে কোনো কাজ? বেশ; তা ভিক্ষে করতে পারবে? দিব্যি রোজগার। ভালভাবে সংসার চলে যাবে।

সেকি!—রতন চমকে উঠল।—ভদ্রলোকের ছেলে ভিক্ষে করব? না; না।

বিশু বলল—জানি, পারবে না। ঠিক আছে ঘাবড়িও না! ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। ততদিন আমি তো আছি। সব পাওনা থাকবে। পরে সুদে-আসলে উশুল করে নেব, বুঝলে?

হো হো করে হেসে, ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বিশু চলে গেল।

এইভাবে বারবার বিশুর কাছে হাত পাততে রতনের সঙ্কোচ হয়। তার ঘাড়েও বড় সংসার। মা আর চার ভাই-বোন। কতই বা মাইনে পায়!

দুর্দশা আরও ঘনিয়ে এল। মা জ্বরে পড়ল। রতন ডাক্তার আনে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন—জ্বর তেমন সিরিয়াস নয়। ফ্লু হয়েছে। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। কিন্তু পেসেন্টের শরীর খুব উইক। টনিক আর ভাল খাওয়া-দাওয়া না পেলে পরে কঠিন রোগে পড়বে।

দুমুঠো অন্ন জোগাতে হিমসিম খাচ্ছে। তার ওপর টনিক-ভিটামিন, ভাল খাবার-দাবার আসবে কোত্থেকে? কিন্তু মাকে কি চোখের সামনে তিলাতল করে শেষ হয়ে যেতে দেখবে রতন। তার কোনো কর্তব্য নেই? সারা রাত রতন চিন্তা করল। পরদিনই সে বিশুর কাছে ছুটল।

—আমি ভিক্ষে করব। আমার টাকা চাই। মাকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু কোথায় করব? আমায় ভিক্ষে দেবে কি লোকে?

বিশু বলল—দেবে, খুব দেবে। তবে ভোল একটু পালটাতে হবে। আরে ভাই চুরি-ডাকাতি তো করছো না। দিন ভোর তেতে পুড়ে ভিক্ষে চাইবে। রীতিমত হক্কের পয়সা।

একটু চুপ করে থেকে বিশু বিষণ্ণ গলায় বলল—জানো রতন, আমাকেও ক্লাশ টেন-এ পড়তে পড়তে স্কুল ছাড়তে হয়েছিল। অ্যাকসিডেন্টে বাবা মারা গেল। উঃ, তারপর কি অবস্থা গেছে। গ্যারেজে কাজটা পাবার আগে আমাকেও অনেকদিন ভিক্ষে করে পেট চালাতে হয়েছে। দুনিয়ায় টিকে থাকতে হলে আমাদের মত অবস্থার লোকের কি অত বাছ-বিচার করলে চলে ভাই। তাছাড়া অন্য কিছু জুটলে এ কাজ ছেড়ে দেবে। ব্যাস্।

বিশু রতনকে নিয়ে গেল লাটু মাস্টারের কাছে। বস্তির জটিল গোলকধাঁধার এক গোপন ঘুপচি অংশে লাটুর আড্ডা। লাটু মাস্টারকে আগে কয়েকবার দেখেছে রতন। লম্বা পাকানো চেহারা। তেল চকচকে বাবরি চুল। সরু করে ছাঁটা গোঁফ। সর্বদা ফুলবাবু সেজে থাকে। কোঁচান ধুতি বা পায়জামার সঙ্গে পরে গিলে করা চুরিদার পাঞ্জাবী। পায়ে নাগরা জুতো। ভারিক্কি চালে চলাফেরা করে। এই রহস্যময় ব্যক্তিটি কে তা রতন জানতো না। তবে খেয়াল করেছিল, এ অঞ্চলের লোকে তাকে রীতিমত সমীহ করে।

বিশুর কাছে সব শুনে লাটু মাস্টার বলল—দেখ বিশু, এ লেখাপড়া জানা ছেলে। বেশিদিন তো টিকবে না। এমন ঝুটঝামেলা আমার পোষায় না। তবে তুই যখন রিকোয়েস্ট করছিস এত করে, ঠিক হ্যায়।

তারপর সে রতনকে বলল—চাকরি জুটছে না? কুছ

পরোয়া নেই। এ লাইনে ভিড়ে যাও। স্বাধীন বিস্‌নেস্‌। ভাল ইনকাম। কেন বেকার পরের গোলামী করে খেটে মরবে।

রতনকে নানা অ্যাঙেগলে ঘ্ররিয়ে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণ করে লাট্‌ মন্তব্য করল—বাঃ চোখে বেশ ফিলিংস আছে তো! ল্যাংড়া ব্রড়ো বেড়ে মানাবে। কি রকম মেক-আপ চড়াব দেখবে। একবার হাত পাতলে কোনো মিঞা পয়সা না ফেলে পারবে না। আরে বাবা, লাট্‌র হাতে কত ছোকরা ব্রড়ো, আর কত ব্রড়ো বিলকুল নাতি বনে গেছে। সাত বছর মুন থিয়েটারে মেক-আপ ম্যান ছিলাম। ডালিম কুমারের নাম শ্রনেছো? ফেমাস হিরো। লাট্‌র হাতের মেক-আপ্‌ নইলে ডালিম কুমার তো স্টেজেই ঢ্রকতো না।

কাছে বসে একটি বোকা টাইপের ছোকরা ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে কথা বলছিল। লাট্‌ তার দিকে আঙ্গ্রল দেখিয়ে বলল—এর নাম ভরকিলাল। দেখ কেমন দিব্যি গর্‌র মত চোখ দ্রটো। কিন্তু রোজ সকালে এমন ফাস্ট ক্লাস কানা বানিয়ে রাস্তায় পাঠিয়ে দিই যে, কারো বাপের সাধ্যি নেই ধরতে পারে।

নিজের কৃতিত্বের ফিরিস্তি দিয়ে লাট্‌ গর্বিতভাবে তার সাঙ্গপাঙ্গদের দিকে চেয়ে সিগারেটে স্খটান দিল। ঘরের মধ্যে লাট্‌ মাস্টার বসেছিল খাটিয়ায়। তার চার-পাঁচজন চেলা বসেছিল মেঝেতে, চাটাই পেতে। লাট্‌র মন রাখতে তারা দাঁত বের করে হেঁ হেঁ করল।

লাট্‌ বলল—হ্যাঁ, আগে কয়েকদিন আমার স্টর্ডিওতে এসে মেক-আপ নিয়ে খোঁড়া ব্রড়োর হাঁটা-চলা আর ভিক্ষের ডাক প্র্যাকটিশ্‌ করে নিতে হবে। এ্যাই তিনকড়ি, তুই একে ট্রেনিং দিয়ে দিবি। তারপর স্রবিধে মত কোনো জায়-গায় দাঁড়িয়ে যাবে ভিক্ষে করতে। হ্যারে ফজল্‌, তুই যে বলছিলি পাটকল স্টপেজে তোর জমছে না। জায়গা বদলাবি?

ফজল্‌ নামধারী একটি শ্রটকো চেহারার লোক উত্তর দিল—হাঁ মাস্টার, বহ্রৎ দ্রর হাঁটতে হয়। কাছে গঙ্গার ঘাটে বসলে বেশি ইন্‌কাম।

লাট্‌ বলল—ঠিক আছে, তুই একে পাটকলে পোঁছে দিবি। আর তুই গঙ্গার ঘাটে যাবি।

লাট্‌ বিশ্রর দিকে ফিরল। বলল—বিশ্র, আমার রেট বলে দিইছিস তো? রোজ এক টাকা ড্রেস ভাড়া। আর এক টাকা মেক-আপ চার্জ। নগদ চাই। ধারে কারবার নেই।

এই ঘটনার সাত-আট দিন পরে ট্রাঙ্ক রোডের পাটকল স্টপেজে এক নতুন ব্রড়ো ভিখিরীর আবির্ভাব ঘটল।

রতন প্রত্যেক দিন সকালে লাট্‌ মাস্টারের স্টর্ডিওতে মেক-আপ নিয়ে বেরিয়ে যায়। রাতে ফিরে ছদ্মবেশ খ্রলে ফেলে। প্রথম ক'দিন লাট্‌ নিজে হাতে মেক-আপ দিয়েছিল। তারপর থেকে মেক-আপ দেয় তিনকড়ি। এই কাজে লাট্‌র দ্র'জন অ্যাসিস্টেন্ট আছে।

রতনের বাড়িতে জানল যে চাকরি পেয়েছে। হাওড়ায় এক গ্রদামে। মা আনন্দে প্রজো দিলেন।

তারপর এক বছর কেটে গেছে। এখনও রতন ছদ্মবেশ ত্যাগ করার স্রযোগ পায়নি। সর্বদা ব্রকভরা অশান্তি, বিতৃষ্ণা। কিন্তু এমন নিশ্চিন্ত আয়ের পথ ছাড়তেও ভরসা পায় না। ভিক্ষের পয়সায় তাদের খাওয়ার ভাবনা ঘ্রচেছে। ছোট ভাই স্কুলে যাচ্ছে। মার শরীরও খানিকটা সেরেছে। বিশ্রকে সে প্রায়ই তাড়া দেয়, অন্য কোনো কাজের সন্ধানে। কিন্তু কোন উপায়ই হয়নি।

ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের জন্য রতন লাট্‌ মাস্টারেরও নেকনজরে পড়েছে। লাট্‌ তাকে উৎসাহ দিয়ে বলল একদিন—সাবাস রতন! ভেরি গ্রড ওয়ার্ক! হ্যাঁ, যদি এ কাজ পছন্দ না হয় তো বল আমাকে। কোনো ভাবনা নেই। অন্য লাইন আছে। ব্যবসার ফন্দি-ফিকির একবার ব্রঝে নিলে ঢের টাকা কামাবে। লাট্‌র অন্য লাইনের খবর সে জেনেছে। ভিখিরীর ব্যবসা ছাড়াও এক চোরা কারবারী দলের সর্দার হ'ল লাট্‌ মাস্টার। বিশ্র বলেছে, লাট্‌ এমনি লোভ দেখিয়ে ছেলেদের দলে টানে। তার খপ্পরে বেশি জড়িয়ে পড়লে আর নিস্তার নেই।

শীতের রাত। পাটকল স্টপেজে কলকাতা থেকে লাস্ট বাস আসার সময় হয়েছে। গ্রঁড়ি গ্রঁড়ি বৃষ্টি ঝরছে। ধারে কাছের দোকান-পসারগ্রলো প্রায় বন্ধ। রাস্তায় লোক নেই। ব্রড়ো ভিখিরী ওরফে রতন এক বাড়ির অন্ধকার রোয়াকে বসে শিউপ্রসাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু শিউপ্রসাদ যদি না আসে আজ। তাহলে এই বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে হবে। ভাবতেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। বড় রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে এক একটা গাড়ি হেড-লাইটের তীব্র আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে ছ্রটে যাচ্ছে। রাস্তার ওপাশে চা-এর দোকানটার আধখোলা ঝাঁপের তলা থেকে একট্‌ আলো ঠিকরে পড়ছে বাইরে। ভিতরে তাসের আড্ডা জমেছে।

লাস্ট বাস এসে থামল।

রতন বাসের কাছে গেল না। এই শীতে কেউ ভিক্ষে দিতে হাত বাড়াবে না। বাস থেকে একজন মাত্র যাত্রী নামল। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক। হাতে তার একটি থলি, পরনে ধ্রতি, পাঞ্জাবী, চাদর। লোকটিকে চেনে রতন। হরিবাব্‌। এই অঞ্চলেরই বাসিন্দা। কলকাতায় কোনো অফিস কেরানীগিরি করেন। ছা-পোষা লোক। হরিবাব্‌ রতনের দিকে আসতে থাকেন। রতনের রকের গা ঘেঁষে একটা সর্‌ রাস্তা গেছে। ওই পথে হরিবাব্‌ বাড়ি যাবেন।

এতক্ষণ শেডের তলায় রতনের কাছে আর একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। রোগাটে চেহারা। র্রক্ষ ম্রখ। ফ্রল প্যান্ট ও সার্ট পরা। চুপ চাপ বিড়ি ফ্রকছিল সে।

হরিবাব্‌ সামনে আসতেই লোকটা হন হন করে তার দিকে এগিয়ে গেল। একজন অপরিচিত লোককে এত কাছে আসতে দেখে হরিবাব্‌ একট্‌ চমকে ঘাড় ফেরালেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা লাফ দিয়ে তার পথ আটকাল।

কে?—হরিবাব্‌র গলা থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে আসে।

খবরদার!—লোকটা চাপা কর্কশ হ্রঙ্কার ছাড়ল।—চেঁচালেই খতম করে দেবো। মাল-কড়ি যা আছে ঝট পট বের কর। নইলে—

ইতিমধ্যে লোকটার বাঁ হাতে আবির্ভূত হয়েছে একটা

লম্বা ছুরি। সে হরিবাবুর বুকে ছুরি ঠেকাল এবং ডান হাতে হরিবাবুর পকেট হাতড়াতে লাগল।

হরিবাবুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কাতর কণ্ঠে বললেন—ছেড়ে দাও বাবা। গরীব মানুষ।

এই তো টাকা।—লোকটির আঙ্গুল ভদ্রলোকের কোমরে ধুতির কষি টিপে দেখল।—বার কর শিগগির।

হরিবাবু অসহায়ভাবে তাকালেন। কেউ নেই কাছাকাছি। তিনি করজোড়ে মিনতি জানালেন।—সব নিও না বাবা। দোহাই তোমার। আমার সারা মাসের মাইনে।

সাট্ আপ্। ফের ভ্যাজর ভ্যাজর! এবার জান টাকা দুই যাবে।—গুণ্ডাটা আলতো ভাবে ছুরির খোঁচা দেয় হরিবাবুর পেটে।

হরিবাবু জামা তুলে টাকা বের করার চেষ্টা করলেন। থর থর করে কাঁপছে হাত।

ঘটনাটা ঘটছিল রতনের সামান্য দূরে। সে সমস্ত দেখছে, শুনছে। উত্তেজনায় কখন যেন দাঁড়িয়ে উঠেছে। এক পা এগিয়েও গেল। তারপরেই মনে হল, থাক দরকার নেই ঝামেলায়। কিন্তু পরের মুহূর্তে এক বিপুল আবেগ তাকে নিজের অজ্ঞাতেই চালনা করে। সে এগিয়ে যায়।

এ্যাই, কি হচ্ছে?—বলতে বলতে রতন দৌড়ে গিয়ে গুণ্ডাটার ছুরিধরা হাতে লাঠির ঘা লাগাল।

ছিটকে পড়ে গেল ছুরিখানা। লোকটা চকিতে ফিরে রতনের লাঠি চেপে ধরল। তারপর লেগে গেল ঝটাপটি। হরিবাবু চিৎকার করে ওঠেন—চোর! চোর!

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে চার-পাঁচজন লোক ছুটে আসতে থাকে ঘটনাস্থল লক্ষ্য করে।

হঠাৎ নাকে একটা প্রচণ্ড ঘুষির আঘাত খেয়ে রতন রাস্তার ওপর টলে পড়ে গেল। আর গুণ্ডাটা তৎক্ষণাৎ ছুটে পালালো পাশের গলি পথে।

ধর, ধর, করে লোকেরা তারা করল তার পিছনে। কিন্তু ধরতে পারল না তাকে কেউ। বিদ্যুৎ বেগে সে অন্ধকারে অদৃশ্য হল।

পশ্চাদ্ধাবনকারীরা ফিরে এল। এবার খোঁজ পড়ে, সেই লোকটা কোথায়? গুণ্ডাটাকে যে ধরেছিল।

আরে এ কি ব্যাপার!

বাস স্ট্যাণ্ডের সেই পরিচিত বুড়ো ভিখিরীকে দেখে সবাই তাজ্জব বনে যায়।

ভিখিরীর আলখাল্লা ছিন্নভিন্ন। দাড়ি অর্ধেক ছেড়া আর একটা পাকা চুলের পরচুলা মাটিতে পড়ে রয়েছে। বৃদ্ধের ছদ্মবেশে এ তো এক ছোকরা।

রতন তখন মাটিতে বসে। মাথা ঘুরছে তার। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

একজন হ্যাঁচকা টানে রতনকে দাঁড় করিয়ে দিল।

—তাপ্পর যাদু? দিনের বেলায় ফলস্ মেরে ভিক্ষে হয়। রাত্তিরে কি করা হয় শুনি? সিঁদকাঠি নিয়ে বেরোন হয় বুঝি?

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন পাড়ার লোক এসে জুটেছে।

—বেটা ভণ্ড। ঠকিয়ে খাচ্ছিলি। এবার যাবি কোথায়? এক শিকার ফসকেছে। তাই আর একটা বদলি শিকার হাতে পেয়ে জনতা উৎফুল্ল। অনেক দিনের প্রতারণার শোধ তুলবে আজ।

রতন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

হরিবাবু কি ব্যাপার? চোর ধরা পড়েছে?—প্রশ্নকর্তা সামনের বাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। মাঝবয়সী ভদ্রলোক। দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ গড়ন। ইনি হলেন মিস্টার চৌধুরী। একজন ইঞ্জিনিয়ার। বড় চাকুরে। মিস্টার চৌধুরী খুব মিশুকে লোক। আপদে-বিপদে লোকের সাহায্য করেন। পাড়ায় বেশ খাতির আছে তাঁর। ঘটনার শেষ অংশটুকু তিনি জানলা দিয়ে দেখেছিলেন। তারপর তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় পরে বেরিয়ে এসেছেন।

হরিবাবু হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘাড় নাড়লেন —না, পালিয়েছে।

কিছু নিয়েছে আপনার?—মিস্টার চৌধুরী জিজ্ঞেস করেন।

—না, পারেনি। বুড়ো ভিখিরীটা বাঁচিয়ে দিয়েছে। উঃ, আমার সারা মাসের মাইনে ছিল। সর্বনাশ হয়ে যেত আমার।

বুড়ো ভিখিরী? বাস স্ট্যাণ্ডে যে ভিক্ষে করে। খোঁড়া। হ্যাঁ, তাকেই যেন দেখলাম মনে হল। কোথায় সে?

চৌধুরী কিছু দূরে জটলার দিকে এগোলেন।

ঠাস্। একটা চড় পড়ল রতনের গালে।

আহা; আহা। ওকে মারছেন কেন?—মিস্টার চৌধুরী রতনকে আড়াল করে দাঁড়ান।—এই তো গুণ্ডাটাকে বাধা দেয়েছিল। আরে এ কি!

রতনের অভিনব মূর্তি দেখে চৌধুরী থ। তিনি ডাকলেন—ও হরিবাবু, শুনে যান এদিকে।

হরিবাবু কাছে এলেন।

—আচ্ছা, এই লোকটাই কি আপনাকে বাঁচিয়েছে?

চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরে হরিবাবু বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু—তিনি আশ্চর্য হয়ে রতনের দিকে চেয়ে থাকেন।

—হুঁ, সত্য বাক্য। এই লোকটাই হরিবাবুকে রক্ষা করেছে।

একটি মিহি স্বর কানে যেতে ফিরে তাকালেন চৌধুরী। ব্রজবল্লভ গোঁসাই। মোড়ের বাড়িতে একতলার বাসিন্দা।

চৌধুরী প্রশ্ন করেন—কি করে জানলেন আপনি?

—জানব না! আমি সচক্ষে দেখলাম যে। মানে যাকে বলে প্রত্যক্ষদর্শী। জানলার পাশে তর্জন শুনে এট্টুখানি কবাট ফাঁক করে দেখি, উরিব্বাস্। কি ভীষণ কাণ্ড। তারপর আড়ালে থেকে সব প্রত্যক্ষ করলাম।

একবার চেঁচাতেও তো পারতেন ঘর থেকে।—রেগে গিয়ে বললেন চৌধুরী।

কি প্রয়োজন মশাই। যদি বিপদে পড়ি। দুর্জন তস্কর! —গোঁসাই টুক করে ভিড়ের পিছনে সরে গেল।

চৌধুরী রতনের আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে দেখলেন। বললেন—কতদিন এ ব্যবসা ধরেছো? দিব্যি তো স্বাস্থ্য। খেটে খেতে পার না?

কাঁপছে রতন ঠকঠক্ করে। ভয়ে, অপমানে, লজ্জায়। তার সাথে আছে যন্ত্রনা। নাকের যন্ত্রনা সারা মুখ ছড়িয়ে পড়ছে। হাউহাউ করে উঠল—আজ্ঞে বিশ্বাস করুন, বাধ্য হয়ে এ কাজ করতে হচ্ছে। ভাই আর মাকে নিয়ে না খেতে পেয়ে মরতে বসেছিলাম। অনেক চেষ্টা করেও কোথাও একটা চাকরি জোটাতে পারিনি।......

অসংলগ্ন ভাষায় প্রাণপণে রতন বোঝাতে চেষ্টা করে, দারিদ্র্যের সঙ্গে তার কঠোর সংগ্রামের কাহিনী। মার অসুখের কথা, নিজের অসমাপ্ত শিক্ষার কথা।......

মিস্টার চৌধুরী অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে নিজে মানুষ হয়েছেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বড় হয়েছেন। তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে রতনের কথা শোনেন। সত্য-মিথ্যা যাচাই করার চেষ্টা করেন।

জনতার ভিতরে নানারকম মন্তব্য হয়।

—কিচ্ছু বিশ্বাস করবেন না চৌধুরীদা। বেটা পুরো ফোর-টোয়েন্টি।

—ওঃ, এখন কাঁদুনি গাইছে। কেমন, ক্রেডিট নিতে গিয়ে ফেঁসে গেলি তো?

—না মশাই, ক্রেডিট-ফেডিট নয়। আসলে চোখের সামনে অন্য পার্টি দাও মেরে দিচ্ছে দেখে আটকাতে গেছল, তাপ্পর দুই সাঙ্গাতে লেগেছে মারপিট।

চৌধুরী একটার পর একটা প্রশ্ন করতে থাকেন রতনকে। কি নাম? কোথায় থাক? আগে কোথায় ছিলে? কদ্দুর পড়েছ? বাবা কি করত? ইত্যাদি।

জনতা উসখুস করে। আর দেরী কেন? পরিষ্কার কেস। এবং এর ওষুধ হচ্ছে ধোলাই। এক্ষুনি পুলিস এসে পড়লে মাটি হবে।

ধ্যাচ্। ঠিক সেই সময়ে একটা জীপ এসে থামল পাশে। পুলিস। ধারে-কাছে কোনো বাড়ি থেকে নিশ্চয় থানায় ফোন করেছে।

লাফ দিয়ে নামলেন দারোগা।

—কি ব্যাপার? এ্যাঁ। এত ভিড় কেন? হটো, হটো।

একজন বলল—স্যার ছিনতাই। হরিবাবুকে গুন্ডায় ধরেছিল।

—তাই নাকি! কোথায় হরিবাবু? কি নিয়েছে?

হরিবাবু বললেন—স্যার, নিতে পারেনি কিছু। ছুরি বের করেছিল। লোকজন এসে পড়ায় পালিয়েছে।

—ওঃ, পালিয়েছে। কেউ চিনতে পেরেছে লোকটাকে?

একজন জানাল—হ্যাঁ স্যার, চিনেছি। খাল পারের জগা।

—জগা। বটে। বেটা এইসব আরম্ভ করেছে আজকাল। দাঁড়াও, ওকে টাইট করে দিচ্ছি।

দারোগা তার টুপিতে টান দিয়ে এক চক্কর ব্যাটন ঘুরিয়ে চোখ কটমট করলেন।

মিস্টার চৌধুরী দারোগার কাছে ঘেঁষে বললেন,—ইনস্পেকটর, একজন ভিখিরী হরিবাবুকে সেভ করেছে। ওই প্রথমে গুন্ডাটাকে বাধা দেয়। তারপর অন্যরা ছুটে আসে।

—তাই নাকি! কোথায় সে, দেখি। আরে এ আবার কে হে? রতনের সামনে গিয়ে দারোগা স্তম্ভিত।

একজন বলল—এটা জোচ্চোর স্যার। ভিখিরী সেজে থাকত।

—হুম্। বাস স্ট্যান্ডের বুড়োটা নয়?

দারোগা রতনকে ভাল করে দেখেন।

বুড়ো নয় স্যার। ডাঁসা ছোকরা।—টিপ্পনি ভেসে আসে।

একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দারোগা চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই লোকটাই তো? আর ইউ সিওর?

হুঁ।—চৌধুরী মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন।

ছেলেটা নাকি কলেজে পড়ত। বলছিল অভাবে পড়ে... চৌধুরী দু'চার কথায় রতন যা বলেছিল জানালেন।

স্ট্রেঞ্জ।—দারোগাবাবুর মন্তব্য। তিনি হাঁক ছাড়লেন, রামসিং, এই আদমীকো গাড়িমে উঠাও।

কনস্টেবল রামসিং রতনকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে জীপে তুলল।

চৌধুরী বললেন—ইনস্পেকটর, কেসটা জানতে আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। আমি যদি আপনাদের সঙ্গে যাই?

—বেশ চলুন। হরিবাবু আপনিও আসুন। জগার নামে একটা ডাইরি করবেন। নো, নো—আর কেউ নয়।

হুস্ করে জীপ বেরিয়ে গেল। জনতা হতাশ হয়। —ইস্ ফসকে গেল। হাতের সুখখানা আর হল না। যাক্, এবার পুলিশের গুঁতো খাবে বাছাধন।

সবাই থানায় এসে পৌঁছল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিবাবুর কাজ মিটে গেল। তিনি বিদায় নিলেন। এরপর দারোগা রতনকে ডেকে পাঠালেন। কড়া গলায় ধমক দিলেন। —একদম সত্যি কথা বলবি। নইলে পিটিয়ে হাড় ভেঙে দেব।

রতনের বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছে। মনে মনে কেবল ভাবছে, কি করলাম। হায়, কি করলাম। এবার জেল। সমস্ত জানাজানি হয়ে যাবে।

দারোগা জেরা শুরু করলেন। চৌধুরী পাশে বসে, চুপ করে শুনছেন।

সব প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দিল রতন। শুধু দারোগা যখন জানতে চাইলেন—এই ভিখিরী সাজার বিদ্যে কোথায় শিখেছিস? রতন লাটু মাস্টারের কথা স্রেফ চেপে গেল। বানিয়ে বলল—বস্তির একজন তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল এই-ভাবে রোজগার করতে। সেই লোকটাই আমাকে মেক-আপ করার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিল।

এই মিথ্যে বলার কারণ, রতন জানত, লাটুর নাম ফাঁস করলে ও নির্ঘাৎ রতনকে খুন করবে। তার মা-ভাইও হয়তো লাটুর প্রতিহিংসা থেকে রেহাই পাবে না।

জেরা শেষ হল।

চৌধুরী এতক্ষণে মুখ খুললেন।—ইনস্পেকটর, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। প্রাইভেটলি।

দারোগা অবাক হলেন।—ওঃ, বেশ। রামসিং এই ছেলেটিকে পাশের কামরায় নিয়ে যাও।

রতন চলে গেল। দারোগা চৌধুরীর দিকে ফিরলেন—কি, বলুন?

—এই ছেলেটিকে নিয়ে কি করবেন?

দারোগা বললেন—চালান করে দেব। ঝুলিয়ে দেব কেসে।

—ইনস্পেকটর, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? ওকে এবারের মত মাপ করে দিন। আমি ওকে একটা চান্স দিতে চাই।

তার মানে?—দারোগাবাবুর ভুরু কুঁচকে যায়।

—মানে, বোধহয় ও নিরুপায় হয়েই এ কাজে নেমেছে। একটা চাকরি পেলে, ভদ্রভাবে বাঁচার কোনো উপায় হলে হয়তো শুধরে যাবে।

বাঁকা হেসে দারোগা বললেন—মিস্টার চৌধুরী, কিস্সু লাভ হবে না। এমন সহজ জোচ্চুরী কারবারে অভ্যেস হয়ে গেলে এরা আর সৎভাবে খেটে খেতে চায় না। আমি এরকম কেস আরও দেখেছি।

চৌধুরীর কণ্ঠে অনুনয়।—ইনস্পেকটর, আমার মনে হয় এ এখনও তেমন ঝানু হয়নি। দেখুন সামনে রাহাজানি বা গুন্ডামি দেখলেও আমরা বেশির ভাগ সময় বাধা দিতে এগিয়ে যাই না। ভয় পাই। কিন্তু ছেলেটা কতখানি রিস্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তবে একবার জেল খাটলে ওর আর ভদ্র সমাজে ফেরবার উপায় থাকবে না। হয়তো পুরোপুরি ক্রিমিনাল হয়ে যাবে। তাই এখন যদি একবার চেষ্টা করে দেখি। কি বলেন আপনি?

দারোগা একটু ভেবে বললেন,—অল রাইট। ট্রাই। উইস ইউ বেস্ট লাক, মিস্টার চৌধুরী। যদিও আমি খুব হোপফুল নই।

রতনকে আবার হাজির করা হল।

চৌধুরী রতনের মুখের পানে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন,—চাকরি পেলে এই সব ঠকানো ব্যবসা ছেড়ে দেবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছেড়ে দেব। আমি বাধ্য হয়ে করেছিলাম। সত্যি বলছি।

——বেশ, তোমায় একটা চাকরি দিতে পারি। কারখানায়। আপাততঃ দেড়শো টাকা পাবে। কাজ শিখলে পরে বাড়বে। কি, করবে?

—আজ্ঞে, করব। নিশ্চয় করব। উঃ, একটা কাজ যদি পাই।

রতন আশায় উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ল।

চৌধুরী বললেন—পাবে কাজ। তবে তা টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার। আশা করি তুমি আমার মান রাখবে।

রতন টেবিলের নিচে ঝুঁকে পড়ল। চৌধুরীর পদধূলি নেবে।

আরে, আরে, কর কি?—শশব্যস্ত চৌধুরী চট করে পা টেনে নিলেন।

দারোগা মশাই কিন্তু রতনের প্রণাম গ্রহণে বিন্দুমাত্র আপত্তি দেখালেন না। বরং স-বুট পদযুগল একটু এগিয়ে দিলেন। আর ব্যাটনটি একবার তুললেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে। তারপর তিনি পাক্কা দশ মিনিটের এক গুরু-গম্ভীর লেকচার দিলেন রতনকে।

বিষয়—অসৎ পথে চলার ভয়াবহ পরিণতি।

সেই গমগমে ভাষণ ঘরের বাইরে পাঁচজন কনস্টেবল এবং একজন থানায় আটক পকেটমারও হাঁ করে শুনল।

দারোগা থামলেন।

চৌধুরী এক টুকরো কাগজে লিখে রতনকে বাড়িয়ে দিলেন।—এই আমার অফিসের ঠিকানা। খিদিরপুরে। কাল দুপুরে, বারটা নাগাদ আমার সঙ্গে দেখা কোর।

রতন পরম যত্নে হাত পেতে ঠিকানাটি নিল।

একটু হাসো!

শাশ্বত সেন

একজন পর্যটক গভীর অরণ্য থেকে ফিরে এসেছেন।

বললেন,—অরণ্যের আদিবাসীদের মধ্যে আমার প্রভাবের কথা শুনলে বিস্মিত হবেন। নরখাদকেরা পর্যন্ত তাদের আচার-ব্যবহার পরিবর্তন করেছে।

—তার মানে? তারা আর মানুষ খায় না?

—না, মানুষ খায়। কিন্তু এখন ওরা কাঁটা-চামচ আর ছুরি ব্যবহার করে।

একদিন ভূগোলের ক্লাসে।

শিক্ষক—ভুদো! পৃথিবীর মানচিত্রে দেখাও তো ভারতবর্ষ কোথায়?

ভুদো উঠে গিয়ে দেখাল।

শিক্ষক—বাঃ বাঃ বেশ! এবার নন্তু, তুমি বল তো ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছে কে?

নন্তু (অম্লানবদনে)—স্যার! আপনি তো দেখলেনই, ভুদো!

• ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় •

ওয়াশিংটন শহর ছাড়িয়ে একটু শহরতলীর দিকে, একটা সরু রাস্তা—মেঠো রাস্তাই বলা চলে, ওটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বেমানানভাবে যে বিরাট অট্টালিকাটি দাঁড়িয়ে আছে, তা 'ওল্ড গ্রিনিজ হাউস' বলে পরিচিত।

বাড়িটাতে শুধু চিত্রশিল্পীরাই বাস করে। সামনে প্রসারিত ধু-ধু মাঠ, নীল আকাশ, হু-হু করে বয়ে-যাওয়া হাওয়া,—জায়গাটি ভারি মনোরম।

কিছুদিন হল এখানে এসে আস্তানা পেতেছে দুই পেশাদারী মহিলা চিত্রশিল্পী,—'সু' এবং 'জোন্‌সি'। দুজনের চালচলনে, পোশাকে-আশাকে, খাওয়া-দাওয়ায়—সব তাতেই অদ্ভুত মিল। আর সে জন্যই তাদের এত বন্ধুত্ব।

ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া জানিয়ে দিল শীত আসছে। এল শীত। সাথে এল বিশ্রী মেঘলা দিন, দু-এক পশলা বৃষ্টি, হাড়ভেদকরা ঠাণ্ডা, আর সেই ভয়ঙ্কর রোগ—নিউমোনিয়া।

প্রতি বছরই কেউ না কেউ নিউমোনিয়ার কবলে পড়ে। এবার পড়ল হতভাগ্য জোন্‌সি।

ডাক্তার আসেন। দেখেন। প্রেস্‌ক্রিপশান করেন। কিন্তু রোগ কমার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। বরং জোন্‌সির মুখ-চোখ ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হয়ে আসে। অবশ্য রোগ কমবেই বা কি করে? জোন্‌সি ঠিকমত ওষুধ খায় না—ডাক্তারের নিয়মও মানে না।

একদিন রোগী দেখে ফেরবার সময়ে ডাক্তার আড়ালে ডাকলেন 'সু'-কে। বললেন,—দেখুন মিস্‌, সত্যি কথা বলতে কি, আপনার বান্ধবীর বাঁচার আশা কম। তাছাড়া একটা আশ্চর্য জিনিস আমি লক্ষ্য করছি—আপনার বান্ধবীর যেন বাঁচারই ইচ্ছে নেই। রোগীর যদি মনে বাঁচার ইচ্ছে থাকে, তবেই ডাক্তার সফল হতে পারেন। আপনি জোন্‌সির ব্যাপারটা একটু লক্ষ্য রাখুন।

'সু' ম্লান মুখে ফিরে এল নিজেদের ঘরে। সে নিজেও এই অদ্ভুত ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। জোন্‌সি এখন শুয়ে রয়েছে খাটে। ফ্যাকাশে রক্তশূন্য মুখটা জানলার দিকে ফেরানো। চোখ খোলা। বাইরে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

কাছে এগিয়ে এল 'সু'। আসতেই ভয়ানক চমকে উঠল। শুনতে পেল জোন্‌সির অস্পষ্ট নীচু কণ্ঠস্বর। জোন্‌সি নিজের মনে কি বিড়বিড় করছে। আরো কাছে আসতেই তার কানে এল, জোন্‌সি বলছে,—বারো, না এগারো—দশ,—এবার নয়,—আট......

বিস্মিত 'সু' ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞেস করলো,—জোন্‌সি, প্রিয় বন্ধু আমার, কি হয়েছে তোমার?

জোন্‌সি কোন উত্তর দিল না। সে অতি ধীরে

ধীরে বলে চলেছে,—সাত, ওঃ! ছয়,—পাঁচ...। সু হাত দিয়ে একটা ধাক্কা মারলো জোন্‌সিকে।—বলবে না জোন্‌সি, কি করছো? বলবে না?' 'সু'-র যেন আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ার উপক্রম। জোন্‌সি অতি মৃদুস্বরে এবার উত্তর দিলো,—পাতা গুনছি। তার মানে? সু-র বিস্ময়ের বাঁধ যেন ভেঙে পড়বে।—আমি পাতা গুনছি। —জোন্‌সির অতি ধীর শান্তস্বরে বলে,—সামনের ঐ গাছটায় গতকালও কত পাতা ছিল! আমি গুণে শেষ করতে পারতাম না। কিন্তু কমতে কমতে, পড়তে পড়তে এখন এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচে, না-না, ওই আর একটা পাতা পড়ল, চারে। চারটে মাত্র পাতা অবশিষ্ট আছে। শেষ পাতাটি যে মুহূর্তে পড়ে যাবে, আমি জানি, সে মুহূর্তে আমার জীবনান্ত ঘটবে।

—তোমার মাথায় কি গন্ডগোল হয়েছে? তাহলে ত' মাথার ডাক্তার ডাকতে হয়। লক্ষ্মীটি, ওসব যুক্তি-হীন চিন্তা করো না। এই ওষুধটা টুক্ করে খেয়ে ফেলো।

—না। জোন্‌সির কণ্ঠস্বর দৃঢ় অথচ মৃদু,—ওষুধ আমি আর খাবো না। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সু বিবর্ণমুখে বললো,—খাবে না? তা এই টোস্ট কটা খাবে তো?

জোন্‌সি বিরক্তমুখে টোস্টের প্লেটটা টেনে নিলো।

খাবারের প্লেটটা নামিয়ে রেখে 'সু' ছুটলো এক-তলার ওই বিশেষ ঘরে। বিশিষ্ট ঘরের মালিক একজন বিশিষ্ট চিত্রকর নাম যার মিঃ বারম্যান। ভদ্রলোকের একখানি ছবিরও নাম করা যায় না, যাকে ভাল বলা যেতে পারে। জীবনে সম্পূর্ণভাবে বিফল এই ভদ্র-লোকের কিন্তু সেজন্য বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। প্রায়ই এই ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ ভদ্রলোক নেশার ঘোরে বলে থাকেন, এইবার তিনি তাঁর সেই বহু পরিকল্পিত মহান চিত্র-খানা আঁকতে হাত লাগাবেন। এমন একটা ভাব যেন তাঁর এই না-আঁকা চিত্রখানা লিওনার্দো দা-ভিঞ্চির মোনালিসার চেয়ে কোন অংশে কম হবে না।......বিগত ত্রিশ বছর ধরে, তিনি এই কথাটি অসংখ্য লোককে শুনিয়ে এসেছেন।

ভদ্রলোকের চেহারাটিও অদ্ভুত। সারা মুখভর্তি তাঁর খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি। তাঁর মত চেহারার মানুষ খুব কমই দেখা যায়। সেজন্যই শিল্পীদের তাকে দর-কার পড়ে মডেলিং-এর জন্য। এর জন্য সামান্য টাকা তিনি পান।

'সু' বারম্যানের ঘরের কাছে যেতেই অ্যালকো-হলের তীব্র গন্ধ পেল। অর্থাৎ, বারম্যান এখন সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ। একটু ইতস্ততঃ করে সে ঘরে ঢুকে পড়লো। ঢুকেই সে বারম্যানকে উদ্দেশ্য করে বললো— মিঃ বারম্যান, আপনাকে মডেলিং-এর জন্য আমার বিশেষ দরকার। শীগ্‌গির চলুন। সে, জোন্‌সির পাতা গোনার বিচিত্র কাহিনী তাঁকে বলে বললো,— সুতরাং বুঝতেই পারছেন, ঘরে আমার অসুস্থ বান্ধবীকে ফেলে এসেছি।

বারম্যানের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। অপ্রকৃতিস্থের মত সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো,—কী? এরকম বোকা পাগলও সম্ভব? নিজের সঙ্গে মৃত্যুর তুলনা করছে? আচ্ছা, মিস্ সু, তুমি ওকে চিন্তা থেকে নিবৃত্ত করতে পারছো না? কী যে হয়েছে, তোমরা!

সু-র গলার স্বরে তার তিক্ততা প্রকাশ পেল— দেখুন, অপ্রকৃতিস্থের সঙ্গে তর্ক করে নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। আপনি যাবেন তো চলুন; নইলে অন্য উপায় দেখবো।

বারম্যান ভাঁটার মত লালচোখ দুটি তুলে তাকালো সু-র দিকে। তারপর গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললো,—দুর ছাই! একেই বলে মেয়েছেলে। আমি কি যাব না বলেছি? যাও, যাও, আমি যাচ্ছি।

সু ঘরে ফিরে দেখলো জোন্‌সি একভাবে চেয়ে আছে প্রায় ন্যাড়া গাছটার দিকে। সু-র পায়ের শব্দে তার দিকে ফিরে তাকালো না সে। তার ফ্যাকাশে মুখখানিতে বিষণ্ণতার আভা পড়েছে। ম্লান হেসে সে বললো,—বন্ধু, আর দেরি নেই। মাত্র তিনটে পাতা অবশিষ্ট আছে।

সু চিৎকার করে উঠলো,—চুপ, প্লিজ, চুপ কর, জোন্‌সি। ওসব চিন্তা—বিশ্রী, বিদ্ঘুটে চিন্তা করার কোন অর্থ আছে? মন থেকে সব ঝেড়ে ফেল।

জোন্‌সি ম্লান চোখ দুটো মেলে তাকালো সু-র দিকে। কোন উত্তর দিল না।

সু আবার বলে,—দেখ, জোনসি, আমি এখন বারম্যানের মডেল আঁকবো। জানলাটা বন্ধ করে দেবো। কারণ, জানলাটা খোলা থাকলে তুমি সেদিকে তাকাবে। আর তাতে আমার মন-সংযোগ ব্যাহত হবে। তুমি ঘুমোও।

সু বন্ধ করে দিলো জানালাটা। জোন্‌সি চোখ বুজলো।

রাত্রি নামলো। বড় দুর্যোগের রাত্রি। ঝড়ের

তাণ্ডবলীলা টের পাওয়া যাচ্ছিল জানালার সার্সি দিয়ে। হাড় ভেদ করা ঠাণ্ডা।

সকাল হলো। স্বচ্ছ রোদ্দুর এসে পড়লো সু-দের দ্বিতল কক্ষে। বিছানার থেকে উঠে 'সু' দেখলো এক-ভাবে ঘুমোচ্ছে জোন্‌সি। অঘোরে, অচৈতন্যের মত। সু তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো জানালার কাছে। নাঃ! একটা পাতা এখনো অবশিষ্ট আছে। পাতাটি জানালার ধার ঘেঁষা ডালটার শেষপ্রান্তে লেগে আছে।

এই সময়ে জেগে উঠলো জোন্‌সি। সাথে সাথে তার ব্যগ্র চোখ গিয়ে পড়ল গাছটাতে। উৎফুল্লতার ছাপ পড়ল ফ্যাকাশে মুখখানিতে। অস্পষ্টস্বরে সে বললো,—যাক্‌, একটা পাতা এখনো অবশিষ্ট আছে।

সারাদিন গড়াল। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে পাতাটাকে লাল দেখাচ্ছে। জোন্‌সি বিস্মিত। এখনো পড়ে নি পাতাটা! বিস্মিতস্বরে সে সু-কে বললো,—আশ্চর্য! দেখেছ পাতার কাণ্ডটা। ভগবানের ইচ্ছা! আমার বোধহয় আয়ু ফুরোয় নি। কি আর করব। দাও, ওষুধপত্র দাও, যা আছে।

উৎফুল্লভাবে 'সু' প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান মত ওষুধ খাওয়ালো জোন্‌সিকে।

রাত্রে ডাক্তার বললেন,—মিস্‌ সু, আপনার বান্ধবীর আশা আছে।

সে-রাত্রেও দমকা হাওয়ার দাপট ছিল বেশ। শন্‌-শন্‌ শব্দে গাছ বাড়ি কাঁপিয়ে হাওয়া বইছে। সু আতঙ্কিত হল, পাতাটা নিঃশ্চয়ই পড়ে যাবে। সকাল হলো। নীল আকাশ। উজ্জ্বল রোদ্দুর উঠেছে। জানলা খুলতেই একঝলক সকালের রোদ ঢুকলো ঘরে। সু এবং জোন্‌সি বিস্মিতভাবে দেখলো, পাতাটা অক্ষত —পড়ে নি।

ডাক্তার এসে পড়লেন। বললেন,—রোগীর আর ভয় নেই।

সু-র মুখের এক কোণে কিন্তু বিষাদের চিহ্ন। জোন্‌সি সু-কে জড়িয়ে ধরে বললো,—ওঃ—! সু...! তুমি যা করেছ তার তুলনা নেই। তুমি আমার জীবন-দাত্রী। কিন্তু,...সু...তুমি হাসছ না যে? আনন্দ হচ্ছে না তোমার?

সু কেমন নির্লিপ্তভাবে বললো,—মিঃ বারম্যান মারা গেলেন।

জোন্‌সি বললো,—ওঃ! এই ব্যাপার! তা কি করা যাবে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা! হামবাগ হলেও ভদ্রলোক, আমার মনে হয়, লোক খারাপ নয়। সু অতি শান্ত-ভাবে বললো,—শুধু তাই নয়, জোন্‌সি তিনিই তোমার আসল জীবনদাতা।

জোন্‌সি বিস্মিত এবং হতভম্ব,—অ্যাঁ...! কি বলছ তুমি?

সু-র কণ্ঠস্বর তখন আবেগে বেদনায় থরথর করছে,—ঠিকই বলছি। ওঁকে গতকাল সকালে পাওয়া যায় ওই, ওই গাছটার তলায়। জ্ঞান তখন তার নেই। থাকার কথাও নয়। সারা দাড়িতে মুখে তুষারের গুঁড়ো। হ্যাঁ, ভাল কথা সাথে তাঁর রঙতুলির প্যাকেটটাও পাওয়া গেছে। ষাট বছরের বৃদ্ধ তার ফলে মারাত্মক নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন, তারপর আজ সকালে...

চোখের জল সামলে 'সু' আবার বলতে থাকে,—কিন্তু, কেন, কেন তিনি ওখানে গিয়েছিলেন জান? তোমার জন্যে—তোমাকে বাঁচাতে। শোন তাহলে। তাঁকে আমি তোমার অদ্ভুত মনোভাবটা বলেছিলাম। তিনি স্বভাবতই বুঝতে পেরেছিলেন যে, যে-মুহূর্তে শেষ পাতাটি পড়বে, মানসিক উত্তেজনায় তোমার দুর্বল হার্ট ফেল করতে পারে। স্নেহকাঙাল ওই বৃদ্ধ তাই ঝড়ের রাতে রঙতুলি নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন একাকী আর জানলার ধারের আসল পাতার জায়গায় এঁকেছিলেন, ওই—ওই মহান্‌ ছবিটা, মানে ওই......

নকল পাতাটা। ওঃ! জোন্‌সি দুহাতে মুখ ঢাকলো।*

* O' Henry-র 'The Last Leaf' অবলম্বনে।

মহাজীবনের মণিকণা

শৈলেনকুমার দত্ত

ফরাসী সাহিত্যের অমর স্রষ্টা বালজাকের মৃতদেহ যেদিন পের লা সেইস কবরখানায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন শব-যাত্রার পুরোভাগে ছিলেন বালজাকের অকৃত্রিম বন্ধু ভিক্টর হুগো, আলেকজাণ্ডার দুমা প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিক। সরকারের পক্ষ থেকে একজন মন্ত্রীকে নাম মঁসিয়ে বারোশ, পাঠানো হয় শবানুগমনে। কিন্তু তিনি জানতেন না, বালজাক কে ছিলেন!

যেতে যেতে তিনি তাই হুগোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বালজাক মানুষটি কে ছিলেন?'

অপরিসীম ঘৃণায় হুগো কিছুক্ষণ বারোশের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চাপা কণ্ঠে উত্তর দিলেন, বালজাক ছিলেন ফরাসী দেশের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।'

মনোরঞ্জন ঘোষের সম্পূর্ণ উপন্যাস

টার্গেট-টেগার্ট

টার্গেট—টেগার্ট।

এবার লক্ষ্য চালর্স টেগার্ট, কলকাতার পুলিশ কমিশনার।

আই. পি. অফিসার এই সাহেবটি একবারে আহার-নিদ্রা ভুলে বিপ্লবীদের পিছনে লেগেছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী বীর বিপ্লবীদের নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত মনে হয় তার শান্তি নেই। সংবাদপত্রের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ভারতের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তিনি বিপ্লবীদের সব গোপন প্রচেষ্টার তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

বিদেশ থেকে যাতে তাঁরা সাহায্য না পান সেই তাঁর উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে বিপ্লবীনেতা বাঘা যতীন জার্মাণী হতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে গেরিলা যুদ্ধের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জণের পরিকল্পনা করেছিলেন। বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীতীরে ইংরাজ সেনা ও পুলিশবাহিনীর সঙ্গে তাঁর ও তাঁর চারজন তরুণ সহযোগীর খন্ড-যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে টেগার্টও অংশ নিয়েছিলেন। এবং বাঙালী বিপ্লবীদের যুদ্ধ কৌশল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। ইউরোপে তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল, সেই যুদ্ধে প্রথম ট্যাঙ্ক ও বিমান ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং পদাতিক সৈন্যেরা ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করেছিল। এই ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে যুদ্ধ করার আধুনিক কৌশল বিপ্লবীনেতা বাঘা যতীনও অবলম্বন করেছিলেন।

তাঁর রণকৌশল দেখে মুগ্ধ টেগার্ট পরবর্তীকালে অন্যদের কাছে শ্রদ্ধামিশ্রিত স্বরে বলেছেন,—হি ওয়াজ দি ফার্স্ট বেঙ্গলী হু ফট ফ্রম এ ট্রেঞ্চ।

মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবীনেতাকে সম্মান প্রর্দশনের জন্য তিনি স্বহস্তে পানীয় জল বহন করে এনে আহতের তৃষ্ণা দূর করেছিলেন।

বাংলার বিপ্লবীদের বীরত্ব দেখে তরুণ অফিসার টেগার্ট প্রথম প্রথম তাঁদের খুবই শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং সরকারী শাসনযন্ত্রের সঙ্গে বেশ কিছুকাল সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে তাঁর মনের স্বাভাবিক কোমল মানবিক বৃত্তিগুলি কঠিন কঠোর হয়ে ওঠে। বিপ্লবীদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার স্থান ক্রমশ অধিকার করে গভীর বিদ্বেষ। তাঁদের নির্যাতন করেই তিনি আনন্দ পান। পরবর্তীকালে দেখা গেছে বিপ্লবী মহিলা সুহাসিনী গাঙ্গুলি যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকারের আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দানের অপরাধে চন্দননগরে গ্রেপ্তার হন, তখন টেগার্ট তাঁর গালে প্রচন্ড চড় মারেন। একজন মহিলার গায়ে হাত তুলতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না।

অলিন্দ যুদ্ধের নায়ক বিনয় বোস যখন মৃত্যুর পূর্বে আত্মসমর্পণ করেন, তখন সেই আহত মুমূর্ষু বিপ্লবীর হাতের আঙ্গুলগুলি পায়ের ভারী বুট দিয়ে মাড়িয়ে থেৎলে দিতে টেগার্ট কোন দ্বিধাবোধ করেন না।

দয়ামায়াহীন টেগার্টকে বিপ্লবীরাও আর কোনও দয়ামায়া দেখাতে ইচ্ছুক হন না। এবার তাঁরা তাঁকে দেখাতে চান যে বাংলার বিপ্লবীরা মারের বদলে মার দিতে জানেন।

এবার তাই টার্গেট—টেগার্ট।

এর আগে বিপ্লবীরা সাধারণ পুলিশ অফিসারদের নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতেন না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল অনেক উঁচুতে—উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম, এবং তার জন্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক শাসনকর্তাদের নিশ্চিহ্ন করা, যেমন বড়লাট, ছোটলাট, জেলা শাসনকর্তা প্রভৃতি। এই উদ্দেশ্য সাধনের বাধা ছিল ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগ। তাই গোয়েন্দাবিভাগের অফিসারদের বধ করতে তাঁরা অনেক সময় বাধ্য হতেন। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ ও ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের সঙ্গে চলতো বিপ্লবীদের বুদ্ধির লড়াই এবং মাঝে মাঝে সংঘর্ষ। এই সব সংঘর্ষে ওই দুটি বিভাগের সাহায্যে পুলিশ-বাহিনী এগিয়ে এলে তখন পুলিশের সঙ্গে মোকাবিলা। নইলে বিপ্লবী ও সাধারণ পুলিশের মধ্যে সচরাচর সংঘর্ষ হতো না। সাধারণ পুলিশের কাজ ছিল চোর-ডাকাত ধরা, বিপ্লবীরা তো আর চোর-ডাকাত নন। তাছাড়া দেশের সরকার বদল চাইলেও বিপ্লবীরা অরাজকতা চাইতেন না।

তাই কলকাতার পুলিশ কমিশনার চালর্স টেগার্ট যখন কলকাতা শহরের সব গুন্ডা-বদমাইসকে টিট করে নাগরিক জীবনকে শান্তিপূর্ণ করে তোলেন তখন বিপ্লবীরাও দক্ষ অফিসার বলে মনে মনে তাঁর প্রশংসা করতেন।

কিন্তু ক্রমে টেগার্ট তাঁর কর্মসীমা লঙ্ঘন করলেন। তিনি বিপ্লবীদের পিছনে লাগলেন, তাঁদেরও গুন্ডা-বদমাইসদের সমপর্যায়ভুক্ত করলেন। এই ব্যাপার চরমে উঠল গোয়েন্দা অফিসার বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার পরে।

খুদে গোয়েন্দা বসন্ত চ্যাটার্জীকে ভবানীপুরের এক রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে কে বা কারা হত্যা করে পালালো তার কোন হদিশ পুলিশ বের করতে পারে না। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের কর্তা লোম্যান সাহেব বিপ্লবীদের কয়েকটি কার্যকলাপ দেখে কিছুটা আঁচ করেন কী কৌশলে তাঁরা কার্যসিদ্ধি করে আত্মগোপনে সক্ষম হচ্ছেন। স্থানীয় বিপ্লবীদের স্থানীয় গোয়েন্দারা বেশ ভালভাবেই চেনে, সদা-সর্বদা তাঁদের উপর লক্ষ্য রাখে, ছায়ার মতো অনুসরণ করে। তাই বিপ্লবীরা এক কৌশল অবলম্বন করেন—স্থানীয় ঘটনায় স্থানীয় বিপ্লবীরা অংশগ্রহণ করবেন না, অন্য স্থান থেকে অন্যেরা আসবেন, যাঁদের স্থানীয় গোয়েন্দারা চেনেন না, তাঁরা 'অ্যাকশনে' অংশ গ্রহণ করে স্বচ্ছন্দে গা ঢাকা দেবেন। এইভাবেই 'রডা কোম্পানী'র রিভলভার-কার্তুজ প্রকাশ্য দিবালোকেই বিপ্লবীদের হস্তগত হয়েছিল। তাই কলকাতায় বসন্ত চ্যাটার্জীকে সম্ভবতঃ বিপ্লবীদের পূর্ববঙ্গ শাখার সদস্যরা হত্যা করেছে এই সন্দেহ স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের কর্তারা করেন।

তাই ঘটনাস্থল থেকে বহুদূরে থাকা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের বিপ্লবীদের এই হত্যার ব্যাপারে গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। ঢাকার অনুশীলন সমিতির উপর সন্দেহ বেশি হয়, তাঁদের যেখান থেকে পারা যায় ধরে কলকাতায় টেনে আনা হয় এই হত্যা-মামলার আসামী করার জন্য।

১৯১৬ সালের আগস্ট মাসে বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার ব্যাপারে সুদূর এলাহাবাদে ধরা পড়লেন অনুশীলন সমিতির প্রবীণ নেতা আশুতোষ কাহিলী। সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন বলেই সম্ভবত পশ্চিমে বায়ু পরিবর্তনে গিয়েছিলেন। তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হলো কলকাতার গোয়েন্দা দপ্তরে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে পুলিশ হেপাজতে হাসপাতালে রাখার বদলে শুরু হয় নির্মম দৈহিক নির্যাতন।

অনেকের কাছে থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বরফের চাঙের উপর শুইয়ে রাখা হতো। আশুতোষ কাহিলীকেও বোধহয় এই রকম নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল, কারণ তিনি নিমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন।

তাঁকে গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা লোম্যান কিড স্ট্রীটে এনে জেরা করেন। বিপ্লবীদের এক নামের তালিকা দেখিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাঁদের মধ্যে কাকে কাকে তিনি চেনেন। বিপ্লবীদের প্রথা মতো আশুতোষ কাহিলী জবাব দেন যে তিনি কারুকেই চেনেন না।

পুলিশ কমিশনার টেগার্ট'ও আশুতোষ কাহিলীকে কিড স্ট্রীটে জেরা করেন। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সরকারী অভি-যোগ ছিল ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম। আন্ত-র্জাতিক আইনে সংগ্রামকারী সৈনিকেরা যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা পায়। কিন্তু বিপ্লবীদের সঙ্গে আচ-রণের সময় ইংরেজ সরকার এই সব আইন-কানুনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতো না। আর টেগার্ট তো তাঁদের মনে করতেন সাধারণ খুনী-গুন্ডা। বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যাকারীদের সঙ্গে তিনি খুনী-গুন্ডাদের মতোই ব্যবহার করেন। স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের বদলে তিনি নিজের কাঁধে অনুসন্ধানের ভার তুলে নেন।

তাঁর হুকুমে অসুস্থ বন্দী আশুতোষ কাহিলীকে তার সামনে হাজির করা হলো।

টেগার্ট চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—ডু ইউ নো হু হ্যাজ কিল্ড হিম? তুমি জানো কে তাকে মেরেছে?

আশুতোষ কাহিলী বলেন,—নো, আই ডোন্ট নো। না আমি জানি না।

—ইউ ডোন্ট নো?

—নো।

নো!—মুখ বিকৃত করে ভেংচি কেটে টেগার্ট সজোরে ঘুসি মারলেন আশুতোষ কাহিলীর মুখে।

আশুতোষ কাহিলী আঘাত যেমন খেলেন তেমনি বিস্মিতও হলেন। ওই রকম বড় অফিসার যে নিজের হাতে এমন নির্যাতন করতে পারেন তা তাঁর ধারণা ছিল না। সাধারণত, সাহেবদের হুকুমে দারোগা-কনেস্টবলরাই বন্দী-দের গায়ে হাত তোলে। উপরওয়ালারা এতটা নিচে নামেন না।

রাগে ফেটে পড়ে টেগার্ট ফের বললেন,—আই থিংক নাউ ইউ উইল টেল মি। এবার তুমি বলবে।

—নো।

—নো? আবার মুখে ঘুসি চলে।

আশুতোষ কাহিলীর একই জবাব—নো, নো, নো! আই ওন্ট টেল এনিথিং! আমি কিছু বলবো না।

—নো? নো? নো???

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে টেগার্ট সমানে ঘুসি চালিয়ে যান।

অসুস্থ রোগী আশুতোষ কাহিলী ভেঙে পড়েন তবু মচকান না। তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

অন্য বন্দীরা গোপনে এই নির্যাতনের কথা বাইরের জন-সাধারণকে জানিয়ে দেন। চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে যায়। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট অ্যানী বেশান্ত সরকারের কাছে বন্দীর উপর অত্যাচারের কথা জানিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন।

স্বদেশে বিদেশে মুখ রক্ষার জন্য সরকার এক তদন্ত কমিটি গঠন করল একজন ইংরাজ ও একজন ভারতীয়কে নিয়ে।

এই তদন্ত কমিটির সদস্য স্টিভেন্স সাহেব ও স্যার বিনোদ মিত্র বন্দী আশুতোষ কাহিলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুব কূট-কৌশলের সঙ্গে তদন্ত চালান। তাঁকে সদস্যরা জিজ্ঞাসা করেন,—আপনাকে লোম্যান মেরেছে?

—না। টেগার্ট মেরেছে।

—লোম্যান তাহলে মারেনি?

—না। কিন্তু টেগার্ট মেরেছে।

বন্দী যতই টেগার্টের কথা বলেন, ততই তাঁরা সে কথা চাপা দিয়ে লোম্যানের কথা তোলেন। অর্থাৎ তাঁরা রিপোর্ট দেবেন যে বন্দী স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের কর্তা লোম্যানের হেপা-জতে আছে এবং লোম্যান তাঁর উপর কোন অত্যাচার করেনি। অর্থাৎ এতে সাপ মরবে কিন্তু লাঠি ভাঙবে না। তদন্ত হলো এবং জানা গেল গোয়েন্দা দপ্তরের কেউ বন্দীকে নির্যা-তন করেনি।

কিন্তু এত সহজেই কি সব কিছু ধামা চাপা দেওয়া যায়? জনসাধারণ বোকা নয়। তারা বোঝে সরকারী তদন্ত মানেই ধাপ্পাবাজি। টেগার্টের নাম তদন্ত কমিশনে অনু-ল্লেখ থাকলেও সেই প্রকৃত অপরাধী।

এই অপরাধীর শাস্তি বিধানের সংকল্প বিপ্লবীরা এবার করলেন। উপরওয়ালা টেগার্ট বিপ্লবীদের ব্যাপারে নিচে নেমেছেন, এবার এই নীচ টেগার্টকে মাটির নিচে কবরে পাঠাতে হবে।

এবার তাই টার্গেট টেগার্ট।

— দুই —

১২ই জানুয়ারী ১৯২৪ সাল।

শীতের সকাল। কুয়াশার আবরণ ছিন্ন করে সূর্যের সোনালী কিরণ এসে পড়ছে কলকাতার প্রশস্থ ময়দানে—গড়ের মাঠে। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের ঘড়িতে একটু আগেই ঢং ঢং করে সাতটা বেজেছে।

ময়দানে স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিদের প্রাতভ্রমণ সেরে এবার গৃহে ফেরার সময় হয়েছে। তাদের অনেকে ট্রাম স্টপের দিকে এগোয়, কেউ যায় তার প্রাইভেট কারের দিকে, আবার অনেকে পায়ে হেঁটেই বাড়ির পথ ধরেন।

চৌরঙ্গী রোড ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে এক যুবক থমকে দাঁড়িয়ে এক বড় দোকানের শো-কেসে রাখা কোন জিনিস একমনে লক্ষ্য করে। যুবকটির পরণে মালকোছা মারা ধুতি, গায়ে খাকি সার্ট পায়ে কালো শু-জুতো। যুবকটিকে বেশ কিছুক্ষণ ময়দানের এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। মনে হয় সেও প্রাতভ্রমণ সেরে বাড়ি যাওয়ার আগে কারও জন্য যেন প্রতীক্ষা করছে। হয়তো কোন বন্ধুর পদচারণা এখনও শেষ হয়নি, তারই জন্য এই প্রতীক্ষা। সে এলে দুজনে একসঙ্গে বাড়ির পথ ধরবে।

যুবকটি তাই মাঝে মাঝে অধীর আগ্রহে ময়দানের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে।

ওই তো সে আসছে। এবার শেষ হলো এতক্ষণের প্রতীক্ষা। এতক্ষণের? না, এত দিনের?

ময়দানের দিক থেকে দীর্ঘ পদক্ষেপে যেজন এগিয়ে আসে সে কিন্তু ভারতীয় নয়, এক ইংরাজ।

অগ্রসরমান সেই সাহেবের দিকে চেয়ে যুবকটি এক মুহূর্ত কী যেন চিন্তা করল। সে আশা করেছিল সাহেবটির সঙ্গে আর একজন কেউ থাকবে—তার সশস্ত্র দেহরক্ষী। হয়তো নিঃসঙ্গ সাহেব সাত সকালে সশস্ত্র রক্ষী সঙ্গে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

প্রতীক্ষারত যুবকটি বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে ছুটে সাহেবের দিকে এগিয়ে গেল। চোখের পলকে পকেট থেকে রিভলভার বের করে নিল।

দ্রাম। হঠাৎ রিভলভারের শব্দে আশপাশের মানুষেরা চমকে উঠল।

সাহেবটিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, গুলী তার গায়ে লাগেনি।

যুবকটি আরও কাছে ছুটে আসে। আট-দশ ফুট দূরে থেকে দ্বিতীয়বার গুলী বর্ষণ করল। এবার আর সে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হলো না। গুলী সাহেবের বুকে লাগল, সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

যুবকটি কিন্তু তবুও গুলী বর্ষণ করে চলে। বলা যায় না একটি দুটি গুলী খাওয়ার পরও সাহেব প্রাণে বেঁচে যেতে পারে, মারাত্মক আহত হওয়ার পরও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করে দেহ থেকে বুলেট বের করে ডাক্তাররা তাকে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

না, না, কথায় বলে শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই যুবকটি ভূপতিত সাহেবের দুপাশে পা রেখে দাঁড়িয়ে হাতের রিভলভারের অবশিষ্ট সব কয়টি বুলেটই পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ হতে তার দেহে বিদ্ধ করল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে স্বস্তির স্বাস ফেলল।

সে সফল হয়েছে, লক্ষ্যভেদ করেছে। হি হ্যাজ হিট দি টার্গেট অ্যান্ড দ্যাট টার্গেট ইজ টেগার্ট—এই কথা এবার সগর্বে বলা চলবে। তার হাতে টেগার্টের পতন হলো।

অবশেষে টেগার্ট ঘায়েল হলো।

ইতিমধ্যে আশপাশের লোকেরা তাকে ধরার জন্য ছুটে আসে। কিন্তু যুবকটি এত সহজে ধরা দেবার পাত্র নয়। এখনও তার সঙ্গে আছে গোটা পঞ্চাশ তাজা কার্তুজ, হাতের রিভলভার ছাড়াও সঙ্গে আছে এক ম্যাগাজিন পিস্তল। অতএব বিনা সংগ্রামে অনায়াসে আত্মসমর্পণ নয়।

যুবকটি দৌড়তে শুরু করল। ঘটনার আকস্মিকতার বিস্ময় কাটিয়ে এক ছোটখাট জনতাও তাকে ধরার জন্য পিছনে পিছনে দৌড়ায়।

পার্ক স্ট্রীট দিয়ে এক ট্যাক্সি যাচ্ছিল। পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভার দেখে একটা লোক ছুটছে আর তার পিছনে অনেক লোক তাড়া করেছে। অনুসরণকারীরা চিৎকার করছে—পাকড়ো! পাকড়ো!

ট্যাক্সি ড্রাইভার ধাবমান যুবককে চোর ভেবে ট্যাক্সি নিয়ে তাড়া করল ধরার জন্য। যুবকটি এই বিপদেও বুদ্ধি হারায় না। সে বোঝে দৌড়ে অন্যদের চোখে ধুলো দিয়ে অদৃশ্য হতে পারলেও ট্যাক্সির সঙ্গে দৌড়ের পাল্লায় পারা যাবে না। সে চট করে রাসেল স্ট্রীটের এক বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

বাড়ির লোকেরা কিছু টের পাবার আগেই নিঃশব্দে বাড়ির বাগান ঘুরে পিছনের দরজা দিয়ে আবার পথে নামে। অনুসরণকারী জনতা তখন তার সন্ধানে সামনে ছুটে চলেছে।

পথের উপর যুবকটি একটি প্রাইভেট মোটর গাড়ি দেখতে পেল। আরও দেখল গাড়ির ড্রাইভার এ দেশীয়। যুবকটি দ্রুত তার কাছে এগিয়ে গেল। মনে ভাবল ড্রাইভার যখন এ দেশীয় তখন স্বদেশী এক বিপ্লবীকে সে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

যুবকটি ড্রাইভারকে বলে,—ভাই, আমি একজন স্বদেশী। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে আমি মেরেছি। আমায় ধরার জন্য লোকেরা তাড়া করেছে। আমায় তুমি বাঁচাও। তাড়াতাড়ি একটু দূরে পৌঁছে দাও।

যুবকটির মানুষ চিনতে ভুল হলো। স্বদেশবাসী হলেও সকলে স্বদেশভক্ত নয়, ইংরাজের অনুগতও এ দেশে কিছু কম নেই। পুলিশ কমিশনার হত্যাকারী বিপ্লবীকে ধরিয়ে দিতে পারলে সরকারী পুরস্কার নিশ্চয় পাওয়া যাবে, এমন কি বড় খেতাবও জুটতে পারে।

তাই বিপ্লবীকে বাঁচানোর বদলে মোটর গাড়ির চালক তাকে ধরতে আগ্রহী হয়। কিন্তু চালকেরও মানুষ চিনতে ভুল হয়। বিপ্লবীদের ধরা অত সহজ নয়, তাছাড়া যে বিপ্লবী জানে ধরা পড়লে হত্যাপরাধে তার ফাঁসি হবে এবং দুটো খুনের জন্য তো আর দুবার ফাঁসি হবে না, তাই একটা খুন যে করেছে সে দুটো খুন করতে দ্বিধা করে না।

সুতরাং যেই গাড়ির চালক তাকে ধরার জন্য লাফিয়ে গাড়ি থেকে নামে, অমনি যুবকটি তাকে গুলী করে। এবার ওই অঞ্চলের লোকেরা ছুটে এল তাকে ধরার জন্য। আবার শুরু হলো দৌড়-প্রতিযোগিতা।

যুবকটি দৌড়াতে দৌড়াতে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে এসে পৌঁছায়। পিছনে চিৎকার করতে করতে ধেয়ে আসে একদল লোক। সেই চিৎকারের শব্দে মোড়ের দোকানগুলি ও ফুটপাথ হতে আরও লোক জড় হয়।

যুবকটি দেখে তার সামনে একদল লোক এবং পিছনেও একদল লোক। তবে কি এবার ধরা পড়তে হবে? সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতেও কি এভাবে ধরা দিতে হবে? কিন্তু অনর্থক সাধারণ মানুষকে হত্যা করতে তো মন চায় না। যারা তাড়া করেছে তারা জানে না যে তাদেরই দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদেরই ভবিষ্যতের সুখ-সুবিধার জন্য যুবকটি এই কাজ করেছে। এই হচ্ছে ইতিহাসের পরিহাস। এই হচ্ছে বিপ্লবীর ভাগ্যলিপি।

দেশের মানুষের উপর যুবকটি গুলী চালাতে প্রথমে অনিচ্ছুক হলেও দেশের লোকই তাকে বাধ্য করলো সেই পথ গ্রহণ করতে। তারা যুবকের উপর ইট-পাথর-সোডার বোতল বর্ষণ শুরু করে।

যুবকটি বোঝে এবার আত্মরক্ষার জন্য তাকে গুলী চালাতেই হবে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে দুহাতে রিভলভার ও পিস্তল হতে গুলী বর্ষণ শুরু করল সামনে ও পিছনে।

পশ্চাদ্ধাবনকারী অনেকেই রণে ভঙ্গ দিল। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। কাজ নেই বাবা অমন সাংঘাতিক লোককে ধরার চেষ্টা করে। অনুসরণকারীদের একজনের বাহুতে গুলী লাগতে ভিড়টা আরও তাড়াতাড়ি হাল্কা হয়ে যায়। শুধু দু-একজন দুঃসাহসী গা বাঁচিয়ে দূর থেকে অনুসরণ

করতে থাকে।

যুবকটি ফ্রি স্কুল স্ট্রীট ধরে রয়েড স্ট্রীটে পৌঁছায়। তারপর দৌড়ে ককবার্ণ লেনের মধ্যে দিয়ে রিপন স্ট্রীটে। এখান দিয়ে ওয়েলেসলি লাইনের ট্রামে চাপা যেতে পারে। কিন্তু হাঁফাতে হাঁফাতে অস্ত্র নিয়ে ট্রামে চাপা মানে স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া।

কিন্তু তার গোপন আস্তানা যে অনেক দূরে। পায়ে হেঁটে যাওয়া চলে না। দৌড়াদৌড়ির ফলে ক্লান্তিতে পা অবশ হয়ে আসছে। গাড়ি করে যেতে হবে।

দূরে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখে যুবকটি দৌড়ে তার কাছে যায়। পাদানিতে পা রেখে কোচওয়ানকে বলে,—চালাও!

এ রকমভাব দৌড়ে এসে গাড়িতে চাপাটা কোচওয়ানের কাছে কিছুটা অস্বাভাবিক লাগে। সে গাড়ি না চালিয়ে সন্দেহের চোখে আগন্তুককে লক্ষ্য করে। লোকটা পাগল নয় তো?

আরে, সিধা চালাও। পিছে বতা দেঙ্গে কাঁহা যানে হোগা।—উত্তেজিত কন্ঠে যুবক বলে।

তবু গাড়ির ঘোড়াদের পিঠে চলার জন্য চাবুক পড়ে না।

ইতিমধ্যে দুঃসাহসী অনুসরণকারীদের একজন এসে পিছন থেকে যুবকটির মাথায় আঘাত করে। যুবকটির মাথা ফেটে যায়, কপাল বেয়ে রক্তের ধারা নামে পা টলমল করে। লোকটি তাকে সবলে জাপটে ধরে। যুবকটি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ পায় না। অন্যেরা রাস্তার ট্র্যাফিক পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে এগিয়ে আসে।

শেষ পর্যন্ত যুবকটি ধরা পড়ল।

থানায় নিয়ে যাবার পথে সে পুলিশটিকে বলে,—গিরফ্-তার হোনেমে মুঝে আফসোস নহী হ্যায়। হাম কাম হাঁসিল কিয়া—টেগার্ট সাবকো মার দিয়া।

— তিন —

স্থানীয় থানার ইন্সপেক্টরকে যুবকটি বলে,—আমার নাম গোপীনাথ সাহা। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবকে আমি স্বেচ্ছায় সুস্থমস্তিষ্কে হত্যা করেছি। আমার সঙ্গী কেউ ছিল না। ব্যস, এর বেশি আমি কিছু বলবো না। টর্চার করেও আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বলাতে পারবেন না।

যুবকের কথা শুনে থানাশুদ্ধ সবাই অবাক বিস্ময়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করে। দৈহিক ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া মস্তিষ্কে আহত যুবকের দেহতল্লাসী করে পাওয়া যায় এক রিভলভার, এক পিস্তল, গোটা চল্লিশ কার্তুজ।

তাকে ফার্স্ট-এড দিয়ে তখুনি লালবাজারে ফোনে জানানো হলো যে আততায়ী ধরা পড়েছে। উপর থেকে হুকুম হয় তখুনি গোপীনাথকে লালবাজারে নিয়ে যাবার জন্য।

লালবাজারের পথে যেতে যেতে গোপীনাথ ভাবতে থাকেন নানা কথা। ক্ষুদিরামের মতোই এবার ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার পালা তাঁর। বাংলার বিপ্লবীদের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন।

মনে মনে হিসাব করেন এ পর্যন্ত কতজন বিদেশী শাসনকর্তার প্রাণ বধের প্রচেষ্টা বাংলার বিপ্লবীরা করেছেন।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই সময় ছোটলাট স্যার অ্যানড্রু ফ্রেজারকে বধ করার সংকল্প বিপ্লবীরা করেছিলেন। অগ্নিযুগের সেই বিপ্লবীরা পরিকল্পনা করেছিলেন লাটসাহেবের স্পেশ্যাল ট্রেন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবেন।

১৯০৭ সালে তাঁরা দুবার ট্রেন লাইনে 'মাইন' পুঁতেছিলেন। একবার চন্দননগরের কাছে মানকুন্ডে, অন্যবার মেদিনীপুরের কাছে নারায়ণগড়ে। বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত এই মাইন দুটি প্রস্তুত করেছিলেন। লাটসাহেবের 'ট্যুর-প্রোগ্রাম' গোপনে সংগ্রহ করেছিলেন বিপ্লবীরা সরকারের বিশ্বস্ত কর্মচারী (!) বিপ্লবী বাঘা যতীনের মারফতে। স্পেশ্যাল ট্রেনের গমন পথের মধ্যে সুবিধা মতো নির্জনস্থান নির্বাচন করেছিলেন। ট্রেনের ইঞ্জিনের স্পীডের হিসাব কষে মাইনের ফিউজে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। সেই অঙ্কের হিসাব তাঁদের এমন নির্ভুল ছিল যে মাইন বিস্ফোরণের আগে বিপ্লবীরা নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পেরেছিলেন এবং ট্রেনটি নির্দিষ্ট স্থানে ঠিক মতো উপস্থিত হলে তবেই মাইনটির বিস্ফোরণ ঘটেছিল। কিন্তু লাটসাহেবের সৌভাগ্যবশতঃ বিস্ফোরণে তাঁর ট্রেনের ইঞ্জিনটিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তিনি যে বগিতে ছিলেন সেটি বেঁচে গিয়েছিল। বিপ্লবীদের এই লাট-বধ প্রচেষ্টা দুবারই ব্যর্থ হয়েছিল।

সেই সালেরই তেইশে ডিসেম্বর ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন সাহেবকে বিপ্লবীরা গোয়ালন্দের স্টীমারঘাটে গুলী করেন। সাহেব মারাত্মক আহত হয়ে স্বদেশে চলে যায়, ভারতবাসীদের শাসন করার স্বপ্ন তাঁর ঘুচে যায়। গুজব রটে সাহেব হাসপাতালেই মারা গেছে, তার মৃতদেহটাকেই কফিনে পুরে কবর দেবার জন্য বিলাতে পাঠানো হয় এবং সমস্ত খবরটা সরকার দেশের লোকের কাছে চেপে রাখে।

তারপর বিপ্লবীদের সেই বিখ্যাত বোমা বিস্ফোরণ, যে বিস্ফোরণের শব্দে দেশবাসীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হলো। তার আগে পর্যন্ত বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেশবাসীরা বিশেষ জানতো না। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম দুই বিপ্লবী তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁরা দুজনেই মৃত্যুবরণ করে দেশবাসীকে নবজীবনের মন্ত্র দিয়েছিলেন।

ওই সালেরই সাতই নভেম্বর কলকাতার ওভারটুন হলে ছোটলাট স্যার ফ্রেজারকে আবার হত্যা করার চেষ্টা হয়। বিপ্লবী জিতেন রায় তাঁকে গুলী করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। তিনি ঘটনাস্থলেই ধরা পড়েন এবং হত্যা প্রচেষ্টার অপরাধে দশ বছরের কারাদন্ড লাভ করেন।

সেই সালেই ইংরাজ রাজত্বের বাইরে ফরাসী চন্দননগরে বাঙালী বিপ্লবীদের বোমা ফরাসী শাসন কর্তার উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত হলো। অনেক সময় ইংরাজ গোয়েন্দাদের হাত এড়াবার জন্য বাঙালী বিপ্লবীরা চন্দননগরে আশ্রয় নিতেন। এককালে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার নিয়ে ফরাসীদের

সঙ্গে ইংরাজের বিরোধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই নিজেদের মধ্যে আর বিরোধ না করে যে যতটুকু অংশ দখল করেছে তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে হাতে হাত মিলিয়ে পরাধীন ভারতবাসীদের শাসন করা শুরু করে। এই 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাইরা' পরস্পরের স্বার্থ-রক্ষা করে চলে। আত্মগোপনকারী পলাতক বিপ্লবীদের ফরাসী শাসন কর্তারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে নিজেদের এলাকা হতে বহিষ্কার করে দিত, ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের ধরে ইংরাজের হাতে তুলে দিত।

তাই চন্দননগরের মেয়র তার্দভেলকে বিপ্লবীরা উচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ করলেন। একদিন রাত্রের অন্ধকারে ঘরের জানলা দিয়ে তাঁরা মেয়রের প্রতি বোমা নিক্ষেপ করলেন। অল্পের জন্য মেয়র প্রাণে বেঁচে যান।

১৯০৮ সালের জুন মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিপ্লবীদের বোমা আরও কয়েকবার নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কাঁকিনাড়া শ্যামনগর ও সোদপুর স্টেশনে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসের সাহেব প্যাসেঞ্জারদের প্রতি। এই সব সাহেব প্যাসেঞ্জাররা ছিলেন স্থানীয় মিলের কর্তা। তারা মিলের ভারতীয় শ্রমিকদের মানুষ বলে মনে করতো না, কুকুর বিড়ালের মতো ব্যবহার তাদের সঙ্গে করতো, কথায় কথায় গালাগালি দিত ও লাথি মারত। তারই প্রতিবাদে বিপ্লবীরা ঐ সাহেবদের লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে কয়েকজনকে আহত করেছিলেন।

১৯১১ সালের দোসরা মার্চ গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা ডেলহ্যামকে বিপ্লবীরা বধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারও ভুল করে তাঁদের বোমা পড়ে মিস্টার কাউলি নামে ইংরাজ ভদ্রলোকের মোটর গাড়িতে।

১৯১২ সালের ডিসেম্বরে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে বধ করার চেষ্টা করেছিলেন। হাতির পিঠে বসা হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, দুঃখের বিষয় যে মাহুত মারা যায় আর হার্ডিঞ্জ বেঁচে যায়।

১৯১৩ সালের জুন মাসে সিলেটে ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডনের বাংলোর মধ্যে বোমা নিয়ে প্রবেশ করতে গিয়ে বিস্ফোরণের ফলে এক বিপ্লবী প্রাণ হারান।

এইভাবে মনে মনে অতীত ইতিহাস স্মরণ করতে গিয়ে গোপীনাথ দেখেন প্রায় ক্ষেত্রেই বিদেশী বধ করতে গিয়ে বিপ্লবীরা হয় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন নয় ভ্রমক্রমে অন্য ব্যক্তিকে বধ করেছেন।

তাঁর ক্ষেত্রেও কি কিছু গোলমাল হয়েছে? না, তিনি তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। তবে ভুল করে অন্য কারুকে বধ করেননি তো? তা কি করে সম্ভব? টেগার্টকে তিনি ভাল করেই চেনেন। বহুদিন ধরে টেগার্টের গতিবিধির উপর নজর রাখছেন। কোন সময় সে বাড়ি থেকে বের হয়, কখন অফিস যায়, কখন ফেরে, কখন ক্লাবে যায় এ সবই তো তাঁর জানা।

তিন তরুণ বিপ্লবী ভার নিয়েছিলেন টেগার্টের গতিবিধি নিপুণভাবে লক্ষ্য করে সুযোগ মতো তাঁকে হত্যা করার। এই উদ্দেশ্যে হাওড়ার এক গোপন আস্তানায় আত্মগোপন করেছিলেন অনন্ত সিং, দেবেন দে ও গোপীনাথ সাহা।

ইতিপূর্বে অনন্ত সিং ও দেবেন দে চট্টগ্রামে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের প্রচুর টাকা বিপ্লবীদলের জন্য লুন্ঠন করে নাগারখানা পাহাড়ে পুলিশ-বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রাম করে গোপনে কলকাতায় পালিয়ে এসেছেন। তাঁদের চলছে পলাতক জীবন। গোপীনাথ সাহা এখনও পুলিশের সন্দেহভাজন হননি।

তিনজনে কখনও একত্রে কখনও একা একা টেগার্টের উপর নজর রাখতেন এবং সুযোগের সন্ধান করতেন।

অনন্ত সিং একদিন পুলিশ ক্লাবের মাঠে টেগার্টের উপর আক্রমণ করতে যান, কিন্তু সঙ্গে রক্ষী থাকায় ব্যর্থ হন। তারপর একদিন হাওড়ার বাঁধাঘাটে গঙ্গা পার হবার সময় তিনি পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যান।

দেবেন দেও একদিন এক দুর্ঘটনায় আহত হন। টেগার্টের কিড স্ট্রীটের বাড়ির উপর তিনি নজর রাখতে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বোমা, গানকটন, পিকরিক অ্যাসিড ইত্যাদি বিস্ফোরক। সুযোগ মতো টেগার্টের বোমা নিক্ষেপ করার ইচ্ছা তাঁর ছিল। সে সময় বিপ্লবীরা 'ইগনিশন বম্ব' অর্থাৎ পলিতায় আগুন লাগানো বোমা ব্যবহার করতেন। 'পারকাসান বম্ব' অর্থাৎ ছুঁড়ে মারার বোমা তখনও প্রচলিত হয়নি। সেজনাই তাঁর সঙ্গে ওইসব বিস্ফোরক সামগ্রী ছিল, আর মুখে ছিল জ্বলন্ত সিগারেট, যার থেকে সহজেই বোমার পলিতায় আগুন লাগানো যাবে। কিন্ত দুর্ঘটনাক্রমে হঠাৎ তাঁর পেকেটের পিকরিক অ্যাসিডের শিশিতে আগুন লাগে। কিছু অগ্নিদগ্ধ হয়ে তিনি গোপন আস্তানায় পালিয়ে আসেন।

সেইজন্য গোপীনাথ আজ বোমার বদলে রিভালভার পিস্তল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে সেগুলি সদ্ব্যবহারের সুযোগও পেলেন। টেগার্টকে এমন দেহরক্ষীবিহীন অবস্থায় পাওয়া নিতান্ত ভাগ্যের কথা বলেই তিনি ভাবেন।

লালবাজারে যখন তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হয় তখন সেখানে হৈ-হৈ পড়ে যায়।

এক অফিসার বলেন,—ওকে সোজা কমিশনারের ঘরে নিয়ে যাও!

গোপীনাথ বুঝে উঠতে পারেন না কেন তাঁকে কমিশনারের ঘরে নিয়ে যাওয়া হবে। কমিশনার টেগার্ট তো মৃত। তবে কি ইতিমধ্যে নতুন আর একজন কমিশনার হয়েছেন? ইংরাজীতে কথা আছে—'কিং ইজ ডেড, লং লিভ দি কিং!' রাজতক্ত খালি থাকতে পারে না. এক রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অন্য একজন রাজা হয়। তেমনি হয়তো এক কমিশনারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন কমিশনার হয়েছেন, উচ্চ রাজপদও বোধহয় শূন্য থাকতে পারে না।

যাহোক, বুক ফলিয়ে কমিশনারের ঘরে গোপীনাথ সাহা ঢোকেন। নতুন কমিশনারকে তাঁর ভয় করার কিছু নেই, বলতে গেলে সেই ব্যক্তিটির তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁর জন্যই তো সে ওই পদটি পেল। টেগার্ট বেঁচে থাকলে সে কি আজ কমিশনার হতে পারতো?

পুলিশ কমিশনারের সম্মুখীন হবার আগে গোপীনাথ

সাহার মন ভয়ের চেয়ে আনন্দেই ভরে ওঠে। আনন্দ এই-জন্য যে তাঁর অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, এরপর মরতে আর কোন দুঃখ নেই।

কিন্তু পুলিশ কমিশনারের ঘরে ঢুকেই তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দিনের বেলায় চোখের সামনে কি ভূত দেখছেন? এ যে টেগার্ট!

টেগার্ট তাহলে বেঁচে আছে? তবে কে মরল তার গুলীতে?

টেগার্ট গোপীনাথকে প্রশ্ন করলেন,—হোয়াই হ্যাভ ইউ কিল্ড মিস্টার ডে? ডে সাহেবকে কেন মারলে?

গোপীনাথ ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি ধীরে ধীরে বলেন,—আই ডিড নট ইনটেনড টু কিল হিম। আই ইনটেনডেড টু কিল ইউ। আনফরচুনেটলি হি ওয়াজ এক্সাকটলি লাইক ইউ। থ্যাংক গড দ্যাট ইউ আর সেভড।

[তাকে আমি মারতে চাইনি। তোমাকেই মারতে চেয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় তাকে হুবহু তোমার মতো দেখতে। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে তুমি বেঁচে গেছ।]

গোপীনাথের এই কথা শুনে এবার বিস্ময়ে স্তম্ভিত হবার পালা টেগার্টের।

— চার —

ইংরাজ ভদ্রলোক মিস্টার ই. ডে হত্যার অপরাধে গোপীনাথ সাহার বিচার শুরু হলো প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে।

আসামীর কাঠগড়ায় মাথায় ব্যান্ডেজ বাধা গোপীনাথকে উপস্থিত করা হয়। তিনি ধীর স্থির শান্তভাবে থাকেন, তাঁকে দেখলে মনে হয় মামলার ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনাশক্ত।

গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী পাবলিক প্রসিকিউটার এই হত্যা মামলায় যখন আরও কিছু বিপ্লবীকে গোপীনাথের সঙ্গী হিসাবে জড়িত করার চেষ্টা করেন, তখন তিনি প্রতিবাদ করে বলেন—

"The Public Prosecutor says that I was seen loitering at Lal Bazar and that I was noticed entering a house in Bowbazar in company with another man. This is quite wrong. I always went about alone and loitered alone and was always trying to kill Tegart Sahib. I know him too well. But unfortunately I have killed an innocent Sahib. That innocent Sahib's appearance was exactly similar to that of Mr. Tegart. Through the grace of God Tegart has saved himself and it is my misfortune that I failed in my attempt to kill the enemy of my country. I have committed a mistake.

"If there is any patriotic youngman in the country he will complete my incomplete task. I hope he will not commit the same mistake that I have committed and I hope he will work more skillfully."

(পাবলিক প্রসিকিউটার বলছেন যে, আমাকে লালবাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে এবং আর একজন লোকের সঙ্গে বহুবাজারের এক বাড়িতে আমায় ঢুকতে দেখা গেছে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। আমি সর্বদা একাই চলাফেরা করতাম এবং সর্বদা টেগার্ট সাহেবকে মারার চেষ্টা করতাম। আমি তাঁকে খুব ভাল করেই চিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এক নিরীহ সাহেবকে মেরেছি। ওই সাহেবের চেহারা হুবহু টেগার্ট সাহেবের মতন। ঈশ্বরের কৃপায় টেগার্ট বেঁচে গেছেন এবং আমার দুর্ভাগ্য আমি ব্যর্থ হয়েছি আমার দেশের শত্রুকে বধ করার প্রচেষ্টায়। আমি ভুল করেছি।

দেশে যদি কোন দেশভক্ত যুবক থাকে সে আমার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে। আমি আশা করি সে আমি যা ভুল করেছি তা করবে না এবং এও আশা করি সে আরও দক্ষতার সঙ্গে এ কাজটি করবে।)

২১শে জানুয়ারী মামলা চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট থেকে হাইকোর্টে পাঠানো হলো। নরহত্যার অভিযোগে গোপীনাথ সাহার বিচার শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে আইনের ধারাগুলি শুনে তিনি হেসে বলেন,—ভাল, ভাল! আরও কিছু ধারা যোগ করা যায় না?

হাইকোর্টে দায়রা বিচারের সময় আসামী গোপীনাথ অপরাধ স্বীকার করে এক নির্ভীক বিবৃতি দাখিল করলেন ঃ—

"It is a very auspicious day for me. The mother is calling me in order that I may rest forever on her bosom and, therefore, I want to go.

"In the begining of the last year I read in the newspapers that an European gentleman of the name of Tegart, after going all over the world and collecting information regarding freedom for India, was returning to India with a view to obstruct our endeavours. I began meditating very much on the questoin of this obstruction to our freedom........ while thus contemplating over it. I would fell my head getting heated. I could not sleep at night or eat any food, and would walk about at night on the roof.

"In this state I heard the call of the mother which was this: 'Follow him'. From that time onwords I began collecting information regarding him ...... Then I began meditating very deeply over all those matters. While meditating I got the call from the Mother: 'Remove him from this world.

"With regard to the innocent Sahib whom I have killed, I am extremely sorry. I do not consider anybody to be my enemy because he is a Sahib."

(আজ আমার পক্ষে খুব শুভদিন। মা আমায় ডাকছেন যাতে তাঁর বুকে শান্তিতে চিরকাল ঘুমাতে পারি এবং

তাই আমি যেতে চাই।

গত বছরের শুরুতে আমি খবর-কাগজে পড়েছিলাম যে টেগার্ট নামে এক ইউরোপীয় ভদ্রলোক সারা পৃথিবী ঘুরে এবং ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ভারতে ফিরে আসছেন আমাদের প্রচেষ্টায় বাধা দেবার উদ্দেশ্যে। আমাদের স্বাধীনতায় বাধা দানের এই প্রশ্নটি নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা শুরু করি। .... এইভাবে চিন্তার ফলে আমি অনুভব করতাম আমার মাথা গরম হয়ে উঠতো। রাত্রে ঘুমাতে পারতাম না, কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারতাম না এবং রাতে বাড়ির ছাদে ঘুরে বেড়াতাম।

"এই রকম অবস্থায় আমি মার আহ্বান শুনতে পেতাম—'ওকে অনুসরণ করো'। সেই সময় থেকে আমি তার সম্বন্ধে খবর সংগ্রহ শুরু করলাম।......... তারপর আমি সমস্ত বিষয়টি নিয়ে গভীর চিন্তা শুরু করলাম। এই চিন্তার মাঝে আমি মার আদেশ পেলাম—'ওকে এ জগৎ থেকে সরিয়ে দাও।'

"যে নির্দোষ সাহেবটিকে আমি বধ করেছি তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সাহেব বলেই কারুকে আমি আমার শত্রু বলে মনে করি না।")

১৯২৪ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী গোপীনাথ সাহার প্রাণদন্ডাজ্ঞা ঘোষিত হলো।

আসামীর কাঠগড়া থেকে তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়ার আগে বিচারক যেমন গম্ভীরভাবে রায় দিয়েছিলেন, তেমনি গম্ভীরভাবেই তিনি টেগার্ট সম্বন্ধে এক রায় ঘোষণা করলেন—

"Mr. Tegart may think himself safe, but he is not. I failed to complete the work, I leave the unfinished work for others."

(মিস্টার টেগার্ট নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেন, কিন্তু তা তিনি নন। আমি এ কাজে ব্যর্থ হয়েছি, আমার অসমাপ্ত কাজ অন্যদের জন্য রেখে গেলাম।")

মৃত্যুপথযাত্রী নির্ভীক গোপীনাথের ঘোষণা শুনে টেগার্ট সমেত সমস্ত অত্যাচারী শাসকের সেদিন হৃৎকম্প হয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন গোপীনাথের প্রাণদন্ড অন্য বিপ্লবীদের ভীত করার পরিবর্তে উৎসাহিত করবে। তাঁর অসমাপ্ত কার্যভার স্কন্ধে তুলে নিতে অন্য বিপ্লবীরা সানন্দে এগিয়ে আসবে। এক গোপীনাথ সহস্র গোপীনাথ হয়ে যাবে। 'মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী?'.........

জেলে গোপীনাথ পরম নিশ্চিন্তে কাল কাটায়। সাধারণ খুনী আসামীরা ফাঁসির আগে মৃত্যুভয়ে আহার-নিদ্রা ভুলে যায়, কর্তৃপক্ষের কাছে প্রাণরক্ষার করুণ আবেদন জানায়। কিন্তু বিপ্লবীরা মৃত্যুঞ্জয়ী। তাঁরা জানেন 'জনম মরণ জীবনের দুটি দ্বার।'

ফাঁসির আগের দিনও গোপীনাথ নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেন। জেল কর্তৃপক্ষ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হন যে প্রাণদন্ড পাওয়ার পর তাঁর দেহের ওজন বৃদ্ধি পায়—খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে বন্দী মুটিয়ে যায়। এমন আসামী তাঁরা জীবনে দেখেননি।

১লা মার্চ ১৯২৪ সালের ভোর রাতে তাঁকে সেল থেকে ফাঁসিমঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। ঈশ্বরের নামগান করতে করতে হাসিমুখে তিনি মঞ্চের দিকে এগিয়ে যান।

ফাঁসির রজ্জু গলায় পরানোর আগে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়—কারুকে কিছু বলার আছে? তোমার শেষ ইচ্ছা আমরা জানিয়ে দেব।

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে গোপীনাথ বলেন,—হ্যাঁ, বলার আছে। আমার শেষ ইচ্ছা সকলকে জানিয়ে দেবেন—আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু যেন ভারতের প্রতি ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করে।

গোপীনাথ সাহার শেষ ইচ্ছা শুনে কেঁপে উঠল সেখানে উপস্থিত শাসককুলের প্রতিনিধিরা।

গোপীনাথ আরও বলেন—আমার মাকে বলবেন তিনি যেন আমার জন্য দুঃখ না করে গর্ববোধ করেন এবং সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করেন বাংলার মায়েরা তাঁর পুত্রের মতো সন্তানের যেন জন্ম দেন।

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গোপীনাথ সাহা চলে গেলেন।

তাঁর মরদেহ আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের হাতে তুলে না দিয়ে জেল কর্তৃপক্ষ প্রেসিডেন্সী জেলের ফিমেল ওয়ার্ডের বাইরের পাঁচিলের কাছে সৎকার করেন।

ইংরাজ শাসক কারাগারের অন্তরালে গোপীনাথকে নিশ্চিহ্ন করে ভাবল তাঁর অসমাপ্ত কার্য আর সমাপ্ত হবে না। কিন্তু তা যে কত বড় ভুল সেটা ভবিষ্যতে প্রমাণিত হলো।

এগিয়ে এলেন আবার কজন নির্ভীক বিপ্লবী। 'মারো কিংবা মরো' এই তাঁদের মন্ত্র। তাঁদের টার্গেট—টেগার্ট!

— পাঁচ —

১৯৩০ সালের ২৫শে আগষ্ট। বেলা এগারোটা।

পুলিস কমিশনার টেগার্ট কিড স্ট্রীটের নিজের কোয়ার্টার্স থেকে বেরিয়ে মোটরে করে লালবাজারে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে চলেছেন।

ইদানিং টেগার্ট সাহেব বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি বাংলা প্রদেশটির অবস্থা শাসকদের চোখে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গান্ধীজী আইন অমান্যের আহ্বান জানিয়েছেন। এই বছরের প্রথমেই কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে গ্রহণ করা হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। এই পরিস্থিতির সুযোগ ভালভাবেই নিচ্ছেন সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী বাংলার বিপ্লবীরা। চারিদিকে তাঁরা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। গত এপ্রিল মাসে বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের যুবকেরা ইংরাজের অস্ত্রাগার অধিকার করে নিয়ে সেই শহরটিকে কদিনের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন করেছিল। শেষে চট্টগ্রামের বাইরে থেকে মিলিটারী পাঠিয়ে তাঁদের দমন করতে হয়। ওই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সঙ্গে সংশিলষ্ট বহু বিপ্লবী নাকি আত্মগোপন করে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন।

এই সব ব্যাপারই কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টসাহেবের চিন্তার কারণ হয়েছে। শহর কলকাতায় তিনি দোর্দন্ড-প্রতাপে পুলিশী শাসন চালিয়ে আইন লঙ্ঘনকারীদের শায়েস্তা করে রেখেছেন। কিন্তু রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে জেলাগুলির অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হয়ে উঠছে।

সেখানে বিপ্লবীরা প্রায়ই তাঁদের 'অ্যাকশন' করছে এবং তারপর স্থানীয় পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতার পালিয়ে আসছে। ফলে কলকাতা পুলিসের সমস্যা বেড়ে উঠছে। কলকাতার কাছাকাছি আবার রয়েছে ফরাসী এলাকা—চন্দননগর। কলকাতার পুলিসের হাত এড়াবার জন্য অনেক সময় আবার বিপ্লবীরা সেখানে সরে পড়েন। সেই প্রথম বিপ্লবী যুগের অরবিন্দ হতে আরম্ভ করে ইদানীং কাল পর্যন্ত অনেক বিপ্লবী এইভাবে পুলিসের খপ্পর এড়িয়েছেন।

সম্প্রতি টেগার্টসাহেবের চিন্তার আরও কারণ ঘটেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান অশান্ত অবস্থা দেখে তাঁর মেমসাহেবটি রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছেন। প্রায়ই স্বামীকে অনুরোধ করছেন এই বিপজ্জনক চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে দেশে গিয়ে নিরাপদে বসবাস করতে। যেরকম দিনকাল পড়ছে তাতে তাঁর স্বামীর প্রাণপাখিটিকে কোনদিন বিপ্লবীরা খাঁচা ছাড়া করিয়ে দেবে।

স্ত্রীকে সাহস দেবার জন্য তাঁর কথাটা টেগার্ট হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেন,—তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ। কত গুন্ডা-বদমাইসকে আমি টিট করেছি, তারা কেউ কিছু আমার আজ পর্যন্ত করতে পারেনি। আর কটা মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের ছেলের ভয়ে আজ আমি চাকরি ছেড়ে পালাবো? ওরা আমার কাছে ঘেঁসতে সাহস করবে না। সেই গোপীনাথের ব্যাপারের পর থেকে আমি প্যান্টের দু-পকেটে দুটো লোডেড রিভলভার রাখি, সব সময় বডিগার্ড সার্জেন্ট সঙ্গে থাকে, মোটর গাড়িতে ঘোরাফেরা করি। গোপীনাথ শুধু মুখেই তড়পে ছিল। কই, তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে এগিয়ে আসার হিম্মত তো কেউ দেখাল না?

মিসেস টেগার্ট স্বামীর দম্ভোক্তির জবাবে ভীতকন্ঠেই বলেন,—আমার মন বলছে গোপীনাথ মিথ্যে ভয় দেখায়নি। এসব কাজের একটা সময় ও সুযোগ প্রয়োজন হয়। আমার মনে হচ্ছে ওদের পক্ষে সেই সময় ও সুযোগ এবার এসেছে। এখন দেশের লোক যেরকম ইংরাজ বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে, তাতে বিপ্লবীদের পক্ষে তোমায় মেরে পালানো সম্ভব হবে। জনসাধারণ গোপীনাথের মতো তাদের ধরে পুলিসের হাতে তুলে দেবে না।

জনসাধারণ!—টেগার্ট হো হো করে হেসে উঠে বলেন, —দে আর কাওয়ার্ডস অ্যান্ড সো দে আর ল-এবাইডিং। তারা আইন-শৃঙ্খলা মেনেই চলে। হেন্স আই ডোন্ট কেয়ার ফর এ হ্যান্ডফুল অব রিভোলিউশনারীস।

মেমসাহেব তবু স্বামীর সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করেন—তুমি ওদের তুচ্ছ করো না। দে আর ডেথ-ডিফাইং—ওরা মৃত্যুকে ভয় করে না।

ওকে! ওকে! আচ্ছা, আচ্ছা। লেট দেম ফেস ডেথ দেন। ওরা আমাকে মারতে এসে মৃত্যুই বরণ করুক! স্ত্রীর কাছে বীরত্ব দেখিয়ে টেগার্ট তর্কের ইতি টেনেছিলেন।

এখন গাড়িতে অফিস যেতে যেতে তিনি হয়তো চিন্তা করেন যে মিসেস টেগার্টের আশঙ্কা একবারে অমূলক নয়। দিনকাল যা পড়ছে বলা যায় না কোনদিন আবার তাঁর উপর আক্রমণ হবে। আই. পি. লোম্যানও সেদিন তাঁকে কথা-প্রসঙ্গে বলছিলেন যে তাঁদের দুজনের জীবন এখন আর মোটেই নিরাপদ নয়। লোম্যান তো আর মেয়েছেলে নয় যে তার স্ত্রীর মতো নিছক ভয় পেয়ে অমন কথা বলবে। নিশ্চয় ডিস্ট্রিক্ট ইনটেলিজেন্স থেকে সে ওই ধরনের রিপোর্ট পেয়েছে।

কমিশনার টেগার্টের গাড়ি চৌরঙ্গী মোড় পেরিয়ে ডালহাউসী স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে চলে। লাটসাহেবের বাড়ি বাঁ দিকে রেখে ডালহাউসী স্কোয়ার ইস্টের ট্রাম-লাইন ধরে গাড়ি উত্তরে চলে। পেপার কারেন্সী অফিসের কাছে মোড় পেরিয়ে গাড়ি উত্তরে কয়েক গজ মাত্র এগুতেই অকস্মাৎ সমস্ত অফিস অঞ্চল কাঁপিয়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল .... ব্যোম ......ম্......ম্......ম্।

বোমা! চারিদিকে প্রচন্ড কোলাহল উঠল।

টেগার্ট বুঝলেন তাঁর গাড়ির বাঁ দিক থেকে কেউ গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছে। একটুর জন্য গাড়িটা বেঁচে গেছে।

সঙ্গের সশস্ত্র সঙ্গী ড্রাইভারকে হুকুম দেয়—স্পীড আপ। জলদি ভাগো।

ব্যোম .... ম্ .... ম্ ....

আবার বোমা বিস্ফোরণ। এবার গাড়ির ডানদিকে। অর্থাৎ পথের দুধার থেকেই গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। দুটি বিস্ফোরণের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের মাত্র ব্যবধান।

চারদিক ধোঁয়ার ভরে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত পথচারী প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারে দৌড়ায়।

টেগার্টসাহেবের গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির আরও স্পীড বাড়িয়ে সাহেবকে নিয়ে তাড়াতাড়ি লালবাজারে পালাবে ভাবে। ভাগ্যিস সে প্রথম বোমা বিস্ফোরণের পরে ভয় পেয়ে গাড়িটা থামিয়ে ফেলেনি, তাহলে নির্ঘাৎ গাড়ির উপরে দ্বিতীয় বোমাটি পড়তো। গাড়ি গতিশীল ছিল বলেই দুটি বোমাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। টেগার্ট সাহেব মরতে মরতে বেঁচে গেলেন।

সাহসী টেগার্টসাহেব ড্রাইভারকে গাড়ি থামাবার হুকুম দিলেন। প্রাণে যখন বেঁচে গেছেন তখন ভয় পেয়ে পালাবার পাত্র তিনি নন। বোমা নিক্ষেপকারীদের ধরার জন্য ব্যস্ত হলেন। গাড়ি থেকে নেমে সার্জেন্ট দেহরক্ষীকে বলেন,—ব্রিংগ ফোর্স ফ্রম হেড-কোয়ার্টার্স। আই উইল কর্ডন দিস এরিয়া।

সার্জেন্টটি তখনই গাড়ি নিয়ে চলে যায় লালবাজার থেকে পুলিশ-বাহিনী এনে সারা অঞ্চলটিকে ঘিরে ফেলার জন্য।

টেগার্টসাহেব হুকুম দিয়ে অবশ্য মনে মনে ভাবেন সারা অঞ্চল ঘিরে কি আক্রমণকারীকে ধরা সম্ভব হবে? শত শত অফিস এখানে, সহস্র সহস্র কর্মী সেখানে, আততায়ী স্বচ্ছন্দে তাদের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারবে। আর লালবাজারের কাছাকাছি হলেও পুলিশ-বাহিনী এসে পোঁছাতে কয়েক মিনিট সময় তো নিশ্চয়ই লাগবে। তার আগেই পলায়মান জনতার মধ্যে মিশে আততায়ীও নিশ্চয় পালাতে সক্ষম হবে।

এক ট্রাফিক কনেস্টবল পুলিশ কমিশনারকে গাড়ি থেকে নেমে রাস্তায় দাঁড়াতে দেখে ছুটে এসে সেলাম ঠুকে জানাল

যে প্রথম বোমা হঠাৎ পড়ায় তারা বুঝতে পারেনি কোন দিক থেকে কে মেরেছে। কিন্তু তারপরে তাদের নজর গাড়ির দিকে ছিল বলে দ্বিতীয় বোমানিক্ষেপকারী সকলের নজর এড়াতে পারেনি। তার সংগী অন্য কনেস্টবল দ্বিতীয় বোমানিক্ষেপকারীকে তাড়া করেছে। সে কমিশনার সাহেবকে একা দেখে গার্ড দিতে ছুটে এসেছে।

টেগার্ট প্যান্টের পকেট থেকে দু-হাতে দুটি রিভালভার টেনে বের করে বলেন যে তাকে গার্ড দেবার দরকার নেই। তার সংগীকে সাহায্য করতে কনেস্টবল ওই বোমানিক্ষেপকারীর পিছনে ধাওয়া করুক।

হুকুম শুনে পুলিশটি দক্ষিণ দিকে দৌড়াল।

বোমা ভয়ে ভীত যে জনতা ডালহাউসী স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ দিয়ে হেয়ার স্ট্রীটের দিকে দৌড়েছিল তাদের সংগে প্রথম বোমানিক্ষেপকারী এক তরুণ যুবকও ভিড়ের মধ্যে স্বচ্ছন্দে মিশে গিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছিল। গজ পঞ্চাশেক দৌড়ে আর সে পারে না। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। মারাত্মকভাবে সে আহত হয়েছে। প্রথম বোমাটি ছুঁড়ে সে যখন দাঁড়িয়ে বোমার ফলাফল লক্ষ্য করছিল তখন বিপরীত দিক হতে তার সংগীর ছোঁড়া বোমার স্পিলিনটার এসে তার সর্বাংগে বেঁধে। সেখানেই লুটিয়ে না পড়ে শুধুমাত্র মনের জোরে সে এতটা দৌড়াতে পেরেছে। কিন্তু আর পারে না। রক্তক্ষরণের ফলে তার মাথা ঘুরতে থাকে। সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার আশপাশের যারা ছিল তারা প্রথমে অতটা লক্ষ্য না করে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালায়। পিছনে যারা আসছিল তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পথের মাঝখানে রক্তাপ্লুত এক অচেতন দেহ দেখে। দেখতে দেখতে ভিড় জমে। যথাসময়ে পুলিশও এসে পড়ে। তারা দেখে রাজপথে রক্তের নদী বয়ে চলেছে, রক্ত কমলের মতো এক তরুণ তার মাঝে। নিমিলীত নেত্রে। তার অংগের পোষাক যেন রক্তে ভেজা রাঙা পতাকা। আকাশের সূর্যের রক্তিম কর সস্নেহে স্পর্শ করছে তার প্রশান্ত মুখমন্ডলকে। এই তরুণও কি পথে স্বীয় বক্ষ শোনিতকণা ঢেলে নতুন যুগ-সূর্য রচনার ব্রতধারী?

টেগার্টের প্রতি প্রথম বোমানিক্ষেপকারীর মৃতদেহ পুলিশ রাজপথ থেকে তুলে নিল।

দ্বিতীয় বোমানিক্ষেপকারী? সে কোথায়?

সে দৌড়ায় ডালহাউসী স্কোয়ারের দক্ষিণ দিকে। তার পিছনে ট্রাফিক পুলিশ ও কিছু লোক তাড়া করে। লাফিয়ে সে এক ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে। ট্যাক্সি থেকে অফিসগামী এক ভদ্রলোক সে সময় নামছিলেন, বিপ্লবী যুবক ভদ্রলোকের ছেড়ে দেওয়া ট্যাক্সিটা নিয়ে পালাবেন ভেবেছিলেন। হয়তো পালাতেও পারতেন কিন্তু সেই ভদ্রলোক দূরে গোলমাল ও বোমার শব্দ শুনে এবং যুবকটিকে তীব্রবেগে ছুটে এসে ট্যাক্সিতে চাপতে দেখে তাকেই অপরাধী ভেবে তাড়াতাড়ি ধরতে যান।

যুবকটি সংগে সংগে রিভালভার বের করে গর্জে উঠলেন—মরার ইচ্ছা না থাকলে এগোবেন না।

রিভালভার দেখে টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী সেই ভদ্রলোক ও ট্যাক্সি-ড্রাইভার দুজনেই ভয়ে পাথর হয়ে যায়।

সেই সুযোগে যুবকটি ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নেমে ওয়েলেসলি প্লেস দিয়ে দৌড়ায়। তার পিছনে ধাবমান পুলিশ ও জনতা ইতিমধ্যে ব্যবধান কমিয়ে কাছাকাছি এসে পড়ে। যুবকটি গভর্নমেন্ট প্লেসে ঢুকে পড়ে।

পিছনে সমানে চীৎকার শোনা যায়—পাকড়ো! পাকড়ো!

সামনের রাস্তার লোকেরা সচেতন হয়ে উঠে। তারা দল বেঁধে যুবকটির পথ আগলে দাঁড়ায়। যুবকটিও দাঁড়িয়ে পড়ে। এক মুহূর্ত চিন্তা করেন। ইচ্ছা করলে সে গুলী চালিয়ে পথ করে নিতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু নিরীহ লোকের মারা পড়ার সম্ভাবনা। না, নিজের স্বদেশবাসীকে মারার জন্য সে হাতে অস্ত্র ধরেনি। নির্দোষ লোককে মারার চেয়ে নিজের মরা শ্রেয় বলেই তাঁর কাছে মনে হলো।

হাতের অস্ত্র পথে ছুড়ে ফেলে মাথার উপর দু-হাত তুলে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন।

এইভাবে ধরা পড়লেন পুলিশ কমিশনার টেগার্টের প্রতি দ্বিতীয় বোমানিক্ষেপকারী।

হেয়ার স্ট্রীট এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। তাই অপরাধীকে প্রথমে হেয়ার স্ট্রীট থানায় নিয়ে হলো।

তারপর সেখান থেকে সোজা লালবাজার পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে। একবারে পুলিশ কমিশনারের সামনে।

টেগার্ট ও তাঁর বধকামী আবার মুখোমুখি হলো।

টেগার্ট হয়তো হেসে বলেছিলেন,—দিস টাইম ইউ হ্যাভ অলসো ফেলড। এবারও তোমরা ব্যর্থ হলে।

যুবকটি বলেন,—ডোন্ট বি জুবিলান্ট। আদার্স উইল ট্রাই এগেন, আই থিংক দে উইল নট ফেল। অন্যেরা আবার চেষ্টা করবে, তোমার নিস্তার নেই।

বিপ্লবী যুবকের কথা শুনে টেগার্টের মুখের হাসি বোধহয় মিলিয়ে গিয়েছিল। তিনি ভাবেন তাঁর মেমসাহেবের কথা মতো বাংলাদেশ ছেড়ে পালানোই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

— ছয় —

পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর বোমানিক্ষেপকারী যুবকদ্বয়ের পরিচয় পুলিশের কাছে অজ্ঞাত থাকে না।

মৃত যুবকটির নাম অনুজাচরণ সেনগুপ্ত। কলকাতার ১১।১।১ কারবালা ট্যাংক লেনের বাসিন্দা। আদি নিবাস হচ্ছে খুলনার সেনহাটি গ্রামে। যুবকটি 'হিন্দু সংঘ' পত্রিকার স্বল্পকালীন সম্পাদক ছিলেন। মরার সময় তাঁর কাছে পাওয়া গিয়েছিল ৪৫০ বোরের রিভলভার ও দুটি তাজা বোমা।

ধৃত যুবকটির নাম দীনেশচন্দ্র মজুমদার। দীনেশ ল কলেজের ছাত্র, ঠিকানা ৭ রামমোহন রায় রোড। চব্বিশ পরগনার বসিরহাট হচ্ছে আদি নিবাস। ধরা পড়ার সময় তাঁর কাছে পাওয়া গিয়েছিল একটি ছ-ঘরা গুলীভরা রিভলভার, একটি অ্যালুমিনিয়াম খোলের বোমা, কিছু মুদ্রা ও একটি সিগার, যেটির আগুন থেকে বোমার পলতেয় আগুন দেওয়া যেতো।

২রা সেপ্টেম্বর সিটি করোনার কোর্টে অনুজাচরণ সেনগুপ্তের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট দাখিল করা হয়। যে ডাক্তার পোস্টমর্টেম করেছিলেন তিনি জানান যে মৃতের দেহে আটটি ক্ষত ছিল, প্রতিটিতেই বোমার টুকরো পাওয়া গেছে এবং তাতেই যুবকটির মৃত্যু হয়েছে।

'টার্গেট—টেগার্ট' এই অপারেশনে বিপ্লবীদলের প্রথম

শহীদ গোপীনাথ সাহা, দ্বিতীয় শহীদ অনুজাচরণ সেনগুপ্ত।

১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর দীনেশ মজুমদারের বিচার শুরু হলো। তাঁর বিরুদ্ধে তিনটি প্রধান অভিযোগ—প্রথম হচ্ছে টেগার্ট হত্যা ষড়যন্ত্র, দ্বিতীয় হচ্ছে হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্রবহন, তৃতীয় হচ্ছে বিস্ফোরণ প্রচেষ্টা।

সরকার চেষ্টা করেছিল তাঁর সংগী অনুজা সেনের মৃত্যুর দায়িত্বও তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেয়ার, যাতে নরহত্যার অভিযোগে তাঁকে ফাঁসিতে লটকানো যায়। কিন্তু আসামী পক্ষের উকিলরা এই অভিযোগ উড়িয়ে দিল, তাঁদের মতে অনুজা বোমা বহন করছিল এবং তাঁর সঙ্গের কোন বোমা হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে দীনেশ মজুমদার জড়িত নন।

দীনেশ মজুমদারের বিচারে বেশি সময় লাগে না। এক সপ্তাহের মধ্যেই আদালতের রায় বেরিয়ে যায়। ১৮ই সেপ্টেম্বর দীনেশ মজুমদারকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও বিশ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হলো। অর্থাৎ কারা প্রাচীরের বাইরে আর তাঁকে ইহজীবনে যাতে যেতে না হয় তার ব্যবস্থা সরকার করল। এই ডালহাউসী স্কোয়ার বোমার মামলায় ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভূপাল বসু প্রভৃতি আরও কয়েকজন দন্ডিত হয়েছিলেন।

১৭ই অক্টোবর দীনেশ মজুমদারকে মেদিনীপুর জেলে তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরূপে প্রেরণ করা হলো। যতদিন না জাহাজে আন্দামানে পাঠানো হচ্ছে ততদিন ওইখানেই কয়েদী ঘানি ঘোরাক এটাই সরকার চায়।

জেলার তো দীনেশের চেহারা দেখে অবাক। ক্ষয়রোগীর মতো দেখতে এ লোক সশ্রম কারাদন্ডে তো কিছু দিনের মধ্যে নিশ্চয় মারা যাবে।

কিন্তু জেলারের মানুষ চিনতে ভুল হয়। সরকারেরও ভুল হয়—দীনেশ আজীবন কারাগারে থাকবে এই আশা করা।

কিছুকালের মধ্যেই দীনেশ মজুমদার কারাগারের বাইরে বেরিয়ে এলেন। না, তিনি মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে খালাস পাননি। সরকারও তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করে মুক্তি দেয়নি। নিজের সামর্থ্যে ও বুদ্ধিতে তিনি নিজেই নিজেকে মুক্ত করেন।

১৯৩২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী রাতের অন্ধকারে জেলের পাঁচিল ডিঙিয়ে দীনেশ মজুমদার পালালেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী সকালে জেলার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতিরা টের পেলেন যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত কয়েদীর সেল খালি। শূন্য পিঞ্জর পড়ে আছে, বন্দী বিহঙ্গ মুক্ত আকাশে আবার ডানা মেলেছে।

কারার অন্তরালে যাঁর জীবন নিঃশেষ হওয়ার কথা ছিল, তাঁর জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী যে তখনও শেষ হয়নি।

ইংরাজ পুলিশ কমিশনার দীনেশের গুলী থেকে বাঁচলেও ফরাসী পুলিশ কমিশনার বাঁচতে পারেননি। তারপর উত্তর কলকাতার এক বাড়িতে পুলিশের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধ করে শেষকালে ফাঁসিমঞ্চে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন তিনি।

কবি সুকান্তর ভাষায় বলা চলে—ওঁর কাহিনী বিদেশীর খুনে, গুলী বন্দুক বোমার আগুনে আজও রোমাঞ্চকর।'

— সাত —

কলকাতার কাছাকাছি শহর চন্দননগর। এটি তখনকার দিনে ছিল ফরাসীদের অধীনে, এর শাসন কর্তৃপক্ষ ছিল ফরাসী, আইন-কানুন ছিল আলাদা। ইংরাজ সরকারের কর্তৃত্ব এখানে চলতো না। বিপ্লবীদের পক্ষে এটা খুবই সুবিধাজনক ছিল, সহজেই তারা ইংরাজের রাজত্বের বাইরে ফরাসী রাজত্বে পালিয়ে আসতেন।

অবশ্য এই ছোট শহরের ফরাসী কর্তৃপক্ষ বিশাল ভারতের শক্তিশালী ইংরাজ কর্তৃপক্ষকে সহজে চটাতে চাইতেন না। তাই অনেক সময় তাঁরা পলাতক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারে ইংরাজ সরকারকে সাহায্য করতো।

১৯৩৩ সালের বসন্তকালে কয়েকজন যুবক চন্দননগর বাজারের কাছে এক গলির মধ্যে একটি পুরানো বাড়ি ভাড়া করেছিলেন। তাঁরা প্রায় সবসময় বাড়ির মধ্যেই থাকতেন, রাতে রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেলে তাঁদের দু-একজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কিনে আনতেন। তাঁরা প্রতিবেশী কারও সঙ্গে আলাপ করতেন না।

বাড়ির বাসিন্দাদের এই রহস্যময় চালচলন প্রতিবেশীদের পাঁচ কান হতে হতে ক্রমে পুলিসের কানেও গেল।

৯ই মার্চ বিকেল পাঁচটার সময় পুলিশ দপ্তরে কমিশনার মসিয়ে কুইং (M. Quinn) যখন সংবাদটি পেলেন, তখুনি তিনি একদল পুলিশ নিয়ে বাড়ীটি সার্চ করার সংকল্প করলেন।

সদলে বাড়িটির কাছাকাছি আসতে মসিয়ে কুইং লক্ষ্য করলেন বাড়ির রকে বসা এক যুবক দৌড়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বোঝা গেল যুবকটি বাইরে পাহারায় ছিল, পুলিশ আসছে দেখে সে তার সংগীদের সতর্ক করতে দৌড়াল।

পুলিশ বাড়িটি ঘিরে ফেলার আগেই ভেতর থেকে তিনজন যুবক ছুটে বেরিয়ে আসেন। পুলিশ বেষ্টিত হওয়ার আগেই তাঁরা পালাবার চেষ্টা করেন, পুলিশও ছুটে আসে। একজন দৌড়াতে গিয়ে এক ছোট ঝোপে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। তাঁর আর পালানো হলো না। এইভাবে বিপ্লবী বীরেন রায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গী দুজন কিন্তু পুলিশকে পিছনে ফেলে সামনের রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রাস্তার বিপরীত দিক থেকে এক যুবক সাইকেল চড়ে আসছিল। পলায়মান দুজনের কাছে তার একটু বীরত্ব প্রকাশের ইচ্ছা জাগে। সাইকেল থেকে নেমে সে তাঁদের ধরতে যায়। তার এই অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করে। একটি গুলী খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে মসিয়ে কুইং দু-তিনজন পুলিশ নিয়ে সেখানে এসে পড়েন। দুটি পুলিশকে আহতকে দেখার ভার দিয়ে তিনি সাইকেলে চড়ে পলাতকরা যেদিকে গেছে সেদিকে দৌড়ান। একজন পুলিশ তাঁকে অনুসরণ করে।

ঘাড় গুঁজে সজোরে তিনি প্যাডেল করেন। খানিকটা পথ গিয়ে তিনি দুজন পথচারীকে পাশ কাটিয়ে কিছুটা এগিয়ে যান। তারপর তাঁর খেয়াল হলো যে এদের জিজ্ঞাসা করলে টের পাওয়া যাবে পলাতকরা কোন দিকে গেছে।

দশ গজটাক দূরে গিয়ে তিনি আবার সাইকেল ঘুরিয়ে নিলেন। ধুতি-কোট পরা পথচারী দু-জনের কাছে এসে ব্রেক কষলেন। নিমেষে নিরীহ পথচারী দু-জন রুদ্রমূর্তি ধরলেন। তাঁদের কোটের পকেট থেকে রিভলভার বেরিয়ে এল। তাঁরা অনুমান করলেন সাহেব তাঁদের সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করবেন। প্রথমে নিরীহ পথিক ভেবে পাশ কাটিয়েছিলেন এখন সামনে এসে আর ভুল করবেন না।

পলাতক দুই বিপ্লবীর গুলী এসে লাগে ফরাসী পুলিশ কমিশনার মঁসিয়ে কুইঁয়ের বুকে ও মুখে। তিনি মাটিতে পড়ে যান। তাঁকে সাহায্য করার জন্য যে কনেস্টবলটি পিছু পিছু ছুটে আসছিল, কাছাকাছি আসতে সেও গুলী খেয়ে মাটিতে পড়ল।

আত্মগোপনকারী দীনেশ মজুমদার ও তাঁর সংগী নলিনী দাস এবার নিশ্চিন্তে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

পরদিন হাসপাতালে কুইঁ মারা গেলেন। তাঁর মৃতদেহ প্লেনে করে ফ্রান্সে নিয়ে গিয়ে কবর দেওয়া হয়।

ইতিপূর্বে এই চন্দননগরে চট্টগ্রামের বিপ্লবী তরুণ জীবন ঘোষাল আত্মগোপন কালে ফরাসী ও ইংরাজ পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর সাথী অন্য আত্মগোপনকারী গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত বন্দী হয়েছিলেন, আশ্রয় দাতা শশধর চক্রবর্তী ও সুহাসিনী গাঙ্গুলি নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন। ইংরাজ কমিশনার টেগার্টের মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে সেদিন বাঁধেনি। সেদিনের হিসাব-নিকাশ আজ এই দুজনে বিপ্লবী—দীনেশ ও তাঁর সংগী—করলেন। জীবন ঘোষালের জীবনের বদলা খোদ পুলিশ কমিশনারের জীবন। শোধ-বোধ।.........

চন্দননগর থেকে দীনেশ মজুমদার আবার কলকাতায় ফিরে এসে আত্মগোপন করলেন।

১৩৬/৩-বি, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িতে দীনেশ মজুমদার ও আরও কয়েকজন বিপ্লবী গোপন আস্তানা গড়েন।

যথা সময়ে গোয়েন্দা-দপ্তর এই অঞ্চলে বিপ্লবীদের এক গোপন ঘাঁটি আছে এই সংবাদ সংগ্রহ করল। ১৯৩৩ সালের ২২শে মে ভোর রাতে একদল সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনী বিপ্লবীদের অতর্কিতে গ্রেপ্তার করার জন্য হানা দিল।

আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা যাতে পালাতে না পারেন সেজন্য পুলিশ সমস্ত এলাকাটাই কর্ডন করে ফেলে, পাশাপাশি কয়েকটি বাড়ি একবারে ঘিরে ফেলে, যাতে বিপ্লবীরা এক বাড়ি থেকে লাফিয়ে অন্য বাড়ির ছাদে গেলেও রেহাই পাবেন না। ১৩৬।৩-এ, ১৩৬।৩-বি, ১৩৬।৪-বি বাড়িগুলি পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে। বাইরে নির্গমন নিরুদ্ধ ব্যূহ রচনার পরে পুলিশ-বাহিনী ১৩৬।৩-বি ও ১৩৬।৪-এ বাড়ি দুটির উপরে উঠল।

গোয়েন্দা রিপোর্ট মতো ১৩৬/৩-বি বাড়িটির দোতলায় পুলিশ পলাতকদের পাবার আশা করে। তাই সোজা তারা দোতলায় উঠে আসে, একটি বন্ধ ঘরের দ্বারে করাঘাত করে।

ঘরের ভেতর যারা ছিল তাদের ঘুম ভাঙে। এত রাতে পুলিশ ছাড়া এভাবে কেউ দরজায় ধাক্কা দেবে না এটা তাঁরা সহজেই অনুমান করেন। তাই দরজা না খুলে তাঁরা চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে কী যেন পরামর্শ করেন।

বাইরে অপেক্ষারত ইন্সপেক্টার অধৈর্য হয়ে পড়েন। দরজার কাছাকাছি একটি খোলা জানলা দিয়ে তিনি ঘরের লোকেরা কী করছে উঁকি মেরে দেখতে যান। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে থেকে স্বাগতম জানানো হয় রিভলভারের গুলী বর্ষণ করে। কাঁধে গুলী লাগায় তিনি আর্তনাদ করে জানলা থেকে সরে আসেন। এমন ধরনের অভ্যর্থনার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না।

জানলার মধ্যে দিয়ে গুলী চালিয়ে পুলিশও বিপ্লবীদের গুলীর জবাব দিল।

শুরু হলো দু-পক্ষের লড়াই। জানলার দু-পাশ থেকে আত্মগোপন করে বিপ্লবীরা বারান্দায় পুলিশ-বাহিনীর উপর গুলী বর্ষণ করতে থাকেন। পুলিশও তাঁদের ফায়ারিং এঙ্গেলের বাইরে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে মুষলধারায় গুলী বৃষ্টি করে চলে।

এ এক অভূতপূর্ব যুদ্ধ। বাড়ির বাইরে পুলিসের ব্যূহ, বাড়ির মধ্যের কক্ষ হলো বিপ্লবীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। কতক্ষণ এ যুদ্ধ চলে কেউ তার হিসাব রাখে না। বিপ্লবীরা মনে মনে সৈনিকের সেই ইংরাজি শপথ-বাক্য হয়তো আওড়াল—উই আর নট গোয়িং টু গিভ আপ আওয়ার গানস টিল দি লাস্ট শট ইজ ফায়ারড। শেষ গুলীটি পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

পুলিশ ভাবে কতক্ষণ আর ওরা এই লড়াই চালাবে আমাদের গুলী অফুরান, আর্মারী থেকে আবার গুলী আনবো।

আশপাশের বাড়ির লোকদের নিশীথ নিদ্রা টুটে যায়। তারা বুঝে উঠতে পারে না এতো গোলাগুলীর শব্দ কেন? কাদের সঙ্গে কাদের লড়াই হচ্ছে এই পল্লীর মধ্যে? গৃহ-অঙ্গণ হঠাৎ রণাঙ্গণ হলো কেন? ওই বাড়িতে যে শান্ত-শিষ্ট ভদ্র যুবকগুলি বাস করতো তারাই কি তবে অগ্নি-মন্ত্রের উপাসক রুদ্র বিপ্লবী? বাইরে থেকে দেখে যাদের কুসুমের মতো কোমল মনে হতো, তাদেরই মধ্যে ছিল বজ্রের মতো কঠোরতা? অদ্ভুত এই বাঙালী যুবকেরা।

হঠাৎ পুলিশ দেখতে পায় এই লড়াইয়ের গোলমালে একজন কখন চুপিসারে রেন-ওয়াটার পাইপ বেয়ে পাশের বাড়ির ছাদে উঠে পালাবার উপক্রম করছে। হুইশেল বাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ির পুলিশ-বাহিনীকে সংকেত করা হলো। তারা হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ছোটে।

এই যুবকটি ওই ঘরের মধ্যে অন্যদের মতো ইঁদুর-কলে ধরা পড়েনি। বোধহয় অন্য কোন ঘরে ছিল বা গরমকাল বলে এই বাড়িরই ছাদে শুয়েছিল। এখন চুপিচুপি কেটে পড়ার চেষ্টা করছে।

ছাদ থেকে পলায়মান যুবকটিকে পুলিশ ধরে ফেলল। গোয়ান্দারা তাঁকে চিনতে পারে। আরে, এ যে বরিশালের বিখ্যাত বিপ্লবী নলিনী দাস! সে আমলে বরিশালে এর জনপ্রিয়তার সীমা ছিল না, ঈশ্বরের মতো একবারে সর্বত্র বিরাজমান। কলেজে, হোস্টেলে, খেলার মাঠে, লাইব্রেরীতে; ব্যায়ামাগারে—যুবকদের সর্ব সংগঠনের মধ্যমণি এই নলিনী দাস। আর্ত জনগণের সেবায়, কলেরা-বসন্ত-মহামারীতে দলবল নিয়ে সব সময় দেখা যায় নলিনী দাসকে। সরকারের মতে এমন জনপ্রিয় যুবককে বাইরে বাইরে রাখা বিপজ্জনক, অন্য যুবকদের সহজেই বিগড়ে দিয়ে সরকার

বিরোধী করে তুলতে পারে। তাই নলিনী দাসকে সরকার বরাবরই সুনজরে দেখতো না। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মতো অতগুলি 'বদ-গুণে' ভরা নলিনী ছিল আবার গোঁড়া স্বদেশী।

২৮-২৯ সালে বাংলাদেশে বিপ্লবী তরুণেরা দলের নিষ্ক্রিয় দাদাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গড়ে তোলে 'রিভোল্ট-গ্রুপ'। তাঁরা ইংরাজের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অধীর হয়ে ওঠেন। নলিনী দাসও এই রিভোল্ট-গ্রুপে ছিলেন। মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলায় এই গ্রুপের অনেকেই ধরা পড়েন। নলিনী দাস গা ঢাকা দিয়েছিলেন কিছুকালের জন্য। যখন ধরা পড়েন তখন সরকার তাঁকে হিজলীর বন্দীনিবাসে প্রেরণ করে।

কিছুদিন পরে এই বন্দীনিবাসে বন্দীদের উপর গুলী বর্ষণ করা হয়েছিল। তার ফলে সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন শহীদ হয়েছিলেন। আহতদের খড়্গপুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। অন্য রাজবন্দীরা তাঁদের সেবা করার সুযোগ পান, নলিনী দাস এই সুযোগে সহবন্দী ফণী দাসগুপ্তকে নিয়ে পলায়ন করেছিলেন।

তারপর হিজলী বন্দী নিবাস থেকে পলাতক নলিনী দাস ও মেদিনীপুর জেল থেকে পলাতক দীনেশ মজুমদার এই একই গোপন আস্তানায় লুকিয়ে ছিলেন।

অবশেষে এতদিনে তিনি ধরা পড়লেন।

রাত শেষ হয়ে আসে।

ঘরের মধ্যে থেকে সংগ্রামরত বিপ্লবীদের গুলীও শেষ হয়ে আসে। এইবার ধরা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আত্মসমর্পনের ইচ্ছা জানালেন—উই ওয়ান্ট টু সারেন্ডার!

পুলিস অফিসাররা আনন্দে উল্লাসিত হলেও বিপ্লবীদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না। কে জানে ওই কথা বলে যদি তাদের অসতর্ক করে বিপ্লবীরা আবার গুলী বর্ষণ করে।

—সারেন্ডার ইয়োর আর্মস ফার্স্ট। আগে অস্ত্র সমর্পণ করো।

পুলিশের কথামতো বন্দী বিপ্লবীরা জানলার ধারে পুলিশের চোখের সামনে অস্ত্রগুলি প্রথমে রেখে দিলেন। তারপর দরজা খুলে মাথার উপরে হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলেন।

এইভাবে ধরা পড়লেন দীনেশ মজুমদার ও যুগান্তর দলের জগদানন্দ মুখার্জী।

১৯৩৩ সালের ৫ই অক্টোবর দীনেশ ও তাঁর সঙ্গীদের বিচার শুরু হয়।

দীনেশ মজুমদারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। আগেকার ব্যাপারে একেই তো তিনি 'দাগী আসামী', তার উপর আবার একগাদা নতুন অপরাধ—জেল থেকে পলায়ন, ফরাসী পুলিশ কমিশনার হত্যা, কলকাতা পুলিশের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সংগ্রাম।

সপ্তাহখানেকের মধ্যেই তাঁর বিচার শেষ হলো। এমন সাংঘাতিক লোককে যত তাড়াতাড়ি ফাঁসি দেওয়া যায় ততই সরকারের পক্ষে ভাল। কে জানে আবার কখন কারাগারের প্রহরীদের ফাঁকি দিয়ে পালাবে।

১০ই অক্টোবর বিচারের রায় বের হলো দীনেশ মজুমদারের মৃত্যুদন্ড ও তাঁর সঙ্গীদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

এই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা হলো।

১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী হাইকোর্ট আপিল মঞ্জুর করল না।

নির্ভীক দীনেশ বিপ্লবীর কাম্য শহীদত্বের জন্য সানন্দে প্রস্তুত হয়েই আছেন। জেল থেকে তিনি কয়েকটি চিঠি লেখেন যা তাঁর পূর্ববর্তী সমনামধারী শহীদ দীনেশের (অলিন্দ যুদ্ধের অন্যতম সৈনিক দীনেশ গুপ্ত) চিঠির মতোই অতুলনীয়।

৯ই জুন ১৯৩৪ সালে বীর বিপ্লবী দীনেশ মজুমদার হাসি মুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরলেন।

'টার্গেট—টেগার্ট' অপারেশনে তিন তরুণ বিপ্লবী জীবন দান করলেন—দু-জন ফাঁসিমঞ্চে, একজন রাজপথে।

এই কাজে আরও অনেক বিপ্লবী হয়তো এগিয়ে আসতেন। কিন্তু টেগার্ট সাহেব চাকরীর মেয়াদ শেষে অবসর নেবার আগেই শুধু বাংলা নয় ভারত ছেড়েই চলে গেলেন।

যতদিন বেঁচে ছিলেন বাংলার বিপ্লবীদের দুঃসাহসিকতার কথা তিনি ভুলতে পারেন নি।

সাপ ও শরৎচন্দ্র

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

শরৎচন্দ্রকে প্রকৃতির সন্তান বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না, অন্ততঃ তাঁর শৈশব, কৈশোর এবং যৌবন কাল কেটেছে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে। গাছপালা, নদীনালা, মাঠঘাট, বনবাদাড়, পশুপাখি—সব কিছুর সঙ্গেই তাঁর যোগ ছিল আত্মিক। তাঁর প্রকৃতি যে খুব দুর্দ্ধর্ষ ছিল—তা নয়, সাহস ছিল দুর্জয়, আর ছিল কৌতূহল। জানতে হবে, প্রকৃতির রাজ্যের সব রহস্যের মর্মভেদ করতে হবে—তবেই ত তার সঙ্গে হবে সত্যিকার সখ্য।

ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবন যাপন করতে তিনি বাল্যকাল থেকেই শিখেছিলেন। বনবাদাড়ে যেতে, গভীর জঙ্গলে একা একা দিনে বা রাতে ঘুরতে তাঁর কোনো ভয় ছিল না—না ভূতের, না সাপের। সাপের ত নয়ই; বরং সাপ সম্পর্কে তাঁর অদম্য কৌতূহল।

সাত-আট বছর বয়সে ডিহরীতে যখন তিনি থাকতেন, তখন সেখানে খালের ধারে ঘুরে পাহাড়ী গিরগিটি ধরে ধরে বেড়াতেন।

ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়ীর উত্তর দিকে একটা পোড়োবাড়ি ছিল, সেই বাড়িটার পেছনে নানা লতাপাতায় ঢাকা একটুখানি জায়গা পরিষ্কার করে নিয়ে শরৎচন্দ্র একটা 'তপোবন' বানিয়েছিলেন,—পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে যেত, আর গাছপালায় ঢাকা জায়গা,—যেমন নির্জন, তেমনি প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ভরা। নিমগাছ, কামরাঙার ঝাড় আর গুলঞ্চ লতায় ঘেরা সেই তপোবন। তপোবনের মাঝখানে ছিল একটা বড় পাথর, তার ওপর বালক শরৎচন্দ্র একা একা বসে থাকতেন, আর বড় হবার স্বপ্ন দেখতেন।

ঐ তপোবন থেকে গঙ্গার ওপারের দৃশ্যও বড় মনোরম ঠেকতো. ধূসর গাছপালা, ধোঁয়াটে মেঘে ঢাকা আকাশ, গঙ্গার বিস্তীর্ণ সোনালী চড়া সব মিলিয়ে কেমন যেন রহস্যময় ঠেকতো। একবার সুরেন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র সেখানে নিয়ে এলেন, সুরেন্দ্রনাথের জায়গাটা বড্ড পছন্দ হলো। শরৎচন্দ্র বললেন—সুরেন, এখানে কোনোদিন একলা কিন্তু এসো না; না—ভূতের ভয় নয়, বড় বড় সাপ আছে এখানে।

শরৎচন্দ্রকে একবার সাপে কামড়েও ছিল। সে ঘটনা বর্ণনার আগে তার ভূমিকা হিসাবে কিছু কথা আছে—আগে তা বলে নিই। মামার বাড়ীতে শরৎচন্দ্র 'সংসারকোষ' নামে খুব পুরানো একটা বই দেখতে পান, মাঝে মাঝে সেটা তিনি পড়তেন, কোন্ রোগে কোন্ গাছের শিকড় কাজে লাগে—কোন্ দ্রব্যের কি গুণ,—এইসব তাতে লেখা। এই বইয়ে সাপ ধরার কৌশলও লেখা ছিল। বেলগাছের শিকড় বিষাক্ত সাপের ফণার কাছে ধরলে সাপ তক্ষুণি মাথা নীচু করে বশ মানবে।

ব্যস্, সাপ ধরার কাজে লেগে গেলেন শরৎচন্দ্র। বেলের শিকড় জোগাড় করা এমন কিছু শক্ত নয়, হাঁড়ি, সড়াও জোটানো হলো খুব সহজে। তারপর চললো সাপ ধরার প্রয়াস। ভাগলপুরে খরিস, গোখরো, কেউটে—বেশ নামকরা বিষধর সাপও ছিল প্রচুর। গর্ত দেখলেই শরৎচন্দ্র তা খুঁড়ে দেখতে লাগলেন—সাপ আছে কিনা। বেশীর ভাগ সময়েই সঙ্গে থাকতেন মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অর্থাৎ মণিমামা। একটা গর্ত থেকে ফোঁস করে উঠে এল এক গোখরো সাপ, বেশ বড়সড়। শরৎচন্দ্র তাড়াতাড়ি বেলের শিকড় তার ফণার সামনে ধরলেন, মাথা নীচু করা দূরে থাক, সাপটা বেশ ক্রুদ্ধ হয়েই ফোঁস করে উঠলো, শরতের হাতে ছোবল মারার জন্যে তৈরী হতেই ভাগ্যিস শরৎ হাতটা দ্রুত সরিয়ে নিতে পেরেছিলেন, নইলে সে যাত্রা তাঁর প্রাণরক্ষা হতো কিনা বলা যায় না! মণিমামার হাতে বরাবরই একটা লাঠি থাকতো, সাপ ধরার ব্যাপারে বেলের শেকড়ের চেয়ে লাঠির ওপর তাঁর বিশ্বাস কম ছিল না, বরং কিছুটা বেশীই ছিল। এই বিপদ দেখে মণিমামা হাতের লাঠি দিয়ে সাপটার মাথা লক্ষ্য করে সজোরে একটা ঘা বসাতেই সাপটা গর্জে উঠলো, মণিমামাও মরিয়া হয়ে লাঠির ঘায়ে গোখরোটার ভবলীলা দিলেন সাঙ্গ করে। বেলের শেকড়ে কিছু হলো না।

শরৎচন্দ্রকে যে সাপে কামড়েছিল—তা এই সময়ই। যখন তিনি বেলের শিকড় নিয়ে গর্তে গর্তে সর্পানুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন। মামার বাড়ীর এককোণে একটা পেয়ারাগাছের তলায় কিছু পুরানো ইটের গাদা ছিল, সেখানে ছিল এক সাপের আড্ডা, সেখানকার সাপ ধরার জন্য শরৎচন্দ্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। একদিন ঠিক দুপুরবেলা, চারিদিক বেশ নির্জন, মামার বাড়ীর সবাই হয় দিবানিদ্রায় না হয় বিশ্রামে রত। শরৎচন্দ্র একাই গেলেন সাপ ধরতে।

হঠাৎ এক আর্ত চিৎকার। হ্যাঁ—এযে শরতেরই গলা; মণিমামা ছুটে এলেন,—শরতের পা থেকে দরদর করে রক্ত বের হচ্ছে। হাতের হাঁড়ি সড়াও মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, বেলের শেকড়ও দূরে পড়ে রয়েছে। মণিমামার বুঝতে দেরী হলো না যে শরৎকে সাপে কেটেছে। গলা থেকে নিজের পৈতে খুলে তৎক্ষণাৎ তিনি শরতের পায়ে বেশ করে কষে বাঁধন দিলেন। ধরাধরি করে শরৎকে নিয়ে আসা হলো বাড়ীর মধ্যে। শরৎকে সাপে কামড়েছে—হৈ-চৈ পড়ে গেল বাড়ীতে। শরৎচন্দ্রের মা ভুবনমোহিনী ডুকরে কেঁদে উঠলেন—ওরে আমার শোরো রে—

দেখতে দেখতে লোক জমে গেল এক উঠোন।

কেউ জিজ্ঞাসা করে—কি সাপ?

কেউ জানতে চায়—কেমন করে কামড়াল?

কেউ বা শুধায়—সাপটাকে ধরে রাখা হয়েছে ত!

সোরগোল শুনে শরতের দাদামশাই কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এলেন; এক্ষুণি ক্ষত স্থানটা চিরে দিতে হবে, তারপর ওঝা এলে যা হয় ব্যবস্থা হবে। হরিণের বাঁটের ছুরি এল। কেদারনাথ খানিকটা চিরে দিলেন শরতের পায়ের ক্ষতস্থানে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তুই দেখেছিলি কি সাপ?

হুঁ দেখেছিলাম।—বেশ স্পষ্ট করেই শরৎচন্দ্র জবাব দিলেন।

কোথায় ছিল সাপটা?—আবার প্রশ্ন করলেন কেদারনাথ।

শরতের জবাব—ঐ খাপরার নিচে। আমি ওই পেয়ারাতলার দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ওর পিঠে পা পড়ে গিয়েছিল—

মণিমামা দেখলেন—শরৎচন্দ্র সাপ ধরার ব্যাপারটা চেপে গেলেন, তিনিও আর হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন না।

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—তারপর?

চেঁচিয়ে উঠলাম, যন্ত্রণায় কেঁদে ফেললাম। মণিমামা দৌড়ে এসে পৈতে দিয়ে পা বেঁধে দিয়েছে।

হুঁ—বলে কেদারনাথ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি শরৎচন্দ্রকে যথেষ্ট ভালোবাসতেন বটে, কিন্তু শরতের দুষ্টুমি মনে মনে বরদাস্ত করতে পারতেন না। দুপুরবেলা পেয়ারাতলার দিকে একা একা যাবার দরকারই বা কি ছিল।

বাড়ীর মেয়েদের উদ্দেশ্যে তিনি হুকুম করলেন—একটু নুন আর একটু চিনি আনতে। নুন আর চিনি এল।

প্রথমে তিনি শরৎচন্দ্রকে খানিকটা নুন খেতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি খাচ্ছিস?

নির্বিকার কন্ঠে শরৎ জবাব দিলেন—চিনি।

পরের বার চিনি খেতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলো—এইবার?

শরৎ আগের মতই নির্লিপ্ত কন্ঠে বললেন—নুন।

উত্তর শুনে ভুবনমোহিনী দেবী তারস্বরে কেঁদে উঠলেন, শরতের বাবা মতিলালেরও চোখ ছলছল করে উঠলো। ভুবনমোহিনীর কান্নার আওয়াজ সমস্ত সোরগোলকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল—ওরে আমার শোরো রে—ওরে আমার ন্যাড়া রে—কি হবে গো, শোরো যে নুন খেয়ে বলছে চিনি—আর চিনিকে বলছে নুন—আমার কি হলো রে—আমার শোরো রে—আমার ন্যাড়া যে বুক ভেঙে দিয়ে গেল রে—

কেদারনাথ ধমক দিয়ে উঠলেন, কন্যাকে চুপ করতে বললেন। ওঝা ডাকতে লোক গেছে। তারা আগে আসুক, তারা কি বলে শোনা যাক, তারপরে না হয় কান্নাকাটি করলে হবে।

কেদারনাথ আবার শরৎচন্দ্রকে বললেন—সাপটাকে তুই দেখেছিলি?

বিহ্বল শরৎচন্দ্র বললেন—হুঁ।

কি রকম দেখতে? গায়ে চক্র আছে?

—হ্যাঁ, মস্ত বড় চক্কোর ছিল, ইয়া বড় সাপ।

হ্যাঁ, ইয়া বড় সাপ—বলে কেদারনাথ ধমক দিয়ে উঠলেন—তোর সব মিছে কথা। গায়ে চক্র ছিল না।

আড়ালে কন্যাকে ডেকে কেদারনাথ বললেন—ভুবন, কিছু ভাবিস নি, আমার মনে হচ্ছে সাপটা খুব বিষাক্ত নয়। শরৎ ঘাবড়ে গিয়ে কিছু মিথ্যে বলছে। যদি খরিস কি কেউটে গোখরো হতো—তাহলে তোর ছেলে এতক্ষণ সুস্থ থেকে কথার জবাব দিতে পারতো?

ওঝার দল এসে পড়লো। তাদের আবার এটা চাই, সেটা চাই, সরে যেতে হবে সবাইকে। শুরু হলো ঝাড়ফুঁক। একদিন নয়, কদিন ধরেই চললো নানান তুকতাক, বিবিধরকমের চিকিৎসা। শরৎচন্দ্র সে যাত্রা বেঁচে গেলেন। ভুবনমোহিনী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সাপের সঙ্গে শরতের সাক্ষাৎ কিন্তু এই শেষ নয়। ভাগলপুরে আরও একটা সর্পসম্পর্কিত কাহিনী আছে। সেবারও শরৎচন্দ্রের জীবন রক্ষা হয় নেহাৎ দৈবক্রমে।

সাপে-কাটা ঘটনার পর মতিলাল ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে দেবানন্দপুরে ফিরে আসেন ১৮৮৯ সালে, কিন্তু দারিদ্র্যের চাপে পড়ে ফের তাঁকে ভাগলপুরে যেতে হয় পাঁচ বছর পরে। তখন সেখানকার তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে শরৎচন্দ্রকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। তাঁর দাদামশাই বছর দুই হলো মারা গেছেন, মামার বাড়ীর একান্নবর্তী পরিবার আর নেই। অন্য দাদামশাইরা সব আলাদা হয়ে গেছেন। মামার বাড়ীর সেই শ্রী সমৃদ্ধি নেই।

এই সময় নীলা বলে একটি ছেলের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ হয়। নীলা শরৎচন্দ্রকে ভীষণ ভালোবাসতো; শরৎচন্দ্রের ঘরে প্রায়ই আসতো সে, ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা মারতো। সেবছর শরৎচন্দ্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। তাই একটু দূরে আলাদা করে শরৎচন্দ্রের পড়বার ঘর নির্দিষ্ট হয়ে ছিল, ঐ ঘরে শরৎচন্দ্র রাত্রেও শুতেন। ছোট্ট একটা দড়ির খাটিয়া ছিল, আর ময়লা ছেঁড়া চাদর; একটা কাঠের শেলফে খান-কতক বই, অবশ্য বইপত্তর সহপাঠীদের কাছ থেকে প্রায়ই তিনি চেয়ে আনতেন।

শরতের ঘরটা তাঁর মায়ের মোটেই পছন্দ ছিল না, সারা রাত প্রদীপ জেবলে স্টোভ জেবলে ছেলে কিরকম পড়া তৈরী করছে তা তিনি ভাবতে পারতেন না। তবে ছেলে যে মাঝে মাঝে কফি তৈরী করে খায় আর ধূমপান করে, এটা তিনি জানতেন। শরতের ঘরে ছিল একটা পোষা বেঁজি কেননা—বাড়ীর এদিকটায় বড্ড সাপের উৎপাত ছিল, বলা বাহুল্য, বেশ বিষধর সাপেরই উৎপাত।

একদিন সকালবেলা নীলা শরৎচন্দ্রকে ডাকতে এসে দেখে—শরৎ তখনো ঘুমোচ্ছেন। সে ফিরে যাবে, না শরৎকে ডাকবে,—এইরকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার চোখে পড়ল শরতের গায়ে যে চাদরখানা চাপা রয়েছে—তা রক্তমাখা! খাটিয়ার মাথায় দিকেও যেন রক্তের ছোপ। নীলা খুব চেঁচিয়ে শরৎচন্দ্রকে ডেকে তুললে।

চোখ মুছতে মুছতে শরৎচন্দ্র খাটিয়ায় উঠে বসতেই নীলা জিজ্ঞাসা করলে—তুই রাত্রে রক্তবমি করেছিস?

রক্তবমি? ধ্যৎ—বলে শরৎচন্দ্র আবার শোবার জোগাড় করলেন।

—ধ্যাৎ কিরে—তুই দ্যাখ, তোর চাদর রক্তমাখা, ঘরের মেঝেও রক্তের ছোপ—

নীলার কথায় বাধা দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন কন্ঠে বললেন শরৎ—তুই এখন যা নীলা, আমাকে একটু ঘুমোতে দে—পরে আসিস, তামাক সেজে দেব'খন।

নীলা শরতের হাতের সাজা তামাক খেত ঠিকই, কিন্তু চারদিকে এত রক্ত দেখে সে শরৎচন্দ্রকে জোর করে টেনে তুললো বিছানা থেকে, বললে—তোর চারদটা দিকে চেয়ে দ্যাখ—তাজা রক্তের দাগ, এযে অনেক রক্তরে—

রক্তের কথায় শরৎচন্দ্রের ঘুম ছুটে গেল। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের মেঝের দিকে একবার ,আর একবার তার গায়ে দেবার চাদরের দিকে তাকিয়েই তিনি বললেন—এ নিশ্চয়ই বেঁজি ব্যাটার কাজ, ইঁদুর ফিঁদুর মেরেছে নিশ্চয়ই—

নীলা ঘরের চারদিকে তন্ন তন্ন করে দেখে, বাইরেটায় উঁকি মারতেই চমকে উঠলো—হ্যাঁ, বেঁজিরই কাজ বটে, তবে তোর একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেছে শরৎ। বেঁজি ইঁদুর মারেনি—ওই দ্যাখ—

নীলার হাতের আঙুলের লক্ষ্য ধরে শরৎচন্দ্র তাকিয়েই শিউরে উঠলেন—বেঁজিটা মস্ত বড় এক গোখরো সাপ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে।

সত্যিই শরৎচন্দ্রের মস্ত বড় এক ফাঁড়া কেটে গেল।

এর পরের ঘটনা হচ্ছে পেগুতে। শরৎচন্দ্র যখন রেঙ্গুণে থাকতেন, তখন পেগুতে যাবার একটা সুযোগ জুটে গেল। পেগু জংগুলে জায়গা, সেখানে যেমন আছে প্রচুর বৌদ্ধ-মন্দির, তেমনি আছে অজস্র প্যাগোডা; এছাড়া শিকারের জন্য এ হচ্ছে পশু ভ্রমণকারী আর শিকারীদের পক্ষে একেবারে আদর্শস্থল। ওই দুটো নেশাই—বেড়ানো আর শিকার করা—শরৎচন্দ্রের ছিল। বন্ধু গিরীন্দ্রনাথ সরকার পেগুতে একটা কাজে যাচ্ছিলেন, শরৎচন্দ্র তাকে ধরে বসলেন, তিনিও সঙ্গে যাবেন। পেগুতে মৎস্য শিকারের পর পশু শিকারের জন্য গভীর জঙ্গলে যাওয়া শুরু হলো। একদিন প্রকান্ড একটা গোখরো সাপের সামনে পড়ে গেলেন দুই-বন্ধু। গিরীন্দ্রনাথ ভয়ে একেবারে মুষড়ে পড়লেন। কি করবেন—ভেবে পেলেন না। সাপ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বরাবরই কৌতূহলী, উদ্যত ফণার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আদৌ নিরাপদ নয়; ক্রুদ্ধ সাপের ফোঁসফোঁসানির আওয়াজে মনে হচ্ছে যেন ছোটখাটো ঝড় উঠেছে গাছপালায়—সাপটাকে দেখে তাদের মনে হলো সাক্ষাৎ যমই বুঝি এই চেহারায় তাদের কাছে এসে হাজির হয়েছে। কোনোরকমে দুজনে পালিয়ে এলেন সামন্য দূরে, সেখানে এসেই শরৎচন্দ্র বললেন—সাপটাকে আগাগোড়া দেখতে পেলাম না কোন্ জাতের গোখরো—তা বুঝতেও পারলাম না,—আমাদের দেশে কিন্তু এরকম উদ্যতফণা ক্রুদ্ধ গোখরো বড় একটা দেখা যায় না, বিহারে সাঁওতাল পরগণার খরিস সাপও এর কাছে লাগে না। পালিয়ে না এসে ভালো করে দেখলে বোঝা যেত—

এমন সময় একটা বর্মী বালককে দেখা গেল জঙ্গলে গাছ কাটতে বেরিয়েছে। শরৎচন্দ্রের মুখে সাপের কথা শুনে সে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায়, কোনদিকে সাপটা? আমি ধরে দিতে পারি। কত বখশিস মিলবে?

পাঁচ রুপেয়া—শরৎচন্দ্র বললেন। শরৎচন্দ্র বর্মী ভাষা জানতেন।

ছেলেটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কয়েক মিনিট পরেই ইয়া লম্বা মস্ত এক গোখরো সাপ ধরে নিয়ে এসে বললে—কই রুপেয়া, কই!

শরৎচন্দ্রের কাছে কিন্তু পাঁচ টাকা ছিল না, কথার কথা হিসাবে তিনি বখশিস করবেন বলেছিলেন, ভেবেছিলেন—ছেলেটা পারবেই না সাপ ধরতে। ছেলেটা ছিল একগুঁয়ে, পাঁচ টাকার কম সে কিছুতে নেবেই না, ঝঞ্ঝাট বাধাতে চাইলে। কোন রকমে গিরীন্দ্রনাথের বদান্যতায় দুটো টাকা দিয়ে সে যাত্রায় মান এবং প্রাণ রক্ষা করে পেগু থেকে ফিরে এলেন তিনি।

আরো আছে সাপের ব্যাপার। এবার সামতাবেড়ের বাড়ীতে। রূপনারায়ণ নদের ধারে শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনে পল্লীনিবাস বানিয়েছিলেন, হাওড়ায় বাজে শিবপুরে যখন তিনি বাস করতেন, তখনই তিনি এই সামতাবেড়েতে জমি কিনে বাড়ী করান। বাড়ীটা তখনো সম্পূর্ণ না হলেও বাসযোগ্য হয়েছিল, মাঝে মাঝে তিনি সেখানে গিয়ে বসবাস করতেন, স্নিগ্ধ পল্লীর নির্জন পরিবেশ, বিস্তীর্ণ রূপনারায়ণের চর, সকালের কুয়াশা, রাত্রের জ্যোৎস্না, সন্ধ্যার আলো, দূরের গাছগাছালির সবুজ সমারোহ—শরৎচন্দ্র দুচোখে ভরে দেখতেন আর মুগ্ধ হয়ে যেতেন। শরৎচন্দ্র সস্ত্রীক গিয়ে বেশ কিছুদিন ওখানে বাস করতেন। তখন কলকাতার ভক্তবৃন্দ, সাহিত্যরসিক বন্ধুরা, কিছু সাহিত্যিক—সকলে সামতাবেড়ের বাড়ীতে গিয়ে হৈ-চৈ করে আসর জমিয়ে বসতেন শরৎচন্দ্রকে ঘিরে।

শরৎচন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে সামতাবেড়ের বাড়ীতে গল্পগুজব করছেন—এমন সময় শোনা গেল বাড়ীর পেছনে বাঁশ ঝাড়ের পাশে পাকা ল্যাট্রিনের সিঁড়িতে সাপ, বিষাক্ত সাপ।

এইনা শুনে শরৎচন্দ্র তড়াক করে উঠে একটা টর্চ হাতে আর একটা ছড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বন্ধুরা শঙ্কিত

[শেষাংশ ৩৩৬ পৃষ্ঠায়]

কুমারেশ ঘোষ

আমি ওকে, আমার রুম-মেটকে প্রায়ই বোঝাই, সেদিন আরো ভালো করে বেশি করে বোঝাচ্ছিলাম, দেখো আজকাল পাঁচজনে যা করে, তুমিও তাই করো। বেশি বাহাদুরি দেখাতে যেয়ো না। মনে রেখো যত দায়িত্ব ঘাড়ে নেবে, ততই দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসবে। তোমার দুখানা হাত আছে বলেই, যে খাটতে হবে, তার কী মানে আছে। হাত তো অনেকেরই থাকে, সবাই তোমার মতো খাটে? তাও তো তোমার একটা হাত ছোট। সেই লজ্জা ঢাকতে এত খাটো নাকি?

না, না, না—খাটাটা আজকের দিনে লজ্জার কিছু না। বরং যারা খাটে তারাই বোকা। আর যারা খাটে শুয়ে দিন কাটাতে পারে তারাই চালাক। তুমি বোকার হদ্দ।

আরো বোঝালাম ওকে—

তোমাকে এত কথা বলতাম না। কী দরকার বলবার? তুমি খাটতে খাটতে মরতে চাও মরো, আমার কী তাতে? এক একজন এ সংসারে আসে শুধু খেটে মরবার জন্যেই। তার দুর্ভাগ্য। অথচ জেনে রেখো এজন্যে কেউ তোমাকে প্রশংসা করবে না বা বাহবা দেবে না। এখন মুস্কিল হয়েছে কি, তুমি খাটছো অতএব তোমার সঙ্গে অফিসে আর বাড়িতে আমাকেও খাটতে হচ্ছে। খাটতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। নইলে লোকে বলবে ব্যাটা কুঁড়ের বাদশা। অথচ আমার মোটেই খাটতে ইচ্ছে করে না যাকে বলে গতর-কুঁড়ে আমি। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার হয়েছে যত জ্বালা। একজন যদি ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে তবে আমার মতো একটা শম্বুক-গতি মানুষের কী করে সম্ভব হয়, তার সঙ্গে চলাফেরা করা, কাজ করা?

সত্যি তোমার সঙ্গে ঘর করি, এমন কি, তোমার কথামতো যথাসাধ্য চলি বলেই আজ এতগুলো কথা তোমাকে বলছি। এক এক সময় কী মনে হয় জানো? মনে হয় তোমাকে একঘরে করাই উচিত কিংবা আমার একঘরে হওয়া উচিত। যার সঙ্গে মনের মিল নেই, কাজের মিল নেই, চলাফেরার মিল নেই—তার সঙ্গে ঘর করা সত্যিই দুঃসহ। অথচ তুমি আমার রুম-মেট।

কিন্তু এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে, বলতে পারো বদ অভ্যেস হয়ে গেছে, যে এখন যেন তোমাকে না দেখলে, তোমাকে কাছে না পেলে অন্ধকার দেখি। তোমায় হাতে ধরে না বেরুলে ভাল লাগে না যেন। সত্যিই মানুষ অভ্যেসেরই দাস।

অথচ, এমন একদিন ছিলো, যেদিন লোকে তোমাকে কেয়ারই করতো না। কিন্তু পরে 'নাই' পেয়ে-পেয়ে তুমি এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করছো। আমাকেও। কেবল কথায় কথায় চোখ রাঙাও। কেন? আমি তোমার খাই, না, পরি? না, তোমার বিয়ে করা বৌ? তারাও আজকাল আর কর্তার হুমকীর ভয় করে না। এখন আর তাই কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম হয় না, গিন্নীর ইচ্ছেয় কর্ম। আমি তোমার কথামতো চলি, তোমার পরামর্শ মত কাজ করি, এই হয়েছে আমার অপরাধ। আমাকে দিব্যি পেয়ে বসেছো।

না বাপু, বলে দিচ্ছি, আর আমি পারছিনে তোমার

সঙ্গে। তুমি যত ইচ্ছে খাটোগে, মরোগে। সেজন্য লোকে তোমাকে বাহবা দিক, আমার কোনো দুঃখু নেই। বরং তোমার হাত থেকে বাঁচলে বাঁচি। তোমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে থাকতে পারলাম না বলে লোকে যদি আমাকে নিন্দে করে করুক। রোজ তোমার কাছ থেকে কাজের জন্যে চাঁটা খাওয়ার আগেই টা-টা করতে চাই। বুঝলে?

বুঝলাম।—ও বললো, তবে এটা বুঝছিসনে কেন, আমিই তোদের গড়া ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, আরব্য উপন্যাসের সেই বোতল ছাড়া দৈত্য? এখন ভয় পেলে চলবে কেন? তোরা ভগবানের গড়া ভঙ্গুর সৃষ্টি, আমি তোদেরই গড়া স্থায়ী বাস্তব বস্তু।

বলেই ঠনঠন করে গোটা দশেক গাঁট্টা আমার মাথায় মেরে ঘরের দেওয়াল ঘড়িটা বললে, যা, যা, এখন অফিসে যা। পাঁচটায় ফিরে এসে রোজকার মতো নাকে-কান্না কাঁদিস। আর হ্যাঁ, আমার বাচ্চাটাকে তোর হাতে ধরে নিয়ে যা, নইলে সব তোর গুলিয়ে যাবে।

আমি রিস্টওয়াচটা হাতের কব্জিতে বেঁধে হেসে বেরিয়ে পড়লাম অফিসে।

সাপ ও শরৎচন্দ্র [৩৩৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

হলেন, কেউ কেউ ত ভয়ে একেবারে নীল বর্ণ। দু-একজন মৃদু বাধা দেবার চেষ্টা যে না করেছিলেন—এমন নয়, কিন্তু তাতে ফল হলো না। শরৎচন্দ্র ততক্ষণে ল্যাট্রিনের ধারে চলে গেছেন।

মাত্র কয়েক মিনিট পরেই তিনি ছড়িতে ঝুলিয়ে ইয়া বড় একটা সাপ নিয়ে ফিরে এলেন। উঠোনে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে তাতে টর্চের আলো ফেলে বললেন—ভালো করে চেয়ে দেখো—এটা একটা সাংঘাতিক ধরনের গোখরো সাপ।

সাপের কথা শুনে বেশ কিছু লোকও জড়ো হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের 'টেবি' নামক কুকুরটা দেখে ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো,—সাপটা ফোঁস করে টেবিকে ছোবলও মারলে মনে হলো। সাপটাকে মেরে ফেলে সকলে টেবির প্রতি নজর দিলে, কুকুরটা বোধহয় শেষ হয়ে গেছে! শরৎচন্দ্র ভীষণ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন টেবির জন্য; সৌভাগ্যের কথা—সাপের ছোবলটা টেবির গায়ে লাগে নি, অল্পের জন্যে সে বেঁচে গেছে!

শরৎচন্দ্র হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সাপের প্রতি শরৎচন্দ্রের মমতাও ছিল। সামতাবেড়ের বাড়ীর চারধারে কিছু বিষধর সাপ ছিল, তাদের তিনি মারতে দিতেন না, শীতের দুপুরে উঠোনে তারা এসে রোদ পোহাতো, তিনি দেখে তাদের তাড়া দিতেন না, কাউকে কাছে যেতে দিতেন না। সাপকে তিনি ভালই বাসতেন!

মামার বাড়ী [১৪৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

গজু : কোন ভয় নেই মামী। তুমি এক ফোঁটা গঙ্গা মাটি আর একটা তুলসী পাতা খাইয়ে দাও আমাকে, আর মামা তোমার পৈতেটা ছুঁইয়ে দাও একবার আমার মাথায়। দেখবে তাহলেই ফের আমি হিন্দু হয়ে যাব।

বিপিন : যাবি? তাই যা বাবা। কিন্তু লক্ষ্মীটি, কারোর কাছে যেন বলিসনে এসব কথা।

গজু : ওরে বাবা, তাই কখনো বলতে পারি? কিন্তু তোমরাও আর আমাকে বিক্রি করতে যাবে না বল।

বিপিন : না, না, কখনো না। আমি এক্ষুণি টাকা ফেরত দিচ্ছি প্রাণকেষ্ট বাবুকে।

গজু : খেঁদীর মাকে ফের কাজে লাগাবে বল। আমাকে দিয়ে আর ভাত রাঁধাবে না, জল তোলাবে না, বাসন মাজাবে না বল। শান্তিতে লেখাপড়া আর খেলাধুলো করতে দেবে বল। নইলে কিন্তু.........

মাতঙ্গিনী : ওরে না, না। তোকে আর কিছু করতে হবে না। তুই আমার সোনা ছেলে, আমার গজুমনি!

গজু : তাহলে মামী, ম্যাজিস্ট্রেটের দেওয়া ঐ দুশো টাকা তুমিই নাও। ঐদিয়ে আবার তোমার আচার আমসত্ত আর বড়ি করে নাও। আমি কথা দিচ্ছি আর কোনদিন তা চুরি হবে না!

যবনিকা

কোহ্-ই-নুর ডিটেক্‌টিভ এজেন্সীর জুনিয়র পার্টনার বাবুন এসে আমার চেয়ারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ডিটেক্‌টিভ এজেন্সীর নামটা তাদের সিনিয়র পার্টনার টুকুনের দেওয়া —সে ইতিহাস বইতে আবিষ্কার করেছিল যে কোহ্-ই-নুর নামের অর্থ জগতের আলো। নামে অবশ্য কিছু এসে যায় না, সেটা জগতের আঁধার হলেও ক্ষতি ছিল না, তবে, পয়া-অপয়ার প্রশ্ন আছে তো।

বাবুনের প্যান্টের পকেটে সিগারেট-দেশলাই মজুত থাকে। ফস্ করে ক্যাপস্টানের প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বের করতেই আমি আড়চোখে দেখে নিলাম, তারপর হুঙ্কার দিলাম, "তাতু! এটা কোন্ বই-এর পাতা?" বাবুন সজোরে প্রতিবাদ করল, "না তাতু! তোমার কোন বই-এর পাতা আমি ছিঁড়িনি, এটা আমার পুরোনো ছবির বই, মা তো পুড়িয়েই ফেলছিল। দেখ তাতু, সিগারেটের গায়ে কেমন ছাগলের ছবি! দেখলাম সুন্দর করে সুতো দিয়ে বেঁধে নিয়েছে ছেঁড়া কাগজ পাকিয়ে। আর কিছু আমি বলতে পারলাম না, তবু সে যখন তার দেশলাইটা থেকে কাঠি বের করে সিগারেট ধরালো (সবটাই নকল, শুধু ভঙ্গীটুকু ছাড়া, তখন চট করে দেখে নিলাম বাক্সে সবগুলোই ঝাঁটার কাঠি, সত্যিকারের বারুদ মাখা কাঠি নেই।

কোহ্-ই-নুর এজেন্সী অবশ্য এখনও বড় কিছু ডিটেক্‌ট করেনি, তবু এদের আমি হাতে রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করি। এই তো কিছুদিন আগে যখন আমার কলমটা হারিয়ে যায়, তখন এরাই তো সেটা সোফার গদীর নীচ থেকে বের করে দিয়েছিল। এর কেরামতি একেবারে নেই তাই বা বলি কি করে। এরা লক্ষ্য করেছিল যে আমি সোফায় বসে পড়তে পড়তে হঠাৎ উঠে গেলে কলম-পেন্সিল গদীর উপরেই রেখে যাই। তাই মাসখানেক ধরে খুঁজে খুঁজে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম, তখন এরা গদী উল্টে সেটা বের করেছিল। ফী অবশ্য এরা চায়নি, তবে আমি এদের ও এদের দাদা-দিদিকে, যারা এদের অ্যাড্‌ভাইসার, তাদের টফী খাইয়েছিলাম। এরা আশা করে ভবিষ্যতে এদের এজেন্সী আরও বড় হবে, এবং আমি মনে করি যে তখনও ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে (হাতে অবশ্য টফী থাকবে) কাজকর্ম করাতে পারব।

কুম্ভীরাশ্রু

✱ সুনীলকুমার লাহিড়ী

বাইরে হট্টগোল শুনে বুঝলাম এজেন্সীর সিনিয়র পার্টনার টুকুন ও দ্বিতীয় পার্টনার ছোটনের মধ্যে এক বিরোধ দেখা দিয়েছে। দুজনে এল, একই সঙ্গে কথা বলতে বলতে, কথার ধরনটা এইরকম—প্রথম কণ্ঠ, "হ্যাঁ তুই"; দ্বিতীয় কণ্ঠ, "না আমি"; উভয় কণ্ঠে একত্রে "মেরেছিস্ মারিনি।" ছোটন কিঞ্চিৎ নরম প্রকৃতির, সে হঠাৎ ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। টুকুন ব্যঙ্গ করে বলল, "দেখ্ দেখ্, কুমীরের কান্না"—।

সবদিকে কিছু শান্ত হলে আমি ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করলাম। ছোটন একটা বিড়াল বাচ্চাকে লাথি

৪৩ প ৭৫

মেরেছিল, তাতে বিড়াল-বাচ্চাটা ছিটকে পড়ে। সেটার আর্তনাদ শুনে ছোটন কেঁদে ফেলেছিল। টুকুন তাকে তিরস্কার করাতে সে বলে, সে ইচ্ছা করে মারে নি। এই নিয়েই গোলমাল।

কিছু শান্ত হলে ছোটন জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা জেঠু, কুমীর কি কাঁদে?" বলেই চট্ করে আমি কিছু বলবার আগেই হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে নাকটা মুছে, প্যাণ্টে হাত ঘসে নিল। আমি রেগে মেগে কিছু বলবার আগেই বাবুন বলল, "কাঁদেই তো; চিড়িয়াখানার ছাগলটাকে খেয়ে কুমীরটা কি রকম ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল, তোরা দেখিস্‌নি?"

একে জ্যান্ত ছাগল খাওয়া, তাতে কুমীরের কান্না— ব্যাপারটা হজম করা শক্ত। ছোটন জিজ্ঞেস করল, "তুই দেখেছিস্? টুকুন বরাবরই সন্দিগ্ধ প্রকৃতির, ডিটেক্‌টিভ বইতে পড়েছে, নিজেকেও বিশ্বাস করতে নেই; বলল, "মিথ্যাবাদী!" বাবুনের উপস্থিত বুদ্ধি প্রখর, সে জবাব দিল, "কেন, তাতুকে জিজ্ঞেস কর্।" আমি স্তম্ভিত। তবু প্রশ্ন করলাম, "তোমাকে খেল না কেন?" "আমি তো বাবুন, ছাগল না।"—জবাব।

ছোটনের মনে তখনও কুমীরের কান্নার তুলনাটুকু হুলের মত বিঁধে রয়েছে। আবার বলল, "বল না জেঠু, কুমীর কাঁদে নাকি?"

আমি বললাম, "কাঁদে বৈকি, তবে দুঃখে না, বাঁচার জন্য কাঁদে।"

গল্পের গন্ধে তিনজনে ঘেঁষে এল। বাবুন হাঁক দিল "ছোড়দা, ছোড়দি, গল্প শুনবি আয়।"

আমি শুরু করলাম, "ইঁট সাজিয়ে যেমন বাড়ী তৈয়ারী হয়, তেমনি কোন প্রাণীর শরীর, এমনকি কুমীরের শরীরও, তৈয়ারী হয় কোষের পর কোষ সাজিয়ে। আর এই কোষগুলি সব জীবন্ত, তারা খায় দায়, নিঃশ্বাস নেয়, পায়খানা-পেচ্ছাব করে।"

বাবুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা তাতু, এই সব কোষের মা আছে?

আমি বললাম, "আছে। তবে সে অন্য গল্প। আজ কুমীরের কান্নার গল্প শোন।

"এই কোষদের কাছে খাবার নিয়ে যাবার ব্যবস্থা দরকার। নদীতে নৌকো যেমন একদেশ থেকে অন্যদেশে মাল নিয়ে যায়, তেমনি প্রাণীর দেহে নদীর মত যে রক্ত বয়, তাই খাবারদাবার, বাতাস, কোষের কাছে পৌঁছে দেয়। কেবল, নৌকোর বদলে রক্ত সব কিছু গুলে নিয়ে যায়, ঠিক যেমন জলে চিনি গুলে যায় সেইরকম।"

"জান তাতু, ছোটন আজ চুরি করে চা বানিয়ে খেয়েছে"—বাবুন নালিশ করল।

"বাঃ, জেঠু তো জানে, জেঠুকে দিলাম যে।"

"আমাকে তো দিস্‌নি; আমি মা-কে বলে দেব।"

"নান্‌শে বুড়ো।"

"ওরে থাম্, থাম্, গল্প শুনবি নে তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বল, বল।"

"আবার নৌকোগুলো ফিরবার সময় যেমন নূতন সওদা নিয়ে আসে, তেমনি রক্ত কোষকে খাবার দেবার সময়ে কোষ থেকে সব দূষিত পদার্থ নিয়ে আসে।

আমরা যে সব খাবার খাই, তা থেকেই কোষেদের খাবার তৈয়ারী হয়। খাবারের মধ্যে কতকগুলো জিনিস থাকে; তাদের বলে লবণ। আমরা যে নুন খাই, তা একরকম লবণ, এটা শরীরের পক্ষে দরকারী। তেমনি আরও অনেক দরকারী লবণ আমাদের খাবারে আছে। আবার অনেক লবণ আছে যেগুলো আমরা খাইনে কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহার করি, যেমন তুঁতে, সিঁদুর।

আমাদের শরীরের কোষগুলোর লবণ দরকার হয়, রক্ত সেগুলো নিয়ে যায়। কিন্তু লবণ যদি বাড়তি হয়, তবে কোষদের জীবন সংশয় হয়। সেই বাড়তি লবণ রক্ত, পেচ্ছাব আর ঘামে গুলে নিয়ে আসে।

এই যে রক্ত, সারা গায়ের যত কোষের থেকে যত নোংরা নিয়ে এল, একে তো আমরা ফেলে দিতে পারি নে। তাই একে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা আছে। একে এক দফা পরিষ্কার করে আমাদের কিড্‌নী। কিডনীতে ভারী মজার ছাঁকনী আছে। তারা রক্ত থেকে কিছুটা জল ছেঁকে নেয়, আর তার সঙ্গে লবণ ও অন্যান্য নোংরা গুলে কিড্‌নীতে আটকা পড়ে যায়, ছাঁকা রক্ত হয় পরিষ্কার। এইটাই হচ্ছে পেচ্ছাব। এছাড়া

আমাদের ঘামের গ্রন্থিতে ঘাম হয়ে আরও নোংরা বার হয়ে যায়। কোষেদের ব্যবহার করার পরে বাতাসের অপ্রয়োজনীয় গ্যাসগুলো ফুসফুসে নিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে বাবুন কী একটা করায় ছোটন বলল "এটা তো নিঃশ্বাস নয়! বাবুন কি খেয়েছিলি?"

"বাঃ, মা তখন ঘুমিয়েছিল তো, আর আমার খিদে পেয়েছিল, তাই খেয়েছি।" আমি বললাম "চাবি পেলে কোথায়?" "মা তো ঘুমিয়েছিল, আঁচল থেকে খুলে নিয়েছি।" "মাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?" "মা তো ঘুমোচ্ছিল।"

ছোটন বলল, "জান জেঠু ও এত্তোগুলো বড়া খেয়েছে।—তোর পেটের অসুখ করবে।" "ইস্, করলেই হোল, জোয়ানের আরক খেয়ে নিয়েছি তো?"

আমি রাগ করে বললাম, "কিন্তু তুতু, তোমার পেটের খাবার ভাল হজম হয় নি, পচে গ্যাস হয়েছে।"

খুদে অপরাধী চোখ নামিয়ে নিল।

আমি বলতে লাগলাম, "তাতুর খাবারের মধ্যে যা রক্তে গুলবার তা গুলে গেছে, বাকী শক্ত জিনিষ পায়-খানা হয়ে বেরোবে, কিন্তু হজমের গণ্ডগোল হয়ে কিছু খাবার যেটা রক্তে মিশতে পারত পচে গেছে।

তাতু যদি বেশীবার পায়খানায় যাও তবে রাতে উপোস্, নয়তো বার্লি।" বাবুনের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল, কাছে টেনে নিয়ে তার মনের মেঘ কাটিয়ে দিলাম। গল্প আবার শুরু হোল।

"সমুদ্রের পাখী, সাপ, কুমীর, কাছিম এদের কিড্‌নী আছে বটে কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। তাই রক্তের ময়লা ছাঁকার জন্য প্রকৃতি আলাদা যন্ত্র দিয়েছে।

কুমীর, কাছিম, এদের যন্ত্রটা চোখের নীচে, আর ছাঁকনীর মুখটা চোখের কোলে। তাই এদের পেচ্ছাব চোখের জল হয়ে বেরোয়।

কুমীরকে তাই খাওয়া-দাওয়ার পর যদি পেচ্ছাব করতে হয়, তবে তাকে চোখের জল বলে মনে হবে।

সমুদ্রের পাখিদের পেচ্ছাবের গ্রন্থির মুখ নাকের ফুটোর মধ্যে, কাজেই নোনা খাবার খাওয়ালে পাখীদের নাক দিয়ে পেচ্ছাব বের হয়, মনে হয় সর্দিতে ভুগছে।

শরীরের এই বাড়তি লবণ ধোলাই করবার জন্য প্রাণীদের যথেষ্ট জল খেতে হয়। সমুদ্রের জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না, কারণ আমাদের পেচ্ছাবে বা ঘামে যত লবণ আছে, সমুদ্রের জলে তার চেয়ে বেশীই থাকে। কাজেই জাহাজ ডুবির নাবিক যদি শরীরের লবণ ধোলাই করবার জন্য সমুদ্রের জল খায়, তবে উল্‌টে তার শরীরে আরও লবণ বেড়ে যাবে। জল না খেয়ে সে যে কদিন বাঁচতে পারত সমুদ্রের জল খেয়ে তার সে কদিন বাঁচার সম্ভবনাও থাকবে না।

অথচ মজা হচ্ছে আলবাট্রস বা সীগাল জাতীয় পাখী, যারা মাঝ-সমুদ্রে থাকে, তারা সমুদ্রের জল খেয়েই বেঁচে থাকে, খাঁটি জলের স্বাদ তারা জানে না, পেলেও তা খায় না।

ছোটন জিজ্ঞাসা করল, মাছেরা তো জলে থাকে, তাদের জল তেষ্টা পায়?

"মাছদের গায়ের ছাল, ফুলকোর উপরে মুখের ভিতর এক বিশেষ ধরনের পর্দা থাকে।

হাঁস মুরগীর ডিমের উপরের খোলাটা ভাঙলে যে পাতলা পর্দা দেখা যায়, মাছের গায়ের ঐ পর্দাও সেই রকমই।

ডিমের এই পাতলা খোসা ফুটো করে ডিমের ডিমটুকু বার করে ঐ খোসার থলি দিয়ে মজার পরীক্ষা করা যায়। থলির মধ্যে নুন-জল ভরে যদি তাকে জলে ঝুলিয়ে রাখা যায় তবে দেখা যায় থলিটি বাইরে থেকে জল শুষে নিয়ে ফুলে উঠেছে। আবার, থলিতে খাঁটি জল ভরে সেটাকে নুন-জলে ঝুলিয়ে রাখলে দেখা যায় যে তার ভিতর থেকে খাঁটি জল বেরিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ, পরদার একপাশে নুন জল অন্য পাশে খাঁটি জল রাখলে, জল বেশী নুনের দিকে চলে আসে, কিন্তু নুন বেরুতে বা ঢুকতে পারে না। দুই পাশে যদি দু রকম ঘনত্বের নুন-জল থাকে, তবে কম ঘন নুন-জলের দিক থেকে জল বেশী ঘন নুন-জলের দিকে আসে আর শেষে দুই দিকেই নুন-জলের ঘনত্ব এক রকম হয়ে যায়। এই প্রণালীতে নুন না গিয়ে জল চলাচল করাকে অসমোসিস (osmosis) বলে।

মাছের গায়ের পর্দারও গুণ আছে।

টাটকা জলের মাছেদের, যেমন রুই-কাতলার, দেহের ভিতরের রক্তের পরিমাণ বেশী বাইরের জলের চেয়ে। ফলে, এদের দেহের পর্দা দিয়ে সর্বদা হুড় হুড় করে শরীরের ভিতরে জল ঢুকছে। কাজেই, জল পান তো দূরের কথা, এদের দিবারাত্র ফুলকো দিয়ে জল বের করে দিতে হয়। যেহেতু শরীর থেকে লবণ বেরিয়ে গেলে তা জোগাড় করা এদের মুস্কিল, লবণটাকে আটকে রেখে খাঁটি জল বের করে দেয়। সামান্য এক আধটু লবণ যা বেরোয় তা হড়হড়ে যে রস গায়ে লেগে থাকে তাতে আছে।

সমুদ্রের মাছের বেলায় ব্যাপারটা উল্টো। তাদের রক্তে লবণের যে পরিমাণ, বাইরে সমুদ্র-জলে লবণ তার চেয়ে বেশী; তাই এদের শরীর থেকে সর্বদাই খাঁটি জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তাই এরা সর্বদাই তেষ্টায় ভোগে।

হাঙর যদিও সমুদ্রের মাছ, তার কায়দাটা অন্যরকম। পেচ্ছাবের মধ্যে ইউরিয়া বলে লবণ থাকে। হাঙর করে কি, রক্তে ইউরিয়া জমিয়ে রাখে। কাজেই হাঙরের রক্তে মোট লবণের পরিমাণ সমুদ্রের জলের চেয়ে বেশী। টাটকা জলের মাছের মতই, হাঙরের শরীরে বাইরে থেকে জল ঢোকে। হাঙরের তেষ্টা পায় না, বরং প্রায়ই শরীর থেকে জল বের করে দিতে হয়। আরও মজা কি জান, ইউরিয়া মারাত্মক বিষ, আমাদের রক্তে বেশী ইউরিয়া জমলে অসুখ করে, এমন কি মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু এই বিষ রক্তে নিয়ে হাঙর পরমানন্দে বেঁচে থাকে।

মরুভূমির দেশে জল বাড়ন্ত। সেখানকার গাছ-পালার তাই পাতা থাকে না, যাতে জল উবে না যায়। সেখানে, প্রাণীরা গাছ পালা, আর মাটির নীচের মূল-খন্দ দিয়েই চালিয়ে দেয়। মাংসাশী প্রাণীরা শিকারে শরীরের জলেই খুশী।

এর মধ্যে কয়েকটি জন্তুর কারবার দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ক্যাঙারু ইঁদুরগুলো করে কি, যে সমস্ত বীজ ইত্যাদি পায়, সেগুলো মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে জমা করে। গর্তের মাটির যে সামান্য রস বাতাস জলীয় বাষ্প হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, বীজগুলো তাই টেনে নিয়ে রসে টইটম্বুর হয়ে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। তখন ইঁদুর তাই খেয়ে পেটও ভরায়, তেষ্টাও মেটায়।

অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে একরকম জানো গিরগিটি আছে, তার সর্বাঙ্গে কাঁটার ছড়াছড়ি। এই কাঁটার ফাঁকে ফাঁকে চামড়ায় সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে, তাই দিয়ে সামান্য বৃষ্টির ফোঁটাও ধরা পড়ে। এই জল কিন্তু সোজা রক্তে গিয়ে মেশে না, বরং বিশেষ নল বেয়ে মুখের দু পাশে দুই থলিতে জমা হয়। জল তেষ্টা পেলে গিরগিটি স্রেফ থলের উপর চাপ দেয়, আর জল মুখে ঢোকে।

আবার মরুর মাঝে ঝরণা বা জলাশয় পাওয়া গেলে গিরগিটি তার মধ্যে ডিগবাজী খায় আর ডুব দেয়। ব্যস্ মুখের থলিটি জলে ভরে গেল।

আরও মজা, রাতে গিরগিটির গায়ের কাঁটার ডগা এত ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে এমন কি মরুভূমির বাতাসের সামান্য জলীয় বাষ্পও ঐ কাঁটার ডগায় শিশির হয়ে জমে, আর কাঁটার গা বেয়ে গড়িয়ে চামড়ার ফুটোয় ধরা পড়ে।

এ ছাড়া অবশ্য সব প্রাণীর শরীরেই জল তৈয়ারীর কারখানা আছে। প্রাণীর শরীরে যে চর্বি বা ফ্যাট (fat) থাকে, সেটা পুড়লে জল হয়। প্রাণীর বেঁচে থাকার শক্তি আসে এই ফ্যাট পুড়িয়ে। আমাদের শরীরে অহোরাত্র এই ফ্যাট পুড়ে চলেছে, তাই শরীর গরম থাকে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু জলও তৈয়ারী হয়।

মরুর জন্তুরা তাই জলের ভাঁড়ার হিসাবে ফ্যাট জমা করে। উটের কুঁজে তার ফ্যাটের স্টক। উট সেজন্য জল না পেলেও ৬।৭ সপ্তাহ বেঁচে থাকে।

চর্বি যদি সারা গায়ে জমা হয় তা হলে ভীষণ গরম লাগে, কারণ চর্বি পুড়ে যে তাপ সৃষ্টি হয় তা চর্বির স্তর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে না।"

"তাই বুঝি গরম-কাল এলেই মা-মণি আর পিসীমণির এত কষ্ট হয়?"—ছোটন বলে।

"ঠিক বলেছ।"

মরুর দেশে যে সব জানোয়ার জলের ভাঁড়ার হিসাবে চর্বি সঞ্চয় করে, তারা ভাঁড়ারটা বিশেষ বিশেষ জায়গায় করে। উট তার কুঁজে, ধেড়ে গিরগিটি আর ভেড়া

[শেষাংশ ৩৪৫ পৃষ্ঠায়]

কুম্ভীরাশ্রু : সুনীলকুমার লাহিড়ী

প্রথম দেখা

সুজিতকুমার সেনগুপ্ত

প্রথম দৃষ্টিতে এক মনস্বী সম্বন্ধে অপর মনস্বী অথবা সাধারণ লোকের কি ধারণা হয়? মাইকেলকে দিয়েই শুরু করি।

নবদ্বীপের এক গোস্বামী পণ্ডিত 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য পাঠ করে ভাবরসে এমনই বিচলিত হয়ে ওঠেন যে, তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নবদ্বীপ থেকে কলকাতা যাত্রা করলেন কবি শ্রীমধুসূদনকে দেখবার জন্য। ১১৪ বছর আগের কথা, যাতায়াতের ব্যবস্থা তখন মোটেই সুবিধের নয়। তার ওপর সেই গোস্বামী মহাশয় ইতিপূর্বে কখনো কলকাতা আসেননি। আসার অবিশ্যি ইচ্ছেও হয়নি—কারণ লোক মুখে বহুবার শুনেছিলেন, কলকাতা ম্লেচ্ছদের শহর, জাতধর্ম বজায় রেখে চলাই মুশকিল। যাই হোক, গঙ্গার ওপর দিয়ে দীর্ঘপথ নৌকোয় অতিক্রম করে জীবনে প্রথম কলকাতায় এলেন তিনি। বিরাট শহর কলকাতা দেখে প্রথমটা তো তিনি হতবাক। লোক জনের হৈ-হল্লায় খানিক দিশেহারাই হয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে পালকি ভাড়া করে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমধুসূদনকে খোঁজার পালা শুরু। কষ্ট একটু হচ্ছে বটে, তাতে কি—এমন বৈষ্ণব কুলচূড়ামণি কবিকে স্বচক্ষে একবার না দেখলেই নয়! নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে থাকেন কবি, বই ছাপাবার জন্য কলকাতায় পদার্পণ করেছেন। তা, অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান মিললো বটে। খিদিরপুরের মেটকাফ প্রেসে গেলেই নাকি কবি শ্রীমধুসূদনকে পাওয়া যাবে। গোস্বামী মহাশয় যথাসময়ে মেটকাফ প্রেসে হাজির, ভাগ্যক্রমে দরজার মুখেই বাঙালী ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে গেল। গোস্বামী মহাশয় তাঁকে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, বাপু হে, ভক্তকুলচূড়ামণি, বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীমধুসূদনকে কোথায় গেলে দেখতে পাব?

ম্যানেজার বাবু তো প্রথমটা ভড়কে গেছেন বচন শুনে। পরে বুঝতে পেরে সহাস্যে বলেন, সামনের প্যাসেজ ধরে সোজা এগিয়ে ঐ কোণের ঘরটায় যান—উনি এখন লিখছেন, ওখানে গেলেই দেখা পাবেন আপনি।

উৎফুল্ল চিত্তে গোস্বামী মহাশয় তাড়াতাড়ি উল্লেখিত ঘরে প্রবেশ করেন। ঢুকেই স্তম্ভিত! কোট-প্যান্ট পরা মোটাসোটা কৃষ্ণবর্ণের বিরাট আকৃতির এক "মেটে ফিরিঙ্গী" ঘাড় নিচু করে টেবিলে কি যেন লিখছে।

গোস্বামী মহাশয়ের বুঝতে আর বাকী রইল না যে, তিনি ভুল ঘরে ঢুকেছেন, ম্যানেজারবাবু যে ঘরে যেতে

বলেছিলেন তা ঠিক মতো শুনতে না পাওয়ায়ই সম্ভবত এই বিপত্তি।

সে যুগে ইংরেজ ছাড়া ফিরিঙ্গিরাও রাজার জাতি—বরং তাদের প্রতাপই বেশি। গোস্বামী মহাশয়ের দারুণ ভয় হলো, অনুমতি না নিয়ে ঘরে অনধিকার প্রবেশের জন্য ফিরিঙ্গিটা তাঁকে বুঝি মারধোর করে। এদিকে সেই "মেটে ফিরিঙ্গি" ততক্ষণে তাঁকে দেখেছেন, স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ ও ঈষৎ ভাঙ্গাভাঙ্গা কণ্ঠ যথাসম্ভব কোমল করে প্রশ্ন করেন, কাকে চাই আপনার ঠাকুর মশায় ?

হোক ফিরিঙ্গি, বাংলা ভাষায় কথা বলতে শুনে গোস্বামী মহাশয় অনেকটাই আশ্বস্ত। হাত জোর করে বলেছেন, কিছু না জিজ্ঞেস করে ঘরে ঢুকে পড়েছি বলে অপরাধ ক্ষমা করবেন বাবা। আমি অনেকদূর—সেই নবদ্বীপ থেকে আসছি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ কবি চুড়ামণি শ্রীমধুসূদনকে একবার দেখে চোখ সার্থক করবো বলে। তাঁর ব্রজাঙ্গনা আমি পড়েছি কিনা! তা তাঁর সঙ্গে কি একবার দেখা হয় না বাবা ?

ফিরিঙ্গির চোখে প্রশংসার আলো, মুখে আনন্দের দীপ্তি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। অভিভূত কণ্ঠে বললেন, ব্রজাঙ্গনা পড়ে নবদ্বীপ থেকে ছুটে এসেছেন কবিকে শুধু একবার চোখের দেখা দেখবেন বলে ? ঠাকুরমশায় ধন্য আপনি! ধন্য আপনার কাব্য অনুরাগ! আমিই কবি শ্রীমধুসূদন।

অবিশ্বাস ভরে তাঁর দিকে খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন গোস্বামী মহাশয়। তারপর চোখ দিয়ে দরদর করে অশ্রুধারা নামলো। হাত জোর করে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, বাবা তুমি নিশ্চয় শাপভ্রষ্ট দেবতা।

বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখলেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এক প্রীতি সম্মেলনীতে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৫ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ৩৮। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার একজন পরম অনুরাগী হলেও তাঁকে তখন পর্যন্ত চোখে দেখার সুযোগ ঘটেনি কিশোর রবির। সেই সম্মেলনীর অজস্রলোকের ভীড়ের মধ্যেও এক ব্যক্তিকে দেখে চমকে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। ব্যক্তিটি মধ্যম উচ্চতা ও দোহারা গড়নের, মাথার অধিকাংশ চুলই সাদা। (যৌবনেই বঙ্কিমচন্দ্রের মাথার চুল পেকে সাদা হয়ে যায়।) লোকটি যে রূপবান এমন কথা মোটেই বলা চলে না, কিন্তু এঁর কপালে বিধাতা যেন এক অদৃশ্য রাজতিলক এঁকে দিয়েছেন। অন্য সকলের থেকে এই অজ্ঞাত পরিচয় ভদ্রলোক একেবারে আলাদা। যখন এক ব্যক্তি জানালেন, ইনিই বঙ্কিমচন্দ্র—কিশোর রবি হৃদয়ে অনুভব করলেন অপূর্ব আনন্দ। তিনি যাঁর লেখা পড়ে হৃদয়ের মধ্যে এক মহৎ ব্যক্তির মানস প্রতিমা গড়ে রেখেছেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্র দৈহিক গঠনেও এমনই মহৎ!

বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখতে গিয়ে আরেকজন কিন্তু অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন। ইনি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়। বঙ্কিমের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি এম. এ. ক্লাশের ছাত্র। পরবর্তীকালে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও প্রবন্ধকাররূপে বিপুল প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া দীর্ঘকাল তিনি অলংকৃত করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদটি। যাই হোক, এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে নিয়ে তিনি তো দেখতে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র তখন কলেজ স্ট্রিটের বাড়ীতে থাকতেন। দীনেশচন্দ্র তাঁর বাড়ীটা ভালোমতো চিনতেন না, লোকমুখে মোটামুটি বর্ণনা শুনে এসেছিলেন। দুপুর বেলা, গলিতে লোকজন নেই একদম, কাউকে যে জিজ্ঞেস করবেন তার উপায় নেই, অনুমানের উপর নির্ভর করে একটি বাড়ীর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজা খোলা। একতলার উঠোনে ধুতিপরা ও খালি গায়ে ফরসা রোগা চেহারার এক বৃদ্ধ কাকে যেন খুব চিৎকার করে বকাবকি করছেন। তাঁরা দুজনে গিয়ে দাঁড়াতে বৃদ্ধ কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে প্রশ্ন করেন, আপনারা কি কাউকে খুঁজছেন ? দীনেশচন্দ্র বিনীতকণ্ঠে বলেন, এই বাড়ীতে কি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থাকেন ? আমরা তার সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি।

বৃদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ, এই বাড়ীতেই বঙ্কিমচন্দ্র থাকেন বটে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আপনাদের কি কোন প্রয়োজন আছে ? দেখা করতে চান কেন জানতে

পারি কি? বঙ্কিম যখন জিজ্ঞেস করবেন আপনাদের আসার উদ্দেশ্য কি—তখন তাঁকে কি বলবো?

দীনেশচন্দ্র উত্তর দিলেন, না, তেমন কোনো প্রয়োজনে আসিনি। বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধু একবার দেখতে চাই নিজের চোখে, তাঁকে কখনও দেখিনি কিনা!

দীনেশচন্দ্রকে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি দেখিয়ে বৃদ্ধ বলেন, এই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যান। সামনেই বসবার ঘর। সেখানে একটু বসুন। বঙ্কিমবাবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি।

দীনেশচন্দ্র তাঁর বন্ধুকে নিয়ে দোতলার ঘরে জমিয়ে বসেছেন। মনে মনে আশা, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাহিত্য করবেন চুটিয়ে। মনে একটু বাহাদুরী দেখানোর বাসনাও ছিলো, তাই ইংরেজী-বাংলা বহু সুন্দর কোটেশনও ঠোঁটের ডগায় একেবারে তৈরী।

একটু পরেই সেই বৃদ্ধ ঘরে প্রবেশ করেন। এবার গায়ে একটা জামা দিয়ে এসেছেন। শান্ত কণ্ঠে বলেন, আমিই বঙ্কিমবাবু।

শুরুতে ভড়কে গেলেও দীনেশচন্দ্র চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে সাহিত্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেধার দিয়েও গেলেন না কিন্তু। সাহিত্য এবং সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র বরাবরই অতি পবিত্র বলে মনে করতেন। তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিলো, এই আলোচনার অধিকারীভেদ আছে। অর্থাৎ কিনা, যার তার সঙ্গে, বিশেষত উটকো চ্যাংড়া তরুণের সঙ্গে—তা সে হলই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সাহিত্য প্রসঙ্গ আলোচনা করাই চলে না—করা উচিতই নয়। দীনেশচন্দ্রকে দেখে যোগ্য বলেই মনে করেননি তিনি। কাজেই দীনেশচন্দ্র যতই সাহিত্য আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যেতে চান, বঙ্কিমচন্দ্র ততই আলু, পটল, পান, সুপুরি, ধান, চাল, দুধ, পাট, গরুর গাড়ি ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলতে থাকেন। যেমন, দীনেশচন্দ্র প্রশ্ন করেন, শৈবলিনীর স্বপ্নের নরক দর্শনের তাৎপর্যটি কি?

বঙ্কিমচন্দ্র অম্লান বদনে বলেন, আপনাদের গ্রামে পটল আর ঝিঙের দর কত?

দীনেশচন্দ্র আবার প্রশ্ন করেন 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ আপনি কমলাকান্ত চক্রবর্তী নামক যে অপূর্ব চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন, তা—

বঙ্কিমচন্দ্র কথা শেষ করতে না দিয়েই পালটা প্রশ্ন করেন, আপনাদের গ্রামে দুধে জল মেশানো হয়? আর, আউশ ধান আমন ধান দুটোই ভালো মতো চাষ চলে?

দীনেশচন্দ্র খুবই কাবু হয়ে পড়েছেন, তবুও হাল ছাড়ার পাত্র নন। ক্ষীন কণ্ঠে বলেন, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মতিবিবি চরিত্রটি সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। সেটি—

বঙ্কিমচন্দ্র শান্ত কণ্ঠেই পালটা প্রশ্ন করেন, আপনাদের গ্রাম থেকে যত কুমড়ো আর লাউ চালান যায়, তা কি গরুর গাড়ি করে স্টেশনে আসে?

বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যন্ত বিমর্ষ দীনেশচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণাম করতে গেলেন। বললেন, আপনি তো আমার কোন কথারই জবাব দিলেন না। আমি চলে যাচ্ছি।

বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই দীনেশচন্দ্রকে প্রণাম করতে দিলেন না। বললেন, আপনি মনে মনে আমার ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাচ্ছেন, সে কথা বুঝতে পারছি। তাহলে বাইরের এই প্রণামের মূল্য কতটুকু?

অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয়। সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে সারা পৃথিবীতে এমনটি আর কজন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তা আঙুলে গুনে বলা যায়। ইয়োরোপের বহু মনীষীই এই তথ্যটি বার উল্লেখ করে গেছেন। সুদূর ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে রাশিয়া এবং ইয়োরোপের তাবৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রে তাই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন রাজাধিরাজের সম্মান।

ইরানের সম্রাট, হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার রাজা, শক্তিধর ইয়োরোপিয়ান রাষ্ট্রগুলির প্রধান মন্ত্রীরা এবং তৎকালীন বাঘা বাঘা সাহিত্যিক, যথা জর্জ বার্নাড শ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, এইচ জি ওয়েলস, জাপানের রাজকবি নোগুচি, ও অগণিত সাধারণ মানুষের দল রবীন্দ্রনাথকে দেখা মাত্রই বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন। কাজেই

প্রথম দেখা নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে এত গল্প জমে আছে যা ঠিক মতো বলতে গেলে একখানা বই লেখার দরকার হয়। যাইহোক দুটি ঘটনা শোনাই।

হাঙ্গেরী সফরে ভিয়েনা পৌঁছেই রবীন্দ্রনাথ ফ্লু-তে আক্রান্ত হন। শক্ত ধরনের ফ্লু, তাই ডাক্তাররা বললেন পুরো তিন দিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। হাঙ্গেরী সরকারের সাদর আতিথ্যে তিনি ভিয়েনায় উঠেছিলেন এক খুব নাম করা হোটেলে। গভর্নমেন্ট নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন সেখানে গিয়ে তাঁকে উত্যক্ত না করে বা অযথা। কথা না বলায়। তবে এক-এক করে তাঁকে একবার দর্শন করে আসায় কোনো বাধা নেই।

হাঙ্গেরীর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ অর্কেস্ট্রা দলের প্রধান কাউন্ট আর্নেস্কি ছিলেন খুব প্রতিভাধর সঙ্গীত শিল্পী। সারা ইয়োরোপের স্বীকৃতি তিনি পেয়েছিলেন, প্রতিপত্তি ও আর্থিক সাফল্যের চূড়ায় অবস্থান করছিলেন তিনি। অত্যন্ত অহঙ্কারী ব্যক্তি তিনি, কে এক রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এতো মাতা-মাতি তাঁর গোড়া থেকেই ভালো লাগেনি। বহু অপ্রিয় ভাষণও করেছিলেন এই প্রসঙ্গে। যাই হোক, সবাই যখন উঁকি মেরে দেখে আসছে, তখন একবার যাওয়াই যাক না! রবীন্দ্রনাথের ঘরে যখন পৌঁছোলেন, তখন সন্ধ্যে প্রায় সাতটা। কাউন্টকে দেখে হোটেল কর্তৃপক্ষ শশব্যস্তে ঘরের দরজা খুলে দিলেন। ঘরে উঁকি মেরেই আর্নেস্কি একেবারে স্তব্ধ। মুখে ব্যঙ্গের হাসি মিলিয়ে গেছে পলকেই! রবীন্দ্রনাথ চোখ বুজে এক ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায়। হাত দুটি কোলের ওপর জড়ো করা, সামনের টেবিল ল্যাম্পের আলোর উজ্জলতা যেন সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের কাছে পরাজিত হয়ে লজ্জায় মাথা ঢেকেছে।

কাউন্ট কয়েক মিনিট ফ্যাল-ফ্যাল করে দেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার হয়ে এলেন। তারপর হোটেল কর্তৃপক্ষকে বললেন, আমার বেহালা নিয়ে এই প্যাসেজে দাঁড়িয়ে ওঁকে একটা সুর শোনাতে পারবো কি? ঐ সুর খুব চমৎকার, অসুস্থ শরীর ও মনকে চাঙ্গা করে তোলে, একবার বাজাবো? ওর কোনো অসুবিধে করবো না আমি, আপনারা বিশ্বাস করুন।

হোটেল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলেন তৎক্ষণাৎ, তারপর বেহালার অপূর্ব মূর্ছনায় ভরে গেল জায়গাটি। কাউন্ট একটানা দু ঘণ্টা তন্ময় হয়ে বাজালেন। রবীন্দ্রনাথের সেই সুর সত্যিই খুব ভালো লেগেছিলো। বাজনা শেষে কাউন্টকে ঘরে ডাকলেন। কাউন্ট কিন্তু এলেন না। বললেন, আমার সুর যে ওঁর ভালো লেগেছে, তাতে আমি ধন্য। আমি কাল এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করবো, আজ নয়, আজ উনি সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন।

সত্যিই পরের দিন থেকে রোজ কাউন্ট আর্নেস্কি রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে মাথা নিচু করে বসতেন! এবার দ্বিতীয় ঘটনা। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ। রবীন্দ্রনাথ তখন ইংলণ্ডে গেছেন। সঙ্গে আছেন দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব। হাইড পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। রোদে ঝলমল মনোরম একটি রোববারের বিকেল। যথারীতি তাঁকে ঘিরে সাহেব ও মেয়েদের দল। বিস্মিত ভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করছে তারা। এই অসামান্য জ্যোতির্ময় ব্যক্তিকে গায়ে পড়ে কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত হবে কিনা তাই আলোচনা করছে মৃদু কণ্ঠে। এক সুন্দরী যুবতী ইংরেজ মহিলা তাঁর ফুট-ফুটে সাত বছরের মেয়েটিকে নিয়ে একাগ্রচিত্তে দেখছিলেন! বাচ্চা মেয়েটির মুখ আশ্চর্য আনন্দে ভরে উঠলো। মায়ের হাত ধরে টানতে টানতে ভিড় ঠেলে রবীন্দ্রনাথের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। অতর্কিত এই পরিস্থিতিতে তরুণী মা লজ্জিত, জনতা সকৌতুকে মেয়েটির কার্যকলাপ দেখছে।

ছোট মেয়েটির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। রবীন্দ্রনাথের হাত নিজের কোমল মুঠি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো সে। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললো, এই যে। এই যে। এইবার দেখতে পেয়েছি। তবে কেন লোকে বলে ওকে দেখা যায় না?

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো মামনি, ইনিই তো যীশু! তাই না? আবার ফিরে এসেছেন।

দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ এগিয়ে এসে সস্নেহে ছোট মেয়েটির মাথায় হাত রাখলেন। কোমল কণ্ঠে বললেন, না উনি যীশু নন। তবে যীশুর মতোই উনি মানুষকে ভাল বেসেছেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি। এক উঠতি সাহিত্যিকের রচনা বাংলা সাহিত্যে নতুন চমক এনেছে।

যেমন সুন্দর জোরালো ভাষা, গল্প বানাবার ক্ষমতাও তেমনি। 'বড়দিদি,' 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে'—যে পড়েছে সেই মুগ্ধ! মুশকিল হলো, এই সাহিত্যিককে চোখে দেখেছে এমন লোক কম। থাকেন নাকি ব্রহ্মদেশে। সেই সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে মাসিক পত্র সম্পাদক ও প্রকাশকদের কাছে রেজিস্টার্ড পোস্টে লেখা কলকাতায় পৌঁছোয়। অবশ্য সেই লেখকের দু-একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু কলকাতায় থাকেন এবং ইতিপূর্বে দু-একবার সেই ব্রহ্মদেশ নিবাসী উঠতি লেখক বন্ধুদের কাছে কাটিয়েও গেছেন কয়েক দিন। কিন্তু বিশেষ কেউই তাঁকে চেনে না।

দুপুর প্রায় দুটো। এক সাময়িক পত্রিকা অফিসে তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিক (পরবর্তী কালের কিশোর সাহিত্যের খুব খ্যাতনামা লেখক) হেমেন্দ্র কুমার রায় মহাশয় পরিচিত কিছু সাহিত্য যোদ্ধার সঙ্গে সেই ব্রহ্ম প্রবাসী উঠতি সাহিত্যিকের রচনা প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন জোর গলায়। সম্পাদক তখনো আসেন নি। বাদ-প্রতিবাদ চিৎকারে আলোচনা জমে উঠেছে খুব, প্রত্যেকেরই কণ্ঠস্বর ক্রমেই সপ্তমে উঠছে, এমন সময় মূর্তিমান রসভঙ্গকারী এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করেন। আলোচনারত সকলেই বাধা পেয়ে বিরক্ত মুখে আগন্তুকের আপাদ মস্তক দেখে নিলেন।

অতি মলিন হাফশার্ট ও ধুতি, চটি পরিহিত, হাঁটু অবধি ধূলো, শীর্ণকায় শ্যামবর্ণ এক ব্যক্তি, চুল একেবারে উস্কোখুস্কো, রোদে পোড়া চেহারা, কুণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে। হাতে লম্বা নোংরা একটি দড়ির প্রান্তে বাঁধা রয়েছে এক ততোধিক নোংরা নেড়ি কুকুর। বাধো-বাধো গলায় আগন্তুক বলেন, ইয়ে···মানে···হল গিয়ে···সম্পাদক মশাইয়ের সঙ্গে একটু দেখা হবে কি?

হেমেন্দ্রকুমার রায় আগন্তুককে বললেন, সম্পাদক মশাই তো এখনো আসেননি, আপনি বেঞ্চিটায় বসুন, উনি সম্ভবত একটু পরেই এসে যাবেন।

আগন্তুককে নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে ঘরের সকলে আবার আলোচনায় ফিরে গেলে—সেই ব্রহ্মদেশে নিবাসী সাহিতি্যকের সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হলেন সবাই। ঘরের আবহাওয়া যখন সাহিত্য রসে একেবারে টইটম্বুর, সেই আগন্তুক কিন্তু তখন বেঞ্চিতে বসে বসে নির্বিকার ভাবে নেড়ি কুকুরটার সঙ্গে খেলা করছেন। বাদ-বিতণ্ডার একটি কথাও তাঁর কানে প্রবেশ করছে বলে মনে হয় না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন সম্পাদক এলেন না তখন সেই আগন্তুক হাতের দড়ি বাঁধা নেড়ি কুকুর সমেত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের কাছে এসে দাঁড়ালেন। হেমেন্দ্রকুমার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিছু বলতে চান? বলুন না।

আগন্তুক শার্টের হাতা দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে অতি বিনীত কণ্ঠে বললেন, ইয়ে···হ্যাঁ···বলতে চাই···মানে··· দেখুন, আমার তো আরো দু-তিন জায়গায় যেতে হবে, অপেক্ষা করা মুশকিল। আপনি দয়া করে সম্পাদক মশাইকে বলে দেবেন, ব্রহ্মদেশ থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেখা করতে এসেছিল।

ঘর শুদ্ধ লোক তখন লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে, স্তম্ভিত কণ্ঠে প্রশ্ন করছে—আপনিই! আপনিই!

কুম্ভীরাশ্রু [৩৪০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তাঁদের লেজে ফ্যাট জমায়। পাখীর ডিমের মধ্যে বাচ্চার জন্য জলের ভাঁড়ার হিসাবে চর্বি থাকে।"

"আচ্ছা বাবা, মা তা হলে জল না খেলেই তো রোগা হয়ে যাবেন"—টুকুনের Suggestion।

"উঁহু। মা-কে নুন খাওয়াও কমাতে হবে। আগে অস্‌মোসিসের কথা বলেছি। শরীরে নুন বেশী হলেই জল বেশী আঁটে। নুন কমালেই শরীর থেকে জল বেরিয়ে আসবে, কারণ তখন বাড়তি জলের দরকার হবে না শরীরের। চর্বি পুড়ে যে জল হচ্ছে তা-ও বেরিয়ে যাবে।"

রান্নাঘর থেকে নানান শব্দ আসছিল। হঠাৎ বাবুনের মা-র আর্তনাদ শুনতে পেলাম, "বাবুন, পাজী ছেলে, সব বড়াগুলো খেয়ে ফেলেছে। দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। বাবুন, কোথায় তুই?"

খুদে ডিটেক্‌টিভ আমার টেবিলের নীচে ঢুকে গেল। কোহ্-ই-নুর এজেন্সীর অন্য দুই পার্টনারও উধাও হয়ে গেল। আমি গম্ভীর হয়ে খবরের কাগজটা দিয়ে মুখ আড়াল করলাম।

ভবিষ্যতের শার্লক হোমস্‌কে চোর দায়ে ধরিয়ে দেব এমন অবুঝ আমি নই।
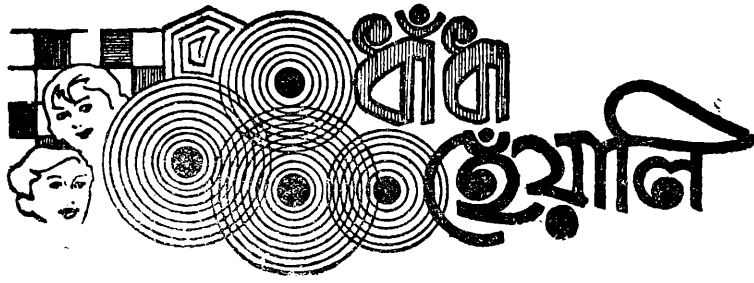
পরিচালক ঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য বছরের মতো এবারের শারদীয়া সংখ্যায় থাকছে বিচিত্র দুটি ধাঁধা। একটি ফুটবল খেলা-সংক্রান্ত— **"জিতল কে?"** এবং অপরটি গোয়েন্দা ধাঁধা— **"চোর কে?"** কিশোর ভারতীর দুইজন শুভাকাঙ্খী এই ধাঁধা দুটি তৈরি করেছেন। প্রথমটির রচয়িতা **বিশ্বনাথ দাস,** কলিকাতা ১২ এবং দ্বিতীয়টির রচয়িতা **চণ্ডী সেনগুপ্ত,** কলিকাতা ১৯।

ধাঁধা দুটির সমাধান যদি না পার, ২৪২নং পৃষ্ঠায় প্রদত্ত সমাধান দেখে নিও।

জিতল কে?

ফুটবলের কথা উঠতে অপু জানাল, "এবারে শীল্ডে নামকরা বেশ কটা দল আসছে বাইরে থেকে।"

"রাখ তো তোদের বাইরে দল,"—ফোঁস করে উঠলেন গুপীমামা,—"আমাদের আমলে শীল্ডে যে সব বাঘা বাঘা দল খেলত, তাদের ধারে কাছেও পোঁছোতে পারবে তোদের এইসব পিয়াং ইয়ং কি ট্রেঙ্গানু এফ. সি.? সেবার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা হলো একদিকে মোহনবাগানের সঙ্গে ইণ্ডিয়ান নেভির আর মহীশূর একাদশের সঙ্গে মাহীন্দ্র এ্যাণ্ড মাহীন্দ্রের; আর অন্যদিকে লীডার্স ক্লাবের সঙ্গে অন্ধ্র পুলিশের আর সার্ভিসেসের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের। তা আটটা টিমের ও বলে আমায় ছাখ্, ও বলে আমায় ছাখ্।

"কী রকম, কী রকম?"

"নয়তো কী,—ভাগ্নেদের কৌতূহল দেখে উৎসাহের চোটে গুপীমামা রীতিমত উত্তেজিত। "কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ফাইনাল পর্যন্ত মোট সাতটা খেলায় ইস্টবেঙ্গল যতগুলো গোল খেল, মাহীন্দ্র আর নেভির বিপক্ষেও গোল হ'ল ঠিক ততগুলো করে। এমন কি, মহীশূর, লীডার্স আর ইস্টবেঙ্গলের স্বপক্ষে গোলের সংখ্যা দাঁড়াল সমান সমান।"

"খেলাগুলো তাহলে খুবই জমেছিল বলুন?"

"সে কথা আর বলতে? এই সাতটা খেলায় মোট ২২টা গোলের মধ্যে একা মাহীন্দ্রই করলো ৭টা। অন্ধ্র পুলিশও কম যায় না। এদের স্বপক্ষে গোলের সংখ্যা দাঁড়ালো ৫। এদিকে মোহনবাগান আর সার্ভিসেসও করলো ৪টে করে।

ব্যাপারটা কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে টের পেয়ে বুড়াই তাড়াতাড়ি জানতে চাইল, "তাহলে শীল্ডটা সেবার পেল কে?"

"সেই কথাতেই তো আসছি",—অমায়িক হেসে গুপীমামা জানালেন,—"ফাইনালে কোন্ দল কাকে ক গোলে হারিয়ে শীল্ডটা জিতল সেবার, সেটাই তো তোদের বের করতে হবে মাথা খাটিয়ে।"

চায়ের খোঁজে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন গুপীমামা।

তোমরাও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজী থাকলে একটা কথা তোমাদের চুপিচুপি জানিয়ে দিতে পারি এই প্রসঙ্গে—ঐ সাতটি খেলার সব কটিতেই ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়েছিল সেবার।

চোর কে?

রবিবার। শীতের সন্ধ্যা। বাইরে টিপটিপিয়ে বিষ্টি পড়ছে। ঝানু গোয়েন্দা কানু রায়ের ঘরে জোর আড্ডা জমেছে। কানু রায় জমিয়ে ক্রিকেটের গপ্পো বলছেন। হঠাৎ টেলিফোন এলো। পর পর দুটো। প্রথমটা থানা থেকে। বউবাজারের গয়না-পাড়ার দু'দুটো দোকান ভেঙ্গে গয়না চুরির এত্তেলা। কানুদা কিন্তু কিছুতেই ওতে মাথা ঘামাতে রাজি নয়। সাফ বলে দিলেন—এখন আড্ডা মারছি, কাল সকালে দেখব'খন্। একটু পরে আবার টেলিফোন। এবার কানুদার বন্ধু গবা মিত্তির। তারও বউবাজারে গয়নার দোকান। গবা টেলিফোনে ডুকরে কেঁদে উঠল—"কানু আর ভাই, আমার দোকানে ডাকাতি

[শেষাংশ ৩৪৮ পৃষ্ঠায়]

মজার মজার জাত্ব

—জাত্বকর নয়নরঞ্জন বিশ্বাস

১. তাসের রঙ পরিবর্তন

জাত্বকর এক প্যাকেট তাস ভালভাবে শাফ্‌ল্ করে তা থেকে গোটা ছয়েক তাস নিয়ে বাকী তাসগুলো টেবিলের উপর রেখে দিলেন। এক-এক করে তাসগুলি মিলিয়ে তিনি দর্শকদের জানিয়ে দিলেন, তাঁর হাতে মোট ছয়টি তাস আছে। দর্শকবৃন্দও ছয়টি কোন কোন রঙের তাস আছে তা দেখে নিলেন। এরপর জাত্বকর হাতের তাসগুলো এক সঙ্গে বাম হাতে ধরে 'ওয়ান-টু-থ্রী' বললেন। এবং বলতে বলতে ডান হাতটা একবার তাসগুলোর উপর বুলিয়ে নিলেন। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গেই তাসগুলোর রং পরিবর্তন হয়ে গেল। জাত্বকর এক-এক করে তাসগুলোকে দর্শকদের দেখালেন। এই তাজ্জব ব্যাপার দেখে দর্শকরা তো থ!

কিভাবে হল, জানো? যে কয়টি তাসের রঙ পরিবর্তন করে দেখানো হবে, সেই তাসগুলোর পিছন দিকে অন্য তাস থেকে পাতলা করে তাসের রঙ (গোটা তাস) তুলে নিয়ে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নিতে হবে। অর্থাৎ কৌশল করা তাসগুলোর পিছন দিক বলে কিছু থাকবে না। তুই দিকে তুই রঙের তাস। প্যাকেটের অন্য তাসগুলো সাধারণ তাসই থাকবে। কৌশল করা তাসগুলো প্যাকেটের একেবারে সম্মুখের দিকে থাকাতে একটু সতর্কভাবে পিছনের দিকের তাস নিয়ে শাফ্‌ল্ করলে, অন্য তাসগুলোর সঙ্গে মিশে যাওয়ার ভয় থাকবে না। এবং পরপর বেছে নিতেও অসুবিধা হবে না। আর সাধারণ তাসগুলি শাফ্‌ল্ করা দেখে দর্শকগণ বুঝতেই পারবেন না যে ওর ভিতর কৌশল করা তাস লুকানো আছে। তারপর ছয়টি তাস নিয়ে 'ওয়ান-টু-থ্রী' বলার সময় ডান হাতের আড়াল দিয়ে তাসগুলো উলটে নিলেই কাজ হয়ে গেল। কয়েক বার অভ্যাস করলেই দেখানো যাবে।

২. ডিমের ভেলকি

জাত্বকর প্লেটে করে এক প্লেট হাঁস অথবা মুরগীর ডিম দর্শকবৃন্দের মাঝে নিয়ে গেলেন। তিনি দর্শকদের বললেন, 'এবার একটা মজার খেলা দেখাবো আপনাদের। আপনারা প্লেট থেকে একটা ডিম বেছে দিয়ে আমার হাতে দিন এবং আপনাদের পকেট থেকে একটা রুমাল আমায় দিন।

জাত্বকর দর্শকদের মনোনীত ডিম এবং রুমাল হাতে করে স্টেজে ফিরে এলেন। এবং ডিমের প্লেটটা টেবিলের এক প্রান্তে সরিয়ে রেখে রুমালের ভিতর দর্শকদের মনোনীত ডিমটি জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'মহাশয় এবং মহাশয়াগণ, আপনারা দেখছেন যে আমি আপনাদের মনোনীত ডিম আপনাদেরই রুমালের মধ্যে পুঁটলি করে বেঁধে এই টেবিলের উপর রেখে দিলাম। এবার দেখুন, রুমালের মধ্যে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটবে। ডিম ফুটে বাচ্চা হয়ে বাচ্চা হাঁসটা রুমালের বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার কেমন চেষ্টা করবে।' এই কথা বলে জাত্বকর মন্ত্র পড়তে পড়তে টেবিলের চারদিকে তিন পাক ঘুরে জাত্বদণ্ডটি রুমালের উপর ঠেকালেন। কি আশ্চর্য, সত্যিই রুমালের ভিতর ডিমের প্রাণ সঞ্চার হয়েছে।

রুমালটি নড়াচড়া করতে থাকল। অর্থাৎ হাঁসটি রুমালের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে আসতে চাইছে। আর দর্শকরা অদ্ভুত কাণ্ড দেখে খুবই পুলকিত। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুঁটলি খুলতে দেখা গেল, ডিমটি ঠিক পূর্বের মতই অক্ষত রয়েছে।

কৌশল : ডিমে কোন কৌশল নেই। আর রুমাল তো দর্শকদেরই কাছ থেকে নেওয়া। তবে কি করে একাজ সম্ভব হল? মন্ত্র? না তাও নয়। স্টেজের ছাদের দিক থেকে টেবিলের উপর সরু নাইলন তার অথবা সরু কালো মজবুত সুতো আগে থেকেই ঝুলানো থাকবে, যা দর্শকদের দৃষ্টি গোচর হবে না এবং যার অপর প্রান্ত আড়ালে দাঁড়ানো সহকারীর হাতে ধরা থাকবে। রুমাল দিয়ে ডিম বাঁধার সময় নাইলনের তারটি রুমালের সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। তারপর জাদুকরের সহকারী নির্দেশ মতো আড়াল থেকে নাইলন তার ধরে মৃদু মৃদু ঝাঁকুনি দিলেই কাজ হল। কলকাতার চীনা বাজারে সূক্ষ্ম নাইলন তার কিনতে পাওয়া যায়, যার সাহায্যে দিনের আলোতেও ওই খেলা দেখানো চলবে। এই খেলার সময় স্টেজের পিছনে কালো পর্দা থাকবে।

৩. দিব্যদৃষ্টির খেলা

জাদুকর দর্শকমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনাদের মধ্য থেকে কেউ একজন স্টেজে উঠে আসুন। এবার আমি আমার বিখ্যাত দিব্যদৃষ্টির খেলা দেখাব।

জাদুকরের কথায় দর্শকদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি স্টেজে আসার পর জাদুকর একজনকে বললেন, 'দেখুন, স্টেজের পিছন প্রান্তে ব্ল্যাক বোর্ডে আপনারা আপনাদের ইচ্ছেমত সংখ্যা লিখবেন আর আমি স্টেজের সম্মুখ প্রান্তে এগিয়ে গিয়ে বোর্ডের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তা বলে দেব।'

জাদুকরের নির্দেশমতো একজন একটি সংখ্যা লিখলেন, সঙ্গে সঙ্গেই জাদুকর সংখ্যাটি বলে দিলেন।

কৌশল : দর্শকগণের মধ্যে আগে থেকেই জাদুকরের একজন সহকারী দর্শক সেজে বসে থাকবে। সে ওই সময় দুই গালে দুহাত লাগিয়ে বসে থাকবে। এক হাতের কনিষ্ঠ আঙুল থেকে অন্য হাতের কনিষ্ঠ আঙুল পর্যন্ত মোট দশটি আঙুলে দশটি সংখ্যা ধরে নিতে হবে। সুতরাং দর্শক যেই ব্ল্যাক বোর্ডে পাঁচ লিখবেন, তখন সহকারী তার পাঁচ নম্বর আঙুলটা একটু নাড়াবে। তাই দেখে অনায়াসে জাদুকর বলে দিতে পারবেন, বোর্ডে পাঁচ সংখ্যা লেখা হয়েছে। পনের লিখলে সহকারী প্রথমে এক নম্বর এবং পরে পাঁচ নম্বর আঙুল নাড়ালেই হবে। এইভাবে জাদুকর শুধু সংখ্যাই নয়, তাসের রঙ ও নম্বর ইত্যাদি অনেক কিছুই বলে দিতে পারবেন।

ধাঁধা-হেঁয়ালি [৩৪৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

হয়ে গেছে রে!" অগত্যা কানুদা গবার দোকানে চললেন। ওর সঙ্গে পরিতোষ।

তখন রাত প্রায় সাড়ে নটা। দোকানের সামনে গবা দাঁড়িয়ে ছিল। তখনও পুলিশ আসেনি। দোকানের বিরাট শো কেসের কাঁচ ভাঙা। ফুটপাতে এন্তার কাঁচের টুকরো-ছড়ানো ছেটানো। ভেতরের কাঁচের শো-কেসও ভাঙা এবং খালি। গবা বললে,"আজ রবিবার দোকান বন্ধ। প্রতি রবিবার আমি বিকেলবেলা দোকানে আসি, দোকানের ভেতরের ছোট্ট ঘরটাতে বসে সারা হপ্তার হিসেব দেখি। রাত দশটা নাগাদ দারোয়ান এলে বাড়ি যাই। দোকানের লোহার গেট আর কাঠের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করেছি। আজও তাই ছিল। সাতটা নাগাদ হঠাৎ দপ করে আলো নিভে গেল। ভাবলাম 'লোড শেডিং'। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার দিকের কাঁচের শো-কেস ভাঙার শব্দ। কারা যেন দুমদাম করে শো-কেস ভাঙার ফাঁক দিয়ে দোকানে ঢুকলো। তারপর দোকানের ভেতরের কাঁচের শো-কেস ভাঙার শব্দ। অন্ধকারে কিছু বোঝার আগেই ওরা যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই হাওয়া। মোট জনা তিনেক ছিল। রাস্তার আলোয় একজনের মুখ খানিকটা দেখতে পেয়েছি। রাস্তায় আলো জলছে দেখে সন্দেহ হলো। তবে তো 'লোড শেডিং' নয়। তবে কি কেবল আমার দোকানের লাইন ফিউজ হলো? দোকানের ফিউজ বোর্ড আমার ভেতরের ছোট ঘরে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি, গুণ্ডাগুলো কোন্ ফাঁকে কানেকশনের মেন সুইচ বন্ধ করে লাইট নিভিয়ে দিয়ে গেছে। এই ছাখ্ কানু,দামী গয়নাগুলো সব সাফ করে নিয়ে গেছে রে ভাই! যে করে হোক গুণ্ডাগুলোকে তুই ধর্ ভাই।" সব শুনে টুনে কানুদা বললেন, "যে লোকটাকে রাস্তার আলোয় দেখেছিস তাকে চিনতে পারবি?"

"অনেকটা আমার দারোয়ানের মতো চেহারার আদল কেবল একটা গোঁফ আছে।"

ইতিমধ্যে গবার দারোয়ান রাত্রের ডিউটিতে এসে গেল। দারোয়ানের গোঁফ পরিস্কার কামানো। কানুদা কটমট করে দারোয়ানকে একবার দেখলেন। টুক করে ওর গোঁফে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে শুকলেন। তারপর পরিতোষকে বললেন, "কেসটা খুবই সোজা।"

কেসটা খুবই সোজা কেন? কে চোর?

স্বপ্নভঙ্গ * শৈলেন দত্ত

আকাশ বলল ঃ এসো না
চুপি চুপি দুটো কথা কই,
ছাখো না নবীন ধানক্ষেত
সবুজ সোহাগে থইথই।
বকের পাখায় রোদ্দুর
চিকচিক সোনা চিকচিক
বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুখ
হাসছে শালুক ফিকফিক।
কথার পৃষ্ঠে কে যেন
বলল ঃ রেশনে যাবে না ?
শুনছি বিকেলে হয় তো
রেশনে চালই পাবে না।

ছাখো না শিউলি-স্বপ্নে
বিভোর হয়েছে বনতল
শঙ্খ-শুভ্র মেঘেরা
সুদূর পিয়াসী চঞ্চল।
ঝুরু ঝুরু ঝুরু বাতাসে
কাশের গুচ্ছ নিশপিশ
আনমনে তরুশীর্ষে
দোয়েল-ফিঙেরা দেয় শিস।
কথার পৃষ্ঠে কে যেন
বলল ঃ বড়ই দুর্দিন
রাত্রেই আলো নিভবে,
আনতে যাবে না কেরোসিন ?

মাছরাঙা-দিঘি শান্ত
বকের পাখায় অবকাশ
শিশিরের মণি-মুক্তো
মুঠো মুঠো ছাখো মাখে ঘাস
হেসে কুটি কুটি কাশবন
পেয়েছে ছুটির চিঠিটি
নদীর কণ্ঠে শোনো ঐ
সুদূরের স্বরলিপিটি।
চমক ভাঙালো কে যেন,
বলল ঃ থাক্ না স্বপ্ন
ছাখো তো জীবনে জড়িয়ে
কত আঁধি, কত প্রশ্ন !
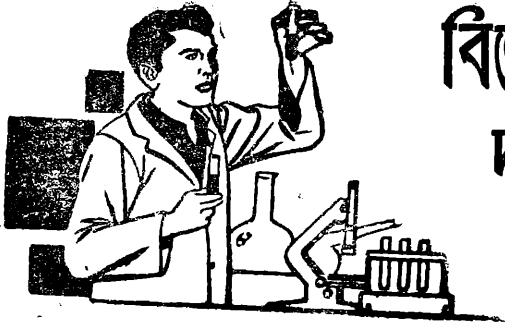
বিজ্ঞানীর দপ্তর

* পরিচালক *

কিশোর বিজ্ঞানী

• *নিজে করো* •

এলিমিনেটর

—শিখরেশ দাশ

এবারে তোমাদের প্রয়োজনীয় একটি সহজ জিনিস তৈরি করা শেখাব। এ থেকে তোমরা খুব কম খরচে রেডিওতে গান-বাজনা শুনতে পাবে। নিচের জিনিসগুলো যে কোন রেডিওর দোকান থেকে নিয়ে নাও।

৪) Resistance (R_1) [150 Ω]—একটা

৫) SPDT সুইচ—একটা

৬) কিছু প্লাস্টিক তার ও একটা কাঠের বড় টুকরো।
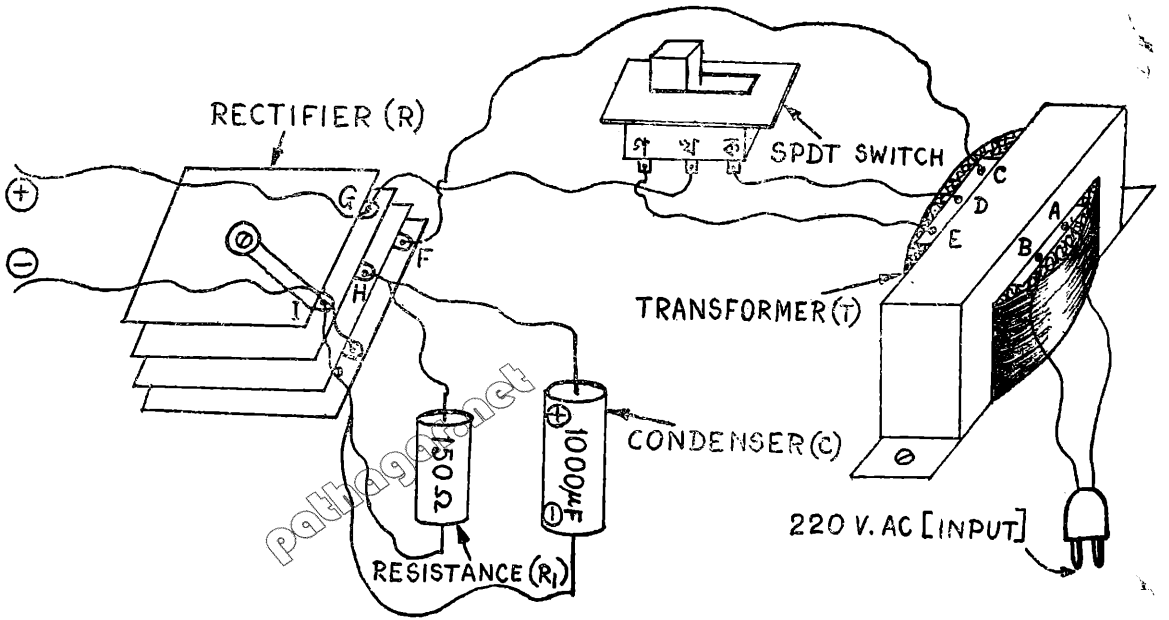
ELIMINATOR

১) Step-down TRANSFORMER (T) [6/9 Volts]—একটা

২) Rectifier (R)—একটা

৩) Condenser (c) [1000 µF 12V]—একটা

Transformer-টাকে ভাল করে লক্ষ্য কর। দেখ—একদিক থেকে দুটো তার বেরিয়েছে (A, B), আর একদিক থেকে তিনটে (C,D,E)। Transformer-টার C,D,E প্রান্তের দিকে অধিকাংশ জায়গা খালি রেখে, ওটাকে স্ক্রু দিয়ে লাগাও। তার পাশে লাগাও

রেক্টিফায়ারটাকে (ছবি দেখ)। এবার C প্রান্তের সঙ্গে F যোগ কর। এবার SPDT সুইচটাকে দেখ। এর তিনটে প্রান্ত আছে (ক, খ আর গ)। ক এর সঙ্গে D প্রান্ত যোগ কর আর গ এর সঙ্গে E। এবার 'খ'র সঙ্গে লাগাও G প্রান্ত।

এবার condenserটার + (পজিটিভ) প্রান্তের সঙ্গে Resistance-এর যে কোন প্রান্ত নিয়ে লাগাও H প্রান্তের সঙ্গে। তারপর Condenserএর − (নেগেটিভ) প্রান্তের সঙ্গে Resistanceএর যে কোন প্রান্ত নিয়ে লাগাও I প্রান্তের সঙ্গে। এবার H আর I-এ একটা করে বড় তার যোগ কর। I-এর তারটা হবে তোমার Eliminator-এর −ve প্রান্ত আর H-এরটা +ve.

এবার Transformer এর A, আর B প্রান্তে দুটো লম্বা তার লাগিয়ে তাতে একটা প্ল্যাগ লাগাও। এটা না লাগিয়েও কোন প্ল্যাগ পয়েন্ট তার দুটো ঢুকিয়ে দেওয়া চলে। তবে, 220 volt AC বিদ্যুতে ছাড়া হবে না। এবার + ve আর − ve প্রান্তের সঙ্গে তোমাদের ট্রানজিস্টর রেডিওর ব্যাটারী লাগানো জায়গায় যে দুটি প্রান্ত আছে, তাতে লাগালেই দেখবে রেডিওটা বেজে উঠেছে। যদি তোমাদের রেডিও চার ব্যাটারীতে চলে, তাহলে সুইচটা 'ক'র দিকে করে দাও আর যদি ছয় ব্যাটারীতে চলে, তাহলে করে দাও 'গ' দিকে।

বিশেষভাবে মনে রেখো, যেহেতু AC বিদ্যুতে মারাত্মক ভাবে শক্ দিতে পারে, যার ফলে তোমার ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে এবং উপরন্তু তোমার ট্রানজিস্টর রেডিওটা একেবারে খারাপ হতে পারে, সেজন্যে ঐ Eliminatorটা তৈরি করে জানাশুনা ভাল ইলেকট্রিশিয়ানকে দিয়ে নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা করিয়ে নিও। আর যোগাযোগ ঝাল (Solder) দিয়ে করাই ভাল, তাহলে খুলে যাবার কোন আশঙ্কা থাকে না।

ভেজাল

• বিজ্ঞান-বিচিত্রা •

—তাপসকুমার ঘোষ

আজকাল প্রায় সব রকমের খাবারেই ভেজাল পাওয়া যায়। আর এই ভেজাল খাবার খেয়ে আমরা অনেকে অসুস্থ হচ্ছি, এমন কি অনেকে মারাও যায়। আমি তোমাদের ভেজালদার চিনিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু খাবারে ভেজাল ধরার কয়েকটি সুন্দর এবং সহজ উপায় শিখিয়ে দিচ্ছি।

স্নেহজাতীয় খাবারের পর্যায়ে পড়ে যেমন ঘি, ডালদা, মাখন এবং সর্ষের তেলের ভেজাল কিভাবে ধরা যায় দেখ।

ভেজাল বার করার জন্যে শুধু মাত্র কয়েকটা সাধারণ জিনিস দরকার। যেমন, খানিকটা গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, একটুখানি চিনি, কয়েকটা টেস্ট-টিউব এবং অ্যাসিড তোলার জন্য একটি ড্রপার।

প্রথমে দেখ কিভাবে সর্ষের তেলের ভেজাল বার করতে হয়। একটা টেস্ট টিউব নিয়ে তুমি যে সর্ষের তেল খাও তার খানিকটা টেস্ট টিউবে ঢালো। তারপর ড্রপারে করে তেলের চাইতে কম কিছুটা গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড টিউবের মধ্যে ঢালো। দেখবে যে, অ্যাসিড টিউবের একদম তলায় চলে যাবে এবং তেল ওপরে ভাসবে। খানিকক্ষণ পর যদি দেখতে পাও যে, তেল ও অ্যাসিডের সংযোগ-স্থল কালচে গোলাপী আকার নিচ্ছে, তাহলে বুঝবে, ঐ তেলটায় ভেজাল আছে। ভেজালটা হচ্ছে শেয়ালকাঁটার বীজের তেল। আর যদি ঐ রঙটা না আসে, তাহলে বুঝবে যে, তেলে শেয়ালকাঁটার বীজের ভেজাল নেই।

ডালদার ভেজাল বার করতে হবে? ডালদা তৈরী হয় নারকেল তেল থেকে। আর এতে যে ভেজালটা থাকে সেটা হচ্ছে জন্তু-জানোয়ারের চর্বি। প্রথমে একটা টেস্ট টিউবে খানিক ডালদা নিয়ে গালিয়ে নাও। তারপর ড্রপারে করে ডালদার চেয়ে কম নাইট্রিক অ্যাসিড ডালদার সাথে মেশাও। দেখবে যে, টিউবের একদম তলায় অ্যাসিড চলে যাবে এবং ডালদা ওপরে ভাসবে। খানিকক্ষণ পর যদি দেখ যে, অ্যাসিড ও ডালদার সংযোগ-স্থলে বাদামী রঙের আভা দেখা যাচ্ছে, তাহলে বুঝবে যে, ডালদাটায় চর্বি মেশানো আছে।

এবারে মাখনে ভেজাল সম্বন্ধে শোন। আমরা

বাজারে সাধারণতঃ দুরকমের মাখন দেখি—সাদা এবং হলদে। কিন্তু কোন মাখনই পুরোপুরি সাদা কিংবা পুরোপুরি হলদে হয় না। মাখন হয় হলেদেটে সাদা রঙের। মাখনের সঙ্গে রঙ মিশিয়ে সাদা কিংবা হলদে করা হয়। কিন্তু এই রঙটা ভেজাল নয়; মাখনে ভেজাল দেবার গ্রামীণ পদ্ধতি হচ্ছে কলার গাদ মেশানো। পচা কলাকে ফেনিয়ে এক রকমের ফেনা তৈরী হয়। তাকে কলার গাদ বলে।

একটা টেস্ট টিউবে সাদা মাখন নিয়ে গলাবার পর মাখনের চাইতে কম নাইট্রিক অ্যাসিড মেশালে দেখবে, অ্যাসিড একদম তলায় চলে যাবে এবং মাখন ওপরে ভাসবে। কিছুক্ষণ পর যদি দেখ যে, অ্যাসিড ও মাখনের সংযোগস্থলে সাদা ফেনার সৃষ্টি হয়েছে এবং নাইট্রিক অ্যাসিড সাদাটে হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে পারবে যে, ঐ মাখনে ভেজাল আছে। কলার গাদ ফেনা হিসাবে জমা হয় এবং যে রঙটা মাখনে ছিল সেটা অ্যাসিডে গুলে যাওয়ায় ফলে অ্যাসিড সাদাটে হয়।

অন্য একটা টেস্ট টিউবে হলদে মাখন নিয়ে গলাবার পর মাখনের চাইতে কম নাইট্রিক অ্যাসিড মেশালে দেখতে পাবে যে, অ্যাসিড তলায় চলে যাবে এবং মাখন ওপরে ভাসবে। কিছুক্ষণ পর যদি দেখ যে, মাখন এবং অ্যাসিডের সংযোগস্থলে সাদা ফেনা জমা হচ্ছে এবং অ্যাসিড হলদে মত হয়ে গেছে, তাহলে বুঝতে পারবে যে, ঐ মাখনে ভেজাল আছে। কলার গাদ ফেনা হিসাবে জমে এবং হলদে রঙ অ্যাসিড গুলে যাবার ফলে অ্যাসিড হলদে হয়ে যায়।

গাওয়া ঘিয়ের ভেজাল ধরার পদ্ধতি কিন্তু অন্য রকম। গাওয়া ঘিয়ের ভেজাল বার করার জন্যে দরকার কয়েকদানা চিনি এবং গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। গাওয়া ঘিয়ে সাধারণত বাজে ডালদা ভেজাল দেওয়া হয়। একটা টেস্ট টিউবে ঘি নিয়ে গলাবার পর ঘিয়ের চাইতে কম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং কয়েক দানা চিনি মেশাও। খানিকক্ষণ পর যদি দেখতে পাও যে, অ্যাসিড এবং ঘিয়ের সংযোগস্থলে বাদামী রঙের আভা দেখা যাচ্ছে তাহলে বুঝতে পারবে যে, ঐ ঘিয়ে ভেজাল আছে।

এই পরীক্ষাগুলোর সাহায্যে তোমরা খাবারের ভেজাল ধরতে পারবে বটে, কিন্তু ভেজাল আলাদা করতে পারবে না।

ওপরের পরীক্ষাগুলো কিন্তু নামকরা ব্রাণ্ডে প্যাক-করা খাবারগুলির ক্ষেত্রে চলবে না। কারণ ঐ খাবারগুলিতে ভেজাল দেওয়া থাকলেও যাতে সাধারণ উপায়ে ভেজাল বার না করা যায়, সেজন্য অন্যান্য কেমিক্যাল মেশানো থাকে।

—শঙ্করলাল সাহা

স্নেহশীলা মাতা—অকৃতজ্ঞ সন্তান

জাপানের এই বাদামী বর্ণের মাকড়সাগুলি আকারে খুবই ছোট। যখন ক্ষেতগুলি কচি ধানে গাছে ভরে ওঠে, তখন এরা হাজির হয় সেখানে। স্ত্রী-মাকড়সা একটা চওড়া আর সবুজ ধানের পাতা বেছে নেয়। তারপর সেটাকে তালপাতার বাঁশির মত পেঁচাতে থাকে। কয়েকদিনের পরিশ্রমে তৈরি করে বাঁশির মত দেখতে একটা বাসা। বৃষ্টির জল যাতে প্রবেশ করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে বাসার মুখে একটা ঢাকনিও থাকে।

তারপর স্ত্রী-মাকড়সা কয়েক ডজন ডিম পাড়ে ঐ বাসাটিতে। যতদিন না ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোচ্ছে একটানা ততদিন পাহারা দেয় ডিমগুলিকে। মুহূর্তের জন্যও কোথাও যায় না বাসা ছেড়ে। এমনই তার সন্তান-স্নেহ! অথচ ডিম ফুটে যে বাচ্চা বেরোয়, তারা মায়ের—এই স্নেহের মূল্য দেয় কিভাবে জানো? তারা লুণ্ঠনকারী সৈন্যদলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের শরীরে—নিমেষে মায়ের মাথাটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলে। তারপর মায়ের দেহের রস শুষে খায়। হিংস্রতার এমন নজীর জীবজগতে খুব কমই আছে।

এই মাকড়সার বৈজ্ঞানিক নাম—Cheira canthium japonicum.